'যং লঙ্কা'—

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন দাস
সুরেন্দ্রনাথ গুঁই
নিবেদিত

সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলিকাতা

YANG LABDHWA

by Surendranath Guin

প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ সন

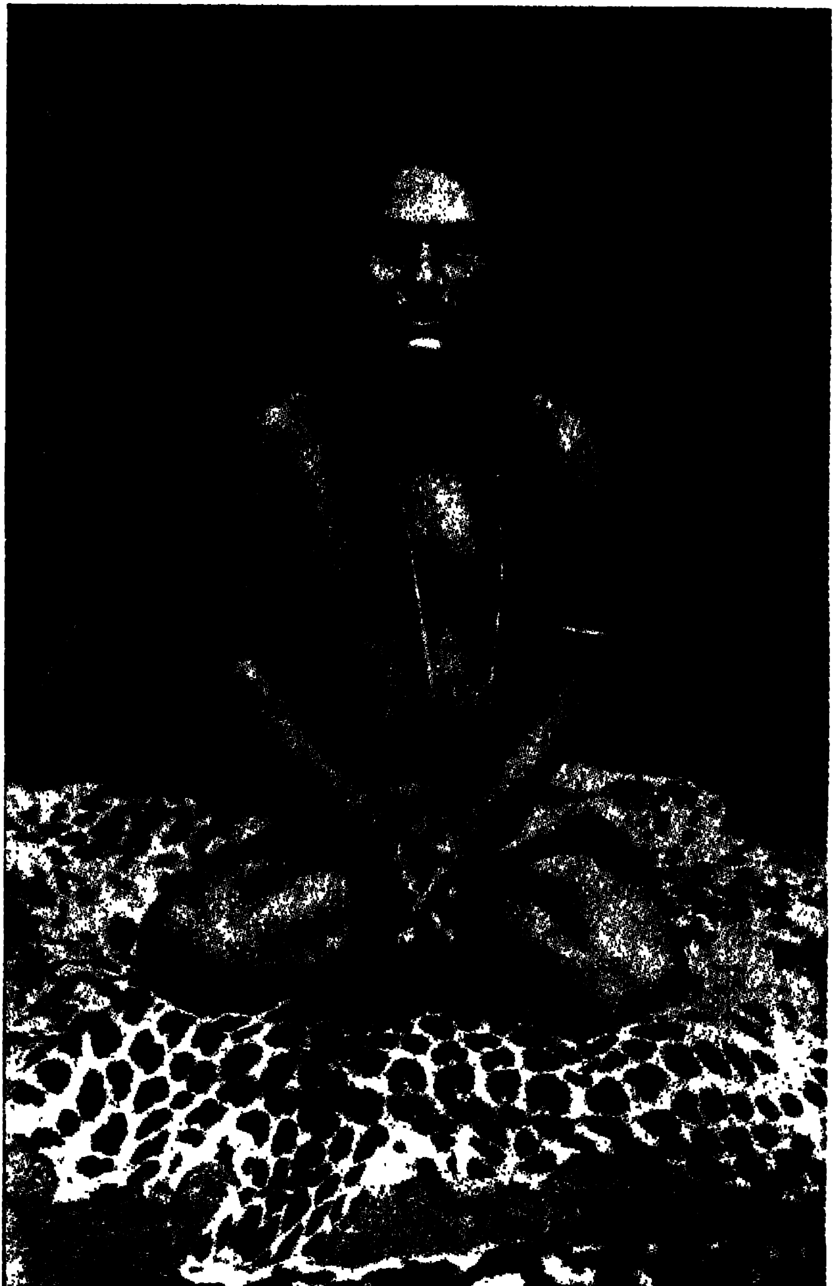
শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক, সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীপার্বতীচরণ রায় কর্তৃক, দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০১-এ
বিধান সরণি কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

প্রথম অধ্যায়

বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ

"মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার
বস্তু নির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার
করি বস্তুর নির্দ্দেশ,
যাহা হইতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ।"

—চৈতন্যচরিতামৃত ১।১



শ্রীশ্রীপাতাল দেব

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

'বস্তু-নির্দ্দেশ'

শ্রীভগবানের অবতার-কারণ

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"—গীতা ৪।৭

—হে অর্জ্জুন! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়েই আমি অবতীর্ণ হই।

এই জগতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের দ্বন্দ্ব চিরকালই চ'লেছে। সময়ে সময়ে অধর্ম্মের প্রকোপ এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ধর্ম্ম বিপর্যস্ত, লাঞ্ছিত ও বিনষ্টপ্রায় হয়েছে; মনে হয়েছে এই পৃথিবীতে ধর্ম্মের রাজ্য বুঝি অন্তর্হিত হল; ধর্ম্ম, ন্যায়, করুণা, প্রীতি—এরা বুঝি সব মিথ্যা, অলীক। সেই অধর্ম্ম, অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের পূর্ণ প্রকোপকালে, নিদাঘতপ্ত ধরণীবক্ষে সহসা নববর্ষার বারিধারার ন্যায় কোনো এক অচিন্ত্য করুণাশক্তি যেন মূর্ত্ত হয়ে ধর্ম্মের সুশীতল সুধাধারায় ধরণী প্লাবিত করে পুনরায় ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাভব ঘোষণা ক'রেছে। সেই মূর্ত্তিমান করুণাশক্তিকে জগদ্বাসী কখনো মহাপুরুষরূপে, কখনো শক্ত্যাবেশরূপে, কখনো বা অংশাবতার এবং ক্বচিৎ পূর্ণাবতাররূপে অভিনন্দিত ক'রেছে। তাঁর বাণী, তাঁর ক্রিয়া-কলাপ পরবর্ত্তী মানবসমাজকে অভিনব উৎসাহে, প্রেরণায় ও পবিত্র ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রেরিত করেছে। তাঁর আবির্ভাব থেকে তিরোভাব অবধি তাঁর প্রতিদিনের প্রতি ক্ষুদ্র কার্য্য, আচরণ ও ইঙ্গিত কোটি কোটি নরনারীকে অসীম আশায়, অদম্য উৎসাহে ও গভীর নিষ্ঠায় অমৃতের পথোদ্দেশে চালিত ক'রেছে। একটি পবিত্র জীবন-কুসুমের স্নিগ্ধ সৌরভ অনুকূল আবহাওয়ায় যুগ যুগ ধরে দিগ-দিগন্ত সুরভিত ক'রে রেখেছে। যুগে যুগে, দেশে দেশে নর-নারী তাঁর জীবনলীলামৃত ধারায় অভিষিক্ত হয়ে শুদ্ধ, পবিত্র ও পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু কালের অব্যাহত গতি-প্রভাবে মনুষ্য-সমাজে আবার অধর্ম্মের অন্ধকার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে এবং ক্রমশঃ অধর্ম্ম ও পাপের প্রকোপে ধর্ম্ম ম্লান হয়ে এসেছে। ধর্ম্মের এরূপ সঙ্কটকালে ধর্ম্মত্রাতা মহাশক্তি আবার আবির্ভূত হয়ে অধর্ম্মের উচ্ছেদ ও ধর্ম্মের বিজয় কেতন উড়িয়েছে। প্রবহমান কালচক্রে এইরূপে ধর্ম্ম-অধর্ম্মের এই চিরন্তন সংঘাতে মন্দীভূত ধর্ম্মপ্রভাব ও অধর্ম্মের প্রবল প্রাদুর্ভাব মুহূর্ত্তে ধর্ম্মেরই জয় হয়েছে। যুগ যুগ ধরে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের এই সংঘর্ষে ও তার পরিণামে ধর্ম্মের বিজয়ে, জগদ্বাসী জেনেছে, এই ধরণী প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মরাজ্য এবং এর স্রষ্টাই স্বয়ং ধর্ম্মত্রাতা। কালপ্রভাবে

ধর্মভাব ক্ষীয়মান হ'লেও, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়, ঐ ধর্মের অন্তরে নিত্য বিরাজমান ধর্ম-সংত্রাতার কৃপাশক্তিবলে ধর্ম আবার নিজ চির-উজ্জ্বল-স্বরূপ প্রকাশ করবে। এই বিশ্বাসই বিশ্ববাসীকে অধর্মের শত অন্যায়, অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও, তৎ-পশ্চাতে নিত্য শাশ্বত ও চির-ভাস্বর ধর্মের আগমণী বাণীর আশ্বাস শুনিয়ে তাদের মনে ধৈর্য্য, সাহস ও আশার সঞ্চার ক'রেছে এবং অধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রেরণা, উৎসাহ ও শক্তি জুগিয়েছে। সকল অন্যায়ের কল-কোলাহল ভেদ ক'রে শ্রীভগবানের বজ্র-গম্ভীর বাণী এই সব অধর্ম-প্রপীড়িত জনগণকে নবীন আশায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"—গীতা ৪।৮

দ্বাপরের অন্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'য়ে এই আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। তারপর বহুদিন গত হ'লে ধর্ম আবার ম্রিয়মান ও অধর্ম-প্রভাব বৃদ্ধি হ'লে কলির প্রথম সন্ধ্যায় সমগ্র পৃথিবীতে অধর্মের অতি প্রবল প্রকোপ সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণ-চৈতন্য নামা
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।"—চৈঃ চঃ নাটক ৬।৭৪

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম স্বয়ং আস্বাদন করে স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে প্রেমধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রকটলীলাকালে কৃষ্ণপ্রেম-বন্যায় দেশ প্লাবিত হয়েছিল। তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে এবং তাঁর ভক্তগণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার ক'রে দেশে দেশে এই সুদুর্লভ প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন: "সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ, প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন।"—চৈঃচঃ ১।৭, ফলে "জগত ডুবিল, জীবের হইল বীজনাশ"—চৈঃ চঃ ১।৭। করুণার অবতার মহাপ্রভু শুধু বিলাবার উদ্দেশ্যেই যেন তাঁর প্রেমের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এসবই তাঁর প্রকট-লীলা পর্য্যন্ত। তাঁর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই নির্বিচার প্রেমদান অন্তর্হিত হল। "হরিদাস কহে, তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি, তাঁহা যত স্থাবর-জঙ্গম জীব জাতি,—সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে, সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম উদ্বুদ্ধ করিবে। সেই জীবে হবে ইহা স্থাবর-জঙ্গম, তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম।"—চৈঃচঃ ৩।৩। সেই সব সূক্ষ্ম জীবে কর্ম পুনরায় উদ্বুদ্ধ ক'রেছে, তাই আবার পূর্ব্বের মত এই ব্রহ্মাণ্ড স্থাবর-জঙ্গমে পরিপূর্ণ হয়েছে। মহাপ্রভুর তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই নিদারুণ

কলি আবার তার স্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। এখন পূর্ণ প্রকোপে তার রাজ্য চলছে। অতি অল্প লোকই ধর্ম মানতে চায় এবং তার চেয়েও অল্প লোক প্রকৃত ধর্ম পালন করে। মহাপ্রভু-প্রচারিত সুদুর্লভ ও পবিত্র প্রেমধর্ম বিকৃতভাবে প্রচারিত হচ্ছে। এক্ষণে এই উপচীয়মান অধর্ম-প্রভাব ও ক্ষীয়মান ধর্মভাবের প্রবাহকে বাধা দিবার মত কোনো শক্তি সাধারণ মানুষের বুদ্ধি বা প্রচেষ্টার অতীত। একমাত্র সাক্ষাৎ ঈশ্বর-শক্তি বা 'তদ্ভাবভাবিতস্বান্তঃ' কোনো শক্তিশালী মহাপুরুষই এর প্রতিবিধান ক'রতে সমর্থ। বস্তুতঃ, এইরূপ সমস্যাসকুল সময়ে জীবজগৎ যখন দিশাহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় —তখন মহাপুরুষের আচরণই প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়ে থাকে; এইরূপ ঘনান্ধকারে তাঁর জীবনলীলাই আলোক-বর্তিকা-স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলছেন, "ধর্মস্থাপন হেতু সাধু-ব্যবহার"—২।১৭, মহাভারতে উল্লিখিত রয়েছে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" ৩।১৩।১১৭, গীতাতেও বলেছেন "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ, স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে"—৩।২১। সেই মহাপুরুষ নিজ আচরণের দ্বারা ধর্মের প্রকৃত-স্বরূপ প্রকাশ তো করেনই, অধিকন্তু সেই জ্ঞান, শক্তিসঞ্চার দ্বারা, কৃপাপ্রাপ্ত যোগ্যপাত্রে উপলব্ধিও করান। শ্রীভগবান সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মাকে স্বীয় পরমগুহ্যজ্ঞান উপদেশ ক'রে সেই জ্ঞান অনুভব করাবার জন্য তাঁর মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন,—নতুবা, ভগবৎ জ্ঞান উপদিষ্ট হ'লেও তা ধারণ করবার শক্তি কারও নেই। এই ধারণাশক্তির জন্য পৃথকভাবে তাঁর কৃপা প্রয়োজন। তাই শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বল্লেন :

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।"—ভাঃ ২।৯।৩১

এই তত্ত্ব-বিজ্ঞানের জন্য, এই অনুভবের নিমিত্ত যে শক্তি-সঞ্চারের প্রয়োজন, তার জন্যই সাধু মহাপুরুষের সাহচর্য, এবং সেবাদ্বারা তাঁকে প্রীত ক'রে তাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ আবশ্যক। অন্যথা, নিখিল শাস্ত্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি তাদের সমস্ত সম্পদ নিয়েও নির্জীব গ্রন্থমাত্রেই পর্য্যবসিত হবে; পণ্ডিতগণের তর্ক, আলোচনা ও বক্তৃতা নিরর্থক শব্দঝঙ্কারে পরিণত হবে, অজ্ঞানতম বিন্দুমাত্র বিদূরিত হবে না। কিন্তু রজনীর পর প্রভাতের মতই মহাপুরুষের করুণা-কিরণ-সম্পাত সুনিশ্চিতরূপে চিত্ততম দূরীভূত করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচারের পর চার শ' বৎসর অতীত হ'লে, কলি-প্রভাবে ধর্ম অতিশয় ক্ষীণ ও ম্রিয়মান হয়ে এল। প্রায় সকল মানুষই ভগবৎ-বহির্মুখ এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আত্মসুখসন্ধানী ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হয়ে উঠল আত্মা ও আত্মারামের সন্ধান বিস্মৃত হয়ে দেহসুখ ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে লাগল। শাস্ত্রেরও বিকৃত অর্থ হল, এবং শাস্ত্রার্থ নিজ সুখ সন্ধানের সমর্থনে প্রয়োজিত হতে লাগল। ধর্মের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা এবং অধর্মের

অপ্রতিহত প্রতাপ, তখন যে শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও অধর্মের স্রোত মন্দীভূত হয়েছিল—সেই যুগান্তকারী মহাপুরুষের পরম পবিত্র, সুদুর্লভ ও অগাধ লীলা-বারিধির কয়েকটি বারি-বিন্দুরূপ স্বল্পমাত্র কয়েকটি লীলা বর্ণনের এই দীন প্রয়াস। যাঁর অলৌকিক লীলা-সমুদ্র অপার ও অসীম বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, কয়েকটি বারি-বিন্দুবৎ এই সামান্য কয়েকটি মাত্র ক্ষুদ্র লীলাংশসঙ্কলন সেই মহামহিমময় মহাপুরুষকে কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পারে? অধিকন্তু, সীমাবদ্ধ প্রাকৃত ভাষায় সেই সব চিন্ময় লীলাপ্রকাশে অক্ষমতাহেতু তাঁর অপরূপ, অপ্রাকৃতলীলামহিমা প্রতিপদেই বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা। সাধারণ মানুষের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সাধারণভাবে উপলব্ধি ক'রে সাধারণ ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়। কিন্তু যার দেহ, মন, বুদ্ধি—সকল অপ্রাকৃত, তাঁর অঙ্গ সুষমা, তাঁর বাণী-মধুরিমা, তাঁর অলৌকিক লীলা-বিলাস কোন্ ভাষায় বর্ণনা করব? তাঁর অঙ্গে যে অপরূপ জ্যোতি স্বতঃস্ফূর্তরূপে নিত্য দেদীপ্যমান ছিল, তাঁর লীলা-তনু ভ'রে যে 'অনুসবাভিনব' চপল মাধুর্য্যাবলী সতত বিলসিত হ'ত, তাঁর করুণাঘন নয়ন-কিরণ সম্পাতে যে অসীম আশা ও আনন্দের বাণী ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠত, তাঁর স্মিত বিকশিত মধুর হাস্যে যে অমৃতধারা প্রবাহিত হ'ত, তাকে কোন্ ভাষায় প্রকাশ করব? তাঁর অপূর্ব কণ্ঠে যে একবার তাঁর সেই সুধা-বিনিন্দিত মধুর হতে সুমধুর হরি-ধ্বনি শ্রবণ করেছে, সেই পুলকে শিহরিত হয়ে ভেবেছে, মানুষের কণ্ঠস্বরে কোথা থেকে এত সুধা, এত সঙ্গীত, এত মধু এল? কিন্তু কোথায় পাব সে অমৃতময় হরিধ্বনি বর্ণনা করবার ভাষা? হরি-নামে যে এত সুধা আছে, তা তাঁর কণ্ঠেই প্রথম শোনা গেল। একটি মধুর 'হরি-বোল্' ধ্বনিতে যে গোলকের গোপন আনন্দ-সুধা-সম্পদকে উজাড় করে ঢেলে দিতে পারে, তা তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হরি-ধ্বনিতেই প্রথম অনুভব করলাম। একটি সুমধুর 'হরি-বোল্' ধ্বনিতে যে নিখিল সঙ্গীতের সুর-লহরী এসে তান তুলতে পারে, যে সঙ্গীতে জীবনের সকল অসঙ্গতি নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে সমস্ত মনপ্রাণ সেই বিশ্বাত্মার বিশ্ব-ছন্দের সহিত ঐকতান বা Resonance জাগাতে পারে, তা তাঁর মধুর থেকে সুমধুর হরি-ধ্বনিতেই প্রথম উপলব্ধি হ'ল। তাঁর কণ্ঠের একটিবার হরি ধ্বনি শুনে যে জীবনের সকল সন্তাপ তৎক্ষণাৎ জুড়িয়ে যেতে পারে, তা' এর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। কিন্তু সে অপ্রাকৃত ভাব-নিধিকে প্রকাশ করবার ভাষা কোথায় আছে এই প্রাকৃত জগতে? এই অতি দীন ও নগণ্য প্রয়াস তাঁর অলৌকিক, অপ্রাকৃত, নিত্য-আনন্দ-ঘন লীলাসমূহের কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পারবে? বরং আমার এ অক্ষম ভাষা ও অপটু লেখনী তার আপন দৈন্যে তাঁর "অবাঙ্মনসগোচর" মহিমাকে হয়তো প্রতিক্ষণে ক্ষুণ্ণই করবে।

মহাপুরুষের আচরণ, উপদেশ-বাণী, শিক্ষা ও লীলাবলী একটি অদৃশ্য জ্ঞানালোকের দ্বারা উদ্ভাসিত, যে আলোকে তাঁর সমস্ত বাক্য ও আচরণ অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে এবং মানসনয়ন সমুখে একটি অপ্রাকৃত জগৎ উন্মুক্ত ক'রে দেয়, যদ্দ্বারা সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয়, যে আলোকের প্রভাবে জীবের মায়ামোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান অন্ধকার দূর হ'য়ে সত্যজ্ঞানের উদয় হয়, মহাপুরুষের সেই জগন্মঙ্গল লীলাকাহিনীর কিঞ্চিন্মাত্র বিবৃত করবার চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য, এই লীলাকাহিনী বিশাল বারিধির কয়েকটি বারি-বিন্দুর ন্যায় তাঁর লীলাসমূহের অতি সামান্য এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাঁর দেহধারণের শেষ চার বৎসর, তিনি কৃপা ক'রে তাঁর যে সব লীলা এই দীন শ্রীচরণাশ্রিত দাসকে প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য প্রদান করেছেন, সেই সব প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট লীলা এবং নির্ভরযোগ্য ভক্তগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও বর্ণিত পূর্ব্বের কোনো কোনো লীলা বর্ণনা করতে প্রয়াসী হয়েছি। তাঁর সেই লীলা-আচরণের দ্বারা ধর্ম্ম ও সত্যের যে স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, সেই আলোকে কলির অন্ধকার কথঞ্চিৎ বিদূরিত হবে —এই আশা। সেই মহাপুরুষের জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সেই 'পরম-ধর্ম্মে'র অনুশীলনে পরিপূর্ণ, তাঁর দৈনন্দিন প্রতি কার্য্য-কলাপ সেই পরম প্রেম-ধর্ম্মের সাধন স্বরূপ। তাঁর লীলাকালের কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তেও এই নিরবচ্ছিন্ন সাধন-ধারা হতে বিচ্যুত হয়নি। ভাগবতোক্ত এই 'নির্মৎসর' মনীষীর সমগ্র জীবন-লীলাই সেই দুরূহ ভাগবত ধর্ম্মের অখণ্ড সাধনা মাত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে 'প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরম ধর্ম্ম' প্রচার করেছিলেন, যে ধর্ম্ম কালপ্রভাবে নষ্ট হলে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকট হয়েছিলেন, ঘোর কলি-প্রভাবে সে ধর্ম্ম পুনরায় ক্ষীণ, ম্লান ও বিকৃত হ'য়ে পড়লে, শ্রীমৎনরহরি প্রভু অবতীর্ণ হয়ে আজীবন সেই ধর্ম্ম-সাধনে রত থেকে নিজ আচরণ দ্বারা সেই কাল-বিকৃত ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার করলেন, এই ত্রিতাপ-পীড়িত অশান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে আবার সেই 'তাপত্রয়োন্মূলন' ও 'শিবদ' 'বস্তু' প্রকাশ করলেন। বস্তুতঃ, তাঁর লীলাগুলি সেই 'পরমধর্ম্মে'র ব্যাখ্যা স্বরূপ। এই লীলামৃতধারা সেই সত্য ধর্ম্মের শিবদস্বরূপ প্রকটিত ক'রে জগতের অকল্যাণ দূর করুক, পাপতাপপীড়িত নিখিল জীবের তাপত্রয় উন্মূলিত ক'রে অমৃতের পথে নিয়ে চলুক, এই প্রার্থনা।

বাল্য-লীলা

পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে, প্রভুপাদের সমগ্র জীবন-লীলা সত্য ধর্ম্মের নিরবচ্ছিন্ন সাধন ও তার স্বরূপ প্রকাশক মাত্র। প্রভু স্বয়ং সেই ভক্তি-ধর্ম্ম-সাধন ক'রে জীব জগতে তা' প্রচার করলেন। সুতরাং তাঁর আচরণ ধর্ম্ম-সাধন হতে ভিন্ন নয়। তাঁর সমস্ত

চিন্তা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় শ্রীভগবৎ-পদাম্বুজে মগ্ন রয়েছে। এই ধ্যান-প্রবাহের কোথাও ছেদ নাই। যদি কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তেও কোনো দিন এই চিন্তাধারা ক্ষণিকের জন্যও ছেদপ্রাপ্ত হয়, তবে তাকে আর নিরবচ্ছিন্না মতি বলা যাবে না, গণিতের লেখচিত্রের ন্যায় তা সাধন মার্গে খণ্ডিত বা discontinuous হয়ে যাবে। একেই বলে—অখণ্ড সাধন, গণিতের অবিচ্ছিন্ন লেখ-চিত্র continuous curve এর মত যা' কোনো দিন কোনো ক্ষণে খণ্ডিত হয়নি; অবিরাম কাল প্রবাহের ন্যায়, সাগরগামী অবিচ্ছিন্ন নদীজল ধারার মত যা কোনো সময়েই ক্ষণমাত্রও বিরাম বা বিচ্ছেদ জানে না তাকেই শ্রীমদ্ভাগবত "মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ"ব'লে কীর্ত্তন করেছেন।

এই মনোগতি থেকে যে সকল শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা উদ্ভূত হয়, সে সবই সেই ভক্তিধর্ম্মের পোষক। সুতরাং এরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোনো মহাপুরুষের কায়-মনোবাক্যের দ্বারা আচরণগুলিই ভক্তিধর্ম্মের অবিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড সাধনমাত্র। এই অখণ্ড ভক্তি-সাধন যাঁর ধর্ম্ম, তাঁর কোনো আচরণ, কোনো কার্য্যকলাপ, কোনো চিন্তাই 'কৃষ্ণ-সম্বন্ধ' ব্যতিরেকে হতে পারেনা। ফলতঃ, এই সব মহাপুরুষ

"বাগ্ভিঃ স্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত—
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥"—ভ. র. সি.—১।৩।১২

একেই কবিরাজ গোস্বামী ব'লেছেন 'আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার; অর্থাৎ মহাপুরুষের আচরণেই ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, অন্যত্র কোথাও তার সন্ধান মেলেনা। যাঁর সমগ্রজীবন অখণ্ডিতভাবে কেবল ধর্ম্মসূত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ, দৃষ্টান্তস্বরূপ —তাঁর আচরণের সহিত পরিচয় না হলে ধর্ম্মকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

এই গ্রন্থে তাঁর লীলাসমূহ যেভাবে গ্রথিত হ'য়েছে, তা' থেকেই 'তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্ব' একান্ত ভক্তগণ ধর্ম্মের স্বরূপ প্রকটিত দেখতে পাবেন। সেইজন্য প্রত্যেক লীলার মধ্যে তার অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম-সূত্রের সম্বন্ধ দেখিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি নি। তাঁর আচরণের সর্ব্বত্র যে-মাধুর্য্য, যে ঐশ্বর্য্য ও যে-দিব্যজ্ঞান প্রকটিত হয়েছে, তাকে ভাষায় সম্যক্-প্রকাশের অক্ষমতা সহজেই অনুমেয়। তথাপি তাঁর সমগ্র আচরণের মাধ্যমে ধর্ম্মের যে-রূপ বিকশিত হ'য়েছে, তাব লীলাক্রম অনুসারে তাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলাম।

ধর্ম্ম-সংস্থাতা শ্রীভগবান যুগে যুগে যে-ধর্ম্ম প্রচার করেন, তার মূল কথা একই। দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে তার পন্থা ও রূপ বিভিন্ন। সুতরাং শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব প্রচারিত ধর্ম্মকেই বর্ত্তমান প্রয়োজন অনুসারে নতুনরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজ আচরণ দ্বারা জনসমাজে তা' প্রচার করেন। ধর্ম্মসূত্রগুলি গ্রন্থে ও লোকমুখে বিদ্যমান থাকলেও কালক্রমে তার অর্থ বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়; তাই স্বয়ংব্রহ্মাও পূর্ব্বোপদিষ্ট ধর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়েছিলেন এবং শ্রীভগবান করুণা ক'রে আবার তাঁকে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে সেই ধর্ম্মের উপলব্ধি শক্তিও প্রদান ক'রেছিলেন। তারপর দ্বাপরের শেষে তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মও কালপ্রভাবে বিনষ্ট হ'লে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে সেই ধর্ম্ম নতুন ক'রে প্রচার করলেন। অতঃপর তার চার শত বৎসর পরে সে ধর্ম্মও ক্রমে মলিন হ'লে, তাকে আবার নতুন ক'রে নবরূপ দেওয়ার অভিপ্রায়ে প্রভু নরহরি এই নবদ্বীপে লীলা ক'রে সেই ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন করলেন।

ধর্ম্ম-পথের মূলসূত্র

প্রভু নরহরির সমগ্র লীলাকাহিনীর মূলসূত্র শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকে সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে :

"তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো, ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ,
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং, কালেন সর্ব্বত্র গভীর রংহসা।"—১।৫।১৮

এর অর্থ এই যে, প্রথমতঃ প্রাকৃত সুখলাভের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা থেকে বিরত হ'তে হবে। এই বিশাল বিশ্ব-সৃষ্টির অগণিত জীব একমাত্র আত্মসুখকামনাতেই ছুটাছুটি করছে। জীবের যত কিছু চেষ্টা, যত কিছু চিন্তা—সমস্তই আত্মসুখবাসনা প্রসূত। এই আত্মসুখলাভের জন্য, কেউ বা ইহকাল, কেউ বা পরকালের জন্য—জীবন ভরে বহুবিধ কর্ম্মে আসক্ত হ'য়ে রয়েছে। ফলে তাদের দুশ্ছেদ্য কর্ম্মবন্ধন দৃঢ়তর হচ্ছে, এবং পুনরায় এই ভব-চক্রে ঘুরে মরছে। প্রভু নরহরি তাঁর আচরণ দ্বারা এই শিক্ষা প্রদান করলেন, —হে জীব! বিরত হও। আত্মসুখার্থে বহুজীবন বহুপ্রয়াস করেছ; এইবার স্থির হও, অনীহ হও, অজগর-বৃত্তি অবলম্বন কর। দুঃখের জন্য কখনো কেউ কি চেষ্টা করে? তবু তা' আসে। সুখের জন্যও সেরূপ কোনো চেষ্টা ক'রোনা; তোমার যেটুকু প্রাপ্য তা' কড়া-ক্রান্তিতে তোমার নিকট উপস্থিত হবে। অতএব সুখলাভের জন্য চেষ্টা ক'রোনা। তোমার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ তোমার ইহজীবনে যে পরিমাণ অর্থ, যেটুকু প্রতিষ্ঠা, যশ বা অন্যান্য প্রাকৃত সুখভোগ নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে, তা' নিশ্চিতরূপে, অভ্রান্তভাবে, গণিতের সূত্রের সমাধানের মত তোমার নিকট অযাচিত হ'য়ে উপস্থিত

হবে। সুখের জন্য তোমাকে অনুসন্ধান করতে হবেনা, সুখ তোমাকে খুঁজে নেবে। চিন্তাশীল লেখক Emerson অনেকটা এরই প্রতিধ্বনি ক'রে ব'লেছেন, "……Thy lot, or portion of life is seeking after thee; therefore, be at rest seeking after it."

তবে কি কিছুই চেষ্টা করতে হবেনা? বিনা চেষ্টায়, বিনা কর্ম্মে এই দেহেন্দ্রিয় মন থাকবে কী ক'রে? গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন, "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"; অতএব কর্ম্ম না ক'রে কেমন ক'রে থাকা যায়? তার উত্তরে বলছেন, কর্ম্ম করবে, কিন্তু আত্মসুখোদ্দেশ্যে নয়। তবে কীসের জন্য?—সেই বস্তুলাভের জন্য কর্ম্ম করবে, যা' উপরে ব্রহ্মলোক থেকে নিম্নে স্থাবর জগৎ পর্য্যন্ত চৌদ্দ ভুবন ভ্রমণ ক'রেও কোথাও পাওয়া যায়না, সেই অতি দুর্লভ বস্তুর প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা কর কর্ম্মকর। সেই পরম দুর্লভ বস্তুটি কী? ব্রহ্মা থেকে স্থাবর জগৎ পর্য্যন্ত কেউই যার সন্ধান সহজে পায় না। সেই মহামূল্য পদার্থ টি কী? উত্তরে বলছেন, এ সেই পরম নিগূঢ় ভক্তি-ধন; যে-ধন লাভ হ'লে জীবের সকল বন্ধন ঘুচে গিয়ে কৃষ্ণপ্রেম-সেবাপ্রাপ্তি হয়। এ সেই পরম ধন—"এই গুপ্ত ভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা উপায় যার বিন্দু"—চৈ: চঃ -২।২; —এই ধন লাভ করবার জন্য তোমার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ কর; তোমার যা' কিছু কর্ম্ম, যা' কিছু চেষ্টা, যা'কিছু চিন্তা—সেই পরমধনলাভের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে নিযুক্ত কর।

প্রভু নরহরির জীবন-লীলায় সর্ব্বত্রই এই সূত্র পরিলক্ষিত হবে। তিনি কখনও আত্মসুখার্থে, এমন কি জীবনধারণার্থেও কোনো কর্ম্ম করেননি, বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেননি। পিতার প্রভূত অর্থ ও মাতামহীর অগাধ সম্পত্তি লাভ করেও তা' রক্ষা করবার বা ভোগ করবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস করেন নি—পরন্তু সেই বিপুল বিষয়সম্পত্তি ধূলিমুষ্টিজ্ঞানে দু'হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন।

জীবের প্রবৃত্তি হয় বহির্ম্মুখী, নয় অন্তর্ম্মুখী হবে। এই দুই পথ ভিন্ন অন্য পথে তা' যেতে পারে না। সুতরাং মানব-মনের সমগ্র প্রবৃত্তি ও তজ্জাত প্রচেষ্টা হয় পরমার্থ, নয় স্বসুখার্থের জন্য নিয়োজিত হবে। জীবের অনন্ত বাসনা ও সঙ্কল্পকে এই দুভাগে ভাগ করা যায়। আমরা যা' পরমার্থের জন্য করিনা, তা' অবশ্যই নিজ সুখের আশাতেই করি—এবং যা' স্বসুখপ্রণোদিত নয়, তা-ই পরমার্থের উদ্দেশ্যে। বিষয় সুখচেষ্টা ও ভক্তিধনার্জ্জনসাধন যুগপৎ অবস্থিতি করতে পারেনা। বিষয়বাসনা করব, তার জন্য উদ্যম ও পরিশ্রমের ক্রটি করবনা, আবার তার মাঝে মুখে দুবার হরি-বোল ব'লে ধর্ম্মার্জ্জন করব—এ হয় না। মানুষের জীবন যেন অসীম সময়ের চিত্রপটে এই দু'টি ভিন্ন ভিন্ন লেখ-চিত্র—একটি আর একটিকে কখনও স্পর্শ করবে না।

বিষয়-বাসনাকে ঘৃণায় পদদলিত করে সারাজীবন অধ্যাত্ম সাধনায় মগ্ন হয়ে থেকে প্রভু নরহরি নিজ আচরণ দ্বারা ভাগবতের এই সত্য ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আত্মসুখের অন্তহীন কামনায় ধাবমান, ত্রিতাপ-জ্বালায় জর্জ্জরিত জীবগণকে তাদের বাসনা-রশ্মি সংযত করতে ব'লে তাদের সাবধান-বাণী শুনিয়ে ব'লেছেন—এইবার বিরত হও ; অনেক চেয়েছ, অনেক ঠকেছ—এইবার ক্ষান্ত হও।

"কামাদীনাং কতিনা কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা, তেষাং জাতা 'ময়ি' ন করুণা, ন ত্রপা, নোপশান্তিঃ—"ভ. র. সি.-৩।২।২১—কিন্তু আর কেন ? একবার স্থির হও ; স্থির হ'য়ে অন্তরের অভিমুখে আঁখি ফিরাও। বহির্বাসনার উপরতি হলেই অন্তরে ভক্তি-বাসনা জাগ্রত হবে—'একে'র অভাবে 'দ্বিতীয়ে'র উদয় হবে। মানুষ যে মুহূর্ত্তে বহির্জগতের বিষয়বস্তু হতে দশেন্দ্রিয় সহ মন ও বুদ্ধিকে অন্তর্জগতে নিবিষ্ট করবে, সেই মুহূর্ত্তে অন্তর্লোকের অফুরন্ত সম্পদ তার মনোনয়নের গোচরীভূত হবে, জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হবে, পরমার্থের উদ্দেশ্যে দেহমনের সমস্ত উদ্যম নিয়োজিত হবে। তখন সে প্রাণ খুলে বলতে পারবে—

"উৎসৃজ্যৈতান্ অথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে"—ভ. র. সি. ৩।২।১৬

অখণ্ড-যোগ

পূর্ব্বের আলোচনায় প্রমাণিত হল যে জীবের মানসিক প্রবৃত্তি ও তার উদ্ভূত কার্য্যাবলী হয় বিষয়-বাসনা-জাত, নতুবা পরমার্থ প্রণোদিত—এই দু' প্রকার হ'তে পারে। বস্তুতঃ একের অভাব হলেই, অপরের আবির্ভাব হবে। তজ্জন্যই বিষয়-বাসনা চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হওয়াই প্রভুর শিক্ষা। কারণ, বিষয়-বাসনা-নিবৃত্তির সাথে সাথেই অন্তরে পরমার্থ-প্রেরণা অবশ্যম্ভাবী।

পরমার্থ-প্রেরণার উপায় নির্দ্দেশ করে প্রভু নরহরি ভক্তি-সাধনের স্বরূপ প্রকাশ করলেন। ভক্তিসাধন অতীব সুদুর্লভ—এর প্রকৃত রূপ জগৎ থেকে একরূপ অন্তর্হিত হয়েছে। এ এতই সুকঠিন, এই পথ এতই দুর্গম ও এরূপ বিঘ্নসঙ্কুল যে এপথে চলে শেষ পর্য্যন্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো জীবের পক্ষে একরূপ অসম্ভবই বলা যেতে পারে। ভগবানের যে 'দুরত্যয়া মায়া' জীবের পার হওয়া অতীব কঠিন, তাও বরং সম্ভব হয়ে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু ভক্তি-সম্পত্তিলাভ আরো অনেক দুর্লভ। কারণ,

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ,
সেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা"—ভ.র.সি.—১।২৩।
"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া,
কভু প্রেম ভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া"—চৈঃচঃ-১।৮

বস্তুতঃ, "কোটি মুক্তমধ্যেও দুর্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত"—চৈঃ চঃ ২।১৯—তাই কবিরাজ

গোস্বামী সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কৃষ্ণপ্রেমলাভ একপ্রকার অসম্ভব ব'লেই কীর্তন করেছেন: "অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম, এই প্রেমা নৃলোকে না হয়"— চৈঃ চঃ ২।১। প্রভু নরহরিও তাই এই সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমকে মনুষ্যের দুষ্প্রাপ্য বলেই উল্লেখ করেছেন;

"জীবে কভু সম্ভবেনা—ভাগ্যে না ফলিলে।"

কিন্তু ভক্তির এ সুদুর্লভতা, ভক্তি-সাধনের এই দুরূহতা এখন লোক-কল্পনার বাইরে। অনেকেই মনে ক'রে থাকে, যে যথাযথ বিষয়-বাসনা চরিতার্থ ক'রে দুবার হরি-বোল্ বল্লেই পাপের ক্ষয়, মায়ামুক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেমলাভ পর্য্যন্ত হয়ে যাবে। কেউ বা মনে করে, তিলকমালা আদি বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে একবার মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি করলেই স্বয়ং যমরাজ ভীত চকিত হয়ে পলায়ন করবে এবং স্বর্গ-বিমানে চড়িয়ে বিষ্ণুদূত তাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে। সুতরাং বিষয়-বাসনা চরিতার্থে কোনো বাধা নেই—তিলকমালা, কৌপীন বহির্ব্বাস, অন্ততঃ মুখে দু'বার হরিবোল্ তো আছেই, সব পাপক্ষয় হয়ে অন্তিমে বৈকুণ্ঠধামটা তাদের বাঁধাই আছে। এইরূপ মনোবৃত্তি-সমর্থনে অনেক শাস্ত্রবাক্যও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এইসকল কলিহত, মায়াচ্ছন্ন মানবের ধারণা করবার সামর্থ্যও নাই যে, তারা যে-যুক্তিতে শাস্ত্র-বাক্য প্রয়োগ করে, প্রকৃত শাস্ত্রার্থ ঠিক তার বিপরীত। শাস্ত্রের বিকৃত অর্থই তাদের মায়া-মলিন চিত্তে উদিত হয়, প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব নয়।

মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তি-প্রভাবেই তাদের চিত্তে প্রকৃতজ্ঞান আবৃত থাকে এবং মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিতে তাদের মন বহির্বিষয়ে নিবদ্ধ হয়। ফলে এই সব অজ্ঞানান্ধ মূঢ় জীব "নামবলে পাপে প্রবৃত্তি" রূপ ঘোর অপরাধে লিপ্ত হয়ে থাকে।

ভক্তি-সাধন যে কত দুরূহ, এ পথ যে কত দুর্গম, তা মানুষ একেবারে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। প্রভু তার পন্থা নির্দ্দেশ ক'রে আবার প্রচার করলেন, সুস্পষ্ট, শুদ্ধ ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বল্লেন—অখণ্ড-যোগই ভক্তির সাধন, অখণ্ড-যোগ ব্যতীত ভক্তিপথের শেষ সীমায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। ক্ষণিকের জন্যও ব্রহ্ম-'চ্যুত' হ'লে সেই পূর্ণ ব্রহ্ম, "অখণ্ড আনন্দসংপ্লব" 'অচ্যুতে'র সন্ধান মিলবেনা। "অখণ্ড মণ্ডলাকার-"কে জানতে হলে 'অখণ্ড' ব্রহ্মচর্য্য দরকার।

এক্ষণে এই অখণ্ডযোগ কী, তাই বিশদভাবে বর্ণনা করছি। যে যোগ তার সাধনপথে কখনও কোনোস্থানে খণ্ডিত হয়নি—তাই অখণ্ডযোগ। কোনো সাধনেচ্ছু মানবের যখন ভক্তি-সাধন করবার ইচ্ছা হল, হয়তো সেদিন থেকেই সে প্রবল উদ্যমে সাধনে তৎপর হল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিষয়-বাসনা তাকে প্রলুব্ধ করতে লাগল, এবং তার মনে বিষয়-বাসনা বা স্বসুখকামনা আবার জাগরূক হল। ফলতঃ, যে মুহূর্তে

তার মনে পুনরায় বিষয়-বাসনার উদ্রেক হ'ল, সেই মুহূর্ত্তেই তার ভক্তি-বাসনা অন্তর্হিত হ'ল, সুতরাং ভক্তিসাধনের প্রবাহ 'খণ্ডিত' হ'ল। কারণ, উভয় বাসনার যুগপৎ-অবস্থিতি অসম্ভব। প্রভু বল্লেন, যার ভক্তি-সাধন-ধারা একবার, তা' সে ক্ষণার্দ্ধ বা মুহূর্ত্তের জন্য হলেও, ব্যাহত হয়েছে, তার যোগ খণ্ডিত হয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে আর ইহ-জন্মে ভক্তিপথের সীমায় পৌঁছানো অসম্ভব, ভক্তিপথে সিদ্ধিলাভ করে প্রেমময়ের প্রেমলাভ এ জন্মে হবার নয়। একমাত্র অখণ্ডিত সাধনা দ্বারাই অখণ্ড প্রেমময়ের প্রেমলাভ সম্ভব হতে পারে। কোনো দিন, কোনো ক্ষণে, কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে বিষয়-বাসনার একটু মৃদুস্পর্শেও এই অখণ্ড-যোগ খণ্ডিত হয়ে যাবে; আত্মসুখ বা দেহসুখের বিন্দুমাত্র কামনা ও এই অমৃতের পথে গরলস্বরূপ হ'য়ে তাকে বিনষ্ট করবে। লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, এমন কি মুক্তি-বাসনার ছায়ামাত্রও এই যোগকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আর অগ্রসর হ'তে দেবেনা। ভক্তিপথের এ দুর্লভতা শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। এই অখণ্ডিত ভক্তি-যোগকেই শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব "মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ" ও "অব্যবহিতা" ব'লে কীর্ত্তন করেছেন। নারদ-পঞ্চরাত্র এই অখণ্ডযোগকেই "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তম্", ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু "অন্যাভিলাষিতাশূন্য", গীতায় "অব্যভিচারিণী ভক্তি" এবং নারদ-ভক্তি-সূত্রে "নিরোধ-রূপা" ও "অবাবৃত জ্ঞান" ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এই অখণ্ডযোগকেই "নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্যদাগে, শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু"—২।২, এবং "অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম, আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন" ব'লে প্রচার করেছেন। আর প্রভু নরহরি এই অব্যবহিত, অবিচ্ছিন্ন, অখণ্ড যোগসাধন সমগ্রজীবনে স্বয়ং আচরণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। এই অখণ্ড-যোগসাধন ব্যতীত ভক্তিপথে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব—কারণ ভক্তিসাধন-পথ সোপান-শ্রেণীর ন্যায় স্তরে স্তরে সজ্জিত। এক একটি সোপান অতিক্রম ক'রে পরবর্ত্তী সোপানে উপনীত হতে হবে। একটি সোপানে না পৌঁছে পরবর্ত্তী সোপানে উন্নীত হবার কোনো উপায়ই নেই—ভক্তিপথে ধাপে ধাপে উঠতে হবে। তাই মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে উপদেশ দিয়েছেন, "ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব-সিন্ধু-কূল"—চৈঃ চঃ ২।১৬। ভক্তি-সাধন খণ্ডিত হ'লে পরবর্ত্তী সোপানের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়—সে ব্যবধান ইহজন্মে পূরণ হবার নয়। সেইজন্য প্রভু নিজ আচরণ দ্বারা প্রমাণ করলেন—অখণ্ড-যোগসাধন ব্যতীত ভক্তিলাভ সম্ভব নয়।

অখণ্ড-যোগের সাধন

এক্ষণে এই অখণ্ডযোগের সাধন করতে হলে কী প্রকারে অগ্রসর হ'তে হবে, কী কী আচার ও নিষেধ মেনে চলতে হবে, তাই প্রভুপাদের লীলা-আচরণ দ্বারা ব্যাখ্যা

করতে চেষ্টা করব। এই অখণ্ড-যোগসাধনার প্রধান লক্ষ্য—বিষয়-বাসনা মনে স্থান না দেওয়া। যাতে কোনো প্রকার কু-বাসনা এসে মন কলঙ্কিত করতে না পারে, তজ্জন্য জীবনের প্রতি মুহূর্তে 'অতন্দ্রিত' হতে হবে, সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে যে মনের কোন্ নিভৃত কোণে বিষয়-বাসনা অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে, তার কিছুই স্থিরতা নেই। তাই সর্ব্বদা অবিচলিত ধৈর্য্য ও নিরলস উদ্যমের সহিত পরমার্থ-সাধনে নিযুক্ত থাকতে হবে। প্রভু আমার তাঁর বাল্যলীলা থেকেই এ বিষয়ে সদা সতর্ক ও সজাগ ছিলেন। এই সাধনায় প্রধানতঃ দু' প্রকার কর্ত্তব্য আছে; প্রথমতঃ, নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, দ্বিতীয়তঃ, অপরের প্রতি কর্ত্তব্য। এই দু'প্রকার কর্ত্তব্যই তাঁর জীবন-সাধনায় কীভাবে পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয়েছিল, তাই প্রদর্শিত হবে।

নিজের প্রতি কর্ত্তব্য। বিষয়-বাসনা থেকে দূরে থাকাই এই অখণ্ডযোগ-সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিষয়ের সঙ্গ থেকেই বিষয়-বাসনা উৎপন্ন হয়, "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ" —গীতা ২।৬২, সুতরাং বিষয়বস্তু থেকে দূরে থাকতে হবে। কোনো প্রকারেই যেন তৎসঙ্গ উপস্থিত না হয়,—"সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ, হা হন্ত! হা হন্ত! বিষ ভক্ষণং প্য সাধু" —চৈঃ চঃ নাটক—৮।২৭ এই উদ্দেশ্যে বাল্যকাল থেকেই প্রভু লোক-সমাজ থেকে দূরে থাকতেন, কারো সাথে মিশতে ভালবাসতেন না, এমন কি মানুষের মুখ দেখলে আপনার মুখ আচ্ছাদন ক'রে ছুটে পালাতেন; বলতেন, মানুষকে তাঁর বাঘ-ভালুক হিংস্র শ্বাপদতুল্য মনে হয়। লোকসমাজের প্রতি এই বিরাগকেই গীতায় শ্রীভগবান্ "রহসি স্থিত একাকী"—৬।১০, "মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ"—১১।৫৫, "বিবিক্তদেশ সেবিত্বম্ অরতির্জনসংসদি"—১৩।১১, শ্রীমদ্ভাগবতে "সর্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ"—৩।২৫।২৪, "বিবিক্তচীরবসনম্"—১১।৩।২৫, "নিঃসঙ্গো মাংভজেৎ"—১১।২৫।৩৪, "গুহাশয়ঃ অলক্ষ্যমানঃ"—১১।৯।১৪ এবং নারদভক্তিসূত্রে "লোকবেদব্যাপারসংন্যাস"-আখ্যায় অভিহিত ক'রে একেই জ্ঞানোদয়ের লক্ষণরূপে বর্ণনা ক'রেছেন। লোকোত্তর মহাপুরুষগণের আচরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী এই লক্ষণই ব্যক্ত করেছেন: "পরমবিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন, গ্রাম্য বার্ত্তাভয়ে দ্বিতীয়সঙ্গীহীন"-২।৪। ভক্তি-সাধন-ব্যাখ্যায় নারদভক্তিসূত্র ব'লেছেন—

"বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ"—৩৫।

লোকসমাজের প্রতি অরতিবশতঃই শ্রীশ্রীপ্রভু বাল্যকাল থেকেই গোপন গিরিকন্দরে, নির্জ্জন গুহামধ্যে নিজ বাসস্থান বেছে নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "গুহাশয়ঃ অলক্ষ্যমানঃ"—এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ নিজ আচরণে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করেছিলেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতের কল-কোলাহল থেকে বহুদূরে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নির্জ্জন প্রদেশে তিনি আপন অন্তর্লোকের অন্তঃহীন গভীরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন

থাকতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান একেই অনন্য ভক্তের লক্ষণরূপে বর্ণনা করেছেন—"মৎকৃতে ত্যক্তকর্মাণস্ত্যক্তস্বজন বান্ধবাঃ" —৩।২৫।২২। নারদভক্তিসূত্র বলেছেন, "যো বিবিক্তস্থানং সেবতে, যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি"— ৪৭।

বস্তুতঃপক্ষে, বহির্জগতে মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের আত্মসুখ কামনাময় কল-কোলাহলের মধ্যে ধর্ম্মের সন্ধান কোথাও মেলে না, এমন কি এই পরিবেশে শাস্ত্রপাঠে, ধর্ম্ম-আলোচনায় বা জনসভায় ধর্ম্মীয় বক্তৃতা প্রদান বা শ্রবণেও ধর্ম্ম সাধনা হয় না। এ তত্ত্ব ভালভাবে অবগত হয়েই মায়ামলিন মনুষ্যসমাজ থেকে বহুদূরে নিভৃত গুহার গভীর গহনে সাধনাস্থল বেছে নিয়ে প্রভু প্রমাণ করলেন, "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্" এবং প্রকৃত সাধক "একচারী, অনিকেতঃ, গুহাশয়ঃ, অলক্ষ্যমাণঃ আচারৈঃ" — ভাঃ ১১।৯।১৪।

কায়, মন এবং বাক্য—এই তিন পথেই বিষয়বস্তু আমাদের আকর্ষণ করে। এই জন্য দেহ, মন ও বাক্যকে সর্ব্বপ্রকার বিষয়বস্তুর সঙ্গ থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন। সুতরাং সাধককে গীতোক্ত "যতবাক্কায়মানসঃ"-১৮।৫২ বা ভাগবতোক্ত "অল্পভাষণঃ"-১১।৯।১৪ ও "মৌনম্"- ১১।৩ ২৪ হ'তে হবে। বাক্যসংযম না হলে সাধনা প্রতিপদে বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা। প্রভু তাই শিশুকাল থেকেই "গ্রাম্যবার্ত্তাভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গীহীন" হ'য়ে "গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, আপনার আহার, বিহার, পরিচ্ছদে তাঁর দৈন্য সুপরিস্ফুট। তিনি প্রায় সব সময়েই একখানি মোটা চট্ গায়ে জড়িয়ে থাকতেন; কিবা শীত, কিবা গ্রীষ্ম এই ধূলিমলিন মোটা চট্খানিই তাঁর একমাত্র পরিধেয় ছিল। বাল্যকাল থেকে মাথায় চিরুনি কখনও স্পর্শ করেননি; কাপড় পরতে জানতেন না, একটি ময়লা ছেঁড়া কাপড় কোনোরকমে কোমরে জড়িয়ে থাকতেন, তার অর্দ্ধেক গায়ে থাকত, অর্দ্ধেক মাটিতে লুটাত—যেন ভাগবতের সেই "বিবিক্ত-চীরবসন" এর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তাঁর আহার কখনো বন্য ফল-মূল, কখনো শুষ্ক, দুর্গন্ধ, বাসি-পচা অন্ন, কখনো বিছুটির ফল-পাতা, নানাবিধ সাধারণ মনুষ্যের অখাদ্য ঘাস ও শাকশব্জী—তাও সামান্য জীবন ধারণোপযোগী মাত্র। যখন যা জুটত তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন; সেই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "যদৃচ্ছয়োপপন্নমন্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতোপন্নম" —১১।১৮।৩৫ অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অন্ন, ভাল হউক, মন্দ হউক, তাই ভোজন করবেন। এইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য "ভাল না খাইবে কভু, ভাল না পরিবে" —তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে আচরণ করে নিজে ধর্ম্ম সাধন করলেন এবং অপরকে শিক্ষা দিলেন। মহাপ্রভুর মত তিনিও "স্বয়ং আচরি' ধর্ম্ম জীবকে শিখান"। শ্রীমদ্ভাগবতে

বলেছেন, "সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ"—১১।২৬।৩, কবিরাজ গোস্বামী মুক্তকণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি করে বল্লেন, "জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়, শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়"-৩।৬ বলাবাহুল্য, বিষয়বস্তু থেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে দূরে রাখতে হলে জিহ্বার লালসা ও বেশভূষার বৈরাগ্য অত্যন্ত প্রয়োজন। অখণ্ড সাধনায় আত্মকর্ত্তব্যের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে একটি মুখ্য বিধি।

তৃতীয়তঃ, নির্ব্বিকারচিত্ততা এই সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ—এই বিচারবুদ্ধি ভোগেচ্ছা থেকেই জন্মায়। প্রাকৃত-বিষয়-ভোগের বাসনা অন্তর্হিত হ'লে প্রাকৃত বস্তুতে ভাল-মন্দ-জ্ঞান ও লোপ পাবে। বস্তুতঃ, অখণ্ড-যোগ সাধনায় সমগ্র ভোগবাসনার পরিসমাপ্তি করতে হবে; সুতরাং তখন প্রাকৃত বস্তুতে ভালমন্দবুদ্ধি স্বভাবতঃই তিরোহিত হবে। প্রভু শিশুকাল থেকেই নির্ব্বিকার চিত্ততার বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। তিনি সামাজিক আচার বিচার, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা. প্রভৃতি কিছুই মানতেন না। উপরন্তু উচ্ছিষ্টগর্ত্তে এবং মলমূত্রপূর্ণ অপবিত্রস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন ও মায়ের তিরস্কার হাসিমুখে গ্রহণ করতেন। বাল্যকালে শ্মশান থেকে রুধিরাক্ত অস্থি-কঙ্কালে ঝুড়ি পূর্ণ ক'রে মায়ের কাছে 'সম্পত্তি' (?) অর্জ্জন ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। এইরূপভাবে তাঁর শৈশব আচরণেই তিনি দেখিয়েছেন,

"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ,
বাচোদিতং তদনৃতং মনসাধ্যাতমেব চ"—ভাঃ-১১।২৮।৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু একেই "সমদৃষ্টিধর্ম্ম" ব'লে কীর্ত্তন ক'রেছেন:

"আমি তো সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টিধর্ম,
চন্দনে-পঙ্কে আমার জ্ঞান হয় সম।"—চৈঃ চঃ-৩।৪

বিষয়-বস্তুর মধ্যে কামিনী ও কাঞ্চনই ইন্দ্রিয় ও মনকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বেগে আকর্ষণ করে। কিন্তু ভোগবাসনা অন্তর্হিত হলে এই কামিনী কাঞ্চনে আর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ থাকে না। কামিনী তখন জননীরূপিনী ও কাঞ্চন লোষ্ট্রখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয়। প্রভু বাল্যকাল থেকেই পিতার প্রচুর অর্থ নিয়ে লোষ্ট্রবৎ ক্রীড়া করেছিলেন। গীতায় শ্রীভগবান এই লক্ষণকেই "সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ"—৬।৮ ব'লেছেন। এই হচ্ছে যুক্ত-যোগীর লক্ষণ, মহাপ্রভু কথিত "সমদৃষ্টি ধর্ম্ম", এবং এই হল প্রভুপাদ প্রদর্শিত অখণ্ড সাধনযোগের একটি মুখ্য লক্ষণ।

চতুর্থতঃ, অখণ্ড-সাধন-যোগে হৃদয় মধ্যে সদাই ধর্ম-জিজ্ঞাসা জাগরিত থাকবে। জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানবার ইচ্ছা, সুতরাং ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে মনে সর্ব্বদাই একটা অনুসন্ধিৎসা

প্রবৃত্তি প্রবল থাকবে। অতি শৈশব থেকে, পঠদ্দশাতেই প্রভুর মনে সদাই এই ধর্মানুসন্ধিৎসা জাগরূক ছিল। ক্রমে তা প্রবল হয়ে অদম্য পিপাসায় পরিণত হলে বাল্যকাল থেকেই প্রভু 'সৎ-ধর্ম' অবগত হবার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে সাধু-সন্ন্যাসী মহাপুরুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন। বহু মহাপুরুষ প্রভুর দৈন্য, বিনয় ও প্রবল ধর্মানুসন্ধিৎসা দেখে চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁদের যথা সর্ব্বস্ব ধর্ম-ধন দান করে প্রভুকে পরিতৃপ্ত করেছেন। কিন্তু এতেও প্রভুর ধর্মসাধন-লিপ্সা মেটে নি। প্রকৃত গুণী ও সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ ও কৃপা লাভের বাসনায় তিনি ভারতের বহু স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এই সীমাহীন ধর্মজিজ্ঞাসা প্রবৃত্তি ও প্রকৃত সাধুসঙ্গ-লিপ্সাই তাঁর অখণ্ড-সাধন পথে দ্রুত সিদ্ধিলাভে সহায়ক হয়েছিল। অখণ্ড-সাধন-যোগে এই অপূরণীয় ধর্মজিজ্ঞাসাই যে একটি প্রধান সহায়ক, তা মহাপ্রভু বর্ণিত ধর্মসাধন প্রসঙ্গেই স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে। সনাতন গোস্বামীকে সাধনভক্তির লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে মহাপ্রভু একেই বলেছেন "সদ্ধর্ম-শিক্ষা-পৃচ্ছা"। কবিরাজ গোস্বামীও ব'লেছেন, "গুরুপাশে সেই ধর্ম প্রষ্টব্য শ্রোতব্য"২।২৫,এবং "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে"—২।২৪, গীতায় শ্রীভগবান বল্লেন, "তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া" ৪।৩৪ এবং শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন, "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ"—২।৯।৩৫

অপরের প্রতি কর্ত্তব্য। অখণ্ডযোগসাধনায় নিজেকে যেরূপ সুকঠোর নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে, বহির্জগতে উদাসীন হলেও তার সংস্পর্শ অনিবার্য্য ব'লে সেস্থলেও যথাবিহিত কর্ত্তব্য পালন করতে হবে। প্রথমতঃ, জীবমাত্রে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ না দেওয়া—এই ধর্ম-সাধনের অবশ্য পালনীয় বিধি। যিনি ভগবদুদ্দেশ্যে সমগ্র মনোবৃত্তি ও দেহেন্দ্রিয় নিযুক্ত করেছেন, তিনি যদি অপর কোনো প্রাণীর উদ্বেগের কারণ হন, তবে তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টা ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হল না; বিশেষতঃ অপরকে উদ্বেগ দেওয়ার জন্য সমপরিমাণ প্রত্যাঘাত পেতে তিনি বাধ্য। বস্তুতঃ, অপরকে উদ্বেগ বা ব্যথা দেওয়ার মত মনোবৃত্তি ভগবৎ সাধকের কখনও হতে পারে না। সুতরাং অখণ্ডযোগসাধনায় এটি যে একটি প্রতিবন্ধক তা সহজেই বোধগম্য। বহির্জগতের জীবকুলের প্রতি প্রভু কী-রূপ ব্যবহারের আদর্শ রেখে গেছেন, তা তাঁকে দর্শনকারী প্রত্যেকেই ভালভাবে অবগত আছেন। প্রত্যেক মানুষের প্রতি তাঁর বিনয়পূর্ণ মিষ্টভাষণ, অপরিসীম দৈন্য, মধুর ব্যবহার ও তাকে পরিতোষ সহকারে সেবাদান —এই তাঁর ব্রত ছিল। শুধু মানুষ কেন, ইতর পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি—সকলকেই তিনি ভালবেসে, তাদের খেতে দিয়ে তাদের সেবা যত্ন করেছেন।

প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কখনও এই দয়া-প্রদর্শন করেন নি তিনি। পরন্তু এই সেবাব্রত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিভৃতে, গুহার গোপন গভীরে ও নির্জ্জনস্থানে হনুমান, কুকুর,

২

বিড়াল, গরু, ছাগল, পক্ষী, পিপীলিকা, ইঁদুর, আরশুলা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ইতর প্রাণীদের উপরই প্রতিপালিত হত—যারা কোনোদিন, কোনোসময়ে তাঁর নাম প্রচার ক'রে তাঁর প্রতিষ্ঠালাভে সহায়তা করবে না, জনসভায় বা সংবাদপত্রে নাম জাহির করবে না, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট তাঁর প্রশংসাপত্র আদায় করেও আনবে না। ত্রিসংসারে আপনার বলতে যাদের কেউ নেই, এরূপ কত অনাথ ও অভাগার জন্যই তাঁর করুণাভাণ্ডার উন্মুক্ত হত, কত অজ্ঞাত, অবহেলিত, দরিদ্র নরনারী, কত বৃদ্ধ, আতুর, অন্ধ, খঞ্জ, অক্ষম তাঁর অন্তহীন করুণার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়েছে, বিশ্ববাসী তার সন্ধান জানে না, সংবাদপত্রে তা প্রচার হয় নি, বই লিখেও কেউ তা প্রকাশ করে নি। নিভৃতে, নির্জ্জনে, নীরবে এই সব নিরাশ্রয়, নিরুপায় নিঃসম্বল নরনারী তাঁর আশ্রয়ে মৃতপ্রায় প্রাণে আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। 'যার কেউ নেই, তার আমি আছি'—এ সত্য তিনিই কার্য্যদ্বারা প্রমাণ করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধনভক্তির বর্ণন প্রসঙ্গে একেই বলেছেন, "প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—চৈঃ চঃ-২।২২,এবং "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"—চৈঃ চঃ ৩।২০ শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ"—১২।১৫, "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাম্"—৫।২৯, "শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"—৫।১৮ এবং ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলেছেন "হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ"—১।২।১২৮ শ্রীমদ্ভাগবতও পুনঃ পুনঃ এই পর-পীড়ন-প্রবৃত্তির নিন্দা করেছেন এবং প্রতি জীবে সম্মান দানের কথা বলেছেন "ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ" —১১।৩।২৪, "নাবমন্যেত কঞ্চন"—১১।১৮।৩১ "ভূতধ্রুক্ কো লভেত শম্"—১০।৪৪।৪৭, "প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ ভূমাবাশ্বচণ্ডাল-গোখরম্। প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব ভগবানিতি"—১১।২৯।১৬ অর্থাৎ ভগবান জীবরূপ অংশে সকল দেহেই প্রবিষ্ট আছেন, মনে করে চণ্ডাল, কুকুর, গো এবং গর্দ্দভকেও ভূমিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করবে।

মধ্য-লীলা

দেহে আত্মার আবির্ভাব থেকে অখণ্ডযোগের আরম্ভ এবং দেহপাতে এর পরিসমাপ্তি। সুতরাং বাল্যে সাধন না করলে তাকে অখণ্ডযোগ বলা যাবেনা এবং সে-সাধন ভক্তিপথে সিদ্ধিলাভ করবেনা। বাল্যকালে সাধনমার্গে বিঘ্ন খুবই কম; কিন্তু এ সময়ে পরমার্থবুদ্ধি উদিত হয়না। তবে প্রাক্তন সৌভাগ্যবশতঃ কচিৎ কখনো কারো হৃদয়ে বাল্যেই ভক্তিবাসনার অঙ্কুর জন্মে। জ্ঞানোদয়ের ফলে এই বাসনা জাগ্রত হলে শিশু-বয়সে ভক্তির আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল হয়। মহামতি ধ্রুব প্রহ্লাদের হৃদয়ে অতি শিশুকাল থেকেই যে প্রবল ভক্তিবাসনা উদিত হয়েছিল, তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজাত

সাধনবশতঃই। প্রভু নিজ আচরণ দ্বারা প্রমাণ করেছেন, প্রাক্তন সৌভাগ্যজাত এই 'ধ্রুব-যোগ' বাল্যে যথাযথ আচরিত না হলে, অখণ্ডযোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়না এবং ভক্তির চরম ফল পাওয়া যায় না। প্রভু নরহরি তাঁর সঙ্গীতে সাধনের এই নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন :

সময়ে সাধন না হইলে—
কী হবে আর বাঁধ বাঁধিলে ?
জল শুকালে, মীন পলালে,
কী হবে আর বাঁধ বাঁধিলে ?

* * *

কল্পবৃক্ষ শুকাইলে, ফল কি ফলে সে-বৃক্ষেতে,
সময়েতে না সাধিলে, কী হবে কাল হ'লে যেতে ?

এই অখণ্ডযোগসাধন বাল্যকাল থেকে আরম্ভ হয়ে যথাযথভাবে অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে। যৌবনই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। জীবের সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তিগুলির চরম বিকাশ ঐ সময়েই হয়ে থাকে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন এই যৌবনেই পূর্ণরূপে পুষ্টিলাভ করে। সুতরাং এ সময়ে সু ও কু-প্রবৃত্তি উভয়েরই পূর্ণ প্রকোপ। অসৎবৃত্তিগুলি দমন করে সৎবৃত্তিসমূহ দ্বারা চালিত হ'লে এই সময়েই অমৃত ফল ফলে, আবার আসুরিক প্রবৃত্তির বশীভূত হ'লে জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। সুতরাং ভগবদারাধনার এই হল শ্রেষ্ঠ সময়। সাধনপথে বিঘ্নও এই সময়ে অত্যন্ত প্রবল। যৌবনে ইন্দ্রিয়সকল পূর্ণরূপে পরিপুষ্ট হওয়ায় ভোগলালসা অতীব তীব্র হয়ে ওঠে। দর্শন, শ্রবণও স্পর্শযোগ্য 'বিষয়'গুলি পরম মনোহররূপে প্রতীয়মান হয়ে কামনাময় মনদ্বারা প্রভাবিত চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিশয় তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। এদের আকর্ষণ দুর্নিবার, এদের প্রতি আসক্তি দুস্ত্যজ ও এদের পাবার আকাঙ্ক্ষা তখন দুর্দ্দমনীয় হয়ে ওঠে। জীবনের এই নব বসন্তে যিনি আপনার "বলবান্ ইন্দ্রিয় গ্রাম"কে ভোগ্য "বিষয়" বস্তুর আকর্ষণ থেকে অপসৃত ক'রে "ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য মন্মনঃ বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ"—ভাঃ ১১।১৪।৪২, অর্থাৎ শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করতে পারেন, সেই মহাভাগ্যবানেরই অখণ্ডযোগসাধন সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হয়ে তাঁকে ভক্তিফল প্রদান করে। এই ত্যাগ যৌবন-বয়সেই কর্ত্তব্য, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে নয়, রাজা ভরত তার জলন্ত নিদর্শন রেখেছেন ;

"যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ"—ভাঃ ৫।১৪।৪৩

সাধুসঙ্গ। ভক্তিসাধনায় সাধুসঙ্গ যেমন প্রথম প্রবর্ত্তক, তেমনি সাধন-পথেও এই সাধুসঙ্গ। সাধুসেবা ও তাঁর কৃপাই হল প্রধান সহায়ক। চৈতন্য-চরিতামৃত বলেছেন, কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ"—২।২২।৪৮, "সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়"—২।২২।২৯,"মহৎ-কৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি নয়" —২।২২।৩২। নারদভক্তিসূত্র ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ মহতের কৃপাকেই নির্দ্দেশ করেছেন: "মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব"। শ্রীমদ্ভাগবত উদাত্তকণ্ঠে বলছেন, "সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ"—১০।৫১।৫৩, "এতত্তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা; নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈ-র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্"-৫।১২।১২, "মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।"—৭।৫।৩২। অখণ্ডযোগসাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়স্বরূপ এই সাধুসঙ্গ-লিপ্সা প্রভুর বাল্যকাল থেকেই প্রকট। নিজ-চেষ্টা দ্বারা, যেমন জপতপ, ধ্যানধারণা, অথবা নামশ্রবণ কীর্ত্তন, শাস্ত্রপাঠ বা পূজা-অর্চ্চনায়, এপথে যে তিলমাত্রও অগ্রসর হওয়া যায়না, এ কঠোর সত্য তিনি বাল্যকাল থেকেই অবগত ছিলেন। মহতের কৃপাই যে এই দুর্গম পথে চলবার একমাত্র পাথেয়, এ তত্ত্ব ভালভাবে জেনেই প্রভু বাল্যকাল থেকে সাধুসঙ্গ কামনায় গভীর বনেজঙ্গলে, শ্মশানে-মশানে দুর্গম, গিরি-পর্ব্বতে প্রকৃত সাধুসন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন। যেন প্রাক্তনসংস্কারবশতই এই সত্য বাল্যকাল থেকে স্বভাবসিদ্ধরূপে তিনি লাভ করেছিলেন, তাই জন্মাবধি সাধুসঙ্গলিপ্সা এত তীব্র ছিল তাঁর এবং এর জন্য তাঁকে আর কারুর উপদেশ নিতে হয়নি। তিনি এ সত্য অবগত ছিলেন যে প্রাকৃত বিষয়সমূহ, দুর্লভ হলেও, নিজচেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা, অপরের সাহায্য ব্যতীতও, লাভ করা যেতে পারে,—কিন্তু এই অপ্রাকৃত ভক্তিধন বেদানুগত কর্মকাণ্ড, সমস্ত দেবের উপাসনা, এমন কি কঠোর তপস্যা দ্বারাও লাভ হয় না।

উপযুক্ত সাধুর সন্ধান পেলে তাঁর শ্রীচরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে তাঁর শরণ নিতে হবে। কিন্তু এরূপ সাধু প্রকৃতই দুর্ল্ভ। নারদভক্তিসূত্র ব'লেছেন "মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ, লভ্যতে তৎ কৃপয়ৈব"-৩৯।৪০, অর্থাৎ মহৎসঙ্গ লাভ যেমন দুর্ল্ভ, তেমনি তাঁর পথ দুর্গম—কিন্তু একমাত্র তাঁর কৃপাদ্বারা যদি সেই সঙ্গলাভ হয়, তবে তার ফল অমোঘ।

প্রকৃত সাধুমহাপুরুষ চিনবার জন্য প্রভুপাদ কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি "কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা" হবেন, কৃষ্ণ তত্ত্ব বেত্তা হতে হলে, তাঁকে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে হবে, এবং এই প্রেমধন একমাত্র অখণ্ডভক্তিযোগসাধনেই পাওয়া যায়—অতএব সেই মহাপুরুষ অখণ্ডযোগী। অখণ্ডযোগী যিনি তাঁর কতকগুলি নিশ্চিত ও বিশিষ্ট লক্ষণ থাকবেই। সেগুলি এইরূপ:—প্রথমতঃ, প্রাকৃত সুখদুঃখে

অনাসক্তি, ফলে, তাঁর সমস্ত চেষ্টাই প্রাকৃত উদ্দেশ্যবিহীন বা অসংবদ্ধ, গীতোক্ত সেই "সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" ও "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ"- ২।৫৬, "শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ" -১২।১৮ ভাব। প্রাকৃত সুখ দুঃখে যিনি নির্লিপ্ত বা নিস্পৃহ, তাঁর আচার আচরণ সবই কেমন অস্বাভাবিক, সাধারণের কাছে উন্মাদবৎ, বালকতুল্য, অসংলগ্ন ও অর্থহীন মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, 'ধ্রুব-যোগ' অব্যাহত থাকায় সেই "ঊর্দ্ধমন্থী", "ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ" মহাপুরুষ হবেন—চির-বালক, নিত্য-কিশোর; সাধারণ মানুষের মত বয়স বা কাল তাঁর উপর বয়ো-বিকৃতির কোনো ছাপ রাখতে পারে না, "নো মেঽনিমিষো লেঢ় হেতিঃ"-ভাঃ ৩।২৫।৩৮, অর্থাৎ আমার কালচক্র আমার একান্ত ভক্তগণকে গ্রাস করে না। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাঁর কণ্ঠস্বর পাঁচ বৎসরের শিশুর ন্যায় অবিকৃত থাকবেই —এটি তাঁর দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অবশ্যম্ভাবী বাহ্যিক লক্ষণ। আর অন্তরে তিনি হবেন শিশুবৎ নির্ব্বিকার, অর্থাৎ শিশুর মতই কামিনী-কাঞ্চনে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করবেন না।

পরন্তু, এইসব বিশেষ লক্ষণ যাঁতে সুপ্রকট নেই, তিনি ভক্তি-মার্গের সাধনে সিদ্ধিলাভ করতে অসমর্থ হয়েছেন বুঝতে হবে। কিন্তু এমন মহাপুরুষ কোটি সাধকের মধ্যেও দুর্লভ। চণ্ডীদাসের মতে "কোটিকে গুটিক মেলে।" প্রভু নরহরিও তাই প্রকৃত সাধু সন্ধানে বহু দুর্গমস্থান, গিরিগুহা, বনজঙ্গল, শ্মশান ঘুরেও মনের মত সাধু খুঁজে পান না,—অখণ্ডযোগসাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষের দর্শন পান না। অখণ্ডযোগসিদ্ধ সাধু মহাপুরুষের উপরোক্ত লক্ষণই তাঁর নিশ্চিত পরীক্ষাস্বরূপ। ভক্তিশাস্ত্রসমূহে এ লক্ষণ অতি সংগোপনে নিবদ্ধ আছে,—জীবজগতে তা' বিস্মৃত হয়েছিল। আধুনিক মানুষের ধারণা এই যে—তিলক-মালা-কৌপীন-বহির্ব্বাস আদি বৈষ্ণবের বহিঃসজ্জা, মৃদঙ্গ-করতালসহ মুখে হরিনাম, অথবা, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ সুপণ্ডিত, শাস্ত্রব্যাখ্যায়, কথকতায় বা বক্তৃতাদানে পটু, অথবা জটাজুটধারী বিভূতি-ভূষিত দেহ সন্ন্যাসীবেশধারী—এঁরাই হলেন বৈষ্ণব, কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সাধু মহাপুরুষ। বাইরের এই সব লক্ষণ থাকলেই তিনি সাধু বা বৈষ্ণব হবেন। কিন্তু এই ধারণা যে, সর্ব্বপ্রকারেই ভ্রান্ত তাই প্রচার করলেন প্রভু নরহরি। অখণ্ড-যোগসাধনা ব্যতীত ভক্তি ও প্রেমলাভ হতে পারে না। সুতরাং 'অন্যাভিলাষ' কর্তৃক ভেদপ্রাপ্ত না হওয়াতে সেই মহাপুরুষের মন, বুদ্ধি ও দেহ অখণ্ডিত, অর্থাৎ শিশুবৎ থাকতে বাধ্য। শিশুর কোমল তনু-রুচির ন্যায় রুচির ও লাবণ্যময় তাঁর সর্ব্বঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; শিশুর কণ্ঠস্বরের মতই তাঁর কণ্ঠস্বর হবে সুচিকন, সুমধুর, সুরময় এবং শিশুর মতই তাঁর সব কাজ, সব প্রচেষ্টা উদ্দেশ্যবিহীন, কারণ-শূন্য, নিছক খুশীতে ভরা শুধু ক্রীড়াময়। এ সব লক্ষণের যে কোনো একটির ব্যতিক্রম হলে বুঝতে হবে, শৈশবান্তে 'বিষয়'-ভোগ-বাসনার

উদ্রেক ও পূরণবশতঃ তাঁর অখণ্ডযোগসাধনা 'অন্যাভিলাষ' দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে,—'ধ্রুবযোগ' ব্যাহত হয়েছে, শ্রীভগবৎপদে গঙ্গাজলধারার ন্যায় মনের অবিচ্ছিন্না গতি ছিন্ন হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, এই বালকবৎ স্বভাবের নিশ্চিত ও সুকঠিন পরীক্ষা কামিনী ও কাঞ্চনের কষ্টি পাথরে। অখণ্ডিত যোগীর যোগসাধনায় বিন্দুমাত্র বিষয়-বাসনা থাকতে পারে না, কারণ তা' হ'লে আর তা' "অন্যাভিলাষিতাশূন্য" বা "অব্যবহিত" রইল না, এবং খণ্ডিত হ'লেই সেই সাধক "মূঢ় অসাধুতে" পরিণত হয়ে যান—"মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মসু অসাধুষু"-ভাঃ ৩।৩১।৩৩। বস্তুতঃ, "নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্যদাগে, শুক্লবস্ত্রে যেছে মসীবিন্দু"-চৈঃ চঃ ২।২।৪২। সুতরাং তাঁর অন্তরে কাম-বাসনার চিহ্নমাত্র থাকবে না, শিশুর মতই কামিনী ও কাঞ্চনে তিনি সর্ব্বদাই নির্ব্বিকারচিত্ত হবেন।

শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রে (১৬) ব'লেছেন—

"অনন্যভক্ত্যা তদ্বুদ্ধির্বুদ্ধিলয়াদত্যন্তম্"

অর্থাৎ, অনন্যভক্তি দ্বারা বুদ্ধির অত্যন্তলয় জন্য 'তন্ময়ী'-বুদ্ধির উদয় হয়। কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে ধরলে, তেলাপোকা কাঁচপোকার রূপ চিন্তা করতে করতে নিজ রূপ ত্যাগ ক'রে কাঁচপোকার রূপ পরিগ্রহ করে—এইরূপ প্রবাদ আছে, সেইরূপ অনন্য ভক্তি দ্বারা একাগ্রচিত্তে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম চিন্তা করতে করতে সাধক নিজ দেহবুদ্ধি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং অপ্রাকৃত শুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলেছেন,

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে,

তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।"—১১।২৯।৩৪

অর্থাৎ, মানুষ যখন অপর সমস্ত কর্ম ত্যাগ ক'রে আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন তার জন্য আমার কিছু করবার ইচ্ছা হয়, এবং তার ফলে সে অমৃতত্ব লাভ ক'রে আমার মত হয়ে যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তীপাদ বলেছেন, "প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়ানামেব ভক্তি সংসর্গেনাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনেব সাধুবুদ্ধ্যামহে"—অর্থাৎ স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়, ভক্তি-সংসর্গেও সেইরূপ সাধকের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই অনন্যাভক্তির লক্ষণরূপে বলছেন, "কৃষ্ণের চরণে যার হয় অনুরাগ, কৃষ্ণ বিনা অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ"-১।৭ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরুষের এই বালকবৎ ক্রীড়াকেই স্পষ্টাক্ষরে বলছেন, "বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ"—১১।১৮।২৯

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ,
হসত্যথো, রোদিতি, রৌতি, গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ"-১১ ২।৪০।

গুরু পদাশ্রয়।

প্রকৃত সাধুর দর্শন পেলে এবং পূর্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা তাঁকে ঠিকমত চিনতে পারলে, তখন সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে তাঁর চরণে আত্মবিক্রয় করতে হবে। গুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত ভক্তিসাধনপথে প্রবেশের উপায় নেই। সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু এইজন্য সাধনাঙ্গ বর্ণনায় 'গুরু-পদাশ্রয়'কেই সর্ব্বপ্রথম অঙ্গ ধ'রেছেন। মুণ্ডক উপনিষদ্ বলছেন "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"-১।২।১২, ভাগবত বলছেন, "তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্"-১১।৩।২১, "মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্"-১১।১০।৫। বালক ধ্রুব সুকঠোর সাধনা ক'রেও গুরু-মন্ত্রে দীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন পাননি, "গুরু বিনা ধ্রুব বনে কৃষ্ণ নাহি পায়"। বস্তুতঃ, শ্রীভগবান্ প্রাকৃত জীবের ইন্দ্রিয় গোচর নন, সুতরাং গুরুরূপেই তিনি ভক্তসাধককে ভক্তিপথে নিয়ে চলেন। "জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তা'তে গুরু চৈত্ত্য-রূপে, শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে"-চৈঃ চঃ ১।১, "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে, গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে"—ঐ।

প্রভু নরহরি তাঁর মনোমত গুরু লাভ ক'রে সর্ব্বস্বত্যাগ করতঃ তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করলেন। এক্ষণে এই সর্ব্বস্বত্যাগ সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। প্রভু বলেছেন, "আমীর না হলে ফকীর হয় না" অর্থাৎ যে দরিদ্র নীচ-কুলে জন্ম-গ্রহণ করেছে, যে কখনও বিষয়, ঐশ্বর্য্য ও কামিনীর মুখ দেখেনি, সে কখনও ত্যাগী বা সন্ন্যাসী হ'তে পারে না। উচ্চকুলমর্য্যাদা, ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রী অপ্সরাসম—এই সব যার আছে, এবং যে যুবা-বয়সেই, অর্থাৎ ভোগের যোগ্যতম সময়েই ঐ সব 'দুস্ত্যজ' আকর্ষণ 'মলবৎ' পরিত্যাগ ক'রে আসতে পারে, সেই ভক্তিভজনপথের উপযুক্ত, তারই অখণ্ডযোগসাধনে সিদ্ধিলাভের আশা আছে। একেই ত্যাগ বলে। অন্যথা, যে ভিখারী, যার কিছুই নেই, সে আবার ত্যাগ করবে কী? প্রভু নরহরির এই সব বিষয়-ঐশ্বর্য্যের কোনোটিরই অভাব ছিল না—উচ্চ কুল-মর্য্যাদা, অতুল ধন-সম্পত্তি, যুবতী স্ত্রী—এদের যে কোনো একটিই তাঁকে সংসার-বন্ধনে বেঁধে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ' যার অন্তরে প্রবেশ করেছে সে "লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম, কর্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম, দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, নিজ পরিজন, স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন"-চৈঃ চঃ ১।৪। সনাতনকে শিক্ষাদানছলে মহাপ্রভুও তাঁকে এই উপদেশ দিয়েছেন:

"প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতন ধন,
অনেক যে দুঃখেতে মিলয়—
দেহ, গেহ, পুত্র, দার, বিষয়-বাসনা আর
সর্ব্ব সুখ যদি তেয়াগয়"—ভক্তমাল।"

গুরু সেবা

সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে গুরুপদে শরণ নিয়ে অবিচলিত যত্ন ও আগ্রহ সহকারে গুরু-সেবায় নিযুক্ত থাকতে হবে। প্রভুপাদ তাঁর সমস্ত আচরণ ও শিক্ষায় এই গুরু-সেবার মহিমা প্রদর্শন করেছেন। গুরু-সেবার যে কী মাহাত্ম্য, তা সম্যক্ প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই। গুরু-সেবা নিছক গুরুর কৃপালাভের জন্য তাঁকে তুষ্ট করবার চেষ্টা নয়— গুরু-সেবা একাধারে ভক্তির সাধন ও সাধ্য, প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্য বস্তু। শুধু তাই নয়, গুরুসেবাই সাধনের মূল। অর্থাৎ, কোনো লতার মূল ছিন্ন ক'রে তার অন্যান্য অঙ্গে সেচনাদি করলেও যেমন সে-লতা নিশ্চিত শুষ্ক হ'য়ে যায়, পরন্তু তার মূলে জল-সেচন ও সারাদি প্রয়োগ করলে কাণ্ড-শাখা-প্রশাখাদি পুষ্ট হ'য়ে লতাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে, সেইরূপ "সমবহায় গুরোশ্চরণম্"-ভাঃ ১০।৮৭।৩৩, অর্থাৎ শ্রীগুরুচরণ পরিত্যাগ ক'রে, গুরু-সেবা বাদ দিয়ে অন্য কোনো সাধনে কোনোই ফল লাভ হয় না এবং সমুদ্রে "অকর্ণধার বণিকের" মত "ব্যসনশতান্বিত" হয়ে অকূলে ভাসতে হয়; পরন্তু "গুরু-শুশ্রূষয়া ভক্ত্যা," অর্থাৎ ভক্তিভাবে গুরু সেবারূপ মূল সিঞ্চনে অন্যান্য সাধনাঙ্গ দ্রুত পুষ্টিলাভ করে। বস্তুতঃ, এই কলিহত জীবের পক্ষে অন্য সর্ব্বপ্রকার সাধনাঙ্গ ঠিকমত পালন করা দুরূহ। কিন্তু সাধুগুরুকে ইষ্ট-দেবতা ও প্রিয়তম জ্ঞানে তাঁকে অকপটভাবে সেবা দ্বারাই ভক্তিপথে সিদ্ধিলাভ হয় এবং এই একনিষ্ঠ গুরুসেবা সাধনই সাধককে অখণ্ডিত যোগমার্গে অবিচলিত রাখতে সমর্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধনাঙ্গের তৃতীয়স্তরে "গুরুর-সেবন" উল্লেখ করেছেন। শ্রীভগবানের 'দুরত্যয়া' মায়া পার হওয়া জীবের পক্ষে অসাধ্য; একমাত্র শ্রীভগবানের শরণ নিলে, তবেই তিনি স্বয়ং তাঁর মায়া বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর নন,—"জীবে সাক্ষাৎ নাহি"। অতএব ভগবৎ-শরণের অর্থ কী?

কৃষ্ণ-ভজনের তাৎপর্য্য কী? কবিরাজ গোস্বামী অতি সুকৌশলে, অথচ সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর উপায় নির্দ্দেশ করেছেন, এই গুরু-সেবনের দ্বারাই মায়াজাল ছিন্ন ক'রে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হয়—

"তাতে কৃষ্ণভজে,—করে গুরুর সেবন,
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ"-২।২২

শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপ কথাই বলেছেন :

"তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ,
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ" ।—১১।৩।২২

অর্থাৎ, আত্মপ্রদ হরি যে সকল ধর্ম দ্বারা তুষ্ট হন, গুরুকেই আত্মা ও দেবতাজ্ঞান করে অকপট সেবা দ্বারা সেই ভাগবত ধর্মসমুদয় তাঁর কাছে শিক্ষা করবে। "তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরু-দেবতাত্মা"-১১।২।৩৭, অর্থাৎ তাঁর মায়ার জন্য জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি গুরুতে দেবতাও প্রিয় বুদ্ধি স্থাপন করে অনন্যভক্তি সহকারে তাঁকে সেবা করবেন। ৭।৭।৩০ শ্লোকে "গুরু-শুশ্রূষয়া ভক্ত্যা," অর্থাৎ ভক্তিভাবে গুরু-সেবার কথা বল্লেন এবং ১১।১৭।২৯ শ্লোকে "শুশ্রূষমান আচার্য্যং সদোপাসীত নীচবৎ" অর্থাৎ সর্ব্বদা নীচ হয়ে গুরু-সেবা করতে নির্দ্দেশ দিলেন। গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলেছেন, "তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া "—৪।৩৪

প্রকৃতপক্ষে, গুরু-সেবা ব্যতীত মায়া-বন্ধন ছিন্ন করা যায়না। বস্তুতঃ, গুরুর সেবনই যে কৃষ্ণ-ভজন, এবং গুরু-সেবাই যে আমাদের সাধ্যবস্তু তা' প্রভুপাদ নিজ আচরণ দ্বারা জীবকে উপদেশ দিয়েছেন। গুরু-সেবা সহজ কাজ নয়। ভাগবত বলছেন, গুরু-সেবা করতে হবে "সদানীচবৎ", "অমায়য়া" এবং "একয়া ভক্ত্যা"। গুরু-সেবায় নিযুক্ত হলে গুরুদেব শিষ্যের মনে নানা বিকারের সৃষ্টি করেন—এই সকল বিকারে ও তজ্জনিত মানসিক বিপর্য্যয়ে অবিচলিত থেকে সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে, অনুরাগের সহিত যে শিষ্য গুরু-সেবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে, সেই ধন্য। এই দুরত্যয়া মায়া-সমুদ্র সে-ই পার হতে পারে, অখণ্ডযোগসাধনে সে-ই সিদ্ধিলাভ করতে পারে। বহু দুঃখ, বহু ধৈর্য্য, দৈন্য ও সর্ব্বস্বত্যাগের দ্বারা সুকঠিন সংযম ও অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত প্রাণপণে গুরু-সেবারূপ সাধন করে প্রভুপাদ অখণ্ডিতযোগে অবিচলিত ছিলেন। গুরু-সেবা-রূপ সাধন যে কত বাধাবিঘ্ন ও পরীক্ষা-সঙ্কুল, তা একনিষ্ঠ গুরু-সেবক অবগত আছেন। যে সাধন দ্বারা দুস্তর মায়াসমুদ্র পার হওয়া যায়, তা যে সহজ সাধ্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। নারদভক্তিসূত্র উল্লেখ করেছেন—"কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্ ?—যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি, যো মহানুভবং সেবতে, যো নির্ম্মমো ভবতি।"-৪৯।

নারদভক্তিসূত্রকথিত মায়াবন্ধন ছেদন করার এই সাধনসূত্র প্রভুপাদ নিজ আচরণে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন—এবং 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবকেও সেই শিক্ষা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পরিষ্কার ভাবায় বলেছেন,

"মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ, তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্,
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।"—৫।৫।২

গুরু-বাক্যে নিষ্ঠা

"আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারনীয়া"-রঘুবংশ। নির্ব্বিচারে গুরুর আজ্ঞাপালন গুরু-সেবার একটি অঙ্গ। গুরু-সেবা সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করতে হলে গুরু-বাক্যে অচল, অটল নিষ্ঠা রেখে সেই বাক্য পালন করতে হবে। সিদ্ধগুরুবাক্য বেদবাক্যসম অবিচারনীয়। অবহেলাভরে উচ্চারিত গুরু বাক্যও অসীম শ্রদ্ধাসহকারে ও অকাট্য সত্যজ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে। বস্তুতঃ গুরুবাক্যই বেদবাণী, গুরুবাক্য অমোঘ। গুরুবাক্যে গভীর ও অবিচলিত বিশ্বাসই সাধনের প্রাণ। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব হলে অখণ্ড-যোগসাধন কদাচ সিদ্ধিপ্রদ হয়না। প্রকৃতপক্ষে, গুরু যা বলেন, তাই সত্য, গুরু যা আজ্ঞা করেন তাই কর্ত্তব্য—এই অন্ধবিশ্বাসই ভক্তিসাধনের দুর্গম পথকে সুগম ক'রে দেয়। এই নিষ্ঠার অভাব হলে পতন অনিবার্য্য।

কিন্তু গুরুবাক্যে নিষ্ঠা রাখা অতি দুরূহ কার্য্য। শ্রীগুরুদেব প্রায়ই এরূপ আদেশ দেন, যা' শিষ্যের মনে অশ্রদ্ধেয়, অর্থহীন ও পক্ষপাতমূলক ব'লে প্রতীয়মান হয়। সে ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সহিত তাঁর আজ্ঞায় নিষ্ঠা রেখে আজ্ঞামত কার্য্য করা বড়ই কঠিন। আবার কখনো বা গুরুদেব যা বলেন, কার্য্যতঃ তার বিপরীত ফল ফলতে দেখা যায়—সে সব ক্ষেত্রে গুরুবাক্যের অকাট্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কখনো এমনও দেখা যায় যে ভক্ত ও নিষ্ঠাবান্ শিষ্যকে গুরুদেব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অনাদর করেন, পরমার্থজ্ঞানলিপ্সু শিষ্যকে বৈষয়িক কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এসব ক্ষেত্রেও গুরুর কার্য্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা রাখা বড়ই দুরূহ। কিন্তু যে একান্তভক্ত, সে গুরুর এই সব দুর্ব্বোধ্য ও আপাত বৈষম্যমূলক আচরণেও বিচলিত না হয়ে, এ সবই গুরুর পরীক্ষা —এই জ্ঞানে, তাঁর শ্রীচরণে অটল নিষ্ঠা রেখে সযত্নে তাঁর সেবা করে তাঁর প্রীতি-বিধান করে। এইরূপ ভক্তকেই প্রভু পরিণামে সর্ব্বাপেক্ষা আপনজন করে নেন। একলব্য ও উপমন্যু গুরু আজ্ঞাপালনে নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। প্রভু নরহরিও তাঁর আচরণে ও শিক্ষায় এই গুরু নিষ্ঠার মহিমা ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তন করেছেন :

"গুরু-সুখে সুখী হও, সিদ্ধ হবে কার্য্য,
গুরু আজ্ঞা যাহা হয়, তাই শিরোধার্য্য।"
"নিজ গুরু-সেবা ছাড়ি, অন্যত্র না যাবে,
অকপটে চরণ সেবা করিবে তাঁহার"
"গুরু ছেড়ে অন্যমতি করিলে হবে দুর্গতি"
"গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে"
"গুরু-নিষ্ঠা রাখ মন, যাবে নিত্য বৃন্দাবন।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে :

"ভট্টাচার্য্য কহে, গুরু-আজ্ঞা বলবান্‌,

গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে শাস্ত্র-পরমাণ"—২।১০

শ্রীনরোত্তমঠাকুর এই গুরু-বাক্যে নিষ্ঠার সম্বন্ধেই বলেছেন,

"গুরুমুখপদ্মবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য

আর না করিহ মনে আশা"—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-২।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, গুরু উপেক্ষা করলে যে কত বড় মহা অপরাধ হয় এবং তার বিষময় ফল কীভাবে জীবনকে অভিশপ্ত করে তোলে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তার উদাহরণ দিচ্ছেন রামচন্দ্রপুরীর আচরণে। তিনি শিষ্য হয়ে গুরুকে উপদেশ দেবার স্পর্দ্ধা দেখিয়েছিলেন গুরুর অন্তর্দ্ধান সময়ে। এই অপরাধের ফলে তিনি আজীবন পরনিন্দক ও সকলের অপ্রিয় হয়ে রইলেন। গুরুর তিরোভাবকালে

"রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে—

শিষ্য হ'এগ গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে।"

তখন গুরু মাধবেন্দ্রপুরী দুঃখিত হয়ে তাঁকে তিরস্কৃত করলেন :

"মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি, যাও যথিতথি"

"এই যে মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল

সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল।

শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ—

সর্ব্বলোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ।"

সেই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী গুরু অপরাধীদের সাবধান করে দিয়ে বল্লেন :

"গুরু উপেক্ষা করিলে ঐছে ফল হয়,

ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধ ঠেকয়"—৩.৮

নিরলস সাধনাগ্রহ।

প্রভুপাদের লীলা-আলোচনা থেকে দেখা যায় যে তাঁর সাধনাগ্রহের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ছিলনা। ফলে স্নানাহার, বিশ্রাম-নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দৈহিক কৃত্যও সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হত। দেহরক্ষার অতি সাধারণ কর্ত্তব্যগুলি সম্পর্কে তিনি সর্ব্বদাই উদাসীন ছিলেন। ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে, রুক্ষকেশে, এই দেহস্মৃতিহীন, উন্মত্তবৎ সাধক সদাই সাধনচিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতেন। সাধন-ক্রিয়ায় তাঁর দিবানিশি, স্থান-অস্থান—কিছুরই স্মৃতি থাকত না। বিরামবিহীন উদ্যমে, নিরলস ধৈর্য্যে দিবারাত্রি সতর্ক হয়ে আপন সাধন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁর সাধন ক্রিয়ায়

কোনো ছেদ ছিলনা। এরূপ অবিরাম সাধন-ক্রিয়া এবং তাতে এত তীব্র আগ্রহ ও আসক্তি এই কলিযুগে দুর্লভ। সাধন কার্য্যে দিনের পর দিন অভুক্ত থেকে, নিদ্রাহীন নিশি যাপন করে এই উন্মত্ত সাধক যখন গুরু-সমীপে উপস্থিত হ'তেন—তখন তাঁর গুরুদেব এই প্রাণপ্রিয় শিষ্যোত্তমকে সাগ্রহে বক্ষে ধারণ করে আশীর্ব্বাদ করতেন, আদর ক'রে জিজ্ঞাসা করতেন—"এ কয়দিন কী খেয়েছ? কোথায় ছিলে?" উত্তরে প্রভু সবিনয়ে বলতেন, "পুলের নীচে নরমকাদার উপর শুয়েছিলাম। আর খাবার মধ্যে বনফল, বিচুটিফল—এইসব যা' প্রভু জুটিয়েছেন তাই খেয়েছি। এই অপূর্ব্ব দৈন্য ও বৈরাগ্য লক্ষ্য করে তাঁর গুরুদেবের দুই চক্ষু সজল হয়ে উঠত।

বাস্তবিক, এরূপ নিরলস, নিরবচ্ছিন্ন সাধনাগ্রহ এযুগে কোথাও দেখা যায়না এবং তজ্জন্যই এই দুর্লভভক্তিসাধন পথে খুব কম সাধকই সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হয়। বস্তুতঃ শ্রীরূপগোস্বামী যে ছয়টি বৃত্তিকে 'ভক্তি বিনাশক ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন, সাধনে অনিয়ম ও অনাগ্রহ তাদের অন্যতম :

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পোঽনিয়মাগ্রহঃ
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি"—উপদেশামৃত।

কবিরাজ গোস্বামীও ব'লেছেন, "যত্ন আগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে"—২।২৪ ভক্তির সাধনপ্রসঙ্গে নারদভক্তিসূত্রে ব'লেছেন, "অব্যাবৃত ভজনাৎ", অর্থাৎ অবিরাম ভগবদ্ ভজনই ভক্তিসাধনের অনুকূল। গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলছেন, "স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিন্ন চেতসা"—৬।২৩, অর্থাৎ এই যোগ শিথিলতা ত্যাগ ক'রে দৃঢ়তা-পূর্ব্বক সাধনের যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে যে-সাধক নিত্য-সাধনপর শ্রীভগবান্ স্বয়ং তার যোগ-ক্ষেম বহন করেন : "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে, তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—৯।২২। এই সকল ভক্ত "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চদৃঢ়ব্রতাঃ, নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে"—৯।১৪। সাধনপথে যে ছেদ হ'লে চলবেনা, নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় এযে অখণ্ডিত ও অব্যবহিত হবে, গীতায় সেই তত্ত্ব পুনঃপুনঃ উদাত্তস্বরে ধ্বনিত হ'য়েছে : "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ, তস্যাহংসুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ"—৮।১৪ নারদভক্তিসূত্রেও সুস্পষ্টভাবে বলছেন, "ক্ষণার্দ্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্"—৭৭।

সাধনপথে বিঘ্ন ও তৎসহনে ধৈর্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলছেন—"তিতিক্ষা দুঃখ সর্ম্মষঃ"—১১।১৯।৩৬ ; বস্তুতঃ, এই শ্লোকোক্ত শম, দম, তিতিক্ষা ও ধৃতি ব্যতীত ধর্ম-সাধন হয় না। যাঁরা সাধনমার্গে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করেছেন, একমাত্র তাঁরাই জানেন, এই পথ কুসুমাকীর্ণ নয় ; এর

প্রতিপদক্ষেপে বাধা, বিঘ্ন ও ব্যর্থতা। এই সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে চলতে হলে অসীম ধৈর্য্যের প্রয়োজন। প্রভুপাদ এই দুর্গমপথের পথিক হয়ে অবিচলিত ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রভু প্রায়ই বলতেন, "পর্ব্বত প্রমাণ ধৈর্য্য না হলে এ পথে এগোতে পারবে না। সাধকের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙবার জন্য বাধা, বিপত্তি ও ব্যর্থতার তরঙ্গ নিত্যই আঘাত করছে। অতএব বিশ্বাস ঠিক রেখো, সাহস হারিওনা, নিরলস উদ্যমের সহিত এগোও। ব্যর্থতায় ভেঙে না পড়ে নব উদ্যমে আবার বুক বাঁধ, নিজের মান-অভিমান, অহংজ্ঞান সব বিসর্জন দিয়ে গুরুবাক্যে নিষ্ঠা রেখে সাধনপথে ধৈর্য্য ধর।" বস্তুতঃ, সাধকের পক্ষে এ অমূল্য সাবধান-বাণী, পথের পথিক ভিন্ন অপরে এর তাৎপর্য্য বুঝবেনা। সাধনপথে এই অবশ্যম্ভাবী বাধা-বিপত্তির কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে:

"কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা—
ভক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা যত, অসংখ্য তার লেখা।
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি, জীব-হিংসন,
লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ।
সেকজল পাইয়া উপশাখা বাড়ি যায়,
স্তব্ধ হইয়া মূলশাখা বাড়িতে না পায়।"—২।১৯

এই বাধা-বিঘ্নের মধ্যে অপরগুলি বহুযত্নে অতিক্রম করতে সমর্থ হলেও, প্রতিষ্ঠার প্রভাব এড়ানো বড়ই দুরূহ। ইদানীংকালে অনেক তথাকথিত 'মহাপুরুষ' দেখা যায়, তারা সকলেই প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য তাদের তপস্যার ফল অর্পণ করেছে। নিজেকে জগৎমাঝে প্রচার করাই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু প্রভু নরহরি প্রতিষ্ঠাকে 'শূকরী বিষ্ঠা' জ্ঞানে ঘৃণায় দূরে নিক্ষেপ ক'রে ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠার 'ভয়ে' লোকসমাজ থেকে পালিয়ে 'পাতালবাসী' হয়েছিলেন। তাই মানুষ দেখলেই চট-বস্ত্রে মুখ আবরণ করে, "আমি মেথরের ছেলে"—এইরূপ ছলনাময় বাক্য ব'লে নিজেকে সংগোপন করতেন, জনতার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচতেন। পরবর্ত্তীকালেও তাঁর নীরব করুণা, আর্ত্তের ত্রাণ, বুভুক্ষুকে অন্নদান ও অন্যান্য লোকোত্তর লীলাসমূহকে বহির্জগৎ থেকে গুপ্ত ক'রে রেখেছিলেন একমাত্র প্রতিষ্ঠার ভয়ে। তিনি আপনাকে অথবা আপনার ধর্মকে প্রচার করবার জন্য কোনো শিষ্যকে বা ভক্তকে নিযুক্ত করেননি। অধিকন্তু নিজেকে "মহাপাপী," "নরাধম," "মেথরের ছেলে" ইত্যাদি হীন-আখ্যায় গোপন করতেন। বস্তুতঃ, পুরী গোস্বামীর মতই এই লোকাতীত মহাপুরুষ বহির্জগৎ থেকে "প্রতিষ্ঠার ভয়ে দূরে গেল পলাইয়া"। প্রকৃতই, তাঁর ন্যায় নিষ্কিঞ্চন, নিরভিমান ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-

পাদপদ্মসর্বস্ব মহাপুরুষ এযুগে দুর্লভ। যাঁর মন-মধুপ ভগবৎ-চরণ-সরোজে সদাই নিমগ্ন—তিনি কি ঐহিক প্রতিষ্ঠায় আকৃষ্ট হতে পারেন ?

ইন্দ্রিয়-দমন বা জীয়ন্তে-মরা

শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকে (১১।১৯।৩৬) বলছেন "দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ" এবং "জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ", অর্থাৎ ধর্মসাধনের অন্য দুটি প্রধান অঙ্গ, দম হচ্ছে ইন্দ্রিয়সংযম আর ধৃতি হচ্ছে জিহ্বা ও উপস্থের বেগকে জয় করা। প্রভু নরহরি বলেছেন, "জীয়ন্তে-মরা না হলে ধর্ম-সাধন হয় না", অর্থাৎ মৃতব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদিতে যেমন কোনো রিপু প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, কাম-ক্রোধাদি বিকারের হেতুভূত বস্তু উপস্থিত থাকলেও তার যেরূপ কোনো বিকার আসে না, সাধকও তার ইন্দ্রিয়-নিচয়কে সেইরূপ সংযত করে সাধনকার্য্যে নিযুক্ত থাকবে। এই ইন্দ্রিয়-সংযমের অভাববশতঃই সাধারণতঃ সাধকের পতন ঘটে ; এই ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রভাবেই ধীরচিত্ত সাধক আপন অখণ্ডযোগসাধনে অবিচল থাকতে পারে। বস্তুতঃ, বিকারের হেতুভূত বিষয়গুলি সম্মুখে বর্ত্তমান থাকতেও যিনি নির্বিকারচিত্ত, তিনিই ধীর, তিনিই প্রকৃত সাধক। "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"—কুমার সম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলেছেনঃ "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ন যুজ্যতে—১।১১।৩৯ প্রভুপাদের সমগ্র জীবনই এই ইন্দ্রিয়-সংযম, এই 'জীয়ন্তে-মরা'র সমুজ্জল দৃষ্টান্ত। সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর পর ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয় ; প্রভু সারাজীবন এই পরিদৃশ্যমান "সুন্দর ভুবনে"র সকল সৌন্দর্য্য, সকল সুখভোগ চিরতরে ত্যাগ করে আঁধার গুহার গভীর গহনে প্রোথিত থাকতেন। রূপে-রসে-গন্ধে-শব্দে-স্পর্শে পূর্ণভোগ্যা এই বসুন্ধরা, প্রাণের প্রাচুর্য্যে আনন্দোচ্ছল এই ধরনীর জীবকুল, তাদের সীমাহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিষয়-বস্তুর মনোহররূপ ও তাদের অসংখ্য আকর্ষণ—এই দুস্ত্যজ, দুর্নিবার বাসনার ইন্ধনরূপা এই ভোগ্যা বসুন্ধরার দুয়ার সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করে আর কোন্ মহাপুরুষ জীবন্তেই মৃতকল্প মনুষ্যের ন্যায় গুহা-গহ্বরের আঁধার আশ্রয়ে গ্রহণ করেছিলেন ? সাধন-লালসায় বিষয়-বস্তুর প্রতি এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিরাগ অপূর্ব্ব ও অনবদ্য এবং বিষয়াসক্ত-চিত্ত মূঢ় মানবের অজ্ঞান তিমিরের জ্ঞানাঞ্জনশলাকাস্বরূপ। বাস্তবিক, সারা জীবন ধরে এই আত্মত্যাগ, এই কৃচ্ছ্রসাধন, এই বেঁচে-থেকে-মরার দৃষ্টান্ত সাধন-জগতে অদ্বিতীয়।

ভক্তিশাস্ত্রসমূহেও এই কঠোর ইন্দ্রিয়-সংযম, এই 'জীয়ন্তে-মরার' প্রয়োজনীয়তা বহুস্থানে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হলেও, সাধকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা যথাযথ প্রতিপালন করেন না এবং তার ফলে এই সুকঠিন অখণ্ড-যোগসাধনে সিদ্ধিলাভও কদাচিৎ কারো

ভাগ্যে ঘটে। ইন্দ্রিয়বর্গ দুর্ব্বার ; 'বিষয়'-বস্তুর সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজাত সংস্কারবশতঃ তাদের অনুকূল সম্বন্ধ থাকায়, তার প্রতি আকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সাধনমার্গে অবস্থিত সাধক এই নানাভিমুখী চঞ্চল মনকে সেই সেই দিক থেকে বিকর্ষণ ক'রে আত্মবশে আনবেন। ভাগবতে ব'লেছেন "গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণ-সেবয়া, গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা, মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ"—১১।১৩।২৬, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ গুণ-সেবায় চিত্ত গুণগণে আবিষ্ট হয়, আমার সেবক এইরূপ গুণাবিষ্ট চিত্ত ও গুণগণ উভয়ই ত্যাগ করবে। তা ছাড়া "বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা"—১১।২০।২৪, সুতরাং "ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য মন্মনঃ, বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ তং সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ"—১১।১৪।৪২ অর্থাৎ, ধীরব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে আকর্ষণ করতঃ, বুদ্ধি সারথির সাহায্যে ঐ সর্ব্বব্যাপক মনকে আমাতে এক প্রদেশে ধারণ করবে।

কিন্তু এ যে কত দুরূহ তা' অর্জ্জুনও স্বীকার করে বলেছিলেন : "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ। প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্, তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্"। শ্রীভগবান্ তার উত্তরে বলেছিলেন, এই চঞ্চল মন দুর্নিগ্রহ,—৬।৩৪ সত্য ; তথাপি অভ্যাস ও বৈরাগ্য-যোগে তাকে বশে আনা যায়। নতুবা সাধন-যোগ প্রাপ্তি হয় না—"অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ, বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ''—৬।৩৬। এই 'অভ্যাস-যোগই' নিরলস সাধনাগ্রহ ও 'বৈরাগ্যযোগই' ইন্দ্রিয়-সংযমরূপে প্রভুপাদের জীবন-লীলায় ব্যাখ্যাত ও প্রতিপাদিত হ'য়েছে। সাধনমার্গে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-ধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কথা সর্ব্বশাস্ত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হয়েছে। শাস্ত্রে এই 'জীয়ন্তে-মরা'র প্রয়োজনীয়তা এইরূপভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে :

(১) "সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্"—মুণ্ডক ৩।১।৫ ; (২) "ব্রহ্মচর্য্যেণ মৌনেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা"—ভাঃ ৩।২৮।৪ ; (৩) "ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায়ঃ পুরুষার্চ্চণম্"—ভাঃ ৩।২৮।৪ ; (৪) "ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ"—ভাঃ ১১।৩।২৪ ; (৫) "অহিংসা সত্যমস্তেয়মকাম-ক্রোধলোভতা"—ভাঃ ১১।১৭।২১ (৬) "রেতোনাব-কিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ম্"—ভাঃ ১১।১৭।২৫ ; (৭) "শ্রমণা উর্দ্ধমন্থিনঃ"—ভাঃ ১১।৬।৪৭ ; (৮) "যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি"—গীতা-৮।১১ (৯) "ব্রহ্মচারিব্রতে-স্থিতঃ"—গীঃ-৬।১৪ ; (১০) "ন হিনস্তি আত্মনা আত্মানম্"—গীঃ-১৩।২৯ ; (১১) নাত্মানমবসাদয়েৎ—গীঃ-৬।৫ ; (১২) "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্—গীঃ-৬।৫

"শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ .
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ"- গীঃ-৫।২৩

অর্থাৎ, দেহান্তের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি এই জীবন্ত দেহেই কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য

করবার শক্তি অর্জ্জন করেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই সুখী। মৃতদেহে যেরূপ কামের প্রভাব নেই, রাগদ্বেষ নেই—তেমনি জীবিতাবস্থাতেই যিনি মৃতের সমান নির্ব্বিকার হ'তে পারেন, তিনিই প্রকৃত অখণ্ডযোগী হবার যোগ্যতা লাভ করেন।

নারদভক্তিসূত্র একেই অন্যভাবে ব'লেছেন :

"কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্"-৬৫।

অর্থাৎ কাম ক্রোধ অভিমান যদি করতে হয় তো তাঁর উপরই করবে। বাহ্যিক জগতের 'বিষয়'-বস্তুতে কামাদি সর্ব্বপ্রকার পরিত্যাগ করে "ছয়রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন, কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ, অন্যথা স্বতন্ত্রকাম, অনর্থাদি যার ধাম, ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ। ক্রোধে বা না করে কীবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা, লোভ-মোহে এই তো কথন"—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। বস্তুতঃ পক্ষে,

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ,
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ।"-গীঃ ১৬।২১

শ্রীরূপ গোস্বামীও বলেছেন :

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং, জিহ্বাবেগমুদরোপস্থ বেগম্,—
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ, সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ"

আত্মাহুতি।

বাল্যে ও যৌবনে যথাযথভাবে সাধনযোগ আচরণ ক'রে সাধকপ্রবর প্রভু নরহরি অখণ্ডসাধনের উচ্চস্তরে এসে উপস্থিত হলেন। এই অবস্থায় সাধনের ক্রমানুযায়ী স্তরগুলি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হল। বিঘ্নসঙ্কুল কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের তিমির রজনী প্রেম-সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনায় প্রভাত হবার উপক্রম হয়েছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন,—"সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন," অর্থাৎ ভক্তি-সাধন সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হলে তদ্দ্বারা অনর্থের নিবৃত্তি হয়। প্রভুপাদ বলেছেন,—"অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে প্রেমের পথে যায়,"—অর্থাৎ অনর্থ-তমিস্রা অপগত হলে প্রেম-সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব থাকেনা। অখণ্ড-যোগ-সাধনকাণ্ড পরিসমাপ্ত হলে সাধক যে অবস্থায় উপনীত হন, তাতেই তাঁর আত্মাহুতির ভাব উদিত হয়। এই আত্মাহুতির ভাব অতি অপূর্ব্ব ও অনুপম। অন্যান্য ধর্ম ও সাধনপন্থায় এর ধারণা করাও অসম্ভব। আত্মাহুতি শুধু মুখের কথা নয়; এ অবস্থা শরণাগতি হ'তে বিভিন্ন। এ সমগ্ররূপে আত্মদান, আত্মসুখচিন্তার সম্পূর্ণ বিলোপ। এর ধারণা সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির বহির্ভূত, এমন কি সাধকগণও সাধনাবস্থায় এর সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেন না। একমাত্র পরিপক্ব সাধনাবস্থায় সকল অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হ'লে তবেই এই অনুপম আত্মাহুতির উপলব্ধি হৃদয়ে

উদিত হবে। বস্তুতঃ, একে বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করা যায় না, সাধন-শুদ্ধ-চিত্তে এর উদয় হয়। 'আত্মা' বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, যা' কিছুদ্বারা আমি আমার 'আমিত্ব' প্রাপ্ত হয়েছি, এবং যার অভাবে আমি সেই 'আমিত্ব'-হারা হই। যা' দ্বারা আমি আমাকে প্রকাশ করি, তাই আমিত্ব; তাকেই কেউ বলে 'অহঙ্কার', কেউ 'স্বাতন্ত্র্য', কেউ 'ব্যক্তিত্ব" বলে। যা' কিছু আমিত্ব প্রকাশক—তার সব কিছুরই সম্পূর্ণ লয়, অহঙ্কারের আহুতি, ব্যক্তিত্বের বিনাশ, স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির বিলোপ—এই হচ্ছে আত্মাহুতি। প্রিয়তম অভীষ্টদেবের সেবাসুখ-অনলে যে জন নিজ আত্মাকে আহুতি দিতে পেরেছে, তার আমার আমিত্বের মৃত্যু হয়েছে, সে আপনার সুখদুঃখবোধ বিস্মৃত হয়েছে, নিজ হিতাহিতজ্ঞান পর্য্যন্ত হারিয়েছে। সেজন আমার-আমি এই বোধ ভুলে তোমার-আমি হ'য়ে নিজ ইষ্টদেবের সম্পূর্ণ দাসরূপে পরিণত হয়েছে। জাতরতি ভক্তের এই আত্মসুখ-সন্ধান বিলোপে স্বসুখস্পৃহার শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; দেহী নিজ দেহ-স্মৃতি বিস্মৃত হয়, মন তার অনন্ত বিষয়-আকর্ষণ থেকে অপসৃত হ'য়ে নিজ অভীষ্টদেবের সেবাসুখ চিন্তারূপ একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো ধর্মে এমন অপরূপ আত্মাহুতির দৃষ্টান্ত নেই—এ তার আপন অপূর্ব্বতায়, আপন মাহাত্ম্যে আপনিই মহিমময় হয়ে আছে। পূর্ণ ও অখণ্ডসাধনলব্ধ এই অপূর্ব্ব উপলব্ধি একমাত্র তিনিই লাভ করেন, যিনি এই স্তরে উপনীত হয়ে এরূপ ভাবের অধিকারী হয়েছেন। এই ভাবাবিষ্ট প্রভু নরহরি অপূর্ব্ব কণ্ঠে গেয়েছেন—

"কবে আমার আমি ভুলে যাব, তোমার আমি হয়ে রব,—
সেদিন আমার কবে হবে হরি ?
সমুদ্রে নদী মিশিবে, নিজসুখ পাসরিবে,
বহিবে আনন্দ-লহরী।"

একমাত্র গোপী প্রেমের সহিত এ তুলনীয়, যে-প্রেমে

"আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার,
কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার।
কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি পরিত্যাগ,
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ"—চৈ: চঃ ১।৪।১৫০

শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব

যে আত্মাহুতির কথা বলা হল, এর দ্বারা মানুষের অহং-ভাব ও স্বাতন্ত্র্য বিদূরিত হয়। স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ—জীবের স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধির বিলোপ; জীব তখন

নিজে বিচার করে কোনো চিন্তাই করতে পারে না ; তার যা' কিছু ভাবনা সবই কৃষ্ণসেবাসুখময়ী সে তখন নিজেকে ভুলে তাঁর ভাবেই ভাবিত হয়ে পড়ে। সুতরাং অহং-ভাবের বিলোপ হলেই সাধক "তদ্ভাব-ভাবিত-স্বান্তঃ" হয়। ফলে যথাবস্থিত দেহে বর্ত্তমান থেকেও সেই সাধকের প্রাকৃত দেহ, মন ও বুদ্ধির বিনাশ হয় ; তার প্রাকৃতেন্দ্রিয়, দেহ-মন-বুদ্ধি সবই অপ্রাকৃত বা চিন্ময় হয়ে যায়। সে তখন 'তাদাত্ম্য'-প্রাপ্ত হয়, তন্ময় হয়। নির্মল লোহা যেমন বহুক্ষণ অগ্নিসংসর্গে থেকে অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হয়ে নিজেও অগ্নিময় হয়ে যায় এবং অগ্নির প্রকাশকত্ব ধর্ম প্রাপ্ত হয়ে নিজেকেও প্রকাশ করে, অপরকেও প্রকাশ করে—সাধনশুদ্ধ প্রাকৃত গুণত্রয় (তম, রজ ও সত্ব) মুক্ত তার নির্মল চিত্ত তখন শ্রীভগবান্‌কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শুদ্ধসত্বের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধসত্বময় হয়ে যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেছেন, "প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াণামেব ভক্তিসংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব"। একমাত্র এইরূপ শুদ্ধসত্বোজ্জ্বল চিত্তেই ভক্তির উদয় সম্ভব হতে পারে। সাধারণ প্রাকৃত মনে (তম, রজ অপগত হ'য়ে সত্বগুণবিশিষ্ট হলেও) কখনও অপ্রাকৃত ভক্তির আবির্ভাব হতে পারেনা—কারণ "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয় গোচর"—চৈঃ চঃ ২।৯। চিত্ত শুদ্ধ-সত্বোজ্জ্বল হ'লে তবেই সে-চিত্ত ভক্তি-দেবীর আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে। তখনই "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি-র্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবদ্প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে"—প্রীতি-সন্দর্ভ-৬৫। হ্লাদিনীশক্তিময়ী শ্রীরাধারাণীর কৃপা হলেই হৃদয়ে ঐ "ভগবৎ-প্রীতি" উদিত হয়ে ভক্তের ভক্তিরস পুষ্টি সাধন করে এবং তখনই উপরোক্ত 'আত্মাহুতির' ভাব উদিত হয়। এইরূপ ভক্তসম্বন্ধেই চরিতামৃত বলেছেন—

> "এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়,
> প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়।
> কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়
> ভুক্তি-সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়"—২।২৩

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুও বলেছেন

> "ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা,
> আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নাম গানে সদারুচিঃ"—১।৩।১১

এবং

> "বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশংন তৃপ্তাঃ
> ভক্তাঃ শ্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি।" ১।৩।১২

গোপী-ভাব

এইরূপে চিত্ত 'তদ্ভাব-ভাবিত' হলে, চিত্তে শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব হয়। একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বময় চিত্তেই হ্লাদিনী-শক্তির প্রকাশ সম্ভব। শ্রীরাধারাণীর কৃপা হ'লে তিনি ভক্তের শুদ্ধসত্ত্বাসনরূপ চিত্তে আবির্ভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন করান। কারণ, একমাত্র বিশুদ্ধসত্ত্বেই ভগবৎ-মূর্ত্তির প্রকাশ সম্ভব—"স চ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতীয়তে প্রকাশতে" —ভাঃ ৪।৩।২৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী।

অধিকারীভেদে এই ভক্তি পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করলে এর মধ্যে পরকীয়া মধুরা রতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—"পরকীয়াভাবে অতিরসের উল্লাস"—চৈঃ চঃ ১।৪। ব্রজগোপীগণ এই পরকীয়া মধুরা রতিতে শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা ক'রেছেন, তাই এ গোপী-ভাব নামে পরিচিত। 'গোপী' শব্দের আরও একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। 'গুপ্' ধাতু থেকে গোপী শব্দ নিষ্পন্ন; গুপ্ ধাতু রক্ষণে, সুতরাং রক্ষা করেন যে রমণী তিনিই গোপী; বিশ্বের মধ্যে যে বস্তুটি সবচেয়ে যত্নের সহিত রক্ষা করবার যোগ্য, যা' রক্ষা করলে সমস্তই রক্ষিত হয়, রক্ষণীয় বস্তুর সেই চরমপরিণতি যে কৃষ্ণ-প্রেম, তা' রক্ষা করেন যিনি তিনিই 'গোপী'। গোপীদের মধ্যেই কৃষ্ণ-প্রেম চরম বিকাশলাভ ক'রেছে—"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে" চৈঃ চঃ ২।৮। তাই গোপীঅনুগত হয়ে তাঁদের ভাবে ভাবিত হয়ে ভজনই শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভজন। এই গোপী-প্রেমের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং—"এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে, অতএব ঋনী হয় কহে ভাগবতে"—চৈঃ চঃ ২।৮; যাঁদের অতুলনীয় প্রেম-মহিমা অবগত হয়ে শ্রীভগবানের ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাঁর 'আত্মসম' উদ্ধব পর্য্যন্ত গোপীচরণ-রেণুপ্রাপ্তি মানসে বৃন্দাবনের লতাগুল্মওষধী হয়ে জন্ম নিতে চেয়েছিলেন, সেই গোপীপ্রেমের পরম দুর্ল্লভতা সহজেই অনুমেয়। বহু জন্ম সাধনের ফলে বহু আয়াসে যে ভক্ত প্রবর আজন্ম অখণ্ড-যোগসাধনে অবিচলিত থেকে একটির পর একটি ক'রে ভক্তির সাধন স্তরগুলি সুষ্ঠুরূপে অতিক্রম করতে পেরেছেন এবং সাধন শেষে আপনাকে ভগবৎ-পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত করেছেন—সেই সুদুর্লভ সাধকের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়াসনে ভক্তিদেবী আবির্ভূত হন, এবং অধিকার অনুযায়ী তাকে ভাব প্রদান করেন। আপন চেষ্টা দ্বারা, নিজ ইচ্ছামত—এ দুর্লভ বস্তু পাওয়া যায় না। ভক্তি-দেবীর কৃপা-নির্দ্দেশে কারো ভাগ্যে এ উদিত হয়ে থাকে।

শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-তনু প্রভু নরহরির চিত্তাকাশে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হলে তিনি স্বতঃই গোপী-অনুগতভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। বলা বাহুল্য, একমাত্র রাগানুগা

ভক্তিমার্গের সাধকগণেরই এই গোপীভাবানুগত ভাবে ভাবিত হবার সম্ভাবনা আছে। প্রভু নরহরি আজন্ম রাগানুগা-ভক্তি মার্গের সাধক। তিনি শাস্ত্রানুশাসনের ভয়ে সাধনপথে অগ্রসর হননি, পরন্তু বাইরের সমস্ত আকর্ষণ মলবৎ পরিত্যাগ ক'রে দুর্নিবার লালসাবশতঃই সাধনপথে অভিনিবিষ্ট হয়েছিলেন। অথচ সাধনদ্বারা যে-যোগ পূর্ণতা লাভ করল, সাধনপরিপক্ক হয়ে যে অমৃত ফল ফলল, সাধনাবস্থায় অভিনিবেশ-বশতঃ তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে গোপী-অনুগত-ভাবই পরিস্ফুট হল। যে ভাব 'লালসা'রূপে তাঁর সমস্ত 'রাগ-পথ' রাঙিয়ে রেখেছিল, সাধনান্তে তাই পরিপক্ক হয়ে গোপী-অনুগ-ভাব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করল। এক্ষণে শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের কথা উপলব্ধি হবে—'সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা, পক্বাপক্ব মাত্র সে বিচার।"

এই গোপী-অনুগত-ভাব মূর্ত্তিপরিগ্রহ করলে সাধকের অবস্থা কীরূপ হয়, তা দর্শন করবার সৌভাগ্য আমরা লাভ করেছি। গোপী-অনুগ-ভাবকে মূর্ত্তরূপে দর্শন করেছি, সঙ্গীতরূপে শ্রবণ করেছি, করুণারূপে অনুভব ক'রেছি। প্রভু নরহরি এই ভাবময়-মূর্ত্তি, তাঁর 'চিত্তেন্দ্রিয় কায়' এই ভাবের দ্বারা বিভাবিত, তাঁর প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন কোনো 'প্রণয়িজনবৃন্দের রসস্তোম' হরণ ক'রে তার দ্যুতিতে দ্যুতিময়, তাঁর সমস্ত 'বাহ্যাবধূতা-কৃতি'র অন্তরে যেন কোনো প্রেমময়ীর অন্তর্ঘনভাব ওতপ্রোত হয়ে জড়িত রয়েছে, সেই ভাবময়ীর ভাববন্যা যেন অন্তরে আপনাকে চেপে রাখতে না পেরে বহিরিন্দ্রিয়দ্বারে ফুটে ফুটে উঠছে। এই গোপীভাবময় মূর্ত্তি দর্শন করেই কবিরাজ গোস্বামীর অপূর্ব্ব বাণী হৃদয়ঙ্গম করলাম—

"তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন"—২।৮

আর 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত' তনু যে কী বস্তু, 'রসরাজ ও মহাভাব' দুই একরূপ হ'লে যে কেমন হয়, 'অখিলরসামৃত মূর্ত্তি,' 'কলিতশ্যামললিত' রূপ যে কীরূপ, তা' মহাভাগ্যবান্ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। নয়ন-ভরে দেখলাম তাঁকে, শ্রবণভ'রে শুনলাম তাঁর সুধা-স্রাবী মধুকণ্ঠস্বর, অন্তর ভরে অনুভব করলাম তাঁর করুণার অমৃত স্পর্শ। দেখলাম তাঁকে—

"অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণ-হৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ"—চৈঃ চঃ নাটক ৯।৪৫

যিনি রাগানুগামার্গে ভজন ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তিনি প্রকৃতই গোপী-অনুগ-ভাবময় হ'য়ে গেছেন ; তাঁর সমস্ত বৃত্তিই উক্তভাবে বিভাবিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে স্বসুখলালসাজাত অন্য কোনো ভাবের আর চিহ্নমাত্র নেই। সেই সাধকের আত্মসুখকামনা, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও পুরুষ-অভিমান সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে—"নিজেন্দ্রিয়

সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার"—২।৮; বস্তুতঃ, পুরুষ-অভিমানের সম্পূর্ণ বিলোপই এই ভাব-লাভের প্রধান লক্ষণ—"সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার"—২।৮। এই জীব জগতে পরস্পর ভোগবাসনায় নর-নারীরূপ মিথ্যা বুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং মায়াজ এই আকর্ষণই জীবকে সংসার-চক্রে ভ্রমণ করায়। নর-নারী এই ভেদজ্ঞান "উপভোগবুদ্ধ্যা" অজ্ঞান থেকে জাত। কারণ জীবমাত্রেই শ্রীভগবানের শক্তি, 'পরা প্রকৃতি'। স্বরূপতঃ এই জীবশক্তি কৃষ্ণের নিত্যদাস। কিন্তু কৃষ্ণ-বিমুখ হয়েই মায়া-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ"—চৈঃ চঃ ২।২০ মায়ামোহে নর ও নারী এই ভেদজ্ঞানে জীবকুল স্বসুখবাসনায় পরস্পর আকৃষ্ট হয়ে ভোগান্তে পরস্পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—"পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ"—ভাঃ ১১।৮।৮। এই পারস্পরিক ভোগবাসনা থেকেই নর ও নারী এই মিথ্যা ভেদবুদ্ধি, এই স্বসুখলালসাই সংসারচক্রের প্রবর্ত্তক ও সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষক। যেহেতু স্বসুখকামনা কৃষ্ণসুখবাসনার ঠিক বিপরীত, আত্মসুখসন্ধানীগণ কৃষ্ণবহির্মুখ হতে বাধ্য, এবং বহির্মুখতার জন্য তারা মায়ার কবলে প'ড়ে মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির প্রভাবে আত্মতত্ত্ব ও ভগবৎতত্ত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় এবং মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিতে তাদের মন চঞ্চল ও বিষয়-বাসনায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। স্বসুখকামী সংসারচক্রে ভ্রমণকারী ব্যক্তিগণকে কৃষ্ণ-বহির্মুখতারূপ অপরাধের জন্য মায়াদেবী প্রাকৃত বা মায়াময় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে গঠিত পঞ্চ তন্মাত্র বা বিষয় ভোগ করান এবং এই চক্রে দৃঢ়ভাবে বন্ধন ক'রে রাখেন। নর ও নারী—এই ভেদ-জ্ঞান বিষয়-ভোগলালসা থেকেই জন্মায়—এবং এই ভেদ-জ্ঞান, এই ভ্রান্তি, এই মোহ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই মায়াবদ্ধ জীবের নিমিত্ত মায়াদেবী বিরচিত। সুতরাং যাঁরা মায়াসমুদ্র পার হবার জন্য গুরুপদাশ্রয় গ্রহণ ক'রে সাধনমার্গে এসেছেন, তাঁদের এই স্বসুখবাসনা সমূলে বিনাশ করতে হবে, এবং ভজনপথের অন্যতম প্রধান বিঘ্ন 'স্ত্রী-পুরুষ'—এই মিথ্যা ভেদ-জ্ঞান পরিহার করতে হবে। সাধনার প্রাথমিক স্তরে এই জন্য সাধক বা সাধিকাকে যথাক্রমে স্ত্রী বা পুরুষের সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে হবে। এ বিষয়ে শাস্ত্রে সর্ব্বত্র সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে: "ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ, যোষিৎসঙ্গাদ্ যথাপুংসো তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ"—ভাঃ ৩।৩১।৩৫, "তস্মাৎসঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ"—ভাঃ ১১।২৬।২৪, "স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরতঃ" —ভাঃ ১১।১৪।২৯, "পদাপি যুবতীং, ন স্পৃশেৎ দারবীমপি"—ভাঃ ১১।৮।১৩, "বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথাম্"—ভাঃ ৭।১২।৭, "সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ, হা হন্ত! হা হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু"—চৈঃ চঃ নাটক ৮।২৭।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও ছোট হরিদাসের প্রতি তাঁর কঠোর অনুশাসনের দ্বারা নর-নারীর আকর্ষণরূপ চিত্তবিকার ভজনপথে যে কতদূর বিঘ্ন-সঙ্কুল ও ভয়াবহ তা ভালভাবেই

প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ, ভক্তিসাধনের জীবন মরণ এই স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ সম্বন্ধের মধ্যেই নিহিত আছে—ভাষায় এ তত্ব সম্যকরূপে প্রকাশ করা অসম্ভব; সাধকগণ এ জিনিষ সাধনমার্গে উপলব্ধি করবেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ,—আর নিখিল জীব তাঁর তটস্থা শক্তির অনু অংশমাত্র—এ তত্ব হৃদয়ঙ্গম হ'লে পুরুষ-সাধক নিজেকে স্ত্রী বা শক্তির অংশরূপেই মনে করবেন, আর স্ত্রী-সাধিকাও শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র পুরুষ ব'লে জ্ঞান করবেন। বস্তুতঃ, যতদিন মায়াবদ্ধ জীবের এই স্ত্রী-পুরুষ-জ্ঞানে পারস্পরিক ভোগলালসা ও তজ্জনিত আকর্ষণবোধ থাকবে, ততদিন ভক্তি-সাধনা হয়না, হতে পারে না। অখণ্ডযোগে অবস্থিত সাধক রাগানুগামার্গ অনুসরণ করে আপন অন্তরে প্রকৃতি-ভাব জাগরণ করবেন, কারণ "সখী বিনা এই লীলায় নাহি অন্যের গতি"—চৈঃ চঃ ২·৮। তখন এই সাধন-জাগ্রত অন্তঃ-প্রকৃতি সাধকের বহিঃ-পুরুষত্বকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে—ফলে সেই সাধকের সমস্ত পুরুষ-প্রবৃত্তি লয়প্রাপ্ত হয়, পুরুষদেহ ধারণ করেও সেই সাধক তাঁর পুরুষোচিত মনোভাবগুলি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন; তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি জাগরিত হয়ে বহিঃপুরুষত্বকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে—বিজ্ঞানের ভাষায় negative charge জাগ্রত হয়ে positive charge-এর সন্নিহিত হয়ে পাশাপাশি অবস্থান ক'রে Di-pole এর সৃষ্টি করে, যার প্রকৃতি positive'ও নয়, negative'ও নয়, পরন্তু সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র সত্তা, যার positive বা negative কোনো charge এর দ্বারাই আকৃষ্ট হবার আর সম্ভাবনা রইল না; যা' Single-charge-রূপ মায়াবদ্ধ জীব-রূপ পরিত্যাগ ক'রে সেই Great Di-pole বা মহাচুম্বকরূপী শ্রীভগবানের আকর্ষণের পরিধির মধ্যে এসে পড়ল। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সেই সাধকপুরুষ বা সাধিকা নারীর 'নর-নারী' এই মিথ্যা ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। পুরুষ হয়েও পুরুষ সাধক নারী কর্তৃক আর আকৃষ্ট হননা এবং স্ত্রী-সাধিকাও পুরুষের প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করেন না। পুরুষ সাধক তখন আর পুরুষ থাকলেন না, বহিঃপুরুষ ও অন্তঃপ্রকৃতির অতি নৈকট্য-অবস্থানে, বা juxta-position-এ 'রসরাজ মহাভাবময়' হয়ে যান। স্ত্রী-সাধিকাও তখন আর শুধু স্ত্রী থাকেন না, পরন্তু একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে স্থাপন করে তিনিও মিলিততনু হয়ে যান। গণিতের সূত্রের ন্যায় ও বিজ্ঞানের সত্যের মতই—এ অভ্রান্ত সত্য। একেই উদ্দেশ্য করে মহাপ্রভু গোপীভাবাশ্রিত রাগানুগামার্গের সিদ্ধসাধক রায় রামানন্দ সম্বন্ধে ব'লেছেন "নির্বিকার দেহমন, কাষ্ঠ-পাষাণসম; আশ্চর্য্য! তরুণীস্পর্শে নির্বিকার মন"—চৈঃ চঃ ৩৫।

বস্তুতঃ, গোপীভাবাশ্রিত কৃষ্ণ-প্রেমলাভ নরলোকে একপ্রকার অসম্ভব বল্লেই হয়। ধর্মশাস্ত্রপাঠে, ধর্মবিষয়ক আলোচনা, বক্তৃতাদিতে, এমনকি কোটিজন্ম নাম সঙ্কীর্তন

করেও এ দুর্লভ ধন লাভ হয় না। যদি কেউ বলে তার গোপী-অনুগত-ভাব লাভ হয়েছে, তবে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে যুবতী সুন্দরী রমণীর কষ্টিপাথরে। যদি রামানন্দের মত "একে দেবদাসী, আরে সুন্দরী তরুণী,—তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি; স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ, গুহ্য অঙ্গের হয় তাঁহা দর্শন-স্পর্শন; তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন"—চৈঃ চঃ-৩।৫। কেউ এইরূপ "কাষ্ঠপাষাণসম" নির্বিকার মন ধারণ করতে পারেন, তবেই তাঁর পক্ষে গোপী-অনুগত-ভজনে সিদ্ধিলাভ সম্ভব। এই ভাব-সিদ্ধ প্রভু নরহরি ব'লেছেন, "বাহিরে পুরুষ আকার, অন্তরে প্রকৃতি" না হলে গোপী-অনুগত-ভজনে সিদ্ধি হয় না। যুবতী-স্ত্রীর কষ্টি-পাথরে এই মহাপুরুষের পরীক্ষা করতে হবে। রায় রামানন্দের মত তিনি যদি নির্বিকার হন, তবে একমাত্র তিনিই সেইভাবে ভাবিত জানতে হবে—অন্যথা, আর কেউই এভাবের দাবী করতে পারে না। এই ভাবলব্ধ সিদ্ধসাধকের অন্তরে স্বসুখকামনার নামগন্ধও থাকবেনা, "নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার" এবং "কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য"—চৈঃ চঃ—২।৮।

মধুরভাবসিদ্ধ ভক্তের উপরিউক্ত নিশ্চিত পরীক্ষা ব্যতীতও আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ, তাঁর সমস্ত তনু-রুচি, মুখ-সুষমা কিশোরী তরুণীর লাবণ্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত। তাঁকে শুধু পুরুষ বা শুধুই রমণী ব'লে মনে হবে না—তিনি "না সো রমণ, না হাম রমণী" "রসরাজ-মহাভাব" মিলিতরূপে প্রতিভাত হবেন।

বিজ্ঞানের ভাষায় তিনি সাধারণ জীবের মত positive electricityও নন, negativeও নন, পরন্তু উভয়ের সন্নিহিত-অবস্থানে সৃষ্ট Di-pole। তাঁর সমস্ত সত্তায় পুরুষ ও রমণী যেন ওত-প্রোতভাবে বিরাজিত হয়ে পাশাপাশি অতি নিকট সন্নিধানে বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয়, যেন রমণীরঞ্জন পুরুষোত্তমের পৌরুষ স্ফুরিত হচ্ছে, আবার পরক্ষণেই দেখা যায় যেন সেখানে কিশোরী কুমারীর তরুণিমা তরঙ্গায়িত হচ্ছে। প্রকৃতি-পুরুষালিঙ্গিত এই অপূর্ব্ব যুগলমাধুর্য্যসুধা যিনি আস্বাদন করেছেন, একমাত্র তিনিই জানেন এ কী বস্তু! উভয়ের সমাবেশে এই যুগলিত তনু, এই যুগল মধুর সৌন্দর্য্য আবার নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, 'অনুসবাভিনব', প্রতিক্ষণে নূতন ভাব ও নূতন মাধুর্য্য পরিগ্রহ করে। প্রভুনরহরির শ্রীঅঙ্গ-শোভায় এই প্রকৃতি-পুরুষের যুগল লীলা-উৎসব নিত্য নব নব মাধুর্য্য ও মহিমায় বিকাশত হয়ে উঠত —এ প্রত্যক্ষ দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

গোপী-অনুগত-সাধনের প্রয়োজনীয়তা

গোপী-অনুগত-সাধনে সিদ্ধিলাভ করলে যে-অমৃত ফল ফলে, তা' স্বাদাধিক্যে চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেও, তার সাধন যে "সর্ব্বথৈব দুরূহ" তা সকলেই বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এই দুর্লভ ফললাভের জন্য এত প্রাণপাত পরিশ্রম, এত কৃচ্ছ্রসাধনের কী প্রয়োজনীয়তা আছে? এর উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং মহাপ্রভু। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তিন বাঞ্ছা-পূরণ অভিলাষে মনে মনে সম্যক আলোচনা করে স্থির করলেন, "বিজাতীয়ভাবে নহে তাহা আস্বাদন" চৈঃ চঃ ১।৪, অর্থাৎ গোপীভাব অঙ্গীকার ব্যতীত সে বাঞ্ছা পূর্ণ হবার আর কোনো উপায় নেই। রাধাকৃষ্ণলীলারস সম্যকভাবে আস্বাদনের উপায় জিজ্ঞাসাচ্ছলে রামানন্দ রায়ের মুখেও প্রচার করলেন, "গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে, ভজিলেই নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে"—চৈঃ চঃ ২।৮। অতএব প্রভু নরহরি অকারণে এই দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গোপী-অনুগত ভাবামৃতে লুব্ধ হননি। কলিযুগে যে-সাধন-কৃচ্ছ্র জীবের শক্তি ও সাধ্যের বহির্ভূত, সেই দুরূহ সাধন-সোপান-শ্রেণী স্তরে স্তরে একটি একটি করে অতিক্রম করে আপন 'অখণ্ড-যোগে' অবিচলিত থেকে সাধনের উচ্চতমস্তর—নরলোকে অপ্রাপ্য ("সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়" চৈঃ চঃ ২।২), কোটিমুক্তমধ্যেও দুর্লভ, দুরাপ, "জাম্বুনদহেমতুল্য", অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবন-লীলা-আচরণ পর্য্যালোচনা করে যা' কিছু সংগৃহীত হয়েছে, তাতেই এই নিগূঢ় সাধন-প্রণালী ও তার স্বরূপ সম্বন্ধে অভিনব আলোক-সম্পাত হয়েছে। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—এই ঋষি-বাক্য স্মরণ করে এই 'কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী মহাজনের আচরিত পন্থা কলিহত জীবজগতের মোহ-অন্ধকার বিদূরিত করে অমৃতের পথোদ্দেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করুক, শুধু এই প্রার্থনাই করি।

সিদ্ধাবস্থা

বাল্যে ধ্রুবযোগ ও যৌবনে সাধনভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন ক'রে অখণ্ডযোগে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে প্রভু নরহরি আপন আচরণ দ্বারা ভক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বস্তুতঃ, লোকোত্তর মহাপুরুষগণ শাস্ত্র ও যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখেন না—শাস্ত্রসমূহই তাঁদের আচরণ ও পন্থা অনুসরণ ক'রে যুগে যুগে রূপ পরিগ্রহ করে। সাধারণ মানুষ যা' কখনো দেখেনি, শোনেনি বা কল্পনাও করেনি, মহাপুরুষগণ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ও অননুভবনীয় লোকের সন্ধান প্রদান করেন। তাঁদের আচরণ,

তাঁদের ক্রিয়াকলাপ, তাঁদের বাক্য সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য ব'লে প্রতীয়মান হয়; তথাপি তাঁদের চরিত্রের প্রভাব অমোঘ। তাঁদের দেহ, মন ও ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়েই শ্রীভগবানের শক্তি আত্মপ্রকট ক'রে থাকে। তাঁরা যা' বলেন, তাই শ্রীভগবানের বাণী, তাঁরা যা' কিছু কার্য্য করেন, সমস্তই ভগবৎ-প্রেরণায় অনুপ্রেরিত। এই নিখিল বিশ্বের পরমাত্মা যদি কোথাও আত্মপ্রকট করতে পারেন, তবে একমাত্র তাঁদের মধ্যেই সম্ভব। তাঁরাই শ্রীভগবানের 'শক্ত্যাবেশ', তাঁদের ভিতর দিয়েই শ্রীভগবান্ ক্রিয়া করেন—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি"—ভাঃ ৯।৪।৬৮
"ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান,
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম"—চৈঃ চঃ ১।১।৩০
"জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু-চৈত্ত্যরূপে.
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ—মহান্তস্বরূপে"—চৈঃ চঃ ১।১।২৯

সুতরাং শ্রীভগবান বলে যদি কাউকে পূজা করতে হয় তো তাঁদেরই করতে হবে।

সাধনভক্তিতে অনর্থ-নিবৃত্তির পর অন্তঃকরণ "তদ্ভাবভাবিতঃ" হলে মধুররসের সাধকের চিত্তে কৃষ্ণ-রতির উদয় হয়। এই মধুরা রতি ক্রমে গাঢ় হয়ে 'প্রেম'-পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। কৃষ্ণপ্রেমলাভ হলে সাধকের আর পতনের আশঙ্কা থাকে না—অখণ্ডযোগে তাঁর স্থিতি-লাভ হয়ে থাকে।

সিদ্ধাবস্থার লক্ষণগুলি একে একে উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) অবিচ্ছিন্ন আনন্দধারা।

প্রভু নরহরি এই 'নৃলোকে অপ্রাপ্য' কৃষ্ণ প্রেমলাভ করে, সেই দুরবগাহ প্রেমসমুদ্রে অবগাহন ক'রে জগতকে তার মাহাত্ম্য জ্ঞাত করালেন। তাঁর প্রতি প্রেমচেষ্টায় সেই প্রেম ময়ের করুণামৃতই বর্ষিত হতে লাগল। এ প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা সম্ভবেনা—এ প্রেম সেই বস্তু—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" প্রেমিক ভক্তের আচরণেই কেবল আমরা তার কিছু কিছু আভাস পাই।

বস্তুতঃ, "অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্"—নারদভক্তিসূত্র-৫১। এ "মূকাস্বাদনবৎ"—নাঃ ভঃ সূঃ-৫২, অর্থাৎ বোবা যেরূপ মিষ্টরস আস্বাদন করে আনন্দে গদগদ হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে রসের ব্যাখ্যা করতে না পেরে কেবল হাস্য করে, এবং তার মুখ-চোখের ভঙ্গী দ্বারাই সে সেই আনন্দের অভিব্যক্তি করতে চেষ্টা করে, প্রেমিকও ঠিক সেইরূপ; অর্থাৎ স্বয়ং প্রেম আস্বাদন করেও মুখে তা' প্রকাশ করতে পারেন না,

শুধু তাঁর বাহ্যিক চেষ্টায় তার কিছু অভিব্যক্তি হয়ে থাকে—"হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।"

অধিকারী-বিশেষে এই প্রেম "প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে"—নারদভক্তিসূত্র। বুদ্ধি, বিচার, কল্পনা বা ভাষা-নৈপুণ্য দ্বারা এই প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না; একমাত্র কোনো সিদ্ধ সাধকের প্রেমে-মাতোয়ারা অবস্থায় তাঁর কায়িক বাচনিক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা প্রেমের বাহ্যিক লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই প্রেম "গুণরহিতং কামনা-রহিতং প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমম্, অবিচ্ছিন্নং, সূক্ষ্মতরম্, অনুভবরূপম্"—নারদভক্তিসূত্র -৫৪। বাস্তবিক, কৃষ্ণপ্রেম যে গুণরহিত ও কামনারহিত হবে তা সুস্পষ্ট। কৃষ্ণপ্রেমের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল এই যে এ "অবিচ্ছিন্ন"। প্রভু নরহরির জীবনলীলার সহিত যে কেউ পরিচিত আছেন, তিনিই অবগত আছেন যে তিনি যেন আনন্দের মূর্ত্ত-বিগ্রহ ছিলেন, কেউ কোনো কালে তাঁর মধ্যে একক্ষণও আনন্দের অভাব দেখেনি—তিনি সেই ভাগবতোক্ত "ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ"—১১।২।৫৪, এবং এ আনন্দ সেই ভগবৎপাদপদ্মজ "আনন্দসংপ্লবম্"-১০।৮৩।৪। এমন কি মনে হত, তাঁর সমস্ত অঙ্গই যেন আনন্দ দিয়ে গড়া, 'চিদ্ঘনানন্দমূর্ত্তিঃ'। শুধু তাই নয়, তাঁর আনন্দময় বিগ্রহ থেকে যেন শতধারায় সেই অপ্রাকৃত আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়ে নিকটস্থ ভক্তহৃদয় প্লাবিত ক'রে চতুষ্পার্শ্বের ইতর জীবকেও স্পর্শ করত। সংসারের শত অশান্তি, নিরানন্দপীড়িত চিত্তভার নিয়ে যে যখনই তাঁর শ্রীচরণসমীপে এসেছে, তাঁর প্রাণারাম মূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই তার সকল জ্বালা জুড়িয়ে গেছে, এক অপারসীম আনন্দে তার হৃদয় প্লাবিত হয়েছে। সে-আনন্দ যেন ইহজগতের নয়,—তাই নিমিষেই হৃদয়ের সব তাপ, সব দুঃখবেদনা, সব ভার-বোঝা, সব দুশ্চিন্তা মিলিয়ে যেত এবং এক অনাবিল, অনাস্বাদিত আনন্দ সুধায় সমস্ত হৃদয় অভিষিক্ত হয়ে যেত। সত্যই সে সুধা-স্বরূপ। অমৃতের কীরূপ আস্বাদ তা আমরা জানি না, কিন্তু এই যে আনন্দ, এর মধুরত্ব, এর অভিনবত্ব, এর ত্রিতাপজ্বালা-জুড়ানো শান্তি—এসব যাদের প্রত্যক্ষ লাভ হয়েছে, তারাই জানে, এ আনন্দই বোধহয় সুধা, অমৃত বোধহয় এর চেয়ে আস্বাদ্য, এর চেয়ে তৃপ্তিদায়ক, এর চেয়ে শান্তিপ্রদ নয়—এ আনন্দ ইহজগতে কেউ কোথাও পায়নি, জানেনি, শোনেনি ইতিপূর্ব্বে, এ আনন্দ বোধহয় সেই "আনন্দ-সংপ্লবম্" এর চিন্ময় আনন্দ, সেই হ্লাদিনী শক্তির "কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিঃ"—প্রীতিসন্দর্ভ। সে আনন্দ ইহজগতের বাসনা-মলিন সব জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে চিরশান্তি ও চিরতৃপ্তির হিল্লোল প্রবাহিত করত। তাঁর অঙ্গে অঙ্গে এই আনন্দধারা যেন উছলে উছলে পড়ত; তাঁর করুণা-নয়ন-সম্পাতে, তাঁর মধুমাখা কণ্ঠধ্বনিতে, তাঁর ললিত-তনু-

লাবণ্যে, তাঁর অসীম দীনতাপূর্ণ আচরণে, তাঁর সদয় মধুর ব্যবহারে—এই আনন্দ স্রোতই যেন প্রবাহিত হত। তাঁর সুধা-মধুর 'হরি-বোল'-ধ্বনিতে, তাঁর প্রাণভরা আকুল 'মা'-'মা' আহ্বানে, তাঁর স্নেহ-মধুর সম্ভাষণে, তাঁর অমৃত-স্রাবী সঙ্গীত লহরীতে যে আনন্দলোক উন্মুক্ত করে দিত, তা প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তগণ অবগত আছেন। ভরা-ভাদ্রের নদীর ন্যায় তাঁর হৃদয় এই প্রেমানন্দসুধায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ,—আপনার মধ্যে আপনাকে ধরে রাখতে না পেরে সে যেন ছাপিয়ে পড়ত, তাঁর সকল কায়িক, বাচনিক ও মানসিক চেষ্টায় এই পরিপূর্ণ আনন্দের ঢেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। এই আনন্দোচ্ছ্বাসের কোনো বিরতি ছিল না, উপরন্তু এ প্রতিক্ষণে নব নব মাধুর্যে নিত্য নবায়মান হয়ে বর্দ্ধিত হত। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক দর্শনার্থী মানুষ থেকে ইতর পশু পক্ষী কীটপতঙ্গাদি পর্য্যন্ত যাবতীয় বিশ্বসৃষ্টিকে এই প্রেমময়চিত্ত মহাপুরুষ কত গভীর প্রেমে, কত স্নেহে, কী-করুণার বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন—তা' তাঁর ভক্তগণ কখনও বিস্মৃত হবেন না। কখনো মুহূর্ত্তের জন্যও কেউ তাঁকে নিরানন্দ হতে দেখেনি। পরিচিত-অপরিচিত, বালক-বৃদ্ধ-যুবা যে কেউ তাঁর দর্শনে আসত, সকলেই তাঁর দর্শনে, তাঁর মধুর কণ্ঠ শুনে ও কোমল, করুণ আচরণে বিস্মিত ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ত। অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও তাঁর দর্শনলাভের পর বুঝত, যেন কোথায় কী একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে, যেন কোথা থেকে একটা আনন্দ-তড়িৎপুঞ্জ তার কঠিন চিত্তে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করেছে। এই প্রভাবিত তড়িৎ বা Induced current থেকে কেউই মুক্ত হতে পারত না। একটি অপরিচিত কুকুর একটি নগণ্য বানর, এমন কি ব্যাঘ্র-সর্পাদি হিংস্র জন্তুও এই বিদ্যুৎ-পুঞ্জের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য হত। বস্তুতঃ, কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই এই—"সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন, আপনার বলে করে সর্ব্ব আকর্ষণ"—চৈঃ চঃ ২।২৪। প্রাকৃত আনন্দের উৎস সীমাবদ্ধ। সেইজন্য এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হয়। প্রকৃতপক্ষে তাকে আনন্দই বলে না, কারণ তা অন্তিমে দুঃখপ্রদ, "নিত্যার্ত্তিদ"-ভাঃ ১১।৩।১৯ পরন্তু, অপ্রাকৃত আনন্দের উৎস অসীম, শাশ্বত ও চিন্ময়—তিনি "নিত্যো নিত্যানাম্," —কঠোপনিষদ ২।২।১৩, এবং "আনন্দ সংপ্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্"-ভাঃ ১০।৮৩।৪ এ আনন্দ তাই অবিচ্ছিন্ন, অহৈতুকী ও অনুসবাভিনব, অর্থাৎ নিত্যনূতন। প্রভুপাদের লীলায় আমরা এর বহুল প্রকাশ লক্ষ্য করি। তাঁর আনন্দ ধারা যেমন বিশুদ্ধ তেমনি নিরবচ্ছিন্ন ও নিত্যনবনবায়মান।

আমরা দেখেছি, প্রভু যখন আপন মনে থাকতেন, যখন বাইরের কোনো প্রয়োজনীয় কাজে তাঁকে বিব্রত থাকতে না হত, তখন তিনি নির্জনে পিপীলিকা, মাকড়সা, আরশুলা,

ইঁদুর, বিড়াল, প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের সহিত বালকের মত খেলা করতেন, তাদের তৃপ্ত করে খাওয়াতেন, তাদের ভাবানুরূপ আনন্দদান করতেন। একেই বলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা। এ আনন্দ স্রোতের কোনো বিরতি নেই, কারণ এর উৎস চিরন্তন, শাশ্বত ও অসীম, এ আনন্দ অখণ্ড, এ 'আপনি ভাসিয়া জগৎ ভাসায়।' এই নিত্য আনন্দময় মহাপুরুষের কথাই বলেছেন নারদভক্তিসূত্র—

"স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারয়তি"—৫০

(২) বাতুল চেষ্টা

কৃষ্ণপ্রেমলাভে যে নিরবচ্ছিন্ন অপ্রাকৃত আনন্দধারার আস্বাদন হয়, তার ফলে তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সাধারণ প্রাকৃত মনের কার্য্য-কারণসম্বন্ধবিহীন হয়ে পড়ে। এইজন্য লোক সমুখে তাঁর সমস্ত চেষ্টাই বালকবৎ উদ্দেশ্যবিহীন ও উন্মাদবৎ অসংবদ্ধ ও অর্থহীন ব'লে প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমধুপানে তিনি এরূপ আত্মবিস্মৃত হন যে, কোনো সময়েই প্রাকৃত জনের ন্যায় আচরণ করা তাঁর সম্ভব হয় না, তিনি বালক ও বাতুল হতে বাধ্য হন। প্রভু নরহরির জীবন-লীলার সহিত যিনি পরিচিত আছেন, তিনিই জানেন প্রভুর সমস্ত আচরণই বাতুল ও বালকের অর্থহীন ক্রীড়ার ন্যায়। তাঁর প্রতি কথায়, তাঁর প্রতি ভাবভঙ্গীতে, তাঁর প্রত্যেক মনোবৃত্তিতে যেন এক অবধূত বালক বাউলের বেশে নিছক খুশীর আবেগে নৃত্য ক'রে বেড়াত, এ খুশীর সীমা নেই, এ নৃত্যের বিরাম নেই। সে-বালক আপন নৃত্যে আপনি পাগল হয়ে জগৎকে পাগল করেছে। এ নৃত্যে কালাকাল, স্থানাস্থান জ্ঞান ছিল না। যখনই যেখানে তিনি লীলা করেছেন, সর্ব্বত্রই তাঁর মধ্যে সে-চিরন্তন বাউল বালকবেশে নৃত্য ক'রে জগৎকে নাচিয়েছে। এই ভাবগম্ভীর মহাপুরুষ যখনই কৃষ্ণনামগানে উন্মত্ত হয়ে মধুর মধুর নৃত্য করতেন, তখন কোথায় থাকত তাঁর গাম্ভীর্য্য, কোথায় লুকাত তাঁর ঐশ্বর্য্য! পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায়, ললিততনুর লালিত্যে, অপূর্ব্ব আনন্দশ্রীমণ্ডিত মুখমণ্ডলে, অমৃত বিজয়িহাস্যে এবং তাঁর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লীলা-ভঙ্গীতে যে অনুপম মাধুর্য্য বিকশিত হয়ে উঠত, ভাষা তা প্রকাশ করতে অক্ষম। তিনি যে সব উপদেশ প্রদান করতেন, তাও উন্মাদের প্রলাপের ন্যায় অসংবদ্ধ ও অর্থহীন ব'লে মনে হত। একমাত্র নিত্যসঙ্গী একান্ত ভক্তগণ ব্যতীত অপর কেউ তাঁর বাক্য ও কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝতে পারত না। বঙ্গদেশের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্যোমকেশবাবু প্রভুর দর্শনে এসে অতিশয় অভিনিবেশ সহকারে তাঁর উপদেশবাণী শ্রবণ করেও তার কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ না হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ইনি পাগলের মত কী প্রলাপ বকছেন? অবশেষে তাঁকে সেই প্রলাপময় বাণীর গূঢ়ার্থ বুঝিয়ে দিলে, তিনি সবিনয়ে স্বীকার

করেছিলেন, "সত্যই মহাপুরুষের বাক্য সাধারণ মানুষের দুর্বোধ্য!" বস্তুতঃ, এই-ই সত্য; দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমিকের স্বরূপই এই। প্রভু নরহরির বাক্য ও আচরণ এই জন্যই সাধারণ মানবের দুর্বোধ্য হয়ে আছে। কারণ তাঁর ভাষা সাধারণের ভাষা নয়— এ প্রেমোন্মাদের ভাষা,—ভক্তিদ্বারাই এ ভাষা, এ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রভু এই প্রেমেই অবধূত হয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমি পাগল, আমার কথা কে নেবে? কে এমন পাগল আছে যে এ পাগলের কথা শুনবে?" বস্তুতঃ, জহুরী না হলে কেউ জহর চিনতে পারে না, অন্ততঃ এই ভক্তি-সাধন-মার্গে কিছুদুর অগ্রসর না হলে, সে-পথের পথিকের ভাষা বুঝবে কেমন করে? এ জগতে মনোমত পাগল না পেয়েই, মহাপ্রভু দ্বিতীয় পাগল রায় রামানন্দকে দুঃখ করে বলেছিলেন:

> "গুপ্তে রাখিহ, কাঁহা না করিও প্রকাশ,
> আমার বাতুল-চেষ্টা, লোকে উপহাস।
> আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল—
> অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল।"—চৈঃ চঃ ২।৮

'আত্মারাম'-শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়ে সনাতন গোস্বামীকে ব'লেছিলেন।

> "এই তো করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান,
> বাতুলের প্রলাপ করি' কে করে প্রমাণ?
> আমা হেন যেবা কেহ বাতুল হয়,—
> এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ সে জানয়।"—চৈঃ চঃ ২।২৪

শ্রীশ্রীনরহরি প্রভু ও মহাপ্রভুর ন্যায় বাতুল ছিলেন। কৃষ্ণপ্রেম লক্ষণ-প্রসঙ্গে চরিতামৃত ব'লেছেন:

> "প্রেমের স্বভাবে ভক্ত হাসে, কাঁদে গায়,
> উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায়"—১।৭

এবং

> "এইপ্রেমা যার চিত্তে করয়ে উদয়,
> তার বাক্য ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"—২।২৩

শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন, "বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ, কুশলো জড়বচ্চরেৎ, বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্"—১১।১৮।২৯, এবং "হসত্যথোরোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ"—১১।২।৪০

নারদভক্তিসূত্র সুস্পষ্টভাবে বলছেন:

"যদ্‌জ্ঞানোন্মত্তো ভবতি"—৬।

বালক বৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

অখণ্ডযোগসিদ্ধ মহাপুরুষের একটি অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ হল—তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌকুমার্য্য। জীবনের প্রথম প্রভাতে আপনার বিকাশোন্মুখ হৃদয়-মুকুলটি যিনি পরম প্রেমময়ের প্রেমোদ্দেশে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করেছেন, বিষয়বাসনার আতপতাপে যে কোমল হৃদয়-কুসুম মুহূর্ত্তের জন্যও পরিম্লান হয়নি, সেই চিরনবীন, চিরপবিত্র হৃদয়টি নিয়ে তিনি অনন্তকাল ধ'রে চিরকুমার, অনাদিকালের চির-বালক। কালের অপ্রতিহত গতিতে দিবস গত হয়ে যামিনী আসে, যামিনী প্রভাত হয়ে দিবস আসে, কালের এই দুর্নিবার বেগে বিশ্ব-সৃষ্টি তিল তিল ক'রে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে চালিত হচ্ছে, "কালেন সর্ব্বত্র গভীর-রংহসা"—ভাঃ ১।৫।১৮। এই নিশ্চিত ধ্বংস, এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। কুসুম মুকুলিত হয়, প্রস্ফুটিত হয়, ঝ'রে পড়ে; বালক কিশোর হয়, আশা-আকাঙ্ক্ষাময় যৌবনে পদার্পণ করে—কিন্তু কালক্রমে সে যৌবন চলে যায়, স্বপ্ন টুটে যায়। বিশ্বের সর্ব্বত্র এই ধ্বংস-লীলা, কালচক্রের এই অব্যাহত গতি থেকে কেউ কোনো দিন পরিত্রাণ পায়নি। কিন্তু একমাত্র শ্রীভগবানের একান্ত ভক্তগণই এই অপ্রতিহত কালচক্রের প্রভাব থেকে মুক্ত; কালের পরিবর্ত্তন তাদের স্পর্শ করতে পারে না, কালগতি তাদের সংস্পর্শে স্তব্ধ হয়ে যায়। বাল্যে যেদিন তাঁরা শ্রীভগবৎ-পদাম্বুজে তাঁদের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন, সেদিন থেকেই তাঁরা অপরিবর্ত্তনীয়, চিরদিনই তাঁরা সেই বালক। তাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই চির-কৌমার্য্যের সৌকুমার্য্য, কণ্ঠস্বরে সেই শিশুসুলভ সুমিষ্টতা। মনে সেই বালবৎ নির্ব্বিকারতা, সেই চাপল্য, সেই সারল্য, সেই মধুর লীলামাধুরী। এই চিরন্তন বালকের সব লক্ষণ, সব ভাবই প্রভু নরহরির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, কণ্ঠস্বরে ও অন্তরে পরিপূর্ণরূপে প্রকট ছিল—এ দর্শন, এ অনুভূতিলাভ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের হয়েছে।

এর যে কোনো একটির অভাব হলেই, কোনো তথাকথিত মহাপুরুষ আর 'মহাপুরুষ'-পদবাচ্য থাকলেন না। কারণ, এই অভাবের দ্বারা নিশ্চিতভাবে সূচিত হয় যে, তাঁর বালকহৃদয় 'অন্যাভিলাষ' পূরণ দ্বারা মলিন হয়েছে, তাঁর অখণ্ডযোগ সাধন খণ্ডিত হয়েছে। তাই তাঁর অঙ্গে কালচক্রের সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন-চিহ্ন, দেহে শিশু-সৌকুমার্য্যের অভাব, কণ্ঠে শিশুর মধুর স্বর পরিবর্ত্তিত, মনোমধ্যে বিকার,—'বাসনান্তর' পূরণের ক্ষতচিহ্ন সর্ব্বত্র তার ছাপ রেখেছে। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমিকের শিশু-হৃদয় কালপ্রভাবে অপরিবর্ত্তিত থেকে তাঁকে যে চির-কৌমার্য্য-সুষমায় মহীয়ান্ করে তোলে, শ্রীমদ্ভাগবত তার সাক্ষ্য দিচ্ছে :

"ন কর্হিচিৎ মৎপরাঃ শান্তরূপে, নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ,
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্"—৩।২৫।৩৮

বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রেমলাভের এই হল সুনিশ্চিত লক্ষণ। একবার এই দুর্লভ প্রেমলাভ করলে, তার আর বিরতি হয়না। সেই প্রেমিক চিরবালক, চিরকিশোরই থাকেন। কৃষ্ণপ্রেমের এই অবিচ্ছিন্নতাকেই কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন :

"যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ"—২।১

(৪) প্রেমের অভিব্যক্তি করুণায়

এক্ষণে দেখা যাক, এই নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণপ্রেম কীভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ প্রেম আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ। স্বসুখবাসনাগন্ধ-বিহীন হওয়াতে এই প্রেম সর্ব্বভাবে কৃষ্ণসুখসেবায় নিয়োজিত হয়। এই জগৎ সেই অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ ; তাই এই জগতের জীবের প্রতি নির্ব্বিচার প্রেম, মৈত্রী ও করুণায় সে আত্মপ্রকট করে। বহির্জগতে দেখা যায় যে কোনো ব্যক্তি ক্রোড়পতি হয়েও উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কিছু দান করে নিছক প্রচার-যন্ত্রের সাহায্যে নিজে মহাদানী ব'লে পরিচিত হয়ে থাকে। সংবাদপত্র আদি প্রচার-অভিযানের দ্বারা এ জগতে কত অসৎ, স্বার্থপর, ব্যবসায়ী, এমন কি সমাজবিরোধী পর্য্যন্ত দাতা, ত্রাতা, এমন কি মহাপুরুষ বা সাধু ব'লেও খ্যাতিলাভ করে থাকে। অনুসন্ধান করলেই জানা যাবে, এরা সকলেই সম্পূর্ণ স্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে জনসমাজকে প্রবঞ্চিত করে অর্থ, শক্তি ও প্রভাব-প্রয়োগে জগতে সুনাম ও সুখ্যাতির উচ্চতম শিখরে পর্য্যন্ত আরোহণ করে থাকে। কিন্তু যে নিজে ভিখারী হয়ে আপনার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল অপর এক অনাথ আতুরকে সমর্পণ করে নিজে উপবাসী থাকে, কিংবা সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুনীর মত নিজের ছিন্ন চীর-বস্ত্রখানি দান করে বৃক্ষ-লতার আড়ালে গিয়ে নিজ-লজ্জা নিবারণ করে, এই বহির্জগতে তার দানশীলতার, তার উদারতার কেউ খোঁজ রাখে না—কিন্তু জগৎ স্বামীর দরবারে সে-সংবাদ সর্ব্বাগ্রে পৌঁছায়। প্রভু নরহরির দানশীলতা ছিল এইরূপ ভিখারীর ভিক্ষা দান। তাঁর অন্তরে প্রেমের যে সমুদ্রে তার অসীম সুধারাশি উত্তালতরঙ্গভঙ্গে নিত্য আন্দোলিত হ'ত, সে প্রেমামৃতনিধি উচ্ছলিত হয়ে উপছে পড়ত বহির্জগতে জীবের উপর বিগলিত করুণা ধারায়, পরিস্ফুট হত মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির নির্ব্বিচার জীব সেবায়। তাঁর অন্তরস্থিত প্রেমানন্দের উত্তালতরঙ্গমালা কল্লোলিত হয়ে উঠত নিখিল জীবের সেবা-পরিতৃপ্তির আনন্দ কোলাহলে, তাঁর প্রেমসুধারাশি ঘৃত হয়ে আহুতি দান করত ক্ষুধিত জীবের ক্ষুধানলে, বুভুক্ষু ও আর্ত্তজীবের সেবা যজ্ঞে তাঁর প্রেম করুণারূপে মূর্ত্ত হয়ে উঠত।

তাই বালকবৃদ্ধযুবা যে কেউ তাঁর দর্শনার্থী হয়ে এসেছে, প্রত্যেককেই তিনি দুই উদার হস্তে ভূরি ভূরি মিষ্টান্ন ও প্রসাদান্ন বিতরণ করেছেন। মানুষ তো বটেই, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি কেউই এই দান মহাযজ্ঞে বঞ্চিত হতনা। দাতা ও ভোক্তা

অন্তরে ও তার চতুর্দ্দিকের আবহাওয়ায় যে-আনন্দের হিল্লোল কল্লোলিত হয়ে উঠত—সে আনন্দ, সে তৃপ্তি, সে শান্তি এই প্রাকৃত জগতে সম্ভবেনা।

তাঁর অন্তঃস্থিত এই বিরাম-বিহীন প্রেমসুধাধারাই যেন করুণার নির্ঝর রূপে পরিণত হয়ে এই অবিরাম অন্ন বিতরণের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠত। মনে হত—এ যেন একটা জীবন্ত আনন্দ, দু'হাতের মিষ্টান্ন-বর্ষণে সে যেন প্রাণশীল হয়ে উঠত। অথচ, এই নিঃস্বার্থ প্রেম, এই অকপট স্নেহ—যে স্নেহ প্রতিদান চায়না, যে স্নেহ বিচার করে না, যে স্নেহ উচ্চ-নীচ, মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীতে কোনো ভেদ দেখেনা, যে প্রেমের সকলেই অংশভাগী, সূর্য্য কিরণের মতই যে করুণা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে, সে-প্রেমের মহিমা, সে স্নেহের অকৃত্রিমতা, সে মনের উদারতার ক'জন সন্ধান রাখে ? সে-প্রেম যাঁর চরণে অর্পিত, সেই প্রেমময়ই সে-প্রেমের মহিমা বুঝবেন। এই মায়া-মোহাচ্ছন্ন পৃথিবীর কেই বা সেই অপ্রাকৃত প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করবে ?

প্রভু নরহরির এই নিরবচ্ছিন্ন প্রেমধারা করুণাস্রোতে প্রবাহিত হয়ে জীবমাত্রকেই শুধু আনন্দদান করেই ক্ষান্ত হতনা—তাদের সেবা দ্বারা পরিতৃপ্ত করে তাদের অন্তর্মুখী করবার প্রয়াসেও নিযুক্ত ছিল। মায়ামোহে অজ্ঞানান্ধ জীবের উদ্ধার-বাসনা শ্রীভগবানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—"জীব নিস্তারিব, এই ঈশ্বর-স্বভাব"—চৈঃ চঃ ৩।২। শ্রীভগবানের যে-শক্তি মহাপুরুষের জীবনলীলার মধ্যে কার্য্য করে, তাতেই এই করুণা-গুণ অন্তর্নিহিত থাকে। এই করুণায় বিচার নেই, পাত্রাপাত্র ভেদ নেই, কালাকাল জ্ঞান নেই—যাকে সামনে পায় তাকেই স্রোতোবেগে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। প্রভুপাদের চরিত্রে এই স্বভাব-কারুণ্যগুণই সমভাবে, নিঃস্বার্থভাবে সকলের কল্যাণ সাধন করেছে। এই গুণকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন : "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ"। এই করুণা-প্রণোদিত হয়েই তিনি জীবমাত্রকেই সম্মান দিয়ে, সুমধুর বাক্য দ্বারা তুষ্ট করে, অসীম দৈন্যে তাকে মুগ্ধ ক'রে এবং সেবা দ্বারা পরিতৃপ্ত করে শ্রীহরিনামরূপ মহামন্ত্র দান করতেন। বস্তুতঃ বহির্জগতে জীব-সেবাই তাঁর মুখ্য ব্রত ছিল, এবং এই জীবসেবা তাঁর অন্তরের প্রেমানন্দেরই বহিঃপ্রকাশ, যে আনন্দ আপনার মধ্যে আপনাকে ধরে রাখতে না পেরে, জীবসেবায় রূপ পরিগ্রহ করত, অমূর্ত্ত আনন্দ মূর্ত্ত হয়ে উঠত। এই জীবসেবারূপ মহাযজ্ঞ শুধু যে প্রেমানন্দেরই অভিব্যক্তি তা নয়, এতে জীবের পারমার্থিক কল্যাণ কামনাও নিহিত ছিল। জীবের বাসনা ও জন্মার্জ্জিত সংস্কার তার প্রদত্ত 'অন্নে'ও সঞ্চারিত হয়ে থাকে ; এইজন্য মহাপ্রভু বলেছেন "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ"—চৈঃ চঃ ৩।৬। সাধুভক্তের প্রদত্ত অন্নে তাঁর গুণ ও বৃত্তি সঞ্চারিত হয়ে জীবের মনোমল দূরীভূত ক'রে তাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে। বস্তুতঃ, সাধুর অন্নের গুণের সীমা নেই। স্বয়ং মহাপ্রভু

'সনোড়িয়া' ব্রাহ্মণের প্রেমদর্শনে সেই ব্রাহ্মণ সমাজে অচল হলেও তার প্রদত্ত ভিক্ষা নিজে ইচ্ছা করে গ্রহণ করেছিলেন, "মোরে তুমি ভিক্ষা দাও, এই মোর শিক্ষা" —চৈঃ চঃ ২।৭। বস্তুতঃ সাধুর অন্নগুণে প্রাকৃত দেহ ও মনের বহুজন্মার্জ্জিত মলরাশি বিধৌত হয়ে তাকে ভক্তিরস গ্রহণে যোগ্য ক'রে তোলে। প্রভুর এই গভীর উদ্দেশ্য অধম জীবের বুঝবার সাধ্য নেই। কী-করুণায় যে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, জীবের এই নির্ব্বিচার, নিঃস্বার্থ কল্যাণ-কামনাই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রভু নরহরি যেমন আজীবন জীবসেবাব্রতে দীক্ষিত ছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাতেও তাই প্রত্যক্ষ দেখা যায়:

"প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন হীন জনে,
দুঃখিত কাঙাল আনি' করায় ভোজনে।
কাঙালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি—
'হরিবোল' বলি 'তার উপদেশ করি'।
'হরিবোল্' বলি 'কাঙাল প্রেমে ভাসি' যায়,
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌর রায়।"—চৈঃ চঃ-২।১৪

প্রভু নরহরির লীলায় অবিকল এই প্রকার আচরণই প্রতিপালিত হয়েছে। বিশেষতঃ, যে কেউ একদিনের জন্যও প্রভুর শ্রীহস্তের অন্ন পরিবেশন প্রাপ্ত হয়েছে, সেই নিশ্চিত-রূপে অবগত আছে—

"প্রভুর হাতে অন্ন অল্প নাহি আইসে—
একেক পাত্রে পঞ্চজনের ভক্ষ্য পরিবেশে।"— ৩।১১

অধিক কি, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত শ্রীশ্রীনরহরিপ্রভুর আচরণের এরূপ অপরূপ মিল বা ঐক্য দৃষ্ট হয় যে শ্রীশ্রীনরহরিভক্তগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত মহাপ্রভুর লীলা চারশত বৎসর পর পুনরায় প্রকট দেখবার সৌভাগ্যলাভ করেছেন, একথা বল্লে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবেনা।

(৫) অগত্যেকগতি ও হীনার্থাধিক সাধক

পূর্ব্ব আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে যে কৃষ্ণপ্রেম জীবজগতে করুণারূপেই অভিব্যক্ত হয়। এক্ষণে এই করুণার স্বরূপ আলোচনা করা যাক। যার কোনো বিষয়ে অভাব নেই, এরূপ লোককে দান করা করুণার পরিচায়ক নয়।

ত্রিভুবনে আপনার বলতে যার কেউ নেই এবং অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত যার কোনো শক্তি বা প্রভাব নেই, এরূপ অনাথ ও অসহায়ের আশ্রয় যিনি, তিনিই প্রকৃত কৃপাময়। প্রভু নরহরির আচরণে আমরা দেখতে পাই—এইরূপ দৈহিকভাবে

অক্ষম, অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, বৃদ্ধ, নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিবর্গই এই অগতির গতি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ প্রভু নরহরির চরণে শরণ নিত। প্রভুও তাদের পরমাত্মীয়ের মত, স্নেহশীলা জননীর মত, পরম আদরে আশ্রয় দিয়ে তাদের অশন, বসন, সুখ-স্বাচ্ছন্দাদির সর্ব্বপ্রকার ভার নিতেন। এরূপ কত আর্ত্ত, আতুর নর-নারী প্রভুর আশ্রয়ে শেষজীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে গেছে। এও লক্ষণীয়, প্রভুপদে শরণাপন্ন এই সব আতুর ও অনাথগণ যেরূপ শান্তিতে শেষের দিনগুলি কাটিয়ে গেছে, বহু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরও সে সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে। ভগবৎ-করুণার রীতিই এই। অহঙ্কার ও মদমত্ত ব্যক্তিবর্গকে এ স্পর্শ করেনা, পরন্তু দীনহীন, নিষ্কিঞ্চন ও কাঙালগণকেই এ করুণার সুধাধারা তার অমৃত স্পর্শে তাদের পবিত্র ও ধন্য করে। এইরূপে সর্ব্বজীবে সম-দৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও করুণায় স্বাভাবিক ধর্মবশতঃই প্রভু নরহরি দীনহীন ও কাঙাল ভক্তকেই অধিক স্নেহ করতেন। যার কেউ নেই, সে জানত, অবশেষে আমার প্রভু নরহরি আছেনই। দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে সর্ব্ব চিকিৎসায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে হতাশা-পীড়িত কোনো রোগী যখন প্রভুর চরণে শরণ নিয়ে বলত, "প্রভু, আমায় রক্ষা করতে হবে", তখন সেই আর্ত্তব্যক্তির মুখে চোখে প্রভুর কৃপাশক্তির উপর একটা সুদৃঢ় বিশ্বাসের ছাপ পরিলক্ষিত হ'ত। জীবন-যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হয়ে কোনো মানুষ যখন শ্রান্ত ক্লান্ত চিত্তে প্রভুর শীতল চরণচ্ছায়ায় শান্তির আশায় ছুটে আসত, তখন এ বিশ্বাস তার নিশ্চিত থাকত, যে এতদিনে চিরশান্তি, চিরকল্যাণের পথে এসেছি। বস্তুতঃ, তার আশা বিফল হতনা। এইরূপ অগণিত অখ্যাত, দরিদ্র, দীনহীন কাঙালের একমাত্র গতি ও শান্তিস্থল হয়ে তিনি প্রেমের ধর্ম্মপালন ক'রে শাস্ত্রবাক্য সফল করেছিলেন—"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।"

(৬) কৃষ্ণ-প্রেমিকের চতুর্বিবধ স্বভাব

ভক্তিসাধনসময়ে সাধককে যে চারটি বৃত্তিকে সর্ব্বদা অভ্যাস ও চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়, সাধনসিদ্ধ হ'লে সেই অভ্যাসই স্বভাবে পরিণত হয়। বস্তুতঃ, সাধনসময়ে যা' চেষ্টা ও অভ্যাসসাপেক্ষ, সিদ্ধাবস্থায় তাই সহজ-স্বভাব হয়ে যায়। সিদ্ধ অবস্থায় সাধক স্বভাবতঃই 'তৃণাদপি সুনীচ', 'তরোরপি সহিষ্ণু', 'অমানী' ও 'মানদ' হয়ে থাকেন। অর্থাৎ এই সকল বৃত্তি তাঁর বিনা চেষ্টায় স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে পড়ে। তখন "উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম"—চৈঃ চঃ ৩।২০, অর্থাৎ সর্ব্বগুণের আধার হয়েও, ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার কর্ত্তৃত্বের শক্তিলাভ করেও, তিনি আপনাকে তৃণঅপেক্ষা নীচ জ্ঞান করেন, নিজে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েও তিনি "হন নিরভিমান", সর্ব্বপ্রকার বিপদ-আপদ, অপমান-লাঞ্ছনা, অত্যাচার-উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করেন এবং পাত্রাপাত্র

বিচার না ক'রেই জীবমাত্রেই সম্মান প্রদর্শন করেন—"জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"—চৈঃ চঃ ৩।২০।২০, এই মহাবাক্য পালন ক'রে। শ্রীশ্রীনরহরি প্রভুর সকল আচরণে এই চতুর্বিধ স্বভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়েছে। একদিনের জন্যও যে ব্যক্তি তাঁর দর্শনোদ্দেশ্যে তাঁর শ্রীচরণসমীপে এসেছে, সেই জানে কী কাতর দৈন্যে, কী মধুর বিনয়ে তিনি প্রত্যেক মানুষের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাদের সর্ব্বপ্রকার সম্মানে ভূষিত করেছেন। এখানে স্মরণ রাখতে হবে, এই দৈন্য, এই অভিমানশূন্যতা, এই পরকে সম্মানদান কেবল মুখের কথা দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনা। এর জন্য চাই কায়মনোবাক্যের দ্বারা সামগ্রিক ও আন্তরিক প্রচেষ্টা। প্রভুর আচরণেই তা' সুস্পষ্ট হ'য়েছে। বালকবৃদ্ধযুবা, উচ্চনীচ, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সাধু-পাষণ্ড যে কেউ তাঁর দর্শনকামী হয়ে তাঁর সম্মুখে এসেছে, প্রভু কৃতাঞ্জলিপুটে, গললগ্নীকৃতবাসে, মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করে তবে তাকে দর্শন দিয়েছেন। এই দৈন্য তাঁর এরূপ স্বভাবসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, যে কৃতাঞ্জলি হস্ত ব্যতীত অন্যরূপে কেউ কখনও তাঁকে লোকসম্মুখে দেখেনি। প্রভু তাঁর আচরণে এই প্রমাণিত করেছেন, যে শুধু মুখে বা মনে দৈন্য থাকলেই চলবেনা, সমস্ত কায়-ব্যাপারে সেই দৈন্য প্রকটিত করতে হবে। এইজন্য প্রভু নিজে জীবমাত্রকেই সাষ্টাঙ্গ বা দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা সম্মান দিতেন এবং সমাগত দর্শনার্থীদেরও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম অভ্যাসের উপদেশ দিয়েছেন। শারীরিক ব্যাপারে দৈন্য অভ্যাস না করলে, প্রকৃত দৈন্য প্রতিষ্ঠিত হয়না। শুধু মনে মনে বা মুখে দৈন্য প্রকাশ করা আত্ম-প্রতারণা; একমাত্র দৈহিক দৈন্য অভ্যাসই একে সুদৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বাচনিক ও মানসিক দৈন্যলাভেরও সহায়ক হয়। যাঁরা প্রকৃত বৈষ্ণব-দীনতা লাভ করতে চান, শরীর-ব্যাপারে দৈন্য-অভ্যাস তাঁদের অপরিহার্য্য। অধুনা সাষ্টাঙ্গ প্রণামপ্রথা একপ্রকার বিলুপ্ত হয়েছে। কেউ আত্মসম্মানের দোহাই দিয়ে, কেউ বা 'মনের দৈন্যই যথেষ্ট'—এইরূপভাবে আত্মপ্রতরণা ক'রে, ভূমি-লুণ্ঠিত প্রণাম করতে কুণ্ঠিত হন। ফলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ভারত থেকে বিলুপ্ত প্রায় ও নামেমাত্র পর্য্যবসিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীশ্রীনরহরি প্রভু এই সাষ্টাঙ্গ-প্রণামকে বৈষ্ণব-দৈন্য প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য্য অঙ্গ ব'লে কীর্ত্তন ক'রেছেন; এবং নিজ আচরণ দ্বারা মনুষ্যমাত্রকেই সাষ্টাঙ্গ প্রণামবিধি উপদেশ ক'রেছেন। বস্তুতঃ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও এই সাষ্টাঙ্গ প্রণামকে সাধন-ভক্তির একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন—"অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎনতি"—চৈঃ চঃ ২।২২, এবং তিনি সর্ব্বত্র স্বয়ং এই দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন: "প্রণমেৎ দণ্ডবৎ ভূমৌ" —১১।২৯।১৬, "বন্দেত দণ্ডবৎ"—১১।২৭।৪৫, "সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্"—১১।১১।২১; সনাতনগোস্বামী হরিভক্তিবিলাসে বলেছেন:

"সঙ্কভূমৌ নিপতিতো ম শক্তঃ প্রণমেন্মুহুঃ,
উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্যং দণ্ডবৎপ্রণিপাতনম্",

শ্রীবৃহৎভাগবতামৃতেও তিনি বলেছেন,

"দৈন্য মূল সেই প্রেমে হয়তো নিশ্চিত।
যেই কায়-ব্যাপারে বা মনের ব্যাপারে
দৈন্য স্থির হয়, অতি যত্ন করে তারে
ভজিবে বিদ্বান্।" (—অনুবাদ)

বস্তুতঃ ভূমিলুণ্ঠিত প্রণামে যে সর্ব্বাত্মসমর্পণের ভাব দেহে মনে উদয় হয়, তা অন্য কোনো উপায়ে হয় না। ভক্তিসাধন-"কৃতি-সাধ্য", অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য অনুশীলন দ্বারা সাধনীয়; কেবল মনে দৈন্য যথেষ্ট—এরূপ মনে করা যে নিজেকে প্রতারণা করা, তা উপরিউক্ত শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা বোধগম্য হবে। প্রভুপাদ তাঁর জীবন-লীলায় স্বয়ং আচরণ দ্বারা এই শিক্ষাই পুনঃ পুনঃ দিয়েছেন।

কায়-ব্যাপারে যেরূপ দীনতা প্রকাশ করা প্রয়োজন, বাক্যেও সেইরূপ বিনয়, সৌজন্য ও নম্রতা দরকার। প্রভুপাদের চরিত্রে এই দৈন্য তাঁর কায়, মন ও বাক্যে যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল। দৈন্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ যদি কোথাও প্রত্যক্ষীভূত হয় তো প্রভু নরহরির কায়মনোবাক্যেই তা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর প্রতিটি মিষ্ট মধুর বাক্য যেন আপন দৈন্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত, বাক্যের বিনয়-বিভূষণ, তার সৌজন্য সুষমা যেন নিখিলচিত্ত হরণ করত। সে দৈন্য অতি বড় পাষণ্ডীর পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত করে। সে দৈন্য নিজেকে ধূলিতে অবলুণ্ঠিত করে ত্রিভুবন বিজয় করে। মানব এত বড় ধনে ধনী হয়েও যে এত দৈন্য, এত অকিঞ্চনতা, এত আর্ত্তি প্রকাশ করতে পারে, তা একমাত্র প্রভুপাদের চরিত্রেই প্রত্যক্ষ করলাম। নগণ্য বালকের সমুখে, পশুপক্ষীর কাছে, দীনহীন কাঙাল ভিখারীর সমুখে, এমন কি অস্পৃশ্য মেথর, চণ্ডালের সমুখেও কে কখন কাকে কৃতাঞ্জলিপুটে, 'অঞ্জলিং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য' কৃপাভিক্ষা করতে দেখেছে? আপনার পদাশ্রিত শিষ্যকে কে কখন 'গুরু' বলে সম্বোধন করতে, গুরু-জ্ঞান করতে, এমন কি প্রণাম ও পূজা করতে শুনেছে? নিজে সর্ব্বতত্ত্ববিদ হয়েও, প্রভুপাদ দর্শনার্থী নরনারীকে দর্শন দিয়ে তাদের পর্য্যাপ্ত মিষ্টান্ন প্রসাদে পরিতৃপ্ত ক'রে অতি সুমধুর বিনয়নম্র বাক্যে তুষ্ট করতেন এবং বিদায়ের সময়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলতেন, "আমি মহাপাপী; মহাজনের ভয়ে পাতালে পোঁতা আছি; তোমরা যেখানে যা' উপদেশ পাবে, এই অজ্ঞান অধম সন্তানকে কানে ধ'রে শিখিয়ে দিয়ে আমার মাথায় চরণ দিয়ে আমাকে উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দিয়ে যেও। এই আমি তোমাদের চরণের তলায় মাথা দিয়েছি, তোমাদের চরণধূলিতে গড়াগড়ি দিয়ে পবিত্র হব ব'লে। তোমরা কৃপা করে

এই মহাপাপীর অঙ্গে চরণধূলি দিয়ে যেও।" এরূপ দৈন্য, এরূপ আর্ত্তি আর কোথাও দেখেছেন, না শুনেছেন? এই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। তাঁর সমগ্র জীবন-লীলা এইরূপ, এমন কি এর চেয়েও করুণ ও মর্ম্মভেদী দৈন্যোক্তিতে ভরপুর। এরূপ অভিমানশূন্যতা কোথাও দেখিনি, শুনিনি, কল্পনাও করতে পারিনি। ভক্ত দর্শনার্থী তাঁর দৈন্যোক্তি শ্রবনে শিহরিয়ে উঠত, তার হৃদয় নিমেষে মুগ্ধ ও অভিভূত হত—এ দৈন্যে স্বয়ং ভগবানেরও 'হৃদয় ফাটিয়া যায়।'

এই অভিমানশূন্য প্রভু নিজে 'নীচ' হয়ে বিশ্ব-হৃদয় জয় করেছিলেন। কিন্তু আপনি দীনতা অবলম্বন করলেও অপরের সম্মান দানে বিন্দুমাত্র উদাসীন ছিলেন না। 'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ' তো দিতেনই না। অধিকন্তু মিষ্টমধুর বাক্যে পরিতুষ্ট করে তাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্মানে ভূষিত করতেন। সাধারণ লোক অনুগ্রহলাভের আশায় অপরকে তোষামোদ ও সম্মান করে থাকে। কিন্তু প্রভু নিজে 'অনপেক্ষ' হয়েও প্রতি জীবকেই অপর্য্যাপ্ত সম্মান ও মর্য্যাদা দান করতেন। বস্তুতঃ, এ সম্মান দান কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, প্রেমের স্বভাববশতঃই তাঁর এই 'মানদ'-স্বভাব হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রভুপাদের চরিত্রে আমরা দেখতে পাই যে তিনি কদাচ বাহ্য লোকাচার উপেক্ষা করতেন না। অন্তরে তিনি বেদবিধি, স্মৃতিধর্ম্ম, সামাজিক ও লৌকিক আচার কিছুই মানতেন না। কারণ তিনি এ সব ত্যাগ করে রাগানুগামার্গে কৃষ্ণভজন করেছিলেন। এই মার্গের প্রত্যেক ভক্তকেই এইরূপ হতে হবে, তা' পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হয়েছে। "এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্মমর্ম্ম; যারে কৃপা করি' করে হৃদয়ে প্রেরণ, কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদলোকধর্ম্ম"—২।১১। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলেছেন, "যদা যমনুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ, স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্"—৪।২৯।৪৬ কিন্তু তথাপি বহির্জগতে সামাজিক লোকের সহিত আচার ব্যবহারে তিনি কখনও এসব বিধি বা আচার লঙ্ঘন করেন নি; উপরন্তু তাদের পূর্ণ মর্য্যাদাই দিয়েছেন। অনেকেই প্রভুর এই অন্তরের ও বাইরের আচরণের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পেতেন না—কিন্তু এইরূপ আচরণই যে বৈষ্ণব ধর্ম্মসম্মত, তা স্বয়ং মহাপ্রভুর আচরণেই প্রমাণিত হবে। তিনি তাঁর "লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষণ"—চৈঃ চঃ ১।৬ করেছেন এবং ভক্তদের উপদেশ করেছেন "তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ, মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ"—৩।৪। শ্রীরঘুনাথ দাসের শিক্ষাপ্রসঙ্গেও বলেছেন, "অন্তর্নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার"—২।১৬। ঠিক এইমত শ্রীশ্রীনরহরি প্রভু লৌকিক আচারে কোনো হস্তক্ষেপ করেননি; লৌকিক লীলায় লোকধর্ম্ম, লোকসমাজের রীতি-নীতিকে

যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়েছেন। অপরপক্ষে যে সব অন্তরঙ্গ ভক্ত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে তাঁর শ্রীচরণে শরণ নিয়েছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতই তাদের সকল বিধি-বন্ধন, সকল সামাজিক আচার, সব কিছুই ছাড়িয়েছেন।

চতুর্থ স্বভাব-সহিষ্ণুতা। সিদ্ধাবস্থাতেও প্রভুপাদ যে সব বিঘ্ন-বিপদ, ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হয়ে সীমাহীন সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। মহাপুরুষের 'জগাই-মাধাইএর' অভাব হয় না। বিশেষতঃ, শ্রীশ্রীনরহরিপ্রভু এই নবদ্বীপে অগণিত নিন্দক, পাষণ্ডী ও শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে ছিলেন। বহু পাষণ্ডী বহু প্রকারে তাঁকে নির্য্যাতন করতে প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়েছে। এখানকার প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ থেকে সুরু করে নিকট প্রতিবেশীগণ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে তাঁর নির্য্যাতন, নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা করতে তাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এই উৎপীড়ন এতই চরমে পৌঁছেছিল যে, কোনও সময়ে তাঁর ভক্তশিষ্যগণ তাঁর কষ্ট দেখে সহ্য করতে না পেরে বলেছিল, "প্রভু, আপনি এখানে সহায়হীন। অথচ এখানকার গণ্যমান্য ও প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী বহু ব্যক্তি আপনার উপর উৎপীড়ন করছে। অতএব আপনার এস্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ"। প্রভুপাদ এর উত্তরে শুধু বলেছিলেন, "মা রাধারাণীর যদি এখানে আমাকে রাখার ইচ্ছা হয়তো ঠিকই রাখবেন"। বলা বাহুল্য, ঐ সকল পাষণ্ডীগণ কিছুকাল পরে একে একে প্রভুর চরণে শরণ নিয়ে নিজকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করেছিল। কিন্তু এই বিপৎকালে তিনি যে সীমাহীন সহিষ্ণুতা, যে পর্ব্বত-প্রমাণ ধৈর্য্যের সহিত জগজ্জননী রাধারাণীর চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে নিজ কর্ত্তব্যে অটুট ছিলেন এবং তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রেমধারার লীলা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, তা' কোনো মানবের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

(৭) সম-লোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ

"কৃষ্ণের চরণে যার হয় অনুরাগ, কৃষ্ণবিনা অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ"-চৈঃ চঃ ১।৭ যে কৃষ্ণপ্রেমলাভ করেছে তার যে অন্য কোনো বিষয়ে বাসনা হতে পারেনা, এ সুস্পষ্ট। কামিনী-কাঞ্চন বৈষয়িক জগতের লোকের দুর্নিবার আকর্ষণ; সুতরাং কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তিই কৃষ্ণপ্রেমলাভের প্রধান ও সুনিশ্চিত পরীক্ষা। শ্রীশ্রীনরহরিপ্রভু সাধনাবস্থায় সর্ব্বসময়েই এই অনাসক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সিদ্ধ অবস্থায় প্রভু এই কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কে কীরূপ মনোভাব অবলম্বন করেছেন, তা তাঁর লীলায় পরিস্ফুট। শিষ্যগণ যে অর্থ প্রণামীস্বরূপ তাঁকে দান করত, তিনি হস্তদ্বারা কখনো তা স্পর্শ করতেন না। টাকাকে তিনি 'মাটির ঢেলা' বলতেন, এবং ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করতেন; টাকার বিনিময়ে রাশি রাশি মিষ্টান্ন, খাদ্য দ্রব্য (মনুষ্য, পশুপক্ষী

সকলের), বস্ত্র আদি ক্রয় করিয়ে তা বালকের মত বিলিয়ে দিয়ে আনন্দে মগ্ন থাকতেন। 'অর্থ' তাঁর নিকট কোনো 'প্রয়োজনীয়' বস্তু ছিলনা, ছিল তাঁর 'খেলা'র সহায় মাত্র। সোনা-রূপার আংটি করে তিনি ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করেছেন—এই আংটিতে খোদিত থাকত, "ক্ষেপার খেলা"। এদিকে স্বর্ণ-নির্ম্মান-প্রণালী বিশেষভাবে (তাঁর গুরুর কাছে) অবগত হয়েও তা কখনও কার্য্যতঃ প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

স্ত্রী-জাতির প্রত্যেককেই তিনি যে জগজ্জননীর অংশরূপা মনে করতেন, যুবতী নারীর প্রতি তিনি কীরূপ 'কাষ্ঠ পাষণসম নির্ব্বিকার' ছিলেন তা পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ, তাঁর কণ্ঠের মধুর 'মা' 'মা' আহ্বানে নিখিল রমনী-হৃদয়ে জগন্মাতার আবির্ভাব হত এবং সে আহ্বানে মুগ্ধ হয়ে সকল রমনীরই মাতৃহৃদয় অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ-সুধারসে উদ্বেলিত হয়ে উঠত। যে মাতৃস্নেহে মা যশোমতী ব্রজগোপালকে উপাসনা করেছিলেন, পরম পবিত্র 'বৎসলরসে' মাতৃহৃদয় ভরে উঠত। কোনো নারীই তাই প্রভুর এই 'মা' 'মা' আহ্বানে স্থির থাকতে পারতনা—তার মনে হত যেন তার অন্তরের নিধি ব্রজগোপালকে কোলে নিয়ে প্রাণ জুড়াই। পরিচিত, অপরিচিত প্রত্যেক রমনীই প্রভুর মাতৃ-আহ্বানে ব্যাকুল হয়ে অশ্রু বর্ষণ করত—বিশ্বজননী হৃদয়ের দুয়ার একটি কণ্ঠের আকুল আহ্বানে সহসা উন্মুক্ত হয়ে যেত—সেখানে তার চিরকালের, চিরস্নেহের ব্রজদুলালকে দেখে সেই মাতৃহৃদয় আত্মহারা হয়ে পড়ত। এ অপরূপ দৃশ্য, এ প্রাণ-শীতলকারী লীলা তাঁর ভক্তগণ প্রায় নিত্যই দর্শন করবার সৌভাগ্য পেয়েছেন।

(৮) অন্তর্য্যামিত্ব

মহাপুরুষের একটি লক্ষণ তাঁর আলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ। তিনি যে সব আচরণ করেন, সব সময়ে তার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। বহুলীলার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই হয়না। প্রথমতঃ, তাঁর চেষ্টা উন্মত্তবৎ এবং তাঁর ক্রিয়া-মুদ্রা দুর্ব্বোধ্য। তিনি পণ্ডিত ও গম্ভীর হলেও "বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ, কুশলো জড়বচ্চরেৎ এবং বদেদুন্মত্তবদ্ বিদ্বান্" ভাঃ১১।১৮।২৯ ; তাছাড়া "অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা"-ভ, র, সি-১।৪।১২। প্রকৃতই, "যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়, তার বাক্য ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়" -চৈঃ চঃ-২।২৩। প্রভু নরহরির লীলা মুখ্যতঃ এইরূপ উন্মাদবৎ প্রচেষ্টা ও বালকবৎ উদ্দেশ্য-বিহীন ক্রীড়াময়। এসকল লীলার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য, কোনো সামঞ্জস্য, কোনো সংহতি সাধারণতঃ লক্ষিত হয়না। তিনি সারাজীবন বালকের মত, ব্রজের নন্দদুলালের ন্যায়, নিছক হাসি-খুশীতে খেলা করে গেছেন। অথচ সেই উদ্দেশ্য-বিহীন নিরর্থক 'খেলা'র মধ্যেই

অলৌকিকলীলা অলৌকিকভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও অহৈতুকী করুণা তড়িৎ-ঝলকের মতই আত্মপ্রকাশ করে সাধারণ জীবজগতকে চকিত চমৎকৃত ও স্তম্ভিত করেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতই তাঁর জীবন ভরে "কভু তো লৌকিক রীতি যেন ইতরজন, কভু স্বতন্ত্র ঐশ্বর্য্য করে প্রকটন"-চৈঃ চঃ-৩।৮। বস্তুতঃ, মহাপুরুষের জীবনলীলায় অলৌকিকত্বের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ তত্ত্বতঃ তাঁরা লোকোত্তর ; তাঁদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবই অপ্রাকৃত—তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অপ্রাকৃত জগতেরই অধিবাসী, সুতরাং তাঁদের লীলা, তাঁদের আচরণ সাধারণ লৌকিক জগতের প্রাকৃত বুদ্ধি ও মনের সীমার বহির্ভূত হবেই। কিন্তু যেহেতু তাঁদের সাধারণ মায়ামুগ্ধ জীবের মধ্যে অবস্থান ক'রে লৌকিক আচরণের মধ্যে বিরাজ করতে হয়, তজ্জন্যই তাঁদের সেই লৌকিক লীলাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য তাঁরা তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপকেও লৌকিক আবরণে আবৃত করেন এবং সেইজন্যই লোকে

"প্রত্যক্ষ দেখয়ে নানা প্রকট প্রভাব,
অলৌকিক কর্ম, অলৌকিক অনুভাব।
আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে,
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে।" চৈঃ চঃ-১।৩

যাঁরা প্রভুর নিত্যসঙ্গী ছিলেন, তাঁরা প্রতিপদেই তাঁর অলৌকিক লীলা সমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন। যে কোনো ভক্ত একদিনও তাঁর কাছে থাকবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তিনি প্রভুর লীলাকে লৌকিক বা সাধারণ ব'লে মনে করতে পারবেন না। এই অলৌকিকতার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত তাঁর অন্তর্য্যামিত্ব। বহু দর্শনার্থী একবার মাত্র প্রভুর দর্শন করার অব্যবহিত পরেই তাঁর মুখে যে সব বাণী শ্রবণ করেছেন, তা শুনে সবিস্ময়ে ভেবেছেন, "এ কি! আমি কিছু না বলতেই ইনি আমার মনের কথা জানলেন কী করে?" অসংখ্য দর্শনার্থীকে ঐ একইভাবে বিস্ময় প্রকাশ করতে শুনেছি। আমরা নিজেও নিরন্তর তা উপলব্ধি করেছি। প্রভুর চক্ষু যেন আধ্যাত্মিক এক্স্-রে—সে যেন মানুষের সকল বহিরাবরণ ভেদ করে অন্তরের নিভৃততম কোণের গোপনতম বাসনাও দেখতে পায়! নিখিল চক্ষু থেকে সংগোপন করে যাকে মনের গভীর গহনে লুকিয়ে রেখেছি. প্রভু আমার তাই প্রকাশ করে দিলেন। এর এত ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত, এত প্রচুর নিদর্শন আছে যে সে সমুদয় বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে প্রভু যখন জীবের প্রতি তাঁর করুণানয়ন-সম্পাতে দৃষ্টি করতেন, তখন সকলেই বুঝত, তিনি তার বহিরাবরণ দেহটিই শুধু দেখছেন না, তার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত প্রভুর নয়ন সম্মুখে একেবারে উন্মুক্ত, অবারিতদ্বার হয়ে গেছে। মুগ্ধ, অভিভূত, ত্রিতাপজ্বালাজর্জ্জরিত জীব ভাব

করেই বুঝত, তার সব কিছুই তিনি জেনেছেন, তার পাপ-পুণ্য, তার দোষ গুণ, তার সুকর্ম-কুকর্ম—কিছুই ঐ সর্বদ্রষ্টার কাছে আর অবিদিত নেই; সুতরাং সেই অন্তর্যামীর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেই জীবনের জ্বালা জুড়াই। শিষ্য-অশিষ্য সকলেই একথা মর্মে মর্মে বুঝত। এমন কি প্রথম দর্শনার্থীও কখনো কখনো তাঁর এই অন্তর্যামিত্বের পরিচয় পেয়ে সেই দরদী, সেই ব্যথার ব্যথীর চরণে আত্মসমর্পণ করে শান্তিলাভ করত। এই অন্তর্যামিত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—"পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা" —১১।১৫।৮।

(১) ত্রিকালজ্ঞত্ব

শ্রীশ্রীনরহরি প্রভু ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন। অলৌকিকতার এই হচ্ছে দ্বিতীয় নিদর্শন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তাঁর দিব্যচক্ষুর সম্মুখে চিত্রপটে অঙ্কিত লেখ-চিত্রের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠত। আমরা বহুবার লক্ষ্য করেছি, কোনো আর্ত্ত মানব শান্তিকামনায় তাঁর শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হ'লে তিনি নিমেষের মধ্যে তার জীবনের অধ্যায়গুলি উন্মুক্ত করে দিতেন এবং তার বর্ত্তমানের মনোভাবও ব্যক্ত করতেন। এসবগুণে সেই পীড়িত, কাতর মানুষটি শিহরিয়ে উঠত, অনুশোচনা অনলে তার অন্তর দগ্ধ হয়ে যেত। প্রভুকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিময় বলে জানতে পেরে সে তাঁর চরণে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিয়ে বাঁচত। ভবিষ্যৎ জানবার জন্য যে কেউ তাঁর চরণে প্রার্থনা জানিয়েছে, তিনি অতি সতর্কতার সহিত তার ভবিষ্যতের কথা বলে তাকে তদনুরূপ হিতোপদেশ দিয়েছেন। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী অকাট্য ও অমোঘ। কোনো দিন, কোনো ক্ষেত্রে তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হতে কেউ দেখেনি। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত একটি অমৃত-বাণী শ্রবণের আশায় বহু পিপাসী, আর্ত্ত ও আতুর মানব নিত্য তাঁর শ্রীচরণ সমীপে সমাগত হত। তাঁর একটি শ্রীমুখবাক্য তার অকাট্য শক্তি বলে শ্রোতার প্রাণে অসীম আশা, অপরিসীম শান্তি আনয়ন করত। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের শ্রীমুখোচ্চারিত একটি অভয় বাক্যসম্পদ যে লাভ করতে পারত, সে সুনিশ্চিতভাবে জানত, পৃথিবীর প্রলয় হলেও প্রভু-বাক্যের কোনো নড় চড় হবে না। শত শত শত্রু সমবেত হয়ে বিরুদ্ধতা করলেও, প্রভুর শ্রীচরণরক্ষিত আশ্রিতের কেউ কিছুই করতে পারবেনা—প্রভুর বাক্যানুযায়ী ফল ফলবেই; সমগ্র জগৎ বিপক্ষে গেলেও প্রভুবাক্য ব্যর্থ হবে না। বস্তুতঃ, আমরা মর্মে মর্মে বুঝেছি, সত্য ও নিত্য বলতে যদি বর্ত্তমান জগতে কিছু থাকে তো তা প্রভু-নরহরির শ্রীমুখবাক্য। অসংখ্য নরনারীর জীবনের ঘটনাবলী দ্বারা এ প্রমাণিত হয়েছে। তাই অগণিত মানুষ বিপদে পড়ে প্রভুর কাছে ছুটে এসেছে, শুধু তাঁর শ্রীমুখের একটি বাক্য, একটি অভয় বাণী, একটি প্রত্যাদেশ, একটু ইঙ্গিতমাত্র লাভ করার আশায়।

সাধারণ মানুষের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীও যেমন তাঁর নয়ন সমুখে অঙ্কিত থাকত, তেমনি বৃহত্তর সামাজিক ও জাগতিক পরিবর্তনও তাঁর জ্ঞান-নয়নের গোচরীভূত ছিল। বহুপূর্ব্বে গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একদা একটি ভক্তের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "এ যুদ্ধ যা' দেখছ, এতো সামান্য। এর চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর ও লোকক্ষয়কর সংহারলীলা পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে।" বস্তুতঃ, ভাবী ঘটনাবলী প্রভুর নিকট এরূপ সুস্পষ্ট ছিল যে তাঁর সমুখে সমাগত শিশু ও বালকগণকে তিনি, কখনো 'ডাক্তার' বাবা, কখনো 'উকীল' বাবা, কখনো 'কেশিয়ার' বাবা ইত্যাদি আখ্যায় সম্বোধন করতেন। উপস্থিত শিষ্যগণ কেউই তাঁর এই অদ্ভুত নামকরণের কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে যেত। কিন্তু যারা সেই সেদিনের শিশুকালের স্মৃতি স্মরণে রেখেছে, তারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে—পাগল বাবার সেই শিশুকালে সম্বোধন ভবিষ্যতে নির্ভুলভাবে রূপ-পরিগ্রহ করেছে,—অর্থাৎ সেদিনের শিশু-ডাক্তার ভবিষ্যতে ডাক্তারই হয়েছে। সেদিনের বালক-উকীল পরে প্রসিদ্ধ উকীল হয়েছে, সেদিনের শিশু-কেশিয়ার ঠিক কেশিয়ার-পদই অলঙ্কৃত করেছে। এরূপ ঘটনা পাঁচটি দশটি নয়—অসংখ্য, অগণিত—প্রায় দৈনন্দিন ঘটনারূপে ঘটতে আমরা দেখেছি। অনেককে আবার তিনি পূর্ব্ব জন্মের পরিচয়ে আহ্বান ও সম্বোধন করতেন। অতীত জন্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধারণতঃ পাওয়া না গেলেও, দু' একটি ক্ষেত্রে আমরা তা' পেয়েছি। যে-ভবিষ্যৎ জীব-জগতের কল্পনার বহির্ভূত, প্রভুর চিত্তপটে তাই সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন চিত্ররেখায় পরিস্ফুট হয়ে উঠত। জীবমাত্রকেই তিনি তার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত প্রারব্ধের ফল-স্বরূপ দেখতে পেতেন—ফলে তার যুগ-যুগের কর্মগ্রথিত জীবনসূত্র প্রভুর নয়ন সমুখে উদ্ভাসিত হত, সেই প্রারব্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ তার অনাগত ঘটনাবলীও নির্ভুলও নিখুঁত ভাবে প্রভুর দিব্যনয়নের সমুখে প্রতিভাত হত। অন্তহীন কালপ্রবাহে মনুষ্যজীবন জন্ম জন্ম ধ'রে যে ঘটনাবলীর চিহ্ন রেখে যায়, তা' অনন্ত কাল ও স্থানের পরস্পর সমাবেশে বিশ্বের পট-ক্ষেত্রে একটি লেখ-চিত্র অঙ্কিত করে যায়। গণিতের ভাষায়—জীবের জীবনরূপ ঘটনাবলী Four-dimensional space-time Continuum এর পটে past, present and future 'events' এর একটি shape গঠন করে যায়। কোনো জীবই Infinite space-timeএ সংস্পৃষ্ট জীবনের এই shape প্রত্যক্ষ করতে পারে না। পরন্তু, এই বহির্বিশ্বসৃষ্টির বাইরে থেকে যে Great Mind বা পরমেশ্বর তাঁর মানসিক ইচ্ছাশক্তিতে এই বিশ্ব সৃষ্টিস্থিতিলয় করেন, একমাত্র তিনিই এর পরিজ্ঞাতা। সীমাবদ্ধ বুদ্ধি মানবের এই বিশ্বপটের বিচিত্র চিত্রাবলী দর্শনের ক্ষমতা নেই। একমাত্র ত্রিকালজ্ঞ শ্রীভগবান্ ও ত্রিকালবিজয়ী শ্রীভগবানের একান্ত ভক্তগণই বিশ্বপটের এই অদৃশ্য চিত্র-সমূহ দর্শন করতে সমর্থ হন। এইজন্য শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সীমাবদ্ধজীবজ্ঞানে

বলেছিলেন, "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন, তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি, নত্বং বেত্থপরন্তপ"-গীতা-৪।৫ জীবমাত্রেরই জন্ম জন্মার্জ্জিত সংস্কারলব্ধ এই বর্ত্তমান জীবন ও প্রারব্ধ-প্রাপ্য অনাগত ভবিষ্যতে তার অপরিহার্য্য ফল সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়েই প্রভু পরম করুণাবশতঃ প্রত্যেক জীবকেই, যাতে তার হিত হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করতেন। তাই ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে তিনি তাদের বিভিন্ন কর্ম ও প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকের কল্যাণার্থে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিতেন। এক এক জনকে এক এক রকম উপদেশ কেন তিনি দেন, সাধারণ অজ্ঞ মানুষ তা বুঝতে পারত না। বস্তুতঃ, সাধারণ মানুষ যুক্তিতর্ক দ্বারা যা সিদ্ধান্ত করতে পারে না, বুদ্ধি দ্বারা যা' ধারণা করতে অক্ষম হয়, ত্রিকালদর্শী এই মহাপুরুষ তা একেবারে প্রত্যক্ষ দর্শন করতেন। এতে তাঁর লেশমাত্র সন্দেহ থাকত না; বিশ্বচিত্রপটে যে সুস্পষ্ট চিত্র তিনি দেখতেন, তা সাক্ষাৎ-দর্শনের পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল, অকাট্য ও অখণ্ডনীয়।

মহাপুরুষের এই ত্রিকালজ্ঞত্ব গুণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছেন:

"তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধি জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা"—১১।১৫।২৮;

"ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বম্"—১১।১৫।৮

(১০) ইচ্ছাশক্তি

অলৌকিক শক্তির তৃতীয় নিদর্শন তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি এত প্রবল ছিল যে তদ্দারা বিশ্বের নর-নারী, এমন কি ইতর জীবগণকেও তিনি আপনার বশীভূত করতে পারতেন। বলা বাহুল্য, এই ইচ্ছাশক্তি তিনি সর্ব্বত্র প্রয়োগ করতেন না। যোগ্যপাত্রে ও যোগ্যভক্তেই ইচ্ছাশক্তি সঞ্চার করে তার 'দুর্নিবার' মনকে আপন ইচ্ছায় নিয়োজিত করতেন। পীড়িতের আকুল আর্ত্তনাদে কাতর হয়ে বিশ বৎসরের কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য করেছেন। ব্যথিতের আর্ত্তিতে ব্যাকুল হয়ে এই দুর্বার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দুর্জ্জেয় শত্রুর মন নিমেষের মধ্যে পরিবর্ত্তিত করেছেন। কাতর ক্রন্দনে ব্যথিতচিত্ত প্রভু কখনো বা এই অসীম ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে বহু মরণোন্মুখ রোগীকে জীবন দিয়েছেন। আর্ত্তের আকুল আহ্বানে, শরণাগতের আত্মসমর্পণে এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বিধিলিপিকেও খণ্ডন করেছেন, অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। বস্তুতঃ, শ্রীশ্রীনরহরি প্রভুর ভক্তগণ অবগত আছেন, ব্যাকুল হয়ে চাইলে তাঁর অদেয় কিছুই নেই; ইচ্ছা করলে তিনি সবই দিতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিময়, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু।

এই ইচ্ছাশক্তি শুধু মানব মনেই প্রভাব বিস্তার করত না, ইতর প্রাণীর উপর, এমন কি জড়-জগতেও তার অসীম শক্তি প্রয়োগে সমর্থ ছিল। ব্যাঘ্র-হরিণ-বন্য শূকর-

শৃগালদের তিনি পাশাপাশি স্বহস্তে খাইয়েছেন, কেউ কাউকে হিংসা করেনি, ভয় করেনি; বিষধর সর্প পাশে নিয়ে তিনি যোগ-সাধনায় মগ্ন থাকতেন। জীবের মন থেকে এবার জড় জগতের কথা ভাবুন। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের জীবন-লীলায় এই জড়-জগতের উপর তাঁর অমোঘ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রথমতঃ, খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে দেহবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম-কানুনের আলোচনা করেই দেখা যাক। উদরাময় হলে গুরুপাক খাদ্য কীরূপ বিষময়, তা' সকলেই জানেন। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে এই খাদ্যগুণ কীরূপ আশ্চর্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। দুরারোগ্য, কঠিন উদরাময় রোগী আরোগ্য-কামনায় প্রভুর চরণে এসে স্মরণ নিয়েছে। প্রভু তার অতীত আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সে তো অবাক—প্রভু তার অতীত জীবনের কাহিনী জানলেন কি করে? অনুতাপে সে ভেঙে পড়ল। প্রভুর অন্তর্যামিত্বের পরিচয় পেয়ে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করল। হয়তো এখন আষাঢ় মাস; কোনো ভক্ত, প্রভুকে, খেলা করবার জন্য, ভাল কাঁঠাল দিয়ে গেছেন। প্রভু চোখের সম্মুখে সেই কাঁঠাল দেখে সেই কঠিন উদরাময় রোগীকে তাই খেতে দিলেন। রোগীও গভীর বিশ্বাসে উদর পূরণ করে কাঁঠাল খেল। সুস্থ, সবল শরীরেও যে কাঁঠাল বেশী খেয়ে হজম করা যায় না, বহুদিনের দুরারোগ্য উদরাময় ও অজীর্ণ ব্যাধি সেই কাঁঠাল প্রচুর পরিমাণে খেয়ে চিরদিনের মত নিরাময় হয়ে গেল। রোগী সুস্থ শরীর ও মন নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করল। প্রভু হাতের কাছে যা পেতেন, তাই রোগীদের খেতে দিতেন—কাউকে কাঁঠাল, কাউকে চানাচুর বাদামভাজা ও বাসি ফুলুরি বেগুনি, কাউকে পচা পান্তা-ভাত। কারো বহুদিনের পেটের পীড়া, কারো প্রবল জ্বর, কারো দুরারোগ্য যক্ষ্মা—এই সব কুপথ্য, অপথ্য আহারে একেবারে আরোগ্য হয়ে গেছে। এইরূপ অসম্ভব উপায়ে, বিজ্ঞানের যুক্তির বহির্ভূত শক্তিতে প্রভু তাঁর প্রতিদিনের লীলায় যে অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করতেন, তা' প্রতি ভক্তচিত্তেই গাঁথা হয়ে আছে। সাধারণ বস্তু-বিজ্ঞান তাঁর এই অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে কিরূপে স্তম্ভিত হয়ে যেত, তার অগণিত দৃষ্টান্ত তাঁর জীবন-লীলায় প্রকট হয়েছে। এরূপ উদাহরণ সংখ্যায় এত অধিক যে তার গণনা সম্ভবে না—তাঁর প্রতিদিনের আচরণ, তাঁর সমগ্র জীবন-লীলাই অলৌকিকঘটনাময়। প্রভুর খেলার ইচ্ছা হলে তিনি যে ট্রেনে ভ্রমণ করতেন, তা সে মেল, এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার যাই হোক, সে ট্রেনকে বহু আকস্মিক দুর্ভোগ ও বিপর্যয় ভোগ করতে হ'ত। তাঁর ইচ্ছামত অস্থানে ট্রেন থেমে যাবার, ইঞ্জিন বিকল হবার, এবং তাঁর ইচ্ছামত ট্রেন পুনরায় চালু হবার বহু দৃষ্টান্ত তাঁর লীলায় ছড়িয়ে আছে। ক্যামেরার লেন্সকে ফাঁক দেওয়া, অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা না হলে তাঁর ফটো তুলতে অসমর্থ হওয়া,—এই অবিশ্বাস্য

ঘটনাও বহু ঘটেছে। আবার প্রাকৃতিক দুর্বার শক্তির উপরও তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাঁর আশ্রমের চতুর্দিকে প্রবল ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি সত্বেও, আশ্রম প্রাঙ্গণে শতশত কাঙ্গালী ও বৈষ্ণব-সেবা-মণ্ডপে কিরূপে একবিন্দুও বৃষ্টিপাত হয়নি; জলন্ত অগ্নিকুণ্ড তাঁর সাক্ষাৎ উপস্থিতি মাত্র, বা আবির্ভাবে কিরূপে অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হয়েছে, তার বহু দৃষ্টান্ত তাঁর জীবন-লীলায় রয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করে তাঁর শক্তি বা মাহাত্ম্য প্রচার করা আদৌ তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কখনো ভক্তের আকুল আহ্বানে, কখনো আর্ত্তের বেদনাতুর প্রার্থনায়, কখনো বা নিছক তাঁর মাধুর্য্যলীলার সহায়করূপে দেবী যোগমায়াই এসব অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রকট করতেন। প্রেমিক ভক্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করতে চান না, প্রেমানন্দলীলার বৈচিত্র্য-সাধনের জন্যই এই ঐশ্বর্য্য ভক্তের সেবা করে কৃতার্থ হয়। তাই তাঁর অলৌকিক লীলা লোকসমাজে প্রকাশ হয়ে পড়লে, প্রভু তাকে সংবরণ করতে চেষ্টা করেছেন,—কিন্তু "আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে, তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে"—চৈঃ চঃ ১।৩।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলেছেন:

"যথা সঙ্কল্পয়েদ্ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে—"১১।১৫।২৬

এবং "কুতশ্চিন্নবিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথামম"—১১।১৫।২৭

অর্থাৎ, তিনি যখন যেরূপ সঙ্কল্প করেন, ঠিক সেইরূপই তা লাভ করেন। আমার আজ্ঞার ন্যায় তাঁর আজ্ঞা কোথাও প্রতিহত হয় না।

(১১) মাধুর্য্য

প্রকৃতপক্ষে মাধুর্য্যই তাঁর লীলা সমূহের প্রাণ। ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে কাউকে ভীত, সন্ত্রস্ত, বা তার অনিচ্ছা সত্বেও কোনো কাজ করতে বাধ্য করা—এসব তাঁর লীলার উদ্দেশ্য নয়। কাউকে ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে চমকিত করতেও তিনি চাননি কখনো; বরং করযোড়ে সকলকেই বলেছেন, "আমি ভেল্কি-বাজী জানিনে, আশ্চর্য্য দেখিয়ে কাউকে তাক লাগাতেও জানিনে।" অর্থাৎ, তিনি ইচ্ছা করে কখনো ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন নি। ঐশ্বর্য্য দেখানোর জন্যই তাঁর ঐশ্বর্য্য-লীলা নয়, পরন্তু এ সবই তাঁর মাধুর্য্য-লীলার সহায়মাত্র, এবং সে সহায়কারিনী স্বয়ং দেবী যোগমায়া। বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র জীবন কাহিনীই মাধুর্য্যলীলাবিলাস মাত্র। এই মাধুর্য্যের খেলাকে রূপদান করবার জন্য, তাকে সম্পূর্ণ করতে কখনো কখনো ঐশ্বর্য্য শক্তি যোগমায়ার প্রেরণায় তাঁর লীলায় সহায় হয়েছে। তাঁর মাধুর্য্যলীলায় বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকল নর-নারী, পশুপক্ষী সকলেই

মুগ্ধ হয়েছে; তাঁর অন্তরের প্রেমমাধুর্য্যামৃতপারাবার অন্তর ছাপিয়ে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়েছে, সে অমৃতধারায় অভিষিক্ত জীবগণও আনন্দে মত্ত হয়েছে। সে আনন্দের আস্বাদে তাঁর কৃপাধন্য প্রাকৃত জীবও অপ্রাকৃত আনন্দের সন্ধান পেয়েছে, তাঁর মাধুর্য্য-লীলায় অবগাহন করে ভগবৎ-স্বরূপের পরিচয় পেয়েছে, উপলব্ধি করেছে যে "মাধুর্য্যই ভগবত্তা-সার"; হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে, সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছে, শ্রীভগবান,

"মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর,
তাহা হইতে অতি সুমধুর—
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিকে বহে যার পূর"—চৈঃ চঃ ২।২১

প্রকৃতপক্ষে, অলৌকিকতা বা ঐশ্বর্য্য প্রকটন প্রেমের প্রকৃত পরিচয় নয়—মাধুর্য্যই এর পূর্ণ লক্ষণ। ইতর সাধকও কিছু কিছু ঐশ্বর্য্য লাভ করতে পারে কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমের মাধুর্য্য সে কোথায় পাবে? কৃষ্ণপ্রেমমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক শক্তি এই যে এ "সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন; আপনার বলে করে সর্ব্ব আকর্ষণ।" কৃষ্ণপ্রেমিক যতই প্রচ্ছন্নভাবে, যতই গুপ্তভাবে থাকুন না কেন, তাঁর এই দুর্নিবার আকর্ষণ শক্তি, এই আনন্দদায়ক গুণ, এই ত্রিতাপ জ্বালা-জুড়ানো শান্তি-প্রদায়ী প্রভাব কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে না। এই-ই তাঁর পরিচয়, এই-ই তাঁর লক্ষণ। শ্রীশ্রীনরহরি প্রভুর ভক্তগণ তাঁর সমগ্র লীলায় উক্ত তিনটি গুণেই তাঁর চরণে চিরদিনের মত বিক্রীত হয়ে আছেন। বহু পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও তথাকথিত ভক্ত বৈষ্ণবের নিকটে ভূরি ভূরি শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্মালোচনা শুনেছি—কিন্তু কোথাও গিয়ে প্রাণ জুড়ায়নি, কোথাও এমন পরম শান্তি পাইনি, কোথাও এমন নির্মল আনন্দে মনপ্রাণ উথলে ওঠেনি, কোনোখানে এমন অগাধ স্নেহ করুণা লাভ করিনি, কোথাও গিয়ে এমন আত্মহারা হইনি! অন্তরে যত জ্বালা, যত যন্ত্রণাই থাক না কেন, একবার মাত্র প্রভুর দর্শনেই সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে, মনে পরম শান্তি, পরম আনন্দলাভ হয়েছে। তাঁর একটিমাত্র সুধা-মধুর বাণীতে হৃদয়-বীণা বেজে উঠেছে, অতীতের যত কিছু অসঙ্গতি সব দূর হয়ে গেছে; তাঁর একটি মাত্র করুণা-দৃষ্টি-পাতে দেহ-মনের প্রতি অণু-পরমাণু সাড়া দিয়েছে, তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণে সকল বাধা, সকল বিঘ্ন ভুলে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেছে।

বস্তুতঃ, কৃষ্ণপ্রেমিক সে-ই, "কৃষ্ণপ্রেম হয় যাঁর দূর দরশনে"—চৈঃ চঃ ২।১৬, এবং "যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ-নাম"—ঐ।

সমাগত দর্শনার্থীগণের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে, গললগ্নীকৃতবাসে, যখন আমার প্রভু নরহরি তাদের দর্শন-দান করে তাঁর অমৃতবিজয়ী বালক-কণ্ঠে মধুর 'হরিধ্বনি' করতেন, তখন সে হরিধ্বনির সঙ্গীতে নিখিল চিত্তের সুপ্ত তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হয়ে উঠত; জন্মজন্মার্জ্জিত

কঠিন কর্ম্ম-বন্ধনের গ্রন্থি যেন নিমেষের জন্য ছিন্ন হয়ে হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত হ'ত, এবং সেই পরম প্রেমময়ের প্রেম-বন্যার তরঙ্গ এসে সে-দুয়ারে আঘাত করত। তাঁর করুণাধন্য দর্শনার্থীগণও তখন হরি-ধ্বনি ক'রে পুলকিতচিত্তে অশ্রু বিসর্জন করত, ঠিক মহাপ্রভুর লীলায় যেমন "হরিবোল্ বলি' কাঙাল প্রেমে ভাসি' যায়"—চৈঃ চঃ ২।১৪। প্রকৃত-পক্ষে এই হ'ল প্রভু নরহরির স্বরূপ। তাঁর প্রেমামৃতপারাবার শুধু তাঁর অন্তরেই আবদ্ধ থাকত না, করুণা ও মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়ে সে চতুষ্পার্শ্বেও পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ত। ভাগ্যবান্ ভক্তগণ সে প্রেমামৃতের কিঞ্চিৎ আস্বাদ পেয়ে ধন্য হত। 'মাধুর্য্যই ভগবত্তা-সার', এবং জীবের প্রতি করুণাতেই তার অভিব্যক্তি—এই সত্য প্রভু আপন জীবন-লীলায় সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত করেছেন।

এইরূপে বাল্যকাল থেকে অখণ্ড-যোগে অবিচলিত থেকে, দুরূহ সাধনভক্তিযোগে সিদ্ধি-লাভ ক'রে প্রভুপাদ যে অমৃতফল লাভ করেছিলেন, তা' স্বীয় মহিমায়, মাধুর্য্যে ও পরিপূর্ণতায় অনবদ্য। এই স্বয়ং প্রকাশমান অমৃত-জ্যোতিতে তিনি যে সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিলেন, কায়মনোবাক্যের প্রচেষ্টা দ্বারা তাই জীবজগতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সত্যের এই যে স্বরূপ, জ্ঞানের এই যে আলোক—এ যুক্তি-তর্কের ফল নয়, পরন্তু এ প্রত্যক্ষ-দর্শনের অভ্রান্ত অভিজ্ঞতা। তাঁর এই সত্য-দর্শন, এবং তদনুযায়ী তাঁর লীলা-আচরণসমূহ ভক্তি-শাস্ত্রের সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সত্যের জ্যোতিতে জীবের অজ্ঞান-তম দূর ক'রে প্রভু তাদের শাশ্বত শান্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, এবং বহু মায়াচ্ছন্ন নরনারীকে ভগবন্মুখী ক'রেছেন। নিজের মধ্যে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও করুণাশক্তি প্রকট করে মায়ামুগ্ধ মানবের কর্ত্তব্য, তাদের ধর্ম্ম ও তার সাধন উপদেশ করেছেন। ঘোর কলিপ্রভাবে মায়াচ্ছন্ন মানুষ যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে অক্ষম, যখন "কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ"—গীতা-৪।১৬, তখন প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপদেশ করে তা' তাদের উপলব্ধিও করিয়েছেন। যে মহাপুরুষ আজীবন সুকঠিন সাধনা ক'রে দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ পূর্ব্বক স্বয়ং আস্বাদন করতঃ জগৎকেও আস্বাদন করিয়েছেন, তাঁর ভুবন-মঙ্গল লীলা সমূহ আবার লোকচিত্তে আবির্ভূত হ'য়ে বিশ্বের অকল্যাণ দূর করুক, এই প্রার্থনা। এই সকল লোকোত্তর মহামানবের চরিত্রের প্রভাব অমোঘ, অসীম তাঁদের ভুবনপাবন শক্তি, সুদুর্ল্লভ তাঁদের আবির্ভাব, অমর তাঁদের লীলা। এই সাক্ষাৎ ভগবদবতার মহাপুরুষগণের আবির্ভাবে পিতৃকুল আনন্দিত হন, দেবগণ নৃত্য করেন এবং অনাথা ধরণী সনাথা হন :

"মোদন্তি পিতরঃ, নৃত্যন্তি দেবতাঃ, সনাথাচেয়ং ভূর্ভবতি"—নারদভক্তিসূত্র-৭১,

এবং কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা সা বসতীশ্চ ধন্যা,

নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ম্"—পদ্মপুরাণ।

মঙ্গলভাষণ

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—এই মহাবাক্য স্মরণ ক'রে শ্রীশ্রীনরহরিপ্রভু-আচরিত ও প্রদর্শিত পথ গ্রহণ ক'রে ত্রিতাপ-পীড়িত নরনারী চিরশান্তি লাভ করুক, সকল কামনা নিবৃত্তি-পূর্ব্বক শ্রীভগবৎপদাম্বুজমধুপানে নিমগ্ন হোক।

শ্রীরূপগোস্বামীর ভাষায় বলি :

"সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম বিষমসংসার সরণী
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু 'গুরু'-লীলা-শিখরিণী"—বিদগ্ধমাধব ১।১।

'নমস্কার'-রূপ ইষ্টদেব-বন্দনা

পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম-বিরচিত মহাপ্রভু-বন্দনা "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ", এই ছন্দে আমার ইষ্টদেব পাতালদেবের বন্দনা করি :

(১)

লোকে লোকে সন্তু ধর্ম্মা মনোজ্ঞাঃ,
নানাদেবানান্তু লীলা-বিলাসাঃ,
শাস্ত্রগ্রন্থা বা সসিদ্ধান্তরত্নাঃ,—
মায়াপারে যা ন নেতুং সমর্থাঃ।

(২)

অস্তু ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে বিধাতা,
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুঃ প্রভুর্লোক পাতা,
কৈলাসে দেবাদিদেবো মহেশঃ—
কো মে মোহান্ধস্তু জ্ঞানদাতা?

(৩)

অস্তু শ্রীকৃষ্ণস্তু গোলোকনাথঃ,
সন্তু শ্রীরামাদয়োঽন্যাবতারা ;
মায়ামগ্নে কো ময়ি ত্রায়তে বা,
কো বা মে নাথো বিনা দীননাথম্?

(৪)

ত্রাতা পাতা মে তু পাতালবাসী,
গূঢ়ং রূপং যস্ত গুপ্তং গুহায়াম্ ;

প্রাণপ্রেয়ান্মে হি নান্যোঽস্তি কশ্চি-
দ্দাসোঽহং তস্যাঙ্‌ঘ্রিপদ্মস্য নিত্যম্‌।

'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে স্তুতি করি :

(৫)

পাতালে যো বসতি সততং সন্নিবৃত্ত্য স্বরূপং,
যো জ্ঞানাব্ধৌ প্লবন-কুশলো ভক্তলোকানুরক্তঃ,—
সোঽয়ং স্বামী পরম-পুরুষঃ শুদ্ধবুদ্ধস্বভাবো,
দিব্যজ্যোতির্বিলসতু তরাং হৃদ্‌গুহায়াং চিরং নঃ।

'মালিনী'ছন্দে তাঁর জয়গান ক'রে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করি :

(৬)

জয়তি জয়তি দেবঃ শ্রীলপাতালবাসী,
জয়তি জয়তি তস্য প্রেমলীলাবিলাসঃ,
জয়তি ললিতলাবণ্যামৃতশ্রীস্বরূপঃ,
করুণরসিকচন্দ্রঃ সচ্চিদানন্দরূপঃ।

(৭)

জয়তি জয়তি দেবঃ সৌরভীনন্দনোহংসো
নরহরিরবধূতশ্ছন্নসন্ন্যাসবেশো,
বসতি গিরিগুহায়ামাবৃত-স্ব স্ব-রূপঃ
অগতিজনগতিঃ সঃ প্রেমকারুণ্যমূর্তিঃ।

—— ০ ——

ইষ্টদেব-বন্দনা-মূলক সংস্কৃত শ্লোকসমূহের ভাবানুবাদ

(১)

জানি জানি আছে বহু ধর্ম,
শত শাস্ত্রে সৎ মর্ম,
আছে কত দেবের অবতার যে—
আমারে করিবে নিস্তার কে ?

(২)

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা সৃষ্টি-কর্ত্তা,
ক্ষীরসায়রে বিষ্ণু ভুবন-ভর্ত্তা,

থাকুন শিব কৈলাস পর্ব্বতে,—
হবে না কেউ সাথী আমার পথে।

(৩)

গোলোকপতি রহুন শ্রীগোলোকে,
নানাবতার থাকুন নানা লোকে ;—
অকূলেতে কোথায় পাব তরী,
বিনা দীননাথ নরহরি ?

(৪)

'স্বরূপ ঢাকি' গুপ্ত গুহায় যে জনে,—
জীবন-মরণ বাঁধা তাঁরি চরণে ;
আমার ত্রাতা পাতা পাতালবাসী—
জন্মে জন্মে আমি তাঁরি দাস-ই।

(৫)

পাতালেতে বসতি যাঁর স্বরূপ-আবরণে,
জ্ঞানসাগরে প্লবন-পটু, প্রীত ভক্তজনে ;—
এই সে স্বামী পরমপুরুষ, শুদ্ধবুদ্ধ-মতি,—
হৃদয়-গুহা আলো করুক তাঁর সে দিব্যজ্যোতি।

(৬)

জয় জয় দেব পাতাল-নিবাসী,
জয় পূত প্রেম-লীলা-বিলাসী,
ললিতলাবণ্যামৃতময় তনু রুচির,
করুণ রসিক চিদানন্দ সুচির।

(৭)

জয় জয় দেব সৌরভী-নন্দন,
নরহরি অবধূত্ সন্ন্যাসী ছন্ন,
গিরি-গুহাবসতি আবৃত-স্বরূপ,
গতিহীনদীনগতি করুণার রূপ।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর লীলাসঙ্কলন

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—গীতা ৬।২২

"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতমিতি"

—ছান্দোগ্য ৬।১।৩

কয়েকজন একনিষ্ঠ গুরুভক্ত অনেকদিন থেকেই আমাকে বলছেন,—"আপনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে প্রায় পাঁচবৎসর অবস্থান করেছেন। শ্রীগুরুদেবের একজন অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্যরূপে আপনি তাঁর শ্রীচরণসেবা পেয়ে ধন্য এবং তাঁর নিগূঢ় ও গুহ্য ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত। উপরন্তু বাহিরে শিষ্যদিগের চিঠি পত্রের আদানপ্রদানে শ্রীগুরুদেবের অন্যতম প্রধান সাহায্যকারী হিসাবে শিষ্যগণের সহিতও নিবিড়ভাবে জড়িত। শ্রীগুরুদেবের সহিত এই ঘনিষ্ঠ অবস্থানের যে অমূল্য অভিজ্ঞতা আপনি অর্জন করেছেন, সে-অভিজ্ঞতার অন্ততঃ কিছুটা বিবরণও আমরা জানতে চাই। জানতে চায় আরও অগণিত ভক্তবৃন্দ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণও—কিসের জন্য আপনি আপনার লৌকিক জীবনের সকল আশা আকাঙ্খা পরিত্যাগ ক'রে সারাজীবন তাঁর শ্রীচরণে ও তাঁর আশ্রম-সেবায় প'ড়ে রইলেন। আপনি লেখনী ধরুন, যা' পারেন তাই লিখুন—শ্রীগুরুদেবই আপনাকে শক্তি দেবেন।"

এ অনুরোধ বহুদিনের, ইংরাজী ষাট দশকের প্রথমে। তখন থেকেই ভেবেছি শ্রীগুরুদেবের অপার লীলা-সমুদ্রের আমি কতটুকুই বা জানি। তাই এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য শিষ্যদের নিকট শ্রীগুরুদেবের স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি সংগ্রহ ব্যাপারে ও নির্ভরযোগ্য শিষ্যগণের নিকট থেকে তাঁর লীলা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে বহু বৎসর অতিক্রান্ত হয়। লেখা শুরু করবার প্রাকালে মনে হয়েছে, "ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্, ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।"—আমার মত একজন মহাপাপী, নরকের কীটানুকীট 'দরিদ্র পাপীয়ানে'র পক্ষে এই অপার মহিমান্বিত 'শ্রীনিকেতন'-মহাপুরুষের লীলা-সঙ্কলন, বামন হয়ে চাঁদ ধরবার চেষ্টার মতই ধৃষ্টতা। তথাপি ভক্ত-অনুরোধে কার্য্য শুরু করার সঙ্কল্প করেছি; কারণ ক্রমে বেলা গত হচ্ছে। শ্রীগুরুদেবের সেই চৈতন্যদায়িনী বাণী—'দিন কি কমিতেছে না বাড়িতেছে?' হৃদয়ে চিরউজ্জ্বল রয়েছে। গুরুভাইয়েরা যা' বলেছেন তা' নিঃসন্দেহে আমার একটি মহৎ কর্ত্তব্য। তাই মাথার

উপর শত বাধা বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও সেই পরমপুরুষ পাতালপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত মণপ্রাণ অভিনিবিষ্ট ক'রে এই মহৎ কার্য্য শুরু করলাম।

কিন্তু যাঁদের জন্য লিখছি তাঁরা প্রথমেই জানতে চাইবেন কেন আপনি এই আশ্রমে এলেন? এই 'কেন'র উত্তরে আমার পূর্ব্ব জীবনের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেই হবে। তারপর প্রশ্ন আসবে, 'কীসের লোভে, কোন্ মহাবস্তুর সন্ধানে আপনার মত কঠোর বাস্তববাদী একজন পুরা 'নাস্তিক' বস্তুবিজ্ঞানী, একটি অখ্যাত অজ্ঞাত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর আশ্রমে রয়ে গেলেন? আপনি তো আত্মীয়-স্বজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও লৌকিক বেশভূষা কিছুই ছাড়েননি; তবে এখানে প'ড়ে থাকলেন কেন? ধর্ম চর্চ্চাই যদি করবেন তো আপনার পক্ষে উন্মুক্ত ছিল নিখিল ভারত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বিপুল বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সমূহ, উচ্চতর দর্শন ও ধর্মসম্বন্ধে গবেষণারত Theosophical Societyগুলি, জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন-চর্চ্চার বহু লোভনীয় সংস্থা সকল—যে সকল স্থানে হয়তো সার্থক হ'ত আপনার জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন অন্বেষার সুগভীর আগ্রহ।'

অনেকবার এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি এবং হেসে সে সব প্রশ্ন এড়িয়ে গেছি। আজ আমার পাঠক পাঠিকাগণ সেই প্রশ্নই করবেন জানি, কিন্তু আজ আর এড়িয়ে যাব না। কারণ তা' হ'লে আমার এই দীর্ঘ কালের নিরবচ্ছিন্ন গুরুসঙ্গ ও তাঁর আশ্রম-সেবার সুদুর্লভ অভিজ্ঞতার পরিচয় চিরদিনই ভক্তজনগণের কাছে অজ্ঞাত রয়ে যাবে। সব প্রশ্নের জবাব দিতে এবং তাঁদের কৌতূহল মেটাতে আজ লেখনী ধরেছি।

কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। বল্‌ব মনে করলেও সব জিনিষ ব'লে বোঝানো যায় না। কথাটি রহস্যময় মনে হ'লেও তুলনা দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে করুন প্যারিসের মিউজিয়মে গিয়ে আমি একটা জগদ্বিখ্যাত ছবি দেখে এলাম, যেমন দ'ভিঞ্চির 'মোনালিসার হাসি'। এখন এই ছবিটা যে ঠিক কীরকম তা' আমি ভাষা দ্বারা কোনোক্রমেই আপনাদের বোঝাতে পারব না। মুখে বড়জোর কতকগুলি Superlative adjective দিয়ে ছবিটার প্রশংসা করতে পারি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছবিটি সম্বন্ধে কোনো সঠিক ধারণা আপনাদের করিয়ে দিতে পারব না, যদ্দারা আপনারা এর যথার্থ appreciation করতে পারেন। ছবিটির মূল্যবোধ ঠিকমত বুঝতে হ'লে বা এর চিত্রকলারস সম্যক্‌রূপে আস্বাদ করতে হ'লে, প্রথমতঃ, আপনাকে চিত্র-রসিক হ'তে হবে, দ্বিতীয়তঃ, ছবিটি স্বচক্ষে দেখতে হবে। আবার এই জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মনে করে তারা সব-জান্তা, সব কিছুই বুঝতে পারে, এক কথায় সর্ব্ব-

শক্তিমান্ তারা। তাদের প্রকৃত জিনিষ বোঝাতে গেলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, এবং তাদের যে বোধশক্তির প্রভূত দৈন্য রয়েছে, একথা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলে তারা ক্রুদ্ধ হবে। এ বিষয়ে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। Albert Einstein যখন তাঁর যুগান্তকারী General Theory of Relativity প্রচার ক'রে বৈজ্ঞানিকদের বিস্ময়-বিমূঢ় ক'রে দিয়েছেন, সারা দুনিয়ায় যখন এই Theory সম্যক-ভাবে বুঝবার মত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়, তখন ট্রেনের কামরায় একটি ছেলেকে তার সহযাত্রী বন্ধুকে বলতে শুনলাম, "Relativity Theory—ও এমন কিছুই নয়; relative velocity-র ব্যাপার মাত্র"। আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, ছেলে দুটি I. Sc. 2nd year এ পড়ে; এবং সম্প্রতি Dynamicsএ relative velocity পড়ানো হচ্ছে ওদের। শুনে আমার কৌতূহল মিটল।

কিন্তু এরূপ 'বোদ্ধা' দু-একজন নয়, আমাদের আশেপাশে হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে বর্ত্তমান—যারা কিছুমাত্র জ্ঞান অর্জ্জনের চেষ্টা না ক'রেও উচ্চতম ও দুরূহতম জ্ঞানের অধিকারী ব'লে নিজেদের মনে ক'রে থাকে।

এতসব কথা বলবার কারণ হচ্ছে এই যে আমার দীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন সাধুসঙ্গপ্রভাব ও আশ্রম-সেবা পরিচর্য্যা-রূপ ভক্তি-সাধনপথে আমি যে সকল দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, সেগুলি ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করতে যতই চেষ্টা করি না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠকের হয়তো তা' আদৌ বোধগম্য হবে না। কারণ, এসব ব্যাপারের যথার্থ উপলব্ধির উপায় হ'ল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনজনিত চিত্তশুদ্ধি। কর্ম্মরূপ মলিনতা দ্বারা আমাদের হৃদয় আবৃত হয়ে রয়েছে। যে যতদূর সাধনা দ্বারা চিত্তের এই মলিনতার আবরণ যতটা পরিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে এবং তদ্দ্বারা ধর্ম সাধনপথে যেটুকু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, এ সব অনুভূতি তার কাছে ততটুকুই স্পষ্ট ব'লে প্রতীয়মান হবে।

কিন্তু ধর্মসাধনসম্ভূত কিংবা মহৎ-কৃপা-সঞ্জাত অপ্রাকৃত অনুভূতিসমূহ ছাড়াও যে সকল প্রাকৃত ঘটনা এই মহাপুরুষের লীলা-কাহিনীকে পুষ্ট করেছে, সেগুলিরও যথেষ্ট মূল্য আছে। উৎসুক ও শ্রদ্ধাবান্ পাঠকবর্গ সেই সব লৌকিক ঘটনাবলী পাঠ ক'রেও যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

এখন সেই প্রথম প্রশ্নে ফিরে আসা যাক—কেন আমি এখানে এলাম। এই প্রশ্নের সঙ্গে আমার তদানীন্তন জীবনকালের কিছু বৃত্তান্ত অপরিহার্য্যরূপেই জড়িত, তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে সেগুলি বিবৃত করছি। অথচ নিজের বিষয়ে লিখতে আমি বিশেষ

সঙ্কোচ অনুভব করি। আত্মজীবনী লিখে আত্মপ্রচার করা আমার নীতিবিরুদ্ধ। আমার সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী, তাঁরা আর পাঁচজনের কাছে সে খবর জানতে পারবেন। নিজেকে জাহির করবার মত হীন উদ্দেশ্যে আমি লেখনী ধারণ করিনি : পরন্তু, শ্রীশ্রীগুরুদেবের অলৌকিক লীলা-কাহিনীর সুধাসিন্ধু—যার বিন্দুমাত্র আমার মহাসৌভাগ্যক্রমে আমি এই দীর্ঘ দিনের নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানের ফলে কখনো পান করেছি, ভক্তগণকে সেই অমৃত-আস্বাদন কিছু জ্ঞাত করাবার জন্যই আমার জীবন-সন্ধ্যায় এই আমার অন্তিম প্রয়াস।

এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কোনো জলস্রোতের গতিপথে যদি কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে সে সহজেই ব'য়ে যায় এবং তাতে তার স্রোতোবেগের শক্তির কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই গতিপথে যদি কোনো বাধা থাকে, তবে তার গতি তদ্দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্রোতোবেগ প্রবল হ'লে ঐ প্রতিবন্ধককেও সে অতিক্রম ক'রে প্রবাহিত হয়ে চলে। তবে প্রতিবন্ধক যত গুরুতর হবে, তাকে অপসারণ করতে স্রোতোবেগকেও তত প্রবল হ'তে প্রবলতর হ'তে হবে। অর্থাৎ গতিপথের বাধাগুলির বিপুলতার পরিমাণই নদীপথের অন্তর্নিহিত স্রোতোবেগের পরিমাপক হবে। লৌকিক জীবনে যার ধন, মান, বিদ্যা, খ্যাতি যত বেশী উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময়, সেই জীবন পরিত্যাগ ক'রে অজ্ঞাত জীবনের অন্ধকারে বিলীন হ'তে চাওয়া তারপক্ষে ততই দুরূহ। যদি বাস্তবিকই কেউ এরূপ হয়, তবে বুঝতে হবে তার আকর্ষণকারীর শক্তি অতি প্রচণ্ড। স্বয়ং শ্রীরাধারাণীর লৌকিক জীবনে প্রলোভনের সবকিছু থাকতেও তিনি নারীর 'কুলধর্মরূপ সেতু' ও 'গুরুজনরূপ' উচ্চ 'শিখরীসমূহ' অনায়াসে অতিক্রম ক'রে প্রবলবেগে কৃষ্ণ-অনুরাগ সমুদ্রে ধাবমানা হয়েছিলেন,—এতে সেই কৃষ্ণপ্রেমের আকর্ষণের অলৌকিক প্রাবল্যই সূচিত করে—বিদগ্ধমাধবে ৩।১৩-"ছিত্বা দূরে" শ্লোকে এবিষয়ে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। আকর্ষকের আকর্ষণ যে কত বিপুল, কত প্রবল তা প্রমাণ করতে হ'লে, আকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতিকূল প্রতিবন্ধকগুলির বিরাটত্বও অবশ্যই দেখাতে হবে। ভিখারী অনায়াসেই ফকীর হ'তে পারে, কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ গোস্বামীর মত নৃপতি-প্রতিম, মহাপণ্ডিত ও প্রভূত ক্ষমতা ও খ্যাতির অধিকারীগণকে কাঙাল করতে হ'লে, আকর্ষণকারীর শক্তি অসম্ভবরূপেই প্রবল হ'তে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সব ছেড়ে কাঙাল হয়েছে, তার পূর্ব্ব জীবনের বিরাট সম্ভাবনাগুলি অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে; এবং প্রতিকূল বাধাগুলি যত বিপুল হবে, আকর্ষকের শক্তিও তদনুপাতে প্রবল ব'লে জানতে হবে।

এবার পূর্ব্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বি. এ. পরীক্ষা দেবার সময় আমার জীবনে একটি অতি দুর্ভাগ্যজনক বিপর্য্যয় এসে উপস্থিত হয়। আমার একমাত্র মামা শৈশবাবধি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। স্নেহ তিনি আমাদের ভাইবোনদের সকলকেই করতেন, তবে আমার প্রতি তাঁর স্নেহের আধিক্যের কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাই শিশুকাল থেকেই আমার লেখাপড়ার প্রতি অত্যন্ত আসক্তি দেখে, তিনিও আমার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ বললে অত্যুক্তি হবে না যে আমার ছাত্রজীবনের সকল উৎসাহ ও প্রেরণার যেমন প্রধান উৎসস্থল ছিলেন তিনি, তেমনি আমার বিদ্যাশিক্ষার প্রচেষ্টাকে কার্য্যকরী ক'রে তুলবার দায়িত্বও প্রধানতঃ তিনিই নিয়েছিলেন। আমার সেই একমাত্র মামা তখন বহরমপুরে Superintendent of Post Offices-এ Head Clerk-রূপে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর আশ্রয়েই আমার চার বছরের কলেজ-জীবন অতিবাহিত হয়। Final পরীক্ষা দেবার ঠিক মাস দেড়েক আগে আমার এই মামা, আমার শিক্ষা-জীবনের প্রধান উৎসাহদাতা ও অভিভাবক নিদারুণ Typhoid রোগে শয্যাশায়ী হলেন। 'নিদারুণ' এই জন্য বলছি যে তখনকার দিনে Typhoid রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না এবং এই রোগে আক্রান্ত হ'লে ডাক্তাররা রোগীর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র নিয়তির উপরই নির্ভর করতেন। কিছুদিন পরে মামীমাও পড়লেন, তাঁর হ'ল Double Pneumonia। গৃহে দুইজন কঠিন রোগাক্রান্ত রোগী জীবন-মরণ-সংগ্রামে নিরত, কখন যান, কখন যান—এই অবস্থা। দুবেলা ডাক্তাররা আসছেন—তাঁদের মুখ গম্ভীর, বাক্য সংক্ষিপ্ত। এদিকে family-র অবস্থা কী-রূপ শুনুন। অতিবৃদ্ধা দিদিমা ও মাসীমা—দুজনেই শোকে উন্মত্তপ্রায়; তাঁদের সামলানো—সে এক মহাসমস্যা। আর এই সব ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় ক'রে, এই তুমুল তুফানে অক্ষম হাতে হাল ধ'রে আছি আমি একা। দু'জন মৃত্যুপথযাত্রী রোগী—শুধু রোগী নয়, আমার একান্ত নির্ভর-স্থল, আমার শিক্ষা-জীবনের প্রধান উৎসাহদাতা ও দাত্রী—তাঁদের ঔষধপথ্য দেওয়া, সেবাশুশ্রূষা করা; দুজন অবুঝ বৃদ্ধার উন্মত্ত আবেগ ও অস্থিরতার ঝড় সামলানো, তাদের জন্য রান্না করা, তাদের বোঝানো, খাওয়ানো; দেড় মাইল দূরবর্ত্তী ডাক্তারের কাছে দুবেলা ঔষধ আনতে যাওয়া; এরপর নিজের—নিজের যে কী করতে পারতাম, তা' বুঝতেই পারছেন। খাওয়া-দাওয়ার কথা ছেড়ে দিন, নিদারুণ ভাবনা-চিন্তাতেই উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠলাম। এমনি অবস্থায় পরীক্ষার নির্দ্ধারিত দিন কিন্তু ঠিকই এগিয়ে আসতে লাগল। আমার এই বিপর্য্যয়ের কথা কয়েকবার আমার প্রিয় প্রোফেসরদের জানিয়েছিলাম। তাঁরাও এই সংবাদে অত্যন্ত

উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসা পর্য্যন্ত এসে খোঁজ খবর নিতেন। এদিকে রোগীদের অবস্থার ক্রমিক অবনতিই দেখা যেতে লাগল। হতাশায় আমি একেবারে ভেঙে পড়লাম। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে, প্রোফেসরদের আমার এই মানসিক অবস্থার কথা জানালাম এবং বললাম, আমার পক্ষে পরীক্ষা দেওয়া একেবারে অসম্ভব। তাঁরাও অনেকে আমার কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করলেন, কিন্তু বেঁকে বসলেন যিনি কর্ণধার, আমার কলেজীয় শিক্ষার নিয়ন্তা, স্বয়ং প্রিন্সিপ্যাল। আমার সব আবেদন-নিবেদন দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান ক'রে তিনি 'হুকুম' করলেন, পরীক্ষা আমাকে দিতেই হবে, ফল যাই হোক না কেন। শিক্ষকদের আমরা চিরদিন দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি—আজও তার অন্যথা করতে পারলাম না। তখনকার দিনে নিজ স্বার্থে শিক্ষকদের অমর্য্যাদা করিনি আমরা কখনও—যদিও আমরা 'বিদ্রোহী' আন্দোলনের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট এবং আমাদের সময়েই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় "সন্ত্রাসবাদী' বা terrorist-দের আবির্ভাব। আমাদের সময় ছাত্ররা শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের মর্য্যাদা দিতে জানত, পরের হিতার্থে আত্মসুখ বিসর্জ্জন করতে পারত এবং দেশের জন্য হাসিমুখে জীবন বলি দিতে পারত। তাই প্রিন্সিপ্যালের 'হুকুম' গুরুর আদেশ-জ্ঞানে, নিজের সমূহ ক্ষতি হবে নিশ্চিত জেনেও হাসিমুখে পালন করলাম; সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থচিত্তে, নিদারুণ দুর্ভাবনায়, অস্থির মস্তিষ্কে, একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে শুধু প্রিন্সিপ্যালের 'হুকুম' তামিল করতে পরীক্ষা-হলে গিয়ে বসলাম। বলা বাহুল্য, যা' ভেবেছিলাম, ফল তাই হ'ল। পরীক্ষা-হলে ব'সে আমার অতি প্রিয় অভিভাবকদ্বয়ের মৃতপ্রায় মুখ দু'টিই কেবল চোখের সমুখে ভেসে উঠতে লাগল—মনে আর কোনো কিছুই আনতে পারলাম না। চোখের জলে ভেসে কলম হাতে শুধু ব'সে রইলাম, প্রোফেসররা দু'একবার আমার অবস্থা দেখে গেলেন নীরবে। 'নিষ্ঠুর' প্রিন্সিপ্যাল একবার যথারীতি তাঁর পর্য্যবেক্ষণকার্য্য সম্পাদন ক'রে গেলেন, আমার অসহায় অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। প্রায় blank paper দিয়ে বেরিয়ে এলাম। প্রিয় প্রোফেসররা ছুটে এলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। যা' শুনলেন, তাতে তাঁদের দুঃখের সীমা রইল না; বললেন, "এ সব প্রশ্নের উত্তর তুমি তোমার সহপাঠিদের অনেকবার শিখিয়েছ।" কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "জানি, স্যার; কিন্তু আমার brain আজ blank, completely—।" তাঁরা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "থাক, আরো তো papers আছে। ধৈর্য্য ধ'রে মাথা ঠিক রেখে পরীক্ষা দাও।" তাঁদের কথা শুনলাম, দু'একটা Paper লিখলামও ঠিক মত। কিন্তু ওদিকে অসুখের বাড়াবাড়ি, আর এদিকে ঠিক Parallel reaction এ আমারও সর্ব্বনাশ

হয়ে গেল; তৃতীয় দিনে কিছুই লিখতে পারলাম না—সেও প্রায় blank paper দিয়ে আসতে হ'ল। মাত্রতো তিনটে দিন—কোথা দিয়ে চলে গেল কে জানে? কিন্তু এর ফলে আমার জীবনের এক বৃহৎ বিপর্য্যয় ঘ'টে গেল। পরীক্ষা হ'য়ে গেল। আমার অবস্থা তখন যেন ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, বিপর্য্যস্ত একটি তরীর ধ্বংসাবশেষ। দুঃখিত হ'লেন আমার প্রিয় প্রোফেসররা—সম্ভবতঃ আমার চেয়েও বেশী।

প্রোফেসর পি. রায় উদাস কণ্ঠে বললেন, "মানুষ যা' ভাবে তা' সব সময় সফল হয় না। প্রশ্ন যা' এসেছিল, তা' এতই সহজ যে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করা তো তোমার পক্ষে কিছুই নয়, উপরন্তু তোমার স্বাভাবিক অবস্থায় তুমি যে record-marks পেতে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।" তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "But man proposes, God disposes. However, prepare yourself for the next chance. M. Sc. পরীক্ষাটাই আসল; সেখানে তোমাকে কেউ রুখতে পারবে না।"

দিন চলে যায়। বাড়ীর অসুখ ক্রমে সেরে এল। কিন্তু পড়াশুনা আর কিছুই করলাম না আমি। এদিকে Pass পরীক্ষা এগিয়ে এল। মনে দুরাশা ছিল, নিজের অসুখ বিসুখের অজুহাতে Pass পরীক্ষাগুলো আর দেব না, যাতে এই বিপর্য্যয়ের গ্লানির ছাপ এড়াতে পারি। কিন্তু তা' হবার নয়—সতর্ক Principal চারদিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং আমাকে পরীক্ষা দিইয়ে তবে ছাড়লেন। ভেবেছিলাম কোনোরকমে 'ফেল' করে এই কলঙ্কের দাগ মুছে দেব—কিন্তু আমার ভাগ্য-বিধাতা তা' হ'তে দিলেন না। যথাসময়ে আমার ছাত্রজীবনের এই দারুণ দুর্ঘটনায় বিপর্য্যস্ত পরীক্ষার হতাশাজনক ফল সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত হ'ল। আকস্মিক দুর্ঘটনায় চারধাপ পিছনে পড়েছি—অর্দ্ধমৃত অবস্থায়। ক্ষোভে, লজ্জায় আর কারো দিকে চাইতে পারলাম না; মনে হ'ল এ জীবনের আর কোনো প্রয়োজন নেই। পরীক্ষার প্রথম স্থান ছাড়া অন্য কোনো স্থান সম্পূর্ণরূপে কল্পনার বহির্ভূত ছিল আমার এবং আমার প্রোফেসরদেরও। তাই পড়াশুনা আর করবই না স্থির করলাম। কিন্তু আমার প্রিয় প্রোফেসর পি. রায় আমাকে ডেকে সব বুঝিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এভাবে হতাশ হয়োনা। জীবনে অনেক ups and downs আসে; কিন্তু তাতে ভেঙে পড়লে চলবে না। আমার জীবনে তোমার মত ছাত্র কখনো পাইনি, তোমার প্রতিভা জয়যুক্ত হবেই। হতাশ না হয়ে এগিয়ে চল, প্রতিভার অপমৃত্যু হ'তে দিও না। তোমাকে আমরা গণিত-বিজ্ঞান-জগতের একজন শ্রেষ্ঠ গবেষকরূপে দেখতে চাই।" আমার পরবর্ত্তী পাঠ-নির্দ্দেশ তিনিই ক'রে দিলেন এবং Science College এর প্রখ্যাত প্রোফেসর Dr. N. Sen

এর নামে একটি পত্র. আমার হাতে দিলেন; ঐ পত্রের মর্ম্ম এইরূপ, "আপনার কাছে একটি প্রকৃত গুণী ছাত্র পাঠালাম, একে আপনার মত ক'রে গ'ড়ে তুলতে আনন্দ পাবেন আপনি।"

I. C. S. পরীক্ষার মোহ তখন আমার কেটে গেছে। আমার তথাকথিত হিতৈষীরা এতদিন ভুলপথে নিয়ে চলেছিলেন আমায়। ঐ পরীক্ষার জন্য যথারীতি প্রস্তুত হয়েছিলাম আমি—কিন্তু আসল কথাটিই তাঁরা আমাকে জানাননি যে পরীক্ষাটা দিল্লীতে দিলে সার্থকতার কোনো আশাই নেই; সাফল্য অর্জ্জন করতে হ'লে পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই London যেতে হবে। যখন বিষয়টা পরিষ্কার হ'ল, তখন আকাশ থেকে পড়লাম। দেখলাম যারা ঠিকপথে চলেছিল—তারা যথা-সময়ে London এ উপনীত হয়েছে, আমার চেয়ে কয়েক নম্বরে অগ্রবর্ত্তী করুণা-কেতন সেন ও আমার পরবর্ত্তী স্থানাধিকারী মৃগাঙ্ক বসু। মৃগাঙ্কদের বাড়ীতে যখন যাতায়াত করতাম, তখন মৃগাঙ্কর মা আমাকে স্নেহভরে বলতেন, "তোমরা দুজনেই তালপাতার সেপাই। এরকম থাকলে তো জীবনে কিছুই হবে না। I. C. S. পরীক্ষা দিতে হ'লে স্বাস্থ্য ভাল করতে হবে। এখন থেকেই ব্যায়াম-চর্চ্চা কর। মৃগাঙ্ক ব্যায়াম করছে, তুমিও কর।" মৃগাঙ্কর মায়ের কথায় বিশেষ আমল দিইনি আমি। I. C. S. পরীক্ষার জন্য দৈহিকস্বাস্থ্যের উপর জোর দেওয়ার কথাও যেমন আমার পরামর্শ-দাতারা কেউ আমাকে বলেনি, তেমনি, পরীক্ষা দেবার জন্য যে বিলাত যাবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে, তাও কেউ আমাকে জানায়নি। যখন সব জানলাম, তখন আর উপায় নেই। বিলাত যাওয়া আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং দেশে থেকেই যা' কিছু ইতি-কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে। প্রোফেসররা বললেন, "আধুনিক Mathematical Physics এ উচ্চতর গবেষণা করাই তোমার কাজ হবে। এবিষয়ে বহুদিকই খোলা আছে। Theory of Relativity ও Quantum Mechanics এর নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে Nuclear Physics এ গবেষণা চালাবে তুমি। অবশ্য তোমার পরবর্ত্তী প্রোফেসররাই এ বিষয়ে তোমার নিয়ামক হবেন ও তোমার পথ-নির্দ্দেশ করবেন। তবে এবিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে তুমি এসব গবেষণার উপযুক্ত পাত্র।"

সুতরাং তাঁদের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে উপনীত হলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Science College-এ—অতি সতর্ক ও সলজ্জ পদক্ষেপে। একবার যে পা পিছলেছে, সতর্কতারও তার যেমন সীমা নেই, অপ্রত্যাশিত বিপর্য্যয়ের আঘাতে যে নির্মম পরাজয় বরণ করেছে, লজ্জা রাখবারও তার তেমনি স্থান নেই। তবু অন্তরের দিকে চেয়ে

পেতাম পরম শান্তি—সেখানে চির উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজ করত আমার গুণী অধ্যাপকবৃন্দের পরম আশীর্ব্বাদ। তাই সম্বল ক'রে চলেছিলাম আগামী দিনের জয়যাত্রার পথে। পথে আলোক-বর্ত্তিকার উজ্জ্বল আলোকও দেখতে পেয়েছিলাম বিজ্ঞান কলেজের নতুন প্রোফেসরদের চোখে মুখে আমার জ্ঞানানুসন্ধিৎসার সপ্রশংস স্বীকৃতিতে। অতি অল্পদিনেই আমি প্রোফেসরদের যে বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠলাম তাই নয়, আমার special subject এর প্রোফেসর Dr. Kar আমার প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হয়ে শুধু যে অতিশয় পুলকিত হতেন তাই নয়, সময়ে সময়ে তাঁকে বিস্ময়ে হতবাক হতেও দেখেছি। আমার অনুসন্ধিৎসায় তুষ্ট হয়ে তিনি প্রায়ই আমাকে তাঁর প্রাইভেট্ চেম্বারে ডাকতেন এবং আধুনিক বিজ্ঞান-জগতের অনেক রহস্যের কথা নিয়ে আলোচনা করতেন যাদের এখনো সমাধান হয়নি। এ সকল সমস্যা হয়তো আমি একদিন সমাধান করব, অনাগত এই আশার আনন্দে মন ভ'রে উঠত আমার। সুতরাং আকস্মিক বিপর্য্যয়ের আঘাতে একবার পিছনে পড়লেও, পরবর্ত্তী পথে সতর্ক পদক্ষেপেই অগ্রসর হচ্ছিলাম এবং পথ চলতে আমার পথপ্রদর্শকদের অবিরাম উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে জয়যাত্রার পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। উৎসাহভরে German class এ ভর্ত্তি হয়ে German ভাষা শিখতে লাগলাম। M. Sc. পাঠ্যপুস্তক প্রায় সব শেষ ক'রে গবেষণার পুস্তকাদিতে গভীর মনোনিবেশ করেছিলাম এবং সর্ব্বত্রই আশার আলোক উজ্জ্বল হয়ে ছিল। কিন্তু তথাপি আমি নীরব সাধকরূপেই অগ্রসর হচ্ছিলাম ; বন্ধুবর্গের সহিত প্রায় সকল সম্পর্কই ছেদ করেছিলাম। আমার এই নীরব সাধনার কথা কিছুটা অবগত ছিল এ দেশের বন্ধু—আমার ছাত্র জীবনের সুখ-দুঃখের সহচর গৌরচন্দ্র মল্লিক এবং ওদেশের, অর্থাৎ আমেরিকার বন্ধু Marvin O'Connor। অথচ মজার ব্যাপার এই যে গৌর যেমন আমাকে মূলতঃ একটি বিজ্ঞানের ছাত্র ব'লে জানত, ভিন্‌দেশী এই বন্ধু Marvin আমাকে আবিষ্কার করেছিল একজন বিস্ময়কর কবি ও সাহিত্যিকরূপে। এর কারণ, সাহিত্য ও কবিতা ছিল আমার recreation, এবং এই দূরের বন্ধুর কাছে (যেহেতু সে বিজ্ঞান বুঝত না) আমার এই দ্বিতীয় রূপটাই প্রকাশ করেছিলাম। প্রোফেসরদের প্রেরণায় এবং এই দুটিমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধুর warm appreciation পাথেয় ক'রে আমি দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছিলাম আমার জয়যাত্রার পথে। জয়ী যে আমি হবই—এ বিষয়ে আমি একরূপ নিঃসন্দেহই হয়েছিলাম এবং তার উপর আশা ছিল—জার্ম্মাণী বা আমেরিকায় গিয়ে গবেষণা করার হয়তো সুযোগ মিলবে। পরিশ্রমও করছিলাম অত্যধিক মাত্রায়—আশা, একবারের বিপর্য্যয়ের পরাজয়কে সুদে-আসলে উসুল ক'রে

নেব আগামী পরীক্ষায়। পড়াশুনায় সময় সময় এতই বিভোর হয়ে থাকতাম যে নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শারীরিক স্মৃতিও বিস্মৃত হয়ে যেতাম। মনে আছে, একদিন গণিত-বিজ্ঞানের একটি জটিল তত্ত্বের আলোচনা করছিলাম বন্ধু গৌরের কাছে। আলোচনা করতে বহু সময় অতীত হয়ে যাওয়ায় বন্ধু প্রশ্ন করল, আমার খাওয়া হয়েছে কিনা। অনেক ভেবেও আমি তার উত্তর দিতে পারলাম না। অবশেষে হোষ্টেলে ফিরে পাচক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, খাওয়া আমার হয়নি সেদিন, আমার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। এরূপ ঘটনা একদিন নয়—গণিত-বিজ্ঞানের চিন্তায় এরূপ দেহ-স্মৃতি-বিস্মৃতির উদাহরণ তখন আমার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এ সব ঘটনা উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে আপনারা জানুন, একবার আঘাতের ধাক্কা খেয়ে কী প্রচণ্ড ও দুর্নিবার গতিতে চলেছিল আমার জয়যাত্রার রথ, যে-গতির সমুখে সমস্ত পরাজয়ের বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে এক অসামান্য সাফল্যের বিজয় মুকুটলাভের নিশ্চিত আশা দিনে দিনে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিল।

এইভাবে প্রায় এক বছর অগ্রসর হয়েছি,—সহসা আমার এই বিপুল গতি বাধাপ্রাপ্ত হ'ল একদিন বিনামেঘে এক বজ্রপাতের ফলে। পড়াশুনা শেষ ক'রে রাত্রে শুতে যাচ্ছি—হঠাৎ বুকটা কী রকম ক'রে উঠল, মনে হ'ল যেন এখনি heart-fail হয়ে যাবে। অতিকষ্টে আমার নিকটস্থ ঘরের এক বন্ধু—রোহিতাশ্ব মণ্ডলকে ডাকলাম। নেমে এলেন Hostel Superintendent সাহেব। অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে আমাকে একটি ভালঘরে স্থানান্তরিত করলেন এবং কলকাতার কোন্ চিকিৎসককে দেখাতে চাই, তাই জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আমার মনে এল, বন্ধু গৌরের কাকা কবিরাজ রামচন্দ্রমল্লিক মশায়ের কথা—যিনি আমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। আহ্বান করামাত্র তিনি এসে উপস্থিত হলেন এবং সে-রাত্রের মত আমাকে সুস্থও ক'রে তুললেন। কিন্তু সে-সুস্থতা সাময়িক মাত্র, অসুখ আমার সারল না। পড়াশুনা বন্ধ হ'ল, কলেজ যাওয়া হ'ল না আর। কবিরাজ মশায় প্রাণপণে চেষ্টা করলেন, অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম, কিন্তু রোগ থেকেই গেল। কবিরাজ মশায় বললেন, সময় নেবে। এখন পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও নিয়মমত ঔষধপথ্য ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই। এদিকে কলেজের ছুটি হয়ে গেল। অতি কষ্টে বাড়িতে এসে পৌছলাম। পিতামাতা ও অভিভাবকগণ আমাকে দেখে আকুল হয়ে উঠলেন। আমাকে সারিয়ে তুলবার জন্য সব চেষ্টাই করতে লাগলেন। স্থানীয় অভিজ্ঞ সব প্রকার চিকিৎসককেই দেখানো হ'ল। তাঁরা শুধু সাধারণ 'রোগী' ব'লে নয়, পরন্তু

তাঁদের মতে, নবদ্বীপের 'গৌরব' হিসাবেই আমাকে দেখলেন। সস্নেহে, সযত্নে, সাধ্যমত সব রকম প্রচেষ্টা ক'রে অবশেষে হতাশ হয়ে কলকাতাতেই নিয়ে যেতে বললেন।

কলকাতায় যখন ফিরে এলাম, তখন আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কবিরাজ মশায়ও হতাশ হলেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে কলকাতার শ্রেষ্ঠ এ্যালোপাথদের দেখানো হ'ল। তাঁরা সব রকম পরীক্ষা ক'রে রোগ কিছুই নেই ব'লে দুই একটি Tonic prescribe ক'রে তাঁদের ইতিকর্ত্তব্য শেষ করলেন। এদিকে দিনে দিনে আমি প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগোতে লাগলাম। আরো দু'একজন প্রখ্যাত কবিরাজের শরণাপন্ন হওয়া গেল। তাঁরাও কিছু করতে পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত হোমিও-প্যাথি ও আরও কিছু কিছু 'প্যাথি' করা হয়েছিল, যা'সব এখন স্মরণ নেই। মোট কথা, মানুষের চেষ্টায় যা' করা সম্ভব সবই করেছিলেন আমার অভিভাবকগণ, সহৃদয় বন্ধু গৌর ও তার কাকা কবিরাজ রাম মল্লিক মশায়। নবদ্বীপের চিকিৎসকগণও আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মানুষের সব প্রচেষ্টা বিফল ক'রে আমি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দ্রুত এগিয়ে চললাম।

লৌকিক চেষ্টা যখন বিফল হয়, তখনই মানুষ অলৌকিকের দিকে হাত বাড়ায়; তা' সে যতই নাগালের বাইরে হোক না কেন। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। বাড়ীতে কানা-ঘুঁষা, শুনতে লাগলাম—সাধু, সাধুবাবার কাছে একবার নিয়ে গেলে হয় না? কোন্ সাধুবাবা? পাতালের সাধুবাবা—আমার বড়দিদির গুরুদেব। এ প্রসঙ্গে আমার বড়দিদির বিষয়ে একটু বলা প্রয়োজন। বড়দিদি ছিলেন মৃত-বৎসা, সন্তান হয়ে বাঁচত না। অবশেষে কোনো এক কালীভক্ত শাক্তের কাছে ধর্ণা দিয়ে তাঁর কবচ নিয়ে দিদির একটি কন্যা হ'ল বটে, কিন্তু বেশ বড়সড় হয়ে, মায়ায় বেশ জড়ীভূত ক'রে কয়েক বৎসর পর সেও মারা গেল। বড়দিদি শোকে পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর সে শোক-কাতর উন্মত্ত মূর্ত্তি যে দেখেছে সেই চোখের জল ফেলেছে। বৎসরের পর বৎসর চলে গেল—কিন্তু কোনোক্রমেই তাঁকে শান্ত করা গেল না। অবশেষে তিনি পাতালসাধুবাবার শরণাপন্ন হন। কিন্তু সেখানেও তাঁর একই কথা, মৃত মেয়েকে ফিরে না পেলে তিনি কিছুতেই শান্ত হবেন না। সাধুবাবা অনেক বোঝানোতেও তিনি শান্ত হননি। অবশেষে তাঁর আর্ত্তিতে সাধুবাবার করুণা হয় এবং তিনি প্রসন্ন হয়ে বলেন, "বেশ, তাই হবে, মা। তোমাদের মেয়ে তোমাদের কোলে আবার ফিরে আসবে এবং তার আর অকাল বিয়োগ হবে না।" তাঁর বাক্য অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল—মৃত 'কালিদাসী' 'গুরুদাসী'-রূপে দিদির কোলে

আবার ফিরে এসে সকল সন্তাপ দূর করেছিল। এত বিশদ খবর অবশ্য আমি তখন জানতাম না, জানবার অবসর বা আগ্রহ ছিল না। বিশেষতঃ আমি আবাল্য 'সাধু'-নামধেয় এই বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলাম না। তাই বড়দিদির ব্যাপারে কেমন করে কী হ'ল—এ বিষয়ে কখনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করিনি। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে আমার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য না থাকলেও, দিদির গুরুদেব এই 'সাধুবাবা' নাকি মাঝে মাঝেই আমাকে তাঁর কাছে যেতে বলতেন। হাত যোড় ক'রে সুমধুর বিনয়নম্র কণ্ঠে দিদিকে নাকি বলতেন, "মামাবাবু (দিদি—'মা', সেইসূত্রে আমি-'মামাবাবু') অনেক লেখাপড়া জানে; আমাকে (অর্থাৎ গুরুদেবকে) একটু অ-আ-ক-খ শিখিয়ে দেবে...।" দিদি তাঁর গুরুদেবকে বলতেন, "আমি তো বলি, বাবা। কিন্তু সে পড়াশুনায় এত ব্যস্ত যে কোনো কথায় কানই দেয় না।" কথাটা ঠিকই; দিদির কথা শুনে রাগ হ'ত। তাচ্ছিল্যভরে সে কথার কোনো উত্তরই দিতাম না। নিজের পড়াশুনাতেই বিভোর হয়ে রইতাম।

কিন্তু এখন ভিন্ন অবস্থা। লৌকিক সব প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে সকলেই অলৌকিকের দিকে হাত বাড়িয়েছে, এবং 'Drowning man catches at a straw' এই প্রবচন অনুসারে আমিও বোধহয় অকূল পাথারে (তখন আমার ধারণায়) এই 'straw' রূপী সাধুবাবাকে ধরবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েও ধরতে মন স্থির করতে পারছি না। কারণ তখন একজন যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমার মনে প্রবল দ্বন্দ্ব—রোগ হয়েছে, চিকিৎসকের কাছে যাব। সাধুর কাছে কেন? চিকিৎসার সঙ্গে এই সাধুদের কী সম্পর্ক? কথাটা যুক্তি-যুক্ত। মা, বাবা, দাদা, দিদি—এরা কেউ আমাকে বোঝাতে পারলেন না। অবশেষে আমার শিক্ষা-জীবনের প্রধান উৎসাহদাতা আমার মামা এসে আসরে নামলেন। বললেন, "দেখ, আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে আমরা যে সব শক্তির পরিচয় পাই ও তার দ্বারা উপকৃত হই, সেগুলি সর্ব্বজন বিদিত। যেমন বিদ্যাশিক্ষার জন্য আমরা উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে যাই, মামলা পরিচালনার জন্য উকিলের পরামর্শ নিই, বা রোগ আরোগ্যের জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই। অবশ্য এদের কাছে আমরা ফল পাই, উপকার পাই—তাই যাই; এবং তাই এদের অবদানও একরূপ সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আর এক শ্রেণীর শক্তিমান মনুষ্য এ জগতে আছেন, যাঁদের চরিত্র ও আচরণ কতকটা রহস্যময়; তাঁরা সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন করেন না বা স্বাভাবিক স্তরে নেমেও আসেন না। তাই সর্ব্বসাধারণের কাছে তাঁরা তেমন recognition বা স্বীকৃতিও পান না। কিন্তু তবু দায়ে প'ড়ে, অর্থাৎ অন্য সব জানাশোনা

উপায় ব্যর্থ হ'লে, কেউ কেউ তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের শরণাপন্ন হয়, এবং অত্যাশ্চর্য্য ফলও পায়। ফলটাই আসল ; কেমন করে তিনি শক্তি অর্জ্জন করলেন, বা তাঁর আচরণই বা অমন রহস্যময় কেন—সে সব প্রশ্ন এখানে অবান্তর। মানুষ সুফল চায়, তা' সে সুফল যেমন করেই, বা যার কাছ থেকেই আসুক না কেন, সেটা বড় কথা নয়। আমরা যদি এই সাধুবাবা, তোমার দিদির গুরুদেব পাতালের সাধুবাবার কাছে থেকে প্রত্যক্ষ ফললাভ করি, তা হ'লে কেন তাঁর কাছে যাব না? তা ছাড়া এই পাতাল-সাধুবাবার শক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার কাছে আছে। কতকগুলি বিশেষ বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তাঁদের অভীষ্ট বস্তু লাভ করেছে, এ আমি জানি।" এই বলে তিনি নবদ্বীপেরই এইরূপ কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম করলেন। তারপর স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বল্লেন', "জায়গাটা যে 'বাজে' নয়, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত এবং আমার পরামর্শ এই যে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া এখন আমাদের নিশ্চিত কর্ত্তব্য।"

মামার এই যুক্তিপূর্ণ কথা অমান্য করতে পারলাম না। ঠিক এই সময়ে আমার মনে পড়ল, বন্ধু গৌরের কাকা আমার পরম হিতৈষী কবিরাজমহাশয় তাঁর চিকিৎসার শেষ দিকে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমার দীক্ষা হয়েছে কি না, তাঁর প্রশ্নে আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকায় তিনি বলেছিলেন, অর্থাৎ, আমার গুরু-করণ হয়েছে কিনা। এই প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর মনে ক'রে আমি একটু বিরক্তভাবেই তার উত্তর দিয়েছিলাম। তিনি কিন্তু শান্তভাবেই জবাব দিয়েছিলেন, "মানুষের চেষ্টা সীমাবদ্ধ। মানুষের প্রচেষ্টা যখন বিফল হয়, তখন এই 'গুরু-শক্তি'ই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে চলে।"

কথাগুলি বিদ্যুৎঝলকের মতই আজ আমার মনে পড়ল। মামার যুক্তির সঙ্গে কবিরাজ মহাশয়ের এই কথার কি কোনো যোগসূত্র আছে? তখন তা' বুঝতে পারিনি। কিন্তু তবু সাধুবাবার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেল্লাম।

সন ১৩৪০ সাল। সেদিন সম্ভবতঃ ১৯ শে কার্ত্তিক রবিবার। বাবার সঙ্গে এলাম পাতাল সাধুবাবার আশ্রমে। আসতে যেন কেমন ভয় ভয় করছিল। আমার অভিভাবকদের কাছ থেকে যেটুকু জেনেছি তাতে বুঝলাম আজ আমি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক সাধুর কাছে যাচ্ছি, যাঁর শক্তি সাধারণ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। বইয়ে কিছু কিছু মুনি-ঋষির কথা পড়েছি ও লোকমুখেও শুনেছি—তাঁরা দুর্ব্বাসার মত কেউ কেউ অতি ভয়ঙ্কর, আর কেউ কেউ বা দয়াল। আজ আমি যাঁর কাছে যাচ্ছি, ইনি কী রকম হবেন তা কে জানে? যদি দুর্ব্বাসার

মতই হন, হঠাৎ অভিশাপ দিয়ে বসেন! তা'হলে? বুকটা এক অজানা আশঙ্কায় দুর দুর করতে লাগল। এইভাবে আশ্রমে এসে পৌঁছলাম। বাবার পরিচিত একজন লোক আশ্রমে ছিল, তাকে ডেকে বাবা আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা জানালেন। তার কথামত আমরা ঠাকুর ঘরের দালানে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে বল্লে, সাধুবাবার মন্দির খুললে আপনাদের কথা তাঁকে জানাব।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর মন্দির দ্বার খুলল। সেবকরা ছুটে এলেন মন্দিরদ্বারের কাছে। কেউ কেউ মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমরা তেমনি বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। আরো কিছুক্ষণ পরে একজন শিষ্য বাইরে এসে আমাদের বল্লে, আপনারা মন্দিরের পূর্ব্বদিকের জানালার সমুখে গিয়ে 'সাধুবাবা, দর্শন দিন' ব'লে ডাকুন। আমার বাবা সেই নির্দ্দেশমত পূর্ব্বদিকের জানালার সামনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং 'সাধুবাবা, দর্শন দিন' ব'লে বার বার ডাকতে লাগলেন। তিন চারবার ডাকের পর জানালা খুলে গেল। দেখলাম, অবাক বিস্ময়ে দেখলাম— মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে গলির দুয়ারের কাছে করযোড়ে দণ্ডায়মান এক অলৌকিক মূর্ত্তি। জীবনে এই প্রথম দর্শন। ইনি যে সাধারণ মানুষের মত নন, হয়তো আমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে, তা' এক নিমেষেই বুঝলাম। তাই তাঁকে দর্শন করে প্রথমেই আমার মনে হল,—ইনি যেন অন্য স্তরের, অন্য জগতের কেউ, যাঁর সঙ্গে এই দৈনন্দিন পরিচিত জগতের আর সবারই সাথে কোনো মিল নেই। কে ইনি, কে? আমার সমস্ত মন যেন বিস্ময়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। আমার বাবা করযোড়ে তাঁকে নিবেদন করলেন, "এ আমার ছেলে,—একে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে—।" সাধুবাবা আমার বাবাকে আর বলতে না দিয়ে বল্লেন, "কর্ত্তাবাবা, আর বলতে হবেনা; আমি সব জানি।" তারপর সেই অলৌকিক মহাপুরুষ আবেগভরে বল্লেন, "কর্ত্তাবাবা, আমি তো কতবার ছবিমাকে (অর্থাৎ আমার বড়দিদিকে) ব'লেছি কতবার ডেকেছি মামাবাবুকে (অর্থাৎ আমাকে); আমার পণ্ডিত মামাবাবুকে। আমি এক অজ্ঞান, অবোধ, মূর্খ সন্তান প'ড়ে আছি—আমাকে একটু অ-আ-ক-খ শিখিয়ে দিবার জন্য। এতদিন তো বাবার দয়া হয়নি। আমি কি করব, কর্ত্তাবাবা? এইভাবে কিছুক্ষণ ধরে অনেক কথা ব'লে গেলেন—যার প্রকৃত অর্থ তখন আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তা' ছাড়া কথাগুলি প্রায়ই অসংবদ্ধ বা link-less; তাই তাঁর কথাগুলি তিনি কেন বলেছেন, কী প্রসঙ্গে বলেছেন, তা' তো বুঝলাম না—বরং কেমন যেন হকচকিয়ে গেলাম। সাধুবাবা কিছুক্ষণ কথা বলার পর তেমনি হাত যোড় করেই বল্লেন আমাকে, "মামাবাবু, তুমি তো আমার কথার কোনো উত্তর দিলেনা,

কিছু কথাই বল্লে না।" আমার মুখ যেন কে জোর করে বন্ধ করে রেখেছিল, আমি কিছুই বলতে পারলাম না। জানালা বন্ধ হয়ে গেল। একজন শিষ্য উপরে উঠে আমাকে বল্লেন, "আপনি মন্দির দুয়ারে এসে সাধুবাবাকে প্রণাম করে যান।" আমি তাঁর কথা মত মন্দির-দুয়ার-চত্বরে এসে প্রণাম করলাম—হাঁটুগেড়ে। আমাকে ঐভাবে প্রণাম করতে দেখে—সাধুবাবা হঠাৎ বলে উঠলেন, "বাবা, অসুখ এখন সারবেনা।" তারপর একটু বিরক্তভাবে বল্লেন, "এত লেখাপড়া শিখেছ, কিন্তু মহাপুরুষকে কীভাবে প্রণাম করতে হয় তা জাননা?" সাধুবাবার কথাগুলি তীব্র কশাঘাতের মতই আমার কাণে প্রবেশ করল। ইতিপূর্ব্বে এরূপ মহাপুরুষও কখনো দেখিনি, বা তাঁদের কেমন করে প্রণাম করতে হয় তাও জানিনি। লেখাপড়া শেখার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে ব'লেও ভাবতে পারিনি। সুতরাং আমার এই অজ্ঞতা, যা এখানে অপরাধ বলে গণ্য হল, তার জন্য আমি নিজে দায়ী না হয়েও, তাঁর শ্রীমুখের তীব্র ভৎর্সনাবাক্য মাথা পেতে নিলাম—সে বাক্য বজ্রসম হলেও। ঠিক যে ভয় নিয়ে এখানে এসেছিলাম তাই ফলল; রোগ-আরোগ্যের আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষায় সাধুবাবার কাছে এসে পরিশেষে হতাশার বজ্রাঘাতই পেলাম।

কী করব বুঝতে না পেরে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। একে তো মৃত্যুর মুখোমুখি এসে পৌঁছেছি—তার উপর এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষের ভৎর্সনা তীব্র কশাঘাতের মতই মনে হল। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে গেল, চোখের জলও শুষ্ক হয়ে উড়ে গেল, ভাল-মন্দ চিন্তা করবার ক্ষমতাও যেন আমার লোপ পেল। সহসা এই অপরাধীকে বাইরে চলে যাবার আদেশ করা হল। মন্দির-দ্বার বন্ধ হয়ে গেল।

হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি, এমন সময়ে কে যেন এসে আমাকে বল্লে, "দুপুরে এখানে এসে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যাবেন।" আমার বাবা তাতে সম্মত হলেন, এবং আমিও রাজী না হয়ে পারলাম না।

বাড়িতে ফিরে এসে সমস্ত কথা বলার পর সেখানে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এল। আমি যেন আসামী হয়ে কোর্টে গিয়েছিলাম, যে-কোর্টের বিচারপতি হচ্ছেন 'সাধুবাবা', এবং যাঁর রায় আমার জীবন-মরণ নির্দ্ধারণ করছে। আমার পক্ষে শুভ রায় তিনি দেননি, সুতরাং বিষণ্ণ হবারই কথা। কিন্তু আমার বড়দিদি, 'সাধুবাবা' যাঁর গুরুদেব এবং সেই গুরুদেবের বিষয়ে যাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তিনি একেবারে হতাশ হলেন না; বরং আমাকে আশা দিয়ে বল্লেন, "সাধুবাবা যখন প্রসাদ পেতে বলেছেন, তখন তাঁর দয়া হবেই একদিন। ভক্তি করে প্রসাদ পেয়ে এসো।"

যথাসময়ে প্রসাদ পেতে এলাম আশ্রমে, সঙ্গে একজন escortও ছিল কেউ; কারণ

একা চলাফেরা করতে সাহস পেতাম না—কী জানি কখন heart-fail হয়ে যাবে এই ভয় সর্ব্বদাই হত। সঙ্গীটি আমাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আবার এখানে এসে আমাকে নিয়ে যাবে ব'লে গেল। যথাসময়ে প্রসাদ পাবার ডাক পড়ল। 'প্রসাদ'—অর্থাৎ অতি সাধারণ মোটা চাউলের অন্ন, পাতলা কলাইয়ের ডাল, একটা লাফরা ব্যঞ্জন ও একটা টক। রান্নাও অতি সাধারণ, বিশিষ্ট স্বাদ বা বৈচিত্র্যের নামগন্ধও ছিলনা,—নেহাতই ক্ষুধিতের উদর-পূর্ত্তির মত সাধারণ ডাল-অন্ন-তরকারী। Rich diet তো নয়ই, রোগীর উপযোগী nutritious পথ্যও নয়;—বলতে কি সাধারণ সংসারে, কাউকে নিমন্ত্রণ করে এমন সাধারণ ডাল-ভাত কেউ খেতে দেয় না। কিন্তু তবুও, কী আশ্চর্য্য, যা' খেলাম তা খেতে বেশ ভালই লাগল। খাওয়ার পর, আকস্মিকভাবে, মন্দিরবাতায়নের সমুখে 'সাধুবাবা'র দর্শন পেলাম। 'সাধুবাবা' আমাকে দেখে শুধালেন, "প্রসাদ পেয়েছ, মামাবাবু?" আমি এই প্রথম তাঁর সঙ্গে কথা বল্লাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" তারপর প্রণাম করলাম; এবার আর ভুল হল না—সমস্ত অঙ্গ ধূলিতে লুণ্ঠিত করে সাষ্টাঙ্গ বা দণ্ডবৎ প্রণাম করলাম। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরে বহুশাস্ত্র আলোচনায় এবং তাঁর কৃপায় পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সুস্পষ্টরূপে বুঝেছি, এই যে তাঁর সকলকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের জন্য অনুরোধ, এটা আদৌ তাঁর নিজের সম্মান বৃদ্ধিকল্পে নয়, পরন্তু প্রত্যেক জীবের কল্যাণের জন্যই। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হবে। প্রণাম করে উঠে আবার তাঁকে দর্শন করলাম। এবার তাঁকে যেন কিছু প্রসন্ন দেখলাম। তিনি খুশীমনে বল্লেন, "আবার কাল প্রসাদ পেয়ে যেও।" আমিও সকৃতজ্ঞনয়নে সায় দিয়ে জানালাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ, আসব।"

জানালা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মন যেন কি এক অজ্ঞাত খুশীতে ভরে উঠল। প্রসাদ পেয়ে, না সাধুবাবার প্রসন্ন-দৃষ্টিতে? কী জানি? তবু মনের পাত্রে যেন আনন্দ উপচে পড়তে লাগল। আমি আর থাকতে পারলাম না। বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম; এই খুশীর বার্ত্তা, এই অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সংবাদ দিতে। পথে যখন অগ্রসর হচ্ছি, (যাবার সময় সঙ্গী এসে উপস্থিত হয়নি তখনো), তখন প্রথমে ধীরে ধীরে, সাবধানে, এক পা এক পা করে চলেছি। তারপর একটু পরেই চলা সহজ হ'য়ে এল; ভয় দ্বিধা কেটে গেল। Heart-failure এর আশঙ্কা ভুলে গেলাম। মন যেন খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠেছে—একি, এমন তো কখনও হয়নি! শুধু তাই নয়,—প্রতি পদক্ষেপে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে আমার মনে হ'তে লাগল, আমার কণ্ঠস্থল থেকে আমার পাকস্থলী পর্য্যন্ত যেন বিন্দু বিন্দু সুধা-ধারা নির্গত হচ্ছে—drop by drop; হ্যাঁ, আমি তা' অতি

সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারলাম,—ঠিক আমরা যেমন Chemistry practical class এ chemical test করি, drop by drop re-agent ফেলে, ঠিক তেমনি। আর তার ক্রিয়ায় আমার অন্তঃস্থল যেন এক আনন্দ-সুধারস ফেনিল, উদ্বেল হয়ে উথলে উঠতে লাগল, ঠিক ঐ chemical action এর অনুরূপ। আমার এই স্পষ্ট অনুভূতিতে বিন্দুমাত্র ভুল ছিল না। এইভাবে আমি বাড়ী পৌঁছলাম। আমাকে একাকী আসতে দেখে বাড়ীর সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এলেন! কিন্তু আমার চোখে মুখে অমন খুশী উপছে পড়তে দেখে তাঁরা সবাই থমকে গেলেন। তাঁরাও হাসিমুখে বল্লেন, "প্রসাদ পেয়েছ? আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো?" আমিও সহাস্যে উত্তর দিলাম, "কষ্ট তো হয়ই নি; বরং খুব আনন্দ হচ্ছে। এমন আনন্দ তো কখনো হয়নি আমার!" দিদি সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, "গুরুদেবের দর্শন পেয়েছিলে?" আমি সানন্দে বল্লাম, "হ্যাঁ। তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছি এবং তিনি বল্লেন, 'আবার কাল প্রসাদ পেতে এসো'।" দিদির চোখ সজল হয়ে উঠল, তিনি বল্লেন, "গুরুদেবের দয়া হয়েছে, তাই তোমার চোখে মুখে এই আনন্দের স্রোত বইছে। তাঁকে ধরে থাক, ছেড়োনা। তাহলে তাঁর দয়া হবে।" সেদিন বাকী সমস্ত দিন ও সমস্ত নিশি ভ'রে যে-আনন্দ পেলাম, জীবনে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো তা' পাইনি।

পরদিন সকাল থেকেই মনে একটা নতুন আনন্দের প্রেরণা—আজও আবার আশ্রমে যাব প্রসাদ পেতে এবং বোধ করি সাধুবাবারও দর্শন মিলতে পারে। যথাসময়ে আশ্রমে গেলাম এবং ঠিক গতকালের মতই তেমনি সাধারণ অন্ন ব্যঞ্জনের প্রসাদ পেলাম; এবং আজও অতি সৌভাগ্যবশতঃ 'সাধুবাবা'র দর্শন পেলাম। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে আজও ভুল হল না। যদিও সাধুবাবা অপর অনেকের সহিতই কথাবার্ত্তা বলছিলেন, তথাপি আমার দিকে একবার করুনা-ঘন-নয়নে চেয়ে বল্লেন, "মামাবাবু, প্রসাদ পেয়েছ?" আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, তিনি বল্লেন, "যে কদিন এখানে থাকবে, রোজ প্রসাদ পেয়ে যেও।"

বাড়ীতে এসে একথা জানাতে সকলেই খুশী হলেন। বড়দিদিও আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, "সাধুবাবা নিশ্চয়ই কৃপা করবেন, নইলে রোজ প্রসাদ পেতে বলবেন কেন?" সুতরাং সপ্তাহের বাকী কয়দিন রোজই নবীন উৎসাহ নিয়ে আশ্রমে আসতে লাগলাম প্রসাদ পাবার জন্য। তা'ছাড়া প্রথম দিন যে অপূর্ব্ব অনুভূতি লাভ করেছিলাম, তা' এ কয়দিন অটুট থাকল। সে-আনন্দের আস্বাদ অব্যাহত রইল এবং আমার চারপাশে নিশ্চিত মৃত্যুর যে ভয়াল, ভয়ঙ্কর ছায়া ঘনিয়ে আসছিল, তার মধ্যেও যেন জীবনের দু'একটি বিদ্যুৎ-ঝলকের চমক দেখা গেল। Silver-lining in the

darkest cloud এর অভিজ্ঞতা কারো জীবনে হয়েছে কিনা জানিনা, কিন্তু আমি সে দৃশ্য সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেছি আমার সেই মুমূর্ষু অবস্থার দিনগুলিতে। বাড়ী থেকে আশ্রমে আসবার জন্য আর কারো সাহায্য নিতাম না। যদি বুকটা একটু ধড়ফড় করত, আশ্রমে এসে আশ্রমের ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলে সঙ্গে সঙ্গে তা' শান্ত হয়ে যেত। প্রতিদিন প্রসাদ পেয়ে শরীরের অভ্যন্তরে সেই সুধা-ক্ষরণ অনুভব করতাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। আমি ভাবতাম—এ কী ক'রে সম্ভব হচ্ছে? ডাক্তারদের এত ঔষধ, এত সুনির্ব্বাচিত পথ্য, এত শক্তিশালী টনিকে বা কখনো কোনদিন লাভ করতে পারিনি, প্রসাদ পাবার পর সমস্ত শরীরে ও মেনে এই অমৃত-নিঃসরণ,এত শক্তি-সঞ্চারণ কেমন করে কোথা থেকে সম্ভব হচ্ছে? তিল তিল করে বিশ্লেষণ করে দেখতাম। মনে রাখবেন, তখন আমি আধুনিকতম উচ্চতম পর্য্যায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, বস্তুতত্ত্ব, তরঙ্গতত্ত্ব, আপেক্ষিকতাবাদ অর্থাৎ Relativity, wave-mechanics, Quantum mechanics এর গভীরতম তত্ত্বে মশগুল, অতি দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য Mathematical Equations সমূহের জটিল জালে সমস্ত মন আমার সমাচ্ছন্ন। এটা স্বাভাবিক যে এরূপ শ্রেণীর কোনো ব্যক্তিকে কেউ 'যাদু বিদ্যা'য় ভোলাতে পারবে না; একজন উচ্চতম পর্য্যায়ের বৈজ্ঞানিক কখনো কোনো ধোঁকা-বাজীতে বিভ্রান্ত হতে পারে না, তথাকথিত শাস্ত্র বা আপ্ত বাক্যও বিনা পরীক্ষায় অভ্রান্ত বলে মানতে পারে না এবং বিজ্ঞান-যুক্তিসম্মত নয় এমন কোনো কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। আমিও পারিনি; কিন্তু মানতে বাধ্য হলাম নিছক বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেই। Every effect has some cause—Logic এর এই মোক্ষম যুক্তি সকল বৈজ্ঞানিককেই স্বীকার করতে হবে। ফল আমি পাচ্ছি, নিশ্চিতভাবেই পাচ্ছি। আমার সমস্ত শরীরে, মনে, আমার শিরায় শিরায়, আমার প্রতি রক্তবিন্দুতে, আমার প্রতি হৃৎস্পন্দনে,প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে অতি প্রকটরূপে আমি ফল পাচ্ছি— একে তো অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এই যে আনন্দ-সুধা-সঞ্চার—কী এর উৎস? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে Scrutinise করে আমার বৈজ্ঞানিক মন। ঐ অতি সাধারণ ভাত-ডাল-তরকারী আহার করার পর থেকেই আমার অন্তরে এই শক্তির সঞ্চার, এই আনন্দ আস্বাদন—তবে কি ঐ প্রসাদে কোনো অপূর্ব্ব শক্তিশালী, medicated কোনো বস্তু মিশিয়ে দেওয়া আছে? কিন্তু প্রসাদ তো সকলেই পাচ্ছে; কৈ কাউকে তো এমন অপূর্ব্ব অনুভূতির কথা বলতে শুনিনি। তবে এ কি শুধু আমার একার জন্য? তাও তো নয়—আমার প্রতি তো কোনো Special treatment করা হয়নি; সকলের সাথে একই প্রসাদ খেয়েছি; সকলের মধ্যে, অনেকটা ভীড়ের মধ্যেই বলা যেতে পারে, সাধুবাবাকে প্রণাম করেছি, গায়ে আশ্রমের

ধুলি লেগেছে। সাধুবাবা সদয় দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখেছেন শুধু। তবে এই অপূর্ব্বশক্তি-সঞ্চার কোথা থেকে হল? আশ্রমের ঐ ধুলিকণাগুলি কি কোনো অদ্ভুত গুণ সম্পন্ন, ওরা কি ionised, radio-active? না, সাধুবাবার ঐ চোখের দৃষ্টিতে কোনো অদৃশ্য বিকিরণ হচ্ছে, Some invisible rays, Some unknown radiation—যার তথ্য আমরা কেউই জানি না?

সপ্তাহের বাকী কয়েকদিন প্রায় এই একইভাবে আশ্রমে আসা, প্রসাদ পাওয়া, কোনো কোনো দিন সাধুবাবার দর্শনলাভ ও ঐ একইরূপ আনন্দের আস্বাদন অব্যাহতই রইল। এদিকে আমার ছুটির দিন ফুরিয়ে আসছে, কলকাতায় ফিরতে হবে, কলেজে ক্লাস করতে হবে। বাড়ী থেকে সবাই পরামর্শ দিলেন—সাধুবাবার কাছে 'ঔষধ' চাও, তাঁর কাছ থেকে 'ঔষধ' বা 'মহাবস্তু' পেলেই অসুখ সেরে যাবে। বাড়ীর পরামর্শমত আশ্রমে এসে 'ঔষধ' প্রার্থনা করে সাধুবাবার কাছে আবেদন করলাম। সাধুবাবার কাছ থেকে directly কোনো সাড়া না পেলেও, তাঁর ভক্তগণের মধ্যে একজন এসে আমাকে এইভাবে বোঝালেন। বল্লেন, "দেখুন, আপনার প্রতি সাধুবাবার যথেষ্ট কৃপা, নইলে আপনাকে ডেকে প্রতিদিন প্রসাদ পেতে আসতে বলবেন কেন? আপনার অসুখ যাতে সারে, সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি আছে। তার জন্য ঔষধও আপনাকে দিতে পারেন তিনি। কিন্তু কী জানেন,—তাঁর সঙ্গে একটা 'আপন-সম্বন্ধ' গড়ে তুলতে না পারলে, তিনিও আপনাকে ঠিক নিজের মত করে নিতে পারছেন না। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। মনে করুন, আপনি একজন ভাল ছেলে; কিন্তু আপনার লেখাপড়ায় যথেষ্ট সাহায্য করবার মত কোনো প্রকৃত শিক্ষক আপনি পাননি। কিন্তু হঠাৎ একজন গুণী হেড্ মাষ্টার মশায় আপনাকে আবিষ্কার করলেন এবং দয়া করে আপনাকে কিছু কিছু শেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাতে আপনার খুব বেশী উপকার তিনি করতে পারলেন না; তাই সেই বিজ্ঞ হেড্-মাষ্টার বল্লেন, তুমি আমার স্কুলে ভর্ত্তি হও; তা' হ'লে তোমাকে আমার নিজস্ব পরিবেশে ঠিক নিজের মত করে লেখাপড়া শেখাতে পারব এবং তুমি আমার স্কুলেরই একজন হওয়ায় তোমার প্রতি আমার একটা দায়িত্ববোধ জেগে উঠবে। আমাদের সাধুবাবাকে মনে করুন, সেই রকম একজন শিক্ষিত হেড্-মাষ্টার, একজন গুণী ছাত্র হিসাবে আপনার প্রতি তাঁর দয়া হয়েছে; কিন্তু এই দয়াটা তাঁর 'নিজস্ব দায়িত্ব' বোধে পরিণত হবে, যখন আপনি তাঁর সঙ্গে তাঁর 'নিজস্ব সম্বন্ধ' পাতাতে পারবেন। তাঁর স্কুল বা আশ্রমে ভর্ত্তি হবেন, তাঁর ছাত্র বা তাঁর শিষ্য হবেন।"

বলা বাহুল্য, কথাগুলি এতই যুক্তিপূর্ণ যে আমাকে আর একটুও ইতস্ততঃ করতে

হল না। এক নিমেষেই আমি এর যৌক্তিকতা বুঝে নিলাম। অসুখ সারাতে হলে বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে হবে, তাঁর সঙ্গে 'সম্বন্ধ' স্থাপন করতে হবে, তাঁর 'শিষ্য' হতে হবে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন, "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুনঃ, আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।"—৭।১৬ ; বুঝলাম, এই চতুর্ব্বিধের মধ্যে প্রথমবিধ, অর্থাৎ, 'আর্ত্ত' হয়েই আমাকে তাঁর চরণে শরণ নিতে হবে। এ সব কথা আমি নিজে মনে বুঝলেও, এবিষয়ে বাড়ীতে একবার পরামর্শ করা দরকার। আশ্রমে আমার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আমি বাড়ীতে এসে সব কথা জানালাম। বাড়ীতে কিন্তু পিতামাতা এতে আপত্তি তুললেন। প্রথমে বল্লেন, আমাদের কুলগুরু আছেন, মন্ত্র-দীক্ষা নিতে হলে, তাঁর কাছেই নিতে হবে ; সংসারী লোকের সন্ন্যাসী-গুরু-করণ বিধেয় নয়। সে আপত্তি যদিও কাটিয়ে উঠলাম 'Special case, এর দোহাই দিয়ে এবং বড়দিদির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে, কিন্তু দ্বিতীয় আপত্তিটি অত সহজে এড়াতে পারলাম না। আপত্তিটি হচ্ছে এই যে বড় ভাই অদীক্ষিত থাকতে ছোট ভাইয়ের দীক্ষা হতে পারে না ; আমার বড়দাদার এখনও দীক্ষা হয়নি, সুতরাং আমার কী করে দীক্ষা হবে ?

এদিকে পরদিন সকালে আশ্রমে এসে সাধুবাবার দর্শন পেলাম। দীক্ষা-গ্রহণ সম্বন্ধে বাড়ীর আপত্তির কথা তাঁকে জানাতে তিনি শান্ত কণ্ঠে বল্লেন, "কারো যদি পরমায়ু ফুরিয়ে আসে, তাহলে তার জ্যেষ্ঠদের মৃত্যু না হয়ে থাকলে, যমরাজ কি তাকে কনিষ্ঠ বলে নিতে পরাঙ্মুখ হবেন, তার কি মৃত্যু হবে না ?" সাধুবাবার এই কথা শুনে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতই আমি চমকে উঠলাম ; অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে বিঁধল সাধুবাবার এই অমোঘ-বাণী। তৎক্ষণাৎ আমি মনঃস্থির করে ফেল্লাম ; ওজর-আপত্তির সব বাধা তৃণের মতই ভেসে গেল সাধুবাবার এই প্রকৃত জ্ঞানপ্রদ দুর্ব্বার বাণী-স্রোতে। এই জ্ঞানোন্মেষে সমস্ত শরীর আমার থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমার এই মুমূর্ষু অবস্থায় কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারেনি, কেউ শান্তি দিতে পারে নি, আশার বিন্দুমাত্র আলোকও কেউ আমাকে দেখাতে সমর্থ হয়নি। কীসের বাধা, কীসের নিষেধ, কীসের বিধি—কে আমাকে রক্ষা করতে পেরেছে ? সাধুবাবার এই সত্যযুক্তির আলোকে সব বাধার অন্ধকার নিমেষে মিলিয়ে গেল। পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ডাক্তার কবিরাজ, ঔষধপথ্য, বিধি-নিষেধ—কে আমাকে এই ভয়াল ভয়ঙ্কর মৃত্যুর নিশ্চিত গ্রাসের আশঙ্কা থেকে মুক্ত করতে পেরেছে ? কেউ না। কারো কথা আজ আমি শুনব না। এই ঘোর দুরাশা-অন্ধকারে যাঁর কাছে পেয়েছি প্রাণ ফিরে পাবার আশার আলো তাঁরই চরণ আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকব ; পৃথিবীর কোনো শক্তিই আর আমাকে এ সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

তখন কি আমি জানতাম, আজ আমার অন্তরে যে দিব্য জ্ঞানালোকের উদয়ে এই সুদৃঢ় সঙ্কল্পের আবির্ভাব হয়েছে, এ একমাত্র আমার সম্মুখস্থিত এই সিদ্ধ মহাপুরুষ এই সুদুর্লভ সাধুর সঙ্গ ও তাঁর কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে—যে পরম দিব্যজ্ঞানের কথা একেবারে হুবহু একইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে উদাত্তকণ্ঠে গীত হয়েছে :

"গুরুর্ন স স্যাৎ, স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ,
দৈবং ন তৎ স্যাৎ, ন পতিশ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্‌।"

—৫।৫।১৮

সেদিনও যথারীতি প্রসাদ পেয়ে তেমনি আনন্দসুধা আহরণ করে বাড়ী ফিরলাম। আমার দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা এক মা ছাড়া আর কাউকে বল্লাম না। বিকালে আবার এলাম আশ্রমে। দীক্ষা নিতে হলে আনুষঙ্গিক কী কী ক্রিয়াকলাপ আছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করলাম আশ্রমের শিষ্যদের কাছে। এবিষয়ে যথারীতি উপদেশ দিলেন আমায় আশ্রমের 'মেজদা' ওরফে শ্রীযুক্ত সত্যহরি চট্টোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, আমি তাঁর পূর্ব্ব পরিচিত ; তাঁর দাদা শ্রীযুক্ত শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয়তম ছাত্র ছিলাম আমি। আগামী কালই যাতে আমার দীক্ষা সুসম্পন্ন হয় তজ্জন্য আমি মেজদাকে অনুরোধ করলাম সাধুবাবাকে একটু বলতে। মেজদা বল্লেন, যে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন এবং সাধুবাবাও তাঁর কথা রাখবেন। আগামী কাল আমাকে স্নান করে এবং কিছু না খেয়ে আশ্রমে আসতে বল্লেন।

পরদিন একটু সকাল সকালই আশ্রমে এলাম, মেজদা যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই তৈরী হয়ে। মন্দির দ্বার খুললেই আমি সাধুবাবাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে করযোড়ে আমার প্রার্থনা নিবেদন করলাম। সাধুবাবা অপরাপর শিষ্য ও ভক্তদের সাথে কথাবার্ত্তা শেষ করে আমাকে মন্দির দুয়ার বন্ধ করে সিঁড়ির উপরের চত্বরে চুপ করে বসে থাকতে আদেশ করলেন।

বসে আছি তো বসেই আছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। শিষ্যদের সাথে সাধুবাবার কথাবার্ত্তা যেন আর শেষই হয় না। তারপর তিনি ভিতর গুহার দ্বার বন্ধ করতে করতে বল্লেন, "বাবা, চুপ করে বসে থাক। ঠিক সময় হলেই আমি তোমায় ডাকব।" গুহার দুয়ার বন্ধ হল। মন্দিরের সিঁড়ির উপরের চাতালটিতে আমি একাকী নীরবে বসে আছি। আবার বহুক্ষণ কেটে গেল। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। জীবনে এই প্রথমে প্রবেশ করেছি আমি মন্দিরে, সেই নিস্তব্ধ নির্জ্জন গুহামন্দিরে আমি একাকী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষাই করে চলেছি। দুর্ব্বল, রুগ্ন শরীর, তার উপর সারা দিন জলও স্পর্শ করিনি,—ক্ষুৎ-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লাম। এক একবার

মনে হতে লাগল, এই বুঝি জীবন যায় যায়। হে প্রভু! একী তোমার নিষ্ঠুর লীলা। ঠিক এইরূপ যখন মনে করেছি, তার অব্যবহিত পর মুহূর্ত্তেই খট্ করে আওয়াজ হল, ভিতর গুহার দুয়ার খুলে সাধুবাবা মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে নীচে নেমে আসতে আদেশ করলেন। দুর্ব্বল পদক্ষেপে আমি মন্দির প্রাঙ্গনতলে নেমে এলাম, সাধুবাবাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সম্মুখে করযোড়ে বসলাম। আমার পরণে পুরানো কাপড় দেখে সাধুবাবা বল্লেন, "নতুন কাপড় পরনি? নতুন কাপড় পরতে হয় যে।" আমি লজ্জিত হয়ে বল্লাম, "তা তো জানিনা।" তখন তিনি হাতের কাছে যা পেলেন, অর্থাৎ একটি ৫।৬ হাত মাপের সাড়ী কাপড় আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, "এইটা পরে এসো।" আমি পুরানো কাপড় ছেড়ে সেই ৬ হাতি সাড়ী পরে আবার তাঁর সামনে এসে বসলাম। সাধুবাবা প্রসন্নদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে কর্ণে মহামন্ত্র দান করলেন—সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর ও মন এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল; সাধুবাবা মন্ত্রটি দুবার বলেই আমাকে আবৃত্তি করতে বল্লেন, আমি নির্ভুলভাবে মন্ত্রটি আবৃত্তি করাতে প্রভু খুসী হয়ে উঠলেন। বল্লেন, "এই মন্ত্র সদা সর্ব্বদা জপ করতে চেষ্টা করবে। এর কোনো কালাকাল নেই, স্থানাস্থান নেই; যখন সুযোগ পাবে তখনই জপ করবে, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, এমন কি রাস্তায় চলতে চলতেও। শয়নে স্বপনে জাগরণে সদা সর্ব্বদাই এই মন্ত্রে মনোনিবেশ করবে। আর শ্রীশ্রীগুরু পাদপদ্ম ধ্যান করবে।"

এই বলে একথালা মিষ্টান্ন আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, "যাও, এই থালা শুদ্ধ মিষ্টি নিয়ে গঙ্গায় যাও। এর অর্দ্ধেক দেবে মা গঙ্গাকে—গঙ্গার জলে, আর অর্দ্ধেক দেবে কুকুরকে। আমি সেই বেশে সেই মিষ্টান্নের থালা নিয়ে গঙ্গায় গেলাম মনে মনে গুরুদত্ত মহামন্ত্র জপ করতে করতে। আশ্চর্য্য! আমার কোনো কষ্ট তো হ'লই না, বরং এক অপূর্ব্ব আনন্দে মন ভরে ভ'রে উঠতে লাগল।

ফিরে আসতেই দেখি গুরুদেব আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। সাগ্রহে আমাকে ডেকে বল্লেন, "এসেছ, বাবা। এই নাও, প্রসাদ নাও।" এই ব'লে শ্রীমুখের প্রসাদামৃত আমাকে দান করলেন। আমি সে প্রসাদ গ্রহণ করে মাথায় ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ মুখে দিলাম। মনে হল—এই কি অমৃত? প্রাণে এ কী পরম পরিতৃপ্তি, একী প্রশান্তি! গুরুদেব সস্নেহে বল্লেন, "যাও, বাবা, উপরে ঠাকুর ঘরের দালানে ব'সে প্রসাদ পেয়ে এসো।"

উপরে এসে যথারীতি প্রসাদ পেলাম। তার কিছুক্ষণ পরে আবার গুরুদেবের কাছে এসে বসলাম। ইতিমধ্যে মেজদা ও তাঁর ছোট ভাই 'ছোট্দা' আশ্রমে এসে গেছেন।

আমার দীক্ষা সুসম্পন্ন হয়েছে জেনে তাঁরা খুব খুশী হলেন। গুরুদেবের সন্নিকটে বসবার পরম সৌভাগ্যলাভ করে যে কী-আনন্দ হচ্ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। মনে হচ্ছিল, যেন ইতিপূর্ব্বে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক আনন্দময় ভুবনে প্রবেশ করেছি। সত্যই এক সম্পূর্ণ নতুন জীবনের শুভ সূচনা। সন্ধ্যার আগে বিদায় চাইলাম, বল্লাম, "গুরুদেব, আগামী কালই আমায় কলকাতা রওনা হতে হবে।" গুরুদেব আমাকে প্রচুর হরি-লুট মিষ্টান্ন দিলেন আর বল্লেন, "শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্ম ধ্যান করবে ও সদা সর্ব্বদা গুরু-মন্ত্র জপ করবে।" এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে তিনি আমাকে "শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ধ্যান" করতেই আজ্ঞা করলেন; কিন্তু কৃষ্ণ-বিষ্ণু-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণ ধ্যানের কথা বললেন না এবং কোনো দেব-দেবীর উল্লেখ পর্য্যন্ত করলেন না।

আমার ধর্ম-জীবনের এই শুভারম্ভের দিনের স্মৃতি আমার জীবনে চির-উজ্জ্বল হয়ে রইল—২৬ শে কার্ত্তিক, রবিবার, সন ১৩৪০ সাল, ইং ১২ই নভেম্বর, ১৯৩৩।

পরদিন কলকাতায় হোষ্টেলে ফিরে এলাম। বাইরের আচরণে কিছু প্রকাশ না পেলেও, অন্তর জগতে এক সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত জগতে এসে প্রবেশ করলাম। আমার এই নতুন জগতে প্রবেশের সংবাদ সাধ্যমত সকলের কাছেই গোপন রাখলাম। স্নান ক'রে জপ ধ্যান করবার সময় ঘরের দুয়ার বন্ধ করে রাখতাম। গুরুদেবের প্রশান্ত মূর্ত্তি স্মরণ করতে চেষ্টা করতাম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই সামান্য কয়েক মিনিটের অনুষ্ঠান করতেও যেন কেমন একটা উৎসাহ ও আনন্দ অনুভব করতাম। ইতিমধ্যে গুরুদেবকে পৌঁছানো সংবাদ দিয়েছি এবং তার উত্তরও পেয়েছি। সে পত্রেরও যথাসময়ে উত্তর দিলাম এবং ঠিক সময়ে তার প্রত্যুত্তরও পেলাম। গুরুদেব আমাকে নবদ্বীপ গুহাশ্রমে আসতে বলেছেন। সামান্য ও স্বাভাবিক একটুখানি কথা— কিন্তু আমি তাতেই যেন ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করলাম। হ্যাঁ, যেতেই হবে আমাকে। পরের সপ্তাহে কলেজের ক্লাস সেরে Week-end ticket এ শুক্রবার ২২ শে অগ্রহায়ণ ৮ই ডিসেম্বর তারিখে নবদ্বীপ যাত্রা করলাম। পরের দিন সকালে আশ্রমে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম,—কখন গুরুদেব মন্দির দুয়ার খোলেন, কখন তাঁর দর্শন পাব এই আশায়, কাউকে দেখবার জন্য যে এত আগ্রহ হয়, ইতিপূর্ব্বে তা কখনো অনুভব করিনি। দুয়ার খুললে গুরুদেবকে দর্শন করে যেন সমস্ত মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। গুরুদেব আদর করে ডেকে নিয়ে বল্লেন, "বাবা, এসেছ? এসো, ভিতরে এসো।" ভিতরে গিয়ে ধূলি-লুণ্ঠিত হয়ে তাঁর সুশীতল চরণস্পর্শে সে কী আনন্দ, সে কী পরিতৃপ্তি! তারপর যথারীতি প্রসাদ গ্রহণ করলাম। গুরুদেব কৃপা করে আমাকে অনুমতি করলেন, "যে ক'দিন এখানে থাকবে, আশ্রমে প্রত্যহ প্রসাদ পাবে ও সারাদিন আমার কাছে থাকবে।" রবিবার দিন বিদায় নেবার সময় বল্লাম, "গুরুদেব, আমার অসুখের জন্য

কোনো ব্যবস্থা করুন। আপনার কাছে যখন আসি, বা এখানে যতক্ষণ থাকি, কোনো অসুখই থাকেনা; কিন্তু দেখছি যে কলকাতায় ফিরে যাওয়া মাত্র অসুখের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আপনার কাছ ছেড়ে যেতে বড় ভয় করছে, অথচ না গেলেও নয়।" আমার সব কথা শুনে, গুরুদেব কাগজে মুড়িয়ে একটু ভস্ম আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, "এই মহাবস্তু নাও।" তারপর সেই ভস্ম বা মহাবস্তু-ব্যবহারের গোপন বিধি আমাকে গোপনেই জানিয়ে দিলেন। মহাবস্তুটি পেয়ে আমার খুব ভরসা হল যে আর বোধ হয় আমার অসুখের জন্য চিন্তা করতে হবে না। কাজেই খুশী মনেই বিদায় নিয়ে কলকাতায় হোষ্টেলে ফিরে এলাম। নবোদ্যমে আবার গুরু-প্রদর্শিত ধর্ম্মপথে চলতে লাগলাম। কিন্তু মনে অনেকটা শান্তি ও স্থৈর্য্য পেলেও শারীরিক অসুখ গেলনা, আবার তা দেখা দিল। অথচ যতক্ষণ নবদ্বীপে থাকি ততক্ষণ অসুখের নামগন্ধও থাকে না। সুতরাং সুযোগ পাওয়া মাত্র, অর্থাৎ বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হতেই ৭ই পৌষ শুক্রবার, ২২ শে ডিসেম্বর আবার নবদ্বীপ যাত্রা করলাম। আশ্চর্য্য, নবদ্বীপ স্টেশনে নবদ্বীপের মাটিতে পা দেওয়ামাত্র স্পষ্ট অনুভব করলাম, অসুখের তীব্রতা কমেছে।

পরদিন সকালে আবার আকুল আগ্রহে ছুটে এলাম আশ্রমে। গুরুদেবকে দর্শন করবার জন্য সমস্ত মনপ্রাণ ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। যেন স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, তিনি একটা বিরাট শক্তির আধার। a source of intense energy, যার field of force এর আওতায় আসামাত্র আমার রোগ-যন্ত্রণা সব প্রশমিত হয়ে যায়। সুতরাং আমাকে তাঁর কাছে কাছে থাকতেই হবে। এমন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, এমন সুনিশ্চিত আশ্বাস, এমন সুনিবিড় শান্তি—আর কোথায় পাব? আর কোথাও না, কোথাও না—এ সত্য আমি আমার এতদিনকার অসহনীয় রোগ-যন্ত্রণা ভোগ কালে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু শুধুই কি রোগ-যন্ত্রণা উপশমের জন্য আমি এখানে তাঁর কাছে আসছি, না আর কোনো পৃথক আকর্ষণ আছে? বিশ্লেষণ ক'রে দেখলাম—আছে, অবশ্যই আছে। কিন্তু অসুখের যন্ত্রণানুভূতি এখন এতই প্রবল যে অন্য আকর্ষণের সত্তা এখন তাতে eclipsed হয়ে আছে এবং বর্ত্তমানে তা প্রকটভাবে প্রকাশ না পেলেও, তার পরম মধুর আনন্দময় রূপ আমার অন্তরের অন্তঃস্থল নিবিড় আনন্দ-সুধারসে পূর্ণ করে তোলে।

গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করা মাত্র আমার রোগ-যন্ত্রণা সব শীতল হ'য়ে গেল, পরম প্রশান্তিতে হৃদয় ভ'রে উঠল। আবার যথারীতি দৈনিক প্রসাদ গ্রহণ, সারাদিন গুরুদেবের শ্রীমন্দিরে তাঁর কাছে কাছে ব'সে থাকা, চিঠিপত্র লেখায় সাহায্য করা ও সন্ধ্যায় রাত্রের জন্য প্রসাদ নিয়ে গৃহে গমন—এইভাবে চলল আমার ছুটির দশটি দিন। এত দীর্ঘ দিন ইতিপূর্ব্বে গুরুদেবের কাছে থাকিনি; গুরুদেবের দৈনন্দিন লীলাও এমন

প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ হয়নি। এবারে শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে কতকগুলি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। বহুক্ষণ ধ'রে তাঁর কাছাকাছি অবস্থান ক'রে, অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শন ক'রে আমার মত একজন নবাগত যুবকের মনে হল, মানুষ এমন সুদর্শন, এমন রূপময় হয়? এমন সুশোভন, এমন সুসমন্বিত ও সৌম্যদর্শন পুরুষ ইতিপূর্ব্বে কখনো তো দেখিনি জীবনে! পুরুষ মানুষকে দেখতে এত ভাল লাগে, তাতো এর আগে ভাবতেও পারিনি। তা' ছাড়া মানুষের দেহে এত জ্যোতি, এমন দীপ্তিও কখনো দেখিনি। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে কারো কাছে শুধু ব'সে থাকলেই—এত আনন্দ আসে কেমন ক'রে? সব দুঃখের চিন্তা, তা সে রোগ-যন্ত্রণা থেকেই উদ্ভূত হোক, বা অন্য কোন মানসিক অশান্তিই হোক না কেন, সব তিরোহিত হয়ে যায়, তাঁর কাছাকাছি শুধু কিছুক্ষণ বসলেই। শুধু তাই নয়, মন এক অপূর্ব্ব, এবং আমার নিকট সম্পূর্ণভাবে অননুভূতপূর্ব্ব, আনন্দ-রসে ভ'রে ওঠে। তারপর তাঁর কণ্ঠস্বর! এমন মধুমাখা, এমন সুধাঢালা কণ্ঠস্বর কোনো মানুষের যে থাকতে পারে, তা কখনো শুনিনি, জানিনি বা কল্পনাও করতে পারিনি। কত সুধা-ধারা বহন করে যে তাঁর কণ্ঠ থেকে "হরি-বোল্"-ধ্বনি বার হয়, তা' শুধু যে শুনেছে সেই জানে; যে শোনেনি তাকে কোনো ভাষা দ্বারাই সে সুধা-স্বরের বর্ণনা করতে পারব না। এরপর দেখলাম, প্রত্যক্ষভাবেই দেখলাম, জীবমাত্রেই তাঁর কত দয়া; সামান্য পিপীলিকা থেকে আরম্ভ করে, আরশুলা, ইঁদুর, ব্যাঙ, বিড়াল, কুকুর, হনুমান, ছাগল, গরু ও সর্ব্ব শ্রেণীর মানুষ পর্য্যন্ত। তাঁর কাছে মিষ্টান্নের ঝুড়ি বা হাঁড়ি সদা সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখতে হয়; তিনি রাশি রাশি ('কণিকা' নয়) মিষ্টান্ন ছুঁড়ছেন সকল জীবের কাছে, সকল জীবকেই পরিতোষ সহকারে সেবা করাচ্ছেন তিনি। মানুষের মধ্যে তো কোনো বাছ-বিচার নেই-ই, ইতর শ্রেণীর জীবের প্রতি যেন তাঁর আরো দয়া। এ দয়া 'দয়াই'—একেবারেই অহৈতুকী; আত্মভোলা হয়ে, আনন্দে মগ্ন হয়ে তিনি জীবসেবা করে চলেছেন—এ যেন এক অফুরন্ত আনন্দের ঝর্ণাধারার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মপ্রকাশ। প্রায় দশ দিন ধরে গুরুদেবকে ও তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখে শুনে ও পরম আনন্দের অনুভূতি লাভ করে আমার স্পষ্টই ধারণা হল—এই যে আনন্দের অনুভূতি আমি নিত্যই লাভ করছি তাঁর সান্নিধ্যে, এর একমাত্র যুক্তিপূর্ণ কারণ এই হতে পারে, যে মানব-বেশী এই মহামানব এক অত্যাশ্চর্য্য, অভিনব ও অসীম আনন্দ ও শক্তির উৎসস্থল—যাঁর field of force এর এলাকায় অবস্থান কালে আমিও সেই অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও শক্তির ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে অনুভব করছি এবং তাঁর কাছ থেকে সরে এলেই সে শক্তির বিকাশ আর থাকছে না। এই দীর্ঘ দশদিন তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থানের ফলে আমার মত একজন যুক্তিবাদী

বৈজ্ঞানিকের আর সন্দেহের লেশ মাত্র রইল না যে মানুষের মধ্যে আমি একজন এমন 'Super-man' এর সন্ধান পেয়েছি, যিনি স্পষ্টতঃই এক অমিত শক্তি, অপরিমেয় প্রাণ-প্রাচুর্য্য, সীমাহীন আনন্দ ও অহৈতুকী করুণার আধার। এইভাবে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে মনে মনে স্থির করলাম, এমন সুদুর্লভ রত্নের যখন সন্ধান পেয়েছি, পেয়েছি যখন তাঁকে আমার গুরুরূপে, তখন কিছুতেই, কোনক্রমেই আর তাঁকে ছাড়ছিনে। বিদায় নেবার সময় তাই করজোড়ে নিবেদন করলাম, "বাবা, দয়া করে আমার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখবেন।" গুরুদেব একবার প্রসন্ন নয়ন তুলে চেয়ে, একটু জোর দিয়েই বল্লেন, "দৃষ্টি। তোমাকে আমি আমার বুকের ধন করে, আমার মঠের প্রধান ক'রে রাখতে চাই যে, বাবা।" গুরুদেবের এইরূপ emphatic anouncement শুনে আমার দুচোখ জলে ভরে উঠল। ত্রিকালজ্ঞ সেই মহাপুরুষ আপন ভাবে বলে গেলেন, "বাবা, তুমিই যে আমার নাম প্রচার করবে। দেশে দেশে, জনে জনে তুমিই গুরুর মহিমা প্রচার করবে।" তারপর একটু অন্যমনস্ক হয়ে মাথাটি নিচু করে বল্লেন, "দেখি তোমাকে বাঁচাতে পারি, তবে তো ?" এই বলে ত্বরিতপদে প্রস্থান করলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই আবার উপস্থিত হয়ে সেইরূপ মহাবস্তু একটু কাগজে মুড়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লেন, "এই মহাবস্তু নিয়মমত ব্যবহার ক'রো; আর গুরুদত্ত মহামন্ত্র নিয়মিত জপ ও গুরুধ্যান করো।" আমি সজল নয়নে সায় দিয়ে বল্লাম, "তাই করব, প্রভু! কিন্তু গুরুধ্যানের কি কোনো মন্ত্র আছে ?" গুরুদেব হেসে বল্লেন, "মন্ত্র যা' গুরু দয়া করে দিয়েছেন, সেই-ই মহামন্ত্র, সেটিই জপ করবে। আর তোমার পাগল ছেলেকে মনে মনে স্মরণ করবে।" এই বলেই দুয়ার বন্ধ করে দিলেন।

ইংরাজী ১'১।৩৪; আমি হোস্টেলে ফিরে এলাম। কিন্তু সে কি পুরানো-আমি, না এক নতুন মানুষ ? নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এ-আমি সে-পুরানো-আমি নই। দিবারাত্রি এক নবভাবে যেন সমস্ত মনপ্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, যে-ভাব এর আগে কখনো আমার হয়নি। এই ভাবাবেশ ক্ষণিক নয়, পরন্তু নিরবচ্ছিন্ন; দিনরাতের কোনো সময়ে কোনো ক্ষণেই এর কোনো ছেদ বা বিরতি ছিল না। সে যে কী ভাব, তা ভাষায় প্রকাশ করে সঠিক বলতে পারব না। অন্তরে যে-ভাবের উদয় হয়েছিল কথার দ্বারা কিছুতেই তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যায় না। এই অনুভবটির স্বরূপ কিরূপ ? মনে করা যাক, আমি একটি অতি উত্তম আস্বাদ্য বস্তু ভক্ষণ করছি; সেই বস্তুটির যে কী অপূর্ব্ব আস্বাদ তা' আমার তৃপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল চোখমুখের ভাবে কিছুটা প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু ভাষায় তার কিছুই বর্ণনা করা যায় না, তাই নারদ ভক্তিসূত্রে ব'লেছেন, এ হচ্ছে "মূকাস্বাদনবৎ।" আমার চোখেমুখে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ দেখে বাইরের কেউ হয়তো 'ভাবনা' দ্বারা আমার আনন্দ ও তৃপ্তির কিছুটার আভাস মাত্র

কল্পনা করে নিতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই এর পূর্ণ পরিচয় পাবেন না, যতক্ষণ না তিনি নিজে এ বস্তু আস্বাদ করছেন। এ হচ্ছে সেই শুদ্ধ-সত্ত্ব-রূপা ভক্তির আস্বাদ, যে রসের অনুভব কিছুতেই কোনো প্রকার ভাবনা দ্বারা লাভ করা যায় না; এ সত্য শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিপিবদ্ধ করেছেন: "ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার-কারভূঃ, হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।" ২।৫।৭৯, অর্থাৎ ভাবনার পথকে অতিক্রম করে চমৎকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ যে বস্তু শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে আস্বাদিত হয়, তাই রস। বস্তুতঃ, এ অনুভব ভাবনাজাত অনুভব নয়, এ শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলচিত্তে ভক্তিরসের অস্তিত্ব বা স্পর্শজ্ঞাপক অনুভব। শুদ্ধসত্ত্বরূপা ভক্তিরসের 'স্বপ্রকাশত্ব' গুণ থেকেই এর অস্তিত্ব জ্ঞাপিত হয়। আমার বাইরের আচরণে অন্তরের এই অপূর্ব্ব অনুভূতির কিছুটা অবশ্য আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার কারণ বাইরের কিছু কিছু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তখন আমাকে দেখে, আমার কথা শুনে বা আমার আচরণে সে কথা প্রকাশ করেছিলেন। অন্তরের এই অন্তরতম অনুভূতি "কহিবার কথা নহে, তথাপি বাউলে কহে, কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়" চৈঃ চঃ ২।২, এবং "বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে, তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে"—চৈঃ চঃ ১।৫

অন্তরে আমি সব সময়েই নন্দ-নন্দন নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্ট অনুভব করতাম, যেন দেখতে পেতাম আমার অতি কাছে, ঠিক আমার পাশটিতেই। সকালে ঘুম ভেঙেই দেখতাম, সেও যেন উঠে এসেছে আমার কাছে এবং আমার সব কাজে আমার পাশে পাশেই আছে। পড়বার সময় কখনো দেখতাম, সে আমার পাশটিতে বসে আছে; কখনো বা সামনে আকাশপটে ভেসে উঠত সে, কখনো গল্প করত, কখনো বাঁশী বাজাত, কখনো তার ভুবনবিজয়ী হাসি হেসে লুকিয়ে যেত—খুঁজে না পেয়ে যখন ছটফট করতাম, মনে হ'ত সে যেন পিছন থেকে চোখ টিপে ধ'রে বলত, "বলতো, আমি কে?" যখন কলেজে যেতাম, তখন রাস্তায় দেখতাম তাকে—কখনো মধুর হাসি হেসে চলত আমার হাত ধরে, কখনো এগিয়ে, কখনো পিছিয়ে, কখনো বা লুকিয়ে পড়ত, আর খুঁজে পেতাম না। বিজ্ঞান কলেজে ক্লাসে যখন দুরূহ বিজ্ঞানের জটিল Equations-এর মধ্যে নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলতাম, তখনো তাকে অনুভব করতাম, মনে হত—সে ও আমি একই সাথে এই দুর্ব্বোধ্য বিজ্ঞান তত্ত্বের মধ্যে বিভোর হয়ে আছি। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যখন কথা বলতাম, তখন কিন্তু সে লুকিয়ে পড়ত, আশে পাশে কোথাও থাকত না সে। বন্ধুরা বলত, তোমাকে খুব ভাব-গম্ভীর দেখাচ্ছে। আমি বন্ধুদের কথার কোনো উত্তর দিতে পারতাম না—শুধু অকারণে চোখ ছলছল ক'রে উঠত। ওদের কাছ হতে সরে গিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতাম বিজ্ঞান কলেজের তেতালার বারান্দার কোণের দিকে নির্জ্জনে রেলিংএ ভর দিয়ে। দেখতাম, সমস্ত

কলকাতা নগরী যেন আমার চোখের নীচে ছবির মত আঁকা রয়েছে। মাথার উপরে সুনীল আকাশ দূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে—আর ঐ আকাশপটে দূরে, বহুদূরে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, অস্পষ্টভাবে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে আমার বন্ধু, নবকিশোর শ্যামসুন্দর। বুঝতাম, আমার মন যখন লোকসমাজে নিবিষ্ট, তখন আমার বন্ধু আমার কাছে থাকে না, আমি যখন লোকসমাগম চাই, তখন সে পালিয়ে যায়। আমি যখন অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলি, বা আলাপ করি, তখন সে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু আমি যে সময় আপন মনে আপনাতে বিভোর হয়ে থাকি, তখনই তাকে দেখতে পাই, তার সাথে কথা বলি, তার সাথে কত লুকোচুরি খেলা হয়। হোষ্টেলে ফিরে একান্তে গৃহকোণে তাকে আবার দেখতে পাই, অভিমানভরে তার কাছে কত কিছু বলি, সেও বলে, অনেক অনেক কথা—যেসব কথা, যেসব নিভৃত মর্ম্ম আলাপ আজ আমিও জনসমাজে প্রকাশ করতে পারব না, প্রকাশ করলেও অনেকেই সেসব বিশ্বাস করবেন না। তবে এইটুকু বলতে পারি, সে যা বলে তা' চুপি চুপি, কানে কানে; মুখে তার মধু হাসি, চোখে তার ছলনা, গতি তার সদা চঞ্চল। সে বলে, "লোক আমি ভালবাসিনা, লোককে আমি 'ভয়' করি; একমাত্র নির্জ্জনেই আমি তোমার কাছে আসতে পারি—'নির্জ্জন' অর্থে জনশূন্য জায়গা নয়, পরন্তু যেখানে তোমার মন নিজের মধ্যে নিবিষ্ট।" সে বলে, "যখন তুমি আর কোনো লোকের সাথে আলাপরত, তা বাইরেই হোক, বা মনেই হোক—আমি আর সেখানে থাকতে পারি না।" গুরুমন্ত্র জপ করার সময় দেখতে পেতাম সে আমার সামনে এসে বাঁশী বাজাচ্ছে; যতক্ষণ মন্ত্র জপ করতাম, সবসময়ই তাকে দেখতাম। শোবার সময় অনুভব করতাম, সে বাঁশীটি রেখে আমার পাশেই শুয়ে আছে। স্বপ্ন যা দেখতাম, তাও তাকে জড়িয়ে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমি তার ধ্যান করতাম না। গুরুদেবও তা বলেননি; তিনি শুধু বলেছিলেন, "এই পাগল ছেলেকে শুধু ধ্যান করো।" তাই আমি করতাম, কৃষ্ণ-বিষ্ণু-গৌরাঙ্গ কারো ধ্যানের কথা তিনি বলেননি—আমিও ভুলেও তাঁদের কথা ভাবতাম না, ধ্যান করা তো দূরের কথা। অথচ আমার 'পাগল ছেলে'—সেই ছেঁড়া চট গায়ে দেওয়া অবধূত সন্ন্যাসীকে ধ্যান করা মাত্র—একী স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বয়ংপ্রকাশ! গুরুদেবকে ধ্যান করে এ কাকে দেখছি! "স্থাবর-জঙ্গম দেখি, না দেখি তার মূর্ত্তি—সর্ব্বত্র হয় মোর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি"—চৈঃ চঃ ২।৮,—আমার এই গুরুদেব কে এরপর আর স্পষ্ট করে বলবার প্রয়োজন হবে কি?

পাতাল-প্রভুর কৃপাধন্য ভক্তগণ কে কী দুর্ল্লভ রত্নলাভ করেছেন তাঁর কাছে, তা' জানি না—তবে আমি তাঁর শ্রীমূর্ত্তিধ্যান করে, তাঁর প্রদত্ত মন্ত্র জপ করে, একমাত্র তাঁর শ্রীচরণে নিষ্ঠা ও ভক্তি রেখে, আমার মহাভাগ্যবশতঃ যেটুকু তাঁর দুর্ল্লভ সঙ্গ ও সেবা

প্রাপ্ত হয়েছি, তার ফলস্বরূপ যেসব অমূল্য নিধিলাভ করেছি—একমাত্র তাই বর্ণনা করতে চেষ্টা করব। নবদ্বীপ থেকে কলকাতায় ফিরবার পর একটি অতি প্রবল তৃষ্ণা বা আকুলতা জাগল আমার মনে—সে হল কৃষ্ণনাম শ্রবণের পিপাসা। ঠিক জলের পিপাসার মতই। জলপিপাসা পেলে প্রথমে অস্বস্তি, তারপর আকুলতা, তারপর কষ্ট, নিদারুণ কষ্ট—। আমারও ঠিক তাই হল। প্রথম প্রথম মনে হ'ত—একটু হরিনাম শুনতে পাওয়া যায় না? অথচ আগের দিনের আমি নবদ্বীপের হরিনামকীর্ত্তনমুখর পরিবেশে থেকেও কখনো হরিনাম শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করিনি। কিন্তু সেদিনের সেই 'পুরাতন আমি'র মৃত্যু হয়েছে—গুরুদেব বীজমন্ত্র বপন করে যে 'নতুন আমি'র জন্ম দিলেন। সেই আমি আজ কলকাতার জনসমুদ্রের কল-কোলাহলের মধ্যে, Oxford mission Hostel-এর প্রতিকূল পরিবেশে বাস করে এবং Science College-এ সতত বিজ্ঞান চর্চায় মনকে নিয়োজিত রেখেও একটু হরিনাম, একটু কৃষ্ণনাম শুনবার জন্য যেন আকুল হয়ে উঠলাম। কোথায় যাই, কাকে শুধাই, কোথায় গেলে হরিকথা আলাপন করতে পারি? বন্ধু গৌরের কাকা কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক মহাশয়—যিনি আমাকে পুত্রসম স্নেহ করতেন, এবং গুরু-করণ সম্বন্ধে যিনি সর্ব্বপ্রথম আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাঁর কাছেই এলাম এ বিষয়ে পরামর্শ নিতে। কবিরাজ মহাশয় আমাকে দেখে এবং আমার কথা শুনে অত্যন্ত খুসী হয়ে আমাকে নিয়ে এলেন অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে। সেখানে এসে আমাকে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়ে দিলেন পত্রিকার তদানীন্তন মূল সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে। ঘোষ মহাশয় উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন, তারপর, আমার চোখেমুখে তিনি যে কী দেখলেন তা জানিনা, সেই পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ আমার প্রতি আকৃষ্টই হলেন না, একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। আমাকে সস্নেহে তাঁর কাছে বসিয়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নয়নে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "তুমি এমন রত্ন! মহাপ্রভুর এমন কৃপা তোমার উপর!" আমি প্রথমে তাঁর এই উক্তিতে সলজ্জে নতনয়নে চেয়ে রইলাম, তারপর ধীরে ধীরে বল্লাম, "দয়া করে আমাকে একটু হরিকথা শোনান, কোথায় গেলে কৃষ্ণনাম শুনতে পাব তারই একটু ব্যবস্থা করে দিন।" ঘোষমহাশয় আগ্রহভরে বল্লেন, "দেব, সবই দেব। মহাপ্রভুই তোমাকে পাঠিয়েছেন, এবং তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।" এই বলে তিনি শিশির ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত' কয়েক খণ্ড আমাকে পড়তে দিলেন এবং বল্লেন, "প্রথমে এই বইগুলি পড়। তারপর বল্লেন, "তুমি প্রত্যহ কলেজের পর বিকালে আমার কাছে এসো, সুরেন। তোমার সাথে হরিকথা আলাপন করে আমি সুখী হব, আর তোমাতে আমাতে বেড়াব। কোথাও কৃষ্ণকীর্ত্তন হলে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। প্রকৃত হরিভক্ত পণ্ডিতদের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।"

ওঁর দেওয়া 'অমিয় নিমাই চরিত' বইগুলি আগ্রহভরে পড়তে লাগলাম, আর রোজ বিকালে তাঁর কাছে গিয়ে কৃষ্ণ-কথা শুনতে লাগলাম। অতবড় পত্রিকার প্রধান কর্মকর্তা হয়েও ঘোষ-মহাশয়, আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া মাত্রই, সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে উঠে পড়তেন এবং আমার সঙ্গে হরি-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠতেন। আমি এ রাজ্যে নবাগত, কিছুই জানি না, সুতরাং তাঁর কাছে বহু বিষয় শুনতাম আগ্রহভরে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণই বা কে, রাধাই বা কে—এবং নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁদের কী সম্বন্ধ, বৃন্দাবনের গোপ গোপীগণের সাথে গৌরলীলার ভক্ত ও পরিকরদেরই বা কী সম্বন্ধ—ঐসব কথা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন তিনি। তারপর বলতেন ভক্তদের আচরণ, গৌরলীলা পরিকরবর্গ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগের ভক্ত ও সাধকদের কথাও। শুনতাম শিশির ঘোষের হরিভক্তি ও কীর্ত্তন অনুরাগের কথা, শুনতাম কেমন করে তিনি ছেঁড়া মাদুরে বসে কীর্ত্তন করতে করতে পত্রিকার Editorial dictate করে যেতেন। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করতাম, "ছেঁড়া মাদুরে বসে! চেয়ার-টেব্‌ল ছিল না?" উনি বলতেন, "না। শিশিরবাবু ছিলেন প্রকৃত গৌরভক্ত—এবং ভক্তের প্রধান লক্ষণই দৈন্য ও আড়ম্বরহীনতা।" তারপর সামনের টেবলটি দেখিয়ে বলতেন, "এই যে টেব্‌লটি দেখছ, এটি present দিয়েছিলেন Ramsay Macdonald সাহেব; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হবার আগে তিনি যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন পত্রিকা-অফিসে এসে এই চেয়ার ও টেব্‌ল উপহার দিয়েছিলেন তিনি।" এইভাবে ভক্তদের দৈন্য, বৈরাগ্য ও অনুরাগের বিবিধ বিবরণ শুনাতেন আমাকে,—কখনো তাঁর অফিসে ব'সে, কখনো রাস্তায় বা গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে। বলতেন, "সুরেন, ভগবান ভক্তদের মধ্যে আবিষ্ট হয়েই নিজেকে প্রকাশ করেন; ভক্তসঙ্গ তাই এত আনন্দদায়ক। ভক্তসঙ্গ তাই এত বাঞ্ছনীয়। একমাত্র ভক্তদের সান্নিধ্যেই সেই পরম স্বরূপ, সেই সচ্চিদানন্দঘন পুরুষের উপলব্ধি হয়। এই দেখ না, তোমার সঙ্গে যতটুকু আমি থাকি, যতক্ষণ বেড়াই, এতটুকুই আমি পরম আনন্দ লাভ করি! তুমি যদি শুধুই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হ'তে, তাহলে কখনই এমন আনন্দ পেতাম না তোমার সান্নিধ্যে; তুমি মহাপ্রভুর কৃপা পেয়েছ, ভক্তিধন লাভ করেছ, তোমার মধ্যে আমি সেই আনন্দময় চিরসুন্দরের ছবি দেখতে পাচ্ছি বলেই আগ্রহ করে তোমার সঙ্গ করি।" নিজের প্রশংসাসূচক এসব কথা শুনে লজ্জায় আমি যেন মাটিতে মিশিয়ে যেতাম, ধীরে ধীরে বলতাম, "আমি অতি সামান্য;—এসবতো কিছুই জানি না, তবে এত কথা কেন বলছেন আমাকে?" বৃদ্ধ ছলছল চোখে আমার দিকে চেয়ে বলতেন, "তোমাকে তো বলিনি, সুরেন,—বলেছি মহাপ্রভুর কৃপাকে। সেই সুদুর্লভ কৃষ্ণ-কৃপাকে—যা, তোমার

উপর পূর্ণভাবে এখন বর্ষিত হচ্ছে। এ যে অতি দুর্লভ, সুরেন,—দেবতাগণেরও বাঞ্ছনীয়।" আমি ওঁর কথা শুনে ছলছল চোখে শুধু চেয়ে থাকতাম, কিছু বলতে পারতাম না। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আমার 'গুরু'র কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবং ব'লেছিলেন—"গুরুকৃপাই কৃষ্ণকৃপার মুখ্য কারণ। গুরুকৃপালাভের জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।" আমি জানিয়েছিলাম আমার সিদ্ধ গুরুদেবের কথা। ঘোষ মহাশয় বল্লেন—"তাঁকে আমার জানার সৌভাগ্য হয়নি।" আমি উত্তরে বল্লাম, "না জানবারই কথা। তিনি নিজেকে গোপনেই রেখেছেন। সাধনা করেন তিনি মাটির তলায়, নির্জ্জন গুহার অভ্যন্তরে, যেখানে কখনো সূর্য্যালোক প্রবেশ করতে পারে না।" আমার কথাগুলি তিনি পরম শ্রদ্ধাভরে শুনেছিলেন। আমি আরো জানিয়েছিলাম, স্বর্গত শিশির ঘোষের মাতা আমার গুরুদেবেরই শিষ্য ছিলেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন—"এ সংবাদ আমরা জানতাম না। তিনি নবদ্বীপে গিয়েছিলেন বটে, তবে সেখানে তাঁর গুরুকরণের সংবাদটি বাড়ীতে কাউকে জানান নি। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন, যে দুর্লভ রত্ন তিনি লাভ করেছেন, তা গোপনে রাখবারই জিনিষ। এবার বুঝলাম, সেইজন্যই তাঁর পুত্র শিশির ঘোষ এত বড় প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি হয়েও কেন এতবড় নিষ্ঠাবান্ ভক্ত হয়েছিলেন।"

মৃণাল কান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁর ভাণ্ডারস্থিত সকল ধর্ম্ম পুস্তকই আমাকে পাঠ করালেন। দু'একদিন কৃষ্ণ-কীর্ত্তনও শুনে এলাম। তারপর তিনি বল্লেন, "আমার ভাণ্ডার তো ফুরালো ; এবার চল, তোমাকে নিয়ে যাই এমন একজন গুণী ভক্তের নিকট যিনি বাংলা, তথা ভারতের বর্ত্তমানকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পণ্ডিত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম এমন কি সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে তাঁর চেয়ে বড় শাস্ত্রজ্ঞ বর্ত্তমান কালে আর কেউ নেই ; তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়, আমাদেরই নিকট প্রতিবেশী। এই ব'লে তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে। দ্বিতলে উঠে ঘোষ মহাশয় আমার হাত ধ'রে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে এসে বল্লেন, "পণ্ডিত মশায়, আপনার কাছে আজ একটি রত্ন নিয়ে এসেছি।" বিদ্যাভূষণ মহাশয় উৎসুক চোখে আমার দিকে চাইলেন। ঘোষ মহাশয়ের এরূপ প্রশংসাসূচক ভূমিকায় আমি লজ্জায় চোখ নীচু করলাম। একে তো নিজের প্রশংসাবাদে আমি অতিশয় সঙ্কোচ অনুভব করি, তার উপর একজন ভারত বিখ্যাত মহাপণ্ডিতের কাছে এরকমভাবে—। সলজ্জভাবে প্রতিবাদ করবারও সময় পেলাম না, আবার এরি মধ্যে ঘোষ মহাশয় আমার university career, আমার বিজ্ঞান-চর্চ্চা, আমার পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান ইত্যাদির ফিরিস্তি দিয়ে আমার ধর্ম্মজগতে প্রবেশের ইতিহাস ও অপূর্ব্ব ভাবোদয়ের বর্ণনা করতে সুরু করেছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও আগ্রহ সহকারে ওঁর কথাগুলি

শুনছিলেন। সব শুনে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "তোমার নাম কী, বৎস ?" আমার নাম, ধাম, বিশেষতঃ নবদ্বীপে আমার জন্মস্থান ও পূর্ব্বপুরুষগণের আদি-নিবাস শুনে তিনি পুলকিত হয়ে শুধালেন, "তোমার গুরু কে ?" গুরুদেবের পরিচয় দিলাম ; তিনি একটু চিন্তা করে বল্লেন, "ঠিক স্মরণ হচ্ছেনা, তাঁর দর্শন পেয়েছি কিনা। তবে তিনি যে একজন আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপাছাড়া কারো মধ্যে এমন ভাবোদয় সম্ভব নয়। মৃণালবাবু না বললেও, আমি তোমার চোখে মুখে সে অপ্রাকৃত ভাবের প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রেছি"—এই ব'লে তিনি একরাশ শ্লোক আওড়ালেন ; তখন সে সব শ্লোকের প্রত্যেকটির অর্থ খুঁটিয়ে না বুঝলেও, এটুকু পরিষ্কার হল যে শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করে তিনি এইটুকু প্রমাণ করতে চাইছেন যে, আমার মধ্যে যে-ভাবের উদয় হয়েছে, তা' সচরাচর কারো হয়না। মানুষ নিজের চেষ্টা দ্বারা এ ভাব প্রকাশ করতে কখনো পারে না ; প্রাক্তন সুকৃতিবশতঃ কচিৎ কারো ভাগ্যে কোনো দুর্লভ মহাপুরুষ বা সিদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপা হ'লে তবেই এই সুদুর্লভ ভাব-রত্ন মানুষ লাভ করতে পারে। শেষকালে তিনি বল্লেন, "তুমি সেই দুর্লভ কোনো মহাপুরুষকেই তোমার গুরুরূপে লাভ করেছ ; শুধু তাই নয়, তাঁর কৃপাও পেয়েছ। এ ভাব যে নিজ-অর্জ্জিত ধন নয়, তা' আমি জানি। শুধু তুমি কেন, কেউই কোনো কালে নিজশক্তিবলে এ ভাব অর্জ্জন করতে পারে না। এ তোমার সেই সিদ্ধ গুরুর কৃপাসঞ্জাত। সুতরাং সেই গুরু কৃপা যাতে বরাবর অটুট রাখতে পার, তোমার সমস্ত মনপ্রাণ সেই দিকেই নিয়োগ কর। তোমার নিজ চেষ্টা দ্বারা বিদ্যা অর্জ্জন করতে পার, কিন্তু এই ভাব লাভ করতে পারনা। মহাভাগ্যফলে যে গুরুকৃপা তুমি পেয়েছ, তাকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখতে চেষ্টা কর।"

আমি সলজ্জ বিনয়নম্র কণ্ঠে বল্লাম, "আমি তো এ জগতের কিছুই জানিনা, একেবারেই নবাগত। গুরু-তত্ত্ব কী—তাও জানিনা, গুরুকৃপা কেমন ক'রে লাভ করতে হয় বা অটুট রাখতে হয় তাও তেমনি জানি না। শুধু হরিকথা শুনবার জন্য যে আকুল পিপাসা হয়েছে, তাই মিটাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি দয়া করে আমার পিপাসা নিবারণ করুন, আর এ বিষয়ে যা' জ্ঞান দিতে হয়, তাই দিন।" আমার কথা শুনে সেই জটাজূটলম্বিত নব্বই বছরের অতিবৃদ্ধ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দুই চোখ ছলছল ক'রে উঠল ; তিনি বল্লেন, "বিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানের যুগে, একজন বিজ্ঞানের ছাত্রের, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কৃতী ছাত্রের যে হরিকথা শুনবার জন্য এমন আকুল পিপাসা হ'তে পারে, যার জন্য সে ছুটাছুটি করে—তোমাকে না দেখলে একথা আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। ধন্য বালক, ধন্য তোমার ভাগ্য, যে মহৎভাগ্যে তুমি এমন সিদ্ধ গুরুর কৃপালাভ করেছ। এ জিনিষ তো আমি

তোমাকে দিতে পারবনা, বৎস ; তবে শাস্ত্র-জ্ঞান কিছু তোমাকে দিতে পারি। অবসর মত এসো তুমি আমার কাছে।"

দেখলাম বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ঘরটি একটি মাঝারি লাইব্রেরী—বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে হিন্দুধর্ম্মের যা' কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ—সব তাঁর আলমারীসমূহে ভর্ত্তি। দর্শন শাস্ত্রও রয়েছে প্রচুর। মুখে বললাম, "দয়া ক'রে তাই জানাবেন। আমি ঐ সময়েই আপনার কাছে আসব।" বিদায় নেবার সময় বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর রচিত একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়তে দিলেন আমাকে।

এরপর থেকে নিয়মিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে আসতে লাগলাম এবং তাঁর কাছে বৈষ্ণবশাস্ত্রগ্রন্থসমূহের পরিচয় পেলাম। নিত্য এই প্রবীণ পণ্ডিতের কাছে শাস্ত্র গ্রন্থ আলোচনার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি সমগ্র বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্র ও বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পেয়ে গেলাম। আমার কাছে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে তিনি নিরতিশয় আনন্দ পেতেন ; বলতেন, "এত সহজে এসব দুরূহ জিনিষ বুঝে নেবার মত শ্রোতা বা ছাত্র ইতিপূর্ব্বে আমি পাইনি। এ সব তত্ত্ব তুমি তোমাদের পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের সাথে তুলনা ক'রে দেখো।"

এইভাবে নিত্য হরিকথা শ্রবণ ও শাস্ত্র আলোচনায় আমার কৃষ্ণ-অনুরাগে ভরা মধুময় দিনগুলি কাটতে লাগল। কৃষ্ণস্মৃতি ও কৃষ্ণভাবাবেশ পূর্ব্বের মতই অক্ষুণ্ণ রইল। প্রায় সর্ব্বক্ষণই সেইভাবে আমি আবিষ্ট হয়ে থাকতাম ; বন্ধু-কৃষ্ণকে কাছে কাছে অনুভব করতাম, তার সাথে কথা বলতাম ও তার ভাবে ভাবিত হয়ে আনন্দে, নিশ্চিন্ত মনে থাকতাম।

পূর্ব্বেই বলেছি, ইতিমধ্যে বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান আমার হয়েছিল। বইও কিছু কিছু পেয়েছিলাম সেগুলিই এখন বিশদভাবে পড়তে সুরু করলাম। গুরুদেবকে মাঝে মাঝে পত্র লিখি ও তাঁর উত্তরও পাই। একবার তিনি লিখলেন, "গুরুদেবের চরণে মতি স্থির রাখিয়া কর্ম করিলেই সকল বিষয়ে সুফল পাওয়া যায় গো, বাবা।" কথাগুলি আমার মনে দৃঢ় রেখাপাত করল, কারণ আমি বুঝলাম এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা তা' সমর্থন করেছিলেন যে বর্ত্তমানে আমার অন্তরে যে ভাবোদয় হয়েছে, এতে আমার নিজের কোনোই কৃতিত্ব ছিলনা, পরন্তু এ সমগ্র ভাবেই সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপা-সঞ্জাত। সেই সিদ্ধ মহাপুরুষই আমার গুরুদেব, এবং বর্ত্তমানে আমি যে ভাববন্যায় ভাসছি, সে বন্যার স্রষ্টা আমার গুরুদেব ছাড়া আর কেউ নয়। সুতরাং সেই গুরুদেবের চরণেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করা বা মতি স্থির রাখাই আমার কর্ত্তব্য। গুরু ছাড়া অন্যত্র মনঃসংযোগ করলে এপথে বাধা বিঘ্ন আসতে বাধ্য। সুতরাং এপথে সামগ্রিক সুফল লাভের আশা করতে হলে একমাত্র

গুরুদেবের শ্রীচরণেই সমস্ত মনকে কেন্দ্রীভূত বা focus করতে হবে। মনকে বিক্ষিপ্ত করা চলবে না, তাতে মনের আলোক diffused হয়ে যাবে, কোনো ফলই পাওয়া যাবে না।

সুতরাং আর কোথাও যাওয়া বন্ধ করলাম, সর্ব্বদা গুরুচরণই স্মরণ করতে লাগলাম। অবশ্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন যথারীতিই চলল। কয়েকদিন পরেই শ্রীগুরুদেবের পত্র পেলাম—আশ্রমে মাঘীপূর্ণিমা উৎসব সুরু হচ্ছে, আমাকে আশ্রমে যেতে লিখেছেন। কথাগুলি সামান্য, কিন্তু অনুরাগে ভরা তখন আমার মন সেই সামান্য আহ্বানেই একেবারে বিচলিত হয়ে উঠল। গুরুদেব তাঁর কাছে আসতে লিখেছেন! এযেন আমার মহাভাগ্য—মনে হল গুরুদেব দূর থেকে মৃদু হেসে যেন আমাকে ডাকছেন হাতছানি দিয়ে। আর কি বসে থাকা যায়? প্রবল আকর্ষণে যাত্রা করলাম নবদ্বীপে।

১৪ই মাঘ রবিবার সন্ধ্যায় যখন নবদ্বীপে পৌঁছলাম, তখন চারিদিক জ্যোৎস্নালোকে ঝলমল করছে। বাড়ীর পাশে এসে, বাড়ীতে উঠতে ইচ্ছা হলনা। সে কি তীব্র আকর্ষণ! মনে হল, আগে গুরুদেবকে দর্শন করি, তারপর বাড়ী। সুতরাং বাড়ীর পাশে এসে শুধু বলে গেলাম যে আমি এসেছি, গুরুদেবকে দর্শন করে তারপর বাড়ী ফিরব। প্রায় ছুটতে ছুটতে আশ্রমে এলাম; দেখলাম মন্দির খোলা আছে তখনো। সহজেই গুরুদেবের দর্শন পেলাম। প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে তিনি মধুর কণ্ঠে বল্লেন, "এসেছ, বাবা; তোমার জন্যই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি।" তখন তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছিলাম আমি,—সেই অবস্থাতেই গুরুদেবের কথাগুলি শুনে দুই চোখ আমার জলে ভেসে গেল। মনে ভাবলাম, আমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ আমি তো কিছুই জানাইনি। গুরুদেব হাসিমুখে আমাকে মিষ্টান্ন প্রসাদ দিলেন। তারপর বল্লেন, "আবার কাল এসো, বাবা! যতদিন এখানে থাকবে, আশ্রমে প্রসাদ পাবে।" দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। পরিতৃপ্ত মনে আমি বাড়ী ফিরে এলাম।

পরদিন থেকেই আশ্রমে মাঘীপূর্ণিমা শুরু হল। আমার জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। আশ্রমে উৎসব ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখিনি। বিশেষতঃ, মাঘীপূর্ণিমা উৎসবের একটা বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে 'রস-কীর্ত্তন-গান'; যা' আমি এর আগে কখনো শুনিনি। আশ্রমে বহু ভক্ত ও শিষ্যসমাগম হতে লাগল, তাঁরা সকলেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণসমীপে যাতায়াত করছেন, গুরুদেব তাঁদের মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করছেন; এদিকে বাইরে সমাগত ভক্তগণকে দর্শন দিয়ে, মধুর "হরিবোল্" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে অজস্র মিষ্টান্ন ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছেন। সমাগত ভক্তগণও হরিধ্বনিতে চারিদিক ভরে তুলছেন। ওদিকে দ্বিপ্রহরে ভোগ-

আরতি, আরতিকীর্ত্তন হচ্ছে— "ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি—"। অপরাহ্নে কীর্ত্তনীয়াদলসমূহ রাধাকৃষ্ণরসকীর্ত্তন গান সুরু করছেন; ভক্তগণ গুরুদেবকে নানাবিধ মাল্যে ভূষিত করে অপরূপ সজ্জায় সাজিয়েছেন; তিনি দুই কর যুক্ত করে ভক্তগণের দিকে চেয়ে এক একবার মধুর কণ্ঠে 'হরি-বোল' ধ্বনি দিচ্ছেন; সেই সুধা কণ্ঠধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে কীর্ত্তনীয়া তার গান থামিয়ে দিয়ে বিমুগ্ধ নয়নে গুরুদেবের দিকে হাত জোড় করে চেয়ে আছেন। গুরুদেব আবার হরি-ধ্বনি দিয়ে রাশি রাশি মিষ্টান্ন হরি-লুট ছুড়ে দিচ্ছেন। সকলেই আনন্দে ভরপুর। যেন এক পুলকের বান ব'য়ে যাচ্ছে আশ্রমে। যে দিকে চাই, সেদিকেই আনন্দ! গুরুদেবের আনন্দময় মূর্ত্তি চোখে যেন আনন্দের স্রোত বয়ে নিয়ে আসছে, তাঁর মধুর হরি-ধ্বনি সেই আনন্দ-স্রোতে আনন্দের তরঙ্গ তুলছে, চারিদিকে হরিকীর্ত্তন যেন আনন্দের জোয়ার হয়ে ভেসে আসছে—সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই যেন সেই জোয়ারে ভাসিয়ে নিচ্ছে। আমার মনে হতে লাগল—এত আনন্দ এই পৃথিবীতে আর কোথাও তো নেই-ই, শাস্ত্রে যাকে গোলোকধাম বলে, সে কি এর চেয়ে বেশী আনন্দময়?

এই আনন্দ সাগরের মধ্যে ডুব দিয়ে যেন স্বপ্নের মত আমার দিনরাত্রি কাটতে লাগল। তার সাথে দুই বেলা পেট পুরে প্রসাদ ভোজন এবং গুরুদেব প্রদত্ত প্রচুর মিষ্টান্ন হরি-লুট সেবা। প্রতিদিন আশ্রমে দরিদ্রনারায়ণসেবা হচ্ছে,—সেও এক অপূর্ব্ব দর্শন! সাধু, মহাত্মগণ ও ক্ষুধিত দরিদ্র জনগণ ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে হরিধ্বনি ও গুরুদেবের জয়ধ্বনি দিতে দিতে বিদায় নিচ্ছে। শেষদিন হল নগর কীর্ত্তন বা ধুলোট। গুরুদেব স্বয়ং বার হলেন এই নগর কীর্ত্তনে;—ঠিক যেমন চারশ বছর আগে মহাপ্রভু বেরিয়েছিলেন কীর্ত্তনসহ নগর-পরিভ্রমণে এই নবদ্বীপের পথে পথে। ভক্তগণ গুরুদেবকে বেষ্টন করে একটা মণ্ডলী রচনা করলেন। গুরুদেবের পাশেই দু'তিনজন ভক্ত দানাদার, বাতসা ইত্যাদি মিষ্টান্নের ধামা ও বস্তা মাথায় করে চলতে লাগলেন। আর গুরুদেব পথিমধ্যে হরি-ধ্বনি দিয়ে সমাগত জনগণের দিকে রাশি রাশি মিষ্টান্ন ছুড়তে লাগলেন। কীর্ত্তনীয়াগণ খোল-করতাল বাদ্যসহ অবিরাম হরিনাম কীর্ত্তন ক'রে চললেন, অনুগামী ভক্তরাও সেই গানে যোগ দিলেন। সবে মিলে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

গুরুদেবের নগর-কীর্ত্তন বা ধুলোটের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে গুরুদেবের আশ্রমের তরফ থেকে জনগণের প্রতি ধূলি, কর্দ্দম বা নোংরা জিনিষ নিক্ষেপ করা হয় না। ভক্তপদধূলিতে পথে যেটুকু ধূলি উড়ে, শুধু সেই ধূলিই ধুলোটের নাম করণের কারণ—ইচ্ছাকৃত ভাবে ধূলি নিক্ষেপ করে অপরকে দুঃখ দেওয়া এর কখনও অঙ্গ নয়। অপরের মনে কষ্ট দেওয়া তো নয়ই, পরন্তু অপরকে আনন্দ ও তৃপ্তিদানই

শ্রীভগবান্ ও তাঁর ভক্তগণের সকল আচরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই গুরুদেবের আশ্রমে ধুলোটের সময় তিনি জনগণের প্রতি রাশি রাশি মিষ্টান্ন নিক্ষেপ করেছেন। অবশ্য ভক্তগণ ইচ্ছা করে কেউ কেউ পথিমধ্যে ধূলিমধ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন বা ভক্ত-পদধূলায় গড়াগড়ি দেন। শ্রীভগবান্ বা মহাপুরুষগণ প্রতি জীবকেই প্রীতি প্রদান করেন, কোনো জীবকেই কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ দেন না তাঁরা। শ্রীগুরুদেবের আচরণে সেইটাই প্রত্যক্ষ করলাম অত্যন্ত প্রকটভাবে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাকীর্ত্তনগান শ্রবণ জীবনে এই আমার প্রথম। কীর্ত্তনগানের সুরের মধ্যে যে রাধাকৃষ্ণলীলা এমনভাবে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠতে পারে তা ইতিপূর্ব্বে আমার জানা ছিল না। এ কীর্ত্তন স্বয়ং মহাপ্রভুরই সৃষ্টি এবং কীর্ত্তনে তিনিই যেন সাক্ষাৎ আবির্ভূত হয়ে লীলারস বিস্তার করেন। কিন্তু তথাপি একথা বলতে আমি বাধ্য, যে কীর্ত্তনের মধ্যে আমাদের গুরুদেব বিরাজিত তার বৈশিষ্ট্যই সম্পূর্ণ পৃথক। আর সেইজন্যই তাঁর উপস্থিতিতে এই কীর্ত্তনগান আমাকে অপ্রাকৃত ভাব-রাজ্যে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। গুরুদেবের সঙ্গে পথে পথে নগর ভ্রমণ—এও আমার জীবনে এই প্রথম। এ যে কী আনন্দ—তা লিখে বোঝাতে পারব না। ইতিমধ্যে মহাপ্রভুর লীলা কাহিনী পড়েছি আমি। আমার মনে হল, চারশ' বছরের সময়ের পর্দ্দাটুকু কে যেন হঠাৎ অপসারিত করে দিয়েছে, এবং আমি সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে চলেছি, যেন চতুর্দিকে "মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন উচ্চধ্বনি, হরি-হরি ধ্বনি বিনা নাহি শুনি," যেন "কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন, নাচিতে নাচিতে আইলা ভবন"— চৈঃ চঃ ১।১৭

মাঘীপূর্ণিমা উৎসব শেষে আবার কলকাতার হোষ্টেলে ফিরে এলাম। আশ্রম থেকে যে ভাব অন্তরে নিয়ে এলাম, তার আবেশ রইল বেশ কিছুদিন। ভাবাবেশে যেন কতকটা নেশার ঘোরে থাকলাম। এ নেশা যে কি রকম, তা লিখে বোঝাতে পারব না। নিত্যানন্দপ্রভু জগাই মাধাইকে বোধ হয় এই নেশার কথাই বলেছিলেন। এ নেশা যার হয়েছে সেই বুঝবে, অন্যথা একে বোঝানো যাবেনা কোনো কথার দ্বারা। গুরুদেব বোধ হয় সেই 'মদিরা'র দু'এক ফোঁটা কৃপা করে আমাকে পান করিয়ে ছিলেন।

কিন্তু তখনো আমার 'কর্ম'-ভোগ কাটেনি। গুরু প্রদত্ত সে 'মদিরা'র নেশা খুব বেশী দিন রইলনা আমার। যে প্রবল অনুরাগের স্রোতে ভেসে চলেছিলাম, সহসা মাস দেড়েক পরে তাতে বাধা পড়ল, স্রোতের উপর যেন কর্মরূপ শিলারাশি এসে বিঘ্ন সৃষ্টি করল। গুরুদেব বলেছিলেন, "বাধা আছে, সাবধান। এ পথে এলেই গুরুর পরীক্ষা দিতে হবে।" বুঝলাম—আজ যে বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছি, সে গুরুর পরীক্ষা, শ্রীগুরুদেবের প্রথম পরীক্ষা। ঠিক সেই সময়ে শ্রীগুরুদেব পত্রে লিখলেন, "মায়াময়

পরীক্ষাক্ষেত্রে একমাত্র শ্রীগুরুদেবই সত্য।" আমার উপর যে পরীক্ষা চলেছে, অন্তর্য্যামী গুরুদেবের পত্রে তা স্পষ্ট হল। বুঝলাম, বাধাবিঘ্ন যা আসছে, সব মায়াময়,—সেই রূপকথার মায়া-রাক্ষসী ও ভূতপ্রেতের ভয় দেখানোর মত। গুরুদেব লিখেছেন, "একমাত্র শ্রীগুরুই সত্য," অর্থাৎ শ্রীগুরুচরণ স্মরণ রাখতে পারলে সব মায়ারাক্ষসীর মিথ্যা ভয় মিলিয়ে যাবে। তাই প্রাণপণে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ মনে মনে আঁকড়ে ধরলাম;—রক্ষা কর, রক্ষা কর, প্রভু। চারিদিকে ঘোর বিপদ। গুরুদেব লিখছেন, "জীবের কর্মফল ভোগ করিতেই হইবে তবে ঐকান্তিকভাবে গুরুচরণ স্মরণ করিলে শুভ হইয়া থাকে," লিখছেন, "নিজ কর্ত্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না; সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা করিবে ও সৎগ্রন্থ অবকাশ মত পড়িবে।" তাঁর বাক্যমত একান্তভাবে তাঁর শ্রীচরণ স্মরণ করে কর্ত্তব্য-কর্ম, অর্থাৎ গুরুমন্ত্রজপ, করতে লাগলাম। শাস্ত্রগ্রন্থাদিও সময় মত পড়তাম। কিন্তু তবু বিঘ্ন কাটল না গুরুদেব এবার লিখলেন, "অবকাশমত অবোধ সন্তানকে দেখা দিয়া যাইবে"—তাই এলাম; ছুটে এলাম এক শনিবারে। নবদ্বীপে পৌঁছেই আকুল আগ্রহে এলাম আশ্রমে। আবার দর্শন পেলাম—সেই তাপিতপ্রাণ-শীতলকারী, সেই হৃদয়-জুড়ানো মূর্ত্তি আবার দেখলাম দুটি নয়ন ভরে। মনে হল,-সকল ব্যথা, সকল কষ্ট, সকল জ্বালা যেন নিমেষে জুড়িয়ে গেল। তিন দিন থেকে আবার কলকাতা ফিরে এলাম। কিন্তু কলকাতায় এসে বেশী দিন থাকতে পারলাম না। অসুখ পুনরাক্রমণ করল। নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে আবার ছুটে এলাম নবদ্বীপে। কারণ অতি স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করছি, নবদ্বীপে এসে গুরুদেবের সান্নিধ্যে যতক্ষন থাকি, ততক্ষণ অসুখের নাম গন্ধও নেই—অথচ কলকাতায় ফিরে এলেই অসুখের পুনরাবির্ভাব ঘটছে। সুতরাং আবার সেই দুরন্ত রোগ-যন্ত্রনার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে আমি ছুটে চলে এলাম গুরুদেবের কাছে। এখানে আসতেই আমার অসুখের সমস্ত দুর্লক্ষণ একেবারে মিলিয়ে গেল, ঠিক সূর্য্যোদয়ে রাত্রির অন্ধকারের মতই। স্থির করলাম, গুরুদেবকে আর ছাড়বনা; কলকাতায় আর ফিরব না। শরীর থাকলে রোগযন্ত্রণা মুক্ত হয়ে সুস্থ হলে তবে তো পড়াশুনা। কাজেই নবদ্বীপেই রয়ে গেলাম। প্রত্যহ শ্রীগুরুদেবের কাছে কাছে থাকা' প্রসাদ ভোজন, তাঁর পত্রাদি লেখায় সাহায্য করা—এই সব হল আমার দৈনন্দিন কার্য্য। শরীর কিন্তু আমার সারল না, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলাম। তথাপি শ্রীগুরুপদে বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য হলনা। বাইরে অবশ্য তাঁকে কিছু বলতাম না, কিন্তু মনে মনে সুদৃঢ়ভাবে তাঁর রাতুল ও অভয় শ্রীচরণ দুটি আঁকড়ে ধরে রইলাম।

এতদিনে গুরুদেবের সম্বন্ধে আমি এই কয়েকটি ধারণা করতে পেরেছি। প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে তিনি হচ্ছেন—a source of intense energy, যে-

energy-র স্বরূপ দুর্বোধ্য হলেও তার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট, বিশেষতঃ তাঁর field of force-এর jurisdiction এর মধ্যে। এ energy-র প্রভাব যে অন্ত জীবের দেহে ও মনে অতি প্রকট এ সুনিশ্চিত। আমি নিজে নিজেই বার বার তা উপলব্ধি করেছি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি একজন ভগবৎসাধক, যিনি নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তার প্রমাণ পেয়েছি আমি বৈষ্ণব পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উক্তিতে এবং তাঁর প্রদর্শিত যুক্তিতে। কারণ গুরুদেবের সংস্পর্শে এসে আমার মধ্যে যে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবোদয় হয়েছিল, যার প্রকাশ শুধু আমার অন্তরেই সন্নিবদ্ধ ছিল না, পরন্তু যার বহিঃপ্রকাশ আমার চোখেমুখে, প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, আচরণে, ও ভাষায় প্রকট হয়ে উঠেছিল—সে ভাব নিজে কেউ অর্জন করতে পারে না। সে ভাবোদয় সুদুর্লভ এবং সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপা ছাড়া ঐরূপ ভাবোদয় একেবারে অসম্ভব। সুতরাং আমার গুরুদেব অবশ্যই একজন সিদ্ধ সাধক ছিলেন। পরে বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে এর যথাশাস্ত্র সমর্থনও পেয়েছি—তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এক তো "মহৎ কৃপা ছাড়া কোনো কর্মে ভক্তি নয়"-চৈঃ চঃ, তাছাড়া ভাবের উদয় হয় দু'প্রকারে: "সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণ—তদ্ভক্তয়োস্তথাপ্রসাদেন অতিধন্যানাং ভাবো দ্বিধাভিজায়তে। সাধনেন বিনা যত্তু সহসাভিজায়তে, স ভাবঃ কৃষ্ণতদ্ভক্ত প্রসাদেন ইতীর্য্যতে"—ভ. র. সি.-১৩।৪১। বিনা সাধনে আমার অন্তরে যে ভাব-সমুদ্র উথলে উঠেছিল, তা' এই সিদ্ধসাধুকৃপাজাত। তৃতীয়তঃ, তাঁর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করলাম যার কোনো ব্যাখ্যা (সে সময়ে আমার সীমাবদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞান-হেতু) আমি খুঁজে পেলাম না। সেগুলি হচ্ছে এই যে (১) তিনি নিত্য আনন্দময়, (২) তিনি সদাই শিশুর মত সরল ও আত্মভোলা, (৩) তাঁর কণ্ঠস্বর পাঁচ বৎসরের শিশুর মত সুমধুর, সুচিক্কন ও সুধাস্রাবী, (৪) তাঁর দর্শনে সবাই মুগ্ধ হয় এবং নিজ স্বভাব ভুলে তাঁকে ভালবাসে, ইতর প্রাণী থেকে সুরু করে সর্ব্ব শ্রেণীর মানুষ এর মধ্যে পড়ে, (৫) পাঁচবছরের শিশুর মতই সুকুমার ও কমনীয় তাঁর শ্রীঅঙ্গ-সুষমা, (৬) তিনি সকল জীবেরই অন্তরের সংবাদ জানতে পারেন। এগুলি সবই আমি প্রত্যক্ষ করেছি —কিন্তু সিদ্ধ সাধক হলে যে এসব গুণ থাকতেই হবে এমন কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ আমি আমার তখনকার পঠিত শাস্ত্রে পাইনি। তখন আমি অল্প দু'চারখানি গ্রন্থ মাত্র পাঠ করেছি এবং বলা বাহুল্য এসবের সুদৃঢ় প্রমাণ পরে শাস্ত্রে পেয়েছি এবং যথাস্থানে সে সকল প্রমাণ সন্নিবেশিত করাও হয়েছে। তখন আমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি তাঁকে যেটুকু বুঝলাম তা' হল এই যে (১) তিনি একটি অপরিমেয় শক্তির আধার, (২) তিনি একজন সিদ্ধ ভগবৎ-সাধক এবং (৩) তারও অতীত আরও কিছু, যার খবর তখন আমার জ্ঞানের বাইরে।

কাজেই আমি বুঝলাম, গুরুরূপে আমি যাঁকে পেয়েছি, তিনি এই তিন কারণেই আমার কাছে প্রয়োজনীয়। প্রথম শক্তির প্রয়োজন হবে আমার রোগ নিরাময়ের জন্য; দ্বিতীয় গুণে তিনি আমার ধর্ম-গুরু, আমার ভগবৎ-সাধনার যোগ্যতম পথ প্রদর্শক, যে গুণ এযুগে আর কারো মধ্যে দেখতে পাব না। আর তাঁর তৃতীয় গুণগুলি আমার অনুসন্ধানের, আমার গবেষণার বস্তু। আমাকে জানতে হবে, তিনি সত্যই কে। আমাকে চিনতে হবে, বুঝতে হবে তাঁকে। বর্ত্তমানে আমার জরুরী প্রয়োজনে, অর্থাৎ আমার রোগ আরোগ্যের জন্য তাঁর প্রথম শক্তির কাছে আমাকে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকতে হবেই। কিন্তু রোগ নিরাময় হবার পরও, আমার কাছে তাঁর প্রয়োজনীয়তা ফুরাবে না। কারণ তাঁর দ্বিতীয় স্বরূপের যে পরিচয় আমি পেয়েছি ও তাঁর কৃপা-প্রসাদে অপ্রাকৃত ভক্তি ও ভাবরাজ্যের উপলব্ধি লাভ করে ধন্য হয়েছি, শ্রীভগবৎসাধনার একমাত্র সহায়ক ও অবলম্বন সেই সিদ্ধ সাধুমহাপুরুষের সাহচর্য,ও আমি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারি না। কারণ এরূপ মহাপুরুষ সত্যই সুদুর্ল্লভ। তৃতীয়তঃ, তাঁর আরো যে সব অসাধারণ লক্ষণ ও গুণাবলী লক্ষ্য করলাম, সে সবও বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। কারণ, এসব লক্ষণ কোনো মানুষে কোনো প্রকারেই সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং তিনি কে, সাধারণ মানুষের সর্ব্বপ্রকার শক্তি ও গুণাবলীর বহু উর্দ্ধে স্থিত কোন্ অসাধারণ, অকল্পনীয় মহামানব তিনি? এ তত্ত্ব আমাকে জানতেই হবে।

এইবার নবদ্বীপে অবস্থান কালে গুরুদেব সহসা একদিন গুহাভ্যন্তর থেকে বার হয়ে এলেন। হঠাৎ গুরুদেবকে বাইরে আসতে দেখে আমরা সকলেই চমকে উঠলাম। কারণ নবদ্বীপ থেকে স্থানান্তরে না গেলে তিনি গুহার বাইরে আসেন না। মেজদাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, গুরুদেব নবদ্বীপের মধ্যেই একটু বেড়াতে যাচ্ছেন। আমি করযোড়ে নিবেদন করলাম, "আমাকে দয়া করে সঙ্গে নেবেন?" গুরুদেব সম্মতি জানালেন। আমি সানন্দে এক লাফে গাড়ীর উপরে (তখনকার দিনে ঘোড়ার গাড়ী) কোচম্যানের পাশে উঠে বসলাম। পীরতলা পর্য্যন্ত গিয়ে গাড়ী থামল। গুরুদেব গাড়ী থেকে নেমে পীরতলার খালের পুলের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন, আর এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। পুল পার হয়ে ওপার পর্য্যন্ত গেলেন। মেজদা গুরুদেবের প্রায় পাশে পাশে ছিলেন, আমি মেজদার পিছনে ছিলাম। গুরুদেব মেজদাকে উক্তস্থানগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। গুরুদেব ঐ স্থানের এদিক, ওদিক, চারিদিক—বেশ ভাল ক'রে চেয়ে দেখছিলেন উৎসুক ও আগ্রহভরা দৃষ্টিতে। চারশ' বছর আগে এই সকল স্থান মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয় লীলাভূমি ছিল। সেই চারশ' বছরের পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত

স্থানগুলি উৎসুক হয়ে দেখার মত তিনি যেন চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। কী এর তাৎপর্য, কী মনোভাব নিয়ে তিনি হঠাৎ এখানে বেড়াতে এলেন? এখানে আসার তো তাঁর কোনোই প্রয়োজনীতা ছিলনা? তবে? কে এর ব্যাখ্যা করবে?

(তখন আমার তাই মনে হয়েছিল। পরে তাঁর কৃপায় তাঁর তত্ত্ব অবগত হয়ে এখানে তাঁর আসার ও এইভাবে পরিচিত স্থান পর্য্যবেক্ষণের তাৎপর্য্য বুঝতে পেরেছি।)

গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর কাছাকাছি থেকে এইভাবে বেড়াতে যে কী আনন্দ হচ্ছিল! তিনি যে আনন্দময়, তাঁকে ঘিরে যে একটা আনন্দের জ্যোতি বা aura তাঁর চারিদিকে encircle করে রয়েছে, তাঁর কাছাকাছি যে থেকেছে সেই বুঝেছে। তিনি শুধু অসীম শক্তিরই উৎস নন, পরন্তু অফুরন্ত আনন্দেরও আধার—এর একেবারে direct বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি আমি বহুবার।

গুরুদেবের নবদ্বীপ গুহাশ্রম ত্যাগ করার সময় হয়ে এল। বৈদ্যবাটি আশ্রমে দশম দোল উৎসব হবে, সেই উপলক্ষে তিনি ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার (১৩।৩৪) তারিখে নবদ্বীপ থেকে বৈদ্যবাটি যাত্রা করলেন। আমার শরীর তখন অত্যন্ত রুগ্ন; তবু আমি কিছুতেই ছাড়লাম না, গুরুদেবের সঙ্গে আমি যাবই, এই আমার দৃঢ় সঙ্কল্প। মেজদা আমাকে বুঝিয়ে বল্লেন, "সেখানে থাকবার ভাল জায়গা নেই, অসুখ শরীরে তোমার খুব কষ্ট হবে।" তথাপি আমি বল্লাম, "থাকতে না পারি, চলে আসব।" গুরুদেবও সম্মত হলেন না। কাজেই আমি অগত্যা হাওড়ার টিকিট কেটে তাঁর সঙ্গেই, অর্থাৎ ঐ একই ট্রেনের একই কামরায়, কলকাতা যাত্রা করলাম। ট্রেনে একই কামরায় শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে এই আমার জীবনে প্রথম ভ্রমণ। তখনকার দিনে ট্রেনে বিশেষ ভীড় থাকতনা। একটি মাঝারি কামরায় উঠে জানালার ধারের একটি বেঞ্চির শেষপ্রান্তে গুরুদেবের আসন করে দেওয়া হল। মেজদা গুরুদেবের সম্মুখে বসলেন অন্য যাত্রীদের দূরে রাখার জন্য এবং আমিও মেজদার পাশেই বসলাম—একই বেঞ্চিতে আমরা তিনজনে বসলাম। গুরুদেব এই কাছেই তো রয়েছেন—এই আনন্দে কিছুক্ষণ সময় বেশ ভালভাবেই কাটল। তারপর হঠাৎ কী জানি কেন, আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করে উঠল, সমস্ত শরীরটা খুব আনচান করতে লাগল। আমি চমকে উঠলাম, মনে হল এই বুঝি 'Heart-fail' হয়। আকস্মিকভাবে শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠল। কিন্তু গুরুদেব আমার এত কাছে থাকতেও, ট্রেনের জনতার মাঝে তাঁকে সাহস করে কিছু বলতে পারলাম না। এদিকে আমার অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে এগোতে লাগল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে মেজদার কাছে আমার অবস্থার কথা বল্লাম। মেজদাও শুনে চিন্তিত হলেন। মেজদাকে জানালাম, "আমার এ অবস্থায় আমি একা কলকাতা যেতে পারব না।

আপনারা যা'হয় ব্যবস্থা করুন।" মেজদা উত্তরে বল্লেন, "কিন্তু বৈদ্যবাটিতেও তো কোনো সুব্যবস্থা হবে না।" তখন গুরুদেবকে আমার অসহায় অবস্থার কথা নিবেদন করাতে তিনি আমাকে উপস্থিত বৈদ্যবাটিতে নিয়ে যাবারই মত প্রকাশ করলেন। আমার সে কী মর্মন্তুদ অবস্থা! এই যাই, এই যাই ভাব। অথচ স্বয়ং গুরুদেব আমার সম্মুখে উপবিষ্ট। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে তাঁর শ্রীচরণ দুটি দেখতে লাগলাম। প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি মনে হতে লাগল—fatal! এইভাবে সেই মরণাশঙ্কাকুল কাল মুহূর্ত্তগুলি অতিক্রম করে যেন গুরু-চরণ-তরীর সাহায্যে জীবনের পারে এসে উঠলাম। শেওড়াফুলি স্টেশন যখন উপস্থিত হ'ল, এবং গুরুদেব যখন ট্রেন থেকে স্টেশনে নামলেন, তখন আমিও তাঁর পিছু পিছু নামলাম। সংকীর্ত্তনের দলসহ ভক্তগণ স্টেশনে উপস্থিত হয়েছেন, সংকীর্ত্তনসহ গুরুদেবকে নগর পরিভ্রমণ করিয়ে আশ্রমে নিয়ে যেতে। গুরুদেব পুরোভাগে চলেছেন, তাঁর পিছু পিছু সংকীর্ত্তনীয়াগণ; সেই কীর্ত্তনের দলের মধ্যে আমিও মিশে পড়লাম। দলে লোকসংখ্যা প্রচুর; কীর্ত্তনের সঙ্গে আমিও যোগ দিলাম। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যে মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখী হয়েছিল, সেই মৃত্যুপথ-যাত্রী আমি মগ্ন উৎসাহে ও আনন্দে 'ভজ নরহরি প্রাণারাম, জপ নরহরি রাধাশ্যাম' কীর্ত্তন করতে করতে শেওড়াফুলি-বৈদ্যবাটির পথে পথে গুরুদেবের অনুগমন করতে লাগলাম। এক দেড় মাইল পথ অতিক্রম করে বৈদ্যবাটি আশ্রমে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন আশ্রম-প্রাঙ্গণ আমাদের কীর্ত্তনে মুখরিত হয়ে উঠল। সেখানেও প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে নাম-কীর্ত্তন চলল; আমিও সেই আনন্দে মেতে উঠলাম।

নাম-কীর্ত্তন ও প্রণাম সেরে যখন বিশ্রাম করছি, তখন মেজদা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছ?" আমি হেসে বললাম, "ভাল। সে ভাব আর নেই।" মেজদা আমাকে খাবার জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন, যত্ন করে খাওয়ালেন এবং রাত্রে শোবারও ভাল ব্যবস্থা করলেন। সকালে উঠে গুরুদেবের দর্শন পেলাম, হরিলুট মিষ্টান্ন প্রসাদ প্রচুর খেলাম। দুপুরে মেজদা আবার ডেকে খাওয়ালেন। এদিকে শিষ্য ও ভক্তগণের ভীড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। এখানে জায়গা এত অল্প যে গুরুদেবের দর্শনই পাওয়া যায় না। অথচ আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। অবশেষে কোনো এক সুযোগে গুরুদেবের দর্শন পেয়ে তাঁকে আমার কথা নিবেদন করলাম। গুরুদেব শুনে একবার বললেন, "হুঁ। কিন্তু একা যেতে পারবে, বাবা?" ঠিক এই সময়ে কলকাতার অমিয়নাথ মিত্র দাদা নিজ মোটরে কলকাতায় ফিরছিলেন। গুরুদেব তাঁকে বললেন, "বাবা, সুরেনধনকে কলকাতায় পৌঁছে দিতে পারবে?" অমিয়দাদা সানন্দে রাজী হলেন। বিদায় নেবার সময় গুরুদেব আমাকে প্রচুর হরিলুট দিলেন। অমিয়দাদার মোটরে আমি কলকাতার হোষ্টেলে ফিরে এলাম।

হোষ্টেলে ফিরলাম হোষ্টেল থেকে চির-বিদায় নেবার জন্য। কারণ শরীরের যা অবস্থা, তাতে Science College এর তেতালায় উঠে class করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। বিদায় নিলাম আমার প্রিয়তম বন্ধু গৌরের কাছে, বিদায়-প্রণাম জানালাম ওর কাকা কবিরাজ রাম মল্লিক মহাশয়কে। গৌর বেশী কথা বলে না; চুপ করে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ ধ'রে আমার জীর্ণ, শীর্ণ, রোগক্লিষ্ট, ভগ্ন শরীরের দিকে। যাবার সময় বল্লে, "তোমার সম্বন্ধে একটি কথা বলেছেন তোমার Special paper এর Professor Dr. Kar; তুমি কয়েক সপ্তাহ ধরে অনুপস্থিত থাকাতে তিনি ছাত্রদের কাছে তোমার অনুসন্ধান করছিলেন। তুমি বিশেষভাবে পীড়িত এবং তুমি আর class এ join করতে পারবে না শুনে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে সখেদে বলেছেন, 'সে চ'লে গেল, তবে আর কাকে পড়িয়ে এত আনন্দ পাব?' বন্ধু গৌরের মুখে Dr. Kar এর এই উক্তি শুনে আমার দুই চোখ সজল হয়ে উঠল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক আমাকে যে কী স্নেহের চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু আমার সে জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত হয়ে গেছে। চোখ মুছে নীরবে বিদায় নিলাম বন্ধুর কাছে। বিদায় আমার Science College, বিদায় Oxford Mission Hostel, বিদায় বন্ধু গৌর, বিদায় কলকাতা!

নবদ্বীপ ফিরে এসেই শয্যার আশ্রয় নিলাম। গুরুদেবের সঙ্গ-প্রভাবে সাময়িকভাবে যেটুকু সুস্থতা অর্জ্জন করেছিলাম, তাঁর কাছ হতে দূরে স'রে আসায় তাঁর সে শক্তির প্রভাব আর থাকল না। আমার নিদারুণ কর্মের ভয়াল, করাল গ্রাসে আবার আমাকে পড়তে হল। অসুখ আবার পরিপূর্ণ বেগে আমাকে আক্রমণ করল। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে বিছানার সাথে একেবারে মিশে গেলাম। দিনে দিনে, তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম। গুরুদেবের সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ রেখেছিলাম। তিনি একটি পত্রে জানালেন, "তোমার এখনও ভোগ আছে।" অর্থাৎ, অসুখ এখন সারবে না। চারিদিকে হতাশার কালো ছায়া ঘনিয়ে এল। বাড়ীতে সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। এই বুঝি কখন শেষ হয়ে যায়, সকলেরই মনে এই আশঙ্কা। আমি কঙ্কালসার হয়ে পড়ে রইলাম; খাওয়া প্রায় বন্ধ হল; রাতে একটুও ঘুম নেই; সর্বক্ষণ মৃত্যুর বিভীষিকা দেখতে লাগলাম। মৃত্যু এগিয়ে আসছে দুর্নিবার গতিতে—আমি কেঁপে কেঁপে উঠতাম। অবশেষে এক বিনিদ্র রজনীতে তার কালো ছায়া বিস্তার করে সে এল—হ্যাঁ, এল, এবং—। এবং কী হল, তা ব'লে বোঝাতে পারব না। তবে সে গেল; তখনকার মত, সেবারকার মত সে চলে গেল। যা বুঝলাম আমিই বুঝলাম, কাউকে বললাম না। তবে তারপর দিন থেকে একটু একটু করে ভালোর দিকে যেতে লাগলাম, রাতে আবার ঘুম হতে লাগল। মনে হল যেন এবারকার মত কোনোরকমে

মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছি ; এবং তা যে কার জন্য তাও বেশ বুঝতে পারছি। কারণ সমস্ত মনপ্রাণ আমার নিদারুণ আকুলতায় কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে গুরুদেবের চরণে ; ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দিন গুণছি একটি একটি করে কবে তিনি আসবেন, কবে দেখতে পাব সেই রাতুল চরণ-দুটি, কবে নয়ন জুড়াব তার ভুবন-মোহন-মূর্ত্তি দর্শনে, কবে প্রাণ শীতল হবে তাঁর মধু-ঢালা কণ্ঠ-ধ্বনিতে। এইভাবে আকুল হয়ে তাঁর প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে কাটাতে অবশেষে একদিন শুভ সংবাদ পেলাম—গুরুদেব আসছেন। তিনি নবদ্বীপে পৌছাচ্ছেন আগামী সন ১৩৪১ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার রাত্রি প্রায় দশটায়। গুরুদেব আসছেন, গুরুদেব আসছেন—এই আনন্দবারতা শোনা যায় আমার মৃতপ্রায় দেহের শিরায় শিরায় যেন নবজীবন জেগে উঠল। মেজদা তখন প্রায়ই আমাকে দেখতে আসতেন। গুরুদেব আসছেন—এ সংবাদ তাঁর কাছেই পেলাম। ওঁরা সবাই স্টেশনে যাবেন গুরুদেবকে অভ্যর্থনা জানাতে। ব্যাকুল আগ্রহে আমি বললাম, "আমিও যাব, মেজদা।" মেজদা বাধা দিয়ে বললেন, "না, না—তোমার এই রুগ্ন অবস্থায়—না, সেটা উচিত হবে না। তুমি তো বিনা সাহায্যে বিছানা থেকে উঠে বসতেই পার না। এই এতদূর রাস্তা—কেমন করে হেঁটে যাবে?" আমি অধীর আগ্রহে মেজদার হাত ধ'রে কাকুতি করে বললাম, "বাধা দেবেন না, মেজদা ; আমি যেতে পারব, নিশ্চয়ই যেতে পারব। গুরুদেব আসছেন এতদিন পরে, আর তাঁকে আনতে আমি স্টেশনে যাব না ; যাঁর আশায় একটি একটি করে দিন গুণছি? নিশ্চয়ই যেতে পারব আমি। আপনি দয়া করে স্টেশনে যাবার আগে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন।"

মেজদা যথা সময়েই আমাকে ডাকলেন। আমি বেরিয়ে পড়লাম। গুরুদেব আসছেন! —ষ্টেশনে যেতে সে কী আগ্রহ, সে কী উৎসাহ! প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছি অধীর আগ্রহে ; ঠিক সময়ে ট্রেন এসে পৌছাল। একটু অনুসন্ধান করতেই গুরুদেবকে দেখতে পেলাম আমরা। তাঁর দর্শনে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ লাগল আমার সমস্ত শরীরে ও মনে। প্ল্যাটফর্মে আমরা সকলেই একে একে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম গুরুদেবকে। তারপর মালপত্র নামিয়ে গোছগাছ করে নেওয়া হল। মালপত্র ছিল প্রচুর, তার মধ্যে কয়েকটি অতি বৃহৎ গয়ার তরমুজও ছিল। গুরুদেবের সঙ্গে ছিলেন বঙ্কিমদাদা। মালপত্র গুছিয়ে কুলির মাথায় চাপিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে পাঠানো হল। গুরুদেবের পাশে পাশে মেজদা ও আমি চললাম। ওভারব্রিজ পেরিয়ে যখন গেটের কাছাকাছি এসেছি, তখন আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হল। গুরুদেব দয়া করে একবার আমার দিকে চাইলেন, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। কুশলবার্তা জানতে চাইলেন আমার ভগিনী—তাঁর কমলামায়ের। বললাম, "ভালই

আছে সে।" বাইরে এসে তিনখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হল। আমি শেষের গাড়ীর উপর কোচম্যানের পাশে বসলাম। গাড়ীগুলি ছুটতে লাগল। ব্যান্ডরা-পাড়ায় বকুলতলার কাছে এসে হঠাৎ একটা ভারী জিনিষ প'ড়ে যাওয়ার শব্দে আমি চমকে উঠলাম এবং চীৎকার করে সামনের গাড়ীকে থামতে বললাম। গাড়ীগুলি থেমে গেল। নেমে গিয়ে দেখলাম—একটি বৃহৎ তরমুজ গাড়ীর ছাদ থেকে মাটিতে পড়ে ফেটে গেছে। সেটি তখন কুড়িয়ে আবার গাড়ীর ভিতরে তোলা হল। যথাসময়ে গাড়ীগুলি আশ্রমে এসে পৌছাল। গুরুদেব নেমে গেলেন। মালপত্রগুলি পরে একে একে আশ্রমের ভিতরে নিয়ে আসা হল। অনেকক্ষণ পর গুরুদেবের দর্শন পেলাম। গুরুদেবের সাধের খেলা করার একটি তরমুজ পড়ে ফেটে যাওয়ায় তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। এদিকে তাঁর সঙ্গে এতগুলি লোক থাকলেও, আমিই যে ওটির পতন সংবাদ শুনে সকলকে সচকিত করে দিয়েছিলাম, যার জন্য রাস্তা থেকে ওটিকে কুড়িয়ে আনাও সম্ভব হয়েছিল, তাতে গুরুদেব আমার প্রতি অন্তরে অন্তরে প্রসন্ন হয়েছিলেন। সে-প্রসন্নতা তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, যখন গুরুদেব স্বয়ং দুইহাতে সেই অতি বৃহৎ তরমুজের প্রায় আধখানা নিয়ে এসে আমাকে দিলেন এবং বললেন, "কমলা-মাকে ও বাড়ীর অন্যান্য সকলকে দিও। এ প্রসিদ্ধ গয়ার তরমুজ, এদিকে পাওয়া যায় না।"

গুরুদেব পরে বলেছিলেন, গুরুর সঙ্গে ভ্রমণ করতে হলে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রতিপদে গুরুর পরীক্ষা আছে। নিজের আরাম বা সুখ দেখলে চলবে না; গুরু ও গুরুর জিনিষপত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

পরের দিন যথাসময়ে আশ্রমে এসে পৌছলাম। গুরুদেবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃতপ্রায় দেহে মনে জীবন জেগে উঠেছিল; রোগযন্ত্রণা, অসহায়তা, হতাশা ও মৃত্যুর কালো ছায়া ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছিল। তাঁকে আর কিছুতেই চোখের আড়াল করব না—এই দৃঢ়সঙ্কল্প মনে মনে গ্রহণ করলাম। কিন্তু শুনলাম, তিনি শীঘ্রই নিঃশঙ্ক-আশ্রমে যাত্রা করছেন। মেজদাকে বললাম, "আমিও যাব।" মেজদা উত্তরে বললেন, "তোমার এই শরীর নিয়ে যাবে? সেটা কি যুক্তিযুক্ত হবে? সেখানে তো home comforts পাবে না, পাবে না কোনো individual care বা attention; অথচ তুমি এখনো সুস্থ হয়ে উঠতে পারনি, এখনো তুমি একজন প্রায় bed ridden patient." আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম, "তা' হোক, মেজদা; আমি যাবই। মরি মরব, তাঁর চরণেই মরব।" আমার এই দৃঢ়সঙ্কল্প ও আকুল আকাঙ্ক্ষাকে কেউই বাধা দিতে পারল না। এইরূপ অটুট বিশ্বাস নিয়ে ৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে যাত্রা করে নিঃশঙ্ক বটতলায় পৌছলাম।

চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটি বটগাছ। সেই বটতলায় গুরুদেবের একটি ছোট্ট মন্দির বা আসনঘর। সেই মন্দিরের সমুখের দাওয়ায় আমাদের আশ্রয়। পরিবেশটি মনোরম; চারিদিক খোলা, হু হু ক'রে হাওয়া দিচ্ছে। জ্যৈষ্ঠের দারুণ গ্রীষ্মেও ওখানে কিছুমাত্র গরম অনুভব হয় না। তাছাড়া প্রায় সর্ব্বদাই গুরুদেবের কাছে কাছে আছি। সব মিলিয়ে দেহেমনে যেন আবার নতুন আশার আলো ফুটে উঠছে। দিবারাত্র সর্ব্বক্ষণই গুরুদেবের কাছে আসছেন নানা শ্রেণীর ভক্ত ও শিষ্যগণ। মধুর হরিধ্বনি ক'রে গুরুদেব সকলকেই রাশি রাশি মিষ্টান্ন বিতরণ করছেন। আসছেন কীর্ত্তনীয়াগণ; গুরুদেবের কাছে নাম ধ'রে অদূরে ঠাকুরবাড়ীতে নামগান করতে যাচ্ছেন। আসছে সাঁওতালী ভক্তেরা, মাদল ও বাঁশী বাজিয়ে গান করছে, হরিবোল বলছে ও গুরুদেবের প্রদত্ত প্রচুর মিষ্টান্ন নিয়ে খুশী হয়ে বাড়ী যাচ্ছে। আসছে কুকুরের দল; গ্রামের যত কুকুর, গুরুদেব এলেই, বটতলায় এসে সমাগত হয়। গুরুদেব তাদের যত্ন ক'রে খাওয়াচ্ছেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। একদিন দেখি, একটি কুকুর গুরুদেবের একেবারে দুয়ারের কাছে বসে বসে হাঁপাচ্ছে। বেচারা অসুস্থ, সমস্ত চোখ দুটি পিচুটিতে ভ'রে গেছে, ভাল ক'রে চাইতেও পারছে না, খেতেও পারছে না। বেচারা কুকুর! তার দিকে কেউই চাইছে না। হঠাৎ গুরুদেবের নজর পড়ল সেইদিকে। নিমেষের মধ্যে তিনি ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন; কুকুরটির গলা ধ'রে নিজে ডান হাতে অতি যত্ন ক'রে তার চোখের সব পিচুটি পরিষ্কার ক'রে দিলেন; তারপর তাকে খেতে দিলেন। গুরুদেবের এই আচরণ দেখে আমি তো হতবাক। একটা ঘৃণিত কুকুর, তাও রোগগ্রস্ত—ওর কেউ নেই, ওর এই অসময়ে ওকে দেখবার কেউ নেই; ওর চোখ দুটি বুঁজে গিয়েছিল পিচুটিতে, কিন্তু কে মুছিয়ে দেবে ওর চোখের সেই ময়লা? ভগবান ছাড়া ওর কেউ নেই, কেউ ওর দিকে তাকায়নি, তাকাতোও না। কিন্তু আজ ওর সাক্ষাতে যিনি উপস্থিত হলেন, তিনি কে? কেন তিনি এই ঘৃণিত, রোগগ্রস্ত কুকুরটিকে নির্বিকার চিত্তে এমন আপন ক'রে নিলেন?

নানা শ্রেণীর ভক্ত ও শিষ্যগণকে আসতে দেখতাম,—কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই কেউ বা কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যাধি-নিরাময়ের জন্য, কেউ মামলায় শুভ ফললাভের আশায়, কেউ বা পুত্র-কামনায়, কেউ বা পরীক্ষাপাশের জন্য, আবার কেউ, আর কিছু না হোক, দুটি খাবার জন্য আসত। যাই হোক, বুঝলাম এঁরা সকলেই 'আর্ত্ত' হয়ে আমাদের গুরুদেবের কাছে এসেছেন; অর্থাৎ অন্য কোথাও ফল না পেয়ে আমাদের গুরুদেবের দৈবী বা অলৌকিকী শক্তির কাছে ধর্ণা দিয়েছেন। এঁরা সকলেই মোটামুটি আমারই শ্রেণীর, কেউই 'জিজ্ঞাসু', 'অর্থার্থী', বা 'জ্ঞানী' নন। সকলেই তাঁর অলৌকিকী শক্তিতে বিশ্বাসী, তাঁর 'অন্ত' বা 'প্রকৃত' স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু নন। গুরুদেবের

এই 'প্রকৃত' স্বরূপ বিষয়ে আমার ঔৎসুক্য জেগেছে মাত্র, তবে জানতে কিছুই এখনো পারিনি। তাঁর দ্বিতীয় সত্তা, অর্থাৎ একজন সিদ্ধসাধকরূপে তাঁর আচরণও আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হ'ত। অপর শিষ্য ও ভক্তগণ এ বিষয়ে আদৌ উৎসুক ছিলেন কিনা, তা' জানি না। যদিও নিদারুণ রোগযন্ত্রণাই আমার চিন্তার অধিক অংশই অধিকার ক'রে ছিল, তথাপি তাঁর অদ্ভুত আচরণগুলি আমার মনের চোখ এড়িয়ে যেত না। একজন বিজ্ঞানের ছাত্রের মস্তিষ্কে সেগুলি জমা হয়ে থাকত, ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য।

একদিন ভক্তগণের সাথে গুরুদেব যখন শ্রীহরিবাসরে আগমন করলেন, তখন আমিও তাঁর পিছু পিছু গেলাম। গুরুদেবের কণ্ঠ ও মস্তক ভক্তগণ বিবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে দিয়েছিলেন; সেই অপরূপ সাজে তিনি এসে দাঁড়ালেন শ্রীহরিনাম-কুঞ্জে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তির সম্মুখে। মহাপ্রভুর গলায় কোনো ফুলের মালা ছিল না। মহাপ্রভুর দিকে একবার তাকিয়েই গুরুদেব নিজকণ্ঠ হতে মালাগুলি খুলে মহাপ্রভুর কণ্ঠে ও মস্তকে পরিয়ে দিলেন। শ্রীমূর্ত্তির চারদিকে কীর্ত্তনীয়া-সম্প্রদায় নাম কীর্ত্তন করছিল,—গুরুদেব স্বয়ং সেই কীর্ত্তনে যোগ দিলেন, 'রাধাগোবিন্দ, রাধাগোবিন্দ, রাধা—'। গুরুদেবের সুধামধুর কণ্ঠস্বর আর সকল কণ্ঠকে ছাপিয়ে যেন 'রাধাগোবিন্দ' নামের অমৃত প্লাবন বহিয়ে দিল। ভক্তগণ সবাই যেন নামের প্লাবনে ভাসতে লাগল। এ যেন সত্যই এক অপ্রাকৃত পরিবেশ। মুখের কথায় বা লেখায় কিছুতেই তাকে প্রকাশ করা যাবে না। যে-কীর্ত্তনে স্বয়ং গুরুদেব যোগ দিয়েছেন, তা' সত্যই অপ্রাকৃত আনন্দময়। গুরুদেব-বিহীন অন্য কীর্ত্তনে সে-আনন্দের অভাব আমি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। যতবড় কীর্ত্তনীয়াই হোন্ না কেন, যত বিখ্যাত ওস্তাদী গাইয়ে বা তথাকথিত 'মধু-কণ্ঠ' বা 'কোকিলকণ্ঠ' হোন না কেন, গুরুদেবের কণ্ঠ যিনি একবার শুনেছেন, তিনি বলতে বাধ্য হবেন যে এ সুধাধারা আর কোথাও নেই, এমন কি এর ধারে কাছেও কেউ পৌছাতে পারবে না। গাইয়েরা নিজেরাই একথা বহু বার মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। সঙ্গীতবিদ্‌গণ প্রাকৃত রাজ্যের লোক; প্রাকৃত দেহে, প্রাকৃত পরিবেশেই তাঁরা কণ্ঠ সেধেছেন; অপ্রাকৃত সিদ্ধ মহাপুরুষের সাধনসিদ্ধ অপ্রাকৃত আনন্দঘনরস-মিশ্রিত সুধাস্বর তাঁরা কোথায় পাবেন? কিন্তু এ প্রসঙ্গে গুরুদেবের একটি আচরণ তখন আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল—তিনি নিজ-কণ্ঠের মালা, অর্থাৎ নিজঅঙ্গে পরিহিত বা প্রসাদী মালা মহাপ্রভু বা ভগবানের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন কেন? ব্যাপারটি ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য আমার মস্তিষ্কে সঞ্চিত রইল।

এই নিঃশঙ্ক আশ্রমে ভক্তগণ গুরুদেবকে নিয়ে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন। এ ঘটনাটি আমি মেজদা, মাষ্টারদা (কলকাতার স্কুলের হেড্-পণ্ডিত

অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ বহু শিক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য শিষ্যের মুখে শুনেছি। বটতলা থেকে ঠাকুর বাড়ী আসতে হয় একটি মাঠ, তারপর নীচুজায়গা ও দুইপাশে ছোট ডোবার মধ্যবর্ত্তী সরুগলি দিয়ে। বৃষ্টি হ'লে দুই ডোবার মধ্যেকার সরু রাস্তাটি অত্যন্ত পিচ্ছিল ও কর্দ্দমাক্ত হয়ে যায়। রাস্তার এরূপ অবস্থা হলে সাধারণতঃ ভক্তগণ গুরুদেবকে হাঁটতে দেন না। দুইপাশে দুইজনে চারহাতে 'চেয়ার-কোলে' করে তাঁকে সেই রাস্তা পার করান। মনে রাখতে হবে রাস্তাটি অতিশয় পিচ্ছিল ও সরু; একবার পা পিছলালে দু'পাশের যে কোনো একটি ডোবায় গিয়ে পড়তে হবে। ভক্তরা অতি সন্তর্পণে গুরুদেবকে নিয়ে আসছেন। রাস্তার যে অংশ বেশ ভাল, সেখানে গুরুদেবকে এত হাল্কা লাগছে যে ভক্তদের মনে হচ্ছে তাঁদের হাতের উপর কোনো ভারই নেই, তাঁরা একরকম ছুটে ছুটে আসছেন গুরুদেবকে নিয়ে; কিন্তু যেই তাঁরা খারাপ রাস্তার কাছাকাছি হচ্ছেন, অমনি গুরুদেব এত ভারী হচ্ছেন যে ভক্তদের হাত প্রায় শিথিল হয়ে আসার উপক্রম হচ্ছে, এই বুঝি গুরুদেব প'ড়ে যান, হাত বেঁকে যাচ্ছে, পা পিছলে পড়ছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, ভক্তরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন, কেমন ক'রে রাস্তাটা পার হওয়া যায়? গুরুদেবকেই একমনে ডাকছেন তাঁরা, হঠাৎ গুরুদেব হাল্কা হয়ে গেলেন, ভক্তরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, আবার তাঁকে নিয়ে কিছুক্ষণ ছুটে ছুটে চল্লেন। আবার কিছুক্ষণ পরেই সেইরূপ অত্যধিক ভারী—এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে অতি ভারী ও অতি হাল্কার ভেল্কি দেখিয়ে গুরুদেব ঠাকুরবাড়ীতে এসে ভক্তদের 'চেয়ার-কোল' হতে অবতরণ করলেন। ভক্তগণ আমাকে বলেছেন, এর কোনো ব্যাখ্যা তাঁরা খুঁজে পাননি—কারণ একই মানুষ মিনিটে মিনিটে অতিভারী ও অতি হাল্কা হতে পারে না।

এরূপ ঘটনা অন্যত্রআশ্রমেও সংঘটিত হ'য়েছে। গুরুদেব কৃপা ক'রে বাৎসল্যভাবে সেবিত কোনো ভক্তের,যিনি গুরুদেবকে কোলে ধারণ করতে অসমর্থ,—কোলে উঠেছেন এবং সেই ভক্ত অবলীলাক্রমে তাঁকে কোলে করেছেন। অথচ সেই ভক্তের দেখাদেখি অপর কোনো সমর্থ ও বলবান্ ভক্ত গুরুদেবকে কোলে করতে ইচ্ছাপ্রকাশ ক'রে তাঁর ভার বহনে অসমর্থ হয়েছেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্তও রয়েছে।

এদিকে আমার অবস্থা তখনও অত্যন্ত কাহিল। জলে ডুবছে এমন ব্যক্তির মত আমি তখন গুরু-চরণ-তরণীকে মনে-প্রাণে আঁকড়ে ধ'রে আছি। অতিশয় ক্ষুধিতের মতই আমার দুটি আকুল আঁখি গুরুদেবকে প্রাণভ'রে দর্শন করত। গুরুদেবের মুখের দিকে চাইলেই আমি যেন রাধা-গোবিন্দকে দেখতে পেতাম। যে-রাধাগোবিন্দ এই নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিয়ন্তা, সেই শ্রীযুগলমূর্ত্তি আমি গুরুদেবের শ্রীমুখে যেন প্রত্যক্ষ বিরাজিত দেখতে পেতাম। মৃত্যুপথযাত্রী আমার তখন মনে হত, যম যাঁর ভৃত্যের ভৃত্য, সেই শ্রীরাধাগোবিন্দ আমার সাক্ষাতে থাকতে, যমের সাধ্য নেই আমাকে

স্পর্শ করবার। এই মনোবলে বলীয়ান হয়ে আমার প্রাণে এল পরম শান্তি। সর্ব্বদাই গুরুদেবের অতি কাছে কাছে থাকতাম। নবদ্বীপ থাকতে আমার দার্জ্জিলিঙ-এ change এ যাবার প্রস্তাব হয়েছিল, গুরুদেবকে তখন সেকথা জানিয়েছিলাম ও। বটতলায় আসার পর গুরুদেব একদিন আমাকে বল্লেন, "বটতলার কী শোভা দেখেছ? দার্জ্জিলিঙের স্বাস্থ্য কি এর চেয়ে ভাল?" তারপর হঠাৎ একটু বিমনা হয়ে বল্লেন, "তোমায় বাঁচাতে পারি, তবে তো!" এরপর একদিন, তখন কেউ ছিল না, গুরুদেব হঠাৎ আমার কাছে এসে বল্লেন, "তুমি যে গুরুর কত প্রিয়,—তা' তুমি জাননা, জাননা, জাননা।"

প্রাণে পরিপূর্ণ শান্তি, মনে অপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তি নিয়ে ২০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে নবদ্বীপ ফিরলাম। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে ফিরে আমার ভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। চমৎকৃত হ'লেন আমার বাড়ীর লোক ও আত্মীয়স্বজনেরাও। একী দৈন্য, একী ভক্তিভাব! অথচ কেউ তো আমাকে শেখায়নি এসব আচার আচরণের বিষয়। তবে আমার আচরণে এমন পরম দীনতা, বাক্যে এমন নম্রতা, এমন মিষ্ট মধুর ভাব কোথা থেকে এল? অবাক হই আমি নিজে, অবাক হয় বাইরে যারা আমাকে দেখে। তখন কি জানতাম যে একমাত্র "সাধুপ্রসাদেন অতিধন্যানাং ভাবোঽভিজায়তে"—আমার সিদ্ধসাধুগুরু-প্রসাদেই এ জীবন 'অতিধন্য' হল আমার।

গুরুদেব ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার নবদ্বীপ গুহাশ্রমে শুভাগমন করলেন। আমি আশ্রমে এসে নতুন উদ্যমে গুরুদেবের কাজে নিজেকে নিয়োগ করলাম। প্রাণে প্রবল ভরসা যে অন্ততঃ আগামী দু'তিনমাস গুরুদেবের কাছ ছাড়া হব না। গুরুদেবের আশ্রমে বহু কাজ—তার মধ্যে গুরুদেব বেছে বেছে প্রধানতঃ যে কাজের ভার এখন দিলেন আমাকে, তা হচ্ছে তাঁর শিষ্যদের পত্র পড়িয়ে তাঁকে শোনানো ও তাদের উত্তর লেখা। প্রথমে মেজদার সহকারীরূপে তাঁর কাছ থেকে গুরুদেবের চিঠি লেখার রীতি ও শিষ্যদের মোটামুটি পরিচিতি জেনে নিলাম। তারপর থেকে চিঠিলেখার কাজ খুব সহজ হয়ে এল আমার কাছে। চিঠি লিখতে একটা অসুবিধার দিকে নজর পড়ল আমার—তা হল শিষ্যদের ঠিকানা। সারা বাংলা ও বাংলার বাইরে বহুস্থানে গুরুদেবের শিষ্যরা রয়েছেন। তাঁদের সকলের ঠিকানা কোনো শিষ্যই ঠিকমত জানত না; এমন কি মেজদাও না। কিন্তু গুরুদেবের কী অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি! জিজ্ঞাসা করামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ঠিকানা ব'লে দিতেন। যদিও গুরুদেবের আদেশ ছিল যে প্রত্যেক শিষ্যকেই গুরুর কাছে ঠিকানা লেখা রিপ্লাইকার্ড বা খাম দিতে হবে, তথাপি সে আদেশ অনুযায়ী সকলে কাজ করত না। তা' ছাড়া সময় সময় গুরুদেবের তরফ থেকে কোনো কোনো

শিষ্যকে চিঠি লেখা দরকার হ'ত, এবং সেক্ষেত্রে তার ঠিকানা আমাদেরই লিখতে হ'ত; তার জন্য গুরুদেবের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। এই সকল অসুবিধার জন্য আমি প্রস্তাব করলাম গুরুদেবের কাছে যে শিষ্যদের বর্ণানুক্রমিক নাম ও তৎসহ ঠিকানা খাতায় লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা হোক। আমার প্রস্তাব গুরুদেব সানন্দে সমর্থন করলেন। তখন আমি alphabetical order এ ইংরাজী ও বাংলায় দুটি ঠিকানার খাতা প্রস্তুত ক'রে ফেল্লাম। গুরুদেব সে খাতা দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং বারবার মেজদাকে বল্লেন, "বাবা, সুরেনধন, কেমন খাতা করেছে দেখেছ?" মেজদা হেসে বল্লেন, "হ্যাঁ, এর অভাবে এতদিন আমাদের বড় অসুবিধা হচ্ছিল। এবার থেকে আমাদের এটা ঠিক অফিসের মত হল।" গুরুদেব আমাকে আদেশ করলেন, "ঠিকানার খাতা তোমার জিম্মায় রাখবে, বাবা; এখাতা যেন আর কেউ না নেয়।" আমিও গুরুদেবের আদেশ-মত খাতা দুটি যত্ন ক'রে আলমারীতে রেখে দিলাম। মেজদা ও আমি ছাড়া এই ঠিকানার খাতাতে আর কেউ হাত দিত না।

নতুন উদ্যমে তখন কাজ করছি। চিঠি পত্র গুছিয়ে রেখে দিই, যেগুলির উত্তর দেওয়া হল সেগুলি আলাদা ক'রে ফেলি। যে সব চিঠির উত্তর এখনো দেওয়া সম্ভব হলনা এবং যেগুলির উত্তরের জন্য গুরুদেবের সাক্ষাৎ নির্দেশ জানা প্রয়োজন, সেগুলি পৃথক করা থাকে। কতকগুলি এমন চিঠি থাকে যেগুলির উত্তর গুরুদেব স্বহস্তে না লিখলে চলবে না—সেগুলি গুরুদেবকে দিয়ে দিই এবং তাদের উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিই। এইভাবে গুরুদেবের চিঠিপত্রাদি বা Correspondence বিভাগটি এতদিন পরে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে লাগল। গুরুদেব এ বিষয়টি সকল শিষ্যকেই জোর দিয়ে বুঝিয়ে বলতেন। শিষ্যরা তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁদের বলতেন, "বাবা, আমার সুরেনধন না থাকলে তোমরা ঠিক সময় মত চিঠি পেতেনা।" যারা আমার পরিচিত নয় তাদের নিয়ে গুরুদেব প্রায়ই একটি মজার খেলা খেলতেন। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলতেন, "আচ্ছা, বলতো, বাবা, এ ছেলেটি কতদূর লেখাপড়া করেছে?" তারা আমাকে কোনোদিন দেখেনি, সুতরাং বলত, "কীজানি, কেমন করে বলব?" গুরুদেব তবু রহস্য ক'রে বলতেন, "তবু কী মনে হয় তোমার, তাই বলনা?" তারা আমার দীন, হীন, মলিন ও রুগ্ন বেশ দেখে তাচ্ছিল্যভরে আমৃতা আমৃতা করে বলত, "এই হয়তো স্কুলে ক্লাস···।" ওদের কথা শুনে গুরুদেব হেসে গড়িয়ে পড়তেন, তারপর উজ্জ্বল চোখে উচ্ছ্বাসভরে যা' বলতেন তা' আমার নিজের মুখে বলা শোভা পাবে না। কেন জানিনা, তিনি প্রায়ই এই দীন সন্তানকে কেন্দ্র ক'রে আমার অপরিচিত শিষ্যদের কাছে এই খেলাটি খেলতে খুব ভাল বাসতেন।

আমি দিনে দিনে বুঝতে পারলাম, গুরুদেব আমাকে যেন কাছে, আরো কাছে টানছেন। এক একদিন আশ্রমে আসতে আমার একটু বেলা হয়ে যেত। গুরুদেব সেটা লক্ষ্য করে বল্লেন, "বাবা, এত দেরী কর কেন আসতে? তোমার এই পাগল ছেলের জন্য মন কেমন করে না?" আমি করযোড়ে বল্লাম, "আজ্ঞে, বাড়ীতে একটু আধটু পড়াশুনা করি।" গুরুদেব আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কী পড়াশুনা কর, বাবা?" আমি সবিনয়ে জানালাম, "এই আমার পড়ার বই, M. Sc-র কিছু বই···।" গুরুদেব মুখটি নীচু ক'রে একবার বল্লেন, "হুঁ। আচ্ছা, বাবা, এখানে এসে পড়লে হয় না, এই আমাদের বৈঠকখানায়?" আমি উত্তরে বল্লাম, "যে আজ্ঞে, তাই পড়ব।" পরদিন বইখাতা নিয়ে সকাল সকাল আশ্রমে এলাম এবং বৈঠকখানায় বসে পড়াশুনা করতে লাগলাম। যথাসময়ে গুরুদেব মন্দির-দ্বার খুললেন এবং সর্ব্বপ্রথম আমাকেই আহ্বান-করলেন, "সুরেন ধন!" আমি তাড়াতাড়ি বই বন্ধ ক'রে ছুটে তাঁর শ্রীচরণ-সমীপে গেলাম এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে করযোড়ে দাঁড়ালাম। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কতক্ষণ এসেছ, বাবা?" আমি বল্লাম, "আজ্ঞে, অনেকক্ষণ।" গুরুদেব বল্লেন, "এতক্ষণ কী করছিলে?" আমি করযোড়ে বল্লাম, "আজ্ঞে, আমার কলেজের পড়ার বই পড়ছিলাম।" মুহূর্ত্তে গুরুদেবের মুখমণ্ডল ভিন্নরূপ ধারণ করল; তীব্রভাষায় আমাকে ভর্ৎসনা ক'রে বল্লেন, "কলেজের বই পড়বার জন্যই কি তোমাকে জীবন দিয়েছিলাম? তুমি কি জাননা, তোমার ধ্রুব মৃত্যুযোগ ছিল, মৃত্যু তোমার কাছে একদিন এসেছিল, তা কি বুঝতে পারনি?" আমি কম্পিতকণ্ঠে সাশ্রুনয়নে বল্লাম, "আজ্ঞে, তা বুঝেছিলাম; এবং আপনার কৃপাতেই—।" গুরুদেব বল্লেন, "এতদিন কোথায় থাকতে তা ভেবে দেখেছ? তুমি পুনর্জন্ম পেয়েছ; পুরাতন জীবনের কথা ভুলে যাও। গুরুদেব যে নবজন্ম দান করেছেন, একমাত্র তাঁর সেবাতেই তা' নিয়োগ করবে। অনিত্য সংসারে সে জীবন আর কিছুতেই নিযুক্ত করতে পারবে না। তুমি এখন থেকে গুরুর দাস হলে, তোমার স্বাধীন সত্তা আর কিছু রইল না। গুরু যা বলবেন, তাই করবে।" সাশ্রুনয়নে করযোড়ে বল্লাম। "যে আজ্ঞে, তাই করব। পড়াশুনা ছেড়ে দেব।" গুরুদেব এবার মধুর কণ্ঠে বল্লেন, "পড়বে বই কি, তবে কলেজের বই নয়; আমাদের ধর্মগ্রন্থ পড়বে। এবার থেকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করবে; শুধু পাঠ নয়। এমন ক'রে পড়বে যাতে সব মুখস্থ হয়ে যায়।"

তখন জানতাম না যে গীতায় শ্রীভগবৎ-কথিত তাঁর চতুর্বিধ ভজনাকারীর মধ্যে আমি নিজে প্রথমবিধ, অর্থাৎ 'আর্ত্ত' হয়ে নিজের রোগমুক্তির জন্যই তাঁর শ্রীচরণে এসেছিলাম বটে, তথাপি "তত্র গীতাদিযুক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাম্ মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপাস্যাত্তৎপ্রিয়স্ত বা, সক্ষীণতদ্ভাবঃ স্যাচ্ছুদ্ধভক্ত্যধিকারবান্—" ভ. র. সি.-১।২।১২;

অর্থাৎ গীতায় উক্ত চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে যার প্রতি ভগবান্ বা তাঁর প্রিয়ভক্তের কৃপা হয়, সে উক্ত চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বভাব ত্যাগ ক'রে শুদ্ধ ভক্তরূপে পরিণত হয়।

গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে তার পর দিন থেকেই বিশদভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়তে লাগলাম। আমরা, বৈজ্ঞানিকরা, যা পড়ি, তার প্রত্যেকটি অক্ষরের তাৎপর্য্য সবিশেষ বুঝেই পড়ি। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রত্যেকটি লাইন ও প্রত্যেকটি শ্লোকের যতরূপ টীকা-টিপ্পনি আছে, সব পড়ে নিঃশেষ ক'রে ফেললাম। শ্রীগুরুদেবের সামনে বসে খাতায় লিখে লিখে বইটি পড়তাম। বইটি সাধারণভাবে দুরূহ বটে, তবে যাঁরা অতি দুর্ব্বোধ্য বৈজ্ঞানিক ইকুয়েশন্স্ সমূহের জটিল জালে বিহরণ করেছেন, তাঁদের কাছে একে 'দুরূহ' বলে আদৌ বোধ হবে না। বলা বাহুল্য, অতি অল্পদিনের মধ্যেই বইটি আগাগোড়া শেষ করলাম। গুরুদেব তো মহাখুসী। তিনি মাঝে মাঝে শিক্ষকের মত আমাকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠ ধরতেন। সব জায়গাতেই যে যথাযথ উত্তর দিতে পারতাম, তা নয়। শ্রীরাধারাণীর রূপ বর্ণনার একস্থানে গুরুদেব হঠাৎ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, যাতে কয়েকটি লাইনের পারস্পরিক ক্রমবিন্যাস ঠিক ক'রে বলতে হবে। সেখানে দুটি লাইন প্রায় একই রকম, তাই এদের ক্রমবিন্যাসে আমার ভুল হয়েছিল। গুরুদেব এতে আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন। একদিন "গোপ্যস্তপঃ কিমচরণ্" শ্লোকে গোপীদের এই বিশেষ তপস্যার বিবরণ জানতে চেয়েছিলাম ; তাতে তিনি আমাকে তীব্র তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন, "তুমি কী জানবে এই সুদুর্লভ তপশ্চর্য্যার কথা ? দেব-মুনিঋষি স্বয়ং ব্রহ্মাও যা' অবগত নন, তা তুমি কেমন ক'রে জানবে ? কী তপস্যা, কী ত্যাগ, কী সাধন তোমার বা অন্যান্য শিষ্যগণের আছে যে এই বিরিঞ্চিবাঞ্ছিতধন, এই দুরাপ, এই অনন্ত-সিদ্ধ গোবিন্দ-রূপ দর্শন করবে ?"

তীব্র ভর্ৎসনার পর আমাকে ম্রিয়মাণ দেখে আবার আদর ক'রে বল্লেন, "মানুষে কি এ তপস্যা কেউ করতে পারে, বাবা ? গুরু-কৃপা হলে তবে এর আভাসমাত্র কিছু কিছু চিত্তাকাশে উদিত হয়। এখন গুরুবাক্য শিরোধার্য্য ক'রে গুরুর আদেশ পালন ক'রে যাও। পড়, বাবা, পড়।"

পড়েছি। তাঁর নির্দ্দেশে এরপর একে একে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ ও বৈষ্ণব স্মৃতি, দর্শন ইত্যাদি সমুদয় গ্রন্থই তাঁরই শ্রীচরণতলে অধ্যয়ন করেছি। মুদ্রিত প্রায় সব বৈষ্ণব গ্রন্থই সংগ্রহ করেছিলাম এবং সে সবই সেই মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের শ্রীচরণ-সমীপে বিশদভাবে পাঠ করেছি। নবদ্বীপস্থ সুবৃহৎ লাইব্রেরীর সব বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রেরও তাঁর নির্দ্দেশে তাঁর কাছে পাঠগ্রহণ করেছি। ঐ লাইব্রেরীতে যেসব প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পুস্তকের অভাব ছিল সে সব পুস্তক আমারই প্রচেষ্টায় লাইব্রেরীতে সংগৃহীত

হয়। আমি নিজে কলকাতা থেকে সে সব পুস্তক কিনে এনেছিলাম। গুরুদেবের সিদ্ধ আসনপীঠের সমীপে, তাঁর পূত-পদধূলিধূসরিত গুহাপ্রাঙ্গণে বসে বসে সেই পরম পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থগুলি অতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে তার প্রত্যেকটি লাইন বিশদভাবে বিশ্লেষণ ক'রে পাঠ করেছি। আমার সেই অধ্যয়ন-তপস্যাকে ধন্য ক'রে কখনো কখনো সেই সর্ব জ্ঞানের আকর গুরুদেব আমার, হঠাৎ আগমন করে আমার গ্রন্থাধ্যয়ন শ্রবণ করতেন ধ্যাননিমীলিতনয়নে, এবং প্রয়োজনমত কৃপা ক'রে তাদের অন্তর্নিহিত অর্থও শোনাতেন। তাঁকে প্রায়ই বলতে শুনেছি—"ছয় গোস্বামীর গ্রন্থই আসল গ্রন্থ। তবে এর প্রকৃত অর্থ গুরুকৃপা বিনা কারো বোধগম্য হবে না। বুদ্ধি দ্বারা এর অর্থ বোধ্য নয়, গুরুকৃপা-আলোকেই এর নিগূঢ় অর্থ হঠাৎ একদিন পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।"

প্রথম প্রথম আমি গুরুদেবের এ কথার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝতে পারতাম না। আমরা এতদিন অনেক সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় উচ্চস্তরের সাহিত্য, কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ ও দর্শনশাস্ত্র পড়েছি; সে সকল যতই দুরূহ হোক না কেন, টীকা-টিপ্পনির সাহায্যে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারা যায়। 'নিজ চেষ্টায় কেউ এর অর্থ বুঝতে পারে না'—এরূপ উক্তি আমাদের কাছে, অর্থাৎ সাধারণ জগতের জ্ঞানান্বেষীর কাছে অর্থহীন। কোনো তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি এ উক্তি মেনে নিতে পারবেন না। কোনো উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে হলে চাই 'গুরু-কৃপা'—এ আবার কেমন কথা? তা' ছাড়া এ গুরু-কৃপা জিনিষটাই বা কী? গুরুদেব কারো প্রতি কোনো বিশেষ কারণে তুষ্ট হলে সে ব্যক্তি ধর্মগ্রন্থের উক্তিগুলির মর্মার্থ ঠিক বুঝতে পারবে, আর যতদিন তাঁর কৃপালাভ না হয়, ততদিন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও শত চেষ্টা সত্ত্বেও ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে পারবেনা, ধর্ম-জগতের দ্বার তার কাছে রুদ্ধ হয়ে থাকবে—এই বা কেমন যুক্তি? সাধারণ মানুষের মত আমারও মনে এ ভাব জাগত। তবে আমি নিজে এতদিনে যে সব অনুভূতি লাভ করেছি, তাতে বুঝেছি যে—গুরুরূপে আমি যাঁকে লাভ করেছি, তাঁর কতকগুলি অলৌকিক শক্তি আছে, যা' সাধারণ মানুষের থাকেনা। নিজের রোগযন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষিতে সে তথ্য আমি তিলে তিলে অনুভব করেছি। রোগ-আরোগ্যের জন্য তাঁকে যে সতত সন্তুষ্ট রাখতে হবে এবং তাঁর কাছে কাছে থাকতে হবে—একথাও আমি বুঝেছি। কিন্তু আমার রোগ নিরাময় হয়ে গেলেও, তাঁর কাছে থেকে যাওয়া, বা তাঁকে তুষ্ট করার চেষ্টার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি? সাধারণের মত এসব কথা ইতিপূর্বে কখনো কখনো আমার মনে উদিত হয়েছে। তারপর অবশ্য প্রভুর সতর্কবাণী—"তুমি পুনর্জন্ম পেয়েছ, এজীবন গুরুসেবাতেই নিয়োগ করতে হবে"—শোনার পর তাঁর চরণেই চির-বিক্রীত হয়ে থাকবার দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি,—কিন্তু সে সিদ্ধান্ত যুক্তি-সঙ্গত। ইতিপূর্বে দীক্ষার অব্যবহিত পরে যে

অপূর্ব ভাবোদয় আমার চিত্তে হয়েছিল, তা যে তাঁরই কৃপা-সঞ্জাত তাও জেনেছি। তবে তা' দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং আমার প্রভুর তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে তাঁরই প্রতি অহৈতুকী শ্রদ্ধা তখনো আমার জাগেনি। কিন্তু এক্ষণে তাঁর সেবায় নিঃস্বার্থভাবে নিযুক্ত হয়ে, মনে অন্য কোনো অভিলাষ বা কামনা না ক'রে,শুধু মাত্র তাঁর প্রীতিবিধান ক'রে যে কী অমৃত ফললাভ হতে পারে, সেটা যখন নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভব করলাম তখন এক নিমেষে আমার পূর্বদিনের সকল সংশয়ের অবসান হয়ে গেল। যে পরম দুর্লভ, অপ্রাকৃত অনুভূতিতে আমার হৃদয় সমুদ্ভাসিত হল, তার ভাস্বর কিরণে গুরু-কৃপার স্বরূপ আমার নিকট সুপরিস্ফুট হয়ে উঠল।

একদিকে প্রভু সতত আমাকে চোখে চোখে রেখেছেন ; মিষ্টি কথায়, আদরে স্নেহের বন্যায় আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন ; অন্যদিকে ঠিক Simultaneously আমার, অন্তঃস্থলে এক নতুন জগতের নবদিগন্ত যেন ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হতে লাগল। এ জগৎ আদৌ প্রাকৃত নয় : এ এক অপ্রাকৃত অনুভূতিময়, আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমময় পরম দুর্লভ জগৎ। একী আনন্দ, একী আনন্দ ! অবিরাম সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃপার একী অমৃতময় ফল ! গোলোক বৃন্দাবনের একী পরম অনুভূতি। ঐ তো দেখতে পাচ্ছি—রাধাকৃষ্ণ একত্রে বিহার করছেন ; ঐ তো সখাসখীগণ, ঐ তো তাঁর ধেনুকুল, ঐ তো তাঁর লীলাপরিকরবৃন্দ। শুনছি কৃষ্ণের মোহন বাঁশী, শুনছি মধুকর-গুঞ্জন, শুনছি সখাসখীর নর্ম-আলাপ। একী, একী হল আমার ! আমি এ কোথায়—কীসের সুখবন্যায় ভেসে চলেছি ! সে আনন্দবন্যা আমার অন্তর ছাপিয়ে চোখে মুখে উপচে পড়ছে, সদাই ভাবে আমি বিহ্বল ; অশ্রু-ছলছল দুটি চোখ। গুরুদেব সময়ে অসময়ে কেবলই আদর ক'রে মিষ্টমধুর স্বরে ডাকছেন, "সুরেনধন, সুরেনধন !" সে মধুমাখা আহ্বান আমার 'কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ ক'রে' সমস্ত অন্তরকে সুধাসিক্ত ক'রে তুলছে। গুরুদেবের মুখের দিকে চাইতেই চোখে জল গড়িয়ে আসছে। গ্রন্থপাঠ করতে দু চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে, কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। গুরুদেবের সুধাকণ্ঠের সুধাসঙ্গীত আমাকে অবিরাম নয়নজলে ভাসাচ্ছে। আমি ভাবছি, এ আমি কোথায় এলাম ! চারদিকে এইতো সেই পুরাতন ইট-কাঠ-দিয়ে-গড়া ঘর-বাড়ী, সেই পুরাতন মানুষগুলি, সেই ধুলিমলিন ধরণী—কিন্তু আমি যেন তাদের উর্দ্ধে, বহু উর্দ্ধে অন্য কোনো একটা আনন্দময় ভুবনে আনন্দ সুধাবন্যায় ভেসে চলেছি। কে আমাকে এখানে আনল, কে ? 'সুরেনধন, সুরেনধন' বলে মিষ্টি মধুর আহ্বানে যিনি অবিরাম আমাকে স্নেহসুধায় অভিষিক্ত ক'রে রেখেছেন এ যে তাঁরই প্রভাব, তাঁরই কৃপাশক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়—তা তাঁর বাইরের স্নেহ-আদর-ময় আচরণে ও আমার অন্তরে তার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত অপ্রাকৃত ভাবরাজ্যের আবির্ভাবে—একেবারে নিঃসংশয়ে, দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল।

আমার সকল সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের নিরসন হল। এবার থেকে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে তুষ্ট করবার চেষ্টা থেকে বিরত হলাম। তিনি আমাকে যে স্নেহদান করছেন, তা একান্তই অহৈতুক,—এ স্নেহের তুলনা হয়না, পৃথিবীর কোনো মানুষ এমন স্নেহ দেখাতে পারেনা কখনো। তাই আমিও তাঁকে ভালবাসলাম,—যে ভালবাসা উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন ও অহৈতুক। মনে হল ভালবাসার পাত্র পৃথিবীতে কোথাও নেই; এখানে সবাই স্বার্থের জন্য ভালবাসে—একথা আজ সুস্পষ্টভাবে বুঝলাম। সত্যকার ভালবাসা যদি কাউকে বাসতে হয় তবে ইনিই তার যোগ্যপাত্র, ইনিই তার একমাত্র আধার।

আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত বহু সুকৃতির বলে, আমি যে সিদ্ধ সাধুগুরর চরণাশ্রয় পেয়েছি, তাঁর যে কী মহিমা তা জগতে কজন বুঝেছে? আমিই কি এতদিন তা জেনেছিলাম? তিনি মধুর কণ্ঠে হরি-বোল বলেন, সকলকে রাশি রাশি মিষ্টান্ন বিতরণ করেন, সংসারী ব্যক্তিগণের সকল প্রকার মুস্কিল-আসান করেন—এইটুকুই মাত্র লোকে জানে ও তাঁর কাছে আসেও এই জন্যই। কিন্তু এ ছাড়া তাঁর আরও যে একটি মহামহিমময় দুর্জ্ঞেয় স্বরূপ আছে, সে সন্ধান কজন রাখে? সে স্বরূপের কৃপা পেলে এমন বস্তুলাভ হয়, যা পেয়ে ত্রিভুবনের আর কিছুই চাইবার থাকেনা; "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"-গীতা ৬।২২, অর্থাৎ যা লাভ করলে আর কোনো লাভকেই তার চেয়ে অধিক ব'লে মনে হয় না এবং "ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে, সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো"—হরিভক্তিসুধোদয় ১৪।৩ অর্থাৎ সেই ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রের কাছে ব্রহ্মসুখও গোষ্পদের তুল্য, এ জিনিষ লাভ হলে "ভুক্তি-সিদ্ধি-ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়"—চৈঃ চঃ ২।২৩। আমার এই সিদ্ধ সাধুগুরু পাতালপ্রভুর কৃপা যে কী বস্তু এবং তার কণামাত্র লাভ হলে যে কী অবিশ্বাস্য, কী অনির্ব্বচনীয়, কী অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দলোকের সন্ধান মেলে, তা' আমার বহুভাগ্যফলে এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। বাইরে যতই আমার গুরুদেবের আদর ভালবাসা পাচ্ছি, ততই ওদিকে অন্তর জগতে নব নব দিগন্ত খুলে যাচ্ছে, যার উপলব্ধি ইতিপূর্ব্বে কখনো হয়নি। আমার কাছে এখন আর এ সত্য অজ্ঞাত রইলনা যে এ রাজ্যে প্রবেশ করবার 'অনুমতি পত্র' একমাত্র সিদ্ধ সাধুগুরু-কৃপাতেই মেলে, সিদ্ধগুরুর প্রসন্ন দৃষ্টিতেই এ অপ্রাকৃত রাজ্যের বন্ধ দুয়ার খুলে যায়—এ দুয়ার খুলবার আর অন্য কোনো উপায়ই নেই।

এদিকে ঝুলনোৎসব এসে গেল, এই উপলক্ষে আশ্রমে আনন্দের স্রোত বইতে লাগল,—অন্ততঃ আমি সেইরূপই অনুভব করলাম। নবদ্বীপের ঝুলনোৎসব প্রসিদ্ধ, বছরে বছরেই এই উৎসব হয়ে আসছে। নবদ্বীপে বহু ঠাকুর বাড়ী, সে সব স্থানে

রাজসিকভাবে ঝুলন-সজ্জার বৈচিত্রী ও আড়ম্বরও খুব। আশৈশব সে সব ঝুলনসজ্জা দেখে আসছি, কিন্তু কৈ কখনও তো এমন আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইনি। সে সব সম্পত্তিসম্পন্ন ঠাকুরবাড়ীর তুলনায় আমাদের এই ভিখারী সন্ন্যাসীর আশ্রমের দীন ঝুলন-সজ্জা যে তাদের মত চমৎকৃতি-জনক বা আনন্দদায়ক হবে, একথা কেউই বলবে না। তবু, তবু এত আনন্দ, এত পুলকের বন্যা-স্রোত আমার মনে বইছে কোথা থেকে? এখন আর আমার কোনোই সংশয় নেই যে, এই বিশুদ্ধ 'আনন্দাম্বুধির উৎসস্থল ঐ আমার সিদ্ধ গুরুদেব পাতাল-প্রভুর কৃপা। এখন আমি নিঃসংশয়ে বুঝেছি শাস্ত্রে কেন বলেছেন, "মহৎকৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি নয়"—চৈঃ চঃ ২।২২, বুঝেছি জড় ভরতের সেই উদাত্ত ঘোষণা "রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা, ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈ-র্বিনামহৎপাদরজোঽভিষেকম্" ভাঃ ৫।১২।১২, বুঝেছি তাঁর কৃপালোকেই "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।"—ভাঃ ১১।২০।৩০

উৎসবের পূর্ব্ব থেকেই তার উদ্যোগ আয়োজনে নিযুক্ত হলাম। নতুন উৎসাহে উৎসবপত্র ছাপতে দিলাম, পত্র ছাপানোয় নতুন রীতি প্রবর্ত্তন করলাম। আনন্দোৎসাহের সঙ্গে ঠাকুরঘরে আমাদের দীন ঝুলন-সজ্জা সাজানো হতে লাগল। উৎসবের সময় মাঝে মাঝে স্বয়ং গুরুদেব ঠাকুরঘরে এসে ঠাকুর দোলাতেন। তখন যে কী আনন্দ হত আমাদের! মনে হত যেন স্বয়ং ঠাকুরই মূর্ত্তি ধ'রে এসে চতুর্দ্দোলায় নিজ বিগ্রহকে দোলাচ্ছেন।

ঝুলনোৎসবের পর জন্মাষ্টমী: ১৫ই ভাদ্র শনিবার—উপবাসে সেদিন কী আনন্দ! উপবাস তো এর আগে অনেক করেছি—কিন্তু কখনো তো সে সব উপবাসে এত আনন্দ হয়নি। বুঝলাম এ আনন্দানুভূতিও আমার ঐ সিদ্ধগুরুর কৃপাপ্রভাবেই। সন্ধ্যায় প্রবীণ পুরোহিত ও গুরুদেবের শিষ্য শিকদারদাদা পূজা অর্চ্চনা সমাপন করলেন। তারপর অঞ্জলি দেবার পালা। সবিস্ময়ে দেখি গুরুদেব স্বয়ং ঠাকুরঘরে এসেছেন। তারপর একে একে অনেক ভক্তই অঞ্জলি দিলেন। গুরুদেব স্বয়ং আমাকে ঠাকুরঘরে ডাকলেন এবং কর্ণে মন্ত্রদান ক'রে সেই মন্ত্রে অঞ্জলি দিতে বল্লেন। প্রাণ পরিতৃপ্ত হল। এরপর ব্রত কথাপাঠের পালা। আশ্রমে ব্রতকথার বই খুঁজে পাওয়া গেলনা। আমি তখন বল্লাম, "আমার কাছে ব্রতকথার বই আছে; যদি আদেশ করেন তো বাড়ী থেকে নিয়ে আসি।" গুরুদেবের অনুমতি পাওয়ামাত্র আমি ছুটতে ছুটতে বাড়ী গেলাম ও তেমনি ছুটে ছুটে আশ্রমে ফিরে এলাম বইটি নিয়ে। সারাদিন জলস্পর্শ না ক'রেও ঐভাবে ছোটাছুটি করতে আমার সে যে কী আনন্দ হচ্ছিল! তারপর বইটি মেজদার

হাতে দিলাম। শ্রীগুরুদেবের আদেশে মেজদাই ব্রতকথা পাঠ করলেন। পাঠান্তে প্রসাদ বিতরণ। প্রসাদ নিয়ে আমি বাড়ী গেলাম।

পরদিন নন্দোৎসব। ভোর থেকেই প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হল। ছেলে মেয়ে, বুড়ো বুড়ী—কত যে প্রসাদ-প্রার্থীর দল! আশ্রম ভ'রে গেল তাদের সমাবেশে। মেজদা আজ সকাল সকাল আশ্রমে এলেন। কারণ, গুরুদেব স্বয়ং আজ বাইরে বেরোবেন নন্দোৎসব উপলক্ষে। একথা শুনে আমরা তো আনন্দে মেতে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম গুরুদেবকে,—পুষ্পমাল্যে অপরূপ সাজে সাজিয়ে দিয়েছেন তাঁকে ভক্তগণ। মন্দিরদ্বারে দাঁড়িয়ে তিনি অপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠে গান ধরলেন, "আহা মরি! কী আনন্দ আজি নন্দ-ভবনে—" গানটি গুরুদেবের স্বরচিত। গুরুদেব একবার গানটির সুর ধরিয়ে দেবার পরই মেজদা গুরুদেবের সুরে সুর দিয়ে গাইতে সুরু করলেন। তাঁর সাথে সাথে আমরা সমবেত ভক্তগণ সকলেই গানে যোগ দিলাম। তারপর গুরুদেবকে পুরোভাগে নিয়ে আমাদের নন্দোৎসবের আনন্দ কীর্ত্তনসম্প্রদায় ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্ল আশ্রমের বাইরে এবং সেখান থেকে পথে। বলা বাহুল্য, গুরুদেবের পাশে পাশে ঝুড়ি ও ধামাভরা দানাদার, বাতাসা নিয়ে দুজন ভক্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়ে আছেন—গুরুদেব যেতে যেতে সর্ব্বদাই হরিলুট বিতরণ করছেন সামনে ও দুপাশে। পথে চলতে চলতে আমাদের কীর্ত্তনদলের কলেবর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে লাগল। কারণ একে তো পাতাল প্রভুর দর্শনই দুর্ল্লভ, তার উপর দানাদার-বাতাসার বৃষ্টি! গান করতে করতে আমরা গুরুদেবের মণিপুর-আশ্রমে, পৌঁছলাম। সেখানে সমস্ত আশ্রম ঘুরে, গুরুদেবের আসন-ঘর পরিক্রমা করে, ছাদে উঠে গুরুদেবকে গঙ্গার শোভা দর্শন-করিয়ে আমরা পুনরায় গুহাশ্রমে ফিরে এলাম। নন্দোৎসবের এই সঙ্গীতটি সুর-সৌন্দর্য্যে এতই সুমধুর, যে শ্রোতামাত্রেই সে-সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ ও পুলকিত হয়।

তারপরের দিনগুলি প্রত্যহ প্রভুর লীলাখেলাদর্শনে পরমানন্দে কাটতে লাগল আমার। একজন সামান্য যাত্রীকেও দর্শনদানচ্ছলে প্রভু যে অমূল্য উপদেশ দান ও সুমধুর লীলাবিস্তার করতেন, তার একদিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৮ই ভাদ্র মঙ্গলবার সকাল ন'টা দশটার সময় কয়েকজন যাত্রী গুরুদেবকে দর্শন করতে এসেছে। তার মধ্যে একজন মা বেশ ভক্তিমতী। প্রভুর দর্শনমাত্রেই ঐ মা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে অভিভূত হ'য়ে বলে উঠল, "প্রভু, আমায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।" প্রভু উত্তরে, করযোড়ে বিনয়নম্র মধুর কণ্ঠে বল্লেন, "মা, তোমার তো ঘরে স্বামী, পুত্র, কন্যা সবই রয়েছে, তাদের ছেড়ে তুমি আমাকে কেমন ক'রে মানুষ করবে মা?" তখন সেই মা কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, "বাবা, তারা তো আমায় রক্ষা করতে পারবেনা"—ব'লেই সে

অতি ব্যথিত ও করুণ নয়নে গুরুদেবের দিকে চাইল। প্রভু তার মনের ভাবটি যেন কেড়ে নিয়ে অপূর্ব্ব করুণ সুরে গাইলেন :

"কেবল ডুবালে,—ডুবালে, একূল ওকূল দুকূল খেলে, কেবল ডুবালে।" অন্তরের অন্তঃস্থলে নিহিত তার এই সুগোপন ভাবের মূর্ত্তিটি প্রভুর সুধা-নির্ঝরিণী সুরধারায় যেন প্রাণ পেয়ে সজীব হয়ে উঠল—সেই মায়ের হৃদয়ের সকল রুদ্ধ আবেগ ভেঙে আছড়ে পড়তে চাইল যেন ঐ সর্ব্বান্তর্য্যামী, দরদী, মরমী প্রভুর চরণতলে। তাই সে হু হু ক'রে কেঁদে উঠল, অবিরল নয়নজলধারায় তার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হয়ে উঠল। এই তীব্র আবেগের, এই গভীর বেদনার, এই চরম মর্মব্যথার যিনি একমাত্র দরদী, সেই নিখিলান্তর্য্যামী প্রভু তখন মধুর স্বরে গাইলেন :

"কেন কাঁদনা…কাঁদনা…হরির অভয়পদ লাগি' কেন কাঁদনা ?

মায়াপাশে বদ্ধ তা কি জাননা ?"

কাঁদতে কাঁদতে সেই মা তখন বল্লে, "বাবা, আমার যে অকূল পাথার।" তার ভাবকে মূর্ত্ত করে প্রভুর অমৃতময় কণ্ঠে নিঃসৃত হল :

"অকূল পাথারে ভেসে যাই—

অকূলের কাণ্ডারীরে কোথা পাই ?"

গান করতে করতে নিমেষের মধ্যে প্রভু অন্তর্হিত হলেন। সেই মা আকুল হয়ে ডাকতে লাগল, "বাবা, একবার দেখা দিন,—আর একটি বার দেখা দিন।" ভিতর থেকে অপূর্ব্ব মধুরস্বরে ধ্বনিত হল :

"একবার দেখা দাও, তাপিত প্রাণ জুড়াও, ওগো নয়নের নীলমণি।"

পরমুহূর্ত্তেই মন্দিরদ্বার বন্ধ হয়ে গেল।

একদিনের এই একটিমাত্র ঘটনা, যা' আমি তখনকার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলাম, তারই সামান্য বর্ণনা করা হল। প্রতিদিন এইরূপ অগণিত দর্শন-প্রার্থীর সহিত প্রভু যে লীলামাধুর্য্য প্রকাশ করতেন ও যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করতেন, তার সম্যক বর্ণনা মানুষের সাধ্যাতীত।

এইরূপ ভাবে প্রভুর অপরূপ লীলা দর্শন করতে করতে পরমানন্দে আমার দিন কাটতে লাগল। ২৯শে ভাদ্র রাধাষ্টমী উপলক্ষে প্রভু নিঃশঙ্ক আশ্রমে যাত্রা করলেন এবং দু'দিনের পর নবদ্বীপ ফিরে এলেন—আমি ষ্টেশনে গিয়েছিলাম তাঁকে আশ্রমে নিয়ে আসতে।

৫ই আশ্বিন শনিবার পূর্ণিমার দিন শ্রীগুরুদেব নৌকাভ্রমণে বার হলেন। নৌকার উপরে শ্রীগুরুদেবের অতি কাছে বসেছি আমি ; ওপাশে বসেছেন মেজদা। ভাদ্রের ভরা গঙ্গা, দুকূল ছাপিয়ে গঙ্গা সহরের ভিতরে আনাচে কানাচে প্রবেশ করেছে। গঙ্গার

সে যে কী অপরূপ শোভা! গুরুদেব বিভোর হয়ে গঙ্গার সেই রূপ দর্শন করছেন। একজন শিষ্য হালের কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক স্থানের পরিচয় দিচ্ছেন। আমরা উজানে বেয়ে চলেছি। শিষ্যটি ব'লে চলেছেন—'এই যে, গুরুদেব, আপনার এক 'জগাই-মাধাই' এর বাড়ী, এই সেই গোঁসাইএর আস্তানা যে আপনার নিন্দা করতে এসে শেষে ক্ষমা চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরেছিল; এই আপনার সেই কাচ-কামিনী-মায়ের মন্দির, যে আপনার একটি মন্দির নির্মাণ ক'রে দেবার বাসনা করেছিল এবং যার প্রস্তাব আপনি গ্রহণ করেননি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পাল খাটিয়ে উজানে নৌকা তর তর ক'রে এগিয়ে চলেছে। রাণীর ঘাট, নিদয়ার ঘাট পেরিয়ে ক্রমে আমরা রামচন্দ্রপুর ঘাটে এসে পৌঁছলাম। হঠাৎ গুরুদেব বল্লেন, "বাবা, এইখানে নৌকা বাঁধ। নৌকা তীরে এনে বাঁধা হল। গুরুদেব আমাদের প্রায় সকলকেই তীরে নেমে রামচন্দ্রপুর-আশ্রম দর্শন ক'রে আসতে বললেন। গুরুদেব অবশ্য নৌকাতেই থাকলেন। আমরা তখন রামচন্দ্রপুর আশ্রমে গেলাম। সেখানে গুরুদেবের একজন শিষ্যকেও দেখলাম। তারপর নৌকায় ফিরে এলাম। হঠাৎ এই রামচন্দ্রপুরে নৌকা বাঁধা ও তথাকার আশ্রম দর্শন করানোর কী তাৎপর্য্য থাকতে পারে? এটা ভাববার বিষয়। সন্ন্যাসের জন্য মহাপ্রভু গঙ্গার যে স্থানে পার হয়েছিলেন, তাঁর গৃহ-পার্শ্বস্থ সেই ঘাট আজও "নিদয়া ঘাট" নাম বহন করছে, আর তার সন্নিকটে এই রামচন্দ্রপুর ঘাটই মহাপ্রভুর নিজঘাট, এই রামচন্দ্রপুরই তাঁর অধুনালুপ্ত জন্মভূমি। তাই কি প্রভু আমাদের সেই পবিত্র ভূমি দর্শন করালেন, এবং নিজেও সেই ঘাটে বসে বিশ্রাম করলেন? গুহাশ্রম-ভূমি যে মহাপ্রভুর একটি লীলাস্থল—একথা বহুবার প্রভুর মুখে শুনেছি।

এবার ফিরবার পালা। এবার আর উজান নয়, স্রোতের মুখেই নৌকা চলেছে এবং তা' 'তীরবেগে'ই ছুটেছে। পূর্ণিমা রাত, আকাশ পরিষ্কার, চারিদিক জ্যোৎস্নার বন্যায় প্লাবিত। উপরে চন্দ্রালোকের প্লাবন, নীচে নীল জলরাশির মেলা—তার মধ্যে চলেছে আমাদের নৌকা। চারিদিকে জ্যোৎস্নালোকিত জলরাশিকে মনে হচ্ছিল যেন "জ্বলিতেছে জল, তরল অনল"। যতদূর চোখ যায় পূর্ণিমার সোনালী আলো বহুদূর পর্য্যন্ত দু'পাশের ছল ছল জলে যেন সোনার স্বপন ছড়িয়ে দিয়েছে, মনে হচ্ছে অচেনা, অজানা খালগুলির মধ্যে দিয়ে এ যাত্রা যেন সেই চিরসুন্দরের উদ্দেশে এক আনন্দময় যাত্রা। সামনে বসে আছেন স্বয়ং গুরুদেব; ভবপারের কাণ্ডারী যেন আজ আমাদের পুরোভাগে থেকে স্বয়ং হাল ধরে ভবপার করছেন। প্রভুর এত নিকটে বসে আছি যে তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত এক অভিনব শক্তির বিচ্ছুরণ স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম—সে শক্তি অপ্রাকৃত আনন্দময়। এইভাবে ক্রমে আমরা আশ্রমের ঘাটে ফিরে এলাম, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

আমি যা' লিখছি তা' আমার সেই সময়কার ডায়েরী থেকে উদ্ধৃত। তাই মাঝে মাঝে এই লীলা কাহিনী আমার দৈনন্দিন 'রোজ-নামচা' বলে মনে হবে। কিন্তু সেই তো আমার একমাত্র সূত্র এবং এতে যা' লিপিবদ্ধ আছে তা নিখুঁত ও নির্ভুল বিবরণ। তা' ছাড়া এইরূপ দৈনন্দিন ইতিবৃত্তের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও নিজস্ব মাধুর্য্যও আছে। স্থানে স্থানে তা একঘেঁয়ে লাগলেও প্রয়োজনবোধে তা লিপিবদ্ধ করলাম।

সন ১৩৪১ সাল ৬ই আশ্বিন রবিবার। আজ সকালে হঠাৎ জানলাম যে শ্রীগুরুদেব গোমো-তপোবন-আশ্রমে যাত্রা করছেন। আমারও যাবার খুবই ইচ্ছা, শুধু তিনি একবার আদেশ করলেই হয়। সেজন্য আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে নিজে তৈরী হয়ে নিলাম। আশ্রমে এসে শুনলাম, গুরুদেবের কয়েকজন শিষ্য এর আগেই গোমো তপোবনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। আমি ভবদেববাবুর সঙ্গে শ্রীগুরুদেবকে নিয়ে যাত্রা করলাম। প্রথমে একটু ভয় ভয় করছিল। ভবদেববাবু সারারাস্তা যাবেন না, আমি একা কী করে প্রভুকে নিয়ে যাব? কিন্তু ট্রেনে উঠে তাঁর প্রেরণায় নতুন আশা ও উৎসাহ সঞ্চার হল। বর্দ্ধমানে এসে শিষ্য পঞ্চাননবাবুর সহিত দেখা হল, তাঁকে গুরুদেব খুব আদর করলেন। যথাসময়ে ডেরাডুন এক্সপ্রেস এল। পঞ্চাননবাবু রেলেরই কর্মচারী, ঐ লাইনের কোনো ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার। ট্রেন আসতেই তিনি গুরুদেবকে নিয়ে একটি প্রায়খালি কামরায় উঠে পড়লেন। আমি অন্য একটি কামরায় উঠলাম। গুরুদেবের জন্য আমার আর কোনো চিন্তাই রইল না। পঞ্চাননবাবু বিশেষ যত্নের সহিতই তাঁকে নিয়ে গেলেন।

যথাসময়ে ট্রেন গোমোষ্টেশনে পৌঁছাল। ষ্টেশনে নেমে শ্রীগুরুদেবের অনুগমন করলাম। নতুন জায়গা, নতুন পথ, প্রাণে এক নতুন আনন্দ জাগছিল। কিন্তু সহসা সে আনন্দ নিমেষে অন্তর্হিত হল। আমার পায়ে জুতা ছিল, গুরুদেব আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য আমাকে তিরস্কার ক'রে বল্লেন, জুতা পায়ে দিয়ে কি গুরুর অনুগমন করতে আছে? বৃথাই তুমি লেখাপড়া শিখেছ, কিছুই জ্ঞান হয়নি।" এই নতুন জায়গায় গুরুদেব কর্ত্তৃক হঠাৎ এভাবে তিরস্কৃত হয়ে মনটা দমে গেল। গুরুদেবের কথামত অগত্যা তাঁর আগে আগেই যেতে লাগলাম। অনেকদূর এসে দেখি, পাহাড়ের ঠিক ধার দিয়ে চলেছি। কুলীরা গুরুদেবের মালপত্র নিয়ে আগে চলেছে। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, আর কতদূর? ওরা বল্লে, "আরো অর্দ্ধেক রাস্তা।" চলতে চলতে অবশেষে আশ্রমে এসে পৌঁছলাম। আশ্রমের শান্তশ্রী ও মাধুর্য্য অনুভব ক'রে প্রাণে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলাম। সে সময়ে গোমো তপোবন আশ্রমটি দেখাশুনা করতেন সুরেন রায় দাদা, তাঁর ডাক পড়ল। তিনি তখন আশ্রমে ছিলেন না, আশ্রমের

ভৃত্য ভিখান্‌কে ডাকতে গিয়েছিলেন। কুলীদের হরিলুট দিয়ে বিদায় করা হল। তারা প্রভুর জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল। আমি জল খেয়ে মন্দির-বারান্দায় শুয়ে পড়লাম। যখন উঠলাম, তখন বেলা অনেক হয়েছে।

গুরুদেবের প্রিয় লীলাভূমি গোমো পাহাড় নরহরিতপোবন সেবাশ্রমের সৌন্দর্য্য নয়ন ভরে দেখতে লাগলাম। গুরুদেব এই আশ্রমের নাম দিয়েছেন 'কৈলাসপুরী'—কৈলাস পুরীই বটে। আশ্রমের অতি সন্নিকটে পূর্বদিকে ছোট বড় পাহাড়ের শ্রেণী। শুনেছি, কাছের ঐ পাহাড়গুলিতে গুরুদেব বিচরণ করেন, ওখানে তাঁর 'আসন' আছে। শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়েও মাঝে মাঝে ঐ সব পাহাড়ে বেড়াতে যান। দূরে উত্তর দিগন্তে পরেশনাথ পাহাড়ের কালো রেখা যেন চিত্রপটে লেখা। যদিও খুব কাছে মনে হয়, তবু শুনলাম এখান থেকে ছ'সাত মাইল দূর। বিকালে হরিলুট মিষ্টান্ন আনবার জন্য শ্রীগুরুদেব আমাকে আদেশ করলেন। বাইরে যেতে খুব আনন্দ হচ্ছিল। সাধারণতঃ, আমরা সহরের বদ্ধ আবহাওয়ায় পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে থাকি, তাই এখানকার উদার উন্মুক্ততার পরিবেশে মনে হল মনপ্রাণ শৃঙ্খল-মুক্ত স্বাধীনতা লাভ করেছে, আর সেইজন্যই এত আনন্দ।

আশ্রমে এসে আশ্রম সংলগ্ন বাগানের চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। সারা আশ্রমেই যেন এক সুনিবিড় শান্তি ও পূর্ণ পরিতৃপ্তি বিরাজ করছে। আশ্রমের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে প্রাণ যেন ভ'রে ভ'রে উঠছিল।

৯ই আশ্বিন সন্ধ্যায় মোটরে ক'রে নলিনাক্ষবাবু এলেন। এখানে আশ্রমে আসা ও আশ্রম থেকে বিদায় নেওয়ার সময় শ্রীগুরুদেবের নামে জয়ধ্বনি দেওয়াই রীতি। এতে আশ্রমবাসীরও যেমন সুবিধা, অর্থাৎ আশ্রমস্থ সকলে জানতে পারেন যে আশ্রমে কোনো শিষ্যের আগমন হচ্ছে, তেমনি যাঁরা আসছেন তাঁদেরও মনে আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। নলিনাক্ষবাবু এসে পৌঁছানোমাত্রই আমি এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে খুব খুসী হলেন। আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে ভিতরে গুরুদেবের কাছে চ'লে গেলেন। প্রত্যেক শিষ্যকে প্রণাম করবার রীতি—এও গুরুদেবই শিখিয়েছিলেন। এতে নিজের মনও যেমন উন্নত হয়, অপরের নিকট হতেও তেমনি সদ্ব্যবহার পাওয়া যায়।

১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে তখনো ঘুম ভাঙেনি ; এমন সময় হঠাৎ কীসের শব্দ পেয়ে চমকে উঠে বসে দেখি কিনা শ্রীগুরুদেব স্বয়ং ভিতর থেকে বাইরে আসছেন —পিছনে নলিনাক্ষবাবুরা। ব্যাপার কী? না, গুরুদেব নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে মোটরে বাইরে যাচ্ছেন। আমি তখনো বিছানা তুলিনি, মুখ পর্য্যন্ত ধুইনি, কোনো প্রাতঃকৃত্যও সমাপন করিনি। পড়ি কি মরি—টলতে টলতে গুরুদেবের পিছন পিছন গেটের বাইরে

পর্যন্ত এলাম। গুরুদেব চটি পায়ে দিয়ে তাঁর দণ্ডটি নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন; তাঁর পায়ের তলায় নলিনাক্ষ বাবুরা বসলেন। গাড়ী ষ্টার্ট দিল। গুরুদেব হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি যাবে ?" গুরুদেবের এই আকস্মিক আহ্বানে আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎস্ফুরণ হ'ল। গুরুদেব স্বয়ং আহ্বান করছেন! আমি ছুটে গিয়ে শার্টটা গায়ে দিয়ে এসে গুরুদেবের চরণপ্রান্তে বসলাম। গাড়ী ছেড়ে দিল। গুরু-নামের জয়ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গাড়ী ছুটে চলল ধানবাদের দিকে। দুপাশে অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা, সমুখে স্বয়ং গুরুদেব। অত্যন্ত আনন্দ হবারই কথা। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে, অথবা গুরুর এক সজীব পরীক্ষা-চক্রে, সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলাম। আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হল। ঘুম থেকে উঠেই গুরুদেবের আহ্বানে কোনোরূপ চিন্তা না ক'রেই তাঁর সঙ্গে গাড়ীতে উঠে বসেছি। প্রাতঃকৃত্যাদি কিছুই হয়নি। বিশেষতঃ সারারাত প্রস্রাব করা হয়নি। এখন গাড়ীতে বসে সেই প্রস্রাবের বেগ আসতে লাগল। চলন্ত গাড়ী, সমুখে গুরুদেব, তাঁর সাথে একগাড়ী লোক। আমার এ শারীরিক কষ্টের কথা কেমন ক'রেই বা বলি, কাকেই বা জানাই? এদিকে প্রস্রাবের বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হতে লাগল, এবং প্রায় অসহনীয় অবস্থায় উপনীত হল। একবার মনে হল, ধানবাদে গাড়ী এলে, নেমে কোথাও প্রস্রাব ক'রে নেব। কিন্তু এমনই মুখচোরা বা লাজুক আমি যে মুখ ফুটে আমার এই নিদারুণ অসহনীয় দৈহিক কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারলাম না। যন্ত্রণা উত্তরোত্তর তীব্র হতে তীব্রতর হতে লাগল, আমার সমস্ত দেহে ও চোখেমুখে সে-যন্ত্রণার, সে-আর্ত্তির আকুলতা ফুটে উঠল; সমস্ত শরীর আনচান করে উঠল, মনে হল—এইবার, এইবার বুঝি জ্ঞানহারা হয়ে যাব। একী কষ্ট, একী যন্ত্রণা! কেউ আমার দিকে চাইল না, চাইলেও কেউ কিছুই বল্লেনা। সহসা গুরুদেব একবার আমার দিকে চেয়ে মৃদু ভর্ৎসনার কণ্ঠে বল্লেন, "গুরুমন্ত্র জপ কর, কেবল গুরুমন্ত্র জপ কর।" আমি প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে শমনদমন ভবভয়হারী সাক্ষাৎ গুরুদেবের সমুখে ব'সে তাঁর চরণের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে প্রাণপণে গুরুমন্ত্র জপ করতে লাগলাম। প্রাণ এই যায়, যায়—এই সংজ্ঞাহারা হয়ে যাই বুঝি। যেটুকু জ্ঞান আছে, সমস্ত চেতনা গুরুমন্ত্রে সন্নিবিষ্ট করে দিলাম। ধীরে, ধীরে, ধীরে—সমস্ত অনুভূতির যেন বিলোপসাধন হ'য়ে গেল; হু হু ক'রে গাড়ী ছুটে চলেছে, দু'পাশের উঁচু নীচু প্রান্তর ও বনের শ্যামল শোভা,—কোনো কিছুই আমার চেতনাকে স্পর্শ করল না। শুধু নয়নসমুখে শ্রীগুরুর অভয় শ্রীচরণ, আর জিহ্বায় গুরু-মন্ত্র—বিশ্বসংসারে আর কিছুই যেন নেই। সুতরাং যন্ত্রণার অনুভূতিও যেন paralysed বা স্তব্ধ হয়ে গেল। ক্রমে গাড়ী এসে কুসুতোড়ে পৌছাল। নলিনাক্ষবাবুরা গুরুদেবকে নামিয়ে নিয়ে

গেলেন। আমি তারপর টলতে টলতে কোনোরকমে নামলাম। সকলে চলে গেলে একটা নির্জনস্থানে প্রস্রাব ফিরতে বসলাম—প্রায় পাঁচ মিনিট ধ'রে। ক্রমশঃ শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরে এল। চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম, শরীরের এই নিদারুণ যন্ত্রণার কথা বিন্দুমাত্র না জানিয়েও যে-অন্তর্য্যামী প্রভুর ইঙ্গিতে মৃত্যুর প্রায় মুখোমুখী হয়েও রক্ষা পেলাম, সে প্রভু কে ?

রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ ব্যানার্জ্জী তখনকার দিনে বিহারের মধ্যে অন্যতম ধনী ও মানী ব্যক্তি। তিনি গুরুদেবের শিষ্য ছিলেন বটে, তবে বৈষয়িক ব্যাপারে এমন গভীর ভাবে নিবিষ্ট ছিলেন যে, কদাচিৎ গুরুদেবের কাছে আসতেন বা তাঁর খোঁজখবর নিতেন। কিন্তু কোনো সঙ্কট উপস্থিত হলে যখন লৌকিক সবরকম প্রচেষ্টায় 'হালে পানি' পাওয়া যেতনা, তখন তিনি 'নিরুপায়ের উপায়' হিসাবে গুরুদেবকে স্মরণ করতেন এবং তাঁর শরণাপন্ন হতেন। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাঁর একমাত্র জামাতা কঠিন রোগে পীড়িত। স্থানীয় চিকিৎসকগণ ব্যর্থ হওয়ায় কলকাতার প্রখ্যাত চিকিৎসকবৃন্দ এসে রোগীকে চিকিৎসা করছেন, এবং প্রায় চার পাঁচজন ডাক্তার সকল সময়ের জন্য রোগীর কাছে নিযুক্ত হয়ে আছেন। তথাপি রোগের বিন্দুমাত্র উপশম হচ্ছেনা এবং লক্ষণ ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যাচ্ছে। গত্যন্তর না দেখে, রায় বাহাদুর তাঁর প্রধান কর্মচারী এবং শিষ্য নলিনাক্ষ ব্যানার্জ্জীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গুরুদেবকে নিয়ে আসবার জন্য; কারণ রায় বাহাদুর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে গুরুদেব অলৌকিক শক্তির অধিকারী, এবং সাধারণ চিকিৎসাবিজ্ঞান যেখানে স্তব্ধ সেখানে গুরুদেবের দর্শন-স্পর্শন বিদ্যুৎশক্তির মতই চমকপ্রদভাবে কার্য্যকরী। তাই তাঁকে আনতে পাঠিয়েছেন। গুরুদেব পৌঁছানো মাত্র রায় বাহাদুর নিজে এগিয়ে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করলেন, সেই সঙ্গে অভ্যর্থনা ও প্রণাম করল তাঁর স্ত্রী ও কন্যা। তারপর গুরুদেবকে রোগীর ঘরে নিয়ে আসা হল। রোগীর শয্যাপার্শ্বে গুরুদেবকে বসবার জন্য একটি চেয়ার দেওয়া হল, কিন্তু গুরুদেব তাতে বসলেন না, নীচে মেঝেতে বসলেন। আমি অবশ্য তাড়াতাড়ি গুরুদেবের আসনটি গাড়ী থেকে নিয়ে এসে পেতে দিলাম। এরপর গুরুদেবের হরিলুট দিবার পালা। মধুর হরিধ্বনি ক'রে এবং 'মা', 'মা' ধ্বনিতে আকুল ক'রে রায় বাহাদুরের স্ত্রী ও কন্যাকে হরিলুট মিষ্টি দিলেন দু'হাত ভ'রে। ওদিকে রোগী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল গুরুদেবের দিকে। সে কী তীব্র দৃষ্টি, কী আকুলতা সে-চাহনিতে! ঠিক এমনি সময়ে রায় বাহাদুর একটি গ্লাসে ক'রে রোগীকে ঔষধ খাওয়াতে এলেন। রোগী শক্ত ক'রে তাঁর হাত ধ'রে উন্মত্ত আবেগে চীৎকার ক'রে বল্লে, "পিতা, এই ঔষধ সেবন করিয়ে আপনি কি আজ আমার পিতার কাজ করছেন? যিনি আমায় রক্ষা করতে পারেন, তাঁর কাছে আমায় যেতে দিন"—

এই ব'লে সে উন্মত্তের স্থায় শ্রীগুরুদেবের চটের প্রান্তভাগ আঁকড়ে ধরল। প্রবল আবেগে বলতে লাগল, "আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনি আমার মাথায় একটিবার হাত দিন,—আমার সব অসুখ সেরে যাবে।" মুমূর্ষু রোগীর সে কী আর্ত্তি, সে কী আকুলতা! বাড়ীতে অবিরাম চার পাঁচজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থেকেও যে-রোগীর রোগের তিলমাত্র উপশম হয়নি, সেই সর্ব্বচিকিৎসকপরিত্যক্ত, নিশ্চিত মৃত্যুপথ-যাত্রী যখন গুরুদেবের দর্শন পেল তখন তার মনে হ'ল, অকূল পাথারে সে যেন এবার অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে, আশ্রয় পেয়েছে একটি জীবন-তরীর, যে-তরীর কাণ্ডারী স্বয়ং ভগবান্। এইরূপ নিরাশ্রয়, নিরালম্ব, নিরুপায় ব্যক্তিই অগতির গতি আমাদের গুরুদেবকে ঠিক চিনতে পারে। তাই সেই মুহূর্ত্তে সে তার শ্বশুরমহাশয় প্রদত্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের Prescription অনুযায়ী ঔষধ দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে শক্ত ক'রে গুরুদেবের চটটি ধ'রে রইল। বল্লে, "আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবেনা; অনেক দেখলাম, আর না। কোনো ডাক্তারের কথা আর আমি শুনব না, কোনো ওষুধ আর খাবনা। আপনি ছাড়া কেউ আমায় রক্ষা করতে পারবে না।" তখন শ্রীগুরুদেব ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লেন, "ভয় কি, বাবা?" পাতাল প্রভুর এই পরম আশ্বাস বাণী পাবার পর ক্ষণেকের মধ্যেই সেই ভয়ঙ্কর বিপদের অবস্থা কেটে গেল—রোগী সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। গুরুদেব রোগীর জন্য ব্যবস্থা ব'লে দিয়ে ফিরে এলেন। ফিরবার পথে রায় বাহাদুর তাঁর সব চেয়ে ভাল গাড়ীখানি ক'রে গুরুদেবকে পাঠিয়ে দিলেন। গুরুদেব বারারীতে নলিনাক্ষবাবুর বাসায় পদার্পণ ক'রে কয়েকমিনিট বিশ্রাম করলেন। তারপর ঝরিয়া হয়ে ধানবাদের পথে বেলা প্রায় দু'টার সময়ে গোমো তপোবনে ফিরে এলেন।

যতদিন যেতে লাগল, আশ্রমে ভক্ত সমাগম তত বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ অঞ্চলের ভক্তদের নিঃস্বার্থ গুরুভক্তি ও অনুরাগ দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হলাম। গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌জ্ঞানে ভক্তি করা, গুরুর পূজার্চ্চনা, আরতি, ইত্যাদি অনুষ্ঠান, গুরুর একান্ত দাস হয়ে থাকা, ও তাঁকে সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট করাই যেন তাঁদের অবিরাম চেষ্টা। তাই এইরূপ ভক্তদের সাথে পরিচয় ক'রে অপার আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম। এদিকে শ্রীগুরুদেবও প্রত্যেক ভক্তকে আমার পরিচয় প্রদান ক'রে আমাকে সকলের প্রিয় ক'রে তুললেন।

এইভাবে পরম আনন্দের মধ্যেই আমার দিন কাটতে লাগল। ১৯শে আশ্বিন ভোর হ'তে না হ'তে শ্রীগুরুদেবের অপূর্ব্ব মধুর সঙ্গীত শুনতে শুনতে ঘুম ভাঙল। যে-স্বপ্ন দেখছিলাম, তা মধুর হতে মধুর—সমস্ত অন্তর যেন গৌরাঙ্গপ্রেমে ভরপুর হয়েছে, 'হা গৌরাঙ্গ, হা গৌরাঙ্গ' ব'লে কেবলই কাঁদছি। ঠিক এমনি সময়ে গুরুদেব

গান গেয়ে উঠলেন। প্রথমেই তানপুরার সহিত 'গুরুজয়, গুরুজয়'—এই ধ্বনিতে সুর মিলাতে লাগলেন। তারপর অপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন: "ভাব মন গুরুপদ সার—" এই গানটি। তার অব্যবহিত পরেই যে স্বরচিত গানটি গাইলেন, সেটি বলবার পূর্ব্বে আমার সেই সময়কার মনের ভাব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। অল্প দিন হ'ল আমি গুরুদেবের কাছে এসেছি এবং ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করেছি আরও অল্পদিন। সুতরাং ধর্ম, ভগবান্, নানা দেব-দেবী সম্বন্ধে আমার জ্ঞান তখনো সীমাবদ্ধ এবং মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ক'রে জেনেছি যে স্বয়ং ভগবান্ কিঞ্চিদধিক চারশ বছর আগে এই বাংলাদেশে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তগণকে ধন্য করেছিলেন ও দেশকে প্রেমবন্যায় ভাসিয়েছিলেন। এ কথা জানা, দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে জানা—মানুষমাত্রেরই পরমলাভ। একী কম আনন্দের কথা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা, সকল ভূতান্তর্যামী, পরমেশ্বর মানুষের মূর্ত্তিতে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের মধ্যে বিচরণ করেছেন, লীলা করেছেন—একী পরমভাগ্য সেই সময়ের মানুষের! সে সময়ও তো খুব বেশী দিনের নয়, এই—মাত্র চারশ বছর আগেকার কথা। আমরাও কেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের স্মরণ মনন ক'রে আনন্দে বিভোর হবনা, তিনি যে কৃপা ক'রে এই কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য তাদের মধ্যে এসেছিলেন, এ কথা মনে ক'রে কেন পুলকিত হ'বনা, কেন তাঁর প্রেমে মত্ত হ'বনা? এই নিশ্চিত সত্য তথ্য জেনেও, এত বড় একটা ঘটনা এই চারশ'বছর আগে ঘটে গেছে এ অবগত হয়েও, কেন আমরা সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে ভুলে থাকব, কেন সেই করুণাময়, সেই প্রেমের অবতারকে অবহেলা ক'রব, কেন আমাদের এই নিকটতম ও প্রিয়তম ভগবানকে আমাদের অতি আপন জন, আমাদের হৃদয়ের ধন ক'রে নেবনা? কোথায় ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র লীলা করেছিলেন, কোন্ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন,—সে সব তো বহু অতীতের, পৌরাণিক যুগের ঘটনা। ইতিহাসে তো তাঁদের অস্তিত্বেরই কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্—যাঁটি ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য ভগবান, যাঁর লীলাকাহিনীর নিখুঁত ও বিশদ বিবরণ রয়েছে বহু প্রামাণিক গ্রন্থে। অথচ অধিকাংশ ভক্তই সেই পৌরাণিক যুগের রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ বা অন্যান্য দেবদেবীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সেই সেই ভগবানের উপাসনা করেন, আর এই মাত্র সেদিনের, ঐতিহাসিক ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কদাচিৎ উপাস্যদেবতারূপে আরাধিত হন। ধর্মজগতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই শ্রীগৌরাঙ্গরূপী স্বয়ং ভগবানের সেরূপ জনপ্রিয়তা নেই দেখে আমি মনে মনে দুঃখ পেতাম। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের কথা না হয় বাদই দিলাম, কারণ অসংখ্য জীব, তাদের কর্ম অনুযায়ীই তাদের প্রবৃত্তি হ'বে। কিন্তু আমাদের গুরুদেব? তিনি তো সাধারণ মানুষ নন,

তিনি একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্‌কে তিনি কিছুতেই অবহেলা করতে পারেন না। অথচ তাঁর মুখে কচিৎ শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনতে পাই, শিষ্যগণকেও গৌর-কথা শুনাতে দেখিনা, নিজেও তিলক-মালাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করেন না। তবে কি তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে স্বয়ং ভগবান্ বলে মানেন না? আমার মনে এইরূপ একটা সন্দেহ কণ্টকের মত আমায় বিদ্ধ করত। অবশ্য আমার মনের এ কথা মুখ ফুটে কোনো দিন তাঁকে ব'লতে পারিনি। এই সন্দেহের ভাবটা যখন চরমে এসেছে, ঠিক তখনই, একমাত্র আমার সন্দেহ-নিরসনের জন্যই, সেই অন্তর্য্যামী প্রভু অতি প্রত্যূষে তাঁর বীণানিন্দিত কণ্ঠে গান গাইলেন :

"নীরদ শ্যাম অঙ্গ লুকায়ে ত্রিভঙ্গ কী ভাবেতে হয়েছ গৌরাঙ্গ বরণ ?
নাহি ব্রজের ভাব, হয়েছে ভাব, করেতে করেছ করঙ্গধারণ।
ব্রজে যখন ছিলে রাধা বলে বাঁশী কত,
এখন সে ভাব গেল, হ'লে পাগলের মত—
বল হরি-বোল্, নাইকো সে বোল্, তোমার রাধারাণী কোথায় করিলে গোপন ?
যে-রাধা-নামে দিবানিশি করিতে গুণগান,
এখন নাই সেই নাম, হরি-বলাই গান,
রাধানামের বাঁশী কী করিলে, গোপীচোরাভাব করি সম্বরণ।
কোথায় পিতা নন্দ, কোথা মা যশোদা,
কোথায় শ্রীদাম সুদাম, কোথায় নন্দের বাধা ?
রাধানামে সাধা নাম, সেই মধুর নাম হয়েছে বিস্মরণ।
কই পীতধরা, কই মোহন চূড়া,
কোথা সে শ্রীরাধা বিরহবিধুরা,
কোথায় গোষ্ঠলীলা, সবি—বিস্মরিলা, অষ্টসখীর কথা ভুলেছ এখন।"

গুরুদেবের গান শেষ হল। গুরুদেব আসন-ঘরের ভিতরে বসে গান গাইছিলেন। দুয়ার বন্ধ। আমি যে বাইরে ব'সে তাঁর দুয়ারের সামনে, এ তাঁর জানবার কথা নয়; তবু সেই অন্তর্য্যামী প্রভু গানখানি যে আমাকে শোনানোর জন্যই গেয়েছেন, আমারই মনের সন্দেহ নিরসনের জন্য—তা' শুধু আমিই বুঝলাম। গান গাওয়া শেষ হ'লে, গুরুদেব হঠাৎ দরজাটি ঈষৎ একটু খুলে ভাববিহ্বল নয়নে দুই কর যুক্ত ক'রে আমার দিকে চেয়ে কেবল বল্লেন, "বাবা।" দীনাতিদীন নরকের কীট আমি, আমার মনের ঐ সন্দেহ দূর করবার জন্য অন্তর্যামী প্রভুর এ কী কৃপা! ভাবাভিভূত হয়ে আমি দুই চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগলাম। "হরি—বোল্"—মধুর ধ্বনি ক'রে গুরুদেব দুয়ার বন্ধ ক'রে দিলেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমি শুধু ভাবতে

লাগলাম, হে অন্তর্য্যামী প্রভু, হে অন্তর-দেবতা, তুমি কে, তুমি কে—কী তোমার স্বরূপ? সন্দেহ-দ্বিধায় ভরা মনে কোনোকালে কি তোমায় চিনতে পারব? অবশ্য পরবর্ত্তীকালে শ্রীগুরুদেবের স্বরচিত শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে বহু সঙ্গীত সংগৃহীত হয়েছে।

শিষ্যরা গুরুদেবকে যে সব চিঠি লিখত তার অধিকাংশই সাধারণ অভাব-অভিযোগে পূর্ণ। ক্বচিৎ কেউ ধর্ম, পরকাল বা ভগবৎপ্রসাঙ্গর অবতারণা করত। হঠাৎ এইরূপ একটি চিঠি আমাদের হাতে এল। চিঠিটি গুরুদেবকে পড়িয়ে শোনালাম। শিষ্যটি লিখেছিল, "গুরুদেব, কেমন করে ভগবানকে লাভ করা যায় ব'লে দিন।" এই প্রসঙ্গে গুরুদেব আমাদের অনেক উপদেশ দিলেন। বল্লেন, "ধর্ম যে কী জিনিষ, তা' মুখে বলা যায় না এবং বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারাও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, এ ধারণাতীত বস্তু।" শিষ্যটিকে উত্তর লিখলেন, "শিক্ষাগুরু বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া অটল বিশ্বাসের সহিত সাধন-যোগ করিতে হয়। তাহার পর শিক্ষাগুরুর কৃপালাভ হইলে দিব্য জ্ঞান-লাভ করিবার আশা করা যায়।" শ্রীমুখে প্রভু বল্লেন, "বাবা, ধর্ম আচরণ বড়ই শক্ত। Total ঠিক রাখা চাই, কোথাও ফাঁকী দিলে চলবে না। ঠাকুর এক, কিন্তু পথ অনেক।"

আমি ব'সে ব'সে চিঠি লিখতে লাগলাম। গুরুদেব আপনমনে তানপুরা নিয়ে গান গাইতে লাগলেন। তাঁর বীণানিন্দিত সুধামাখা কণ্ঠধ্বনি তানপুরার মধুর ঝঙ্কারের সঙ্গে মিলে যে কী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করছিল, তা' ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। যেন একটা ভাবময় সৌন্দর্য্যের বন্যায় ভেসে যাচ্ছিলাম আমি। তার মধ্যে তাঁর গানের যে কয়েকটা কথা সংগ্রহ করতে পারলাম লিখে নিলাম। কিন্তু সে সুধাধারা, সে আনন্দরস, সে ভাব-সৌন্দর্য্য—কেমন করে লিখে বোঝাব? প্রভুর সঙ্গীতসুধার আস্বাদ যে একবার পেয়েছে, সেই জানে যে এমন জিনিষ কথায় প্রকাশ করা যায় না, এ সত্যই গোলোকের দুর্লভ ধন। প্রভুর সঙ্গীতের মধ্যে যে দু'এক লাইন লিখে নিলাম তা এই:

"গুরুপদ কর সার—
গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর।
গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে,
এই ভব পারাবারে গুরু কর্ণধার।

* * *

চল দেখে আসি রসের বৃন্দাবন,—
জয় রাধা ব'লে যাব চ'লে, যা'করেন মদনমোহন—

জীবনে মরণে গতি রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি—
একলা পথে যেতে হবে, ভুলোনা, ভুলোনা—

*　　*　　*

আর কি ব্রজে যাবে ভাই, ওগো ব্রজের গৌর হরি ?
এখনো নাইকো সে ভাব, হয়েছে ভাব, তাই তো তোমায় চিনতে নারি—”

একদিন বেলা প্রায় দুটার সময় শ্রীগুরুদেব ভক্তগণসঙ্গে বড় পাহাড়ে বেড়াতে গেলেন। আমি যেতে চাইলাম, কিন্তু সেদিন আমাকে সঙ্গে নিলেন না। আশ্রমেই থাকতে বল্লেন। আমার মনে অবশ্য খুবই দুঃখ হল। তবু গুরুদেবের আদেশ পালন করতেই হবে—নিজের সুখদুঃখ ভাবলে চলবেনা। অবশ্য এক্ষেত্রে দুঃখটাও তাঁর সঙ্গসুখ-ভঙ্গেরই দুঃখ। যাই হোক, দুঃখ চেপে আশ্রমেই থেকে গেলাম। পরের সপ্তাহে ভক্তবৃন্দসমভিব্যাহারে শ্রীগুরুদেব আবার বড় পাহাড়ে যাত্রা করলেন। আমাকে বল্লেন, “যাবে ?” সেদিন আমার শরীর খুব খারাপ ছিল, সে জন্য প্রথমে রাজী হইনি। কিন্তু গুরুদেব যাচ্ছেন এবং তিনি নিজেই আমাকে যেতে বলছেন, এত বড় সৌভাগ্যই বা ছাড়ি কেন ? ভাবলাম যা হয় হবে, গুরুদেব তো সঙ্গে রয়েছেন। এইরূপ স্থির ক'রে ধীরে ধীরে তাঁর সাথে গেলাম। সঙ্গে অন্যান্য শিষ্য ও নারাণ প্রভৃতি ছিল। শ্রীগুরুদেবের জয়ধ্বনি দিতে দিতে বড় পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। প্রথম দিকে আমার একটু ভয়ভয় করছিল—কারণ হার্টের রোগীর পক্ষে পর্ব্বতারোহণ কেউই অনুমোদন করবেন না। কিন্তু গুরুদেবের সঙ্গগুণের কী অলৌকিক প্রভাব দেখুন; —ধীরে ধীরে আমার অসুস্থতাভাব কেটে গেল এবং উৎসাহ ক্রমশঃ এত বেশী হয়ে উঠল যে আমি ও বালক নারাণ সকলের আগে গিয়ে বনজঙ্গলের মধ্যে পাহাড়িয়া পথ খুঁজে বার করতে লাগলাম। আমাদের সঙ্গে অবশ্য গুরুদেবের আশ্রমের কুকুর-গুলিও ছিল। গুরুদেব কোথাও বাইরে গেলে এই কুকুরগুলি আগে থেকেই জানতে পারে এবং সামনে এগিয়ে এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। অবোধ, নির্ব্বাক, এই নিরীহ প্রাণীগুলি,—কিন্তু গুরুদেবের প্রতি তাদের কী প্রগাঢ় অনুরাগ। গুরুদেব আশ্রম ছেড়ে যেখানেই যান না কেন, প্রবল উৎসাহ ও আনন্দ নিয়ে তারা এগিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেই। একবার গুরুদেব সদলবলে গোমো ষ্টেশনে এসেছেন নবদ্বীপ যাবেন ব'লে। ট্রেন এল, মালপত্র লোকজনসহ গুরুদেব ট্রেনে উঠলেন। ও হরি! কিছুক্ষণ পরে ট্রেন ছেড়ে দেবার সময়ে সকলে যখন ট্রেন থেকে নামছে, তখন দেখা গেল কুকুর গুলি গুরুদেবের আসনের বেঞ্চির তলায় দিব্যি আরামে শুয়ে আছে। অনেক কষ্ট ক'রে, খাবার দিয়ে তবে তাদের নামানো হল। গুরুদেবের সব আশ্রমেই কুকুরগুলির গুরুদেবের প্রতি এই অনুরাগ আদর্শস্থানীয়। শিষ্যদের এথেকে শিক্ষালাভ করা উচিত

—একথা গুরুদেব বারবার বলেছেন। যাক্, এইরূপে কুকুরগুলিকে আগে ক'রে পাহাড়িয়া পথে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ এইরূপ চলতে চলতে আর পথ খুঁজে পেলাম না—হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুধু আমি নই, সকলেই বিহ্বল হ'য়ে পড়ল। অবশেষে শ্রীগুরুদেব সকলের আগে গিয়ে বন সরাতে সরাতে এগোতে লাগলেন এবং বল্লেন, "এসো, রাধাগোবিন্দ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।" বস্তুতঃ, সেদিন শ্রীগুরুদেব সঙ্গে না থাকলে আমরা পথহারা ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়তাম। তারপর পাহাড়ে অনেকক্ষণ ঘুরলাম, শ্রীগুরুদেবের আসন দেখে প্রণাম করলাম। পরে সন্ধ্যার একটু আগে বিপরীত দিক দিয়ে নামতে শুরু করলাম। নামতে গিয়েও আবার পথের গোলমাল হল। এবারও অগতির গতি শ্রীগুরুদেব এসে পথ দেখালেন। এবার বেশ চওড়া রাস্তা পেয়ে আনন্দের সহিত নামতে লাগলাম। পথের পাশে আমি হঠাৎ একটি বনফুলের মনমোহন কুঞ্জের সন্ধান পেলাম। গুরুদেবকে ডেকে এনে সেই কুঞ্জটি দেখালাম।

শ্রীগুরুদেব সেই কুঞ্জের শোভা দেখে এত মুগ্ধ হলেন যে বলতে লাগলেন, "আহা! কী বনশোভা! এখানে যেন সাক্ষাৎ রাধাগোবিন্দ বিরাজ করছেন।" আমরা সেই কুঞ্জের কয়েকগুচ্ছ ফুল নিয়ে আবার নীচে নামতে লাগলাম। ক্রমে সমতলভূমিতে এসে পৌছলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, নীচে চারদিকের মাঠে সেই অস্পষ্ট চন্দ্রালোক যেন এক স্বপ্ন-লোকের সৌন্দর্য্য রচনা করেছে। সমুখে শ্রীশ্রীগুরুদেব, আশে পাশে ভক্তবৃন্দ। আমরা সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত সন্ধ্যায়, "ভজ নরহরি প্রাণারাম, জপ নরহরি রাধাশ্যাম" গান করতে করতে ধান ও অড়হর ক্ষেতের মাঝ দিয়ে এগোতে লাগলাম। প্রভুর জয়ধ্বনি দিয়ে অবশেষে আমরা তপোবন আশ্রমে ফিরে এলাম।

ঐদিন সন্ধ্যায় নগেনবাবু বাড়ী যাবেন। তিনি তখনো তৈরী হননি দেখে গুরুদেব তাঁকে বকলেন। গুরুদেব বল্লেন, "তৈরী হয়ে থাকতে হয়, বাবা। যাবার সময় তাড়াতাড়ি করা কি ভাল?" নগেনবাবু তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। অবশেষে সেই নির্দ্ধারিত ট্রেনেই নগেনবাবু যাত্রা করলেন। নগেনবাবুকে গুরুদেব যে সব কথা বল্লেন, তার অন্য অর্থ ছিল; পরে সেই অর্থ বুঝেছি।

এর কয়েকদিন পরে পূজা। পূজায় আমাদের আশ্রমে কোনো সমারোহ নেই। বেশীর ভাগ শিষ্যই বাড়ী চ'লে যান ব'লে আশ্রমে শিষ্য-সমাগম তেমন হয় না। পূজার দিন বরং শ্রীগুরুদেবকে বিশেষ ব্যথিত অন্তঃকরণেই বলতে শুনলাম, "আহা! এসময়ে কত নিরীহ, মূক, অসহায় জীবহত্যা হচ্ছে। যিনি জগতের জননী, তিনি কি তাঁর

সন্তানহত্যারূপ এই নিষ্ঠুরতায় তৃপ্ত হন ?" বিজয়াদশমীর দিন অনেক শিষ্য এলেন। সেদিন ভক্তগণ নানা রঙের ফুলের মালায় শ্রীগুরুদেবের আপাদমস্তক সাজালেন। নানা বিচিত্র রঙ-বেরঙের বসনে মনের মত ক'রে প্রভুকে সজ্জিত করলেন। যেন আজ ব্রজদুলালকে সাক্ষাৎলাভ ক'রে ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা নেই। সমারোহের সহিত প্রভুর পূজা, আরতি হল। অনেক রাত পর্য্যন্ত কীর্ত্তনানন্দে ভক্তগণ মেতে থাকলেন।

এরপর গুরুদেব রসার এক ভক্তগৃহে যাত্রা করলেন। ডেরাডুন এক্সপ্রেসে গোমো থেকে রওনা হলেন। কয়েকদিন পরেই সন্ধ্যার গাড়ীতে গুরুদেব ফিরে এলেন। সঙ্গে অপরাপর শিষ্যসহ একটি বিকৃতমস্তিষ্ক ছেলে। আশ্রমে ফিরে এসে গুরুদেব সেখানকার কাহিনী বল্লেন। প্রত্যেক জংশন ষ্টেশনে বিপুল জন-সমাবেশ হয়েছিল, সকলেই প্রভুর দর্শনে মুগ্ধ ও অভিভূত। প্রভুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা রেলওয়ে ষ্টাফের অধিকাংশই পূর্ব্ব থেকেই অবগত ছিল। ঐ উন্মাদ ছেলেটি জনৈক প্রভাবশালী I. W. এর পুত্র, গুরুদেবের অদ্ভুত শক্তির কথা শুনে তার রোগ-নিরাময়ের জন্য প্রভুর শরণাপন্ন হয়েছিল।

তারপর দিন পোষ্টাফিসে গিয়ে সেখানে জমা রাখা প্রায় ৬০।৬৫ খানি চিঠি নিয়ে এলাম। এখন এইসব চিঠি পড়া ও লেখার ভার আমার উপর পড়ল। বেলা বারোটার পর গুরুদেবের মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে মউল-তলায় গিয়ে শ্রীগুরুদেব তাঁর আসন করলেন ও ইঙ্গিতে আমাকেও যেতে আদেশ করলেন। দোয়াত-কলম, কাগজপত্র নিয়ে সেই বনের মধ্যে গিয়ে বসলাম। সেখানকার সৌন্দর্য্য বড় বিচিত্র। চারিদিকে বনশোভা, সম্মুখে পরেশনাথ তার বিশাল বক্ষ বিস্তার করে দণ্ডায়মান। আশপাশে নানারঙের পাহাড়িয়া পাখী নানা সুরে গান ক'রছে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে শীতের দিনের মিষ্টি রোদ এসে গায়ে লাগছে; সম্মুখে উপবিষ্ট আনন্দময় নন্দদুলাল— মনে হল যেন নব বৃন্দাবন প্রকটিত হয়েছে আজ এই তপোবনে। সেই নব বৃন্দাবন-শোভার মধ্যে যেন বৃন্দাবন-চাঁদ নবরূপে আজ লীলা করছেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে চিঠি লিখে চলেছি। মধ্যে মধ্যে প্রভু আমাকে মিষ্টি অথবা ফল খেতে দিচ্ছেন। আবার কখনো কখনো তিনি আসন থেকে উঠে গিয়ে গাছে গাছে ফল তুলছেন, বনফল সেবা করছেন, কলকূজনরত নানা রঙের পাখী দেখছেন এবং বলছেন, "দেখ, দেখ,— কী শোভা!"

এই সময়ে কমলারা সুদূর টিটিলাগড় থেকে গোমো তপোবনে এসে পৌছাল। এ যাত্রা যে কত কষ্টকর তা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। ট্রেনেই ওদের তিনদিনের বেশী কাটাতে হত। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের প্রতি ওদের এত গভীর অনুরাগ,

তাঁর এত তীব্র আকর্ষণ যে, সমস্ত পথ তাদের গুরুদর্শনের আগ্রহ ও আশার আনন্দেই কাটত। অধীর আগ্রহে ঘণ্টা মিনিট গুণত ওরা—কখন শ্রীগুরুদেবের অভয় শ্রীচরণ দুটি দর্শন পাবে, কখন তাঁর মধুমাখা 'মা', 'মা' বুলি শুনে প্রাণ জুড়াবে, কখন তাঁর শ্রীহস্তপরিবেশিত প্রসাদ পেয়ে ধন্য হবে। এবার পথে কমলার হঠাৎ শরীর খুব অসুস্থ হয়েছিল। গুরুদেব হৃষীদাকে ও আমাকে ষ্টেশনে পাঠালেন ওদের নিয়ে আসতে। ষ্টেশনে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ট্রেন পৌঁছালে দেখলাম, ওরা ঠিকমতই এসেছে, তবে কমলা খুবই শ্রান্ত, ক্লান্ত ও দুর্ব্বল। এক পা-ও হাঁটতে পারবে ব'লে তার ভরসা ছিলনা। কিন্তু গোমো ষ্টেশনে নেমেই কী যেন এক অননুভূতপূর্ব্ব প্রেরণায় তার সমস্ত শরীর মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল. সে উৎসাহের সঙ্গে বলে, "চল তো, দেখি।" শ্রীগুরুদেবের কী মহিমা দেখুন! যে ইতিপূর্ব্বে এই কিছুক্ষণ আগেও একপা চলতে পারবে বলে আশা করেনি, এখন শ্রীগুরুদেবের দর্শনআগ্রহে, তাঁর নাম গুণ গান করতে করতে অনায়াসে দেড় মাইল পথ অতিক্রম ক'রে আশ্রমে এসে পৌঁছাল। শ্রীগুরুদেবের প্রাণ-জুড়ানো মূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁর আকুল করা 'মা' 'মা' আহ্বানে তার সব অসুখ সেরে গেল।

দুর্গাপদবাবুর এই প্রথম গুরুদর্শন। গুরুদেব করযোড়ে তাঁকে দর্শন দিয়ে শুধালেন, "বাবা, এই অবোধ সন্তানকে উপদেশ দেবার জন্য কিছুদিন থাকবে তো এখানে?" গুরুদেবের কথাগুলি তখন বোধহয় তাঁর সম্যক বোধগম্য হ'লনা—তাই আমি বুঝিয়ে বল্লাম, যে "এখানে আপনি গুরুদেবের কাছে কতদিন থাকবেন সেই সংবাদ জানতে চাইছেন গুরুদেব।" তখন দুর্গাপদবাবু বল্লেন, "আমরা বেড়াতে যাব এই প্রোগ্রাম ক'রে বেরিয়েছি।" গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাবে, বাবা?" দুর্গাপদবাবু উত্তরে বল্লেন, 'এই গয়া, কাশী—।" গুরুদেব ওঁকে বাধা দিয়ে বল্লেন, "তোমার পাগল ছেলে যে উর্দ্ধশ্লেষ্মা, কাসিতে ভুগছে, তার কী ব্যবস্থা হয়, বাবা?"

গুরুদেবের কথা শুনে ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হ'ল গুরুদেবের কথাগুলি তাঁর মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি আমি তখন তাঁকে বুঝিয়ে বল্লাম—গুরুদেব কী বলতে চাইছেন। সব শুনেও, অবশ্য তখনই তিনি কিছু মনঃস্থির করতে পারলেন না। গুরুদেবপ্রদত্ত হারলুট সেবা ক'রে তপোবনের শোভা দেখতে লাগলেন। তারপর কুয়ার জলে স্নান করে পরিতৃপ্ত হলেন। দুপুরে অন্নপ্রসাদ পাওয়ার পর হঠাৎ তাঁর মতপরিবর্ত্তন হল। তাঁর Tour programme বাতিল ক'রে তিনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে মনঃস্থির করলেন। শ্রীগুরুদেবকে পরের দিন এই শুভ সংবাদ জানাতে তিনি খুসী হলেন, তবে পূর্ব্বদিন কিছু বিধিপালন করা হয়নি বলে সেদিন দীক্ষা হলনা, আগামী কাল হবে ব'লে স্থির হ'ল। সুতরাং সেদিন

হরি-লুট ইত্যাদি আনার জন্য বাজারে গেলাম ওঁর সঙ্গে এবং শ্রীগুরুদেবের মহিমা সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করলাম। পরদিন দুর্গাপদবাবুর দীক্ষা হল। তিনি অন্যত্র বেড়াতে যাবার যে Tour programme করেছিলেন তা' বাতিল ক'রে তাঁর পাশটি পরিবর্ত্তন ক'রে নেবার জন্য আগ্রা গেলেন। গুরুদেবের সঙ্গপ্রভাবে তার বেড়ানোর সাধ মিটে গেল, ছুটির বাকী দিনগুলি তিনি গুরুদেবের কাছেই থেকে গেলেন।

ছুটি ফুরালে দুর্গাপদবাবুরা বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। যাবার সময় গুরুদেব পথে তাদের খাবার মত বিবিধ প্রসাদ দিলেন এবং কিছু মহাবস্তুরূপ ঔষধ ও দিলেন। ঔষধের কী প্রয়োজন, তখন কেউই আমরা তা বুঝতে পারিনি। বেলা একটার ট্রেনে ওদের তুলে দিয়ে এলাম ষ্টেশনে। আমাদের আনন্দময় দিনগুলি আনন্দময়ের সঙ্গে বেশ ভালভাবেই কাটতে লাগল। যথাসময়ে দুর্গাপদবাবুদের পৌঁছানো সংবাদ পেলাম। পথে তারা বেশ ভালভাবেই গেছে, কোথাও কোনো অসুবিধা বা কষ্ট হয়নি, বরং সর্ব্বত্র আদর ও অভ্যর্থনা লাভ করেছে। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পথে কাতুর খুব অসুখ হয়ে পড়েছিল—শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত মহৌষধ ব্যবহারে সে-অসুখ নিরাময় হয়ে যায়।

শ্যামাপূজার দিন সমস্ত আশ্রম আলোকমালায় সজ্জিত করলাম। নারাণরা অনেক মোমবাতী ও বাজী প্রভৃতি নিয়ে এল। শ্রীগুরুদেব আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেটের বাইরে গিয়ে আলোকিত আশ্রমের শোভা দেখতে লাগলেন।

প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে মউলতলায় একাকী শ্রীগুরুদেবের চরণোপান্তে বসে চিঠি লিখতাম। চারদিকের এই নির্জ্জনতা ও শান্ত বনশ্রী যেন প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্য উজাড় ক'রে দিত; অথবা অখিল মাধুর্য্যরসামৃতময় শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণোপান্তে ব'সেই যেন এই মাধুর্য্য রসধারায় প্রাণমন ভ'রে ভ'রে উঠত। প্রথম প্রথম আমি একাকীই চিঠি লিখতাম, তারপর হবীদা আসতেন এবং আমার সঙ্গে চিঠিলেখায় যোগ দিতেন। সারা কার্ত্তিক মাস ভোররাতে প্রভুর মঙ্গল-আরতি ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি হ'ত। যেদিন বড়দাদা আসতেন সেদিন তিনিই আরতি করতেন এবং আমরা মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে গান করতাম। বৃন্দাবনদাদা, বঙ্কিমদাদা, অবিনাশদাদা প্রভৃতি ভক্তগণ মধুর কণ্ঠে আরতি গান করতেন। ওদের সুকণ্ঠে ও ভক্তদের ভক্তিপ্লুত সুরে অতিবিচিত্র এক আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হ'ত—যার স্মৃতি এখনও বিস্মৃত হতে পারিনি। মনে হ'ত যেন সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাঁর ভক্তগণ তাঁকে আবার ফিরে পেয়ে পরমানন্দে বিভোর হয়েছেন। কোনো কোনোদিন ভক্তগণ গুরুদেবকে অপরূপ ফুলসজ্জায় সজ্জিত করতেন। সেই সজ্জায় যখন সেই মুনিমনোহারী মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গল আরতি হ'ত, তখন আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেতাম সেই

'রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত-কৃষ্ণ স্বরূপ' সেই 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ', সেই 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন সঙ্গে মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর যুগলিততত্ত্ব, সেই রায় রামানন্দদৃষ্ট অপূর্ব্ব দর্শন! সে কী শোভা, সে কী মধুরিমা! আর সে যে কী আনন্দ সে যে কী অনুভূতি— তা' লিখে কী করে জানাব? এ অপূর্ব্ব দর্শন, এ অপূর্ব্ব অনুভূতি যার হয়েছে, একমাত্র সেই আমার এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করবে। এ অপ্রাকৃত অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

উপদেশচ্ছলে একদিন গুরুদেব বল্লেন, "বাবা, পার্থিব সমস্ত জিনিষই হৃদয়ঙ্গম করা যায়—কিন্তু ধর্ম অতি নিগূঢ় বস্তু, এ ধারণার অতীত জিনিষ। কথার দ্বারা একে বর্ণনা করা যায়না বা বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় না। যদি ধর্ম পালন করতে চাও, তবে অন্য সব আশা-ভরসা ত্যাগ ক'রে, 'জীবনে-মরণে গতি রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি' এইরূপ ভাব নিয়ে একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে চল।"

একদিন মন্দিরের ভিতরে আপন মনে গুরুদেব অপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগলেন, "জপ জয় গুরুগোবিন্দ, মনের যাবে নিরানন্দ," এবং "জয় জয় জয় শ্রীহরি হরি, হরি বল বদনে,—থাকিবে আনন্দ মনে।" এরপর আরও কয়েকটি ছোট ছোট গান গাইলেন। গুরুদেবের মধুর সঙ্গীত শুনে ভক্ত তো বটেই,—এমন কি অভক্ত, পাষণ্ডী বা ইতর প্রাণীরাও মুগ্ধ হ'য়ে যেত।

এই সময়ে আমাদের গুরুভ্রাতা জ্যোতিষসরকারদাদা আশ্রমে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। তিনি আসতে না চাইলেও গুরুদেব প্রত্যহ তাঁকে ডাকিয়ে আনাতেন। শ্রীগুরুদেব একদিন তাঁকে স্পষ্টই বল্লেন, "তোমার গ্রহ আছে, বাবা।" বোধ করি সেই জন্যই তাকে ডাকিয়ে প্রত্যহ প্রসাদ খেতে দিতেন। তিনি গেমোতে A.S.M. থাকাকালীন Bombay Mail সংক্রান্ত যে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং দুর্দ্ধর্ষ ষ্টেশনমাষ্টার Alexander সাহেব শ্রীগুরুদেবের অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ এই জ্যোতিষদাদার মুখেই শুনি।

ইং ১৯২৫—২৭ সালের কোনো এক সময়ে গুরুদেব সদলবলে গোমো তপোবন থেকে নবদ্বীপ রওনা হচ্ছেন। সমস্ত মালপত্রসহ গুরুদেবের সহযাত্রী শিষ্যগণ আগেই ষ্টেশন প্লাটফর্মে এসে উপস্থিত হয়েছেন। টিকিটও কাটা হয়ে গেছে। মেল আসার সময় হয়ে এল। শিষ্যগণ অধীর আগ্রহে গুরুদেবের আগমনের প্রতীক্ষা ক'রছেন। গুরুদেবের সহযাত্রী শিষ্যগণ ছাড়াও ষ্টেশন-ষ্টাফের মধ্যে আমাদের দুজন শিষ্য আছেন—Senior A.S.M জ্যোতিষ সরকার এবং তাঁর সহকারী পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জী। Bombay mail ষ্টেশনে in করল; কিন্তু তখনও গুরুদেবের দেখা নেই। শিষ্যবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। জ্যোতিষ বাবু তাঁর সহকারী পঞ্চানন বাবুকে বল্লেন, "তুমি ওভারব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য কর,

গুরুদেব আসছেন কিনা। গুরুদেবকে দেখতে পেলেই আমাকে জানাবে। গুরুদেব প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর আগে আমি line clear দেব না।" এ দিকে ট্রেন ছাড়ার সময় হ'য়ে গেল; গার্ড সাহেব মুখে whistle ও হাতে পাখা নিয়ে নেমে এল। জ্যোতিষ বাবুর সামনে এসে বল্লে, "সময় হয়ে গেছে, line-clear signal দাও।" জ্যোতিষ বাবু হেসে বল্লেন, "আমার একজন first class passenger আছেন, তার জন্য wait করছি, kindly এক মিনিট সময় দাও।" তার কথা শুনে গার্ড অধীর আগ্রহে পায়চারী করতে লাগল—এক মিনিট, দু'মিনিট চলে গেল, এবার গার্ড সাহেব জ্যোতিষ বাবুর সামনে এসে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বল্লে, "কোথায় তোমার passenger—দু'মিনিট হয়ে গেল, আমি আর দেরী করতে পারি না।" ঠিক এমনি সময়ে ওভার ব্রিজের উপর থেকে পঞ্চানন বাবু চীৎকার করে জানালেন, "গুরুদেব আসছেন, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি; তিনি প্রায় ছুটে ছুটে আসছেন।" কথাটা শুনবামাত্র জ্যোতিষবাবু যেন এক অভূতপূর্ব্ব প্রেরণা পেলেন। গুরুদেব আসছেন—তিনি না পৌঁছানো পর্য্যন্ত তিনি কিছুতেই line clear দেবেন না। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন মনে মনে জ্যোতিষ বাবু। বাইরে হাসিমুখে গার্ডকে বল্লেন, "তিনি এসে গেছেন, তাঁকে দেখা যাচ্ছে। Kindly আর একটু অপেক্ষা করুন।" গার্ড বিরক্ত কণ্ঠে বল্লে, "না, আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না; already তিন মিনিট late হয়ে গেছে, কোনো passenger এর জন্যই আমি আর wait করব না।" গার্ডের কথা শুনে জ্যোতিষ বাবুর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। তিনি অনুনয়সূচক অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বল্লেন, "Please আরও একটু অপেক্ষা করুন; তিনি গাড়িতে না উঠা পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই line clear দেব না। জ্যোতিষ বাবুর কথা শুনে ব্রিটিশ আমলের সেই গার্ডসাহেব ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়ল। সে ভাবল, কী! একজন Indian এর এত বড় কথা, এত বড় স্পর্দ্ধা! প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে সে বল্লে, "তোমাকে দিতেই হবে।" জ্যোতিষ বাবুও তেমনি দৃঢ় কণ্ঠে বল্লেন, "না, কিছুতেই না।" রাগে কাঁপতে কাঁপতে তখন সেই গার্ডসাহেব ষ্টেশনের দুর্দ্ধর্ষ ষ্টেশনমাষ্টার তদানীন্তন কালের কুখ্যাত 'দুঁদে' অফিসার Alexander সাহেবের ঘরে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তখন Alexander সাহেব ছুটে এলেন, জ্যোতিষ বাবুর কাছে এসে অঙ্গুলি আস্ফালন ক'রে বল্লেন, "ব্যাপার কী সরকার! তুমি line-clear দিচ্ছনা কেন?" সরকারের মুখ এবার হাসিতে ভ'রে উঠল, তিনি কোনো কথা গোপন না ক'রে স্পষ্ট বল্লেন, "আমার গুরুদেব আসছেন, ঐ যে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। তিনি এসে পৌঁছানো না পর্য্যন্ত আমি line clear দিতে পারছিনা। কিন্তু Alexauder সাহেব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লেন, "কী! কোথাকার কে তোমার গুরুদেব!

আর তার জন্য Bombay mail এর মত important ট্রেনকে তুমি ইচ্ছা করে detain করছ! জান এর consequence কী?" জ্যোতিষবাবু তেমনি হাসিমুখে বল্লেন, "জানি, স্যর।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব প্লাটফর্মে এসে উপস্থিত হলেন। পঞ্চানন বাবু গুরুদেবের হাত ধ'রে নিয়ে আসছেন! বেশ দ্রুতপদেই আসছিলেন তাঁরা। পথে জ্যোতিষ বাবু, গার্ড ও Alexander সাহেবের সাথে দেখা। গুরুদেবের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষবাবু যেন এক অভূতপূর্ব্ব প্রেরণায় ও এক অমৃতরসের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। মহা আনন্দে তিনি গুরুদেবের সঙ্গে ষ্টেশনমাষ্টারের পরিচয় করিয়ে দিলেন; গুরুদেবও সঙ্গে সঙ্গে সহাস্যে রসভরা মিষ্টান্ন অঞ্জলি করে তুলে Alexander সাহেবের হাতে দিলেন। এরূপ অভ্যর্থনায় সাহেবেরা অভ্যস্ত নয়, তবু গুরুদেবের এমনি মোহিনীশক্তি যে সেই দুর্দ্ধর্ষ Alexander সাহেব আপত্তি তো করলেনই না, বরং বারবার "Thank you, thank you" শব্দে নিজের কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে দু'ঠোঙা মিষ্টান্ন গুরুদেব সাহেবকে দিলেন, এবং তার মধ্যে একটি মেম-মাকে অর্থাৎ Mrs. Alexander কে দিবার জন্য অনুরোধ করলেন। জ্যোতিষবাবু সযত্নে Alexander সাহেবকে গুরুদেবের সব অভিপ্রায় বুঝিয়ে দিলেন। তারপর গুরুদেবের হাতে ধ'রে তাঁকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে প্রণাম ক'রে নেমে এসে line clear দিলেন। ট্রেন ছাড়বার সময় গুরুদেব জ্যোতিষবাবুকে একবার শুধালেন, "বাবা, সাহেবের সঙ্গে তোমার কীসের ঝগড়া হচ্ছিল?" জ্যোতিষবাবু হেসে বল্লেন, "ও কিছু নয়, বাবা। আপনি এসে না পৌছানো পর্য্যন্ত আমি ট্রেন ছাড়িনি, তাই কিছু late হয়ে যাওয়ায় ওদের সঙ্গে বাদানুবাদ হচ্ছিল।" তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, সেই চলন্ত ট্রেন থেকেই গুরুদেব একবার বল্লেন, "বাবা, ঘড়িটা একবার দেখতো কত late হয়েছে।" গুরুদেবের এই কথা শোনার পরই ট্রেন pass ক'রে চলে গেল!

জ্যোতিষবাবু এইবার তাঁর পকেট ঘড়ির দিকে দৃষ্টি দিলেন। কত late হল report দিতে হবে তো ষ্টেশনমাষ্টারের কাছে। কিন্তু তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন ঘড়িতে ১০ টা বেজে তিন মিনিট—ট্রেন ছাড়ার correct time! এ কী! তাঁর ঘড়ি কি খারাপ হয়ে গেল? ছুটতে ছুটতে তিনি সামনেই ষ্টেশনমাষ্টার Alexander সাহেবের roomএ গিয়ে অবাক্ বিস্ময়ে তাঁর ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন—সে ঘড়িতেও ঐ একই time! তিনি ষ্টেশনমাষ্টারকে তাঁর ঘড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখানো মাত্র তিনিও অতিশয় বিস্মিত হলেন। একী! আমার ঘড়ি কি খারাপ হয়ে গেল? নিজ পকেট ঘড়ি বার ক'রে তাতেও ঐ একই time দেখে তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। হন্তদন্ত হয়ে সরকারকে নিয়ে পাশের Telegraph office এ গিয়ে—সাহেব

বিস্ময়ে একেবারে হতবাক। সেখানকার ঘড়িও ঐ একই কথা বলে। আর একটি source মাত্র বাকী, Yard master's cabin—telephone করে সেখানেও যা' time পেলেন, তাতে সাহেবের মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। নিজের room এ ফিরে গিয়ে সরকারকে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বল্লেন, "সরকার, এ যে তাজ্জব ব্যাপার। প্ল্যাটফর্মে যাবার আগেও আমি আমার নিজের ঘড়ি দেখে গেছি, ট্রেন ছাড়ার সময় তখন হয়ে গেছে। কিন্তু ষ্টেশনের সব ঘড়ি, মায় আমার নিজ পকেটঘড়ির কাঁটা কে পিছিয়ে দিল?" জ্যোতিষবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন, "সাহেব, বিশ্বাস কর, সে আমার গুরুদেব। তাঁর অলৌকিক শক্তির এরূপ ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। নইলে কার বলে বলীয়ান হয়ে, আমি আমার কার্যের serious consequence নিশ্চিত জেনেও ট্রেনকে detain করতে সাহসী হয়েছিলাম? যাঁর জন্য এই train detain করেছি, তিনিই তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে এই অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ব্যাপার সংঘটন করেছেন। তিনি এক জন সিদ্ধ মহাপুরুষ; তাঁর কৃপা হলে অনেক বিঘ্ন বিপদ, অনেক সমস্যার অতি সহজ সমাধান হয়ে যায়।" গম্ভীরভাবে শুনলেন সাহেব সরকারের সব কথা। এইমাত্র যে অলৌকিক ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেন তিনি, তাকে তো কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ ঘটনার স্মৃতি চিরতরে অঙ্কিত হয়ে গেল তাঁর হৃদয়ে। এবার সরকার হেসে বল্লেন, "কী report দেব, সাহেব?" সাহেব বল্লেন' "কী আর দেবে? যা' আমরা ঘড়িতে দেখলাম তাই—correct time এ train ছাড়ছে।" এ কথা ব'লেই সাহেবের মনে একটা ঔৎসুক্য জাগল। তিনি পরের stoppage station ধানবাদের সঙ্গে contact করলেন এবং সবিস্ময়ে শুনলেন, সেখানেও ট্রেন correct time এ পৌঁছেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে তখন তিনি বল্লেন, "যাক্, তা হলে গার্ডের report করবারও কিছু থাকল না। সরকার বল্লেন, "হ্যাঁ, তিনি যখন রক্ষা করেন, তখন কোনো দিকেই আর বিপদ থাকে না। সব দিকই পরিষ্কার হয়ে যায়।" তারপর হেসে বল্লেন, "সাহেব, আমার গুরুদেব যে মিষ্টি নিজহাতে তোমাকে দিয়েছেন, তাকে সাধারণ মিষ্টি বা খাবার জ্ঞানে অবহেলা ক'রো না। ওর মধ্যে তাঁর শক্তি নিহিত আছে, ভক্তিভরে তুমি তা খেও এবং তাঁর কথামত তোমার স্ত্রীকেও (যাকে তিনি মাতৃ সম্বোধন করলেন) ঐ খাবারের ভাগ দিও। তাতে তোমাদের দুজনেরই কল্যাণ হবে, এ তুমি নিশ্চিত জেনো। সাহেব আর সরকারের কোনো কথাই অবিশ্বাস করতে পারলেন না। ভক্তিভরে সেই মিষ্টান্ন তখনি একটু খেলেন এবং বাকীটা বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য যত্ন ক'রে রেখে দিলেন। তারপর সরকারকে বল্লেন, "সরকার, তোমার গুরুদেব আবার যখন এখানে আসবেন, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেও। এরূপ একজন অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষের সঙ্গে আমি আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় করতে চাই।" জ্যোতিষবাবু হেসে বল্লেন, "নিশ্চয়ই,

নিয়ে যাব আপনাকে।" সেই দুর্দ্ধর্ষ সাহেবের অন্তরের অন্তঃস্থলে গুরুদেব তাঁর মহা মহিমায় চিরতরে শ্রদ্ধার আসন পরিগ্রহ করলেন।

এর পরের বারে গুরুদেব যখন গোমো তপোবনে আগমন করলেন, তখন জ্যোতিষবাবু Alexander সাহেবকে সে সংবাদ জানালেন এবং সাহেবও একদিন সুযোগ ক'রে প্রায় দেড় মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে, আশ্রমের গেটের বাইরে জুতা খুলে, তাঁকে দর্শন করতে গেলেন। গুরুদেবের দর্শনে তিনি মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন, এবং তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি মনে পোষণ করেছিলেন, তা যেন এই দর্শনে আরো দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়ে গেল। "হ্যাঁ, অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য্য পুরুষই বটে! যেমন মনোমুগ্ধকর তাঁর আচরণ, তেমনি অলৌকিক তাঁর শক্তি, তেমনি দিব্য জ্যোতির্ম্ময় তাঁর মূর্ত্তি"—বল্লেন সাহেব।

এরপর কর্মক্ষেত্রে সাহেবের কিছু জটিলতা এসে উপস্থিত হয়। সাধারণভাবে তার কোনো সুষ্ঠু সমাধান করতে না পেরে তিনি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং প্রসঙ্গক্রমে জ্যোতিষবাবুকে সে কথা জানান। জ্যোতিষবাবু নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে তাঁকে অভয় দিয়ে বল্লেন, "চিন্তার কী কারণ আছে? চলুন, আমার গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই আপনাকে। তাঁকে জানালে তিনি নিশ্চয়ই এর সমাধান ক'রে দেবেন।" সাহেব একটু বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "কিন্তু এসব অফিসের ব্যাপারে তিনি কেমন করে interfere করবেন? অফিসে তাঁর অনুগত কেউ আছে কি, যার দ্বারা তিনি সেখানে influence প্রয়োগ করতে পারেন, এবং—।" জ্যোতিষবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন, "কোনো ব্যক্তি-বিশেষের influence দরকার হয়না, সাহেব! সকলের অন্তরে যে পরমাত্মারূপী ভগবান বিরাজ করছেন, যাঁরা সেই পরম পুরুষের সাথে সংযোগ সাধন করতে পারেন, তাঁদের সব কাজ সেই পরম ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সাধিত হয়। সেই পরম ঈশ্বর বা স্বয়ং ভগবানকে যিনি ধ'রে রাখতে পেরেছেন, তাঁর ইচ্ছা ক'লে তাই সকল সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যায়।" অবাক বিস্ময়ে শুনলেন সেই দুর্দ্ধর্ষ, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী সাহেব। কথাগুলি খুবই যুক্তিপূর্ণ। সুতরাং তিনি জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে একদিন গুরুদেবের কাছে গিয়ে নিজের প্রার্থনা পেশ করলেন। গুরুদেব যথাযথভাবে তার উত্তর দিলেন এবং তাঁকে যা' যা' করতে হবে তারও নির্দেশ দিলেন। এর পর ধীরে ধীরে সাহেবের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, ঠিক গুরুদেবের বাক্য-অনুযায়ীই। গুরুদেবের প্রতি সাহেবের বিশ্বাস চিরস্থায়ী হয়ে গেল।

এই অভাবনীয় ঘটনাবলীতে যে-ভক্ত প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁর সুদৃঢ় গুরুভক্তি প্রত্যেক শিষ্যেরই আদর্শ, সেই শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য গুরুভ্রাতা জ্যোতিষদাদার মুখে যা' শুনেছি, ঠিক হুবহু তারই বিবরণ দিলাম। জ্যোতিষবাবুর গুরুভক্তি কতটা

স্বার্থলেশ শূন্য, তা' একবার ভেবে দেখুন। তিনি জিদের বশে যে কাজ করছিলেন, অর্থাৎ, ইচ্ছা ক'রে বিনা কারণে বোম্বে মেলের মত একটা উল্লেখযোগ্য ট্রেনকে পাঁচ ছয় মিনিট আটকে রাখা, তার পরিণাম তাঁর পক্ষে তখনকার ব্রিটিশযুগে ভয়াবহ। একথা তিনি জানতেন, জানতেন দুর্দ্ধর্ষ Alexander সাহেবের কঠোর ও কঠিন শাসনের কথা। কিন্তু তবু তিনি গুরুদেবকে ছেড়ে নিজের চাকুরী বাঁচাতে যাননি; গুরুদেবকে ট্রেনে না তুলে দিয়ে কিছুতেই তিনি গাড়ী ছাড়তে দেবেন না—এই প্রবল সঙ্কল্পে তিনি অটুট ছিলেন। কী সুদৃঢ় গুরুভক্তি দেখুন! আবার যখন স্বয়ং গুরুদেব ট্রেন ছাড়ার সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কীসের বাদানুবাদ হচ্ছিল তাঁদের,—তখনও তিনি নিজেকে বাঁচানোর জন্য গুরুদেবের কাছেও প্রার্থনা জানাননি, বরং গুরুদেবকে যে নির্ব্বিঘ্নে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে পেরেছেন, এই আনন্দে তিনি বলেছিলেন, "ও কিছু নয়।" ঘুণাক্ষরেও তাঁকে জানাননি নিজের আসন্ন বিপদের কথা। কী-রূপ স্বার্থগন্ধহীন ভক্তি দেখুন! শুধুমাত্র এইরূপ স্বার্থশূন্য:ভক্তিতেই ভগবান্ বাঁধা থাকেন, তাই তাঁর অলৌকিক শক্তিও একমাত্র সেইখানেই আত্মপ্রকাশ করে ও এইভাবে সকলকে বিস্ময়ে বিমূঢ় ক'রে দেয়। যখন তখন, যেখানে সেখানে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য শক্তির বিকাশ হয়না। এই ঘটনায় যিনি জ্যোতিষবাবুর কার্য্যে সহায়তা করেছিলেন, সেই পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জী দাদার মুখেও পৃথকভাবে অনুরূপ বৃত্তান্তই শুনেছিলাম পরে। পঞ্চানন দাদার কথাপ্রসঙ্গে মনে পড়ল, তাঁর দৃষ্ট গুরুদেবের আর একটি অলৌকিক লীলার কথা।

ইং ১৯২৪ সালের এপ্রিল মে মাস। ভক্তগণকে পরীক্ষা করার জন্যই তখন গুরুদেব নিজহাতে বাত-বেদনার ন্যায় কী একটা ব্যথা গ্রহণ করেছিলেন। শিষ্যগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও সে ব্যথার কোনো আশু উপশম দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে ভক্তগণ গুরুদেবের সুচিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন; সেখানে ডাঃ বিধান রায় প্রমুখ তদানীন্তন কলকাতার প্রখ্যাত চিকিৎসকবৃন্দ তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং গুরুদেবের এই বাত-বেদনা যে তাঁদের চিকিৎসার বাইরে, একথা এক বাক্যে স্বীকার করেছিলেন। গুরুদেবের কষ্ট প্রশমনের জন্য শিষ্যগণ সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রচেষ্টা যা' পঞ্চানন দাদার উপস্থিতিতে ও উদ্যোগেই হয়েছিল—তারই বিবরণ দিচ্ছি। পঞ্চানন দাদা বহির্দ্বারে ব'সে আছেন, এমন সময়ে সেখানে জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বাড়ীতে কোনো সাধু এসেছেন কি?" পঞ্চানন দাদা জানালেন, "হ্যাঁ, এসেছেন। কোনো প্রয়োজন আছে কি আপনার তাঁর সাথে?" আগন্তুক ব্যক্তি বল্লেন, "শুনেছি তিনি কঠিন পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন; অনেক চিকিৎসকও তাঁকে দেখানো হয়েছে, কিন্তু তাঁরাও বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তাঁর রোগপ্রশমনের জন্যই আমি এখানে

এসেছি।" পঞ্চানন দাদা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি একজন চিকিৎসক?" ভদ্রলোক বল্লেন "হাঁা, তবে সাধারণ চিকিৎসক নই। আমি একজন Hypnotist, hypnotism বিদ্যাদ্বারা আমি দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহ, যা' কোনো ডাক্তার কবিরাজে ভাল করিতে পারে না, সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে থাকি। এরূপ বহু রোগী আমি সারিয়েছি। আপনাদের প্রয়োজন হ'লে আপনারা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন।" পঞ্চানন দাদা ভাবলেন, গুরুদেব কষ্ট পাচ্ছেন; যদি কোনো উপায়ে তাঁর কষ্টের একটু লাঘব করা যায়, তাঁকে একটু শান্তি দেওয়া যায়—তবে কেনই বা সে পন্থা অবলম্বন ক'রে দেখব না আমরা? এই ভেবে ওঁকে ডেকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে গুরুদেবের কাছে গেলেন সংবাদটি জানাতে। গুরুদেব সাগ্রহে সব শুনে ঐ আগন্তুককে ডেকে আনবার জন্য অনুমতি দিলেন।

প্রশস্ত ঘরে গুরুদেব ব'সে আছেন; কাছে দু' একজন শিষ্য রয়েছেন। পঞ্চানন দাদা ঐ আগন্তুক ভদ্রলোককে নিয়ে গুরুদেবের ঘরে এলেন এবং তাঁর সম্মুখে একটি আসন পেতে দিয়ে ভদ্রলোকটিকে বসতে বল্লেন। সেই আগন্তুক Hypnotist গুরুদেবের সমুখে বসলেন; তারপর গুরুদেবের দিকে চেয়ে বল্লেন, "আপনার সব অসুখ আমি ভাল করে দেব; কোনো চিন্তা নেই। আপনার মত এরূপ অনেক case, বড় বড় ডাক্তাররা যে সবের কিছুই করতে পারেনি, সে সব case আমি দেখেছি এবং সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করেছি।" গুরুদেব দুই হাত যুক্ত করে নতবদনে বসে ছিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকের কথায় তাঁর কোনো ভাবান্তরের লক্ষণ দেখা গেলনা, তিনি তেমনি করযোড়ে নতনয়নে ব'সে রইলেন। তাঁকে সেইরূপ অবস্থায় ব'সে থাকতে দেখে Hypnotist বল্লেন, "অমন করে চোখ নীচু করে ব'সে থাকলে হবে না, আপনি চোখ তুলে আমার দিকে চান। দেখবেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনি রোগমুক্ত হয়ে যাবেন। গুরুদেব তথাপি চোখ তুলে চাইলেন না, সেইরূপ চোখ নত ক'রেই ব'সে রইলেন। বারবার বলা সত্ত্বেও গুরুদেব একইভাবে করযোড়ে নতনয়নে ব'সে রইলেন। Hypnotist ভদ্রলোক এবার যেন একটু অসহিষ্ণু হয়ে বল্লেন, "আমার কথা না শুনলে আমি কী করতে পারি? আপনি যদি রোগ সারাতে চান তো আমার কথা শুনুন। তা' ছাড়া আমার দিকে চাইতে আপনার আপত্তিরই বা কী আছে? ভয় হচ্ছে কি? কোনো ভয় নেই। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না; আপনি নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে একবার আমার চোখের দিকে চান।" গুরুদেব এবার ধীরে, ধীরে নতনয়ন দুটি উন্নত করলেন; স্থিরদৃষ্টিতে চাইলেন সেই Hypnotist এর চোখের দিকে। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট—একী, একী হচ্ছে? Hypnotist এর চোখ বুঁজে আসছে—হাঁা,

একেবারে বুঁজে গেছে, ভদ্রলোক টলছেন, টলে প'ড়ে যাচ্ছেন—এ কী হ'ল, এ কী হ'ল—সশব্দে প'ড়ে গেলেন Hypnotist মাটিতে মূৰ্চ্ছিত হয়ে। গুরুদেব সচকিত হয়ে বল্লেন, "এ কী হ'ল, বাবা? শীঘ্র জল আন, ওর চোখে জলের ঝাপটা দাও, জ্ঞান ফিরাবার চেষ্টা কর।" পঞ্চানন দাদা এগিয়ে এলেন জল নিয়ে, অনবরত চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া হ'তে লাগল; তবু জ্ঞান হয় না। তখন 'আন্ পাখা', পাখা এনে জোর হাওয়া করতে লাগল সবাই তাঁর মাথায়। অবশেষে অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রমের পর ভদ্রলোক চোখ মেলে চাইলেন; বল্লেন, "এ আমি কোথায়?" ক্রমে ক্রমে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। উঠে ব'সে দেখলেন সম্মুখে গুরুদেব করযোড়ে উপবিষ্ট, মুখে মৃদু হাসি। নিমেষের মধ্যে পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ হ'ল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের চরণে প্রণত হয়ে করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। বল্লেন, "আপনার মহিমা না জেনে আপনার প্রতি যে ঔদ্ধত্য ও স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেছি, দয়া করে নিজগুণে আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন। গুরুদেব সেইরূপ হাতযোড় করেই কেবল বল্লেন, "বাবা!" তারপর মিষ্টান্নাদি হরিলুট দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন।

গুরুদেবের হাতের ব্যথা কেউই সারাতে পারেনি—শিষ্যদের এটা একটা পরীক্ষা ক'রছিলেন তিনি। গোমো তপোবনে ফিরবার পর কিছুদিনের মধ্যে তাঁর এই হাতের ব্যথা নিরাময় হয়ে যায়।

পূর্ব্বের ডায়েরীর কথায় ফিরে আসা যাক। জ্যোতিষবাবুর দিন ফুরিয়ে এসেছিল, সেইজন্যই প্রভু তাঁকে এত আকর্ষণ করেছিলেন। সন ১৩৪১ সাল ৩০শে কার্ত্তিক শুক্রবার জগদ্ধাত্রী পূজার দিন শ্রীগুরুদেব গোমো আশ্রম থেকে নবদ্বীপ যাত্রা করলেন। ষ্টেশনে জ্যোতিষবাবু গুরুদেবকে খুব সমারোহ করে অভ্যর্থনা ক'রলেন। ষ্টেশনের সাহেব ইয়ার্ড মাষ্টার ও তাঁর সব নিম্ন কর্মচারীবৃন্দকে নিয়ে এসে অনেক কথাবার্ত্তা ও হরিলুট বিতরণ হ'ল। যথাসময়ে তুফান এক্সপ্রেস এলে আমরা গুরুদেবকে নিয়ে ট্রেনে উঠলাম। গুরুদেবের কোনো কষ্টই হয়নি, কারণ ষ্টেশনের সমস্ত Staff মিলে গুরুদেবকে একটি ভাল কামরায় তুলে দিলেন। ধানবাদে ট্রেন পৌঁছালে জ্যোতিষবাবু গুরুদেবের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে প্রণাম করে নেমে গেলেন। তিনি আমাকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে বল্লেন, "চিঠিপত্র দিও, সুরেন।"

বৰ্দ্ধমানে গাড়ী বদলাতে হবে। ষ্টেশনে অনেক শিষ্য গুরুদেবকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে গুরুদেব আমাকে বল্লেন, "সুরেনধন, Alexander সাহেব এখন বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার। তাঁকে হরি-লুট দিয়ে আসতে পারবে?" গুরুদেবের আদেশ অমান্য করতে পারলাম না; তবে একটু ভয় ভয় করছিল। শুনেছি তিনি একজন অতি দুর্দ্ধর্ষ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সাহেব। অত কড়া

লোকের সামনে আমার মত বেশভূষাহীন, রুগ্ন, শ্রীহীন একটি যুবক কেমন করে এগোবে, তাই ভেবে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। কিন্তু স্বয়ং শ্রীগুরুদেব নিজহাতে মিষ্টান্ন হরিলুট দিয়েছেন, তাই এক অভিনব প্রেরণায় সমস্ত প্রাণ ভ'রে উঠল। ওভারব্রিজ পার হয়ে ষ্টেশন মাষ্টারের রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম; তারপর ভদ্রভাবে প্রশ্ন করলাম, "May I come in, Sir?" গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এল, "Yes"। তখন মিষ্টান্নের ঠোঙা হাতে করে দ্রুতপদে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং হরিলুটের ঠোঙাটি তাঁর হাতে দিতে দিতে সবিস্তারে গুরুদেবের আগমন বৃত্তান্ত তাঁকে জানালাম। সবিস্ময়ে দেখলাম, সাহেব ভক্তিনতচিত্তে হরিলুটের ঠোঙাটি হাতে নিয়ে প্রথমে মাথায় ঠেকালেন, তারপর আমার সামনেই একটি হরি-লুট নিয়ে মুখে দিলেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট আর একটি সাহেবকে গুরুদেবের মাহাত্ম্যের কথা সংক্ষেপে জানিয়ে তাঁকেও একটি মিষ্টান্ন খেতে দিলেন। বাকীটা তাঁর স্ত্রীকে দেবার জন্য বাড়ীতে নিয়ে যাবেন ব'লে পাশের ট্রেতে রেখে দিলেন। এ নির্দ্দেশও গুরুদেবই দিয়েছিলেন এবং আমিও সাহেবকে তদনুরূপ কথাই বলেছিলাম। গুরুদেব কোন্ ট্রেনে এখান থেকে যাবেন, তাও আমি তাঁকে জানালাম। তিনি সাগ্রহে বল্লেন, "আমি যথাসময়ে তাঁর সাথে দেখা করতে যাব।" এইরূপে প্রায় আনন্দে অভিভূত হয়ে তাঁর কাছ থেকে ফিরতে ফিরতে ভাবলাম, একজন বিধর্মী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের যে শ্রদ্ধা-ভক্তি স্বচক্ষে দেখলাম, তা আমাদের শিষ্যদের মধ্যেও দুর্লভ। এই সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী Alexander সাহেব, যার শাসনে সমস্ত Staff থরহরি কাঁপে। সমস্ত কথা শ্রীগুরুদেবকে জানাতে, তিনি আনন্দে আবার আমাকে দিয়ে হরিলুট পাঠালেন; আবার আমি ছুটতে ছুটতে গেলাম তাঁর রুমে, এবারেও তিনি বহু ধন্যবাদ দিয়ে সাধুবাবাকে প্রণাম জানালেন। ফিরে এসে ট্রেনের কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি সাহেবের আগমন-আশায়; ট্রেন ছাড়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময়ে হঠাৎ দেখি প্ল্যাটফর্মের রেলকর্মচারীবৃন্দ অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল,—ব্যাপার কী? পরমুহূর্ত্তেই দেখি ষ্টেশন মাষ্টার Alexander সাহেব গট্‌গট্ ক'রে এগিয়ে আসছেন এবং ট্রেনের কামরাগুলি লক্ষ্য করে দেখছেন। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলাম এবং তাঁকে সসম্মানে ট্রেনের কামরার ভিতর নিয়ে এলাম। গুরুদেবের সামনে এসে সাহেব একটুখানি বসলেন এবং তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। ট্রেন ছেড়ে দিল।

এ সম্বন্ধে আমার নিজের কিছু পূর্ব্ব ধারণার কথা বলা প্রয়োজন ব'লে মনে করি। কারণ তা না হ'লে, আমাকে দিয়ে Alexander সাহেবের কাছে হরি-লুট প্রেরণ ও এই বিধর্মী সাহেবের অপূর্ব্ব ভক্তি দেখে আমার বিস্মিত হবার ব্যাপারটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। ইতিপূর্ব্বে বহুবার শিষ্যদের মুখে এবং স্বয়ং শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখেও এই Alexander

সাহেবের শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা শুনেছি। একবার গুরুদেব সদলবলে মোটরে করে গোমো তপোবনে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে থেমে গুরুদেব হরিলুট বিতরণ আরম্ভ করেন। সেই দানযজ্ঞ ক্রমে এত বিপুল আকার ধারণ করে যে ষ্টেশনস্থিত সমস্ত মিষ্টান্নের দোকানগুলি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং গুরুদেবের গাড়ী ঘিরে এক বিরাট জনতার সমাবেশ হয়। জনতা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেখে, তখনকার দিনের ব্রিটিশ পুলিশ এসে গুরুদেবের গাড়ী ঘেরাও করে এবং গুরুদেবকে জিজ্ঞাসাবাদ কর্'তে সুরু করে। এই দানযজ্ঞের জন্য গুরুদেবকে লাঞ্ছনা করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এমন সময়ে গুরুদেব কোনো শিষ্য কর্তৃক গোপনে Alexander সাহেবকে তাঁর আগমনবার্ত্তা ও এই বিভ্রাটের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। Alexander সাহেব সে সংবাদ শুনবামাত্র গুরুদেবের সামনে এসে তাঁকে প্রণাম ও সম্মান প্রদর্শন করেন এবং পুলিশকে এই অযথা ও অন্যায় interference এর জন্য যথোপযুক্তভাবে শাসিয়ে দেন। এইভাবে Alexander সাহেব গুরুদেবকে অনেকস্থলেই সাহায্য করেছেন শুনতে পেতাম। কিন্তু কথাগুলি আমার সন্দিগ্ধমনে পুরাপুরি বিশ্বাস হ'তনা। ভাবতাম বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান 'হুঁদে' সাহেব কখনো এমন নত হয়ে একজন চটি পরা বাঙালী সাধুকে এত শ্রদ্ধা করতে পারে ? কথাটা প্রায় অবিশ্বাস্য। আমার সেই সন্দেহ-দ্বিধার মূলকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করবার জন্য দয়াময় প্রভু আমাকে দিয়েই বর্দ্ধমান ষ্টেশনে সাহেবকে হরি-লুট পাঠালেন এবং তাঁর গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন আমাকে সাক্ষাতে দেখালেন। যে ভক্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার অন্তরে এরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উদ্রেক হওয়ামাত্র তিনিই তার সমাধান করে দেন। সত্যই তিনি ভক্তের ভগবান্।

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে এসে পরবর্ত্তী গাড়ীর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। আমি বরাবরই গুরুদেবের কাছেই ছিলাম। আমাদের সহযাত্রী অন্যান্য শিষ্যগণ কে কোথায় ছিলেন তার খোঁজ নিইনি। নবদ্বীপের ট্রেন এসে পৌঁছালে গুরুদেব আমাকে আমাদের সঙ্গের শিষ্যগণকে খুঁজে নিতে বল্লেন। তাদের সকলকে সন্ধান করে নিতে খুব বিলম্ব হয়ে গেল এবং তখন ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। তখন নিরুপায় হয়ে সামনে যে কামরাটি পেলাম তাতেই গুরুদেব ও অন্যান্য শিষ্যবৃন্দসহ উঠে পড়লাম। ট্রেন তখন চলতে সুরু করেছে। গাড়ীতে উঠে দেখি এটি একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা। সঙ্গে সঙ্গে একজন চেকার প্রবেশ ক'রে আমাদের টিকিট দেখতে চাইল। আমি আমাদের থার্ড ক্লাশের টিকিট দেখাতেই সে অভদ্র ভাষায় আমাদের গালাগালি দিতে লাগল এবং অত্যন্ত রূঢ় ও কর্কশকণ্ঠে আমাদের অপমান করে পরের ষ্টেশনেই থার্ডক্লাশে আমাদের নেমে যেতে বল্লে অথবা ফাইন্ ও বাড়তি ভাড়া দেবার জন্য জোর দাবী জানাল। শ্রীগুরুদেবের সমুখে তার এইরূপ রূঢ় আচরণে আমি অতিশয় ব্যথিত হলাম। যাই

হোক, তার কথা শেষ হলে আমি শান্ত কণ্ঠে জানালাম, কীরূপ অনিবার্য্য পরিবেশে এবং অনিচ্ছাক্রমে এই উচ্চতর শ্রেণীর কামরায় আমরা উঠতে বাধ্য হয়েছি। তারপর ধীরে ধীরে গুরুদেবের কথাও তাকে বল্লাম, এবং প্রসঙ্গক্রমে এলাইনের রেলওয়ে Staff, বিশেষ করে Alexander সাহেবের শ্রদ্ধা ভক্তির কথাও এসে পড়ল। এ সব কথা শুনে সেই কঠিন ও কর্কশ স্বভাব চেকারও ক্রমে শান্ত হল এবং গুরুদেবের মহিমা-শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে গেল। অবশেষে সেই চেকারই বল্লে, "Compartment change করবার কোনো দরকার নেই। আপনারা এই কামরাতেই থাকুন, আমিও এখানে থাকলাম।" বলা বাহুল্য কোনো কিছু excess fare বা fine আর সে দাবী তো করেই নি, বরং শেষে বিনয়নম্র বচনে ক্ষমাই চেয়েছিল।

এইভাবে নির্ব্বিঘ্নে আমরা নবদ্বীপ ষ্টেশনে পৌঁছলাম। ষ্টেশনে নেমে দেখি সংকীর্ত্তনের দল এসে উপস্থিত। কীর্ত্তনদলসহ গুরুদেবকে নিয়ে মহানন্দে আমরা আশ্রমে এসে পৌঁছলাম। আশ্রমে এসে কীর্ত্তন দলের লোকগুলিকে পরিতোষ সহকারে সেবা করিয়ে ও প্রচুর হরিলুট দিয়ে বিদায় করা হ'ল।

প্রাণে অপরিসীম আনন্দ ও তৃপ্তি নিয়ে নবদ্বীপে ফিরলাম। গোমো তপোবন থেকে যে এক নতুন জীবন, নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই: শ্রীগুরুদেবের যে মাধুর্য্যময় নতুন মূর্ত্তি গোমো তপোবনে দেখলাম, ঐ অঞ্চলের ভক্তগণের ভক্তি ও নানা ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাদের যে অভিনব রূপের পরিচয় পেলাম তা' তাঁর অন্য কোনো আশ্রমে পাইনি! তপোবন আশ্রমে প্রভুর লীলামাধুর্য্য যে উপভোগ করেনি, সে গুরুদেবের সত্যকার পরিচয় লাভ করেনি—এটা নিঃসন্দেহে সত্য।

নবদ্বীপে এসে তাই পার্থক্যটা বড় প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এখানে শ্রীগুরুদেবের মাধুর্য্যলীলা সঙ্কুচিত, সর্ব্বসমক্ষে আরতি-পূজার্চ্চনাদি নিষিদ্ধ, ভক্তদের সহিত বন-বিহার অজ্ঞাত। এখানে বাইরের জনসমাগম, দর্শনার্থীর সমারোহ, সঙ্কীর্ত্তন ও উৎসবাদি বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান সমূহেরই প্রাধান্য। রাসপূর্ণিমা উৎসবের আর দেরী নেই। তাতেই ব্যস্ত হয়ে রইলেন গুরুদেব; এবং সমাগত ভক্ত, শিষ্য অতিথিসেবা ও উৎসবের আয়োজনে, সকলেই উঠে পড়ে লেগে গেল। এ গুরুদেবের আর এক নতুন রূপ। উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হয়ে গেল। নবদ্বীপের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন আবার সুরু হ'ল।

২রা অগ্রহায়ণ আমার দাদার ও মায়ের দীক্ষা হ'ল। এই সময়ে ধানবাদের জ্যোতিষবাবুর Train-accident এর খবর নিয়ে তাঁর ছেলে আশ্রমে এল। তিনি যে এ যাত্রা রক্ষা পাবেন না, তার ইঙ্গিত ইতিপূর্ব্বেই গুরুদেব দিয়েছিলেন। আসবার সময় জ্যোতিষবাবুকে বারবার নিষেধ করেছিলেন ধানবাদ থেকে গোমোতে যাতায়াত করতে। কিন্তু জ্যোতিষবাবু গুরুদেবের সে নিষেধ শোনেন নি। শিয়রে যার শমন

তার গুরুর কথা মনে লাগেনা, গুরুবাক্য সে ঠিকমত পালন করতে পারে না। শেষের ক'দিন গুরুদেব তাঁকে প্রাণপণে আকর্ষণ ক'রে গুরুমুখী ক'রে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন।

সন্ধ্যার নির্জ্জনে যখন গুহামন্দিরে কেউ থাকতনা, তখন প্রভুর শ্রীমুখে কিছু কিছু উপদেশবাণী শুনতে পেতাম। এ সময়ে প্রভুর যে মূর্ত্তির দর্শন পেতাম, তা অপরূপ, অভিনব। ধ্যানগম্ভীর, প্রশান্তমূর্ত্তি; দিবসের কর্মমুখর লীলাচাঞ্চল্য অন্তর্হিত হয়ে সন্ধ্যার শান্তচ্ছায়ায় তাঁর মধ্যে এক নিবিড় নিস্তব্ধতা ও মৌন মাধুর্য্য প্রকাশ পেত। আমার সতত চঞ্চল মন তাঁর সেই সুগম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে সহসা স্তব্ধ হয়ে যেত। মধ্যে মধ্যে তাঁর শ্রীমুখ থেকে যে দু'একটি বাণী এই নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে বার হত, মনে হত তা যেন সেই সত্য-সনাতন আদি-পুরুষেরই কণ্ঠনিঃসৃত দৈব-বাণী।

১৩ই অগ্রহায়ণ এমনি এক সন্ধ্যায় প্রভু বল্লেন, "সাধুর জন্মমৃত্যু সাপের খোলস ছাড়ার মত; তাঁরা অমর। বাহিক দেহরক্ষা করেও তাঁরা অন্যত্র বিচরণ করতে পারেন। সকলে তাঁদের চিনতে পারেন না। বালাগোস্বামী পনেরো বার দেহ রক্ষা করেছিলেন। 'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি'—প্রকৃত সাধু বৈষ্ণব পাগলের মত, ছেলেমানুষের মত ধূলায় খেলা করেন; দেবতারাও তাঁকে চিনতে পারেন না, মানুষ তো কোন্ ছার।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত থেকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার অবতরণের একটি লাইনের কথা জিজ্ঞাসা করলে প্রভু উত্তরে বল্লেন। "শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হয়েছেন, তবে কোনো কোনো ভাগ্যবান্ তাঁর লীলা দেখতে পায়।"

এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা; খল্সীর নগেন রাহার মৃত্যু। তার দিন ঘনিয়ে আসছিল বলেই প্রভু তাকে টেনেছিলেন; গোমো তপোবনে নিয়ে গিয়েছিলেন, কাছে কাছে রেখেছিলেন। গোমো থেকে বিদায় নেবার দিন ইঙ্গিতে বলেছিলেন, "বাবা, সব সময়েই তৈরী থাকতে হয়, যাবার সময় তাড়াতাড়ি করা কি ভাল?" যাবার সময় —অর্থাৎ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময়। যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে দেখে নগেন বাবুকে ও জ্যোতিষবাবুকে—উভয়কেই যথাসাধ্য কাছে টেনেছিলেন। কী অপার করুণা প্রভুর!

এই সময়ে রেলওয়ে ইন্স্পেক্টর দত্ত সাহেব তাঁর উন্মাদপুত্রের জন্য ঔষধ নিতে আশ্রমে এলেন। এই উন্মাদ পুত্রের অসুখ গুরুদেবের কৃপাতেই আরোগ্য হয়েছিল।

নতুন গুহামন্দির-নির্মাতা অমিয়নাথ মিত্র দাদা আশ্রমে এলেন ২০শে অগ্রহায়ণ গুহামন্দির মেরামতির কিছু কার্য্য বাকী ছিল, তা এখন আরম্ভ হ'ল। ২৮শে অগ্রহায়ণ থেকে ২৩শে পৌষ পর্য্যন্ত মন্দির মেরামতির কাজ চলল। অমিয় দাদা মাঝে মাঝে আশ্রমে এসে দেখে শুনে যেতেন।

গুরুদেবের চিঠিপত্র লেখার ভার এখন প্রধানতঃ আমারই উপর ন্যস্ত। লেখা চিঠিগুলি পোষ্ট করবার জন্য পোড়ামাতলায় পোষ্টাফিস পর্য্যন্ত ছুটতে হ'ত। অনেক সময় ঠিকমত লোক পাওয়া যেতনা, লোক পাওয়া গেলেও দেখা যেত ডাক চ'লে গেছে —এইরূপ নানা অসুবিধা হ'ত। এইজন্য আমি গুরুদেবের কাছে প্রস্তাব করলাম, "আপনি যদি আদেশ করেন, আমি আশ্রমে একটা Letter-box বসাতে চেষ্টা করি। আমার মামা এখন Postal Superintendent Office এর Head clerk—তিনিই এর ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন।" আমার কথা শুনে গুরুদেব সানন্দে আমাকে অনুমতি প্রদান করলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ একটি দরখাস্ত লিখলাম; সেই দরখাস্তে প্রথমেই সই করলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাষ্টার দাদা অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, তারপর আরো অনেকে। দরখাস্তটি নিয়ে মামাকে দিলাম। মামা সব দেখে বল্লেন, "হয়ে যাবে।" তারপর যথারীতি Inspector কর্তৃক inspection, report ও স্থানীয় Postmaster এর inspection এর পর গুহাশ্রমের প্রবেশপথে Letter boxটি বসিয়ে নিলাম আমরা। তখন আশ্রমে রাজমিস্ত্রীর কাজ চলছিল; Postmaster এর উপদেশে boxটি আমরা cement দিয়ে একেবারে আশ্রমের দেওয়ালে বসিয়ে নিলাম। সব দেখে শুনে গুরুদেব খুব সন্তুষ্ট হলেন। পোষ্টাফিস থেকে box এর উপর Name-plate ও দেওয়া হল—'Guhasram'।

২৭শে পৌষ প্রভু নিঃশঙ্ক আশ্রমে যাত্রা করলেন। আমাকে দিনের বেলা আশ্রম দেখাশুনা করতে ও প্রত্যহ প্রসাদ পেতে আদেশ করে গেলেন। সেই দিন রাত্রিভোরে স্বপ্নযোগে দেখলাম প্রভু গুহাশ্রমে আবির্ভূত হয়েছেন,—বস্তুতঃপক্ষে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, নবদ্বীপ গুহাশ্রমে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখেন। এদিকে আমার গুরুসেবা-পূজায় প্রবল অনুরাগ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল। গুরুপ্রদর্শিত যোগমার্গের পন্থায় যখন ধ্যানমগ্ন হ'তাম, তখন যেন দেখতে পেতাম আমি একটি তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদী-স্রোতে প্রাণপণে সাঁতার দিচ্ছি, কূল আর বেশী দূরে নয়; সেই কূলে আমার গুরুদেব আকুল হয়ে প্রতীক্ষা ক'রছেন আমার জন্য এবং উৎসাহ দিয়ে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকছেন —আর আমি যেন বলছি —"যাই, যাই, এই যে এলাম বলে।" এদিকে নিঃশঙ্ক আশ্রম থেকে তখন গুরুদেব নিজ শ্রীহস্তে আমাকে যে পত্র লিখলেন, তাতে আমার এই গুরুসেবাপূজার অনুরাগের কথা উল্লেখ করলেন। সেই পত্র প'ড়ে আমি নয়নজল সংবরণ করতে পারলাম না—হে প্রভু, সত্যই তুমি অন্তর্য্যামী, সত্যই তুমি ভক্তবৎসল! ৮ই মাঘ গুরুদেব গুহাশ্রমে শুভাগমন করিলেন।

এবার ২০ শে মাঘ অর্দ্ধোদয় যোগ। সেই উপলক্ষে যোগের অনেক আগে থেকেই আশ্রমে প্রচুর লোক সমাগম হ'তে লাগল। যোগের এখনো এক সপ্তাহ বাকী আছে,

তথাপি যাত্রীর এত ভীড় হচ্ছে যে, সমস্ত আশ্রমপ্রাঙ্গণ যাত্রীদের সমাবেশে পূর্ণ হয়ে যায়। শুধু গুরুদেবকে দর্শনই নয়, তারা আশ্রমে এসে অনেকেই ব'সে পেট ভরে প্রসাদ পেয়ে যেতে লাগল। শ্রীগুরুদেব এক এক দিন একএকভাবে এসে দর্শন দিতেন। একদিন সারা অঙ্গে বিভূতি মেখে সত্য সনাতন পুরুষের স্থায় তাঁর সিদ্ধাসনে এসে বসলেন। তাঁর সে মূর্ত্তি অপরূপ ও বিস্ময়কর,—সেই বিভূতি ভেদ ক'রে এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিপুঞ্জ তাঁর চারিদিকে বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল। তাঁর সে রূপ যে দেখেছে, সেই বিস্ময়ে চমকে উঠেছে। মাঘীপূর্ণিমা পর্য্যন্ত এইরূপ অসংখ্য লোক সমাবেশ হতে লাগল আশ্রমে — আমরা মন্দিরের সব জানালা খুলে দিতাম দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য। ১৪ই মাঘ কয়েকজন যাত্রীকে প্রভু উপদেশ দিচ্ছিলেন। সংগুরু প্রসঙ্গে তাদের বল্লেন, "কভু মিলে, কভু না মিলে, দৈবের ঘটন।" আর একটি কথা বল্লেন, "নবীনে প্রবীণে যদি হয়" — এর অর্থ তখন বুঝিনি।

৪ঠা ফাল্গুন থেকে মাঘীপূর্ণিমা উৎসব সুরু হল। উৎসব উপলক্ষে আশ্রমে যথারীতি কীর্ত্তনগান ও শিষ্যসমাগম হ'তে লাগল। গুরুদেব-বর্ত্তমানে আশ্রমের কীর্ত্তনগান সম্বন্ধে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল,—তা' হচ্ছে এইযে, কোন নাম-করা কীর্ত্তনীয়াকে আশ্রমে গাইতে ডাকা হ'ত না। যে সব কীর্ত্তনীয়াকে সচরাচর কেউ ডাকেনা, বাজারে যাদের ঠাঁই নাই তাদেরই আদর করে ডেকে গুরুদেব গান করাতেন। এই সব অখ্যাত, অজ্ঞাত, বেকার কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়গণই ছিল আমাদের গুরুদেবের বাঁধা কীর্ত্তনীয়াদল। মন্দিরের সামনে তাদের যত্ন করে আসর করে দেওয়া হত; শ্রোতা খুব বেশী হ'তনা, তবু গাইয়েগণ প্রাণপণে চিৎকার করে গাইত, কিন্তু সে গানের শ্রোতা ছিল কম। কেবল গুরুদেব মাঝে মাঝ মন্দিরজানালার সামনে দাঁড়াতেন, এবং যেই তাদের সুরে সুর দিয়ে গাইতেন অমনি তাদের কণ্ঠ থেমে যেত; হাত যোড় করে মুল কীর্ত্তনীয়া দাঁড়াত গুরুদেবের সামনে এবং তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত। গুরুদেব আমাদের আসরে পাঠিয়ে দিতেন এবং ওদের গানে বাহবা ও হাততালি দিতে শিখিয়ে দিতেন। এইরূপে অখ্যাত কীর্ত্তনীয়াদের তিনি আশ্রয় দিতেন। তারা সবাই প্রত্যহ দুবেলা পেট ভ'রে প্রসাদ পেত, বিদায়ের সময় সবাই এক একটি বস্ত্র ও কিছু দক্ষিণাও। সকালে ভক্ত অবধূতদাসের চৈতন্যমঙ্গল গান ও বিকালে অখ্যাত দলের রাধাকৃষ্ণলীলারসকীর্ত্তন হ'ত। এইভাবে অখ্যাত কীর্ত্তনীয়াদের আশ্রয় দিয়ে তিনি তাদের ক্রমে খ্যাত করে তুলতেন; 'খ্যাত' হয়ে পড়লে আর তারাও আসতনা, তিনিও ডাকতেন না।

ধুলোটের দিন বহু কুলি এসে সমবেত হ'ল। গুরুদেব এদের সরলতার জন্য এদের বড় ভালবাসতেন। এরা দল বেঁধে গান করতে করতে (নিজস্ব মৃদঙ্গকরতাল সহ) আগে আগে চ'লল। পরে শ্রীগুরুদেবকে মণ্ডলী বন্ধনে বদ্ধ ক'রে আমরা চল্লাম। তারপর

বিভিন্ন কীর্ত্তনীয়াদল, খোলকরতাল সহ, গান করতে করতে এগোতে লাগলেন। আমাদের গানের কলি সাধারণতঃ "পাতাল বাবার বোল, হরিবোল্, হরিবোল্।" গুরুদেবকে মণ্ডলী করে সত্যহরিদাদা, প্রকাশদাদা, অন্যান্য বিদেশাগত শিষ্যগণ এবং আমিও আছি। গুরুদেবের ঠিক ডান পাশে যে আছে, তার হাতে আছে হরি-লুটের ধামা ; তার অনতিদূরে হরি-লুটের বস্তা মাথায় ক'রে একজন যাচ্ছে। গুরুদেব দুপাশে অবিরত হরি-লুট বিতরণ করছেন। ধামা ফুরিয়ে যেতেই বস্তা থেকে তা পূরণ করা হচ্ছে ; বস্তা শেষ হলে নিকটস্থ ময়রা দোকান হ'তে এনে তা দ্রুত বোঝাই করা হচ্ছে। কারণ গুরুদেবের হাত খালি করবার যো নেই, ছুটে গিয়ে বাতাসা দানাদার—যা,পাওয়া যায় তাই আনা হচ্ছে। এদিকে হিন্দুস্থানী কুলিরা মহাসোরগোল তুলে "হারি-বোল, হারি-বোল্" বলতে বলতে মহা উল্লাসে এগিয়ে চলেছে। সত্যহরিদাদা প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রভুকে বাইরের জনতার স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখে সাবধানে গুরুদেবকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। গুরুদেব মাঝে মাঝে মধুর 'হরি-বোল' ধ্বনি দিচ্ছেন, মায়েদের দেখে আকুল করা 'মা' 'মা' কণ্ঠে তাদের দিকে হরি-লুট ছুড়ে দিচ্ছেন। রাস্তার দুপাশে প্রচুর জনসমাগম হচ্ছে, তাঁরা উৎসুক দৃষ্টিতে "পাতালের সাধুবাবাকে" দর্শন করছেন, কেউ কেউ বা প্রণাম করতে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু কোথাও এতটুকু বি-শৃঙ্খলা বা নোংরামি নেই ; হাতে করে কেউই ধূলি নিক্ষেপ করছে না ; পথে চলতে যেটুকু ধূলি উড়ে—তারই নাম ধূলোট।

এমনি করে মহা আনন্দে গুরুদেবের সঙ্গে নগরকীর্ত্তনদল নবদ্বীপ রেল স্টেশনে এসে পৌঁছাল। বিপুল সমাবেশ দেখে ও কীর্ত্তন-মঙ্গল ধ্বনি শুনে স্বয়ং স্টেশন মাষ্টার নিজ বাসা থেকে সপরিবারে বেরিয়ে এলেন এবং সকলেই একে একে গুরুদেবকে প্রণাম ক'রলেন। গুরুদেবও তাদের প্রচুর হরিলুট দিয়ে ও মধুর 'মা' 'মা' কণ্ঠে ডেকে পরিতৃপ্ত করলেন। ভক্তগণ গুরুদেবকে অতি মনোহর সাজে সাজিয়েছিলেন ; কণ্ঠে গোলাপফুলের মালা, মাথায় গোলাপের মুকুট — কী অপরূপই না দেখাচ্ছিল তাঁকে। লাইনের ধারের রাস্তা দিয়ে ব্যাদ্‌রা পাড়া, চারচাড়া পাড়া, দণ্ডপানি তলা হয়ে পুনরায় আশ্রমে ফিরলেন গুরুদেব। সদর গেটে প্রবেশের কিছু পূর্বে মেজদাদা তাঁর সুকণ্ঠে গান ধরলেন, "গৌর এল ঘরে, আমার নিতাই এল ঘরে—ধেয়ে এসে শচীমাতা গৌর কোলে করে—।" একে মেজদার সুন্দর কণ্ঠ তার উপর সমুখে গুরুদেব—আজ আমরা যেন সত্যই সেই সাড়ে চারশ, বছর পূর্বে ফিরে গেলাম, এবং অনুভব করলাম যেন নগর-সঙ্কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করছি।

আশ্রমে পৌঁছে গুরুদেব তাঁর মন্দিরে চলে গেলেন। কীর্ত্তনীয়াগণের সঙ্গে আমরা তখনও কিছুক্ষণ আশ্রমপ্রাঙ্গণে কীর্ত্তনে মেতে রইলাম।

তারপর মালসাভোগ ও সেবামহোৎসব। সমবেত সাধু মহান্ত দরিদ্রনারায়ণগণ আশ্রমে ব'সে পেট ভরে সেবা করে পরিতৃপ্ত হয়ে মুহুর্মুহু পাতালবাবার জয়ধ্বনি দিতে লাগল। এইভাবে মাঘীপূর্ণিমা উৎসব সমাপ্ত হ'ল। ভক্তগণও একে একে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন।

৬ই চৈত্র দোল পূর্ণিমায় নতুন গুহামন্দির-নির্মাতা অমিয়নাথমিত্রদাদার মায়ের গীতাদান উৎসব হ'ল। পণ্ডিতদের গীতাদান করে তাঁদের ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হ'ল। টোলের পণ্ডিতদের আমি মেজ-দাদার সঙ্গে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলাম। নবদ্বীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ গুহাশ্রমে এসে চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন ক'রে ভোজন দক্ষিণা ও গীতাসহ বিদায় নিয়ে পাতাল সাধুবাবার বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা ক'রে গেলেন।

দশমদোলে বৈদ্যবাটির ভক্তরা গুরুদেবকে সেখানে নিয়ে যান। সেই উপলক্ষে যথাসময়ে গুরুদেব বৈদ্যবাটি আশ্রমে যাত্রা করলেন। আমি ১৫ই চৈত্র মেজদাদার সঙ্গে কোন্নগর হয়ে বৈদ্যবাটি আশ্রমে পৌছলাম। গিয়ে দেখি, আশ্রমে গুরুদেব অত্যন্ত ব্যস্ত,--কারণ অগণিত জনসমাগম, এবং তাদের কেউই নিছক দর্শনার্থী নয়, প্রত্যেকেই এক এক জন প্রার্থী, কেউ অসাধ্যরোগনিরাময়ের, কেউ বা অনুরূপ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আবেদনের। ভোর থেকে সুরু ক'রে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ প্রার্থীদের চাপে পড়ে গুরুদেব একটুও বিশ্রাম পান না। ফলে সাধারণ শিষ্যগণের কাছে গুরুদেব এখানে নাগালের প্রায় বাইরে বল্লেই চলে। আমি ১৭ই বিকালের ট্রেনে নবদ্বীপে ফিরে এলাম, অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে। কারণ গুরুদেব এত কষ্ট পাচ্ছেন তা নিজ চক্ষে দেখছি, অথচ নীরব, নিরুপায় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তরও নেই। তাই অতি দুঃখে ফিরে এলাম। অন্তর্য্যামী গুরুদেব বৈদ্যবাটি থেকে, অত ভীড়ের চাপে থেকেও, আমাকে পত্র লিখলেন, —একখানি নয়, দু'খানি নয়, পর পর তিনখানি। সেই চিঠিগুলি মস্তকে ও বক্ষে রেখে অনেক কাঁদলাম—সত্যই তুমি ভক্তের অন্তরের ধন, ভক্তের মনোবেদনা বুঝে তাই তোমার এই আহ্বান। দিবারাত্র ঐহিক স্বার্থান্বেষী প্রার্থীদের নানা প্রকার প্রার্থনা পূরণের চাপে পড়ে গুরুদেব যে খুব কষ্ট পাচ্ছেন তা মনে ক'রে আমার প্রাণ ছটফট ক'রে উঠল; পত্রেও তিনি তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সুতরাং, আমি আর থাকতে না পেরে ৩রা বৈশাখ বৈদ্যবাটি যাত্রা করলাম। সেখানে পৌছে হৃদয়ের নাথকে দর্শন ক'রে যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেগে সমস্ত অন্তর উথলে উঠল, এ কয়দিন অদর্শনের আকুলতা ও জ্বালা যেন তাঁর অমৃতময়ী মূর্ত্তি দর্শনে জুড়িয়ে গেল। তাঁর চরণে লুটিয়ে আমার সে কী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন! এদিকে যা ভেবেছিলাম তাই দেখলাম; জনসমুদ্রের উত্তাল প্রার্থনাতরঙ্গ যেন প্রভুকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। দিবারাত্র প্রভুর বিরামবিহীন পরিশ্রম।

সাধারণ পাপী তাপী জীবের অবিরাম সংস্পর্শে ও তাদের নাছোড়বন্দ আবেদনে গুরুদেব যেন হাঁপিয়ে উঠছেন। যাঁরা প্রকৃতই গুরুসুখে সুখী ও তাঁর দরদী ভক্ত, তাঁদের কাছে এ দৃশ্য একেবারেই অসহনীয়। কেমন ক'রে এই অবাঞ্ছিত জনগণের অত্যাচার থেকে তাঁকে মুক্ত করতে পারি—এই চিন্তা আমাকে অতিশয় পীড়িত ক'রে তুলল। এই সব স্বার্থ-সর্বস্ব, হৃদয়হীন—অথচ বাহ্যতঃ প্রভাবপ্রতিপত্তিশালীদের কাছে আমি এগোতেও পারব না—সুতরাং এদের কাছে আবেদনের কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না। তখন নিরুপায় হয়ে আমি অগতির গতি গুরুদেবকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ডাকতে লাগলাম। অবশেষে প্রভু আমার কাতর আবেদন শ্রবণ করলেন। যখন এই সব তথাকথিত 'নাম-জাদা'দের দল গুরুদেবকে ঘিরে রয়েছে, এবং তাদের স্বার্থ-সাধন-আবেদনশৃঙ্খলে গুরুদেবকে একেবারে বেঁধে ফেলেছে, তখন হঠাৎ প্রভু এই জীর্ণ, শীর্ণ, মলিনবসন বালককে ডেকে ওদের বল্লেন, "যদি একে রাজী করাতে পার, তবে থাকতে পারি।" আমার দিকে একবার অবহেলার চোখে চেয়ে ঐ সব 'গণ্যমান্য'রা তো একেবারে থ! গুরুদেব যুক্তকরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন—আমিও অশ্রুসজল চোখে করযোড়ে প্রভুর দিকে চেয়ে রইলাম। আমার ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর প্রার্থনা প্রভুর কর্ণে পৌঁছেছে—এই ভেবে আমার সমস্ত অন্তর কান্নায় ভ'রে উঠল। তুমি সত্যই অন্তর্য্যামী, সত্যই ভক্ত বৎসল!

সন ১৩৪২ সালের ৬ই বৈশাখ তখন বেলা প্রায় বারোটা। আশ্রম লোকে লোকারণ্য। সবাই নিজ নিজ আর্জি নিয়ে গুরুদেবের কাছে পেশ করতে ব্যস্ত। শিবপুর থেকে কয়েকজন ভক্ত এলেন মোটরে ক'রে। সহসা অতর্কিতে গুরুদেব বেরিয়ে এলেন এবং তাঁদের মোটরে গিয়ে উঠলেন। গুরুদেবের ইঙ্গিতে আমিও গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। গুরুদেব যে এরূপ আকস্মিকভাবে বৈদ্যবাটি আশ্রম থেকে আসন তুলবেন, তা' কেউই জানেনা; আমার মনে হ'ল, তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্। কিন্তু ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতেই আজ তাঁর এই অতর্কিত যাত্রা। যথাসময়ে শ্রীরামপুর ষ্টেশনে এসে পৌঁছালেন গুরুদেব। একে একে অন্যান্য ভক্তগণও অনেকে এলেন ষ্টেশনে। কিন্তু গুরুদেবের সমস্ত প্রয়োজনীয় মালপত্র ও তাঁর সহযাত্রী শিষ্যগণ সকলে এসে যখন পৌঁছালেন তখন ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ ক'রছে। এখানে উক্ত 21-up ট্রেনের Stoppage অল্প, অথচ আমাদের মালপত্র প্রচুর। তাই গুরুদেবকে নিয়ে একদল শিষ্য, অন্যান্য সংযাত্রীদের তুলে দিবার জন্য আর একদল শিষ্য এবং গুরুদেবের সমস্ত মালপত্রের ভার নিয়ে জয়হরি বাবু, পাচক ব্রাহ্মণ ও আমি প্রস্তুত থাকলাম। ট্রেন এসে থামল; কে কোথায় কী ভাবে উঠলেন জানিনা। মালপত্রও সব ঠিকমত উঠেছে কি না তাও ঠিক বুঝতে পারলাম না। ট্রেনে উঠতে না উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। আমার মনটা খুব ব্যাকুল

হয়ে উঠল। ব্যাণ্ডেলে ট্রেন এসে পৌছাতেই তাড়াতাড়ি নেমে দেখে নিলাম, হ্যাঁ, শ্রীগুরুদেব ঠিকমতই উঠেছেন। এরপর next stoppage বৰ্দ্ধমান—বৰ্দ্ধমানে পৌছালে সেখানে অন্য সহযাত্রী শিষ্যদের সন্ধান নিলাম এবং শ্রীগুরুদেবকে আমাদের কামরায় নিয়ে এলাম। এই গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে গুরুদেব তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছেন মনে করে তাঁর সেবার জন্য ডাব কিনলাম। অনেক প্রার্থনার পর তাঁকে একটু ডাবের জল গ্রহণ করাতে পেরেছিলাম। বেশীর ভাগ প্রসাদ আমরাই পেলাম। আমাদের কামরায় এসেই গুরুদেব কামরার যাত্রীগুলিকে ধীরে ধীরে এমনভাবে মুগ্ধ করে ফেল্লেন যে তাঁর জন্য আমাদের আর কোনো চিন্তাই রইলনা। সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর সহিত কথাবার্ত্তা বলতে লাগল। ধানবাদ পৌছানোর একটু আগে আমাদের কামরাটি প্রায় খালি হয়ে গেল। উঠবার সময়ে যে ট্রেনে এত ভীড়, এত কষ্ট—যাত্রার শেষ পর্ব্বে সেই কামরা একেবারে খালি! এখানে হঠাৎ একদল বৈষ্ণব খোল করতাল সহ আমাদের কামরায় প্রবেশ করল। তারা গুরুদেবকে দেখে তাঁকে চিনতে পারল; সকলেই তাঁকে একে একে প্রণাম করল, এবং সেই কামরার মধ্যেই খোলকরতালসহ গুরুদেবের নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে দিল। সে কী আনন্দ! যেমন উদ্বেগের মধ্যে ট্রেনে উঠেছিলাম, তেমনি আনন্দের বন্যায় ভাসতে ভাসতে যেন আমরা যাত্রা শেষ করলাম। শ্রীগুরুদেবের কী অপূর্ব্ব খেলা, কী অপরূপ লীলা—তাই অনুভব করুন।

আমাদের গোমোতপোবন আশ্রম পাহাড়অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায়, এখানকার আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন—শীতের সময় যেমন প্রচণ্ড শীত, গ্রীষ্মে তেমনি দুঃসহ উত্তাপ। দ্বিপ্রহরে ঘরের বার হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবু আমরা প্রত্যেকদিনই ষ্টেশনে, পোষ্টাফিসে ও বাজারে যেতাম এই দারুণ গরমের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে এতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হ'তনা। উপরন্তু এত ক্ষুধা হ'ত যে সকালে গুরুদেবপ্রদত্ত প্রচুর হরিলুট মিষ্টি ও দুপুরে পেট ভ'রে অন্নপ্রসাদ পেয়েও বিকাল চারটা না বাজতেই ক্ষুধায় শরীর আনচান করত। নিঃস্বার্থভাবে গুরুসেবায় থাকলে যে কতভাবে গুরুকৃপার নিদর্শন স্ফুটিত হয়ে উঠে, তার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত অসামান্য হয়ে রইল আমার জীবনে। এটি হচ্ছে বিকাল চারটার সময় প্রত্যহ গুরু-কর্ত্তৃক আহ্বান ও গুরু-হস্তপরিবেশিত অন্নপ্রসাদ ভোজন। ঘটনাটি সামান্য এবং অপর কেউ এতে কোনো বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাবেনা। কিন্তু আমি সবিস্ময়ে ভাবতাম, আমি যে বিকাল হ'তে না হ'তেই ক্ষুধায় কাতর হয়েছি, এবং লজ্জায় যে একথা কাউকে বলতেও পারছি না, কেমন ক'রে তিনি আমার সে ক্ষুধার কথা জানতে পেরে আমাকে ডেকে খেতে বসালেন। গুরুর স্বহস্ত-পরিবেশিত সেই অমৃতসম প্রসাদ পেতে পেতে সমস্ত মন আমার আনন্দে ভ'রে ভ'রে উঠত। পশ্চিমদিকের ভিতরের বারান্দায় বসিয়ে তিনি আমাকে খাওয়াতেন। খেতে

খেতে দেখতাম সমুখের দূর আকাশে পরেশনাথ পাহাড়ের কালো রেখা যেন চিত্রপটে আঁকা ছবির মত বিরাজ করছে, দুপাশে আশ্রমের ঘন বনচ্ছায়া এক শ্যামলমায়া বিস্তার করেছে, সেই মাধুরিমার মধ্যে মগ্ন হয়ে গুরুপ্রদত্ত সেই প্রসাদান্ন যেন অমৃতের মত মনে হত আমার। এইরূপে প্রায় প্রতিদিনই ডেকে ঐ একই নির্জ্জন পরিবেশে খাওয়াতেন আমায়। ধুসূড়ী চাউলের সেই লাল মিষ্ট অন্ন, তার সাথে আশ্রমস্থ যজ্ঞডুমুরের ডালনা, বা ইঁচড়ের তরকারী, বা কুমড়ার ঘণ্ট তাঁর শ্রী-হস্ত-পরিবেশিত হয়ে কী অমৃতময় যে হয়ে উঠত!

এইভাবে তিন সপ্তাহাধিক গোমো তপোবন আশ্রমে অবস্থানের পর আমি চলে এলাম ২৬শে বৈশাখ। শ্রীগুরুদেব ৩০শে বৈশাখ নবদ্বীপে ফিরলেন। ১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার শ্রীগুরুদেব নিঃশঙ্ক আশ্রম গমন করলেন। সঙ্গে হৃষীদাদা গেলেন। গুরুদেবের আদেশমত আমি নবদ্বীপেই থাকলাম। নিঃশঙ্ক থেকে গুরুদেবের চারখানি পত্র পেলাম; সেখানকার উৎসব বেশ ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তারও সংবাদ পেলাম। আমাদের বাড়ীর বাগানের কিছু গাছপাকা আম গুরুদেবের সেবার জন্য নিঃশঙ্ক আশ্রমে পাঠিয়েছিলাম। গুরুদেব পত্রে লিখলেন, "বাবা, তোমার আম খুব ভাল হইয়াছে, খুব মিষ্ট।" গুরুদেবের চিঠি প'ড়ে ধন্য হলাম, ধন্য হল আমাদের ভিটে-মাটি। ২১শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীগুরুদেব নবদ্বীপ শুভাগমন করলেন—সঙ্গে ছিলেন হৃষীদাদা। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ দশহরায় আশ্রমে যথারীতি ভক্ত ও শিষ্য সমাগম হ'ল। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার একাদশী; সকালে গুহামন্দিরে প্রবেশ ক'রছি, হঠাৎ কানে এল ভিতরে গুহার অভ্যন্তর থেকে অপূর্ব্ব মধুর ঝঙ্কারে প্রভু গাইছেন:

"হরি, হরি শব্দ কর রাত্রিদিনে—
হরি নামের ফল বুঝিবে সে দিনে
যেদিন পার হবে অকূল ভবসাগরে,
হৃদিকলেবর, সে যে পরের ঘর,
ভাড়া দিয়ে বাস ভাড়াটে যাবে।"

গান গাইতে গাইতে প্রভূ মন্দিরে প্রবেশ করলেন। আমাকে দেখে করযোড়ে ঢুলু ঢুলু নয়নে চেয়ে ভাবময় কণ্ঠে বল্লেন, "বাবা!" আমি অভিভূত হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলাম। আমার সমস্ত হৃদয় করুণ দৈন্যে ভ'রে উঠল, মনে হ'ল আমি নরকের এক কীটানুকীট, কত কোটি জন্মের মহাপাপী, কত হীন, কত অধম আমি—তবু আজ এ কী সৌভাগ্য আমার—আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান করুণা-রস-ঘন মূর্ত্তিতে সেই শ্রীনন্দনন্দন সাক্ষাৎ ভগবান্।

কর্মবন্ধন যত কাটছে, একটু একটু করে তাঁর কৃপাও বিকশিত হচ্ছে। শ্রীচৈতন্য

চারতামৃতে পড়েছি "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল, ভক্তভুক্তি-অবশেষ তিন মহাবল,"
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে "উচ্ছিষ্ট ভোজিনোদাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।" গুরুপদধূলি অবশ্য পেয়েছি, তিনি যেখানে পদ-চারণা করেন, সেখানকার জলও হয়তো কখনো গ্রহণ করেছি, কিন্তু উচ্ছিষ্ট বা 'ভুক্তি-অবশেষ' রূপ প্রসাদ খুব কমই লাভ হয়েছে ভাগ্যে। আজ শুভক্ষণে প্রভাত হয়েছিল আমার, সেই গুরু-ভুক্তি-অবশেষ-মহা-প্রসাদ পেয়ে ধন্য হলাম।

২৬শে আষাঢ় সন্ধ্যা সাড়েছটা। মেজদাদা ও ছোটদাদা হরিলুট নিয়ে বাড়ী চলে গেছেন। মন্দিরে আর কেউ নেই। আমি এক কোণে চুপ করে ব'সে আছি। সহসা গুরুদেব তানপুরাটি নিয়ে তাতে ঝঙ্কার তুলে আপন মনে সুধাঝরা কণ্ঠে গাইলেন:

"কেন রে ভাই জীবন কানাই, ব্রজপুরে যাবিনে—
ব্রজে গিয়ে মা যশোদারে আর কিরে মা বলবিনে?"

গুরুদেবের সে সুধাকণ্ঠধ্বনি মন্দিরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সেই করুণা-রস-সিক্ত সুধাকণ্ঠস্বর আমার সমস্ত অন্তরকে যেন কৃষ্ণ-অনুরাগে অভিষিক্ত ক'রে তুলল। 'জীবন-কানাই'-কে যেন গুরুদেবের গুহামন্দিরের অভ্যন্তরে তাঁর সম্মুখে দেখলাম, হাসিমুখে সে যেন গুরুদেবের অমৃতময় গান শুনছে। এই যে অনুভূতি—এ শুধু চিন্তা-দ্বারা মনে জাগ্রত করা যায় না কোনো কালে; এ অপ্রাকৃত অনুভূতির প্রকৃত স্পর্শ হয় চিত্তে, বিনা চেষ্টায়, বিনা চিন্তায় সে অনুভূতি স্পষ্ট-হয়ে উদিত হয় গুরুকৃপা-লোকোজ্জ্বল চিত্তাকাশে।

২৫শে থেকে ২৯শে শ্রাবণ যথারীতি ঝুলন-উৎসব হ'ল। উৎসবে ঠাকুরঘর সাজানোয় আমার প্রবল আগ্রহ ও আনন্দ। ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে ফুল, পাতা, ইট, সুরকী দিয়ে নকল বৃন্দাবন সাজালাম ঠাকুরবারান্দায়। ফোয়ারা করলাম একপ্রকার লতাগাছের নল দিয়ে। নানাবিধ জাপানী পুতুল কিনে নিয়ে এলাম বাজার থেকে। তার মধ্যে দুটি পুতুল (Spring দেওয়া) দেখে গুরুদেব বালকভাবে এতই বিভোর হয়ে গেলেন যে প্রায়ই তার মধ্যে একটি পুতুলের বাজনা-বাজানো ও তালে তালে মাথানাড়া দেখে আনন্দ পেতেন, ঠিক পাঁচ-বছরের বালকের মতই। আমরা দুপাশে নকল রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরিগোবর্দ্ধন সাজালাম। নকল কুণ্ডে খেলনার হাঁস চরতে লাগল, ফোয়ারা উঠতে লাগল। সুরকীর রাস্তায় গোপিনীরা জল নিতে আসছে, পাহাড়ে বাঘ হরিণ খেলা করছে—এই সব দৃশ্যসজ্জা করলাম। গুরুদেব কখনো কখনো ঠাকুর ঘরে এসে ঝুলন দোলায় ঠাকুরকে দোলাতেন এবং আমাদের ঝুলন-সজ্জা আগ্রহ সহকারে দেখতেন। এতে আমাদের আনন্দের আর

সীমা থাকত না। শিষ্য ও ভক্তসমাগম বেশ ভালই হ'ল। পূর্ণিমার দিন মালসাভোগ ও দরিদ্রনারায়ণসেবা উৎসব হ'ল।

৫ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর উপবাস। উপবাসে খুব আনন্দ হয়েছিল। পরদিন যথারীতি নন্দোৎসব হ'ল পূর্ব্ববৎসরের মতই। গুরুদেব প্রথমে নন্দোৎসবের গান সুরু করলেন। তারপর মেজদার সঙ্গে গাইতে গাইতে গুরুদেবকে পুরোভাগে রেখে আমরা সবাই মণিপুর আশ্রম ঘুরে এলাম।

৭ই ভাদ্র শনিবার একাদশীর দিন বেলা একটায় শ্রীগুরুদেব বিদ্যানগর যাত্রা করলেন। মৌগুরার খাল দিয়ে নৌকা চলল; তারপর কালীনগরের পাশে এসে পড়লাম। ক্রমে সমুদ্রগড়ের পুলের নীচে এলাম, সেখান থেকে পোলতা ছাড়িয়ে বিলে গিয়ে পড়লাম। দেখি চারদিক জলময়। মাঝে মাঝে ধান ও পাটের ক্ষেত অর্দ্ধ-নিমগ্ন অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। এই বিলে অনেকক্ষণ চলার পর আমরা বিদ্যানগরে এসে পৌঁছলাম। বিদ্যানগরের মন্দিরে গৌর নিতাই বিগ্রহ এবং একটি বৃক্ষতলে মহাপ্রভুর পড়বার স্থান দর্শন করলাম। মহাপ্রভু যে গাছতলায় বসতেন, সেটি তখনও বর্তমান। গাছের গোড়াটি বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা গুরুদেবের সঙ্গে সেই গাছতলায় প্রণাম করলাম এবং কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করলাম। গুরুদেব সকলকে হরিলুট বিতরণ করলেন। তারপর আমরা ঠাকুর মন্দিরে এলাম। ঠাকুর সেবাইতগণ গুরুদেবকে সশ্রদ্ধ ও সাদর সম্বর্দ্ধনা জানালেন। গুরুদেব তাদের প্রচুর হরিলুট দিয়ে তৃপ্ত করলেন। তারপর বেলা চারটার সময় পুনর্যাত্রা করা হ'ল। আসবার সময় পথের দৃশ্য বড়ই মনোরম লাগল। পোলতার খাল বরাবর এসে রেলওয়ে পুলের নীচে দিয়ে গঙ্গায় পড়লাম। ভরা ভাদ্রের গঙ্গা বড়ই ভীষণ, অথচ সুন্দর। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে; সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে চার দিক ঢেকে গেছে। সামনে-পিছনে, আশে পাশে বেশীদূর দৃষ্টিগোচর হয়না; শুধু নৌকার দাঁড়ের জল কাটার শব্দ ঝপ্ ঝপ্ করে সেই সান্ধ্য-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে।

গুরুদেব তখন সকলকে গান করতে আদেশ করলেন। তাঁর আদেশ পেয়ে নৌকায় যারা ছিল সকলে মিলে কীর্ত্তন গান সুরু ক'রল। গান শুনতে শুনতে আমরা এগিয়ে চল্লাম। ক্রমে তেঘরির ঘাট পেরিয়ে শ্মশান ঘাট, আমাদের মণিপুর আশ্রমের নীচে দিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম। নৌকায় মাঝে মাঝে আমরা গুরুদেবের জয়ধ্বনি দিচ্ছিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাত নৌকা গুহাশ্রমের ঘাটে ভিড়ল। গুরুদেবের জয় দিয়ে আমরা নেমে পড়লাম। এইভাবে গুরুদেবের প্রথমবারের বিদ্যানগর ভ্রমণ সমাপ্ত হল।

১৮ ভাদ্র বুধবার শ্রীগুরুদেব নিঃশঙ্ক আশ্রম যাত্রা করলেন। সঙ্গে হৃষীদাদা গেলেন। আমাকে কিছুতেই সাথে নিলেন না, অনেক কাকুতি মিনতি করা সত্ত্বেও। সেজন্য তখন

দুঃখ ও অভিমানে মুষড়ে পড়লাম। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা প্রভু যে আমার কল্যাণের জন্যই আমাকে রেখে গেলেন,—সামান্য জীব আমি, আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানে আমি তখনো তা' বুঝতে পারিনি। এক অজ্ঞান, অধম, হীন জীব হয়ে সেই শ্রীনিকেতন শ্রীগুরুর প্রতি কত রাগ অভিমানই করেছি, কিন্তু তবু তিনি এই পতিতের উপর বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ হননি, ভর্ৎসনা না করে আদরসোহাগই করেছেন; তিনি বলেছেন, "ও রাগ করে আমারই জন্য, ওর নিজ স্বার্থভঙ্গের জন্য নয়।" আমি যখন গুরুর চরণ ধ'রে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম, তিনি আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন এবং বল্লেন, "তোমার জন্য আমি বড়ই দুঃখ পেলাম। কিন্তু গুরু যা' করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন—এইটুকু বিশ্বাস রেখে স্থির হয়ে থেকো।"

২৫শে ভাদ্র তপোবনে পৌঁছলেন গুরুদেব। ২৬শে ভাদ্রই আমাকে পত্র দিলেন। আমি এখান থেকে যে আনারসের পার্শ্বেলটি গোমোয় redirect করেছিলাম, সেটি সেখানে ঠিকমত পৌঁছানোর সংবাদ পেলাম। গুরুদেব পত্রে আমাকে নবদ্বীপ গুহাশ্রমের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন এবং যাতে কোন বিবাদ-বিসংবাদ না হয়, শান্তিতে চলে তা দেখতে বলেছেন। আমার বিপদ আসন্ন; —তাই বুঝে শ্রীগুরুদেব পর পর দুখানি চিঠি দিলেন আমাকে ৩১শে ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন।

পুনরায় আমার শিয়রে শমন এসে দাঁড়াল। ১লা আশ্বিন হঠাৎ শরীর এত খারাপ হ'ল যে মৃতের মত হ'য়ে গেলাম। ২রা উঠবার ও কথা বলবার শক্তিও লোপ পেল। বাড়ীর সকলে আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিল।

এই অধম মহাপাপীর প্রতি শ্রীগুরুরাধাগোবিন্দের কত করুণা দেখুন। ২রা রাত্রি ভোরে শ্রীগুরুদেব স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হলেন। সবিস্ময়ে দেখি—শ্রীশ্রীগুরুদেব যুগল শ্রীরাধাগোবিন্দরূপে পরিবর্ত্তিত হলেন—সেই জগৎ-জননী শ্রীরাধারাণী করুণা-ঘন-নয়নে চেয়ে বল্লেন, "বাছাকে দুটি খেতে দিই," এই বলে আমাকে অনেক খাওয়ালেন।

এ নিভৃত সংবাদ আমি ও আমার অন্তর দেবতা ছাড়া আর কেউ জানল না। আমি বুঝলাম তাঁরা এ যাত্রা আমাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু বাটিস্থ সকলে আমার অবস্থা দেখে গুরুদেবের কাছে লোক পাঠাতে মনস্থ করলেন। ৪ঠা আশ্বিন লোক পাঠানো হ'ল এবং ৬ই আশ্বিন সে এখানে ফিরে এল। গুরুদেব তার মার্ফৎ ঔষধ ও পত্র পাঠিয়েছেন। পত্রে আমার অসুখের জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ ক'রে লিখেছেন, সেবার গোমো আশ্রমেও প্রায় সকলেই অসুস্থ এবং গুরুদেবও বেশ শান্তিতে ছিলেন না। শুনে আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। ৯ই বৃহস্পতিবার রাত্রে গুরুদেব রাত্রে একবার ক্ষণমাত্র দর্শন দিয়ে হাসতে লাগলেন। অন্তরটা বড় আকুল হয়ে উঠল গুরুদেবেরে জন্য, তাঁর কুশল জানবার জন্য ১০ই শুক্রবার গোমো তপোবনে আবার লোক পাঠালাম। এদিকে ১১ই

রাত্রেও স্বপ্নে দেখলাম গুরুদেবের শরীর সুস্থ নয়, আমি তাঁর চরণ দুটি ধরে খুব কাঁদতে লাগলাম, তাঁর চরণ সেবা করতে লাগলাম। তিনি অনেক স্নেহে আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন এদিকে ১৩ই আশ্বিন আমার প্রেরিত লোক ফিরে এলে জানলাম, আমার স্বপ্ন একেবারে খাঁটি সত্য এবং আমার আকুলতা আদৌ অমূলক নয়; কয়েকটি পাহাড়িয়া ভীমরুল গুরুদেবের হাতে হুল ফুটিয়ে দিয়েছিল এবং তার ফলে তিনি কয়েক-দিন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

কোন বহিঃসংযোগ ব্যতীতও অন্তরের সুখ দুঃখ ব্যথা-বেদনা অনুভবের সংবাদের এই যে আদান প্রদান,—এই আন্তর্যোগাযোগ, ভক্ত ও ভগবানের নিঃস্বার্থ প্রীতি-সম্বন্ধের একটি অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। ভক্তগণ তা নিরন্তর অনুভব করেন; এবং তাঁর একজন হীনাতিহীন দাস অভিমানী আমিও বহুবার সে অনুভূতি প্রত্যক্ষ করেছি।

এই সময়ে গোমো তপোবনে দুর্গাপদ বাবুরা এসেছিলেন। গুরুদেব আমাকে পত্রে লিখলেন, "ওদের কত বল্লাম, নবদ্বীপে যাও, কিন্তু কিছুতেই গেল না।" গুরুদেবের সঙ্গে দুর্গাপদ বাবু লিখলেন যে, ওঁরা ওখানে আট দিন ছিলেন। আমি সেখানে না থাকাতে ওঁদের কোন অসুবিধা তো হয়ই নি, বরং গুরুদেব আরও যত্ন, আরও আনন্দ দিয়েছেন ওদের। করুণাময় শ্রীগুরুদেব দুদিন আগে থেকেই সেই নির্জন ঘরটি, ওঁরা আসছেন বলে পরিষ্কার করিয়ে রেখেছিলেন। গুরুদেব নিজ শ্রীহস্তে পরিবেশন ক'রে ওঁদের খাইয়েছেন। এই মহাপাপীর কত নাম করেছেন, এবং এই অধম দাসের চিঠি এনে ওঁদের দেখিয়েছেন এবং মাথায় ক'রে কত নেচেছেন। দুর্গাপদবাবুর চিঠিটি পড়ে দৈন্যে ও লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা হ'ল। স্বয়ং ভগবান হয়ে এক মহাপাপী নরকের কীটানুকীটের প্রতি এ কী করুণা, এ কী স্নেহ!

এরপরে আরও তিন খানি চিঠি লিখলেন আমাকে গুরুদেব। শেষ চিঠি লিখলেন নবদ্বীপে তাঁর শুভাগমনের দিন স্থির ক'রে। তিনি লিখেছেন ২০শে কার্ত্তিক বুধবার তিনি নবদ্বীপ গুহাশ্রমে শুভাগমন করবেন। রাত্রি ৯টা ও ১০ টায় দুখানি ট্রেন দেখতে বলেছেন। ঠিকানাটি শ্রীগুরুদেব স্বহস্তে লিখেছেন।

শ্রীগুরুদেব ঐ তারিখেই নবদ্বীপে এলেন বটে, কিন্তু আমরা কেহই ষ্টেশনে উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে পারিনি। কারণ গুরুদেব নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই, অর্থাৎ বিকাল পাঁচটার ট্রেনে নবদ্বীপ পৌঁছালেন নিঃশঙ্ক আশ্রম হয়ে। গুরুদেবের যাতায়াতে এরূপ অনিশ্চয়তা প্রায়ই ঘটিত, কারণ তাঁর লীলা ছিল বালকবৎ নিছক আনন্দময়, খেয়ালখুসীভরা খেলামাত্র।

তখন আমি দ্বিতীয়বার মৃত্যুযোগ কাটিয়ে উঠেছি। নিবু নিবু দীপশিখা সবেমাত্র পুনরুজ্জীবিত হয়ে তার ক্ষীণপ্রভায় মিট মিট করছে। এখনও চলতে ফিরতে ট'লে

পড়ি। এমন সময়ে শুভাগমন হল—আমার প্রাণের প্রাণ, আমার হৃদয়ের নিধি, আমার অন্তর দেবতা, আমার গুরুদেবের। সেই নিবু নিবু দীপশিখা যেন কী এক বৈদ্যুতিক সংস্পর্শে দপ্ করে জ্বলে উঠল আবার। এক অপ্রাকৃত আনন্দপ্রেরণায় ছুটে এলাম আশ্রমে। শ্রীগুরুদেবকে দর্শনমাত্র সমস্ত রুদ্ধ আবেগ আমার উন্মুক্ত হ'ল অশ্রুজলে। মনে মনে বললাম, "হে গুরুদেব, হে প্রভু, হে অন্তরতম, কী ব'লে তোমায় প্রণাম জানাব, কী মন্ত্রে তোমার পূজা করব ; এ চোখের জল ছাড়া আর কোন্ ফুল তোমার চরণে অর্ঘ্য দেব ?" একবার দর্শন ও চরণস্পর্শনমাত্র যেন নতুন জীবন নিয়ে নতুন জগতে ফিরে এলাম। যতক্ষণ সম্ভব গুরুদেবের কাছে কাছেই আছি। এ কী আনন্দ, এ কী উৎসাহ! সাধারণ লৌকিক জগতের লৌকিক আনন্দের সঙ্গে এর যে মূলগত পার্থক্য আছে, তা বেশ স্পষ্টই অনুভূত হয়। কিছুদিন অদর্শনের পর পুনর্দর্শনে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এরই নাম বোধহয় অপ্রাকৃত বা অকৈতব আনন্দ। ২১শে, ২২ শে, ২৩শে কার্ত্তিক—এই তিন দিন মনে হ'ল যেন কী এক আনন্দরূপ অমৃতধারায় ডুবে আছি। নিত্য সেই রসপানে বিভোর হয়ে আছি। গুরুদেবের সেই মধুকণ্ঠের 'হরি-বোল' ধ্বনি, আর সোহাগ-মাখানো 'সুরেনধন', 'সুরেন ধন' আহ্বান যেন সমস্ত মনপ্রাণকে সুধারসে সিক্ত করে রেখেছে। একী আনন্দ, একী আনন্দ! এমন আনন্দধাম ছেড়ে কেউ কি কোথাও যায় ?

৯ই অগ্রহায়ণ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে তাঁর আসনঘরের ছাদে বেড়ালাম। কী যে আনন্দ হচ্ছিল। গুরুদেবকে ছাদের আলিসায় আসন পেতে দিয়েছিলাম ; তিনি রোদে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন, আর আমি তার সামনে ব'সে তাঁর নির্দ্দেশমত পত্র লিখছি। এই নির্জ্জন পরিবেশে আনন্দময় প্রভুর সঙ্গে অবস্থিতি এক অপূর্ব্ব আনন্দ শিহরণে সমস্ত মন প্রাণ আমার উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলছিল।

রাত্রে স্বপ্নে শিক্ষা-মন্ত্রের আভাস পেলাম। ১৬ই অগ্রহায়ণ রাত্রে স্বপ্নে দেবী-মূর্ত্তি সহসা প্রকট হয়ে কথা বললেন। সে দেবী-বাণী এখনও আমার কানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দেবী বললেন, "বৎস, গুরু তোমাকে কৃপা করছেন, কিন্তু তুমি কর্মদোষে সে কৃপা হ'তে আংশিক বঞ্চিত হচ্ছ।"

৪ঠা মাঘ শ্রীগুরুদেব বেলা বারোটার ট্রেনে নিঃশঙ্ক আশ্রম যাত্রা করলেন। আমাকে গুহাশ্রমে থাকতে ও সমস্ত দেখাশুনা করতে নির্দ্দেশ দিয়ে গেলেন।

১১ই মাঘ শনিবার। পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্নে শ্রীগুরুদেবের দর্শন ও আনন্দলাভ। অদ্য সকালে শ্রীগুরুদেবের পত্র পেলাম। পত্রটি আগাগোড়া নিজ শ্রীহস্তে প্রভু আমাকে লিখেছেন। চিঠিটি পেয়ে মাথায় ঠেকিয়ে নয়নজলে ভাসতে লাগলাম। ভাবলাম কোথায় সেই পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগুরুদেব—আর কোথায় এই অধম, মহাপাপী,

নরকের কীটানুকীট। চিঠিতে আমার বাড়ীর সকলকে, মেজদাদাদের ও আশ্রমের সকলকে আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন এবং আশ্রমে মাটিফেলার কাজের জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছেন। পত্রে একস্থানে লিখেছেন, "কম দরের (৵৹) মজুর পাইলে কাজ করাইবে।" গুরুদেবের স্বহস্ত লিখিত এই বাণীটি সকল শিষ্যের প্রণিধানযোগ্য। গুরুদেব তো স্বয়ং ভগবান্, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তাঁর গৃহে বাঁধা। তিনি তো বলতে পারতেন, "খরচ যা লাগে লাগুক, ভাল ক'রে কাজ করাবে, খরচের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে না, ইত্যাদি।" কিন্তু তিনি তা লিখেননি। তিনি কম দরের দিকেই জোর দিয়েছেন এবং শিষ্যদেরও তাই আদেশ করেছেন। গুরুদেব স্বয়ং শ্রীমুখে বহুবার বলেছেন, "গুরুর কাজ শিষ্যের নিজের কাজ ব'লে মনে করা উচিত এবং একটি পয়সা যাতে অপব্যয় না হয় তা প্রত্যেক শিষ্যেরই দেখা কর্ত্তব্য। গুরুর একটি পয়সা নিজের গায়ের রক্ত ব'লে মনে করবে।" গুরুর এই মহান্ উপদেশ কৃপণতা শিক্ষা করানো নয়, পরন্তু গুরুকে যাতে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞান হয়, তদুপযুক্ত মর্য্যাদা, শ্রদ্ধা ও সম্মান যাতে তাঁর প্রতি প্রদর্শিত হয়, তাঁর সহিত আত্মসম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তার অনুকূলতা করবার জন্যই এই শিক্ষা। গুরুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁর এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। নতুবা কিছুতেই প্রকৃত গুরুতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় না।

পত্রটির ঠিকানাও গুরুদেব নিজহস্তে লিখেছেন; শিরোনামায় লিখেছেন, "হিতোপদেশদাতা"; চিঠির প্রারম্ভে লিখেছেন "সুরেন্দ্র ধন"। আমার যে ভাগিনাটি (গৌর) গুরুদেবকে বেশ পছন্দমত বেদানা কিনে এনে দিত, তাকে লিখেছেন, "বেদানা-খরিদ্দার বাবা"; ভৈরবদাদাকে লিখেছেন "টেলিগ্রাফ বড়বাবু" ইত্যাদি।

১৩ই মাঘ। পূর্ব্বরাত্রে শ্রীশ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব দর্শনানন্দ। গুরুদেবকে মন্দিরের ভিতর প্রণাম করলাম; দেখলাম তিনি বেশ সুস্থই আছেন।

১৮ই মাঘ। পূর্ব্বরাত্রে সমস্ত রাত্রিই স্বপ্নযোগে শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলাদর্শন করেছি। আমি যে নিদ্রিত এবং স্বপ্নদর্শন করছি—এ কথা বুঝতেই পারিনি। সর্ব্বশেষে গুহার সিঁড়িতে গুরুদেবকে দর্শন, প্রণাম ও পরমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হলাম। এই যে সব স্বপ্ন দর্শন—এর একটিও নিজমনের চিন্তাপ্রসূত নয়; নিজস্ব ভাবনাজাত স্বপ্ন ও এই স্বপ্নের পার্থক্য খুব স্পষ্ট বোধগম্য হয়। গুরুদেব কর্তৃক স্বয়ং-স্ফুরিত এই সব স্বপ্নযোগে যে অপ্রাকৃত আনন্দের আস্বাদন হয়, তা নিজ চিন্তা প্রসূত স্বপ্নে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

শ্রীশ্রীগুরুদেব এইদিন অর্থাৎ ১৮ই মাঘ সন্ধ্যার ট্রেনে নবদ্বীপ গুহাশ্রমে শুভাগমন করলেন। শ্রীগুরুদেবকে ফিরে পেয়ে আবার আনন্দে মেতে উঠলাম। আশ্রমের দৈনন্দিন কার্য্যে আবার আত্মনিয়োগ করলাম।

এদিকে আমার অন্তরজগতে আলোড়ন হ'তে শুরু হয়েছে। হতাশা ও ব্যর্থতা, অশান্তি ও আকুলতার গভীর অন্ধকার ভেদ ক'রে নিবিড় শান্তির উৎসস্থল ধর্মরাজ্যের সীমারেখা যেন কী এক নবারুণালোকে আমার নয়ন সমুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অপরিসীম দৈন্যের অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, "ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব-কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ?" যেন সকাতরে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে "মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চনঃ, পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ?" দৈন্যে প্রাণ ভ'রে উঠল, আর্ত্তিতে প্রাণ হাহাকার ক'রে উঠল। হায়, হায়। এ মহাপাপীর গতি কী হবে ? সেই করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ, সেই দয়াময়ী শ্রীরাধারাণী কি এই অধম, এই নরকের কীটকে দয়া করবেন ? সর্ব্বদাই এইরূপ দৈন্য অনুভূতি হ'তে লাগল। শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণ ধ'রে কেবলই মা, মা ব'লে কাঁদতে লাগলাম।

২৯ শে মাঘ—রাত্রি ভোরে শ্রীরাধারাণীরূপে জগজ্জননী আমায় দর্শন দিলেন—সে দর্শনানন্দে সারা দিন মুহ্যমান হ'য়ে রইলাম।

৩০শে মাঘ—স্বপ্ন দেখলাম, এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি, সব স্বপ্ন মানস-চিন্তা প্রসূত নয় ; কিছু কিছু স্বপ্নে শ্রীভগবান তাঁর চিন্ময় স্বরূপের প্রতিবিম্ব কৃপা ক'রে ভক্তচিত্তে প্রতিফলিত করেন, সেই সব স্বপ্নের অপ্রাকৃত আনন্দানুভূতিই তার সাক্ষ্য বহন করে। আজো সে স্বপ্নের সবকিছু দৃশ্য চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভাসছে। দেখলাম—একটা বাড়ী, সারি সারি কয়েকখানা ঘর। সে বাড়ীতে আমার মা রাধারাণী আছেন, আর তাঁর শিশুপুত্র আমি আছি। মা কত কাজে ব্যস্ত আছেন, আর আমি মায়ের পিছু পিছু ফিরছি। কিছুক্ষণ পরে এলেন গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণ। আমার মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার পর বললেন,"ছেলেটা কোথায় ?" মা হেসে বললেন, "কোথায় আর থাকবে ? আমার পিছু পিছুই ঘুরছে। কেবল মা, আর মা। মা ছাড়া কি একদণ্ড কোথাও থাকতে পারে ?" আড়াল থেকে মায়ের কথা শুনে আমি লজ্জায় এক কোণে গিয়ে লুকালাম। কিন্তু এই বাড়ীর সামনে ঠিক দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে—ওটা কী ? ওযে আমাদের গুহাশ্রমের মন্দির, বহু পুরাতন সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, মাটিতে অর্দ্ধেকটা প্রোথিত, অর্দ্ধেকটা উপরে জেগে আছে, ভিতরটা সব মাটিতে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। আর তার ওপাশে বাঁশবন,| নিবিড় জঙ্গল ॥

মাঘীপূর্ণিমার দিন অপূর্ব্ব সুধা-ঝরা কণ্ঠে গুরুদেব গাইলেন :

"কবে আমার আমি ভুলে যাব, তোমার আমি হ'য়ে রব—
সেদিন আমার কবে হবে হরি ?
কত গুণের তুমি আমার, ওহে সর্ব্বগুণাধার,
কেমনে তোমারে পাসরি ?"

তানপুরায় ঝঙ্কার দিতে দিতে গুরুদেব গাইছিলেন—সে অপূর্ব্ব সুর-লহরী মন্দির মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে এক অপ্রাকৃত পরিবেশের সৃষ্টি করছিল। শ্রীগুরুদেব তখন সুরে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন, ভাবে বিভোর হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েছেন। তাঁর অর্দ্ধমুদিত নয়নে, তাঁর স্মিতবিকশিত বয়ানে যে বিচিত্র ভাবতরঙ্গের ক্রীড়া চলছিল, সে অনুপম মাধুরী যে একবার দেখেছে সে কখনো ভুলতে পারবে না। সে মধুকণ্ঠ ও সে ভাবলীলাকল্লোলিত বদনখানি স্মরণ করলে আজো যেন সমস্ত মনপ্রাণ মধুময় হয়ে ওঠে।

সিদ্ধ সাধুগুরু-সঙ্গ ও তাঁর নিঃস্বার্থসেবায় যে কী অমৃত ফল ফলে, তা' একমাত্র সেই সব দুর্লভ ভক্তগণই অবগত আছেন, যাঁরা সেরূপ সঙ্গ ও কৃপালাভ করেছেন। সাধারণ মানুষ আমরা আমাদের চক্ষুকর্ণ আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে-জগতের অনুভূতি লাভ ক'রে থাকি, আমাদের সেই চিরপরিচিত ভুবন হঠাৎ একদিন নতুনরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যে-রূপের ধারণা সুদূর কল্পনালোকেরও বহির্ভূত। পাখীর কূজনে, পাতার মর্ম্মরে এক নতুন আনন্দবারতা শুনতে পেয়ে মন পুলকিত হয়ে ওঠে ; এক অতীন্দ্রিয় আনন্দ-ঘন রসের তুলিকার স্পর্শে মন যেন চিত্রিত হয়ে আনন্দময় রূপ ধারণ করে ; মনে হয় এতো সেই পুরানো পৃথিবী নয়— এ কোন্ আনন্দঘন নব ধরণীর সংস্পর্শে এলাম—যেখানে যা' কিছু দেখি সবই রূপময়, যা' কিছু শুনি সবই মধুময়, যা' কিছু আস্বাদ করি সবই অমৃতময়!! এদিকে ধর্মগ্রন্থে যেসব বাণী প্রচারিত রয়েছে, আবহমান কাল থেকে সবাই তা' শুনছে, পণ্ডিতেরা তার ব্যাখ্যা করছে ; কিন্তু সাধুগুরুসঙ্গপ্রভাবে সে সব ধর্মকথার নতুন তাৎপর্য্য হঠাৎ মানস জগতে বিকশিত হয়ে ওঠে। যা' কখনো ভাবিনি, কখনো শুনিনি, সেই সব অশ্রুত বাণী, অকল্পিত ভাবার্থ স্পষ্ট চোখের সমুখে ফুটে ওঠে। যাঁরা Maeterlink-এর Blue Bird পড়েছেন, তাঁরা আমার কথার তাৎপর্য্য কিছুটা বুঝতে পারবেন। কিন্তু সেই Blue Bird যে কী বস্তু, এবং সেই কল্পিত Blue Bird বাস্তবে কারো লাভ করা সম্ভব কিনা, তা' বোধ হয় Maeterlink-ও ভাবতে পারেননি। কিন্তু আমি সেই Blue Bird বা তার চেয়েও অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার বাস্তবে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করেছি ; এবং তা' সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমার সিদ্ধ সাধু গুরুর সঙ্গজনিত কৃপা-প্রভাবে। অপর কারো এরূপ অনুভূতি হয়েছে কিনা জানিনা ;

কিন্তু আমার তা হয়েছে এবং অত্যন্ত প্রকট ও স্পষ্টভাবেই হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে অনুভূতির অনুরণন আজো আমার হৃদয়তন্ত্রে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে; এবং যতদিন স্মৃতি জাগ্রত থাকবে কখনো তা বিস্মৃত হ'বনা।

এই যে অনুভবের কথা বলা হ'ল—এটি ভাবনাজাত অনুভব নয়। কোনরূপ চিন্তা-শক্তি দ্বারা এ অনুভূতি লাভ করা যায় না। পরন্তু শ্রীভগবৎকৃপালাভ হ'লে, তাঁর স্বরূপ-শক্তিজাত বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত ভক্তচিত্তের স্পর্শ হয়ে থাকে। এইরূপে সেই ভক্তচিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্বের সহিত 'তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত' হ'লে তখন সেই চিত্তে এই সকল চিন্ময় অনুভূতি 'স্বয়মেব স্ফুরতি', চেষ্টা বা চিন্তাদ্বারা এ উপলব্ধিলাভ কখনও সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ভক্তিরস বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীরূপগোস্বামী স্পষ্টই বলেছেন, "ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভূঃ, হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ" ভ. র. সি. ২.৫।৭৯, অর্থাৎ ভাবনার পথকে অতিক্রম করতঃ চমৎকারাতিশয়ের আধার স্বরূপ হয়ে যা সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে আস্বাদিত হয়, তাই রস। সুতরাং এ অনুভব হৃদয়ে শুদ্ধ-সত্ত্বের অস্তিত্ব জ্ঞাপক অনুভব—এই স্পর্শজনিত শুদ্ধসত্ত্বের অস্তিত্ব লাভ একমাত্র সিদ্ধ সাধু গুরুকৃপাতেই সম্ভব।

আমার জীবনে এরই শুভসূচনা সুরু হ'ল এ বৎসর ৪ঠা ফাল্গুন থেকে। 'শরণাগত' কথাটা সবাই শুনেছেন। এই সামান্য সাধারণ কথাটা নিয়ে কেউ কি কখনো মাথা ঘামিয়েছেন? কিন্তু তখন হঠাৎ আমার মনে হ'ল, গুরুর 'শরণাগত' কি আমি হ'তে পেরেছি? আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু করি, জিহ্বা দ্বারা যা কিছু বলি, মন দ্বারা যা কিছু চিন্তা করি—সবই কি আমার গুরুসেবার 'আনুকূল্য' বিধান করে? কিছুই কি গুরুসেবার প্রতিকূল নয়? আমি কি তাকে আমার 'একমাত্র রক্ষক ও প্রভু' ব'লে মনে করতে পেরেছি? তিনি ছাড়া আমি কি আর কাউকেও আমার বন্ধু বা হিতকামী ব'লে ভাবিনা? গুরুই আমাকে সর্ব্ব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, এ দৃঢ় বিশ্বাস কি আমার হয়েছে? আমি কি 'হা গুরু, আমাকে রক্ষা কর ব'লে আর্ত্তি প্রকাশ করতে পারছি? আমি কি আমার বলতে যা কিছু—আমার দেহ, মন, অহংকার, বিদ্যা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব—সবই গুরুকে 'তিলতুলসী' দিয়ে সমর্পণ করতে পেরেছি? হরিভক্তিবিলাস-কথিত সেই 'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ, প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্, রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা, আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিঃ" আমার হয়েছে, না সেই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা, হ'তে পেরেছি? ভাবি, কেবলই ভাবি, কৈ তা তো হ'তে পারিনি। অনেক ফাঁক থেকে গেছে তো। তবে কেমন ক'রে তাঁর হ'ব? দুঃখে, চিন্তায়, উদ্বেগে আমার মন ভ'রে ওঠে। কাঁদি, কেবলই কাঁদি। এখনও অনেক দূরে আছি, তাঁর চরণ পাবার যোগ্য

হ'তে এখনও অনেক দেরী আছে। হা গুরু! এ মহাপাপীর কী গতি হবে? যদি আপনার 'শরণাগত'ই হ'তে না পারলাম, তবে তো সবই বৃথা। কেমন ক'রে এ দুস্তর ভবসাগর পার হবার আশা করব? কেমন ক'রে তাঁর চরণলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করব? সদা সর্বদাই মন এই দুঃখে, এইরূপ করুণ দৈন্যে ভারী হয়ে থাকে। এদিকে নিয়মমত সব কাজই ক'রে যাই। গুরুর কাছে কাছে থাকি। তাঁর আদেশ ও বাক্য অনুরূপ কাজ করি। তাঁর দুটি রাতুল যুগল চরণ সর্বদাই দর্শন করি। জপধ্যান করি, গুরু প্রদর্শিত পন্থায় যোগমার্গের সাধনও যথারীতি ক'রে যাই—আর কেবলই কাঁদি—হে প্রভু! এ অধমের কি কোনো গতি হবে না? কেমন ক'রে তোমার শরণাগত হব, প্রভু? সেইদিন রাত্রিভোরে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখলাম: দেখলাম গুরুদেব যেন ব্রজের গোপাল; আর আমি যেন বাৎসল্যভরে তাঁকে কোলে ক'রে তাঁর সেবা করছি! এক অননুভূতপূর্ব বাৎসল্যরসধারায় সমস্ত হৃদয় আমার ভ'রে উঠল। গুরুদেবের পাশেই বালিকা বেশী শ্রীরাধারাণী মায়েরও দর্শন পেলাম। নিদ্রাভঙ্গের পর সে ভাব যেন মন থেকে কিছুতেই যেতে চায় না, যেন আঠার মত মনে লেপটে থাকল, সারাদিন সেই ভাবের ঘোরে বিভোর হয়ে থাকলাম।

আজ হঠাৎ গুরুদেব একটা অপূর্ব বাণী শোনালেন—"যদি সৎগুরু পায়, ভ'জে লয়, মরণের ভয় রবে না।" সারাদিন ধ'রে আমার সমস্ত অন্তঃকর্ণ ভ'রে সেই বাণীর অবিরাম অনুরণন শুনতে লাগলাম; মনে হল এতো আর 'যদি' নয়, সত্যিই তো সৎগুরু পেয়েছি, কিন্তু তাঁকে ভ'জে নিতে পারব কবে, কেমন ক'রে?

১৭ই ফাল্গুন গুরুদেব উপদেশ দিলেন। বিনা জিজ্ঞাসায় আপনিই যেচে শিক্ষা দিলেন। বুঝলাম—অন্তর-বাহির একই সুরে বাঁধা। গুরু যখন কৃপা করেন, তখন অন্তরলোকও যেমন এক অদৃষ্টপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, অননুভূতপূর্ব ভাব সমূহের উদয় হয়, বাইরেও গুরুর আচরণ তারই পরিপূরকরূপেই প্রতিভাত হয়। অন্তরে জেগেছে ধর্মজগতের নতুন ভাবোদয়, বাইরেও গুরুদেব অযাচিতভাবে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করছেন। একী অপরিসীম করুণা তাঁর!—ভাবতেও এখন সমস্ত প্রাণ শিউরে ওঠে। গুরুদেব শ্রীমুখে বললেন, "বাবা, গুরু যেপথ দেখিয়েছেন, সেই পথে অটল বিশ্বাস রাখবে। মনে মনে চিন্তা করবে, কোথা থেকে হ'লাম। চিন্তা করো অনুমান, বর্ত্তমান। ধৈর্য ধরতে হবে, বাবা। একেবারে, বা হঠাৎ কোনো কিছুই হয় না, সিঁড়ির মত একটি একটি ক'রে ধাপ উঠতে হবে। স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে একদিনেই কি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলে? সাবধান! যেন পদস্খলন না হয়।"

২৬শে ফাল্গুন সকাল ৬টায় শ্রীগুরুদেব নিঃশঙ্ক আশ্রমে যাত্রা ক'রলেন। গুরুদেব চ'লে গেলেন, সারাদিন তাঁর বিরহদুঃখে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। কিন্তু নিশি-

ভোরে তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করলাম। স্বপ্নে গুরুদেবকে দর্শন পেলাম। আকুল হয়ে তাঁর শ্রীচরণে পতিত হলাম। তার পরই এক অপূর্ব ভাবোদয়। এ কী ভাব, এ কী অনুভূতি! ঠিক এমনি ভাব আর কখনও তো হয় নি। এই ভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মহাভাগ্যবান্ মহাপণ্ডিত মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের মহাপ্রভুর কৃপায় একদিন যে-দশা উপস্থিত হয়েছিল, আমারও আজ এই শুভক্ষণে, জীবনের এই মাহেন্দ্র-মুহূর্তে, সেই "কী যেন কী এক নব ভাবোদয় হৃদয় মাঝারে হতেছে"। তাঁরই মত মনে হ'ল, "বহুদিন শ্রবণে শুনেছি ও নাম, কভু তো হয়নি এমন পরাণ!" ধূলিমাখা হ'য়ে জ্ঞানহারা আনন্দে ভ্রমণ ক'রছি, আর পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দের মত মনে হচ্ছে, "আজ সব ফেলে হরি হরি ব'লে নাচিতে বাসনা জেগেছে।" বইয়ে পড়েছি মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছিলেন। এত উদার হস্তে এই প্রেমদান করেছিলেন যে সে প্রেমের বন্যা ব'য়ে গিয়েছিল, সে প্রেম বন্যায় সম্মুখস্থিত জীবকুল একেবারে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু এ বইয়ে পড়ামাত্র; তার উপলব্ধি কখনো হয়নি। পাঁচশ বছর আগে জন্মালে ও মহাপ্রভুর কাছাকাছি থাকলে হয়তো তার ছিটে-ফোঁটাও এসে লাগত গায়ে। যে প্রেমবন্যায় একদিন 'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু, ন'দে ভেসে যায়' পাঁচশ' বছরের সুদীর্ঘ সময় অতিক্রম ক'রে তার বিন্দুমাত্রও এখন অবশেষ নেই আর। কিন্তু আজ নিশিভোরে আমি যা অনুভব করলাম, সে তো সুস্পষ্টভাবে, সুনিশ্চিতরূপে সেই প্রেমবন্যারই তরঙ্গাঘাত। আমি এ বন্যা-তরঙ্গে ডুবছি, উঠছি—ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচতে নাচতে ভেসে চলেছি। দেহ-মন-প্রাণ, আমার সমস্ত সত্তা এক অননুভূত-পূর্ব আনন্দে আচ্ছন্ন। আনন্দে আমি বাহ্যজ্ঞানহারা, আনন্দে আমি পাগলপারা, যেদিকে তাকাই তাই সুন্দর, তাই আনন্দময়; যা শুনি তাই মধুময়, সঙ্গীতময়; সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিই আনন্দময়, ভিতর-বাহির সবই আনন্দময়। আমি আনন্দে কখনো হাসছি, আনন্দে কখনো কাঁদছি, আনন্দে কখনো নাচছি, আনন্দে আমি বাহ্যসৌজন্যজ্ঞানশূন্য, প্রায় উন্মাদ। মনে হ'ল শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটা তা' হ'লে বৃথাই লেখা হয়নি—এ যে সেই "হসত্যথ রোদিতি রৌতি, গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ" —এ শ্লোক যে আজ আমাকে ঘিরে মূর্ত্ত হয়ে উঠল!

শ্রীগুরুদেব কৃপা করে আজ নিশিভোরে যে অনুভূতির সূচনা করলেন, সেই আনন্দঘনরস আমার সমস্ত দেহে মনে, আমার প্রতি শিরায়, শিরায় আমার প্রতি অণুপরমাণুতে সঞ্চিত হয়ে রইল।

এদিকে শ্রীগুরুদেব নিঃশঙ্ক আশ্রমে পঞ্চমদোলোৎসব সেরে দশম দোল উপলক্ষে

বৈষ্ণবাটি আশ্রমে আগমন করলেন ২রা চৈত্র। ৩রা চৈত্র আমি বৈষ্ণবাটি আশ্রমে পৌঁছলাম।

নবদ্বীপ থেকেই আমার হৃদয়াকাশে যে অপূর্ব্ব ভাবের অরুণোদয় সূচিত হয়েছে, বৈষ্ণবাটি এসেই সেই ভাব-সূর্য্যের পূর্ণ উদয় হ'ল। এক নব ভাবের কিরণ-সুধায় স্নাত হয়ে এক নবীন জন্মলাভ করলাম; ৫ই চৈত্র বুধবার সন্ধ্যা থেকে এই নবভাবের পূর্ণ বিকাশ হল। সম্পূর্ণ এক নূতন ভাবময় ভুবনে প্রবেশ করলাম।

এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবাটি আশ্রমের পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এখানে গুরুদেবের মন্দিরের যে রকম দুরবস্থা, শিষ্যদের থাকার জন্য চালাটির অবস্থাও তেমনি শোচনীয়। এটি মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তার ওপর এখানে কেউ ডেকে খেতে দেয় না, কেউ কারো কোনো সন্ধানও রাখে না। পায়খানা বীভৎস নরক-সদৃশ। স্নানের ব্যবস্থা শ্মশান ঘাটের পাশের ঘাটে, অপরিষ্কৃত গঙ্গার জলে। নবদ্বীপের গঙ্গার পরিষ্কার জলে স্নান করা যাদের অভ্যাস, তাদের পক্ষে এ স্নান ভয়াবহ। মোট কথা বৈষ্ণবাটি আশ্রমে আগন্তুক শিষ্যগণের কোনো সুখ নেই, আনন্দ নেই, আরাম তো দূরের কথা। তাছাড়া আশ্রমের প্রাণ যিনি সেই শ্রীগুরুদেব স্বয়ং তাঁর অতি সঙ্কীর্ণ দর্শনস্থানের মধ্যে অসংখ্য স্বার্থপর শিষ্যের ভীড়ের চাপে পিষ্ট ও ব্যতিব্যস্ত। এই ভীড়ে গুরুদেবেরও যেমন কষ্ট, তাঁর দুঃখ দেখে আমরাও সেইরূপ ব্যথিত; বিশেষতঃ তাঁর দর্শন না পেয়ে বিষণ্ণ ও মর্মাহত। এই সব পরিস্থিতির জন্য, ইচ্ছা ক'রে কেউই বৈষ্ণবাটি আশ্রমে বাস করতে চাইবে না।

কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও গুরুদেব নবদ্বীপ থেকে সত্যহরিবাবুকে (মেজদাকে) প্রতি বৎসর তাঁর সঙ্গে বৈষ্ণবাটি আশ্রমে নিয়ে যেতেন এবং উৎসবে অন্ততঃ দু-তিন দিন তাঁকে রাখতেন। তবে তাঁর জন্য সব ব্যবস্থা ছিল আলাদা। যাতে কোনো দিকে তাঁর কোনো কষ্ট না হয়, তজ্জন্য আশ্রমের সন্নিকটে একটি সুন্দর বাড়ীর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় তাঁর বাসস্থল নির্দিষ্ট ছিল। খাটের উপর গদি তোষকে তাঁর সুকোমল শয্যা, পরিচ্ছন্ন ঘর, পরিষ্কার পায়খানা, টিউব-ওয়েল— সবেরই সুবন্দোবস্ত ছিল। ফলে তিনি বেশ আরামেই থাকতেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও তাঁর কোনো অসুবিধা ছিল না, কারণ তাঁকে সবাই মান্য করত, আদর আহ্বান ক'রে যত্ন ক'রে খেতে দিত। গতবার অর্থাৎ ১৩৪১ সালে গুরুদেবের সঙ্গে আমি বৈষ্ণবাটি আশ্রমে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে সেখানকার সমস্ত অসুবিধার একটি পরিষ্কার সুস্পষ্ট চিত্র তিনিই তুলে ধ'রে আমাকে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু গুরুদেব তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, "মেজবাবা, তোমার তো

'বৈঠকখানা' আছে। সেখানে সুরেনধনকে তোমার সঙ্গী ক'রে নিও।" এ কথায়, মেজদা আর আপত্তি করেন নি ; সুতরাং গতবার আমি তাঁরই সঙ্গী হয়ে বৈষ্ণবাটি আশ্রমে যাওয়ায়, আশ্রমের অসুবিধার কোনো আঁচই আমাকে স্পর্শ করেনি।

কিন্তু এবারে অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে বৈষ্ণবাটি আশ্রমের ওই অসহনীয় অসুবিধা ও মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী স্থানে কেউ কখনো ইচ্ছা ক'রে বাস করতে চাইবে না। এই পরিবেশ প্রত্যেক মানুষকেই বিতৃষ্ণ করবে বা দূরে সরিয়ে দেবে। কিন্তু আমাকে শ্রীগুরুদেব বর্ত্তমানে এমন এক অভূতপূর্ব্ব 'বস্তু' দান করেছেন, যার প্রভাবে এই অত্যন্ত অসহনীয় ও বিভীষিকাময় পরিবেশ বা repellant atmosphereকে আমি যেচে অঙ্গীকার ক'রে নিলাম। এবার আমি সত্যহরিবাবুর সঙ্গে যাইনি। আশ্রমে পৌছে আশ্রমের সেই অতি জঘন্য চালাতেই আশ্রয় নিলাম। ঘরের ভিতর অন্ধকার ; সারা বছর ওঘরে কেউ বাস করে না, নানা জঞ্জালে পরিপূর্ণ ; ঘরের মধ্যে একটা ভাপ্‌সা দুর্গন্ধ, বেশীক্ষণ থাকা যায় না, থাকলে মনে হয় যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে একটা ছেঁড়া চ্যাটাই পাতলাম। ঘরের কোণ থেকে গোটাকতক চামচিকে উড়ে এদিক ওদিক গেল। মানুষের সাড়া পেয়ে ইঁদুর ও ছুঁচোরা পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে লাগল। বাইরের দাওয়া বিচালীর গাদা ও কাঠ-কুটায় ভরা। তার পাশে একটুখানি খালি জায়গা। শিষ্য যাঁরা আসছেন, তাঁরা চ্যাটাই পেতে সেখানে ব'সে আছেন। আমি কখনো ঘরের মধ্যে, কখনো, ভাড় কমলে, বাইরের দাওয়ায় বিচালির গাদার পাশে বাস।

কিন্তু কেন ? কেন আমি ঐ সুন্দর আরামপ্রদ বৈঠকখানা ছেড়ে এই অতি নোংরা, অপরিষ্কৃত ও কদর্য্য স্থানে আশ্রয় নিলাম ? গত বৎসর আমি নিজেই এ ভাবতে পারতাম না, এরূপ স্থানে বাস করার কল্পনাতেই শিউরে উঠতাম। কিন্তু এবার এমন হ'ল কেন ? ঐ আরামদায়ক বৈঠকখানায় থাকবার জন্য গুরুদেবও একবার রহস্যভরে ব'লেছিলেন, এবং মেজদাও এসে পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু তথাপি আমি সেখানে গেলাম না, 'স্বর্গ' ছেড়ে 'নরকে' বাসই বেছে নিলাম। তার কারণ, শ্রীগুরুদেব এখন আমাকে এমন এক পরম 'ধন' দিয়েছেন, যা' ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও পাইনি এবং যার স্বরূপ আমি কোনো দিন কল্পনাও করতে পারিনি। যেন এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের injection দেওয়া হয়েছে আমার মধ্যে, যা' আমার দেহ মনের প্রতি অণু-পরমাণুতে প্রবেশ ক'রে এক অকল্পনীয় আনন্দসুধার নেশায় ভরপুর ক'রে রেখেছে আমায়। আমি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করছি আমার অতি নিকট স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজেশ্বরী জগজ্জননী শ্রীরাধারাণী লীলা করছেন,—এই উপলব্ধিতে আমার বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা বা সংশয় ছিল না। আমি দেখছি, আমি তাঁদেরই সন্তান, ভবসাগরে

প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, তাঁদের কাছে যাবার জন্য আকুল হয়ে কাঁদছি—আর তাঁরা, বিশেষতঃ স্বয়ং রাধারাণী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, এই মুহূর্ত্ত আমার বিফলে গেল, আমি তাঁদের ডাকতে পারছিনা,—এই ভব-সাগরের উত্তাল তরঙ্গ আমাকে তাঁদের চরণসান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টার প্রতি মিনিটে, সেকেণ্ডে,—ঘুমিয়ে স্বপ্নেও আমি আকুল হয়ে কাঁদছি, আর ভাবছি—এই মুহূর্ত্ত আমার বৃথা গেল, আমার কী হবে? এক একটা ঢেউ যেন আমাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, আর আমি 'মা', 'মা' বলে আকুল হয়ে কাঁদছি, মা রাধারাণী যেন আমার ডাকে সাড়া দিয়ে দূর থেকে বলছেন 'আয়, আয়'। এ উপলব্ধির মধ্যে একটুও আবিলতা ছিল না—এ স্পষ্ট, পরিষ্কার, সংশয়লেশশূন্য। আর এ উপলব্ধি ছিল continuous বা নিরবিচ্ছিন্ন, বিন্দুমাত্র dis-continuity বা ছেদ দ্বারা এ ক্ষুণ্ণ হয়নি। বুঝলাম শ্রীরূপ গোস্বামী একেই বলেছেন 'অব্যর্থকালত্বম্', কবিরাজ গোস্বামী যাকে বললেন, "কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।" যতক্ষণ জেগে থাকি, জিহ্বা যেন আপনা আপনি আমার বিনা চেষ্টাতেই, নাম মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে, আমি চেষ্টা ক'রেও তাকে থামাতে পারিনা বা থামাতে ইচ্ছাও হয়না, কারণ তাতে আনন্দ পাচ্ছি, মিষ্ট দ্রব্য চুষতে যেমন আনন্দ লাগে ঠিক তেমনি আনন্দ। পরে বুঝেছি শ্রীরূপগোস্বামী জাত-ভাবাঙ্কুর জনের যে 'নামগানে সদারুচিঃ'র কথা বলেছেন এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে-নামকে বলেছেন—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ, সেবোন্মুখেহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ", এ সেই স্বয়ংস্ফূর্ত্ত ভগবৎ নাম। আমার মধ্যে তখন গুরু কৃপাবলে যে যে লক্ষণ উদিত হয়েছিল, পরে বিচার ক'রে দেখেছি, সে সব লক্ষণ শ্রীরূপ গোস্বামী নিখুঁতভাবে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত ক'রে গেছেন। এই যে আশ্রমের এত বীভৎস ও কষ্টকর পরিবেশেও আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না, তাকে বলেছেন 'ক্ষান্তি', কবিরাজ গোস্বামী যাকে বললেন, "প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়।" এই যে আত্মসুখের প্রতি বীতরাগ, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের প্রতি ঔদাসীন্য, সর্বদা উৎকণ্ঠা, গুরুদেবের কাছে কাছে থাকার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, গুরুগুণগান শ্রবণলালসা, তিনি রক্ষা করবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস, নিজের দৈন্য ও স্বরূপ অনুভূতি—এ সবই লিখে রেখে গেছেন 'জাতরতি' ভক্তের লক্ষণে :

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা,
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ,
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুঃ জাতভাবাঙ্কুরে জনে।"

এই শ্লোক অক্ষরে অক্ষরে কাজ করছে তখন আমার মধ্যে।

আশ্রমের নিরতিশয় কষ্টকর পরিবেশে আমার যে কোনো কষ্ট হ'তনা, শুধু তাই নয়—এই পরিবেশ তখন আমার খুব ভাল লাগত। সেই স্যাঁতসেতে মাটির মেঝের ভ্যাপসা দুর্গন্ধ, সেই চামচিকে ছুঁচো ইঁদুর অধ্যুষিত পরিবেশ, সেই ভাঙাচোরা ময়লা কাঠকুটা ভরা জঞ্জাল—এমনকি সেই বীভৎস পায়খানা—সবই আমার অত্যন্ত সুখকর ও মনোরম ব'লে প্রতীয়মান হ'ত। মনে হ'ত এই আমার গোলোক-বৃন্দাবন যেখানে নিত্যলীলাপরায়ণ গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ ও গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধারাণী—যাঁদের সন্তান আমি, অতি আদরের ও প্রিয় সন্তান,—যাঁরা আহ্বান করছেন আমায় দিবানিশি ও যাঁদের কাছে পৌঁছবার জন্য আমি আকুল হয়ে চেষ্টা করছি অবিরাম।

এই যে অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থাও অতি সুখকর মনে হ'তে পারে—একথা আমি নিজেও এর আগে, কখনও সম্ভব হ'তে পারে ব'লে, বিশ্বাস করতে পারতাম না। কেউ যদি বলত, তবে আমি এটা নিশ্চয়ই তার অতিশয়োক্তি ব'লে ধ'রে নিতাম। সত্যিই এরূপ অসম্ভব কথা কেউ কখনও বিশ্বাস করতে পারে না। এ ভাব যায় হয়নি সে কখনই তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু যাঁরা এ পথের পথিক, এ ভাবের ভাবী—তাঁরা এ অবস্থা নির্ভুলভাবেই অবগত আছেন। পরে দেখেছি শ্রীরূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে স্থায়ীভাব প্রকরণে 'রাগ'এর লক্ষণে লিখছেন যদি কারও চিত্তে 'রাগ'-এর উদয় হয়; তবে "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজতে"—অর্থাৎ অতিশয় দুঃখও সুখ ব'লে মনে হয়। অবশ্য এই সুদুর্লভ 'রাগ' এর উদয় দুইপ্রকারে সম্ভব: প্রথমতঃ ভক্তিসাধনা দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ সাধুগুরুকৃপায়। আমার অন্তরে বর্তমানে যে রাগ-লক্ষণের উদয় সম্ভব হয়েছে তা এই দ্বিতীয় প্রকারের "সাধুপ্রসাদেন অতিধন্যানাং ভাবোঽভিজায়তে।"

আরও একটি আশ্চর্য্য জিনিষ লক্ষ্য করেছি—এই সময়ে আমার চিত্তের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি রূপ হয়েছিল। আমার মন অতিশয় 'কোমল' হয়ে গিয়েছিল, কাঠিন্যের লেশমাত্র ছিলনা। আগুনের তাপে মোম-জাতীয় জিনিষ যেমন ক্রমশঃ নরম হয়ে মসৃণ হয়ে, শেষে গ'লে তরল হয়ে যায়—আমার চিত্তও তেমনি যেন কোন্ অদৃশ্য করুণা-কিরণ-বিকিরণের ফলে কোমল থেকে কোমলতর হয়ে একেবারে দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল। জীবমাত্রের দুঃখ দেখলেই তখন আমার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ত। সেই দ্রবীভূত চিত্ত আমার যেন গ'লে তরল হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণে মিশে গিয়েছিল। অর্থাৎ আমাতে আমি তখন আর ছিলাম না; আমার আমি গলিত নদীরূপে তাঁদের চরণ-সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিলাম। শ্রীগুরুদেব একটি গান করতেন, "কবে আমার আমি ভুলে যাব, তোমার আমি হয়ে রব—সেদিন আমার কবে হবে, হরি? আত্মসুখ পাসরিবে, সমুদ্রে নদী মিশিবে, বহিবে আনন্দ লহরী"—এ গানের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি সে সময় স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।

এ স্থলে আর একটি অদ্ভুত উপলব্ধির কথা বলছি। এই যে চিত্তের দ্রবীভূত অবস্থা, এ ঠিক জলের মত নয়, এ যেন 'আঠালো' কোনো ঘনীভূত অমৃতময় পদার্থের মত। এ আমি অতি স্পষ্টরূপে অনুভব করেছি। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে এরই কথা বলছেন এইরূপে—"সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ, ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে"—অর্থাৎ এইভাব জাগলে অন্তঃকরণ সম্যক্‌ভাবে মসৃণিত বা দ্রবীভূত হয়ে যায়, শ্রীমদ্ভাগবত যাকে বলছেন 'দ্রুতচিত্ত', 'দ্রুত', অর্থাৎ দ্রবীভূত; এটা ভাবের তটস্থ লক্ষণ, ভাবের উদয় হ'লে চিত্তের অবস্থার বর্ণন। আর ভাবের স্বরূপ লক্ষণ হচ্ছে এই যে এ "সান্দ্রাত্মা", ঘনীভূত আত্মা, অর্থাৎ গাঢ়, আঠালো; 'প্রীতি-সন্দর্ভে'র বিশ্লেষণে ও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। ভাবেরএই 'আঠালো' স্বরূপ ও ভগবানের প্রতি অত্যন্ত 'মমত্ববোধ' এই দুই লক্ষণই সুস্পষ্টরূপে আমি তখন উপলব্ধি করেছি।

যদি কেউ বলেন—এতো সেই সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমই—যে "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম নৃলোকে না হয়"; কিন্তু আপনি এমন কি কঠোর তপস্যা করলেন যে এই "নরলোকে-দুর্লভ' কৃষ্ণপ্রেম লাভ করলেন? এর উত্তরও শ্রীরূপগোস্বামীই দিয়েছেন: "সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা, প্রসাদেন অতিধন্যানাং ভাবো দ্বিধাভিজায়তে। সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে, স ভাবঃ কৃষ্ণতদ্ভক্ত প্রসাদজ ইতীর্যতে" ভ, র, সি,—১।৩। এবার পাঠক বুঝতে পারবেন এই মহামূল্য রত্নমণি কেমন ক'রে কোথা থেকে আমি পেয়েছিলাম। সিদ্ধসাধুগুরু 'প্রসাদজ' এই দুর্লভ ধন লাভ ক'রে জীবন আমার 'অতিধন্য, অতিধন্য, অতিধন্য' হয়েছে। এদিকে অন্তরে এই দুর্লভ ভাব উদয় করিয়ে গুরুদেব কিন্তু চুপ ক'রে বসে নেই। ভাবে বিভোর হয়ে আমি যখন অশ্রুজলে ভেসে আপন মনে মন্ত্রজপ ক'রে চলেছি, তখন তিনি তাঁর সুযোগমত মাঝে মাঝে ডাকছেন, "সুরেনধন!" ছুটে তাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি করুণাঘননয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে কিছু হরিলুট দিয়ে বল্লেন, "যাও, বাবা, আপন মনে জপ কর।" বেশীক্ষণ তাঁর কাছে বসতে পারতাম না, কারণ জনস্রোতের আর বিরতি ছিল না। একটু বসেই আবার আমাকে বাইরে আসতে হ'ত। বাইরে এসে ভাবের অমৃত সমুদ্রে আবার ডুবে যেতাম; জিহ্বা অবিরাম মন্ত্র জপ ক'রে যেত, দুচোখে অশ্রুর ধারা বইত, মসৃণিত অন্তঃকরণ মমতায় ভ'রে উঠত গুরুদেবের প্রতি।

প্রবল অনুরাগের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এইভাবে আমার দিনগুলি কাটতে লাগল। একদিন গুরুদেবকে পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গায় নৌকাভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হল। ওখানকার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ গুরুদেবকে নিয়ে নৌকায় উঠলেন। আমি তখনকার শিষ্যদের মধ্যে সে সময়ে একদম শেষ সারিভুক্ত, তাই বড় বড় শিষ্যদের কিছু বলতে না পেরে

করযোড়ে তীরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সহসা গুরুদেবের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়ল; তিনি বল্লেন, "এসো, বাবা, আমার কাছে।" আমি একলাফে নৌকায় উঠলাম এবং গুরুদেবের শ্রীচরণের কাছ ঘেঁষে বসলাম।

কলকাতা ও সহরতলী থেকে বড় ও ধনী শিষ্য যাঁরা আসতেন, তাঁরা মাঝে মাঝে মোটরে ক'রে আসতেন। বালক ভাবাবিষ্ট শ্রীগুরুদেবের মোটরে চেপে বেড়ানোর খুব ঝোঁক ছিল। শিষ্যরাও সাগ্রহে ও সানন্দে তাঁকে গাড়ীতে চাপিয়ে বেড়িয়ে নিয়ে আসতেন। এবার বৈদ্যবাটিতে থাকাকালে কয়েক বারই শ্রীগুরুদেব মোটরে ক'রে বেড়াতে গিয়েছিলেন আমার মত তখনকার দিনের শেষ সারির শিষ্যের পক্ষে স্বল্প-পরিসর মোটরের মধ্যে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গী হয়ে মোটর ভ্রমণ করা প্রায় অসম্ভব কল্পনা ছিল। কিন্তু কত কৃপা তাঁর। প্রায় প্রত্যেকবারই তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। দু'দিন চন্দননগরের দিকে গেলেন। তখনকার দিনের ব্রিটিশ ও ফরাসী চন্দননগরের সীমান্তে গাড়ী থামিয়ে পুলিশকর্তৃক গাড়ী সার্চ করার রীতি ছিল। একবার গুরুদেবকে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াতে হ'ল, দ্বিতীয়বার আর তাঁকে নামতে হ'লনা, তাঁকে দেখেই পুলিশ গাড়ী ছেড়ে দিল। চন্দননগরে গুরুদেবের বহু তথাকথিত শিষ্য ছিল; গুরুদেব তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময় 'মা', 'মা' ব'লে ডাকলেন এবং প্রচুর হরিলুট ছড়িয়ে দিলেন। 'তথাকথিত' এই জন্য বলছি যে তারা মন্ত্র নিয়ে আর গুরুদেবের কাছে বড় একটা আসেনি। গুরুদেব একদিন বালী ব্রিজ পার হ'য়ে কিছুদূর গেলেন।

এই সময়ে গুরুদেবের জনৈক ভক্ত বৈদ্যবাটী আশ্রমে এসে প্রায়ই গুরুদেবের নাম কীর্ত্তন করতেন। ভক্তটি অত্যন্ত সুকণ্ঠ। তাঁর মিষ্টি কণ্ঠের 'ভজ নরহরি' গান আমাকে মুগ্ধ করত। উপরন্তু তাঁর স্বরচিত কয়েকটি গান আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। তার মধ্যে একটি গানের কিয়দংশ আমি লিখে নিয়েছিলাম। সেটি এখানে লিপিবদ্ধ করছি:

"কবে, সিক্ত করিব নয়নের জলে রাঙা চরণ দুখানি,
গুরু গো, গুরু গো—
পড়িয়া রহিব চরণ ধূলায় সকল তীর্থ মানি;
আমি ভজি নরহরি, জপি নরহরি, নরহরি নাম করেছি সার,
তব নাম নিতে হৃদয়ে আমার উথলে সিন্ধু অনিবার।
আমি নরহরি নাম ভজনা করি, ত্রিভুবনে আর কারে ডরি?
পাপী তরাতে অবতার, অবতার তুমি অবতার;
আমি মহাপাপী হইনা কেন—পাপী তরাতে অবতার।

কোন্ শুভলগনে হৃদয়তটিনী করিয়া দিলে মুক্ত ;
কোন্ বীণার সুরে জাগাইলে প্রভু হৃদয়তন্ত্রী লুপ্ত ?
বিনা সাধনায় অভাজন জনে নিলে ও চরণে টানি'।"

২৩শে চৈত্র রবিবার শ্রীগুরুদেব বৈদ্যবাটি থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যায় কলকাতা-ভবানীপুরে রাণীমায়ের গৃহে গমন করলেন। রাণীমায়ের মত গুরুভক্ত সত্যই দুর্লভ। তাই বোধহয় ভক্তের আকুল আহ্বান এড়াতে না পেরে ভক্তের ভগবান্ ভক্তের ভবনে পদধূলি দিয়ে তাঁকে ধন্য করলেন। সেখানে গুরুদেবের ভক্ত রাণীমায়ের আত্মীয়স্বজন অনেকেই এসেছিলেন। সকলকে নিয়ে আনন্দময় প্রভু খুব আনন্দ করলেন। 'মা' 'মা' ক'রে সে কী মধুর ও আকুল আহ্বান। সে ডাকে বিশ্বজননীর হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে। তাই রমণীমাত্রেরই মাতৃহৃদয় সেই মধুর মাতৃ-আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেনা। সেই মাতৃভাবের বিকাশ দেখেছিলাম সেদিন রাণীমায়ের বাড়ীতে সমাগত মায়েদের স্নেহাশ্রু বিসর্জনে ও তাদের অভিভূত ভাবের মধ্যে। প্রচুর হরিলুট বিলাতে লাগলেন প্রভু দুই উদার হস্তে। তারপর হাওড়া ষ্টেশনে ফিরে এসে ডেরাডুন এক্সপ্রেসে উঠলেন। গোমো তপোবনে পৌঁছলাম যখন, তখন রাত্রি প্রায় তিনটা।

গোমো-তপোবন

এখানে গুরুদেবের শুভাগমনের পরই একে একে ভক্তগণ তপোবনে আসতে লাগলেন। ওখানকার বড়দাদা (সুরেন্দ্রনাথ নন্দী দাদা), কলকাতার মদন দাদা, ভূপেনদাদা—এরা এলেন চৈত্র মাসেই। ৩১শে চৈত্র এলেন সুদূর টিটিলাগড় থেকে দুর্গাপদবাবু কমলা ও কাতুকে নিয়ে। তখনকার দিনে টিটিলাগড় থেকে আসা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল, অথচ বছরে তিন চারবার তাঁরা আসতেনই। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে তখন তাঁদের এতই তীব্র অনুরাগ এবং শ্রীগুরুদেবের এত প্রবল আকর্ষণ যে, এই কষ্ট-কর ভ্রমণও তাঁদের পরম আনন্দদায়ক ব'লে মনে হত ; কখন সেই আনন্দময় মূর্ত্তিখানি দেখব এই আশায় আশায় প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাঁদের আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠত। শ্রীগুরুদেবও ওঁদের আদরে-যত্নে সোহাগে একেবারে বিভোর ক'রে রাখতেন।

সেবার গোমো আশ্রমে গুরুদেবের নতুন যোগ-মন্দির নির্মাণ হয়েছে। গোমো আশ্রম দেখাশুনা করবার ভার যাঁকে দিয়েছিলেন গুরুদেব, সেই প্রবল গুরুভক্ত সুরেন রায় দাদা এই কাজের ভার নিয়েছিলেন। এক্ষণে মিস্ত্রী ও কুলিকামিনদের প্রাপ্য টাকাকড়ি মিটিয়ে দিতে হ'বে। মদনদাদা, আমি ও আর কয়েকজন শিষ্য মিলে এই payment কর্ম সমাধা করলাম—৩১শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ দুদিনে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। গোমোর পল্লী অঞ্চলে এই সব মিস্ত্রী ও কুলিকামিনরা সাধু-সন্তকে মানত না। আমাদের গুরুদেবের প্রতিও তাদের বিশেষ কোনোরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজন ছুতার মিস্ত্রী গুরুদেবের মন্দিরের দুয়ার নির্মাণ করছিল। ঠিকমত মাপজোপ নেওয়া সত্ত্বেও দুয়ার নির্মাণ ক'রে সে দেখল যে দুয়ারটি বেশ কিছু ছোট হ'য়ে গেছে। এতে সে অত্যন্ত চিন্তাকুল হয়ে পড়ল। বস্তুতঃ এর কোনো সমাধানই ছিল না। এর জন্য সুজন রায়ের কাছে সে অত্যন্ত তিরস্কৃত হবে তাও সে বুঝল। দুর্ভাবনায় সে একেবারে মুষড়ে পড়ল। শেষে উপায়ান্তর না দেখে রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে একান্ত চিত্তে আমাদের গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে তাঁকে ডাকতে ডাকতে জানাল, "সাধুবাবা, শুনেছি আপনি মহাপুরুষ, আপনার আশ্চর্য্য ও অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আজ তো আমি আপনারই কাজ করতে গিয়ে খুবই মুস্কিলে পড়েছি। আপনি যদি প্রকৃতই মহাপুরুষ হন, তবে আমার এই মুস্কিল আসান করুন।" পরদিন ভোরবেলা আশ্রমে গিয়ে কাজে লাগতেই সে সবিস্ময়ে দেখল যে মাত্র গতকাল যে দুয়ার এত ছোট হয়েছিল, আজ তার ঠিক ঠিক মাপ হয়েছে এবং সুন্দরভাবে fit করেছে, আনন্দে বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেল, সাধুবাবা তা হ'লে সত্যিই অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষ! সেই থেকে ওরা সবাই মনে-প্রাণে গুরুদেবের মহাভক্ত হয়ে গেল। এ ঘটনা ঘটেছিল যখন তখন গুরুদেব বৈদ্যবাটি আশ্রমে। মিস্ত্রীরা ইতিপূর্বে গুরুদেবকে দর্শনও করেনি। অথচ পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গুরুদেব যখন আশ্রমে পদার্পণ করলেন, তখন এই মিস্ত্রী গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলে, গুরুদেব তাকে সাগ্রহে শুধালেন, "বাবা, তোমার কপাট-টির ঠিক মিল হয়েছে তো?" বিস্ময়ে চমকে উঠল মিস্ত্রী! যা ছিল তার অন্তরের জিনিষ, তা ইনি জানলেন কী ক'রে? পরম বিস্ময়পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তার সমস্ত মনপ্রাণ লুটিয়ে পড়ল এই অন্তর্য্যামী প্রভুর শ্রীচরণতলে। সেই থেকে আজীবন ওরা শ্রীগুরুদেবের পরম ভক্ত।

শ্রীগুরুদেব গোমো তপোবনে আগমন করলে এখানে তাঁর একটা মুখ্য লীলাই হ'ত নিকটস্থ পাহাড়-ভ্রমণ, আশ্রমের একেবারে সন্নিকটে যে ছোট পাহাড়টি আছে সেখানে তো প্রায় প্রত্যহই ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বেড়াতে যেতেন। এবারও এখানে এসেই ২৮শে, ২৯শে, ও ৩০শে চৈত্র গুরুদেব পাহাড় ভ্রমণে গেলেন। ২৮শে শুক্রবার আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় আমার যাওয়া হয়নি; শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে অমরবাবু, নারাণ প্রভৃতি গেল। গুরুদেবের সঙ্গে যেতে না পারায় আমার খুব মন খারাপ হ'ল। রাত্রে গুরুদেব নিজেই দয়া করে আমাকে কী একটা জিনিষ খেতে দিলেন, তার ফলে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। পরদিন শনিবার আমি গুরুদেবের সঙ্গে পাহাড়ে গেলাম।

আমাদের সঙ্গে ছোট টাঙ্গি ছিল, উঠবার সময় ঐ টাঙ্গি দিয়ে বন কেটে কেটে পথ প্রস্তুত ক'রে নিতে হয়। অনেক সময় পথের উপর শুকনো লতাপাতা আগুনে জ্বালিয়ে দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে হয়। গুরুদেব বল্লেন, "বাবা, দেশলাই বার কর।" কিন্তু দুঃখের বিষয় শিষ্যদের কারো কাছেই দেশলাই ছিল না। গুরুদেব পরিহাসময় ভৎর্সনার কণ্ঠে বললেন, "ধূমপান করার সময় তো দেশলায়ের অভাব হয়না কারো।" যাকে বলেছিলেন, সেও একজন ধূমপায়ী। লজ্জায় সে আর মুখতুলে চাইতে পারলনা। পাহাড়ের উপর উঠে চারদিকের বনশোভা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। তার উপর সেই প্রাকৃতিক শোভা যেন শতগুণে বৃদ্ধি পেত বৃন্দাবনবিপিনবিহারী সাক্ষাৎ বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীশ্রীগুরুদেবের সাহচর্য্যে। পাহাড়ের উপর কতকগুলি বড় বড় পাথর শ্রীগুরুদেবের আসন ব'লে চিহ্নিত ছিল; তার মধ্যে একটি ছিল বেশ বড়, হেলান দেওয়া বেঞ্চের মত। এই বেঞ্চ সদৃশ প্রস্তর-আসনে শ্রীশ্রীগুরুদেব বসতেন; বিবিধ কুসুম রচিত মনোহর মাল্যে ভূষিত করতেন তাঁকে ভক্তগণ। বৃন্দাবনদাদা, অবিনাশদাদা, বঙ্কিমদাদা প্রমুখ ভক্তগণ হাততালি দিয়ে গুরুবন্দনামূলক গান সুরু করতেন। ভক্তগণের আবেগমাখা সে মধুর ভক্তি-সঙ্গীতের সুরে পাহাড়ের সেই নিস্তব্ধ আকাশ বাতাস পরিপূরিত হয়ে উঠত; সে সঙ্গীতে অভিভূত ও রোমাঞ্চিত হতাম আমরা, সে গানে শিউরে উঠত বনের লতাপাতা, সে সঙ্গীতে পুলকিত হয়ে বনের পাখীরা তাদের গান থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনত এই বৃন্দাবনলীলা গান; সে সুর ভেসে বেড়াত আকাশে বাতাসে; সে আনন্দ-সুরলহরী ছড়িয়ে পড়ত দিকে দিগন্তরে। সঙ্গীত-শেষে গুরুদেব স্বহস্তে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করতেন। পাহাড়ের উপর তৃণ-প্রস্তরকঙ্করময় ভূমিতে তাঁর শ্রীচরণচ্ছায়ায় ব'সে মহা আনন্দে ভক্তগণ প্রসাদ পেতেন —মুড়ি, নিমকী, কচুরি, সিঙ্গারা, অমৃত্তি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। ঘড়ায় করে জল ও জলের গেলাস নিতেও ভুল হ'তনা। এই ভাবে গুরুদেব সকলকেই এই ভ্রমণ-শেষে পরিতৃপ্তি সহকারে সেবাদ্বারা আনন্দ দান করতেন। অবশেষে সন্ধ্যার গোধূলি নেমে এলেই চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে গুরুদেবকে পুরোভাগে নিয়ে ভক্তগণ নেমে আসতেন। আমি ও বালক নারাণ, কুকুর গুলিকে সাথে ক'রে, গুরুদেবের আগে আগে গিয়ে পথ পরিষ্কার ক'রে দিতাম যাতে গুরুদেবের শ্রীচরণে আলগা পাথর, বা কাঁটা, আবর্জ্জনা, ইত্যাদি না লাগে। পাহাড় থেকে নামতে নামতে সারা গোমো স্টেশন ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল দেখতে পেতাম। দূরে যেন সরীসৃপের মত ট্রেনগুলিকে চলতে দেখা যেত। ওদিকে পাহাড়ে নদীর ক্ষীণ রজতরেখা—এবং তার পাশেই আমাদের তপোবন আশ্রমের কাননকুঞ্জ শোভা পাচ্ছে। "ভজ নরহরি" গান করতে করতে ও গুরুদেবের জয়ধ্বনি দিতে দিতে আমরা নেমে আসতাম। গুরুদেবের

সঙ্গে এই পাহাড়-ভ্রমণ যে কী অপরিসীম আনন্দময়, তা লিখে বোঝাতে পারব না।

ভাল ফসল আশা করতে হ'লে শুধু ভাল বীজ বপন করলেই হবেনা, ক্ষেত্রটিও উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। ক্ষেত্রটির নিজস্ব গুণ থাকা তো চাই-ই, উপরন্তু তাকে কর্ষণ ক'রে তাতে প্রয়োজনীয় সার আদি দ্বারাও তাকে প্রস্তুত করতে হবে। আমরা অনেক সময় এই সত্যটি ভুলে যাই। বীজবপনকারীকে তাই কখনো কখনো দোষ দিই, এবং তিনি কেন সব ক্ষেত্রে সমভাবে বীজ বপন করেন না, এই ব'লে অভিযোগও করি। কিন্তু মরুভূমিতে বা অনুর্বর জমিতে বীজ বপন করলে যে বীজটি শুধু শুধু শুকিয়ে নষ্ট হবে, সে কথা আমাদের মনে থাকেনা। আমাদের সাধন-জীবনে এই সত্যটি সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করলাম। কয়েকমাস থেকে শাস্ত্রোক্ত 'ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তি র্মানশূন্যতা' প্রভৃতি যে যে লক্ষণ আমার মনোজগতে উদিত হয়েছে এবং বর্তমানে যার চরম অভিব্যক্তি আমার সমস্ত মনে প্রাণে প্রকটিত হয়েছে, তা এর আগে কখনো হয়নি। দিবারাত্রি আকুলতায় ছটফট করছি, মনে হচ্ছে আমার প্রত্যেকটি ক্ষণ বৃথায় যাচ্ছে, আকুল হয়ে ডাকছি 'হে গোবিন্দ, হে রাধারাণী, আমার উপায় করুন, আপনাদের শ্রীচরণসমীপে আমাকে নিয়ে চলুন। এই ভবকারাগারের কঠিন শৃঙ্খল আমি যে কিছুতেই ছিন্ন করতে পারছি না, আপনাদের সন্তানকে কোলে তুলে নিন, হে রাধারাণী, করুণারূপিণী জননী, এবার করুণা করুন মা, আর যে পারিনা, মা' মনে যখন দিবা নিশি এই কাতর আর্তি, এই তীব্র আকুলতা, ঠিক সেই সময়েই অন্তর্যামী গুরুদেব করুণা করলেন, ধর্মজগতের আর একটি প্রধানধাপে উন্নীত করবার ইঙ্গিত দিলেন।

২রা বৈশাখ শ্রীগুরুদেব কৃপা ক'রে ডাকলেন এবং এই শুভসংবাদ শোনালেন। গুরু-কৃপার এই আকস্মিক ঘোষণার কথা শুনে আনন্দ-বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম; সমস্ত দেহমনপ্রাণ যেন এক অজানা পুলকে শিহরিত হ'য়ে উঠল গুরুদেব বল্লেন, "বিধিমত সমস্ত কাজ আগামী কাল হবে, কারণ আজ সকালে তুমি কিছু প্রসাদ খেয়ে ফেলেছ।" তারপর কমলা ও দুর্গাপদ বাবুকে ডাকলেন, তাদেরও ঐ একই অবস্থা। অনুরাগের বন্যায় তখন তা'রা ভাসছে। তাদের প্রতিও ঐ একই নির্দেশ হ'ল, "আগামী কাল শুভকাজ সম্পন্ন হ'বে। কারণ আজ সকালে কিছু খাওয়া হয়ে গেছে।" বলা বাহুল্য, পরদিন সকালে আমাদের তিনজনেরই জীবনের এই পরম শুভকার্য্য সম্পন্ন হ'ল। গুরু-কৃপা পেয়ে জীবন আমাদের ধন্য হ'ল। কিন্তু এখন কঠিন কর্তব্য পড়ল আমাদের উপর। উর্বর ক্ষেত্রে তিনি যে শক্তিশালী বীজ বপন করলেন, তাকে যেমন অবিরাম জল-সিঞ্চনে অঙ্কুরিত ক'রে তুলতে হ'বে, তেমনি অঙ্কুরিত বীজকে রক্ষা করতে হবে বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে। প্রকৃত পরীক্ষা এখনই সুরু হ'ল।

৬ই বৈশাখ রবিবার মোটরে বেড়াতে গেলেন গুরুদেব। আমাকে যেতে অনুরোধ করলেন। কি জানি হয়তো কোনো দুর্জ্জয় অভিমানের বশে সেদিন আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম না। দুর্গাপদ বাবুরা গুরুদেবের সঙ্গে গেলেন। মধুবনের কাছাকাছি গিয়ে গুরুদেব ফিরে এলেন। ৯ই বৈশাখ বুধবার আশ্রমের ভিতরদিকের বারান্দায় শ্রীশ্রী-গুরুদেবের সম্মুখে দুর্গাপদবাবু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করলেন। আমরা সবাই ভক্তি-নত চিত্তে শ্রবণ করলাম। এই সময় কাতু পাঁচ ছয় বছরের বালকমাত্র। পুরীর রথে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখদর্শনাকাঙ্ক্ষিণী এক বৃদ্ধ খঞ্জ ভক্তশ্রেষ্ঠ ভিখারিণীর ভক্তির প্রবল আকর্ষণে কী ভাবে জগন্নাথের রথ অচল হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ভিখারিণীকে বহন ক'রে নিয়ে এসে জগন্নাথের রজ্জু স্পর্শ না করানো পর্য্যন্ত রথ কিছুতেই চলেনি, তারই ভক্তিপ্লুত কাহিনী পয়ারছন্দে লিখিত একটি কবিতা এই শিশু-কণ্ঠে কত যে হৃদয়-গ্রাহী হয়ে উঠত, তা লিখে বর্ণনা করতে পারব না। স্বয়ং শ্রীগুরুদেব রুদ্ধ-নিশ্বাসে বালক-কণ্ঠের এই আবৃত্তি শ্রবণ করতেন—উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের সকলেরই চক্ষু সজল হয়ে উঠত।

আমাদের গোমো তপোবন ছিল ফুলে ফলে ভরা আদর্শ তপোবনই। কত রকমের কত বিচিত্র বর্ণ ও সৌরভের ফুল ফুটে সারা আশ্রম আমোদিত ক'রে রাখত। আমরা সে-ফুল তুলে শেষ করতে পারতাম না। ছোঠ ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে আমি আশ্রমের ফুল তুলতাম এবং নানা রকমের মালা গেঁথে মনের সাধে প্রভুকে সাজাতাম। মাথার মকুট থেকে আরম্ভ ক'রে চরণে নূপুর পর্যন্ত সর্ব্ব অঙ্গই সুশোভিত করতাম বিবিধ বিচিত্র সুগন্ধ কুসুমরাজিতে। এক সন্ধ্যায় এইরূপ এক অপূর্ব্ব সাজে গুরুদেবকে সাজানো হয়েছে—এইবার আরতি হবে। এমন সময় হঠাৎ কাতু এসে গুরুদেবকে এমন অপরূপ সাজে সজ্জিত দেখে আপনমনে উল্লাসভরে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "আজ গুরুদেবকে যেন ঠিক রাজার মত দেখাচ্ছে।" অপরূপ ফুল-সজ্জায় যে তিনি বৃন্দাবনের রাজা হয়েছেন, এই সহজ অনুভূতি সরল শিশুর চোখে ফুটে উঠেছে।

১০ই বৈশাখ অনিল হাজরা সপরিবারে আশ্রমে এলেন। তিনি সঙ্গে গ্রামোফোন্‌ও এনেছিলেন। বালকভাববশতঃ গুরুদেব গ্রামোফোন্ শুনতে খুব ভালবাসতেন; বিশেষতঃ তার গান যদি ভক্তিমূলক হ'ত। গ্রামোফোনে যে কয়েকটি গান হ'ল, সবই ভক্তিমূলক, তার মধ্যে কিছু কিছু রাধাকৃষ্ণলীলাগানও ছিল। সেই সব গান গুরু-দেবও যেমন নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করতে লাগলেন, তেমনি গুরুকৃপায় আমারও মনের চোখের সামনে যেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীকে দেখতে পেলাম, চোখের জলের মধ্যে ঝাপসা দৃষ্টির সমুখে যেন ফুটে উঠলেন সেই পরম মমতাময়ী মা আমার; মনে মনে

বুঝলাম আমার যিনি স্নেহময়ী মা, তিনিই সেই গোবিন্দানন্দিনী শ্রীরাধারাণী। এরূপ স্বরূপদর্শন আর একদিন পেয়েছিলাম নবদ্বীপে, মেজদাদা যখন আবেগমধুর কণ্ঠে গাইছিলেন; 'অল্পভাগ্যে, অবৈরাগ্যে চিন্‌বি কিরে শ্রীরাধায়?" এখন নিত্যই ক্ষণে ক্ষণে তাঁর 'দর্শন' পাই, আর এ যে 'অল্প ভাগ্যে' নয়, তাও বেশ বুঝতে পারি।

১১ই বৈশাখ শুক্রবার মালসা ভোগ হ'ল। এদিন বঙ্কিমদাদা, অবিনাশদাদা, দুর্গাপদবাবু প্রভৃতি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। নিমতলাটি বাঁধানো হয়েছিল। গুরুদেব সেখানে গিয়ে বসলেন, আমরা তাঁর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে বসলাম। গুরুদেব প্রায়ই নিমতলার এই ছায়াশীতল স্থানটিতে বসতেন। ঐ দিন রাতে কমলারা বিদায় নিয়ে টিটিলাগড় যাত্রা করল।

১২ই শনিবার সকালে গুরুদেবের সঙ্গে আমরা সবাই মিলে পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। বৃন্দাবনদাদা ছিলেন আমাদের সঙ্গে। পাহাড়ে উঠে সেই হেলান-দেওয়া প্রস্তর-আসনে বসলেন গুরুদেব। আজও পুষ্পমাল্যে তাঁকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে দিলেন ভক্তগণ। তারপর বৃন্দাবনদাদা রাধাকৃষ্ণলীলাসমন্বিত বিবিধ গান গাইতে লাগলেন, তাঁর সঙ্গে করতালি দিয়ে আমরাও যোগ দিলাম। তারপর গুরুদেবের স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ—মুড়ি, কচুরি, অমৃতি, প্রভৃতি। সেই পাহাড়িয়া পরিবেশ, নিভৃত অরণ্য-সৌন্দর্য্য, চারদিকে বনবিহঙ্গের কল-কাকলী, আর সমুখে যেন সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দ নরবপু ধারণ ক'রে ভক্তগণসমুখে আবির্ভূত হয়ে লীলামাধুরী বিস্তার ক'রে তাদের আনন্দবন্যায় প্লাবিত করছেন। এ অতি আশ্চর্য্য সত্য যে, কোনো কোনো দুর্লভক্ষণে শ্রীগুরুদেব এমন এক অপূর্ব স্বরূপ ভক্তগণসমুখে প্রকটিত করতেন, যা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। আজ এক পরম ক্ষণে এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য পরিবেশে ভাগ্যবান ভক্তগণ বহু ভাগ্যফলে যেন সেই অপ্রাকৃত গোলোক ধামেরই দর্শন পেয়েছিল।

১৩ই রবিবার দুপুরে কালিবক্সী দাদা মোটর নিয়ে আশ্রমে এলেন। গুরুদেব সেই মোটরে বেড়াতে গেলেন, দয়া ক'রে আমাকেও সঙ্গে নিলেন। Grand Trunk Road দিয়ে পশ্চিমদিকে গাড়ী ছুটল। ইব্রি ষ্টেশন পার হয়ে কালি বাবু বললেন, 'সামনেই ট্রাফিক পুলিশ আছে; গাড়ীতে লোকসংখ্যা বেশী হয়েছে, অন্ততঃ একজনের নেমে যেতে হবে।" গাড়ীতে উঠবার সময় এ খেয়াল তাঁর হয়নি, এখন মাঝ পথে কে নামে? সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। যাকে নামতে বলা হবে সেই দুঃখ ও রাগ করবে। তখন গুরুদেব আমার দিকে চেয়ে বললেন, "সুরেনধন, তুমিই নেমে পড়, বাবা।" আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশ পালন করলাম। কালি বাবু খুসী হয়ে বললেন, "আমরা বেশী দূর যাব না। ফিরবার পথে ঠিক তোমাকে তুলে

নেব।" গাড়ী চলে গেল। সেই ভয়াবহ নির্জ্জন পরিবেশে আমি একাকী প'ড়ে রইলাম। মনটা মুচড়ে উঠল। জায়গাটা এত নির্জ্জন যে দিন-দুপুরেও ভয় হয়, তার উপর আমি দুর্ব্বল ও অসুস্থ। গুরুদেব এভাবে আমাকে একা ফেলে গেলেন? দুঃখ একটু হ'ল ঠিকই; কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে ভাবলাম, প্রয়োজনের সময় 'নিজজন'কেই কষ্ট দেওয়া যায়, তার উপরেই জোর করা চলে, অপরের উপর নয়। মুহূর্ত্তেই মন আমার উল্লসিত হয়ে উঠল, ভাবলাম, গুরুদেব তাঁর সুরেনধন ছাড়া আর কাউকেও নেমে যেতে বলতে পারতেন না, এ আমার পরম সৌভাগ্য। মিনিট পনেরো পরেই গাড়ী ফিরে এল। ওঁরা সেই নিভৃত স্থানে আমাকে দেখতে পান নি। গাড়ী আমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আমিই ছুটে গিয়ে থামালাম। গুরুদেব আমার দিকে তাকিয়ে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন। "ওঠ, বাবা।" কালিবাবু জানালেন, "তোমাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে ব'লে গুরুদেব আর কিছুতেই বেশী দূর যেতে চাইলেন না।" শুনে আমার দুচোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠল। দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম।

অতীন্দ্রিয় ভাব-লহরীতে দুলতে দুলতে আনন্দ-দোলায় আরো এক সপ্তাহ কাটল। এবার গুরুদেবের গোমো-আশ্রম-ত্যাগের সময় হ'য়ে এল। ২০শে বৈশাখ গুরুদেব সকাল আটটার ট্রেনে নিঃশঙ্ক অভিমুখে যাত্রা করলেন। তার পূর্ব্বদিন রাত্রের ট্রেনে আমি নবদ্বীপ রওনা হয়ে গিয়েছিলাম।

নবদ্বীপ

নবদ্বীপ পৌঁছে আশ্রম ফাঁকা দেখে আমার সমস্ত প্রাণটা হুহু ক'রে উঠল। দেবতা-বিহীন দেবমন্দিরের মত গুরুদেব-শূন্য গুহাশ্রম আমার একেবারে অসহনীয় মনে হ'ল। এ অনুরাগের অবস্থায় এই রকমই হয়। স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু তাঁর ভক্তভাবাশ্রিত আচরণে এই রূপই দেখিয়েছেন। স্নান-যাত্রার পর যখন পনেরো দিন জগন্নাথদেবের দর্শন পাওয়া যায় না, তখন ভক্তভাব-অঙ্গীকৃত মহাপ্রভুর পক্ষে এটা অসহনীয় মনে হওয়ায় "অনবসরে জগন্নাথের না পাইয়া দর্শন, বিরহে আলালনাথ করিল গমন"—চৈঃ চঃ ২।১। আমি অতি দীন, হীন, অধম জীব মাত্র; তথাপি বহুভাগ্য-ফলে সাধু গুরুকৃপা-প্রভাবে যে দুর্ল্লভ ভাবের কৃপা-স্পর্শ পেয়েছিলাম, সেই ভাবানুরাগে আমি তাঁর বিরহে নবদ্বীপে থাকতে পারলাম না, চ'লে গেলাম কৃষ্ণনগরে। সেখানে গিয়েও দিনরাত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ ধ্যান করতে লাগলাম। কেঁদে কেঁদে আমার সময় কাটতে লাগল। একটি একটি ক'রে তাঁর গুহাশ্রম আগমনের দিন গুণতে লাগলাম। অবশেষে আশায় আশায় নবদ্বীপ চ'লে এলাম। এখানে এসে সংবাদ

গেলাম, ৮ই জ্যৈষ্ঠ তিনি শুভাগমন করবেন। আমরা সকলে ঐ দিন ষ্টেশনে গেলাম। বিকালের ট্রেনে তিনি নবদ্বীপ এসে পৌঁছালেন। ঐ আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শনমাত্র যেন আবার সেই পূর্ব্ব রাজ্যে ফিরে এলাম। দুই সপ্তাহাধিক তাঁর অদর্শনে সে-আনন্দের রাজ্য যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, শত চেষ্টা ক'রেও তার আভাসমাত্র কোথাও সন্ধান পাইনি ; আজ যেন তিনি নিজে সঙ্গে ক'রে সেই অপ্রাকৃত আনন্দময় ভুবন নিয়ে এলেন। আমরাও সেই আনন্দসুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত হলাম। কী আনন্দময় মূর্ত্তি, কী মধুঢালা অমৃতময় বাণী, কী সুধাকণ্ঠের সুধাসঙ্গীত ! এই তো জগতে আরো শত সহস্র লোক রয়েছে, কারো সাথে তো তাঁর তুলনা মেলেনা ! জীবনে কতই তো জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত ও সাধু-সজ্জন ব্যক্তি দেখেছি—কিন্তু কেবল মাত্র একবার দর্শনেই প্রাণে এমন আনন্দের বন্যা এনে দিতে পারে, একটি মধুর কথায় প্রাণ এমন জুড়িয়ে যায়, শুধু মাত্র তাঁর সমীপস্থ হ'লেই প্রাণে এমন পরম শান্তি আসে, এমন তো কোথাও দেখিনি !

সেই আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেব আবার গুহাশ্রম আলো ক'রে আবির্ভূত হলেন। আমারও তাই আনন্দের সীমা নেই। অনুরাগের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এই আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে কোথা দিয়ে যে আমার দিন চ'লে যায় বুঝতেই পারি নে। সর্ব্বক্ষণই এই আনন্দ অনুভব করি। মান-অভিমান অবশ্য আসে মাঝে মাঝে, কিন্তু তাতেও আনন্দ। গুরু-প্রসাদ ভাগ্যে না ঘটলে আমি উপবাস ক'রে থাকতাম ; আমার এ কঠোর সাধনা গুরুদেবকে গভীরভাবে স্পর্শ করত। একদিন আমার এইরূপ উপবাস-ক্লিষ্ট মুখখানি দেখে গভীর স্নেহে গুরুদেব বললেন, "এসো বাবা, আজ তুমিও খাবে, আমিও খাব।" গুরুদেবের এই মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি শুনে আমার দু'চোখ ভ'রে জল এল। ভাবলাম, "হে, অন্তর্য্যামী প্রভু, তুমি তো অন্তরের ব্যথা বেদনা সবই জান ; তবু কেন এত ছলনা, এত পরীক্ষা ? এই অধম, দুর্বল জীব আমি —অত কঠিন পরীক্ষা কি সহ্য করতে পারি ?"

আমাদের গুরুদেব মনে প্রাণে একটি 'শিশু' ছিলেন। তাঁর কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সকল প্রকার আচরণেই এই 'শিশুভাব' সতত প্রকট হ'ত। বাইরের লোক-সমাজে, অর্থাৎ বহিরঙ্গ মহলে তিনি যতই কেন কঠোর বাহ্যিক রীতি নীতি ও লৌকিক আচরণ প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁর অন্তরস্থ এই চিরন্তন শিশু তার খাম-খেয়ালী খেলায় ও আত্ম-ভোলা আনন্দলীলায় সততই উঁকি ঝুঁকি দিত। একটু মনোযোগ সহকারে তাঁর লীলা-আচরণ বিশ্লেষণ করলেই এ সত্য উদঘাটন হবে। আমি নিজে বহু স্থানে বহুবার তাঁর এই শিশুবৎ ক্রীড়া ও আত্মভোলা আনন্দ প্রত্যক্ষ করেছি। এখানে সেরূপ খেলার কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

ছোট ছেলের মত নানারূপ ছবি দেখে গুরুদেব যেন আত্মহারা হয়ে যেতেন। কিন্তু এসব কথা সকলের কাছে, অর্থাৎ বহিরঙ্গমহলে, প্রকাশ করা যায় না। গুরুদেব তাই আমাকে একান্তে ডেকে চুপি চুপি নির্দ্দেশ দিলেন বিবিধপত্র পত্রিকা থেকে নানারূপ ছবি এনে তাঁকে দেখাতে। আমি এই সব শিশুচিত্তবিনোদনকারী নানাছবির বই আনতাম। আর গুরুদেব আপনমনে নির্জনে বিভোর হয়ে সেই সব ছবি দেখতেন ও শিশুর মতই নানা প্রশ্ন করতেন আমাকে। অন্তরে তিনি যে শিশুর চেয়েও সরল ছিলেন এবং নিখিল জীবের প্রতিই তাঁর আত্মীয়তা ছিল, তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি ঘটনা মনে পড়ল। একদিন গুরুদেব নিভৃতে ডেকে চুপি চুপি বললেন 'বাবা, কয়েকটা খালি টিন আনতে পারবে, এই পাঁচ ছ'টা ?" 'আমি সানন্দে উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারব।" গুরুদেব বললেন, "দুপুর বেলা টিনগুলি নিয়ে এসে একেবারে গুহার মধ্যে চুপি চুপি আমাকে দেবে, কাউকে ব'লোনা।" তাঁর নির্দেশমত ঠিক তাই করলাম আমি। কিন্তু কয়েকটা খালি টিনের জন্ম এত গোপনীয়তার কী প্রয়োজন, তা তখন কিছুই বুঝতে পারলাম না। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে গুরুদেব ভিতর গুহায় সামনের গলি রাস্তায় আমাকে হাত ধ'রে নিয়ে গেলেন। ভিতর গুহার সামনে আসার আগেই গুরুদেব বলতেন, আগে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে তবে এখানে এসো—এ সিদ্ধ আসন, বড় ভয়ংকর স্থান। আজও গুহার সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই, গুরুদেব আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে চুপি চুপি বললেন, "কিছু শুনতে পাচ্ছ ?" আমি উৎকর্ণ হয়েও বিশেষ কিছু শুনতে না পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাকে সেইভাবে চুপ ক'রে থাকতে দেখে গুরুদেব বললেন, "আঃ, ঐযে— খস্খস্, খস্খস্ শব্দ ঐ তোমার আনা খালি টিনের মধ্যে।" তখন আমার চমক ভাঙল। তাইতো! ঐ তো আমারই নিয়েআসা খালি টিনগুলি পরপর সাজানো রয়েছে, আর ওরই মধ্যে থেকেই তো ঐ খস্খস্ মৃদু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ওগুলো কিসের আওয়াজ হ'তে পারে, এই ভেবে যেই আমি সেদিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে গেছি, অমনি গুরুদেব বললেন, 'আঃ দেখতে কি পাবে এই অন্ধকারে ?' তারপর হাততালি দিয়ে মহানন্দে বালকের মত হেসে উঠে বললেন, 'আরশুলা, আরশুলা—ছেলে পিলে, মেয়ে জামাই, নাতি নাতনি নিয়ে কেমন মনের সুখে ঘরকন্না করছে, বাবা।" আমি তো অবাক! গুরুদেব ফিরে আসতে আসতে আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বললেন, "কিন্তু এসব কারো কাছে ব'লোনা—আমার তো সব পাগলের খেলা!" বুঝলাম স্বয়ং গোবিন্দ ছাড়া এমন পাগল, এমন আত্মভোলা চিরশিশু আর কে হ'তে পারে ? মহাপ্রভু রায় রামানন্দ ও সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন, "আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল; অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল," "গুপ্তে রাখিহ, কাঁহা না

করিহ প্রকাশ, আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস", এবং "বাতুলের প্রলাপ করি—কে করে প্রমাণ ?" অদ্বৈত প্রভুকে বলেছিলেন," বাউলকে কহিও, ইহা কহিয়াছে বাউল" সেই মহাবাউল, যিনি আজ অতিগূঢ়রূপে নবদ্বীপে লীলা করছেন,—তিনি ছাড়া কে আর এমন সর্ব্ববিষয়ে শিশুর মত, পাগলের মত আচরণ ক'রে প্রেমানন্দে বিভোর হ'য়ে থাকবেন ? শুধু আরশুলা নয়, পিঁপড়ার জন্য সার দিয়ে মিষ্টান্ন সাজিয়ে রেখে দিতেন দেওয়ালের প্রান্তভাগে তাদের পথের উপর সমস্ত গুহার অন্ধকারময় গলিতে। বিড়ালকে আদর ক'রে খেতে দিয়ে তাকে কোলে নিয়ে কত যে খেলা করতেন, আদরে সোহাগে তাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলতেন, কত যে কথা বলতেন তার সাথে। সেও যেন তাঁর কথায় সায় দিয়ে মেও মেও ক'রে গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ করত। আর সে সময় এত বিভোর হয়ে যেতেন যে শিশুর মতই পূর্বাপর স্মৃতি তাঁর কিছুই মনে থাকত না; বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ থাকলেও ভুলে যেতেন, এমন কি ডেকেও তাঁর সাড়া পাওয়া যেতনা। কখনো কখনো ভক্তগণ বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর কাছে এসে তাঁকে বার বার ডেকেও তাঁর সাড়া পেতনা, তখন তিনি বিড়ালটির সঙ্গে বেশ ভাল ক'রেই আলাপ জমিয়েছেন—দুজনেই কত কথা হচ্ছে, মহা সৌভাগ্যশালী সেই বিড়ালটি লেজ নেড়ে নেড়ে নানা স্বরে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। ভক্ত ও সেবকগণের পুনঃপুনঃ আহ্বানে যখন গুরুদেবের চৈতন্য ফিরে আসত, তখন তিনি হঠাৎ অন্যভাব ধরে বলতেন, "বাবা, আমার কি একটুও সময় আছে, কত কাজ—?" ওঁরা যখন হেসে বলতেন, "কাজতো ঐ বিড়ালের সাথে।" তখন ধরা পড়ে গেছি দেখে পরাজয় মেনে নিরীহ বালকের মত সঙ্কুচিত হয়ে শুধু বলতেন "হু"। তারপর তাঁদের কথামত ধী'রে ধীরে শান্ত বালকের মত তাঁদের পিছু পিছু যেতেন।

আর একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। গুরুদেব মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে তাঁর আসনে ব'সে আছেন। সমুখে ভক্তগণ উপবিষ্ট আছেন। চিঠিপত্রাদি লেখা হচ্ছে; গুরুদেব নানাপ্রসঙ্গে নানা কথা বলছেন। এমন সময় দেখা গেল, একটা ছোট ইঁদুর ভিতর গলি থেকে বার বার গুরুদেবের সামনে এসে উঁচু হয়ে গুরুদেবের দিকে চাইছে। আর গুরুদেব পার্শ্বস্থিত মিষ্টান্নের হাঁড়ি থেকে একটু মিষ্টান্ন তাকে ছুড়ে দিচ্ছেন। মিষ্টান্নটি খেয়ে সে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার আসছে সে, গুরুদেব পুনরায় তাকে মিষ্টান্ন দিচ্ছেন ও সেটুকু খেয়ে সে ছুটে চ'লে যাচ্ছে। এইভাবে বারবারই সে আসতে লাগল এবং অবশেষে মিষ্টি খেয়ে খেয়ে তার পেট ভ'রে গেল। উদরপূর্ত্তি ক'রে এবার সে কিন্তু পালিয়ে গেলনা, গুরুদেবের শ্রীচরণের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আর যতক্ষণ সে ঘুমাল, গুরুদেব তাঁর শ্রীচরণ দুটি একটুও নড়ালেন না; নিশ্চিন্তে নির্ভয় আশ্রয়ে সে তাঁর শ্রীচরণের উপর ঘুমাতে লাগল।

নবদ্বীপে হনুমান ও গোমো-তপোবনে কাক ও পক্ষীদের যত্ন ক'রে খেতে দেওয়া গুরুদেবের দৈনন্দিন সেবাকার্য্য ছিল। নবদ্বীপে হনুমানদের জন্য আসত বস্তা বস্তা রাঙা আলু ও অন্যান্য শব্জী, তা ছাড়া মিষ্টান্ন ও নানাবিধ খাবারও তাদের দিতেন তিনি। মন্দিরের বাইরে সর্বসমক্ষে তাদের পেটপুরে খাইয়েও তৃপ্ত হতেন না তিনি; নিমতলার গলিতে একটি ক'রে মাটির থালা ও জলের গেলাস সাজিয়ে রাখতেন, সেখানে তাঁর ইচ্ছামত ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াতেন তাদের। সাধারণ মায়াবদ্ধ স্বার্থসর্ব্বস্ব মানুষ তাঁর এ কাজকে নেহাৎ অপচয় ব'লে মনে করবে এবং এ দৃশ্য সহ্য করতে পারবে না, তাই তাদের জানতে না দিয়ে তাদের চোখের আড়ালে সামনের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে নিভৃত গলির মধ্যে আনন্দময় এই চির-শিশু তাঁর জীবসেবানন্দে মেতে থাকতেন। এ ছাড়া ছিল তাঁর গো-সেবা, বিশেষতঃ ষাঁড়। আমাদের সময়ে আমরা কয়েকটি ষাঁড় দেখেছি, তারা গুরুদেবের এমন ভক্ত ছিল যে গুহাশ্রমের এতগুলি উঁচু সিঁড়ি ভেঙে তারা ঠিক নিয়মিত সময়ে আশ্রমের উপরে উঠে আসত এবং ফেনজল ইত্যাদি খেয়ে গুরুদেবকে দর্শন ক'রে স্বয়ং প্রভুর হাত থেকে কিছু খেয়ে তবে নামত। গুরুদেব অপ্রকট হ'লে একটি কালো ষাঁড়, যে গুরুদেব-বর্ত্তমানে প্রত্যহ তাঁর হাত থেকে কিছু খেত, গুরুদেবের মন্দির-বাতায়নের সমুখে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকত। অপলক দৃষ্টিতে গুরুদেবের শূন্য আসনের দিকে চেয়ে তার দুই চোখ বেয়ে জলধারা নামত।

আরও ছিল শ্মশানে শিবা-ভোগ—এ সেবাব্রত নিয়মিত ভাবে হ'ত গোমো তপোবনে। এখানে পাহাড় অঞ্চলে গভীর নিশীথে বাঘ-হরিণ-শেয়াল-বুনোশূয়র একসাথে গুরুদেবের হাতে ভোগ খেত। গোমো তপোবন আশ্রমে আর একটি খেলা করতেন পাখীদের নিয়ে। ডাল-অন্ন ভাল ক'রে মেখে নিয়ে বালতী বোঝাই ক'রে সেই বালতী-ভরা ডাল-অন্ন গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। এ সব ব্যবস্থা করতেন বড়দাদা (সুরেন্দ্রনাথ নন্দী) গুরুদেবের নির্দ্দেশমত; গুরুদেবও তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। বলা বাহুল্য, আমরাও তাঁদের পিছু পিছু যেতাম। তখন রাশি রাশি কাক এসে সেই অন্ন সেবা করত।

আর কুকুর? তাদের কথা কী আর বলব? তারা সব আশ্রমেই গুরুদেবের নিত্যসঙ্গী; গুরুদেব সর্ব্বদাই তাদের খাওয়াচ্ছেন। নিয়ম ছিল, আগে কুকুর-সেবা, তারপর মানুষ।

এরপর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তিনজন অতি উচ্চস্তরের সাধুর আগমন হয়েছিল গুহাশ্রমে। তাঁদের বিবরণ একে একে লিপিবদ্ধ করছি।

আষাঢ় মাসের ৫ই কি ৬ই হবে, অর্থাৎ অম্বুবাচীর দু'একদিন আগে। গুরুদেবের মন্দিরের বাতায়ন সমুখে বহু দর্শনার্থীর ভীড়ের মধ্যে একজন অতিবৃদ্ধ শীর্ণকায় সাধুর

দেখা পাওয়া গেল। সাধুজী অতি কষ্টে জনতার ভীড় ঠেলে গুরুদেবকে একটু দর্শনের চেষ্টা করছেন। এদিকে তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়বামাত্র গুরুদেব সচকিত হয়ে তাঁকে মন্দির ভিতরে ডেকে আনতে আদেশ করলেন আমাদের। আমরাও তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এসে তাঁকে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে এলাম। তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রকৃতিও ছিলেন। উভয়েই মন্দির মধ্যে প্রবেশ ক'রে গুরুদেবের কাছে এলেন। গুরুদেব এবার আমাদের সকলকে মন্দির ভিতর থেকে বাইরে যেতে ব'লে মন্দির-দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে নিভৃতে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। আমরা তো অবাক! বাইরে থেকে এই বৃদ্ধ সাধুজীর এমন কিছুই বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় না, অথচ তাঁকে দেখবামাত্র সকল দর্শনার্থীকে সরিয়ে দিয়ে, এমনকি আমাদেরও বাইরে যেতে ব'লে, তাঁর সঙ্গে একী গভীর ও নিবিড় অন্তরঙ্গতা! কে তিনি? অথচ ইতিপূর্ব্বে দেখেছি, লৌকিক ও জাগতিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী এবং বিত্ত ও প্রতিষ্ঠাবান্ দর্শনার্থীদের তিনি কোনো আমলই দিতেন না, অনেক সময় তাদের সাথে দেখাই করতেন না। আমার মনে আছে, একবার কয়েকজন এই জেলার Circle officer (ব্রিটিশ আমলের Circle officer রা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন), তাঁরা আমার পরিচিতও বটে, গুরুদেবের দর্শন ইচ্ছায় আশ্রমে এলেন। আমি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে মন্দির জানালার সমুখে অপেক্ষা করতে ব'লে গুরুদেবকে তাঁদের পরিচয় দিলাম। কিন্তু গুরুদেব, কী জানি কেন, কিছুতেই তাঁদের দর্শন দিলেন না। আর একবার দেখেছিলাম নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর পত্নী এলেন দর্শনে। তখনকার দিনে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তা বা রাজা ছিলেন। গুরুদেব ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীকে 'মা' 'মা' ব'লে ডেকে দু'একটা কথা বললেন বটে, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গ্রাহ্যই করলেন না। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখেছি—জাগতিক প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের তিনি বিন্দুমাত্র আমল দিতেন না, স্বয়ং মহাপ্রভু যেমন স্বেচ্ছায় রাজা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেননি। অথচ এই অপরিচিত শীর্ণ, বৃদ্ধ সাধুজীর এত আদর-আপ্যায়ন, যত্ন করলেন কেন তিনি? তার কারণ ভগবান বলেছেন, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ",—তিনি একমাত্র ভক্তি-লভ্য; ভক্তের ভক্তি-ডোরে তিনি বাঁধা আছেন। অভক্তেরা তাঁকে জানতে পারে না, বুঝতে পারে না—তিনিও অভক্তদের তাই গ্রাহ্য করেন না, তাদের যত প্রতিষ্ঠা, বিত্ত বা ক্ষমতা থাকুক না কেন। এই সাধুজী অবশ্যই একজন অতি উচ্চস্তরের সাধক; সাধন-মার্গে অগ্রসর হ'য়ে তিনি ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ ক'রে ভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হয়েছেন—তাই গুরুদেবের কাছে তাঁর অত আদর, অত যত্ন। গুরুদেব ওঁদের দু'জনকে নিজহাতে সেবা করালেন এবং ওঁদের থাকবার জন্য আশ্রমে সব রকম সুবন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। নীচের ঘরে তাঁদের আসন

ক'রে দেওয়া হ'ল। রাত্রে গুরুদেব স্বহস্তে তাঁদের সেবার দ্রব্যাদি সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন তাঁরা গুরুদেবের কাছে বিদায় চাইলেন, কিন্তু গুরুদেব কিছুতেই তাঁদের ছাড়বেন না। সাধুজী বুঝিয়ে বললেন, এক রাত্রির বেশী তিনি কোথাও থাকেন না—এটাই তাঁর নিয়ম। দ্বিতীয়তঃ, তিনি অম্বুবাচীতে কামরূপ-কামাখ্যায় যাবেন—এই সঙ্কল্প ক'রে তিনি বেরিয়েছেন। কিন্তু গুরুদেব ছেলেমানুষের মত কিছুতেই ওঁদের কথা শুনবেন না,—'মা' 'মা', 'বাবা' 'বাবা', ক'রে তাঁদের আকুল ক'রে তুললেন। "এই পাগল ছেলেকে ছেড়ে কোথায় যাবে মা, কোথায় যাবে বাবা ?"—এমনি সুধা-ঝরা স্বরে স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে তিনি তাঁদের একেবারে অভিভূত ক'রে ফেললেন। সেই সাধুজী অতিশয় গম্ভীর, প্রায় শতবর্ষ বয়স তাঁর। কচিৎ দু'একটা কথা বলেন, তাঁর নিয়ম খুব কঠোর, নিজ আশ্রম ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি এক রাত্রির বেশী বাস করেন না। অথচ আজ একী হ'ল তাঁর ? সেই অতিবৃদ্ধ, অতি গম্ভীর, অতি কঠোর নিয়মানুবর্ত্তী সাধুর হৃদয় আজ বিগলিত হ'য়ে পড়ল, তাঁর চিরজীবনের নিয়মভঙ্গ হয়ে গেল, গুরুদেবের স্নেহমাখা অনুরোধ তিনি এড়াতে পারলেন না। প্রায় সপ্তাহখানেক গুরুদেব তাঁদের সেবাযত্নে পরিতুষ্ট ক'রে তবে বিদায় দিলেন। সাধুজীর সাথে আমরাও মিশতে চেষ্টা করতাম ; কিন্তু তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ও স্বল্পভাষী হওয়ায় দু'একটিমাত্র কথাই হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। আমরা তো তাঁর অন্তর জগতের সন্ধান পাবনা, তাই তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও অল্প হতে বাধ্য। কিন্তু নিখিলান্তর্যামী গুরুদেব একবার দেখামাত্র তাঁর অন্তরের আসল রূপটির পরিচয় পেয়েছিলেন, বাইরে বিশেষ কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হয়নি তাঁদের। তবে আমাদের কাছে সাধুজী যে অল্প দু'একটি কথা বলেছিলেন, তাতে আমাদের গুরুদেবের সম্বন্ধে তাঁর অতি উচ্চ ধারণাই পরিস্ফুট হয়েছিল। তিনি কেবলই বলতেন, "বড়া উচা, বড়া উচা, উ বড়া উচা। নাগাস মেলা ভার। আমার নিয়মভঙ্গ করালে। এক রাত্রির বেশী থাকালে। এমনটি আর কুথা পাবেনা—বড়া উচা, বড়া উচা, বড়া উচা।"

সাধুজী মেদিনীপুরের লোক, বেশীর ভাগ থাকতেন উড়িষ্যায়। প্রায়ই ভ্রমণ ক'রে বেড়াতেন। বয়স প্রায় একশত। তিনি পরম যোগী, পরম বৈষ্ণব—সাধনার অতি উচ্চস্তরে উন্নীত। তাই দর্শনমাত্রেই গুরুদেবকে চিনেছিলেন, তাঁর আকর্ষণে ধরা পড়েছিলেন, এবং নিয়মভঙ্গ ক'রে তাঁর সেবা-যত্ন গ্রহণ করেছিলেন—কারণ গুরুদেব যে 'বড়া উচা, বড়া উঁচা'—সত্যই রতনে রতন চেনে।

সময়টা ঠিক স্মরণ নেই—তখন নবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় একজন দীর্ঘকায়, ক্ষীণতনু, উলঙ্গপ্রায় (শুধু একটি বল্কলের কৌপীন পরিহিত) পশ্চিমা পাগলা সাধুকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। সাধুজী রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যবিহীন-ভাবে দ্রুত চলতেন ;

হঠাৎ থেমে প'ড়ে সামনে যাকে দেখতে পেতেন তাকেই ডেকে বলতেন, "মেরা রাম-জীকো দেখা হ্যায়? মেরা রামজীকো পত্তা জানতা?" সমুখের লোকটি যখন অবাক বিস্ময়ে সাধুজীর দিকে চেয়ে থাকত, তখন সাধুজী বিষণ্ন কণ্ঠে বলতেন, "নেই দেখা, নেই জান্‌তা? সব কোই ওহি বোল্‌তা।" এই ব'লে তাকে ছেড়ে আবার দ্রুতবেগে চলতে সুরু করতেন। এই ভাবে সারাদিন ঘুরতেন। কারো সাথে প্রকৃতিস্থভাবে কোনো কথা বলতেন না। সকলে তাঁকে পাগল ব'লেই জানত। দয়া ক'রে যে যা ফেলে দিত, তাই তিনি আহার করতেন, কারো কাছে কিছু চাইতেন না। এই পাগল সাধুজী হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হলেন আমাদের আশ্রমে। তখন মন্দির দ্বার খোলাই ছিল এবং গুরুদেবও সমুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। সাধুজী আসবামাত্রই সমুখে গুরুদেবের দর্শন পেলেন। দর্শন মাত্র তাঁর সে পাগল ভাব বদলে গেল, তিনি চমকে উঠে চীৎকার ক'রে বেশ সজ্ঞানেই বলতে লাগলেন, "এহি তো মেরা রামজী হ্যায়; মিলা মিলা, মেরা রামজী মিলা!" এই ব'লে তিনি আনন্দে নাচতে লাগলেন—সেকী তার হর্ষ, সে কী তার পুলক! গুরুদেবও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মন্দির মধ্যে ডেকে নিলেন এবং আমাদের সকলকে বাইরে যেতে ব'লে তাঁর সাথে একাকী বহুক্ষণ ধ'রে নিভৃত-আলাপনে নিযুক্ত থাকলেন। তাঁকে ভাল ক'রে সেবাযত্ন ক'রে তবে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। আমরা সম্মান ক'রে তাঁকে রাধাগোবিন্দ মন্দির বারান্দায় বসালাম। সেই পাগল সাধু তখন আর 'পাগল' বা অপ্রকৃতিস্থ নেই। মুখ তাঁর ভাব-গম্ভীর, নয়ন যুগল অশ্রু-ছলছল। আমরা বিনীতভাবে তাঁকে দু'একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম—তাঁর পরিচয়, তাঁর আশ্রম, তাঁর সাধন-জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে। তিনি নিজের বিষয়ে কিছুই বললেন না। শুধু ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে স্পষ্ট ও দৃঢ়কণ্ঠে বললেন: (হিন্দীভাষার বঙ্গানুবাদ লিখছি) "আপনাদের যিনি গুরুদেব,—আপনারা যাঁর কাছে, যাঁর আশ্রমে আছেন—তাঁকে কি আপনারা চিনতে পেরেছেন? যদি না পেরে থাকেন, তবে নিশ্চয় জেনে রাখুন, আপনারা যাঁর কাছে আছেন তিনি এমন একটি বস্তু যিনি তুষ্ট হ'লে ত্রিভুবন প্রসন্ন হবে, চারদিক কল্যাণময় হবে—আর তিনি যদি রুষ্ট হন, তবে বিশ্বভুবনে আর কেউ নেই যে আপনাদের রক্ষা করতে পারবে।" এই বলতে বলতে ভাবাবেগে তাঁর দুই চক্ষু সজল হয়ে এল। এ সব পাগলের কথা নয়, তথাপি তিনি বাহ্যতঃ পাগলের ভাব গ্রহণ ক'রে পাগলের মতই আবার ছুটে বেরিয়ে গেলেন। পরপর আরও দু'তিন দিন তিনি এসেছিলেন। গুরুদেবও যত্ন ক'রে তাঁকে সেবা দিয়েছিলেন। তারপর আর তিনি আসেন নি। তাঁর একটি বল্কলের কৌপীন তিনি ভুলে আশ্রমে ফেলে যান—আমরা সেটি যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছিলাম।

এবারে যাঁর কথা বলছি, তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্প্রদায়ের একজন সাধক; নাম স্বরূপা-

নন্দ ব্রহ্মচারী—একজন ঘোর তান্ত্রিক সাধু। তিনি যে সাধনমার্গে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন, তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়। জাতি বাঙালী, বেশ উচ্চ বংশজ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান তিনি, তাঁর পিতামহ কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নিজেও উচ্চ-শিক্ষিত। সাধনমার্গে উন্নত হ'লেও তাঁর তেজ ও অহঙ্কার তাঁর চেহারায় ও কথাবার্তায় সুস্পষ্ট। দীর্ঘকায়, গৌরতনু, দৃপ্ত, তেজস্বী সাধক একজন। সাধনমার্গে অগ্রসর হ'য়ে তিনি বেশ কিছু বিভূতি অর্জ্জন করেছেন। এখন ভ্রমণে বেরিয়েছেন সাধু পরখ করবার জন্য। নবদ্বীপে অনেক প্রসিদ্ধ সাধু আছেন—এইরূপ প্রবাদ শুনেই তিনি নবদ্বীপে এসেছেন। নবদ্বীপে আর কোন্ কোন্ সাধু তিনি পরখ করেছেন তা জানিনা, তবে আমাদের আশ্রমে এসে তিনি যে ভাব দেখালেন, তাতে তাঁর সেরূপ মনোভাবই পরিস্ফুট হ'ল। আশ্রমে এসেই তিনি উন্নতশিরে দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, এখানে কোন্ সাধু আছেন, তার সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। তাঁর হাবভাব আমার মোটেই ভাল লাগলনা, বলতে কি আমি মনে মনে কিছুটা রুষ্টই হ'লাম তাঁর প্রতি। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না, কারণ আমার উপর মেজদা আছেন, যা বলবার তিনিই বলবেন। মেজদাকে গিয়ে সব কথা জানাতেই তিনি উপরে উঠে এলেন এবং সাধুজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করলেন। সাধুর অহমিকা ও দম্ভ লক্ষ্য ক'রেও মেজদা কিন্তু বিরক্তি বা রোষের ভাব প্রকাশ করলেন না, বরং অত্যন্ত সংযত ও মিষ্ট ভাষায় তাঁর সাথে কথাবার্ত্তা বললেন। তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে বসতে বললেন। আমরা আসন দিতে গেলাম, কিন্তু তিনি নিজের আসন ছাড়া অন্য আসনে বসলেন না। আমাদের গুরুদেবকে তাঁর কথা নিবেদন করা হবে, এ কথাও তাঁকে বিনীতভাবে জানানো হ'ল। এরপর মেজদা গুরুদেবের কাছে এসে সাধুজীর কথা বিস্তৃতভাবে জানালেন; তাঁর বংশ-পরিচয়, শিক্ষাদীক্ষা এবং সাধনজাত তাঁর তেজ ও বিভূতির কথাও বাদ দিলেন না। সব শুনে গুরুদেব যেন কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, বাবা, ওর খুব খাতির কর, আদর যত্ন কর, এই নাও, এইসব খাবার ওকে যত্ন করে খেতে দাও।" মেজদা বললেন, "কিন্তু ও তো আপনার দর্শন চায়, দর্শনের কথা কী বলব?" গুরুদেব মাথাটি নীচু করে বল্লেন, "হুঁ।" তারপর একটু থেমে বললেন, "বল, উঁর কত কাজ, এখন যোগের কাজে আছেন, এখন দর্শন হ'বে না।" মেজদা গম্ভীর হয়ে বললেন, "কিন্তু ও তো আপনাকে দর্শন করতেই এসেছে, খেতে আসেনি। একে তান্ত্রিক সাধু, তার উপর শিক্ষিত লোক, ওকে কী বলে বোঝাব?" গুরুদেব বললেন, "এলেই কি দর্শন হয়? ভাল করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে খুসী কর। তুমি তো আমার উকিল বাবা, তুমি ঠিক বোঝাতে পারবে। ওকে খুসী করে আজকের মত এখানে রেখে দাও। কাল যা' হয় হবে।" মেজদা আর কি করেন, গুরুদেবের আদেশ মত

তাঁর প্রদত্ত মিষ্টান্নের থালি হাতে নিয়ে উপরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে সাথে এলাম তার পর তাকে পরিতোষ করে খাইয়ে এবং মিষ্টি কথায় গুরুদেবের ও তাঁর উভয়ের মান মর্যাদা রক্ষা করে ও তাকে তুষ্ট করে সেদিনকার মতো আশ্রমে থাকতে রাজী করা গেল।

মেজদার সঙ্গে আবার মন্দিরে নেমে গেলাম গুরুদেবের কাছে। গুরুদেব চুপি চুপি মেজদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী বললে, বাবা ?" মেজদা হাসি মুখে বললেন, "রাজী করিয়েছি। সাধুজী আজ রাত্রে আশ্রমেই থাকবেন।" গুরুদেব তো শুনে মহাখুসী; বললেন, "বলেছি তো তুমি ঠিক পারবে।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, "কাল কিন্তু খুব সকাল সকাল এসো, বাবা।" গুরুদেব এমনভাব দেখালেন যে তিনি যেন কত অসহায় এবং সেই ভাবেই বললেন, "বাবা, ঐ বহ্মচারী তো আশ্রমে রইল, এদিকে আমি তোমার অবোধ পাগল ছেলে একা পড়ে রইলাম। তুমি না এলে কে আমাকে দেখবে, বাবা ?" গুরুদেবের সেই অসহায় ভাব ও কাতর আবেদন লক্ষ্য করে মেজদা তাঁকে সাহস দিয়ে বললেন, "বেশ, তাই আসব ; আপনি চিন্তা করবেন না। ব্রহ্মচারীর সঙ্গে যা কথাবার্তা বলতে হয় আমিই বলব।" গুরুদেব যেন মেজদার কথায় একটু উৎসাহ পেয়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা ন'টার মধ্যেই এসো। কাল এখানেই প্রসাদ পাবে।"

পরদিন সকাল সকালই আশ্রমে এলেন মেজদা। গুরুদেব মেজদাকে দেখে খুব সাহস পেলেন এই ভাব দেখিয়ে বল্লেন, "এসেছ বাবা। যাও, শীঘ্র সেই ব্রহ্মচারীর কাছে যাও, তাঁর তত্ত্বাবধান কর।" বলা বাহুল্য, গুরুদেব ইতিপূর্বেই তাঁর খোঁজখবর নিয়েছিলেন, তার সুখসুবিধার জন্য গত রাত্রি থেকে একাধিক লোক নিযুক্ত করেছিলেন। এবার মেজদা ঐ ব্রহ্মচারীর কাছে এসে তাঁর খোঁজ খবর করলেন। ব্রহ্মচারী জানালেন, তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি, আশ্রমের সেবকগণ ভাল ভাবেই তাঁর দেখাশুনা করেছেন। তারপর বললেন, "যেজন্যে আমার এখানে আসা, এবার তার ব্যবস্থা করুন। আপনাদের সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন।" মেজদা হেসে বললেন, "এইবার হবে।" তারপর গুরুদেবের কাছে এসে বললেন, "ব্রহ্মচারী আপনার দর্শনাকাঙ্খী, এবার তাঁকে দর্শন দিন।" মেজদার কথা শুনে হঠাৎ গুরুদেবের ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল। মনে হ'ল তিনি যেন খুব ঘাবড়ে গিয়েছেন। ভয়ে ভয়ে বল্লেন, "আমি ওর সাথে দেখা করতে পারব না, বাবা। একে তান্ত্রিক সাধু—ওরা কত কী জানে, তার উপর বলছ— উচ্চশিক্ষিত; ওদের সাথে কি কথায় আমি পারব ? তবুও ওর সাথে আলাপ জমিয়ে নানা কথাবার্তা বলে ওর প্রশ্নের যথাযথ উত্তরাদি দিয়ে সন্তুষ্ট করে ওকে বিদায় দিয়ে দাও।' মেজদা হেসে বললেন, "তাই কি হয়, বাবা ?" ও এসেছে আপনার সাথে দেখা করতে, আপনাকে পরখ করতে—আমার সাথে ওর কি সম্বন্ধ ? তাতে ও সন্তুষ্ট হবেনা।"

গুরুদেব মেজদার কথা শুনে মাথাটি নীচু করে একবার শুধু বললেন, "হুঁ"। তারপর আবার বললেন, "ওরা তন্ত্রমার্গের লোক, তার উপর আবার লেখাপড়া জানে। আর আমি তো তোমার এই ক্ষ্যাপা পাগল মূর্খ ছেলে—কী বলতে কী ব'লে ফেলব। দরকার নেই, বাবা। আমার বড় ভয় করছে।" মেজদা গুরুদেবকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "কথা আমিই বলব। আপনি শুধু দাঁড়িয়ে দর্শন দেবেন, আপনার কিছুই বলতে হবে না; আপনার কোনা ভয় নেই।" গুরুদেব তথাপি ইতস্ততঃ করে বললেন, "থাক, সে সব পরে যা হয় হবে। এখন ভাল করে ওর সেবার ব্যবস্থা কর।" মেজদা অগত্যা ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়ে নানা অজুহাত দেখিয়ে বেশ যুক্তিপূর্ণ কথায় গুরুদেবের দর্শনের সময় পিছেয়ে দিলেন। ব্রহ্মচারী তাহাতে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও বিশেষ অসন্তুষ্ট হলেন না। তবে দম্ভভরে জানাতে ভুললেন না যে, তিনি কাজের লোক, এক জায়গায় বেশী সময় নষ্ট করতে পারবেন না।

ভালভাবেই সেই তান্ত্রিক সাধুর সেবার ব্যবস্থা করা হ'ল। গুরুদেব স্বয়ং খাবার সাজিয়ে আনলেন, আর মেজদা নিজে তত্ত্বাবধান করে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন। আমি সর্ব্বদাই মেজদার পাশে পাশে ছিলাম। যেটা যখন প্রয়োজন হয়,—মেজদাকে সাহায্য করছিলাম। সেবার পর তাঁকে বিশ্রামের জন্য পাঠানো হ'ল এবং আশ্বাস দেওয়া হ'ল যে এইবার গুরুদেবের দর্শন করিয়ে দেওয়া হ'বে। এদিকে গুরুদেব সাধুজীর সেবা ভালভাবে হয়েছে জেনে খুসী হলেন। কিন্তু তাঁকে দর্শন দেওয়ার ব্যাপারে এখনো ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। মেজদা গুরুদেবকে ভালভাবে আশ্বাস দিলেও গুরুদেব বারবারই বলতে লাগলেন, "তাইতো বাবা, আজ না হয় থাক, ইত্যাদি।" শেষ কালে মেজদা যখন বললেন, "আমি বলছি আপনার কিছু ভয় নেই; যা, করবার আমিই সব করব। আমিই সব বলব। ওঁকে কথা দিয়েছি, এখন সে কথা না রাখলে আমাদের অপদস্থ হ'তে হ'বে। আপনারও মান-মর্যাদা ওঁর কাছে একেবারে-ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আপনি আর গড়িমসি করবেন না। এইবার তাঁকে দর্শন দিন। আদেশ করুন, আমি ওঁকে ডেকে নিয়ে আসছি।" মেজদার কথা শুনে গুরুদেব তখন যেন শান্তশিষ্ট বালকটির মতই বললেন, 'তা হ'লে যা' করবার কর, বাবা। আমি কিন্তু কিছু জানিনে। তোমার সব দায়িত্ব, ভাল মন্দ যা' হয় তুমিই দেখবে।"

গুরুদেবের কথা শুনে মেজদা উপরে উঠে এলেন এবং সহাস্যে ও সবিনয়ে তান্ত্রিক সাধুজীকে আহ্বান ক'রে মন্দির দরজার সমুখে এনে তাঁকে "সাধুবাবা, একবার দর্শন দিন" এই ব'লে ডাকতে অনুরোধ করলেন। তখন মন্দির দ্বার খুলে দেওয়া হল, সাধুজী মন্দিরের চাতালে দাঁড়ালেন। মন্দিরের ভিতর দৃষ্টিপাত ক'রে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কে, কোথায় আপনাদের সাধুবাবা?" মেজদা

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "এই যে ইনি।" ভাল করে দেখে সেই তান্ত্রিক সাধু বললেন, "ঐ যিনি গড় হয়ে প্রণাম করছেন, উনি? কিন্তু তাঁকে তো ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছিনা; তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমন কি মুখটিও তো তিনি আড়াল ক'রে রেখেছেন। যাঁকে দেখতে এলাম, তাঁকে ভাল ক'রে, তাঁর সর্ব অঙ্গ, দেখতে চাই।" এই কথা শোনার পর মেজদাও গুরুদেবকে মৃদুস্বরে বললেন, "বাবা, উঠে দাঁড়ান।" তখন গুরুদেব দুইহাত যুক্ত ক'রে প্রশান্ত নয়নে চেয়ে দণ্ডায়মান হলেন সেই তান্ত্রিক সাধুর নয়ন সম্মুখে। গুরুদেবের সর্ব অঙ্গ অনাবৃত, শুধু ক্ষীণ কৌপীন পরণে; সমস্ত দেহ অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, দুই নয়ন দিয়ে তীব্র তেজরাশি বিকীর্ণ হচ্ছে।

তান্ত্রিক সাধুজী দেখছেন,—দেখছেন অপলক নয়নে, দেখছেন তাঁর সর্বঅঙ্গ। গুরুদেবের শ্রীঅঙ্গের অলৌকিক তেজঃপুঞ্জ তান্ত্রিকের নয়ন ভেদ ক'রে অন্তর জগতে প্রবেশ করেছে; তিনি তাই শুধু নয়ন ভ'রে নয়, সমস্ত হৃদয় ভ'রে দেখছেন নয়নে তাঁর পলক নেই, মুখে এক বাণীহীন বিস্ময়। নয়ন সম্মুখে এ কী দৃশ্য দেখলেন তিনি আজ, এ কাকে দেখছেন তিনি। সেই বিস্ময়-বিমূঢ় তান্ত্রিক সাধুজীর সমস্ত অঙ্গ এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের আবেগে, এক প্রচণ্ড পুলকের তরঙ্গে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। অত বড় সাধু, অত বড় একজন শিক্ষিত লোকের মুখে একটি কথা বার হ'ল না—কাঁপতে কাঁপতে তিনি সেই চাতালের উপরই সশব্দে প'ড়ে গেলেন। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত ভাব ও অবস্থা দেখে আমরাও যেন কেমন বিমূঢ় হ'য়ে গেলাম। গুরুদেব একবার ইঙ্গিতে মেজদাকে সাধুজীর কাছে উঠে যেতে আদেশ করলেন। তখন মেজদা উপরে এসে ওঁকে ধ'রে তুলতে চেষ্টা করতে উনি উঠে দাঁড়ালেন। গুরুদেব তখনও তেমনই তাঁর সম্মুখে যুক্ত-করে দণ্ডায়মান। তান্ত্রিক সাধু তখনও কাঁপছেন, তাঁর সারা অঙ্গ রোমাঞ্চিত, কণ্টকিত, নয়নদু'টি অশ্রু ছল-ছল। তাঁর সমস্ত মুখ ভ'রে এক অলৌকিক দর্শনের সুদৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ এবং ভক্তিপূর্ণ এক কাতর আকুতি। বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে এখন তাঁর মনে এসেছে সুদৃঢ় প্রত্যয়—তিনি দেখেছেন, তিনি দেখেছেন; তিনি পেয়েছেন, পেয়েছেন; সেই সুদুর্লভ সাধ্য বস্তুকে লাভ ক'রে, সেই অধরাকে ধরতে পেরে, আজ তাঁর সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও মন পুলকের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। সেই অসম্ভব সম্ভব হওয়ায়, সেই আনন্দ-বন্যা-তরঙ্গে এবার তাঁর জিহ্বা মুখর হয়ে উঠল। দুই কর যুক্ত ক'রে গুরুদেবের দিকে চেয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবেগপূর্ণ অথচ উচ্চকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন; "কে আপনি, কে। হে মহাযোগেশ্বর, মহৈশ্বর্যশালী, অসীম শক্তিধর, মহাতান্ত্রিক, দেবাদিদেব মহেশ্বর, নিখিল জগতের প্রভু—কে আপনি। প্রভু, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন; রক্ষা করুন, রক্ষা

করুন,—এই অধম দীন সাধক আপনার মহিমা অবগত না হ'য়ে আপনাকে অবজ্ঞা ক'রে মহা মহা অপরাধে লিপ্ত হয়েছি—ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, প্রভু। হে অনন্তদেব, হে মহাপুরুষ—এই ক্ষুদ্র, নগণ্য জীবের নিদারুণ ঔদ্ধত্য, অমার্জ্জনীয় অপরাধ মার্জনা করুন, প্রভু। আপনাকে চিনতে না পেরে, সাধারণ মানুষ জ্ঞানে একী মহামূর্খতা, একী মহা অপরাধ ক'রে ফেলেছি, প্রভু। দয়াকরে, হে দয়াময়, এ অজ্ঞানের, এ অধমের, এ মহা অন্ধের সেই অজ্ঞানকৃত মহাপাপ মার্জনা করুন, প্রভু। কাতর মিনতি জানাই, প্রভু, একবার করুণ-নয়ন দৃষ্টিপাত করুন আপনারই এ অধম সেবকের প্রতি। প্রভু, আমি যাঁকে চাই, নিত্য যাঁর ধ্যান করি, আজীবন যাঁর সাধনা ক'রে এসেছি—সে মহা যোগেশ্বর আপনিই, আমার নয়ন সম্মুখে আজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে দণ্ডায়মান। আমার উপাস্যদেব, আমার সে সাধ্য পুরুষ, আমার সে ভগবান্ আপনিই। প্রভু ঐ দুটি দেবদুর্লভ, অভয় শ্রীচরণে স্থান দিন, স্থান দিন, প্রভু। ঐ রাতুল শ্রীচরণ-ছাড়া করবেন না, করবেন না, প্রভু; আমি যে আপনারই অধম দাস, আপনারই...." এইভাবে বহুক্ষণ বহুবিধ কাতর আকুতি জানিয়ে সেই তান্ত্রিক, সেই মহাগম্ভীর মহাপণ্ডিত, বিদ্যা ও সাধনা গর্ব্বে উদ্ধতচিত্ত সাধু বালকের মত আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

আমরা সকলেই বিস্ময়ে, পুলকে ও গুরুদেবের মহিমা গর্ব্বে নির্ব্বাক হ'য়ে বসে আছি। সহসা গুরুদেবই বললেন, "মেজবাবা, যাও, ওকে এই হরি লুট প্রসাদ দিয়ে এসো।" গুরুদেব প্রদত্ত সেই মিষ্ট নিয়ে মেজদা তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে তাঁকে ত' গ্রহণ করতে বললেন। তিনি তখনও অশ্রু-সজল কণ্ঠে কাঁদছিলেন, বললেন, "আমাকে মিষ্টি দিয়ে ভুলাবেন না, প্রভু! আমাকে ঐ শ্রীচরণ দুটি দিন, আমি যে ঐ শ্রীচরণের ভিখারী, প্রভু।" মেজদা বুঝিয়ে বললেন, "তিনিই আপনার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে মিষ্ট দিয়েছেন; তাঁর স্নেহের দানও তো উপেক্ষা করা উচিত নয়; এরও তো মূল্য আছে।" তখন সেই সাধুজী ভক্তিনত চিত্তে গুরুদেব-দত্ত সেই মিষ্টি গ্রহণ ক'রে শ্রদ্ধায় মস্তকে স্পর্শ করালেন, তারপর ভক্তিভাবে তা' সেবা করলেন। গুরুদেব বললেন, "বাবা, এবার বাইরে গিয়ে বিশ্রাম কর। পরে আবার দর্শন হবে।" তান্ত্রিক কিন্তু বার বার বললেন, "প্রভু, যখন আপনাকে চিনেছি, তখন কিছুতেই ঐ শ্রীচরণ ছাড়ব না, ঐ চরণের দাস ক'রে নিতেই হবে এই অধমকে। আর দূরে রাখবেন না, আমাকে এবার আপনার শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য করে নিন।" গুরুদেব বললেন, "সে সব কথা পরে হবে, বাবা। এখন যাও।" সজল নয়নে তিনি মেজদার সঙ্গে বাইরে গেলেন।

তারপর আরও দু'দিন ছিলেন সাধুজী। সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল তাঁর। কোথায় সে গাম্ভীর্য্য, কোথায় সে ঔদ্ধত্য, কোথায় সে দর্প? একেবারে মাটির মানুষ,

বিনয়ী, নম্র, ভাব-বিভোর—গুরুদেবের কথা প্রসঙ্গে চোখে জল। তিনি যাঁর সাধনা করেন, তিনিই ইনি—এ দুর্লভ দর্শন তাঁর হয়েছে,—এতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা। তবু কর্মস্রোত—কর্মের বন্ধনকে মানতে হবে সকলকেই। তাঁর মত জ্ঞানী সাধকের এ তথ্য অজ্ঞাত ছিলনা। যাবার সময় গুরুদেব তাঁকে ডেকে নিভৃতে অনেক উপদেশ দিলেন।

এই যে স্বরূপ দর্শন লাভ—এ দুর্লভ সৌভাগ্য আরো কোনো কোনো কৃপাধন্য ভক্তের হয়েছে। তার মধ্যে আমি স্বচক্ষে যাঁদের দেখেছি এবং তাঁদের সেই দর্শন সময়ে উপস্থিত ছিলাম, তাদের বিবরণ দিলাম। আর একজন ভক্ত আমার সামনেই গুরুদেবের স্বরূপ-দর্শন পেয়েছিলেন—তিনি হচ্ছেন গোমো আশ্রমের মহাভক্ত সুরেনরায়। বাহ্যতঃ সুরেন রায় ছিলেন একজন অতি সাধারণ শিষ্য। প্রথম দিকে গুরুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ খুব কমই ছিল তাঁর। গুরুদেব যখন গোমো আশ্রমে অবস্থান করতেন না, তাঁর সেই অনুপস্থিতির সময় গোমো আশ্রমটি তত্ত্বাবধান করবার মত কোনো যোগ্য শিষ্য পাওয়া যেত না। কী ভাগ্য ছিল, কী সাধনা করেছিলেন এই সুরেন রায় যে, সেই দুর্গম গোমো তপোবনের সমস্ত ভার গুরুদেব তাঁকেই বহন করবার শক্তি দিলেন। গুরুদেব যখন আশ্রমে থাকতেন না, তখন প্রতিবেশীবর্গ যথেচ্ছভাবে আশ্রমে আধিপত্য করত। তাদের সন্তুষ্ট ক'রে রাখা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। একদিকে প্রতিবেশীর যথেচ্ছ অত্যাচার, অন্যদিকে বাঘ-বুনোশূয়র-সাপের ভয় এবং ভূতপ্রেতের বিভীষিকা। কোনো মানুষের সাধ্য ছিলনা একাকী এই গোমো আশ্রমে থেকে সুচারুরূপে আশ্রম রক্ষা করা—শুধু রক্ষা নয়, বিবিধ ফুলে-ফলে আশ্রমটি সুশোভিত ও সুসজ্জিত ক'রে রাখা। কিন্তু এই নগণ্য শিষ্য সুরেনরায়কে গুরুদেব কী কৃপা করলেন জানিনা, কী অমিত শক্তি দিলেন তাকে, কী দুর্জয় সাহসে প্রণোদিত করলেন যে, তিনি একাকী এই গুরুশক্তি-বলে প্রবল প্রতাপে সেখানে আধিপত্য করতে লাগলেন, এবং এই পরিত্যক্ত অবহেলিত আশ্রম আবার বিবিধ ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে উঠল, নানাবিধ ফল ও শস্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল, সোনার তপোবনে আবার সোনা ফলল। শুধু তাই নয়, শক্তি তো তাঁকে সঞ্চার করলেন, উপরন্তু কী কৃপা তাঁকে করলেন যে প্রবল অনুরাগের বন্যায় তিনি ভেসে গেলেন। সে সময়ে যে তাঁকে দেখেছে, সেই তাঁর নয়নে-বচনে, কার্য্য-কলাপে, তাঁর স্তবস্তুতি ও গুরুগুণ-গানে, তাঁর নব অনুরাগমাখা ভাবময় মূর্ত্তি দেখে বিস্মিত না হ'য়ে পারেনি। সেই 'অতিধন্য' সুরেনরায়ের কথা বলছি। একদিন আমরা সকলে গুরুদেবের মন্দিরের সম্মুখের বারান্দায় ব'সে আছি,—সুরেন রায়ও আমাদের কাছে ব'সে আছেন,নত নয়নে ভাব বিহ্বল হয়ে গুণ গুণ করে গুরুগুণ-গান করছেন, এমন সময়ে গুরুদেব খট্ ক'রে

দরজার কপাট খুললেন। আমরা সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম তাঁকে। সুরেন রায়ও দূরে থেকে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে করযোড়ে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। গুরুদেব সহসা দরজাটি সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাতযোড় ক'রে ঢুলুঢুলু নয়নে আমাদের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন। অমনি এ কী! সুরেন রায় হঠাৎ থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলেন, তারপর গগনভেদী চীৎকার করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—"এ কী রূপ, এ কী রূপ দেখালেন প্রভু! যাঁর ইচ্ছায় এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হচ্ছে, সেই নিখিলান্তর্ব্যামী বিশ্বপিতা, দেবাদিদেব —এ কী রূপ তোমার। যাঁর ইঙ্গিত শিরোধারণ ক'রে আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্ররাজি অনুগত ভৃত্যের মত তাঁর আদেশ পালন ক'রে চলেছে, যাঁর ইচ্ছায় দিবা-রাত্রি হচ্ছে, যাঁর ভ্রূভঙ্গে এই অগণিত জীবকুলের জন্ম, জীবনলীলা ও মৃত্যু হচ্ছে, যাঁর ইচ্ছায় বৃক্ষলতাফুলেফলে এই পৃথিবী সুশোভিত, যিনি সব জীবের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান, সতত সর্ব্বত্র যিনি বিদ্যমান, যিনি মানব বুদ্ধি ও জ্ঞানের অগম্য, সেই অবাঙ্‌-মনসগোচর—এ কী রূপ দেখালে প্রভু! হে প্রভু, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, তুমিই সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মহানারায়ণ, তুমিই সেই চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠপতি, তুমিই সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় লক্ষ্মীপতি। দেব ঋষি মুনিগণ শতসহস্রবৎসর কঠোর তপস্যা ক'রে ধ্যানে যে চরণ দর্শন পান না, সেই দেব-মুনিদুর্লভ পরম-পুরুষ তুমি, সেই ভক্তের ধ্যানের ধন, সাধকের সাধনার ধন তুমিই প্রভু———।" এইভাবে বহুক্ষণ স্তব-স্তুতি করতে করতে তিনি যেন দিশেহারা ও উন্মত্তের মত হয়ে গেলেন। গুরুদেব সবসময়েই তার দিকে প্রসন্ন-নয়নে চেয়ে ছিলেন। তারপর হঠাৎ দুয়ার বন্ধ ক'রে দিলেন। সুরেন রায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের মত অবসন্ন হ'য়ে পড়ে থাকলেন। এ আশ্চর্য্য লীলা আমি স্বচক্ষে দর্শন করেছি; আরও যে যে ভক্তগণ এসময়ে আমাদের সঙ্গে থেকে এ অদ্ভুত অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম গুরুদেবের একান্ত ভক্ত হৃষীকেশ আঢ্য দাদা।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে, সুরেন রায় দাদা লেখাপড়ায় বেশীদূর অগ্রসর হননি, অথচ পরমাশ্চর্য্যের বিষয় দেখুন—গুরুদেবের স্বরূপ দর্শনমাত্রে তাঁর জিহ্বায় যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভগবৎস্তুতি, তাঁর মহিমাসূচক বন্দনা প্রকটিত হ'ল, তাকে একমাত্র সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতীর কৃপা-আবির্ভাব ছাড়া আর কোন ক্রমেই ব্যাখ্যা করা যায়না। এই সুসমৃদ্ধ ভাবালঙ্কার-ভূষিত বন্দনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

এইবার পূর্ব্বের ক্রমানুযায়ী লীলাবর্ণনায় ফিরে আসা যাক।

২৯শে শ্রাবণ শ্রীগুরুদেব নৌকাবিহার করলেন গঙ্গাবক্ষে। খেয়াঘাট পার হ'য়ে নিমতা-ঘাট পর্য্যন্ত গেলেন। তারপর ফেরা হ'ল।

৩০শে শ্রাবণ বেলা চারটার সময় গুরুদেবের এক প্রভাব-শালী স্থানীয় গোয়ালা ভক্ত গয়ারাম (বাসস্থান গঙ্গাতীরে ঘোলাপাড়ার চড়ায়) বাবাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য নৌকা নিয়ে এল। ভক্তগণ একে একে গুরুদেবের অনুগমন করলেন, গুরুদেব কৃপা ক'রে আমাকেও সঙ্গে নিতে চাইলেন, কিন্তু কী জানি কী এক দুর্জয় অভিমানে আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। কিন্তু শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণে নিবেদিতাত্মা এই অধম সন্তানের প্রতি তাঁর কী কৃপা দেখুন, স্বয়ং শ্রীরাধারাণী আমার অন্তরে আবির্ভূত হ'য়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন, "গুরুর সঙ্গে মান অভিমান ক'রে ব'সে থেকোনা, গুরুদেব যখন নিয়ে যেতে চাইছেন, অবশ্যই তাঁর সঙ্গে যাও।" মায়ের ভৎর্সনায় আমার জ্ঞান হ'ল, আমি শ্রীগুরুদেবের পিছু পিছু গিয়ে নৌকায় উঠলাম।

ভক্ত গয়ারাম নৌকায় ক'রে গুরুদেবকে তার বাড়ী নিয়ে গেল। আমরা সকলে গিয়ে উঠলাম গয়ারামের বাড়িতে। গয়ারাম সপরিবারে গুরুদেবের চরণে এসে পড়ল। ওদের বাসভূমি পবিত্র হ'ল। আশ-পাশের প্রতিবেশীরাও এসে সমবেত হ'ল। সহর থেকে দূরে গঙ্গাসৈকতের এই গ্রাম্য পরিবেশ বেশ ভালই লাগছিল আমাদের। মধুর 'মা,' 'মা' আহ্বানে ও সুধা-ঝরা 'হরি-বোল' ধ্বনিতে গুরুদেব দিগ্‌বিদিক মুখরিত করলেন। তাঁর উপস্থিতিতে সেই গঙ্গা সৈকতে যেন আনন্দের বন্যা এল, ক্ষণেকের জন্য যেন সেই স্থান মধুর বৃন্দাবনধামে পরিণত হ'য়ে গেল। প্রচুর হরিলুট মিষ্টান্ন দুইহাতে বিতরণ ক'রে গুরুদেব আবার নৌকায় গিয়ে উঠলেন। নৌকা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যেতে যেতে ক্রমশঃ রেললাইনের কাছাকাছি এসে পড়ল। ঠিক সেই সময় রেললাইনের উপর দিয়ে একটি যাত্রী-ট্রেন দেখে হঠাৎ গুরুদেব বললেন, "বাবা, আর একটুও এগিওনা। তারা অতদূর থেকে এসে আমাকে না দেখতে পেয়ে খুব বিষণ্ণ হ'য়ে থাকবে।" সুতরাং ফেরা হ'ল। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে আশ্রমে এসে দেখি সত্যই কলকাতা থেকে ভূপেনবাবুরা এসে গুরুদেবের জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন। বস্তুতঃ গুরুদেব তাঁর অন্তরদৃষ্টিতে নিজ ভক্তদের উক্ত ট্রেনে দেখতে পেয়েছিলেন।

৩রা ভাদ্র গয়ারামের নৌকায় বেলা ২টা ১০ মিনিটে দ্বিতীয়বার বিদ্যানগর যাত্রা করা হ'ল। ভাদ্রের ভরা গঙ্গা, দুকূল ছাপিয়ে গঙ্গার গৈরিক, রঙীন জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে। চরের ঘর বাড়ী সব ডুবে গেছে। দু'একটা উঁচু গাছের মাথা জল ভেদ ক'রে উপরে জেগে আছে। কূল ঘেঁসেই আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। ঘোলাপাড়া পেরিয়ে মূলগঙ্গার খাত ছেড়ে পশ্চিম দিকের খালে, খড়ি-নদীতে, পড়লাম আমরা। তারপর রেল-লাইনের পুলের তলা দিয়ে আবার মোড় ঘুরে উত্তর অভিমুখী খালে গিয়ে পড়লাম। এ খালটি সরু। বর্ষাকালে ভ'রে যায়, অন্য সময়ে শুকনো

থাকে। মনে হয় গঙ্গারই পূর্ব্ব পরিত্যক্ত খাত। দুপাশে জঙ্গল, মাঝে মাঝে মাঠ। দৃশ্য পরম রমণীয়। আমার মনে হ'ল, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে যেন তাঁরই পরিচিত কোনো এক প্রাচীন ও পরিত্যক্ত লীলাভূমিতে এসে পড়েছি। শ্রীগুরুদেবও গভীর অভিনিবেশ সহকারে চারদিকের এই রমণীয় বনশোভা দেখতে লাগলেন। এমন ভাবেই দেখছিলেন যে মনে হ'ল—এসব যেন তাঁর পূর্ব্ব পরিচিত, যেন এই বন উপবনে কোনো এক সুদূর স্মৃতির কুসুম-চয়ন করছেন তিনি। বেলা চারটায় বিদ্যানগরে এসে পৌঁছলাম। নৌকা থেকে নেমে গুরুদেবকে মাঝে নিয়ে গান করতে করতে আমারা এগোতে লাগলাম। ঠাকুর বাড়ীর সেবায়েত ও পূজারীরা ব্যগ্র হ'য়ে ছুটে এসে গুরুদেবকে অভ্যর্থনা ক'রে এগিয়ে নিয়ে চলল। ঠাকুর বাড়ীর চারিদিকে পরিক্রমা করলাম আমরা গুরুদেবকে নিয়ে সুমধুর কীর্ত্তন করতে করতে। খুবই আনন্দ হচ্ছিল। সেবায়েতরা গুরুদেবকে পেয়ে আনন্দে একেবারে অভিভূত হ'য়ে গেল। তাঁকে নিয়ে কোথায় বসাবে, কী করবে যেন ভেবে পায় না। ঠাকুর বাড়ী থেকে গুরুদের মহাপ্রভুর পাঠ-স্থান সেই 'না-জানি-গাছ'-তলায় এলেন। গাছটি মহাপ্রভুর আমলের ব'লে প্রসিদ্ধ। গাছতলাটি বাঁধানো রয়েছে। গুরুদেবকে নিয়ে আমরা সেখানে বসলাম। তারপর গুরুদেব সকলকে প্রসাদ বিতরণ করলেন রাশি রাশি। ঠাকুর বাড়ীর সেবায়েত, পূজারী ও সমবেত গ্রামবাসীরাও গুরুদেবের শ্রীহস্তের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হ'ল। সেবায়েত ও গ্রামবাসীরা বললেন, তাঁরা এমন আনন্দ আর কখনও পাননি। সে সময়ে সকলেরই মনে হচ্ছিল—সাড়ে চার শত বৎসরের ব্যবধান যেন কোন্ যাদুমন্ত্র-বলে হঠাৎ অপসারিত হ'য়ে সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তগণ সঙ্গে আবার এসেছেন পাঠ করতে বিদ্যানগরের পণ্ডিতের টোলে, সেই 'না-জানি' বৃক্ষের ছায়াশীতল কুঞ্জতলে।

এবার বিদায়ের পালা। গান করতে করতে বেলা পাঁচটার সময় আমরা গুরুদেবকে নিয়ে পুনর্যাত্রা করলাম। সেবায়েত, পূজারী ও গ্রামের লোকজন সকলেই নৌকা পর্য্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিতে এলেন। তারপর সমবেত কণ্ঠে গুরুদেবের জয় ধ্বনির মধ্যে আমাদের নৌকা ছাড়ল বিদ্যানগরের খাল থেকে।

খাল বেয়ে অগ্রসর হলাম দক্ষিণ অভিমুখে। সমুদ্রগড় পেরিয়ে রেলের পুলের নীচে খড়ি নদীতে আবার পূর্ব্বাভিমুখী হয়ে নৌকা এগোতে লাগল। খড়ি নদী গিয়ে পড়েছে মূল গঙ্গা নদীতে। সেখানে প্রবল স্রোত। এই সাজসরঞ্জাম-বিহীন ছোট ছোট নৌকা বড় গঙ্গায় প'ড়ে যাতে বিপদগ্রস্ত না হয়, তজ্জন্য মাঝিরা (এখানে গোয়ালারাই অপটু মাঝির কাজ করছিল) খাল বিল ধ'রে নৌকা চালাচ্ছিল। পথে বৃষ্টির জন্য অনেক জায়গায় নৌকা থামিয়ে রাখতে হ'ল। ফলে শীঘ্রই সন্ধ্যার

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। অন্ধকারে চারদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না; চারিদিক জলে জলময়; ওদিকে আকাশে ঘন মেঘ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা কোন্ খালে যাচ্ছি, ঠিকপথে চলেছি না বিপথে পথহারা হয়েছি, তারও কিছুই নিশ্চয়তা নেই। এমনকি কোন্ দিকে যাচ্ছি, তাও কেউ বুঝতে পারছেনা। চারিদিকে সূচী-ভেদ্য অন্ধকার। মাঝে মাঝে আকাশের বিদ্যুৎচমকে দেখছি শুধু জল, আর জল। বিপথে চ'লে নৌকা যদি বড় গঙ্গার প্রবল স্রোতে পড়ে, তা হলে আর রক্ষা নেই। সকলেরই মনে এক অজানা ভয়; কেউ মুখফুটে একটা কথাও বলছে না। ওরি মধ্যে শুষ্ক কণ্ঠে কেউ কেউ এক এক বার মাঝিদের জিজ্ঞাসা করছে, "কতদূর এলাম, ঘোষ? জায়গাটা কোথায়? মৌভগার খাল কী পেরোলাম?" মাঝিও শুষ্ক ও ভীত কণ্ঠে বলছে, "আজ্ঞে, ঠিক ঠাহর হচ্ছে না।" মাঝির যদি 'ঠাহর' না হয় তো হবে কার? ভয়ে আমাদের সকলেরই বুক দুর দুর করতে লাগল। আতঙ্কে কেউ অনেকক্ষণ ধরে কথাই বলতে সাহস করলনা। আমাদের সকলেরই যখন এইরূপ আতঙ্কিত চিত্ত, তখন হঠাৎ শ্রীগুরুদেব মধুর কণ্ঠে বললেন, "বাবা, সব চুপ ক'রে আছ কেন? হরিনাম কর, গান কীর্ত্তন কর। তোমাদের যে গান বেশ ভাল জানা আছে, সেইগান কর, বাবা।" তখন সকলেরই প্রাণে সাহস ফিরে এল। ঘোষেদের মধ্যে অনেকেই ভাল গায়ক ছিল, ভাল হরি কীর্ত্তনগানও তাদের জানা ছিল। তারা তখন সমবেত কণ্ঠে গান সুরু করল, "রাধানামের হাঠ বসেছে—তাই এসেছি শুনে—"গানটি একেই অতি মধুর, তার উপর স্বয়ং গুরুদেব আমাদের মধ্যে বিরাজমান রয়েছেন—তাই কী জানি কী এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জেগে উঠল সকলেরই মনে, এবং সে গান গাইতে গাইতে আমরা সকলেই যেন একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলাম। তারপর গানের পর গান, আরও কত সুমধুর গান হল—কতক্ষণ কেটে গেল আমাদের চেতনাই নেই। এই কিছুক্ষণ আগে, যখন চারদিকে ঘন অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টি ও বাতাসের ঝাপটায় নৌকা একেবারেই চলছিল না, পাট ও ধান ক্ষেতের ওপর চার দিকই জলময়, কোথায় যাচ্ছি তাও তখন কেউ বুঝতে পারছিল না, অজানা বিপদের আতঙ্কে আমাদর বুক দুর দুর করছিল, মনে হচ্ছিল হয় তো বা সারা রাতই আজ এইভাবে জলে জলে ঘুরতে হ'বে তখন সম্মুখে উপবিষ্ট গুরুদেবকে মনেমনে বারবার বলছি, "হে গুরুদেব। এ কী হল—বিপন্মুক্ত করুন, মেঘ কাটিয়ে দিন, ঠিক পথে নিয়ে চলুন।" অন্তর্যামী গুরুদেব সে কথা শুনলেন। আমাদের মনের উদ্বেগ প্রশমনের জন্য তাই তিনি মধুর হরিনাম কীর্ত্তনের আদেশ দিলেন। সেই রাধানাম কীর্ত্তন আনন্দে বিভোর হ'য়ে আমরা যখন আসন্ন বিপদ আশঙ্কার উদ্বেগ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে গেছি, ঠিক তারপরই সবিস্ময়ে দেখলাম এত নিবিড় মেঘ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠল, মুক্তগগনে তারা ফুটে

উঠল। বুঝলাম, ভবকাণ্ডারী গুরুদেব ঠিকই হাল ধ'রে আছেন, আর রাধানাম কীর্তন রূপ দাঁড় বেয়ে আমরা সকল বিপদ মুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে কূলে এসে পৌঁছেছি। তখন আমরা মনের আনন্দে গুরুদেবের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। এমন সময়ে একজন মাঝি উল্লাসে ব'লে উঠল "চিনেছি, চিনেছি—এইবার আমাদের চেনা খালে এসে পড়েছি।" তখন আমরা আনন্দে আবার জয়ধ্বনি দিলাম। তারপর 'রাধানাম' গান গাইতে গাইতে অন্ধকারের কোলে কোলে নৌকা বেয়ে গুহাশ্রমের ঘাটে এসে তরী ভিড়ল। স্বয়ং গোলকপতি যেখানে সশরীরে বর্তমান, সেখানে কি বিপদ ঘটে? এ একটা তাঁর লীলা খেলা মাত্র। জয়ধ্বনি দিতে দিতে আমরা নৌকা থেকে নামলাম। গুহাশ্রমে পৌঁছালাম যখন তখন সন্ধ্যা ৮টা ৫০ মিনিট।

এবার গোমোতপোবনে যাবার দিন এগিয়ে আসছে। আমার মন এখনো অনুরাগের তরঙ্গে টলমল। গতবার এই সময়ে গোমো যেতে পারিনি। তাই এবার আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম। শ্রীগুরুদেব এবার আমায় নিরাশ করলেন না। ১৫ই ভাদ্র সোমবার আমি তাঁর সঙ্গে নিঃশঙ্ক আশ্রমে এলাম। গুরুদেব আমাকে কাছে কাছে রাখলেন। পরদিন তিনি আমাকে নিজে ডেকে খাওয়ালেন। ওদিকে নিঃশঙ্কের শিষ্যরা গুরুদেবকে শীঘ্র ছেড়ে দিতে চায়না—ঠিক হলো শুক্রবার গুরুদেব তপোবন যাত্রা করবেন। আমি শুনে নীরবে কাঁদতে লাগলাম। হঠাৎ বেলা ৩টা ৪৫ মিনিটের সময় গুরুদেব বললেন "আমি আর থাকতে পারছিনে, এখনি যাব।" তাঁর আদেশ মত তখনি মোটর ডাকতে পাঠানো হল। এদিকে আশ্রমবাসীরা গুরুদেবের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে প্রচুর মালপত্র বাঁধতে লাগল। নিঃশঙ্ক পল্লী-আশ্রম, ভাদ্রমাস। কাজেই মালপত্র হ'ল অনেক। পাকাতাল ও তালের আঁটি হ'ল বস্তা পাঁচ ছয়, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য ফল বস্তা চার, শাকসজী তরি তরকারি বস্তা চার—তা' ছাড়া গুরুদেবের অন্যান্য লটবহর, মিষ্টান্ন, হরিনামের ঝুলি ইত্যাদি। যাই হোক, সে সমস্তই মেমারী ষ্টেশনে ঠিক মত পৌঁছে গেল। মেমারী ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার স্বয়ং গুরুদেবের শিষ্য। কাজেই গুরুদেব ষ্টেশনে পৌঁছান মাত্র মাষ্টার মশাই নিজে, তাঁর ষ্টাফ ও কুলিরা সব সন্ত্রস্ত হ'য়ে এগিয়ে এলেন গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করতে। ট্রেন এলে তাঁরা একটি খালি কামরা দেখে মালপত্র সহ গুরুদেবকে ভালভাবেই তুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ আমাদের মালপত্র গোছগাছ সম্পূর্ণ না হ'ল, ততক্ষণ ট্রেন ছাড়ল না। তারপর সমবেত জয়ধ্বনির মধ্যে ট্রেন চলতে সুরু করল।

এতক্ষণ কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল বুঝতেই পারি নি। কিন্তু এবার বুঝতে হ'বে। কারণ আমি এখন একেবারে একা পড়লাম। মেমারী ষ্টেশনে একজন তথাকথিত শিষ্য অবশ্য ঐ গাড়ীতে উঠলেন, কিন্তু তিনি বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছানো মাত্র

গুরুদেবের প্রতি আর কোন মনোযোগ না দিয়ে (অবশ্য তাঁর হরিলুটের পুঁটুলি মনোযোগ সহকারে বেঁধে নিয়েছিলেন) গৃহাভিমুখে দ্রুত রওনা হ'য়ে গেলেন। আমি গুরুদেবকে নিয়ে একেবারেই একাকী প'ড়ে গেলাম। সঙ্গে স্বয়ং গুরুদেব, তাঁর যাতে কোন কষ্ট অসুবিধা না হয়, সেদিকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখতে হবে। তার উপর তাঁর সঙ্গে রয়েছে ১৪।১৫টি কুলির বহনযোগ্য মালপত্র। মেমারী ষ্টেশনে স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টার উপস্থিত থেকে এসব মাল তুলে দিয়েছেন—এবং এগুলি অতি নগণ্য জিনিস, যথা তালের আঁটি, পাকা তাল, শাকশব্জী যা গুরুদেবের বিলাবার বস্তু-এই জ্ঞানে সেগুলি 'বুক' করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি বলেই মনে হয়। কিন্তু এখন আমার মত এক নগণ্য অনভিজ্ঞ, অপদার্থের উপর এগুলির দায়িত্ব আমার ইচ্ছা না থাকলেও, এসে পড়ল। এগুলিকে নিয়ে একাকী আমি এখন কী করি—এই চিন্তায় আমি আকুল হ'য়ে পড়লাম। আমি বরাবরই বাইরের এসব কাজে একেবারে অপটু ও অক্ষম; তার উপর আমি তখন রুগ্ন ও অসুস্থ। গুরুদেবকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দুরু দুরু বক্ষে আমি কুলি ডাকলাম। তারপর মালপত্রগুলি গুছিয়ে নিয়ে একে একে কুলিদের মাথায় দিলাম। গুরুদেবের হরিনামের ঝুলি ও হরিলুট-মিষ্টান্নের ঝুড়ি অবশ্য আমি নিজে কাঁধে করলাম। এইভাবে ওভারব্রিজের দিকে এগোলাম। ব্রিজের গেটের সামনে আসতেই টিকিট চেকার আমার সঙ্গে অত গুলি কুলির মাথায় মাল দেখেই কুলিদের দিকে চেয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, "ঠহরো। এই সব মাল নামা, ওজন হবে।" শুধু তাই নয়, মাল আমাদের জেনে গুরুদেবকে ও আমাকে সেই ব্রিজের সমুখে দাঁড় করিয়ে রাখল। এইভাবে প্রতিহত হ'য়ে আমি একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেলাম, কী করব কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। আমার মাথা ঘুরতে লাগল, চারিদিকে 'সরষের ফুল' দেখতে লাগলাম। মনে হ'ল বুঝি বা অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে যাব। আমার এইভাবে হতবুদ্ধি হওয়ার কারণটি বিশ্লেষণ করে বলি। মাল বুক না হওয়ার জন্য বা আমার নিজের অপমানের জন্য আমি বিভ্রান্ত হইনি। এই সব মাল বুক না ক'রে আমি একা যদি যেতাম, তা হলে টিকিট চেকারের সামনে এসে প্রতিহত হ'য়ে আমি হয়তো বিব্রত বোধ করতাম, কিন্তু এতটা 'হতবুদ্ধি' হতাম না। কিন্তু আমার সঙ্গে রয়েছেন স্বয়ং গুরুদেব; আমার পাশে টিকিট চেকারের কাছে বাধা পেয়ে তিনিও 'অপরাধীর' মত ম্লান-মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এইভাবে 'অপরাধীর' মত কতক্ষণ যে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাও জানিনা; কারণ টিকিট চেকার প্যাসেঞ্জার পাস্ করাচ্ছে আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। আমরা সেইভাবে একপাশে নীরবে দাঁড়িয়েই আছি। তারপর অপমান লাঞ্ছনা যে কী পেতে হবে তাও জানিনা। আমার কাছে অত মাল বুক করার টাকাও ছিল না; গুরুদেবের কাছে—? কী জানি? এসব ভাবতে ভাবতে আমার

মাথা ঘুরতে লাগল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। সমস্ত দেহ মনের আমার যখন এইরূপ অবস্থা তখন হঠাৎ গুরুদেবের স্বরূপের প্রতি আমার মন নিবিষ্ট হ'ল। ভাবলাম, গুরুদেব তো স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। তাই যদি হন, তা হ'লে তিনি নিশ্চয়ই জানেন আমি এ সব ব্যাপারে কত অপটু, কত অক্ষম। আর এই মালপত্র—এসবও আমি নিজে নিয়ে আসিনি; নিঃশঙ্ক আশ্রমের শিষ্যরা যখন এত মাল চাপাল, তিনি তো নিষেধ করতে পারতেন; তাও তিনি করেন নি। অথচ এই অপদার্থকে সঙ্গে নিয়েই এত মালপত্র সহ তিনি ট্রেনে উঠেছেন। তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান হন, তবে তাঁর শক্তি তিনি এখন প্রয়োগ করুন এবং এইসব মালপত্রের মোকাবিলা তিনিই করুন। আর তিনিই যখন সর্ব্বান্তর্য্যামী তখন আমার মনের অবস্থাও তিনি সবই জানতে পারছেন। অতএব এবার সব ব্যবস্থা তিনিই করুন। নাঃ। আমি আর একটুও ভাবব না; শুধু নীরব দর্শক হ'য়ে রইব, আর দর্শন করব কেমন করে তাঁর ভগবত্তা, তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তা, আর তাঁর ভক্ত-বৎসলতা ভক্তের জন্ম আত্মপ্রকট করে।

মনে মনে যখন এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প ক'রে চিত্ত স্থির করেছি, সব ভাবনা তাঁর চরণে অর্পণ করেছি, ঠিক সেই সময়েই এক অভিনব ঘটনা ঘটল। আমারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার অল্প কিছু দূরে একজন টিকিটকালেক্টর দ্রুত পদবিক্ষেপে চলে যাচ্ছিলেন। এর আগেও অবশ্য কোনো কোনো রেল-কর্মচারী প্লাটফর্মে যাতায়াত করেছেন দেখেছি। কিন্তু এঁর দৃষ্টি হঠাৎ আকৃষ্ট হ'ল গুরুদেবের প্রতি, এবং ইনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর একবার ভাল ক'রে দেখেই তিনি সবিস্ময়ে ছুটে এলেন এদিকে। গুরুদেবের কাছে এসে জুতা খুললেন এবং ভক্তিভরে বললেন, "সাধুবাবা, আপনি!" গুরুদেব প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি বললেন, "আজ্ঞে, আমি আপনার মোহিত বাবা, সেই যে গোমো ষ্টেশনে আপনার 'অমুক' বাবুর সঙ্গে আপনার দর্শন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।" পরিচয় দিয়ে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। উল্লসিত হয়ে তাড়াতাড়ি হরিলুটের ঝুড়ি নিয়ে এগিয়ে এলাম গুরুদেবের পাশে। গুরুদেব তার সবিশেষ পরিচয় ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে তাকে প্রচুর হরি-লুট দিলেন এবং বাড়ীতে 'মায়ের জন্য নিয়ে যেতে বললেন। তিনিও ভক্তিভরে সেই হরিলুট গ্রহণ করলেন। এইভাবে গুরুদেব যখন তাঁর সাথে আলাপে বিভোর, তখন পাশ দিয়ে আর একজন রেল-কর্মচারী যাচ্ছিলেন। তিনি মোহিত বাবুকে ঐ ভাবে একজন চটপরিহিত সাধুর সঙ্গে আলাপরত দেখে থমকে দাঁড়ালেন ও এ দিকে এগোতে লাগলেন। মোহিত বাবু তাঁকে নাম ধরে ডেকে এগিয়ে নিয়ে এসে বললেন, আরে আসুন, আসুন। ইনি আমাদের সেই প্রখ্যাত গোমোর সাধু-

বাবা; প্রণাম করুন।" তিনিও সবিস্ময়ে দুই চোখ কপালে তুলে বললেন, "তাই নাকি?" তারপর জুতা খুলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। প্রণামান্তে গুরুদেবের পাশে আমি দাঁড়ালাম হরিলুটের ঝুড়ি নিয়ে। তাকেও প্রচুর হরিলুট দিলেন ও বাড়ী নিয়ে যেতে বললেন। দু'জনের সঙ্গে আলাপ হ'তে হ'তে প্লাটফর্মে গমনরত আরও একজন, আরও, আরও……। এমনি ক'রে ক্রমেই রেল কর্মচারীদের ভীড় বাড়তে লাগল। শেষকালে এমন হ'ল যে সেখানে আর জায়গা হয়না। ওঁরা বললেন, "আপনি তো গোমো যাবেন, চলুন, এখানে আর দাঁড়িয়ে কেন—আপনাকে ট্রেনে তুলিয়ে দিয়ে আসি।" এই ব'লে ওঁরা কুলিদের ইঙ্গিত করতেই ওরা মাল তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল। দশ বারো জন রেল কর্মচারী যখন গুরুদেবকে ঘিরে ওভারব্রিজে উঠতে লাগলেন, তখন আমাদের সেই গেটের টিকিট-চেকার করুণ চোখে আমাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল। আমি উল্লসিত হ'য়ে গুরুদেবের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। রেল কর্মচারীগণ ও কুলিরা সমবেত ভাবে আকাশ ফাটিয়ে গুরুদেবের জয়ধ্বনিতে যোগ দিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁর অক্ষম ও অপদার্থ ভক্তের অন্তরের বেদনা অবগত হয়ে স্বীয় অসীম শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের বিন্দুমাত্র সেদিন প্রকাশ করলেন।

বহু রেলকর্মচারী ও কুলি পরিবৃত হয়ে গুরুদেব যখন দ্বিতীয় প্লাটফর্মে এসে পৌঁছালেন তখন কালকা-মেল আসতে আর বেশী দেরী ছিলনা। ঐ অল্প সময়টুকু ভক্ত রেল-কর্মচারীগণের সহিত নানাবিধ আলাপে রত থাকলেন গুরুদেব। তারপর রাত্রি ১০টা ২৭ মিনিটে প্লাটফর্মে প্রবেশ করল তখনকার দিনের প্রখ্যাত ট্রেন 'দিল্লী কালকা-মেল।' সুখের বিষয় ঐ দিন কাল্‌কা মেলে ভীড় ছিলনা মোটেই। রেল কর্মচারীরা আবার ওরি মধ্যে একটি খালি কামরা খুঁজে নিয়ে তাতেই গুরুদেবকে উঠিয়ে দিলেন। সেদিন উক্ত প্লাটফর্মে সে কী বিপুল জনসমাগম। সবাই অবাক বিস্ময়ে গুরুদেবকে দর্শন করছিল,—প্লাটফর্মে যত রেল-কর্মচারী, যত যাত্রী ছিল সকলেই। গুরুদেবের গাড়ীর সামনে যেন মেলার মত ভীড় জমে গেল। নিছক যাত্রী বা বাইরের লোকের এত আকর্ষণ এর আগে কখনো দেখিনি। রেল কর্মচারীরা না হয় গুরুদেবের মহিমা কিছুটা জানত—কিন্তু এই সব নিছক ট্রেন ভ্রমণকারী, পথচারী বা কুলির দল। এরা কেমন ক'রে সেদিন সমবেতভাবে গুরুদেবের প্রতি এত গভীরভাবে আকৃষ্ট হল? রেল কর্মচারীরা কুলিদের সাহায্যে মালগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ ক'রে আমাকে সব দেখিয়ে দিলেন। আমার কিছুই করতে বা ভাবতে হ'ল না। ট্রেন ছাড়ার আগে আমি কুলিদের পয়সা দিতে গেলে তারা গুরুদেবের মাল বহন করার জন্ত পয়সা নিতে চাইল না। গুরুদেবের নির্দ্দেশে অবশেষে আমি ওদের দিকে ওদের প্রাপ্য মজুরির পয়সা ছুড়েই দিলাম। এ ছাড়া প্রচুর

মিঠার হরিলুট তো দেওয়াই হ'ল। প্লাটফর্মস্থ কর্মচারী, যাত্রী, পথচারী ও কুলিদের সমবেত জয়ধ্বনিতে সেদিন বর্দ্ধমান ষ্টেশনের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। সে কী উল্লাস, সে কী উৎসাহ, সে কী সমবেত কণ্ঠের সোৎফুল্ল জয়ধ্বনি! তারি মধ্যে হুইসিল দিয়ে ট্রেন চাড়ল। ট্রেন কর্মচারীরা হাত নেড়ে বিদায় জানাল। কুলিদের গোমো ষ্টেশনে যেতে অনুরোধ করলাম, ওরা সানন্দে রাজী হ'ল।

এক অপদার্থ অক্ষম অসুস্থ ও রুগ্ন ভক্তাধম সেদিন যখন 'কেমন ক'রে একাকী গুরুদেবকে নিয়ে যাব'—এই ভেবে আকুল হয়ে উঠেছিল, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁর অসীম শক্তি সমুদ্রের বিন্দুমাত্র যা প্রকাশ করলেন, তা' বহু সমর্থ, সুস্থ ও সবল ব্যক্তি দ্বারাও করানো সম্ভব হত না।

রাত ১টা ২৫ মিনিটে গোমো ষ্টেশনে ট্রেন পৌঁছাল। ষ্টেশনে অভাবনীয় রূপে আমাদের দুজন রেল-কর্মচারী শিষ্য জীবন দাদা ও কমল দাদা উপস্থিত ছিলেন—গুরুদেব যে আসছেন এঁরা তা' কেউই জানতেন না, অথচ দুজনেই প্লাট্ফর্মে উপস্থিত হ'য়ে গুরুদেবকে সাদর অভ্যর্থনা ক'রে নামিয়ে নিলেন। দেখেশুনে আমি তো অবাক! একী মহিমা তোমার প্রভু! আমাকে অক্ষম বুঝে পূর্ব্বাহ্নেই সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। বলা বাহুল্য আমার কিছুই করতে হ'ল না; ওঁরাই কুলির ব্যবস্থা ক'রে মহানন্দে, গুরুদেবকে নিয়ে আশ্রমে চললেন।

গুরুদেবের অনুগমন করতে করতে সারাপথ শুধু এই ভেবেছি—হে প্রভু, একবার মাত্র সকাতরে এ অধমের অক্ষমতা নিবেদন করার ফলে একী বৈভব প্রকাশ করলেন প্রভু!—সারা রাস্তা নয়ন জলে ভেসে মনে মনে বলেছি "এই যে তোমার অনন্ত বৈভবাবৃত সিন্ধু, মোর বাক্যনোগম্য নহে এক বিন্দু।"

গোমো তপোবন

এবার গোমো তপোবনে এসে অনুরাগের তরঙ্গদোলায় আমি যেন দুলতে লাগলাম। আমার মনে হ'ত স্বয়ং বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ যেন এখানে লীলা করছেন। আর আমি তাঁর অতি নিজজন, তাঁর একান্ত অনুগত দাস হ'য়ে তাঁর অপ্রাকৃত লীলায় সাধ্যমত সহায়তা করছি এবং সে লীলাদর্শনে আনন্দে বিভোর হ'য়ে আছি। বস্তুতঃ আমার চারপাশে যা ঘ'টে যেত, তা' এক মধুর স্বপ্নের মতই সুন্দর মনে হ'ত। শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা আসছেন যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে সেরূপ মিশতাম না। আমার মনোযোগ একমাত্র গুরুদেবের লীলার দিকেই কেন্দ্রীভূত ছিল, তাই বাইরের শিষ্য-বর্গ ও অন্যান্য ঘটনাবলী আমার কাছে অস্পষ্ট হ'য়ে মনে কোনো রেখাপাত করত না; কোনো বিশেষ বস্তুকে focus করলে ক্যামেরার ছবিতে যেমন তার চারপাশের

background out of focus বা hazy হয়ে যায়, আমারও ঠিক তাই হয়েছিল। তবে সেই সময়ের ডায়েরীতে উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

টিটিলাগড় থেকে কমলা-দুর্গাপদবাবুরা এসেছিল এবং শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে দিন দশ অবস্থান করে ৩রা, আশ্বিন শনিবার বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। ৫ই আশ্বিন একটি বিশেষ কাজে শ্রীগুরুদেব নবদ্বীপ যাত্রা করেন এবং ১১ই আশ্বিন রবিবার রাত্রি ৯টার এক্সপ্রেসে নিঃশব্দ হ'য়ে গোমো আশ্রমে ফিরে আসেন। পূজার ক'দিন যদিও আশ্রমে শিষ্যবর্গ বিশেষ কেউ আসেন না, তবু এই দিনগুলি আমার খুব ভাল-ভাবেই কেটেছিল। সাক্ষাৎ জগৎপিতাকে পেয়ে ও তাঁকে সাক্ষাৎ-ভাবে পূজা-অর্চনা-আরতি আদি দ্বারা তাঁর 'বর্ত্তমান'-সেবা লাভ ক'রে আমার যে কী ভালো লেগেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

পূজার দিনগুলিতে শ্রীগুরুদেবকে গভীর শোক ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ও অশ্রু-সজল কণ্ঠে বলতে শুনেছি, "এই সময়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে যে নিষ্ঠুরতা করা হয় তার তুলনা নেই। আহা! কত নিরীহ নির্ব্বোধ জীব এই সময়ে অসুরের খড়্গাঘাতে বলি হচ্ছে!"

২৩শে কার্ত্তিক সোমবার 'মীরা'-পালাগান গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে গুরুদেবকে শোনানো হ'ল। পালা-গানটি মীরার ভজন গানে ভর্ত্তি। ভজনগান-গুলি শুনে গুরুদেব এত গভীর ভাবে লীলাবিষ্ট হ'য়ে পড়েছিলেন যে তাঁর বাহ্যস্মৃতি ছিল না। শেষ গানটি করতে করতে মীরা যখন তাঁর গিরিধারীলালের অঙ্গে মিশে যাচ্ছেন তখন গুরুদেবের সে কী করুণ ক্রন্দন! তাঁকে আর থামানো যায় না। সেদিন মীরার ভজনগান শুনে আমরাও যেন এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে প্রবেশ করেছিলাম।

২৪শে মঙ্গলবার গুরুদেব পরেশনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলেন; সেদিন আমার যাওয়া হয়নি। ছোট গাড়ী, ভক্ত ছিলেন অনেক,—সেই জন্যই আমার যাওয়া হ'ল না। কিন্তু তাতে আমার কীযে দুঃখ হল! চুপ করে একাকী বিষণ্ণ মনে আশ্রমে রইলাম।

গুরুদেবের লীলাদর্শন ক'রে অনুরাগের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কাল-সমুদ্রে আরো দু'সপ্তাহ কেটে গেল আমার।

৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীগুরুদেব একটার এক্সপ্রেসে গোমো ত্যাগ করলেন। ৯ই রাত্রি সাড়ে আটটায় আমি নবদ্বীপ গুহাশ্রমে পৌঁছলাম।

১১ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার কমলারা টিটিলাগড় থেকে গুহাশ্রমে এসে পৌঁছাল। ১২ই শনিবার রাসপূর্ণিমা। ১৬ই বুধবার দয়াময় গুরুদেব স্বয়ং আমাকে ডেকে নিজহাতে প্রসাদ দিলেন। অন্তরে যে-প্রসাদ কামনা ক'রে আমি নিত্য ধ্যান করি, অন্তর্যামীরূপে তা' অবগত হয়েই ভক্তবৎসল গুরুদেব তাঁর এই অধম শ্রীচরণাশ্রিতকে কৃপা করলেন। গুরুদেবের যখন সেবা হবে তা' সঠিক জানতে না পারলেও, অনুমান ক'রে আমি সেই পর্যন্ত জলগ্রহণ করতাম না—প্রসাদ পাবার আশায়। কোনোদিন সে প্রসাদ পেতুম ধ্যানে, কোনোদিন বাস্তবে। "কভু মিলে কভু না মিলে—দৈবের ঘটন," গুরুদেব প্রায়ই এ কথা বলতেন। তবু আশা ছাড়তাম না একদিনও।

১৯শে শুক্রবার কমলারা টিটিলাগড় যাত্রা করল। ২২শে মঙ্গলবার আশ্রমে 'কৃষ্ণ যাত্রা' হল। কৃষ্ণ-যাত্রা সে সময়ের এক অপূর্ব বস্তু। ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অভিনয়। ছেলেদের সকলকেই অতি সুন্দর ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হ'ত। তারপর সাজগোজ করিয়ে তাদের আসরে নামানো হ'ত। বড়রা শুধু বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গত করত। এই কৃষ্ণযাত্রায় ছোট ছেলেরা এমন সুন্দরভাবে অভিনয় ও গান করত যে তা' শুনে ভক্ত শ্রোতাগণ অভিভূত হ'য়ে পড়ত। শ্রীগুরুদেব বিভোর হ'য়ে এই যাত্রা-অভিনয় শ্রবণ করতেন। গুরুদেবকে নানাবিধ মালাভূষিত ক'রে গুহামন্দিরের দক্ষিণ দিকের জানালা সম্পূর্ণ খুলে সেখানে তাঁর আসন ক'রে দিতাম। আমরা কখনো গুরুদেবের কাছে, কখনো উপরে আসরে গিয়ে বসতাম। এই কৃষ্ণযাত্রা শুনে আমি এত বিভোর হয়ে যেতাম, যেন মনে হ'ত সত্য সত্যই বৃন্দাবনে এসেছি এবং সেখানে রাধাকৃষ্ণ ও গোপ-গোপীগণের লীলা দর্শন করছি। এমন কি যে-ছেলেটি 'কৃষ্ণ' সাজত, তার সঙ্গে আলাপও বন্ধুত্ব করবার জন্যও আগ্রহী হ'য়ে উঠতাম। সম্ভবতঃ গুরুদেবের শক্তিতেই ওদের লীলা-অভিনয় আরো প্রাণবন্ত, আরো হৃদয়-গ্রাহী হ'য়ে উঠত। আমার ইচ্ছা হ'ত এই লীলা-অভিনয় যেন রোজ রোজই হয়, নিত্যই মজে থাকি এই বৃন্দাবনলীলারসে। সে যে কী আনন্দ, কী মন-মাতানো নেশা—তা' মুখে প্রকাশ করা যায় না। যাত্রা শোনার পরও তার রেশ লেগে থাকত সারাদিন সব কাজের মধ্যে, সারানিশি স্বপনে। সেই ছোট্ট কৃষ্ণকে, তার মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি এত ভাল, এত মধুর লাগত আমার! মনে হ'ত ওর জগতে গিয়ে ওর সঙ্গে মিলেমিশে থাকি, ওর সখাদের মধ্যে একজন হ'য়ে ওর সাথে সাথে বেড়াই। গভীর নেশার মতই এই বাসনা আমার সমগ্র মনকে অধিকার ক'রে বসত এবং এই প্রবল নেশাকে ইচ্ছা করেও ছাড়াতে পারতাম না। যখন

অভিনয় হ'ত না, তখনও ওর জন্য মন কেমন করত; ওর বাসা-স্থান সন্ধান ক'রে ঐ 'কৃষ্ণ'-বেশী বালকটির কাছে যেতাম, ওর কাছে বসতাম, আলাপ করতাম এবং সেই আলাপনে কী যে আনন্দ পেতাম! নেশাচ্ছন্নের মতই মনে হ'ত আমার—এ সেই 'কৃষ্ণই', নিশ্চয়ই সে। তাই তো ছুটে ছুটে তার কাছে যেতাম! পরে বুঝেছি, এ সবই গুরুকৃপার নিদর্শন—নতুবা এমন হয় না, হ'তে পারে না কারও।

অন্তর্যামী গুরুদেব আমার মনের আকুল বাসনা ঠিকই পূর্ণ করলেন। ২৪শে বৃহস্পতিবার আবার কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় হ'ল আশ্রম-প্রাঙ্গণে। সাধারণতঃ বিকেলের দিকেই এই অভিনয় হ'ত। বাইরে বৃন্দাবনলীলা, আমার মনেও সেই মধুর লীলা—এবং ভিতরে বাহিরে সামঞ্জস্য রেখে তা' পরিচালনা করছেন স্বয়ং গুরুদেব। এ কল্পনা নয়, অনুমান নয়—এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ বার বার পেয়েছি আমি। আমার বৈজ্ঞানিক মন প্রমাণ ছাড়া কোনো জিনিষ কখনো গ্রহণ করতে পারে নি। আশ্রমে অনেক শিষ্য, কিন্তু যাত্রাভিনয় অন্তে গুরুদেব আমাকে ডাকতে ভুললেন না এবং যত্ন ক'রে, আদর ক'রে নিজ হাতে গুছিয়ে প্রসাদ দিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। লীলাচ্ছন্ন মন নিয়ে আমি বাড়ী ফিরলাম।

২৫শে শুক্রবার—গুরুদেব আমার মনের আকুলতা জেনে আজও কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করালেন। আমি যেমন আমার 'কৃষ্ণ'কে ছাড়তে পারছিনা, আমার 'কৃষ্ণ'ও তেমনি আমাকে ছাড়ছে না—রোজই এসে বৃন্দাবনলীলার অভিনয় ক'রে আমাকে তার অঙ্গীভূত ক'রে নিচ্ছে।

পরের দিন আমার শরীর অসুস্থ হ'ল; এবং আশ্চর্য! এ দিন আর গুরুদেব যাত্রা অভিনয় করালেন না। আমি সারাদিন আশ্রমে যেতে পারিনি। বিকেলে গিয়ে শুনলাম গুরুদেব আমার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন আমাকে খাওয়াবার জন্য।

৬ই পৌষ সোমবার আমার অসুখ খুব বেশী; বাড়ীতে রোগশয্যায় শুয়ে মনে হ'ল আর বোধ হয় দর্শন হ'বে না। আকুল হ'য়ে সকাতরে গুরুদেবকে ও জগজ্জননী রাধারানীকে ডাকতে লাগলাম। আমার সে আর্তি নিশ্চয়ই জগন্মাতার কর্ণে প্রবেশ করেছিল, এবং গুরুদেবের আচরণে ও পরম দুর্লভ গুরুকৃপাতেই তা' প্রকটিত হ'ল। কারণ পরদিন আশ্রমে গিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করা মাত্র তিনি আমাকে গুহার অভ্যন্তরে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রসন্ন বচনে বললেন, "বাবা, তুমি যে আকুল হ'য়ে মা রাধারানীকে ডেকেছ, তাতে তাঁর আসন টলেছে তোমার প্রতি মা রাধারাণীর অসীম স্নেহ। তাঁর আকুল আগ্রহে তোমার আসন্ন মৃত্যু-যোগ থেকে তোমার রক্ষা ক'রে গুরু-চরণ ও মাতৃ-চরণে তোমায় সমর্পণ করলাম। তোমাকে আজ

থেকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, তুমি সংসারী হবে না, বিয়ে করবে না, চাকরী করবেনা—আজীবন গুরুআশ্রমে থেকে গুরুসেবা করবে। শ্রীশ্রীগুরুরাধাগোবিন্দের কৃপায় তোমার কিছুরই অভাব হ'বে না। চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী রেখে তোমাকে গুরুর প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জানালাম সব। তোমাকে আশ্রমের কর্ত্তা ক'রে রাখব, এই আমার ইচ্ছা। তুমিও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ছেড়ে কোথাও যাবে না। "জীবনে-মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি"—এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে গুরুপাদপদ্মই জীবনে মরণে একমাত্র গতি ক'রে থাকবে। যা, করেন গুরুদেব করবেন—মনে এই অটল প্রত্যয় রেখে আর কোনো চিন্তা করো না। সর্ব্বভাবে গুরুপদে আত্মসমর্পণ করতে পারলে আর তো কোনো ভাবনা থাকবে না, বাবা। আমি সজলনয়নে বললাম, "মন যদি বিপথে যায়, রতি যদি চঞ্চল হয়, তখন কী করব? সেটা তো আমার আয়ত্তে নয়, ওটা যে আপনিই হয়।" গুরুদেব বললেন, "তখন 'মা, রক্ষা করুন, মা রক্ষা করুন'—এই ব'লে আকুল হ'য়ে মা রাধারাণীকে ডাকবে। আমার যা, তা'তো করলাম, এইবার কাতর কণ্ঠে আকুল হয়ে কেবল 'মা'-কে ডেকো। 'মা' রাধারাণী ছাড়া আর কে রক্ষা করবে, বাবা?" গুরুমুখে মা রাধারাণীর এই অচিন্ত্য মহিমার কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। গুরুদেব অভয় দিয়ে বললেন, "ভয় কি, বাবা? তুমি আমার সোনার ছেলে; তুমি গুরুর হ'য়ে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে থাকবে। তোমাকে যে মঠের প্রধান ক'রে দেওয়ার ইচ্ছা আমার। তুমি গুরুর নাম-প্রচার ক'রে চারিদিক গুরুময় ক'রো, বাবা।"

গুরুদেবের এই অমৃতস্রাবী বাণী শ্রবণ করে আমি শুধু নীরবে নয়ন-জলে ভাসতে লাগলাম।

গুরুদেব বললেন, "রাধারাণীর কৃপায় আজ তুমি যে ধর্মতত্ত্ব পেলে, তা দেবতারও দুর্লভ।" অন্তরে মা রাধারাণীর অভয় বাণী শুনতে পেলাম, "গুরু তোমায় কৃপা করেছেন; ভয় নেই, বাবা। সর্ব্বদা গুরুর কাছে কাছে থাকবে, গুরুর হাওয়ায় হাওয়ায় থাকবে।"

অদ্য আমার পিতার ও দিদিমায়ের দীক্ষামন্ত্র হল।

পরদিন ৮ই বুধবার শ্রীগুরুদেব নিঃশঙ্ক আশ্রমে যাত্রা করলেন। পরম করুণাময় গুরুদেব কিন্তু আমাকে শ্রীচরণছাড়া করলেন না, আমাকেও সঙ্গে নিলেন। মা রাধারাণীর আজ্ঞা-বাণী 'গুরুদেবের কাছে কাছে তাঁর হাওয়ায় থাকবে' পূর্ণ করলেন গুরুদেব।

নিঃশঙ্কে আশ্রমে গুরুদেবের কাছে কাছেই থাকতাম। গুরু যখন কৃপা করেন, তখন তা' স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপে প্রকাশ পায়; আবেদন-নিবেদন আদি বহু চেষ্টাতেও

সে কৃপালাভ ভাগ্যে ঘটে না। আমার বহুদিনের ধ্যানের ধন, দেব-বাঞ্ছিত সাধু-গুরু প্রসাদ এখানে এসে না চাইতেই তিনি স্বয়ং প্রত্যহ আমাকে দান করেছিলেন। খেজুর গাছের মেতি গুরুদেবের একটি প্রিয় সেবার দ্রব্য। বটতলায় বসে গুরুদেব মেতি সেবা করলেন এবং সেবা-অন্তে আমাকে প্রসাদ দিলেন। রাত্রে পেলাম আলুরদম প্রসাদ। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই তাঁর অযাচিত কৃপা-প্রসাদ পেতাম। ১২ই রবিবার সকালে বহু ভক্তের দীক্ষামন্ত্র হ'ল। বিকালে শ্রীগুরুদেব কৃপা ক'রে তাঁর শ্রীচরণ সেবার আদেশ দিলেন। এই ভাবে শ্রীরাধারাণীর আজ্ঞামত গুরুর হাওয়ায় হাওয়ায় আছি। কিন্তু মা কি আমায় দূরে রেখেছেন? না, কারণ সেইদিনই নিশিযোগে তিনি স্বপ্নে আমায় দর্শন দিলেন এবং অনেক ধর্ম উপদেশ দান করলেন। সে সব উপদেশ আমার হৃদয়ে গাঁথা রইল। ১৩ই সোমবার বেলা তিনটার সময় নিঃশঙ্ক থেকে যাত্রা করে রাত্রি সাড়ে ন'টায় নবদ্বীপ পৌঁছলাম।

২২শে পৌষ বুধবার অবেলায় দই ও খিচুড়ি খেয়ে আমার শরীর খারাপ হ'ল। সেদিন রাত্রে শুয়ে আর ঘুম এল না। এ রাত্রি আমার জীবনের এক স্মরণীয় রাত্রি। কারণ ঐ রজনীযোগেই গুরুদেব স্বয়ং আমার চিত্তাকাশে উদিত হয়ে তাঁর অচিন্ত্য শক্তির 'ভজ নরহরি' শ্লোকের অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ব্যাখ্যা প্রকাশ করলেন। সারা রাত্রি সেই আধো-জাগরণ আধো-ঘুমঘোরে আমার মনে হ'ল, চলন্ত ছবির পর্দায় যেমন এক একটি নতুন নতুন ছবি পর পর প্রতিফলিত হয়ে চলে, তেমনি আমার মানস মুকুরে 'অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারী' এক একটি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা প্রতিবিম্বিত হ'য়ে ফুটে উঠছে তার মহা মহিমায়! রাত্রি প্রায় ভোর হ'য়ে এল। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। এ কী অপূর্ব্ব আলোক-সম্পাত! এ কী অচিন্তনীয়, এ কী অভিনব, এ কী পরমাদ্ভুত ব্যাখ্যা-বৈচিত্রী! বিস্ময়ে আমি একেবারে অভিভূত, স্তব্ধ। যা' কোনদিন শুনিনি, ভাবিনি, কল্পনাও করিনি—আজ এই নিশিযোগে সেই সব অত্যাশ্চর্য্য, কল্পনাতীত অর্থাবলী কে আমার মানস-রাজ্যে প্রকাশ করল! অর্থের এতই বিস্ময়কর বৈচিত্রী, এতই নিবিড় গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-মাধুর্য্য যে, এখনি তা' লিপিবদ্ধ না করলে পরে ভুলে যাব। তাই আলো জেলে সেই ভোর রাত্রেই সেই বিচিত্রব্যাখ্যা-সম্বলিত 'Vision' লিপিবদ্ধ করতে বসলাম।

এই অপরিকল্পিতপূর্ব অত্যদ্ভুত ব্যাখ্যা পেয়ে আমি যেন অভিভূত হ'য়ে গেলাম। ভক্তগণের কাছে বা শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে এ ব্যাখ্যা শোনাতে প্রথমে সাহস হ'লনা আমার। কী জানি—এ যদি আমারই মনের প্রলাপ হয়—এরূপ সন্দেহ দ্বিধাও মনে জাগল। কিন্তু এ যে আমার কল্পনারও অতীত, সুতরাং আমার মনের সৃষ্টিতো হ'তে

পারে না। বার বার মনের মধ্যে এইরূপ আলোড়ন হয় আমার। অথচ কাউকে সাহস ক'রে শোনাতে ভরসাও হচ্ছে না। কিন্তু কী জিনিষ দেখালেন আমার গুরুদেব! নাঃ, আর তো মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারছি না। অবশেষে ভাবলাম যিনি আমার অন্তরে সতত বিরাজমান, সেই মা রাধারাণীকেই জানাই সব। তিনি তখন কৃপা করে আদেশ দিলেন গুরুদেবকে এই ব্যাখ্যা শোনাতে। তখন আমি আমার এ বাসনার কথা কর্তামাকে দিয়ে গুরুদেবকে জানালাম। গুরুদেব কৃপা করে বললেন, "বেশ তো, ভক্তরা সবাই এলে, সকলের সামনে শুনিও।" দুপুরের পর মেজদা, ছোড়দা ও ভক্তবৃন্দ সবাই এসে সমবেত হলেন। গুরুদেব মেজদাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "মেজবাবা, সুরেনধন 'ভজনরহরি' সম্বন্ধে কী-একটা লিখেছে, সেটা পড়ে তুমি সবাইকে শোনাও তো।" মেজদা গুরুদেবের কথায় আমার হাত থেকে খাতাটা নিয়ে পড়তে সুরু করলেন। ভক্তগণ রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনলেন, স্বয়ং গুরুদেব স্বীয় আসনে ব'সে সমাহিত চিত্তে করযোড়ে নতমস্তকে আগাগোড়া সব শুনলেন। তারপর পাঠ সমাপন হ'লে গুরুদেব শ্রীমুখটি তুলে মেজদার পানে চেয়ে বললেন, "মেজবাবা, তুমি কি মনে কর, সুরেনধন নিজের মন থেকে এটা লিখেছে? না, বাবা, গুরুদেব ওর অন্তরে উদিত হয়ে ওকে যা' জানিয়েছেন, তাই ও লিখেছে।" গুরুদেবের শ্রীমুখের এই বাণী শুনে শ্রোতাগণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। আমার দুই চোখ সজল হ'য়ে উঠল।

নরহরি-নাম-কীর্ত্তনের এই যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা স্বয়ং গুরুদেব আমার চিত্তাকাশে আবির্ভূত হ'য়ে প্রকাশ করলেন, এর একটি নিগূঢ় কারণ আছে। শিষ্যগণ ভক্তিভরে এই গুরুনাম কীর্ত্তন করতেন। শিষ্যগণ গুরুনামগুণ-গান করবেন—এর তাৎপর্য্য সহজেই বোধগম্য। কিন্তু গুরুদেব স্বয়ং এই নামকীর্ত্তন তো করতেনই, উপরন্তু এই নামগানে একেবারে বিভোর হ'য়ে যেতেন। নরহরি প্রভু নিজনামগানে কেন তন্ময় ও অভিভূত হ'য়ে পড়তেন—এর কোনো সৎ ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাইনি; পরন্তু নামে 'স্তুতিবাদ' রূপ 'অর্থবাদ'ই আমার তার্কিক মন অধিকার ক'রে বসে, এবং এতে আমি অত্যন্ত মানসিক পীড়া অনুভব করতাম। ভক্তবৎসল প্রভু একান্তভাবে তাঁরই শ্রীচরণাশ্রিত সন্তানের এই মনো-বেদনা অবগত হয়েই কৃপা ক'রে স্বয়ং আমার মানস রাজ্যে প্রবেশ ক'রে এই শ্লোকের অপরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করলেন; এবং সেই প্রসঙ্গে উৎসুক ভক্তগণকেও নাম মহিমা-উপলক্ষ্য ক'রে নিজতত্ত্ব ও ধর্মসাধনের নিগূঢ় স্বরূপও প্রকটিত করলেন।

'ভজনরহরি'-নামের ব্যাখ্যা প্রকাশের দু একদিন পরেই ২৫শে পৌষ শনিবার রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব। দেখলাম তিনি যেন কৃপা করে আমাদের গৃহে আগমন

করেছেন। আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে তাঁর শ্রীচরণ পূজা করলাম; পূজা অন্তে গুরুদেব আমাকে অনেক উপদেশ দান করলেন।

গুরুদেব শিষ্যকে সাধনতত্ত্ব দান করলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই শিষ্যের পরীক্ষা আরম্ভ হ'য়ে যায়। সে পরীক্ষা অতি কঠিন, তাতে গুরুর প্রতি বিশ্বাস রেখে টিঁকে থাকা অত্যন্ত দুরূহ। অন্তরে যাঁকে আমি একান্তভাবে আঁকড়ে ধ'রে আছি, আমার সেই কৃপাময়ী মা রাধারাণী এ বিষয়ে বার বার আমাকে সজাগ ক'রে দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন। মা বল্লেন, "বৎস, শ্রীগুরুর পরীক্ষা হচ্ছে তোমার উপর। গুরুর প্রতি বিশ্বাস হারিও না। যাই হোক না কেন, গভীর অনুরাগের সাথে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ধ'রে থাক। গুরুকৃপা হলেই সব বুঝতে পারবে। আমি বলছি, তোমার ভাল হবে।" মা রাধারাণীর এই সতর্ক বাণী পেয়ে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। ভেবে দেখলাম, সত্যই তো, শ্রীগুরুর পরীক্ষা আমাকে যেন ঘিরে রয়েছে।

ভিতরে পরীক্ষা, বাইরে পরীক্ষা, কাজের মধ্যে, আবার অকাজের অবসরে, দিনে, রাতে, জাগরণে এবং নিদ্রাতেও। সর্ব্বদাই এক বিরামবিহীন পরীক্ষার মধ্যে আছি— তা, বেশ বুঝতে পারছি। সোনাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে যেমন খাঁটি করা হয়, এ বোধ হয় সেই রকম পরীক্ষা। সেদিন ৩রা মাঘ শনিবার রাত্রে এক দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখছি, কিছুতেই যেন তা' থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবেনা, দুঃস্বপ্ন তার কঠিন, নির্মম, লৌহশৃঙ্খলে আমাকে বেঁধে রেখেছে। হঠাৎ মনে হল, আমার গুরুদেব আছেন, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন গুরুর অভয় শ্রীচরণ আছে। সেই দুটি রাতুল শ্রীচরণ স্মরণ করামাত্র সেই লৌহশৃঙ্খল খুলে গেল, মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেলাম। জয়গুরু, জয়গুরু ব'লে জেগে উঠলাম।.

৪ঠা রবিবার। আজ আমার এক কঠিন পরীক্ষার দিন। দুপুরে যথারীতি গুরুদেবের কাছে বসে তাঁর চিঠিপত্রাদি লেখার পর গুরুদেব আমাকে আদেশ করলেন, "সুরেন-ধন, তোমার বন্ধুর কাপড়ের দোকান থেকে সস্তা দরে কাপড় নিয়ে এসো।" তখন নবদ্বীপের অন্যতম বৃহৎ কাপড়ের দোকানটির কেনাবেচার ভার ছিল আমার এক সহপাঠী ও অনুরাগী বন্ধুর উপর। সে নামমাত্র লাভ রেখে আমাকে কাপড় বেচত— গুরুদেবের খেলার জন্য। সেদিন ওর কাছে গিয়ে শুনলাম টাকায় একজোড়া ন হাতি কাপড় পাওয়া যাবে। দরাদরি করাতে কাপড় প্রতি আরো এক আনা কম হ'ল। আশ্রমে এসে গুরুদেবকে এ কথা জানাতে তিনি বালকবৎ খুসীতে ব'লে উঠলেন, "ঐ দোকানে ঐ কাপড় যত আছে সব নিয়ে এসো। ঐ সঙ্গে তার সমসংখ্যক রেডিমেড ফতুয়াও এনো।" আমি মহা উৎসাহে ওর দোকানে গিয়ে ওর দোকানের যাবতীয় ন' হাতি ধুতি ও তৈয়ারী ফতুয়া কিনলাম। কাপড় জামাগুলি বেঁধে ঠিক একটা গাঁটের

মত হ'ল। বন্ধু বললে, "নিয়ে যেতে পারবে তো?" আমি উৎসাহভরে বললাম, "নিশ্চয়ই, যদিও ঐ ভার তখন আমার পক্ষে অত্যধিক ছিল। তখন আমার সেই মারাত্মক ব্যাধি অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে এলেও, স্বাস্থ্য শোচনীয়, শরীর নিতান্তই হতশ্রী, পাণ্ডুর, মলিন ও জীর্ণশীর্ণ। তার উপরে পরণে একটা ময়লা কাপড় ও গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি। আমাকে দেখে ভ্রমেও কেউ কোনো 'ভদ্রলোক' বলে মনে করবে না। সেই অর্দ্ধমৃতের মত মলিন চেহারায়, মলিন বসনে, হীন শ্রেণীর এক কুলির মত মাথায় এক গাঁট বস্ত্র নিয়ে সেই গোধূলিক্ষণের আধো আবছায়ায় নবদ্বীপের তথাকথিত ভদ্র-সমাজের মধ্যে দিয়ে পাতালপ্রভুর এক নগণ্য ভৃত্যরূপে একটি তুচ্ছ কুলির বেশে পথে অগ্রসর হ'য়ে চললাম। রাস্তার পথিকদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে হন্ হন্ ক'রে আমি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম। তবু শীতের ছোটবেলায় আশ্রমে ফিরতে সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এল। আশ্রমের নীচের গলিতে গর্ত্তের উপরে গুরুদেবেরই নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করে দেওয়া একটি কাঠের পুল ছিল। পুলটির ঠিক পাশেই পশ্চিমদিকে একটি সরু গলি গিয়েছে এই দুই গলির মোড়ে কাঠের পুলের কাছে কে একজন ব'সে ছিল—অন্ধকারে তা আমার ঠিক নজর হয়নি। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, কাজেই কোনো দিকে না চেয়ে, দ্রুতগতিতে আমি এগিয়ে আসছিলাম। কাঠের পুলের উপর যেমন আমি পা দিয়েছি, অমনি সহসা—একী! কে একজন দৈত্যের মত বজ্রমুষ্ঠিতে আমার হাতটি চেপে ধ'রে অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে 'এই শালা চোট্টা' বলে কুৎসিত ভাষায় অজস্র গালাগালি করতে লাগল। এই আক্রমণের আকস্মিকতায়, তীব্রতায় ও রূঢ়তায় আমি এতই অভিভূত হ'য়ে পড়লাম যে আমি থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলাম, মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'লনা– দু' একটা কথা বলতে গিয়েও কিছু বলতে পারলাম না। এই ঘোর বিপদে অভিভূত হ'য়ে বিপদ বিনাশন শ্রীগুরুদেবের কথা একবার বিদ্যুৎ ঝলকের মতই মনে পড়ল, তাঁর সেই অভয় শ্রীচরণ দুটি স্মরণ করলাম। কিন্তু স্মরণ করতেও যেন ঠিক পারছি না—তখনও আমি বিভ্রান্ত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! এক সেকেণ্ড, দু'সেকেণ্ড, তিন সেকেণ্ড—এমন সময়ে একী দৃশ্য! হঠাৎ সামনে দেখি মেজদা ও ছোটদা (সত্যহরি দাদা ও প্রকাশদাদা)। তাঁদের দেখামাত্র আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম, "মেজদা, দেখুন, দেখুন—এই লোকটা আমাকে আক্রমণ করেছে।" মেজদা ও প্রায় তৎক্ষনাৎ তেমনি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, "এ কী জমাদার, এ কী করেছ, কাকে ধরেছ? ইনি যে আমাদের গুরুদেব পাতাল বাবার শিষ্য। গুরুদেবই ওঁকে দোকানে পাঠিয়েছেন কাপড় জামা কিনে আনতে। তুমি ওঁকে চেনোনা, কত বড় মানী ও শিক্ষিত ব্যক্তি উনি। ভক্ত ব'লে এ রকম দীনহীন বেশ। জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেটরা এঁর বন্ধু। তুমি করেছ কী, জমাদার? তোমার জেল হবে

যে,।" মুহূর্ত্ত মধ্যে জমাদারের রূপ পাল্টে গেল। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে তখন বিনীত কণ্ঠে বললে, "আজ্ঞে, আমি জানতাম না; খুব ভুল হ'য়ে গেছে। এখানটায় বড় চোর-চাপ্টার উপদ্রব ব'লে পাহারায় ছিলাম।" মেজদা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তাই ব'লে তুমি ভাল লোককে ধরবে—বিশেষতঃ সাধুবাবার শিষ্য এমন একজন লোককে? উনি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্কে বললে তোমার কী হ'বে তা ভেবেছ? তোমার উত্তর-পূব জ্ঞান নেই, ভালমন্দ বোধ নেই, চোর সাধুর তফাৎ বোঝ না?" পুলিশ-জমাদার মিনতির সুরে বললেন, "আজ্ঞে, অপরাধ হ'য়ে গেছে।" মেজদা বললেন' "এত বড় অন্যায় ক'রে এখন মুখে অপরাধ স্বীকার করলেই চলবেনা। চল, আমাদের গুরুদেব পাতাল-বাবার কাছে। সেখানে গিয়ে তাঁর সামনে ক্ষমা চাইতে হ'বে। তিনি যদি ক্ষমা করেন, তবেই তোমার নিস্তার। নইলে, যা, করেছ তাতে তোমার কঠিন সাজা অনিবার্য্য।" জমাদার কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "আজ্ঞে, তাই যাচ্ছি, চলুন।" আমাদের পিছু পিছু এল সেই ভীত, সন্ত্রস্ত জমাদার। আশ্রমে মন্দিরে প্রবেশ করেই দেখি—গুরুদেব একেবারে প্রস্তুত হয়েই আছেন। মেজদা গুরুদেবকে আনুপূর্ব্বিক সব বৃত্তান্ত বলার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব আমার হ'য়ে সেই জমাদারকে তীব্র ভৎসনা করলেন—ঠিক মেজদা যেভাবে করেছিলেন প্রায় অনুরূপভাবে। গুরুদেবও আমাকে এমন ভাবে প্রকাশ করলেন যে বেচারা জমাদার এবারে সত্যিই ভ্যাবাচাকা খেয়ে প্রায় কেঁদে ফেলল। নত হ'য়ে আমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে এল। আমি একটু সরে এসে বললাম, "আমার গুরু-দেবের কাছে ক্ষমা চাও, তা হলেই হবে। উনি যা' করবেন তাই হবে, আমরা তাঁর ভৃত্য মাত্র।" তখন সে গুরুদেবের কাছে নত হ'য়ে হাত যোড় করে ক্ষমা চাইল। তবে ভুলের জন্য সে যে সত্যই অনুতপ্ত হয়েছে, এ কথা আমরা সবাই বুঝতে পারলাম, আর অন্তর্য্যামী গুরুদেব তো বটেই। আমার কাছে ও যোড়-হাতে বারবার ক্ষমা চাইল। তখন গুরুদেব প্রসন্ন হয়ে তাকে ক্ষমা করলেন এবং হরিলুট মিষ্টি, এমনকি একটি নতুন বস্ত্র উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন।

এখন এই নাটকীয় ঘটনার অন্তরালে গুরুদেব যে লীলা-অভিনয় করেছেন সেটা বলছি। আসল ঘটনাটি আগাগোড়া গুরুদেবের পূর্ব্ব-পরিকল্পিত, এবং তখন তাঁর অনুরাগে ভরা এই অধম ভৃত্যের উপর তাঁর একটি পরীক্ষামাত্র। গুরুদেব ভাল করেই জানতেন সেদিন সন্ধ্যায় পুলিশজমাদার ওখানে গোপনে চোর ধরবার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকবে। তাই কাপড়ের গাঁট মাথায় করিয়ে মলিন বেশে এই দীন হীন ভৃত্যকে ঠিক সন্ধ্যার সময় ওখানে আনিয়ে ছিলেন। তিনিই আমায় বিলম্ব করিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে ব্যস্ত হ'য়ে দ্রুতপদে আমি রাস্তা দিয়ে চলি।

এদিকে মেজদা ও ছোট্দাকে আমার কাছে সেই সঙ্কট মুহূর্তে উপস্থিত না করলে, বাহ্যতঃ আমাকে রক্ষা করা যাবে না, তাও তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাই এই নাটকীয় পরীক্ষার জন্য তাঁদেরও যথারীতি তৈরী রেখেছিলেন। মেজদারা সাধারণতঃ সন্ধ্যার একটু আগে আগেই গুরুদেবের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। সেদিনও সেই ভাবেই তাঁরা বিদায় নিয়ে উঠেছেন, এমন সময় গুরুদেব মুখটি নীচু করে বললেন, "বাবা, এখনই যাবে?" মেজদা বললেন, "আজ্ঞে, যাই, আর তো কোনো কাজ নেই; আপনিও এবার নিজের কাজে যান।" গুরুদেব এবার মাথাটি নীচু ক'রে বললেন, "হুঁ।" তারপর হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "ঐ দেখ, বাবা, সব বিস্মরণ হ'য়ে যায়। তোমাদের জন্য আলুর দম দেব যে—সব ভুলে যাই। দাঁড়াও বাবা, দেখি—আলুর দম হ'ল কি না।" এই বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি গরম গরম আলুর দম নিয়ে এনে ওদের দিলেন। ওরা তা' নিয়ে বললেন, "এবার যাই, বাবা।" গুরুদেব যেন অন্যমনস্ক হয়ে কোনো উত্তরই দিলেন না। ওঁরা আবার বিদায় প্রার্থনা করলেন। তখন গুরুদেব বললেন, "এ্যাঁ, যাবে, বাবা,? যাও।" সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠেছেন, হঠাৎ আবার গুরুদেবের ডাক, "মেজবাবা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমাদের জন্য পান্তুয়া রেখেছিলাম, কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছিনা। দাঁড়াও একটু।" ওঁরা আবার দাঁড়ালেন। গুরুদেব বেশ কিছুক্ষণ খোঁজা খুঁজি করে পান্তুয়া নিয়ে এসে ওঁদের দিলেন। ওঁরা এবার আবার আদেশ চাইলেন। গুরুদেব মাথা নীচু ক'রে রইলেন, কোনো সাড়া দিলেন না। ওঁরা আবার বললেন। এবার গুরুদেব যেন শুনতে পেয়ে অন্যমনস্কের মত বললেন, "এখনই যাবে, বাবা? তোমাদের এই পাগল ছেলের আর কে আছে? এই অবোধ সন্তানকে একা ছেড়ে যেতে তোমাদের মায়া হয় না, বাবা? তোমরাই তো আমার ভরসা, আমার সহায় সম্বল। তোমরা যতক্ষণ থাক, বেশ নিশ্চিন্তে থাকি।" এমন মিষ্ট কথা শুনে কে আর পা বাড়াতে পারে? তাঁরা আবার থমকে দাঁড়ালেন। গুরুদেবও এটা, ওটা, সেটা—নানা অপ্রয়োজনীয় কথা ব'লে সময় কাটাতে লাগলেন।.........তারপর হঠাৎ একসময় খুব ব্যাকুল হয়ে উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "যাও, যাও, বাবা; আর একটুও দেরী করো না। মায়েরা কত ভাবছে। যাও, যাও—এক্ষনি ছুটে যাও, তাড়াতাড়ি যাও, বাবা।" ওঁরা দ্রুতপদেই বেরিয়ে এসে যা' দেখলেন, তা' ইতিপূর্বেই বিবৃত করা হয়েছে।

এখন বুঝুন, আমাকে বাজারে পাঠিয়ে তিনি সমগ্র সময়ের প্রতিটি ক্ষণে আমার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। আমি যখন কাপড় কিনছি তখনই মেজদারা উঠি উঠি করছিলেন।

তারপর আমি কাপড়ের গাঁট মাথায় ক'রে চলেছি, আর সেই ভক্ত বৎসল ভগবান, সেই অন্তর্যামী গুরুদেব আমার সমুখে সমুখে চলেছেন। একরূপে তিনি রয়েছেন আমার সমুখে আমার মাথার উপরে, আর এক স্বরূপে তিনি গুহামন্দিরে বর্তমান থেকে মেজদা-দের আটকে রাখছেন আলুর দম দিয়ে, পান্তুয়া দিয়ে, নানা গল্প-গুজব ক'রে তারপর যে মুহূর্তে পুলিশ আমার হাত ধরেছে, আর আমি তাঁর অভয় শ্রীচরণ দুটি স্মরণ করেছি, অমনি সেই ভক্তবৎসল করুণাময় প্রভু উচ্চকণ্ঠে মেজদাদের আদেশ দিয়ে বলছেন, "যাও বাবা, এখনি যাও, তাড়াতাড়ি যাও।" একমিনিট আগে বা এক মিনিট পরে মেজদাদাদের ছাড়লে এ নাটকের অভিনয় আদৌ হত না। ঘাড়র কাঁটা ধ'রে তিনি ব'সে আছেন তার এই অধম ভৃত্য, অনুগত দাসের জন্য! পথ চেয়ে আছেন তার জন্য, কখন সে বিপদে পড়ে, কখন তার পরীক্ষার চরম মুহূর্ত আসে।

এই পরীক্ষা থেকে কয়েকটি শিক্ষা পেলাম। প্রথম, চারদিকে লোকজন সহায় সম্বল থাকলেও আকস্মিকভাবে বিপদ আসতে পারে, প্রচুর সহায় থাকতেও একেবারে অসহায় অবস্থা আসতে পারে। এই বিপদ কর্মজ বা শ্রীগুরুর পরীক্ষামূলক—এই দু'প্রকার হ'তে পারে। কর্মজ হলে তার ভোগ হয়, গুরুর পরীক্ষামূলক হ'লে সঙ্গে সঙ্গেই তার ফয়সালা হ'য়ে যায়। দ্বিতীয়, বিপদ যে প্রকারই হোক না কেন, সে সময় তৎক্ষণাৎ শ্রীগুরুচরণ একান্তভাবে স্মরণ করতে হবে; মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এবং কিছুতেই বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। নিজের বুদ্ধি খাটাতে গেলে বা ক্রোধের বশবর্তী হ'লে বিপদ বাড়বে, কমবে না। গুরুর পরীক্ষাজ বিপদ গুরুর চরণস্মরণে সঙ্গে সঙ্গে মায়ার মত মিলিয়ে যায়, আর কর্মজ বিঘ্নের ভোগ কমে যায়। তৃতীয়, শ্রীগুরুদেব অন্তর্যামী এবং তাঁর শরণাগত দাসের প্রতি পরম করুণ। চতুর্থ, আমি বৈজ্ঞানিক, তাই আমার বিজ্ঞান-মানসকে ঠিকমত Convinced করাবার জন্য এই time-synchronising factor, অর্থাৎ যখন আমার বিপদ এসেছে ঠিক তখনই, এক মিনিটও আগে বা পরে নয়, মেজদাদের দ্রুত পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা, অর্ন্তভুক্ত করলেন এই লীলা-অভিনয়ে। এই time-factor টুকু না থাকলে তাঁর অন্তর্যামিত্ব ও করুণাময়ত্ব এমন ক'রে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হ'ত না আমার বিজ্ঞান-ময় চেতনার কাছে।

শ্রীগুরুদেব যাকে পরীক্ষা করেন পরীক্ষার গুরুত্ব তার কাছেই, অন্য কেউ কিছুতে বুঝতে পারে না। আশ্রম যথারীতিই চলতে লাগল, আমার পরীক্ষা শুধু আমিই বুঝলাম। এদিকে গুরুদেবের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে আমার উপর রয়েছে তা' দিনে দিনে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠতে লাগল। পরদিন, অর্থাৎ ৫ই মাঘ সোমবার গুরুদেব ডাকলেন, "বাবা, সুরেন ধন, হনুমানে বাটি নিয়ে গেছে; তুমি নিয়ে এসো।" এভাবে গুরুদেবের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করতে যে কত ভালো লাগে। আমি একলাফে ছাদে উঠে হনুমান

কর্তৃক পরিত্যক্ত বাটিটি নিয়ে নেমে এলাম। গুরুদেবের কী আনন্দ! বললেন, "বাঃ তুমি বেশ বুদ্ধি ক'রে বাটিটি এনেছো তো, বাবা।" হনুমানটিকে কিছু খেতে দিয়ে তবে ওর বাটিটি পেয়েছিলাম, নতুবা বাটি নিয়ে ও বহুদূর চ'লে যেত, ফিরে পেতম না।

দুপুরে গুরুদেব একটি জামা ও গায়ের কাপড় দিলেন আমায়, আমি মাথায় ক'রে সে বস্ত্র গ্রহণ করলাম। বলা বাহুল্য, আমার তখন ভালজামা ছিল না। ময়লা কাপড় ও ছেঁড়া গেঞ্জি পরতাম। শ্রীগুরুদেব কিন্তু আমার এরূপ হীন বেশভূষা খুব পছন্দ করতেন; শ্রীমুখে বলেছিলেন, "সুরেনধন, এই দিন বেশই ভাল। ভগবান কাঙালের ঠাকুর। ভাল খাওয়া এবং ভাল পরা—এ আমাদের ধর্ম নয়। তুমি যে বাসি পচা জিনিস ছাড়া খাওনা, এবং এই মলিন বেশে থাক, এতে শ্রীগুরুদেব তোমার প্রতি প্রীতই হবেন। তুমি ঠিকপথেই চলেছ বাবা।" আমি অবশ্য তাঁর আদেশমত বা শাস্ত্র নিয়ম অনুযায়ী খাওয়া পরা করতাম না। ঐ রকম বেশে থাকতে, ঐরূপ খাদ্য খেতেই আমার ইচ্ছা হত, ভাল লাগত। গুরুদেব আমাকে বলছিলেন—"ঐটিইতো গুরু-কৃপা, বাবা,—যা' না বলতে কাজে আপনি প্রকাশ পায়।"

৬ই মাঘ। আজ সন্ধ্যায় কীর্ত্তন গান হ'ল। গুরুদেব আজ কৃপা ক'রে অনেক উপদেশ দান করলেন এবং তাঁর লীলা কথাও শোনালেন। ১১ই রবিবার শ্রীগুরুদেবের আদেশমত পাঠ ক'রে শোনালাম তাঁকে। ১৬ই শুক্রবার শ্রীগুরুদেবের উপদেশ বাণী শ্রবণ ক'রে নবশক্তি লাভ করলাম। গতরাত্রে তিনবার বিভীষিকা দর্শন করেছি এবং তিনবারই নামমন্ত্রে সে ভীতি কেটে গেছে। শেষরাত্রে মা রাধারাণীর দর্শন ও স্বপ্নে তাঁর শ্রীচরণসেবা লাভ। মা বললেন, 'সাবধান, মন বিগড়াতে দেরী লাগে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত নিষ্ঠা রাখবে। অস্ত্র নিয়ে খেলা—এ পিঠ আর ও পিঠ। সর্ব্বদা গুরুর পরীক্ষা। সাধন অতিশয় শক্ত। ভয় তো আছেই। সর্ব্বদা গুরুকে তুষ্ট রাখবে।" আমি তাঁর চরণ দুটি ধ'রে কেঁদে বললাম, "আপনাকে যে ভুলতে পারি না, মা। আপনার জন্য সদাই মন মুচড়ে ওঠে, মা।" মা হেসে বললেন, "ভুলবে কেন? রাধারাণী কি গোবিন্দ ছাড়া? মন কেমন করলেই প্রাণ ভ'রে আমায় ডেকো। ভক্তের দ্বারে আমি যে বাঁধা আছি, বাবা।" পরম স্নেহে মা আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর ঘুম ভেঙে গেল।

এর পর থেকে শ্রীগুরুদেবের নামে অনুরাগ বৃদ্ধি হ'ল আমার। ১৭ই শনিবার—আজ একটি মণিপুরী মেয়ের কৃষ্ণলীলা গান হ'ল। তার সুমিষ্ট কণ্ঠে ব্রজলীলা কীর্ত্তন শুনে গুরুদেব ভাবে বিভোর হ'য়ে গেলেন। ২৪শে শনিবার রাত্রে স্বপ্নে মায়ের এক ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শন করলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে মূর্ত্তি দর্শনে আমার একটুও ভয় হ'ল না, ঠিক যেমন ভীষণ-দর্শন নরসিংহদেব অসুরদের পক্ষে ভয়ংকর

হ'লেও প্রহ্লাদের আহ্লাদ-দায়ী' ('প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে'), সেইরূপ মায়ের সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি অসুর স্বভাব দৈত্যকুলের কাছে মহাভীতিপ্রদ হলেও আমার নিকট মমতাময়ী মায়ের মতই স্নেহশীলা ও করুণাপূর্ণা মনে হ'ল—যেমন "উগ্রোঽপ্যসুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃ-কেশরী, কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ।" আমি স্বপ্ন যোগে সেই মায়ের কোলে শুয়ে অনেক কথা বললাম।

এদিকে বাইরে গুরুদেবের লীলা দেখুন। ২৬শে দুপুরে গুরুদেব নিঃশঙ্ক আশ্রম থেকে গুহাশ্রমে ফিরেই আমাকে বললেন "এখন কিছু খেওনা।" পরে গুরুপ্রসাদ লাভে ধন্য হলাম।

তার পরের দিনগুলি বর্ষার বারিধারার ন্যায় আমার দুই নয়ন অশ্রু-জলে ভেসে যাচ্ছে। কাঁদছি, কেবলই কাঁদছি, অভিমানে অন্তর কেবলই গুমরে উঠছে। মা রাধারাণীর চরণ ধ'রে আকুল হ'য়ে কেবলই অন্তরের বেদনা জানাচ্ছি। আর কতদিনে করুণা হবে মা, আর কতদিনে? আর যে ধৈর্য্য ধরতে পারিনা, মা? আমার আন্তরিক আকুল প্রার্থনার উত্তরে মা জানালেন, "পরীক্ষা ক'রে নিচ্ছি, বুঝতে পারছ না? আমি কৃপা না করলে, এতদিন কোথায় থাকতে? আমার কৃপাতেই তুমি দাঁড়িয়ে আছ। নিজের কাজে হেলা দিও না। ভয় কি, বাবা? আমি যাকে মানুষ করব মনে করি, তাকে মানুষ করেই নিই।"

মা রাধারাণীর অমৃত বাণী আমার অন্তরের তন্ত্রীতে দিবানিশি ধ্বনিত হতে লাগল। নিজের হীনত্বজ্ঞানে দৈন্য অনুভূতিতে কাঁদতে লাগলাম—হায়! এখনও পশুভাব গেলনা, কেমন ক'রে তাঁকে পাব? এদিকে আমার সাধনমার্গের প্রতিপদক্ষেপে যে কৃপানিধি গুরুদেব আমাকে হাতে ধ'রে নিয়ে চলেছেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রত্যহই পাচ্ছি। এখন গুরুদেব রোজই আমাকে ডেকে গুরু-প্রসাদ দেন, কখনো নিজ হাতে পরিবেশন ক'রে আদর ক'রে খাওয়ান। মনে মনে ভাবি, আমার মত এত নীচ, এত হীনের প্রতিও যাঁর এরূপ অপরিসীম কৃপা, এমন হৃদয়-ভরা স্নেহ তাঁর মত এমন গুণনিধি, এমন দরদী আর কি কোথাও আছে? এমনি ভাবে বাইরে গুরুরূপী গোবিন্দের কৃপা ও অন্তরে অন্তর্য্যামিনী মা রাধারাণীর স্নেহ মমতার অমৃত সিঞ্চনে এই শুষ্কপ্রায় তৃণটি আবার ভক্তিরসধারায় পুষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল। ১৩ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার মাঘী পূর্ণিমা —আজ আমার শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আমার ব'লতে যা কিছু ছিল, সবই নিঃশেষে সমর্পণ ক'রে প্রাণে বড় শান্তি পেলাম।

উৎসবান্তে ২৬শে বুধবার শ্রীগুরুদেব গোমো তপোবনে শুভাগমন করলেন।

শ্রীগুরুদেবের কাছে কাছে থাকলে, কত দিক থেকে কতভাবে অপরাধের সঞ্চার হয় সে সম্পর্কে সতর্ক করবার জন্য গুরুদেব আমাকে সম্ভাব্য সব রকম অপরাধ সম্বন্ধে সজাগ ক'রে দিলেন। কায়মনোবাক্যে গুরুর প্রতি এরূপ আচরণ করতে হবে, যেন তাঁর উপর সাক্ষাৎ-ভগবদ্‌জ্ঞান সর্ব্বদা অটুট থাকে। ক্ষণমাত্রও এর প্রত্যবায় হ'লে অপরাধ হয়। সর্ব্বদাই দেহে, বাক্যে ও চিন্তায়, গুরুসেবার অনুকূল কিছু কাজ করতে হবে। শিষ্যদের কারো প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবে না, কারণ তাতে গুরুর প্রতি মনঃসংযোগের তীব্রতা ও নিষ্ঠা ব্যাহত হয়। বস্তুতঃ গুরু সেবার প্রয়োজন ব্যতীত কোনো অশিষ্য তো নয়ই, কোনো শিষ্যের সাথেও মিশবে না।

মা রাধারাণীর জন্য খুব মন কেমন করছে। মা, তুমি কোথায়? কান্নায় আমার হৃদয় ভ'রে উঠছে। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় সব সময়ই কান্নায় অন্তর উথলে উঠছে—মা, তুমি কোথায়, মা, তুমি কোথায়? নিশিযোগে কৃপাময়ী মা আমার দর্শন দিলেন, বললেন, "এই তো আমি। গুরুর সুখে সুখী হও। অবিরাম গুরুদর্শন কর, দুঃখে গুরু-নাম কর। গুরুবাক্য পালন ক'রে গুরু সেবার আনুকূল্য ক'র। অমৃতের ভাণ্ডার যাঁর কাছে তাঁকে দিবানিশি ডাক; ভাণ্ডারীর দয়া না হলে অনাহারে মরতে হবে।" আমি আকুল হয়ে শুধাই, "সে ভাণ্ডারী কে, মা?" মা ঈষৎ হেসে বলেন, "বুঝতে পারো না? রাধারাণীই গোবিন্দের প্রেমের ভাণ্ডারী।" অশ্রুজলাভিষিক্ত হ'য়ে তাঁর চরণ দুটি মস্তকে ধারণ করি—শ্রীচরণরজ সারা অঙ্গে মাখি। এই শ্রীচরণধূলি যে সত্যই প্রেমোন্মাদকারী তা' যে অনুভব করেছে সেই জানে। শাস্ত্র যে এই 'অঙ্ঘ্রিসরোজসুধা'র মহিমা বারবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে তাও, একটুও অতিরঞ্জিত নয়। এই মহৎপদরজ অভিষেক ব্যতীত মায়াবন্ধনও ঘোচেনা, ধর্মরাজ্যের দ্বারও উন্মুক্ত হয় না—কৃষ্ণভক্তি বা অনুরাগ তো দূরের কথা। তাই এই পদধূলির কাঙাল আমি।

সকালে গুরুদেব আমার এই স্বপ্নদৃষ্ট অভিলাষ পূর্ণ করলেন। কৃপা ক'রে এই অধম চরণাশ্রিতকে শ্রী-চরণ-চিহ্ন দান ক'রে ধন্য করলেন। শ্রীচরণযুগলের তলদেশ অলক্তক-রাগে রঞ্জিত ক'রে সেই চারুচরণযুগলের ছাপ নিলাম কাগজে। ভবভয়হারী এই অভয় শ্রীপাদপদ্ম এই রাতুল চরণের রাঙা চিহ্ন আমার মস্তকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে প্রাণে বড়ই শান্তি পেলাম। এই শ্রীচরণযুগল যেন জীবনে মরণে আমার একমাত্র গতি হয়—এই প্রার্থনা।

১২ই শুক্রবার দোলপূর্ণিমা। গোমো তপোবনে দোল-উৎসবের এই শুভ সূচনা হ'ল। শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমরা সবাই আবির দিলাম। তিনিও কৃপা ক'রে

আমাদের মস্তকে ও কপালে আবির বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। আজ অনেক ভক্তই এসেছেন এবং শ্রীগুরুদেবের চরণে আবির অর্ঘ্য দিয়ে ধন্য হয়েছেন। ছেলেরাও অনেকে এসেছে, তার মধ্যে আমার প্রিয় নারাণের রঙ খেলাতে খুব উৎসাহ। আশ্রমের বাগানস্থ একটি চৌবাচ্চায় সে রঙ গুলেছে। পিচ্‌কারী নিয়ে ছোট ছেলে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে রঙ খেলায় মেতে উঠল। গুরুদেবও তাই দেখে খুব আনন্দ করলেন। এই ভাবে নানা লীলা-খেলায় আনন্দোৎসব সমাপ্ত হ'ল; সমবেত ভক্ত অতিথিদের খাওয়ানো হ'ল। গুরুদেবকে বিবিধ ফুল মালায় সাজালাম আমরা। ফুলের মালা গাঁথতে আমারই উৎসাহ বেশী, সাহায্য করল আমার ছোট ছেলে মেয়ের দল। মাথার মুকুট থেকে পায়ের নূপুর সজ্জা—যে অঙ্গে যেরূপ আভরণ মানায়—সবই গাঁথলাম আমরা যত্ন ক'রে। তারপর সন্ধ্যায় গুরুদেবকে প্রাণভরে সাজিয়ে আসনে বসিয়ে তাঁর আরতি করা হ'ল। বড়দাদাই আরতি করলেন। বৃন্দাবনদাদা, অবিনাশদাদা, বঙ্কিমদাদা,প্রমুখ ভক্তগণ আরতির গান করতে লাগলেন খোল করতাল বাদ্য সহকারে। আমরাও এই কীর্ত্তন আনন্দে যোগদান করলাম; মনে হ'ল সাক্ষাৎ শ্যামচাঁদ আজ যেন গোলোক হ'তে নেমে এসেছেন এই ধরণীর ধূলায়, আর ভক্তগণ তাঁদের প্রাণের ঠাকুরকে পেয়ে প্রাণভরে তাঁর পূজা আরতি ক'রে জীবন সার্থক করছেন। এই সন্ধ্যারতিতে সত্যই এক অপ্রাকৃত আনন্দজগৎ উন্মুক্ত হ'য়ে উঠত। সেই চিন্ময় জগতের চিন্ময় আনন্দতরঙ্গ সকলেরই হৃদয়ে দোলা দিত।

দোলের সময় ভৈরবদাদারা এসেছিল, ১৫ই সোমবার তারা চ'লে গেল। ১৮ই বৃহস্পতিবার গুরুদেব ডেরাডুন এক্সপ্রেসে নবদ্বীপ যাত্রা করলেন। আমি গোমোতেই থাকলাম তাঁর আদেশমত। কিন্তু চোখের আড়াল হলেও অন্তরে তিনি ঠিকই বিরাজমান থাকলেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই নিশিস্বপ্নযোগে তিনি দর্শন দেন ও কথাবার্ত্তা বলেন। কোনো কোনো স্বপ্নে মা রাধারাণীও আবির্ভূত হ'য়ে তাঁর প্রাণজুড়ানো শান্তিময়ী মূর্তি দর্শন করান ও উপদেশ দান করেন। ১৯শে শুক্রবার মা রাধারাণী দর্শন দিয়ে বললেন "আপন সাধন-যোগ ঠিক রেখে যাও, তাতেই রিপুদমন হয়। আপন কাজে বিভোর হ'য়ে থাকবে। রতন পেয়ে হারিও না।" ভোর রাতে স্বপ্ন-যোগে মা রাধারাণীর শ্রীচরণ-সেবা ও প্রাসাদ লাভে ধন্য হলাম। ২০শে রবিবার স্বপ্নযোগে নবদ্বীপ গুহায় চলে গেলাম—দেখলাম সেখানে মা রাধারাণী মধুর হাসি হেসে আমাকে ডাকছেন। ২৫শে বৃহস্পতিবার রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করে আকুল হ'য়ে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করছি—গুরুদেব হেসে বলছেন, "ভাল আছি, বাবা, চিন্তা করো না।" শ্রীঅঙ্গে হাত দিয়ে দেখলাম শ্রীচরণে তেলমাখানো। ২৮শে রবিবার তাঁকে রাস্তায় চলতে দেখলাম। সুস্থ, তবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ২৯শে সোমবার রাত্রে ৩টায় গুরুদেব

স্পষ্ট বললেন, "যেতে একদিন বিলম্ব হবে, বাবা।" আমি তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম।

এ সময়ে গুরুদেব বৈদ্যবাটি আশ্রমে অবস্থান করছিলেন। তাঁর আদেশে আমি গোমো তপোবনে আছি এবং তাঁর অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছি। শ্রীচরণাশ্রিত দাসের এই ব্যাকুলতা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছে তাই বাইরেও যেমন একদিন পরপর তিনখানি চিঠি লিখলেন, অন্তরেও তেমনি স্বপ্নযোগে স্পষ্ট আবির্ভূত হ'য়ে দর্শনও সান্ত্বনাদান করেছেন। প্রথম পত্রে লিখলেন "কাহারো সাথে মিশবে না, নিজের মনে একলা থাকিবে। সময়মত খাইয়া লইবে ও আপন মনে বেড়াইবে;" দ্বিতীয়টিতে বললেন, "একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক বাবা, বুকজুড়ানো ধন;" তৃতীয়টিতে স্পষ্ট লিখলেন, "তোমার জন্য আমার প্রাণ কাঁদিতেছে;" জীবন দাদা তখন গোমোতে আছেন, তাঁকে লিখলেন, "সুরেন-ধনকে দেখিবে, সে যেন মনে কোনো কষ্ট না করে।"

এত করুণা সেই করুণাময় প্রভুর এই অধম নরকের কীটের প্রতি যে, তা মনে করতেই পুলকে সমস্ত প্রাণ পরিপূরিত হ'য়ে ওঠে। এদিকে তাঁর প্রদত্ত স্বপ্ন-দর্শন ও স্বপ্ন-বাণী কী-রূপ আশ্চর্য্যভাবে সত্য তা' দেখুন। ৩০শে মঙ্গলবার ঠিক রাত তিনটায় শ্রীগুরুদেব গোমোয় প্রত্যাবর্তন করলেন; আর পূর্ব্বরাত্রে ঠিক তিনটায় স্বপ্ন যোগে বলেছেন "একদিন বিলম্ব হবে, বাবা, যেতে।" এ স্বপ্নকে নিছক স্বপ্ন বলা যায় না, কখনো না। এ স্বপ্ন প্রকৃত আবির্ভাব। এ স্বপ্ন এক'দিন তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সুস্পষ্ট দর্শন, বাণী-শ্রবণ ও তাঁর শ্রীচরণস্পর্শ অনুভূতি যা' পেয়েছি—তা' তাঁর সত্যকার স্বরূপের আবির্ভাব জনিত। না—এ সাধারণ স্বপ্ন নয়, আমার নিজের মনের দ্বারা সৃষ্ট অলীক ও খাপছাড়া এলোমেলো স্বপ্নদর্শন নয়,—কারণ সাধারণ স্বপ্নে কখনও চিন্ময়-আনন্দের অনুভূতি হয় না—এ আনন্দের উপলব্ধি একমাত্র তাঁর 'অপ্রাকৃত' স্বরূপের সাক্ষাৎ আবির্ভাব ছাড়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং এ যে তাঁর কৃপাসঞ্জাত আমার শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে তাঁর চিন্ময় স্বরূপের প্রকাশ এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

চৈত্রসংক্রান্তি দিনে আমার অন্তরে যেন গেয়ে উঠলেন শ্রীগুরুদেব তাঁর সুধামধুর কণ্ঠে একটি অপূর্ব গান:

চিনিলি না মন আপন রতন,
এই ভবমাঝে সার শ্রীগুরুচরণ।
কেন ভবে আসা, কেন চলে যাওয়া,
কেন বা অনিত্য এ দেহ ধারণ?

অনিত্য এ সংসার, কেহ নহে কার—
খুঁজলে সেথা পেতিস আপনার জন।
এই দেহার্ণবে ডুবিবি মন কবে,
ডুবলে সেথা পাবি তোর নিত্যধন।

১লা বৈশাখ—আজ শুভপ্রভাতের প্রথম রবিকরস্পর্শে সমস্ত চেতনা আমার আনন্দে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল; আমার হৃদয়বীণা যেন আপনিই আনন্দগান গেয়ে উঠল:

আজ, কী-আনন্দ, কী আনন্দ আনন্দময়ের আগমনে,
আনন্দেরি বান এসেছে গোলোক হ'তে এই ভুবনে।
আনন্দে মন পাগলপারা,
আনন্দে দিক দিশাহারা,
আজি, নিখিল ভুবন লুটিয়ে পড়ে আনন্দে ঐ শ্রীচরণে।

আজ, কী আনন্দের হাওয়া লাগে হৃদয়শতদলে,
আনন্দময়ী হেথায় যেন মিলিত যুগলে।
বর্ষ আজি নবীন হ'য়ে
আনে আনন্দেরি বার্ত্তা ব'য়ে;
আজি আনন্দময় রূপ হের আনন্দবৃন্দাবনে।।

এ অপ্রাকৃত আনন্দ। এ আনন্দের অনুভূতি যার হয়েছে, সেই শুধু বুঝবে এ কী জিনিষ। কথা-দ্বারা তাকে বোঝানো যাবে না। আমার মনে হ'ল, আনন্দ শুধু আমার নয়, আনন্দ সকলের। গুরুদেবের আগমনে যেন আনন্দের—কোনো অদৃশ্য অপ্রাকৃত তরল বা বায়বীয় সত্তার—বন্যা এসেছে। সে বন্যা যেন সকলকেই প্লাবিত ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে চ'লেছে। আশ্রমে যে যে আছে, সকলেই যেন আমারই মত আনন্দে একেবারে মশগুল—হ্যাঁ, সকলেই,—এমন কি ঐ কুকুরগুলিও। ওরা যেন এতদিন প্রভুর অদর্শনে কেমন মন-মরা হ'য়ে থাকত। আর এখন ওদের কী আনন্দে মাতামাতি দেখ! বনের ঐ পাখিগুলিও। ওরা তো আগে এত আনন্দ ক'রে আশ্রমে এসে ভীড় করত না। এখন ওরা আসছে, কল-কাকলীতে ওদের পুলকের কথা জানাচ্ছে, গুরুদেব বালভীত'রে খাবার নিয়ে যাবেন ওদের জন্য—সে কথা ওরা যেন পরস্পরকে বলছে। এই বৃক্ষলতা, গুল্মগুলি—এরাও যেন আনন্দে ফুলে-ফলে বিকশিত হ'য়ে উঠল। ওদের গায়ে লেগেছে যে অপ্রাকৃত আনন্দবন্যার ঢেউ। নিখিল ভুবন আনন্দময় হ'ল—এটা শুধু কথার কথা নয়, এ অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং আমি তা সুস্পষ্ট অনুভব করলাম। মনে হল শ্রীমদ্ভাগবতে এমনি একটা অনুভূতির কথাই ব্যাসদেব

লিখেছেন : "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ, ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ" এর টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছেন, "আত্মনো যো ভগবতি ভাবঃ প্রেমা তমেব চেতনাচেতনেষু ভূতেষু পশ্যতি", অর্থাৎ নিজের চিত্তে যে ভগবান স্ফুরিত হন, যিনি সর্ব ভূতকেই সেই ভগবানে প্রেমযুক্ত, স্বীয় প্রেমের অনুরূপ প্রেমযুক্তরূপে দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত। সাধুগুরুকৃপা হলে এইরকমই হয়; মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ভগবৎ প্রেমে আনন্দময় হ'য়ে উঠেছে। গোপীদেরও তাই মনে হ'ত বনলতা তরুগণ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে রোমাঞ্চিত হ'য়ে মুকুলিত হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মধুধারা-রূপ অশ্রুবর্ষণ করছে—

"বনলতা স্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ,
প্রণতভার বিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম।"—ভা:১০।৩৫।৯

গুরুদেব এসেছেন—আনন্দে যেন আমরা আত্মহারা হ'য়ে গেলাম। যতক্ষণ পারছি গুরুদেবকে দর্শন করছি, তাঁর কাছে কাছে থাকছি। যেদিকে চাই, সকলই যেন আনন্দে আনন্দময়, সকলেই যেন আনন্দে মাতোয়ারা ব'লে মনে হচ্ছে। সারাদিন এমনি আনন্দের নেশায় কাটল। বিকালে তপোবনের সুবিস্তৃত পুষ্পকানন ঘুরে বিবিধ পুষ্পচয়ন করলাম, ও মনের সাধে, মনের সকল মাধুরী মিশিয়ে যত্ন করে মালা গাঁথলাম, সন্ধ্যায় গুরুদেবকে সাজাব ব'লে। তাঁর সর্ব্ব অঙ্গে, যেখানে যেমনটি মানায় তেমনি ক'রে, পুষ্পমাল্যাভরণে সুসজ্জিত ক'রে ভক্তগণ সন্ধ্যারতি সুরু করলেন। তারপর মৃদঙ্গ-করতাল বাদ্য ও মঙ্গলশঙ্খধ্বনিসহ আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতাগণের সঙ্গে পরম উল্লাসের সহিত আরতিগান করতে লাগলাম আমরা। সব মিলিয়ে এমন এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল যে আমি আমার অন্তরলোকের সমুখে সাক্ষাৎ গোলোক বৃন্দাবনকে প্রকটিত দেখতে পেলাম। সাধুগুরুকৃপাসঞ্জাত আমার শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়-গগনে পরিষ্কার উদিত হ'ল শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত যুগলরূপমাধুরী এবং সেই সঙ্গে ধ্বনিত হ'ল এক অপূর্ব্ব মধুর সঙ্গীত :

আজি, কী আনন্দ হের রে মন ভুবন ভরি',
আনন্দময় ভূতলে এলেন অবতরি'।
সেই মধুর বৃন্দাবন,
সেই যুগল রতন,
সেই শ্যামের বামে হের নয়ন রাই কিশোরী।
আজি, জীবের ভাগ্যোদয়,
গোলোক ভূলোকে উদয়—
আঁখি অনুরাগে মাখি' লও হৃদয়ে ধরি।'

মোদের ধন্য এ জীবন,

ধন্য এ ভুবন—

থাকতে সময় এই ধরাতে ধর চরণতরী।

১২ ই বৈশাখ রবিবার মণিহারি থেকে কান্তি দাদা এলেন। সেদিন ও পরদিন গুরুদেবের অনেক ফটো তুললেন তিনি। ১৪ই মঙ্গলবার গুরুদেবের সঙ্গে বিকালে মাঠে বেড়াচ্ছি। গুরুদেব একপাল গরুর মধ্যে এসে দাঁড়ালেন, কান্তিদাদা ধেনুপালের মধ্যে গুরুদেবের ছবি তুললেন।

আমি দেখছি, খুঁটায় বাঁধা দেখছি গো-বৎসগুলিকে ; ওরা ওদের মায়ের পানে আকুল ব্যথাতুর চোখে চেয়ে আছে। কী কাতর দৃষ্টি। আমার মনে হ'ল জগজ্জননীর কি চক্ষু নেই? পরদিন আমার অন্তরে জগজ্জননী যেন বললেন, "সেই ডাকে ডাকো আমারে। সে আহ্বান বৃথা যাবে না, কখনো না কখনো সাড়া মিলবেই।"

পিপাসায় পরিষ্কার সুস্বাদু জল পেলে যত পাই তত খাই, মনে হয় আরো খাই, আরো। অনুরাগেও তাই ; মনে হয় দেখি, দেখি, আরো দেখি—দেখে যেন সাধ মেটে না।

১৭ ই শুক্রবার ভোর রাতে স্বপ্ন দেখছি—আমার মা রাধারাণী যেন মহারাণী। আমি যেন এক দীন ভিখারী হয়ে এসেছি রাজপ্রাসাদে তাঁর দর্শনমানসে। বিরাট প্রাসাদ—কত লোকজন, কত সেবক, কত ভৃত্য ঘুরছে সেখানে ; তাঁর মধ্যে কোথায় তাঁকে খুঁজে পাব? মা, মা বলে আকুল হয়ে কত ডাকলাম ; কৈ সাড়া পাচ্ছি না তো। তারপর দেখলাম যেন জগন্নাথের মন্দিরে এসেছি—সেখানে রয়েছেন আমার মা, বাবা —শ্রীরাধাগোবিন্দরূপে।

কান্তিদাদা আজ চলে গেলেন। কমলারা ১৮ই এসে ১৯শে বিদায় নিল আজ ১৯ শে রবিবার আমি সারারাত স্বপ্নে মা রাধারাণীকে দেখছি। যেদিকে চাই, সেদিকেই আমার মা। জগৎ আমার মাতৃময় হ'ল। আমার প্রতি মায়ের সে কি অমৃতময় স্নেহ, মায়ের প্রতি আমার সে কি অনুরাগ। শেষ রাতে একটি বিরাট বাড়িতে মায়ের ঘরে গিয়ে মাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। তখন সেই ঘরের পিছনে গিয়ে আমি আর একটি ছোট মেয়ে—দুজনে মা, মা বলে আকুল হয়ে কত যে কাঁদলাম।

স্বপ্নদৃষ্ট এই মাতৃস্নেহ-সুধা-সিঞ্চনে আমার সমস্ত তনুমন অভিসিক্ত হ'য়ে রইল। সারাদিন ধরে সেই সুধারস আস্বাদ করতে লাগলাম।

২৪শে শুক্রবার শ্রীগুরুদেব গোপনে আমাকে তাঁর লীলাসংবরণের ইঙ্গিত ও আভাস দিলেন। শুনে আমি আতঙ্কে চমকে উঠলাম, দু'চোখে আমার বারিধারা নামল। গুরুদেব তখন আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন, "দেহ চিরদিন থাকেনা, বাবা।

কীর্ত্তিই অমর হয়ে থাকে। তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে; গুরুর নাম চিরস্থায়ী করবে, গুরুর নাম প্রচারে ব্রতী হবে, সুরেনধন।"

আমার দুটি সিক্তনয়নের দিকে চেয়ে আশ্বাস দিয়ে প্রভু বললেন, "একটি জন্ম তো অনন্তলীলার একটি অংশমাত্র। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ জন্মে জন্মে অটুট থাকে। দিব্যজ্ঞান হ'লে বুঝতে পারবে, কত জন্ম তুমি এরূপ ভাবে আমারই কাছে রয়েছ। নিজ নিজ কর্ম্ম-বশতঃ এক এক জন্মে এক এক রূপ নিচ্ছ। পূর্ব্ব-জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে কাশীর পণ্ডিত হ'য়ে ছিলে, এবার নবদ্বীপে এসে জন্মেছ।"

রাত্রে স্বপ্নযোগে মা রাধারানী দর্শন দিলেন। আমি করযোড়ে তাঁকে নিবেদন করলাম, "মাগো, তোমা থেকেই এই জগতের উৎপত্তি, তোমারই মায়ায় জগতের জীব মুগ্ধ। তোমারই ঐ অভয় শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় নিলাম মা; আমার ভাল মন্দ আমি কিছুই জানিনা, যাতে তোমার শ্রীচরণে সুদৃঢ় অনুরাগ থাকে সেই পথে নিয়ে চলুন আমায়, মা।" মা ঈষৎ হেসে বললেন, "শুধু নিবেদন করলেই তো হয়না। তোমার রাগ কমাও, বিনয়ী হও, মাটির সহিত মিশে যাও,—নইলে অপরাধ হ'য়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছ না। অপরাধ হলে তো গুরুর দয়া হবেনা, আর গুরুর দয়া না হ'লে আমাকেই বা পাবে কোথায়?" আমি বললাম, "নাকে কানে খৎ দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি মা, এবার থেকে তাই হবার চেষ্টা করব।" মা তখন হেসে শ্রীচরণ দু'টি বাড়িয়ে দিলেন—চরণ দুটি মাথায় রেখে সেবা করতে লাগলাম। মায়ের সেই দুটি সুকোমল শ্রীচরণ সেবায় সে কী পরম পরিতৃপ্তি, সে কী শান্তি!

এবার থেকে রাগ না ক'রে বিনয়ী হ'য়ে গুরুর আদেশমত কাজ করছি, তাঁর সেবার কাজও করছি। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু আমার আমাকে নানা উপদেশ ও সান্ত্বনা দিলেন; তারপর বললেন, "আমার সোনার ছেলে, আমায় ছেড়ে কি থাকতে চায়?" তারপর একজন ভক্তকে বললেন, "আমার সুরেনধনকে খেতে দাও।"

আমার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠল। একী দয়া, একী স্নেহ। সারা বিশ্বে এমন দয়ার সাগর আর কি কেউ আছে?

১০ জ্যৈষ্ঠ-সোমবার শ্রীগুরুদেব নিঃশঙ্ক আশ্রমে যাত্রা করলেন। গুরুদেবের গাড়িতে আমি একা রইলাম। অন্য কামরায় অন্যান্যেরা ছিলেন। গুরুদেবের কাছে ব'সে ব'সে তাঁর দয়ার কথা ভাবছি, আর চোখের জলে ভাসছি। এমনি ক'রে বর্দ্ধমান ষ্টেশন এল। এখানে গাড়ী বদল করতে হবে। গুরুদেবকে নিয়ে আমি নামলাম।

১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শ্রীগুরুদেব তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে নিঃশঙ্ক আশ্রমে এলেন। উৎসবে অসম্ভব শিষ্যভীড় হ'ল এবং তজ্জন্য গুরুদেবের বিশেষ ক'ষ্ট হতে লাগল। উৎসবান্তে শ্রীগুরুদেবকে বিশ্রাম করতে দেওয়া হ'ল। আমি চিঠিপত্র লেখার কাজ ছাড়াও মাঝে মাঝে সুযোগমত শ্রীগুরুদেবের সেবার সৌভাগ্য লাভ করি। কিন্তু তথাপি নিজের নীচতা অনুভব ক'রে প্রায়ই কষ্ট পাই, ভাবি এমন সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে এসেও আমার কিছু হ'ল না। একদিন এইরূপ বিমর্ষচিত্তে চুপ ক'রে বসে আছি, এমন সময় গুরুদেবের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত আমাকে ঐ রূপ বিষণ্ণ অবস্থায় দেখে কতগুলি মূল্যবান্ উপদেশ দিলেন : গুরুর কাছে এলে পরীক্ষা আছেই ; অনুরাগের তরঙ্গে কখনো উত্থান কখনো পতন হয় ; কখনো অনুরাগের বন্যা আসে, কখনো শুকিয়ে যায়। তখন নানা বিকার আসে মনে, ছাড়ি ছাড়ি মন হয় ; কিন্তু তখন দৃঢ়চিত্তে শ্রীগুরুচরণে নিষ্ঠা রেখে, বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তাঁকে ধ'রে থাকাই হ'ল একমাত্র কর্ত্তব্য। নাই বা কিছু পেলে, তবু তাঁকে ধ'রে থেকো, ছেড়োনা। নিষ্ঠাই প্রাপ্তির উপায়। একলব্যের উদাহরণ মনে রেখো। গুরু সুখে সুখী হয়ো, নিজের সুখ চেওনা, তবেই গুরুকৃপা লাভ হবে।

এই উপদেশগুলি সত্যই আমাকে সাহায্য করল। গুরুর পরীক্ষার তরঙ্গের উত্থান পতনের আঘাতে আমি অভিভূত হচ্ছিলাম। আজ ২৪শে সোমবার গুরুদেবের কাছে বহুক্ষণ কাঁদলাম। দয়াময় অন্তর্য্যামী গুরুদেব আমার অন্তরের ব্যথা সব বুঝে আমাকে বুকে ক'রে নিলেন। বললেন, "পঞ্চতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব উপাসনা কর ; তা'হলেই তোমার ভাল হবে, বাবা।" এমন দরদী, এমন ব্যথার ব্যথী, এমন গুণনিধি আর কে আছে ?

নিশীথে স্বপ্নযোগে মা রাধারানী অপূর্ব্ব মহিমময়ী মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়ে বললেন, "তোমার উপায় আমরাই করব। আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে ? আমাদের ছেলে—আমরা যেখানে যাব, তুমিও যাবে। গুরু ছাড়া আপন কে আছে ?" ২৬শে বুধবার গুরুদেব কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "সুরেনধন, তোমাকে মঠের কর্ত্তা ক'রে দেব।" একথা একাধিকবার গুরুদেব বলেছেন—কিন্তু আমার যেন কেমন ভাল লাগতনা এ শুনতে। আমি তো আদৌ তা চাইনি। প্রতিষ্ঠা বা কর্তৃত্ব আমি একেবারেই পছন্দ করিনে। বিশেষতঃ আমি সে সময়ে শিষ্যদের শেষ সারিতে ; আমার অগ্রে পূজনীয় অনেক গুরুভ্রাতা রয়েছেন। তবু বার বার এ কথা বলেন কেন ? সত্যিই—আমার এ বিষয়ে শুনতে একটুও ভাল লাগত না।

২৮শে শুক্রবার বেলা ৯ টা ১০ মিনিটে আশ্রম ত্যাগ ক'রে বিকাল ৫ টায় কলকাতার ভবানীপুর বাসায় পৌঁছলাম।

কলিকাতা—ভবানীপুর

২৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ভবানীপুরের বাসা শ্যামানন্দ রোড থেকে যাত্রা ক'রে সারাদিন ঘুরলাম। সন্ধ্যা সাতটায় ফিরলাম। রাত্রি সাড়ে দশটায় শ্রীশ্রীগুরুদেব কলকাতার বাসায় শুভাগমন করলেন।

গুরুদেবের সব আশ্রমেই শিষ্যভীড় খুব বেশী হয়। তাই তাঁকে কিছুদিন বিশ্রাম দেবার অভিপ্রায়েই এই কলকাতার বাসায় আনা হ'ল। এখানে শিষ্যভীড় যাতে না হয় সেটাই আমাদের কাম্য ছিল। গুরুদেবও প্রথমে আমাদের এই শুভসঙ্কল্প কার্য্যকরী করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি কলকাতার বাসায় পৌঁছে আমাকে নির্দ্দেশ দিলেন, "কোনো শিষ্যকে কলকাতার এ বাসার ঠিকানা দিওনা, বাবা। নিঃশঙ্ক আশ্রম থেকে যে সব চিঠি re-directed হ'য়ে এখানে আসবে, তাদের উত্তর দিও, কিন্তু এখানকার ঠিকানা জানিও না।" আমি প্রথমে সেই মতই চিঠি পত্র লিখতে লাগলাম। কলকাতার শিষ্যবৃন্দকেও প্রথমদিকে সংবাদ দেওয়া হলনা।

গুরুদেবের এই কলকাতায় অবস্থান কালে তাঁর সম্পূর্ণ ভার প্রধানতঃ আমার উপরই ন্যস্ত হ'ল। গুরুদেবের প্রত্যেক আশ্রমেই আশ্রমের নানাবিধ কার্য্যের দায়িত্ব নিয়ে নানা শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ থাকেন; সে সব আশ্রমে আমার দায়িত্ব আংশিক এবং সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখানে স্থায়ী শিষ্য বলতে কেউ নেই, সুতরাং গুরুদেবের এবং তাঁর শিষ্যবর্গের সামগ্রিক দায়িত্বভার আমারই উপর এসে পড়ল। এরূপ ভাবে তাঁর এবং তাঁর আশ্রমের ষোলো আনা দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ আমি আর কখনো পাই নি। কলকাতা ভবানীপুরের এই বাসাভাড়া যিনি ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি বাইরের অল্প কিছু কিছু কাজ তাঁর অবসর মত কখনো করতেন; পরন্তু শ্রীগুরুদেব, তাঁর সমীপে অবস্থিত শিষ্যবর্গ ও সমাগত সব শিষ্যের দেখা-শুনা ও দৈনন্দিন আশ্রম চালানোর সামগ্রিক খুঁটি-নাটি কার্য্যের মূল দায়িত্ব আমারই উপর ন্যস্ত ছিল। এ যে কত বড় গুরু দায়িত্ব, কত দুরূহ এ কাজ, তা' যার উপর এ ভার কখনো পড়েছে, সেই বুঝবে। আমার মত একজন দুর্ব্বল, অক্ষম ও অপদার্থের পক্ষে এ গুরু ভার বহন করা অসম্ভব এবং একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য মনে হবে; এবং আমি এখন নিজেও বিস্মিত হই, কেমন ক'রে সে দুরূহ দায়িত্ব আমি একাকা পালন করেছিলাম। আমার মত এই অপটু, অসমর্থ ও অসুস্থ এবং

বহির্জগতে একেবারে অপদার্থকে দিয়ে এই কঠিন কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন, যে তিনি সত্যই "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।"

শ্রীগুরুদেবের বিশ্রাম ও সেবা শুশ্রূষা যাতে ঠিকমত হয় সেইদিকেই ছিল আমার মূল লক্ষ্য। এটি বজায় রেখে আমায় দৃষ্টি রাখতে হয়েছে তাঁর শিষ্যগণের প্রতি—যাঁরা এখানে গুরুদেবের কাছে রয়েছেন, এবং ক্রমে ক্রমে খবর পেয়ে যাঁরা এখানে আসছেন যাচ্ছেন। এঁদের দেখাশুনার সমস্ত ভারই আমার উপর। আশ্রমের দৈনন্দিন কাজে আমাকে সাহায্য করবার জন্য ছিল একজন আমার প্রায় সমবয়সী পাচক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যবাটির একজন প্রবীণ ভক্ত শিষ্য। ভোর চারটায় অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠতাম। উঠে উনুনের ছাই ও এঁটোপাতা ইত্যাদি সব একটা জায়গাতে বোঝাই ক'রে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে সেই অস্পষ্ট আবছায়া অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে বড় রাস্তায় ডাষ্টবিনে ফেলে আসতাম। সদর দুয়ারের সামনের গলিতে ফেলার উপায় নেই, কারণ সেখানে কোনো ডাষ্টবিন ছিলনা; কাজেই বেশ একটু দূরে বড় রাস্তায় অবস্থিত ডাষ্টবিনে এনে ফেলতে হ'ত। তারপর ঘর দোর পরিষ্কার করা, গোছগাছ করা—এতে ঐ শিষ্যাদিদি কিছু সাহায্য করতেন। বাড়িটা ছিল তেতালা। তিনতলায় গুরুদেব অবস্থান করতেন, দোতালায় কর্ত্তামা অন্যান্য শিষ্যমায়েরা থাকতেন এবং একতালায় থাকতাম পাচকব্রাহ্মণ ও আমি। তিনতলায় গুরুদেবের ব্যবহারের জন্য জল তুলবার ব্যবস্থা ছিল নীচের তলায় অবস্থিত হ্যাণ্ড্-পাম্প্ দ্বারা। এই হ্যাণ্ড্ পাম্প্ করার ভারও ছিল আমার উপর। সকালে প্রায় আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার ধ'রে এই শক্ত পাম্প্‌টি পাম্প্ করতাম আমি আমার দুর্ব্বল শরীরের যথাসাধ্য শক্তি দ্বারা। তারপর গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে বার হ'তাম বাইরে—প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহের জন্য। ঘুঁটের বস্তা ও গুরুদেবের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ কয়লা নিজে মাথায় করেই ব'য়ে আনতাম। সাধারণ কয়লা অবশ্য গাড়ী ক'রে দিয়ে যেত। তারপর চাল, ডাল, আটা, তেল, মশলা ইত্যাদি সে সবও আমাকেই নিজে আনতে হ'ত। আমার অসাধ্য হ'লে কুলি করতে হ'ত, নইলে সানন্দে মাথায় করেই আনতাম। কাঁচা তরিতরকারি বাজারও তাই। কোনো কোনো দিন কলকাতার স্থানীয় ভক্ত শিষ্য কেউ কেউ আমায় সাথে যেতেন এবং কিছু কিছু সাহায্য করতেন। এ সব বিষয়ে ভবানীপুরের ভূতোনদাদা ও বালিগঞ্জের মদনদাদা আমাকে প্রায়ই সাহায্য করতেন ও উপদেশ দিতেন। তারপর ছিল গুরুদেবের হরিলুটের খেলা। মিষ্টির বড় দোকান ছিল বড় রাস্তা রসা রোডের উপর, বাসা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। বেশীর ভাগ মিষ্টি ও খাবার সেখান থেকেই আনতাম। তবে হঠাৎ প্রয়োজনে,

অর্থাৎ যখন অনেক শিষ্য এসে পড়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি হরিলুট আনা দরকার, তখন কাছাকাছি কোনো ছোট দোকানে যেতাম। এমনি দুটি ছোট মিষ্টির দোকানের মালিকের সাথে ক্রমে বেশ আলাপ জমে গেল। গুরুদেবের কাহিনী শুনে তারা বিস্ময় বোধ করল; এত রাশি রাশি মিষ্টান্ন ও খাবার নিয়ে তিনি খেলা করেন জেনে চমৎকৃত হ'য়ে তাঁর অর্ডারী মিষ্টান্নাদি তখনই তিয়ার ক'রে টাটকা গরম গরম সরবরাহ করত এবং মূল্যও যথাসাধ্য কম নিত। গুরুদেবও এতে ওদের প্রতি তুষ্ট হ'তেন। একদিন তারা গুরুদেবকে দর্শন ও প্রণাম ক'রে স্বচক্ষে তাঁর মিষ্টান্ন বিতরণ খেলা দে'খে গেল।

এদিকে প্রথম দিকে শিষ্যদের কাউকে না জানালেও, ক্রমে ক্রমে তারা কেমন ক'রে যেন গুরুদেবের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল। সুগন্ধি কুসুমের সৌরভ যেমন কাউকে বিজ্ঞাপিত করতে হয়না, গুরুদেবের শুভাগমনের শুভসংবাদও তেমনি না জানালেও কলকাতার শিষ্য ও ভক্ত মহলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। একে একে তারা এসে ভীড় জমাতে লাগল। যাদের জানতাম তারা তো এলই; যাদের কখনো দেখিনি, বা নাম শুনিনি তারাও আনাচ কানাচ থেকে বার হ'য়ে ভীড় করল। তারপর কত অশিষ্য, কত তথাকথিত ভক্ত, কত উৎসুক দর্শনার্থী। শেষে এমন হ'য়ে পড়ল যে বাসায় আর তিলধারণের জায়গা থাকতনা। স্বয়ং গুরুদেব এই অসম্ভব ভীড়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবশ-প্রায়, আর আমি আকুল ও দিশাহারা।

গুরুদেবের এ এক অদ্ভুত লীলা। তখন গুরুদেবের প্রতি রাগই হয়েছিল, এবং এই অতিরিক্ত ভীড় জনিত পরিশ্রম থেকে তাঁকে মুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করেছিলাম। দুঃখও হয়েছিল অত্যন্ত; যে জন্য তাঁকে এখানে আনা, তার বিপরীতই হ'ল। কিন্তু মহাপুরুষের দুর্জ্ঞেয় লীলা বোঝা ভার। এখন বুঝছি,—কলকাতা অঞ্চলের শিষ্য ও ভক্তদের শেষ দর্শন দিবার জন্যই তাঁর এই লীলা, বিশ্রাম করা উপলক্ষ্য মাত্র। গুরুদেব তাঁর ঈপ্সিত লীলা ঠিকই ক'রে যেতে লাগলেন, অর্থাৎ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যাবতীয় শিষ্য ভক্ত ও উৎসুক দর্শনার্থীকে নিজ সমীপে আনয়ন করিয়ে তাদের শেষ দর্শন দান ও যার যে বাসনা ছিল তা পূরণ করতে লাগলেন। যে সব বলিহত, সংসারাবদ্ধ ও মায়ামুগ্ধ জীব তাঁর শিষ্য হ'য়েও তাঁর শ্রীচরণদর্শন করতে আসতনা, তাদের সকলকেই জোর ক'রে টেনে আনলেন নিজের কাছে এবং বলতে চাইলেন, "ওরে তোদের সবার কাছে আমি নিজে এসেছি,—আর পাবিনে, এই শেষ দর্শন করে নে।"

১লা আষাঢ় গুরুদেবকে নিয়ে মিউজিয়মে বেড়াতে যাওয়া হ'ল। পথে একটি ভিখারীর অসহায় অবস্থা দেখে গুরুদেব দাঁড়ালেন এবং তাকে যথাসাধ্য সাহায্য

দিলেন। মিউজিয়মের সব দ্রষ্টব্য জিনিষই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হলো ওঁকে—তিনিও বিশেষ আগ্রহ সহকারেই এ সব দেখলেন। ২রা চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া হ'ল। নানাধরনের জীবজন্তু ও বিহঙ্গমকুল দেখে আজও খুব আনন্দ পেলেন গুরুদেব। ৪ঠা সকালে গুরুদেবের সঙ্গে খোলা হাওয়ায় একটু বেড়ালাম, বিকালেও তাঁকে নিয়ে গেলাম বাইরে বেড়াতে। ৮ই থেকে অম্বুবাচী; এখানেও গুরুদেব অম্বুবাচী ব্রত পালন করলেন। ৯ই রাতে স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথের মন্দির দর্শন; মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুদেবকে একই সাথে দর্শন করলাম। মহাপ্রভুর নাম স্মরণ ক'রে অনেক কাঁদলাম। ১১ই আষাঢ়—অবিরাম লোক সমাগম গুরুদেবের খুব পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে। ১২ই সকালে গুরুদেবকে নিয়ে টালিগঞ্জে বেড়াতে গেলাম। কালিঘাটের এক ভক্ত সম্প্রতি গুরুদেবকে দর্শন ক'রে খুব ভক্তিভাব দেখাচ্ছেন। তিনি বেশ ধনী—কলকাতায় বেশ কিছু সম্পত্তি ও বাড়ী আছে। টালিগঞ্জেও তাঁর পুকুর ও বাগান বাড়ী ছিল। সেগুলি তিনি গুরুদেবকে দান করে আশ্রম করবেন ব'লেছিলেন। টালিগঞ্জে গুরুদেবকে বেড়াতে নিয়ে এসে সেই বাগান বাড়ীটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান হ'ল তাঁকে। বলা বাহুল্য, এ সবই গুরুদেবর খেলা মাত্র,; এবং গুরুদেব কলকাতা পরিত্যাগের পর সেই তথাকথিত ভক্তের ভক্তি বাষ্পের মতই উড়ে গিয়েছিল এবং আমরাও আর কখনো তার সন্ধান করিনি।

এদিকে লোকভীড় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে লাগল। গুরুদেবের খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এখান থেকে না গেলে এ থেকে পরিত্রাণও নেই। লোকভীড় থেকে মুক্ত ক'রে গুরুদেবকে একটু বিশ্রাম দেওয়াই কলকাতায় আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। দৈনিক এতলোক সমাবেশ সাধারণতঃ তাঁর কোনো আশ্রমেও হয় না।

১৫ই আষাঢ় থেকে রোজই সকাল বিকাল বাবাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে চেষ্টা করি, তবে কোনো কোনো দিন লোকভীড়ে সুযোগ হ'য়ে ওঠে না। ১৭ই সকালে যাদবপুরের ওধারে বাবাকে বেড়াতে নিয়ে গেলাম, বিকাল পাঁচটায় শালিমারে বেড়ালাম, ফিরতে সন্ধ্যা সাতটা হয়ে গেল।

একদিন গুরুদেব প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার প্রতি চেয়ে বললেন, "বাবা, গুরুদত্ত সাধনক্রিয়া এইভাবে ঠিকমত ক'রে যাবে; গুরু তোমার মঙ্গল করবেন।" এই ব'লে গুন্‌গুন্ করে একটি গান করলেন। গানটির সবকথা ঠিকমত আমার স্মরণ নেই, তখন লিখেও নিই নি, তবে তার অর্থ হচ্ছে এইরূপ: সাধনপথে ঠিকমত অগ্রসর হ'লে শুষ্কতরুও আবার মুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে, মরুভূমিও উর্ব্বর হ'য়ে শস্যশ্যামল হয়, মৃত্যুসম অন্ধকারও জীবনের আলোয় আলোময় হ'য়ে ওঠে। আমি মাথা নীচু ক'রে নীরবে এই

গুরু আশীর্ব্বাদ স্বরূপ সঙ্গীতসুধা শ্রবণ করতে লাগলাম। ১৮ই শুক্রবার। সময়ে সময়ে শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত তত্ত্ব এবং নিজের ক্ষুদ্র, নগণ্য, কুৎসিৎ স্বরূপ যুগপৎ অন্তরে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। তখন মনে হয়, কত জন্মের মহাপাপী, মহা অপরাধী এক ঘৃণ্য নরকের কীট আমি—আর জীব বুদ্ধির অগোচর, নিখিল ভুবনের অধীশ্বর প্রভু আমার। আমার কত ভাগ্য যে এমন গুরুদেবের স্নেহ পেয়েছি, পেয়েছি তাঁর সীমাহীন করুণা, তাঁর দর্শন ও সেবার যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ ও সৌভাগ্য। সত্যই ধন্য, মহাধন্য আমি, সার্থক আমার এই মানব জীবন।

১৯শে শনিবার স্বপ্নে দেখি মা রাধারাণী তাঁর শ্রীহস্তকমল আমার মাথায় দিয়ে আমায় আশীর্ব্বাদ করছেন।

এদিকে লোকভীড় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এত ভীড় যে সামলানো মুসকিল হ'য়ে পড়ছে। এত লোকের প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি দিতে ও তাদের যা' কিছু প্রার্থনা সব সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে গুরুদেবের অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। তাঁর কষ্ট দেখে আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়ছি। গুরুদেবের কলকাতায় অবস্থান আর ভাল লাগছে না আমার, তাঁকে কি শুধু এইরূপ কষ্ট দিতেই কলকাতায় নিয়ে আসা হ'ল? মাঝে মাঝে দুঃখে অভিমানে আমি অনশন ক'রে থাকি। গুরুদেব তখন নিজে প্রসাদ হাতে ক'রে নিয়ে আমার কাছে এসে বলেন, "খাও, বাবা ,খাও।" দুঃখে আমার দুই চোখ জলে ভ'রে যায়, আমি অতিকষ্টে আমার মনোবেদনা জানাই তাঁকে।

কোনোদিন সকালে গুরুদেবের সাথে গঙ্গার ধারে বেড়াই। ৩০শে বিকাল সাড়ে তিনটায় গুরুদেব শালকিয়া বেড়াতে গেলেন, ফিরতে সন্ধ্যা হ'ল। ৩২শে গেলেন আলিপুর অঞ্চলে। ৪ঠা শ্রাবণ আবার শালকিয়া যাওয়া হ'ল।

এদিকে আমার অন্তর্জগতে মা রাধারাণী প্রায়ই আবির্ভূত হ'য়ে আমাকে শাসন, উপদেশ ও সোহাগ করেন।

২৬শে আষাঢ় আদেশের সুরে বললেন, "ত্রিসত্য করে ধর্মপথ গ্রহণ করেছ, সুতরাং কোথাও যাবার উপায় নেই। ধৈর্য্য ধরতে হবে। ক্রোধ ত্যাগ করতে হবে। আমি জানি তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম তোমায় এরূপ করাচ্ছে। গুরুর দাসত্ব কর—তাতেই সব রিপু দমন হবে।" ২৮শে রবিবার মধুর কণ্ঠে উপদেশ দিলেন, "মাটির মত হওয়ার সাধন কর। গুরু সন্তুষ্ট হ'লে পরিণামে বস্তু মিলবে। বাহির ছেড়ে অন্তররাজ্যে প্রবেশ কর। বাহিরটা উপেক্ষা করা যায়—অন্তর্নিষ্ঠাই মূল। অন্তরে ভক্তি-ডোরে আমাকে যেমন বেঁধে রেখেছ, তেমনি বেঁধে রাখ।" ৩০শে শাসনের সুরে বললেন, "তোমাকে ছেড়ে দেব না; যেমন ক'রে হোক আমাদের কাছে থাকতেই হবে। গুরুকে একমাত্র আপনজন মনে করবে, অপর কেউ তোমার আপন নয়।" ৩২শে উপদেশ পেলাম,

"অনুরাগ চিরদিন সমান থাকে না। তখন নিষ্ঠা রেখে গুরুপাদপদ্ম আঁকড়ে ধ'রে থাকতে হবে। সাধতে সাধতে রতন মেলে। ধৈর্য্য ধরতে হবে। উত্থান পতন আছেই।" ৩রা শ্রাবণ ভোর রাত্রে মা আমার হাত ধ'রে প্রসাদ ক'রে আমার হাতে ধ'রে বললেন, "কী হয়েছে তোমার?" মা রাধারাণীর সেই স্নেহ সোহাগে আমি কাঁদতে লাগলাম তারপর মা যেন শিক্ষয়িত্রীর মত আমাকে আদেশ করলেন, "কেমন যোগশিক্ষা করেছ, আমাকে দেখাও দেখি।" আমি দেখাতে আরাম্ভ করতেই ঘুম ভেঙে গেল। মায়ের এই স্নেহ-সুধা স্পর্শে আমার এই অন্তর যেন জুড়িয়ে গেল। মাগো, আমি তোমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছি; তোমার ঐ চরণকমলই আমার সর্ব্বস্বধন ক'রে রাখতে পারি যেন, এই প্রার্থনা।

এদিকে কিছুতেই শিষ্য-সংঘট্ট এড়াতে পারছি না। এই সব শিষ্যদের বেশীর ভাগই নিজের ঐহিক সুখ সমৃদ্ধি, সুবিধা অসুবিধা, অভাব অভিযোগ জানাতে, এমনকি দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের আবেদন নিয়ে গুরুদেবের কাছে প্রত্যহ ভীড় করতে লাগল। তারা কেউ ধর্ম, অথবা পরলোকের চিন্তায় গুরুদেবের কাছে আসত না; সুতরাং তাঁর সুখসুবিধার দিকে কারো বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। নিত্য এইসব স্বার্থপর শিষ্যদের পাপের চাপে গুরুদেব পিষ্ট ও মলিন হ'তে লাগলেন। কিন্তু আমি এক নগণ্য কীট হ'য়ে কী-ই বা করতে পারি তাঁকে শান্তি দিতে? তবু যতদুর পারতাম চেষ্টা করতাম এই সব স্বার্থান্ধদের হাত থেকে গুরুদেবকে পরিত্রাণ করতে। কিন্তু আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রায় রাত বারোটা পর্য্যন্ত এদের ভীড় হ'তে লাগল। আমাদের শিষ্যদের মধ্যে এই সব স্বার্থ-সর্ব্বস্বের দল তখনও ছিল, এখনও আছে, হয়তো চিরদিনই থাকবে।

৮ই শ্রাবণ শনিবার বিকালে গুরুদেবকে নিয়ে কালীঘাটে বেড়াতে গেলাম। সেখানে গিয়ে গুরুদেব কাঙালী-ভোজন করালেন। এই সময়ে গুরুদেব যখন ভোজনরত কাঙালীদের দিকে চেয়ে হরি-ধ্বনি করছিলেন, তখন তাঁর হর্ষোৎফুল্ল বদন কমলটি দেখে আমার মনে পড়ল চারশ বৎসরের পূর্ব্বের মহাপ্রভুর লীলা, যখন "কাঙালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি।"

লোকসংঘট্টে গুরুদেবের কষ্ট দেখে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ এবার সত্যই ভেঙে পড়ল। সেদিন ১১ই শ্রাবণ মঙ্গলবার। আমি গুরুদেবকে নবদ্বীপ নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম; কিন্তু তিনি সম্মত না হওয়ায় আমি রাগ করে নিজেই তল্পিতল্পা নিয়ে যাত্রা করলাম। গুরুদেব তাই দেখে আমায় বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি এখন যেওনা, বাবা। তুমি এখানে না থাকলে আমি যাবার পর আমার আসন প্রভৃতি কে গোছগাছ ক'রে নিয়ে যাবে? তা' ছাড়া আমার ব্যবহৃত কোনো জিনিষ, এমন কি ফুল-মালা, পাতাটি থেকে এই বাড়ীর একটি

ধূলিকণাও যেন না থাকে। এই ভাবে বাড়ী পরিষ্কার ক'রে, ধুয়ে মুছে সাফ্ করতে হ'বে। এ সব ব্যাপারের ঠিকমত ব্যবস্থার ভার একমাত্র তোমাকেই দিতে পারি, বাবা। অতএব আমি আসন তুললে তারপর এসব ব্যবস্থা ঠিকমত ক'রে তবে তুমি যেতে পারবে, বাবা।" এই ব'লে তিনি আমাকে হাত ধরে বসালেন, এবং নিজেই আবেগের মুখে তখনই গুহাশ্রম যাত্রা করলেন।

গুরুদেব কলকাতার এই মনুষ্য-সংকুল জনারণ্য ছেড়ে নবদ্বীপ নিজ আশ্রমে যাত্রা করাতে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এবার তিনি আমাকে যে-দায়িত্ব ভার দিয়ে গেলেন, তা' পালন করতে হবে। প্রথমে গুরুদেবের আসন ও অন্যান্য জিনিষ-পত্র গুছিয়ে বাঁধাবাঁধি করতে লাগলাম। এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করলেন মদনদাদা ও ভূপেনদাদা। অনেক রাত পর্যন্ত 'গুরুদেবের সংসার' গোছালাম। পরদিন সকাল এগারোটা পর্যন্ত এই কাজ চলতে লাগল। গুরুদেবের ব্যবহৃত তিনতলার ঘর, বারান্দা, বাথরুম, সিঁড়ি ও ছাদে—একটি ধূলিকণাও রাখিনি, তাঁর বাক্যমত। শুকনা মালা ইত্যাদির স্তূপ ভূপেনদাদাকে দিলাম গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে। বাকী ঘর সব সোডা দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে মুছে দিলাম। দোতালা, একতলাও অনুরূপ ভাবে সাফ্ করলাম—তাঁর কৃপায় গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। 'গুরুদেবের সংসারে'র মালপত্র হ'ল প্রচুর। এমন সময় গোমো থেকে জীবনদাদা এসে পৌঁছালেন। তিনিও এসে আমাকে অনেক সাহায্য করলেন। মদনদাদা ও ভূপেনদাদা গতকল্য সন্ধ্যায় আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। এখন তাঁদের অফিস। জীবনদাদাও দুপুরে চ'লে গেলেন। সুতরাং আমি এখন একা। ভূপেনদাদা ব'লে গেছেন তিনি তাঁর অফিস হাওড়া মিউনিসি-প্যালিটি থেকে হাওড়া স্টেশনে ঠিকমত উপস্থিত হ'য়ে মাল সব বুক্ ক'রে ট্রেনে তুলে দেবেন। ঠিকমত সময় নির্দ্ধারিত করা হ'ল এবং সেই নির্দ্ধারিত সময়ে হাওড়া স্টেশনের কোন্‌খানে আমি মাল নিয়ে উপস্থিত থাকব তাও ঠিক করা হ'ল। দু'খানি Taxi করে বেলা চারটার সময় যাত্রা করলাম। একজন Taxi driver গুরুদেবের পরিচিত, গতকালই তাকে ব'লে রেখেছিলাম। গুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে তার সঙ্গে হাওড়াস্টেশনে এসে পৌঁছালাম। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত স্থানে মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি; ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই ভূপেনদাদা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মাল বুক করিয়ে আমাকে ট্রেনে উঠিয়ে মাল তুলিয়ে দিলেন। রাত ন'টায় নবদ্বীপ গুহাশ্রমে পৌঁছে গুরুদেবের আসন ঘরে তাঁর দর্শন পেলাম।

প্রায় আড়াই মাস কলকাতায় অবস্থানের পর গুরুদেব গুহাশ্রমে নিজ সিদ্ধাসনে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে শান্তিলাভ করলেন এবং আমরাও কতকটা স্বস্তি পেলাম। কিছুদিন ধ'রে শিষ্যদের যাতায়াত কমই থাকল, তা'তে গুরুদেবও বিশ্রাম পেলেন এবং আমরাও নিশ্চিন্ত থাকলাম। অন্তরঙ্গও ভক্তশিষ্য ছাড়া আর কাউকে আসতে লিখলেন না গুরুদেব। ২৪শে শ্রাবণ টিটিলাগড় থেকে কমলারা এল। তাদের নিয়ে গুরুদেব শান্তিই পেলেন। এই সময়ে কমলাদের হঠাৎ এখানে আসার পশ্চাতে গুরুমহিমার এক অলৌকিক কাহিনী জড়িত আছে। সে কাহিনী পরে যথাস্থানে বিবৃত করা হবে। ইতিমধ্যে আমার অন্তরজগতে আমার অন্তর্য্যামিনী মা রাধারাণী কৃপা করে যে লীলা-বৈচিত্র্য প্রকাশ করছেন, তারই কিছু বিবৃত করতে চেষ্টা করছি। সিদ্ধসাধুগুরুসঙ্গ ও সেবার ফলেই বহুজন্মার্জ্জিত কর্মবাসনা দূরীভূত হয় এবং সাধকের সাধনা অনুযায়ী সেই সাধুকৃপাস্পৃষ্ট নির্ম্মল চিত্তে বিশুদ্ধ সম্বোজ্জ্বল পরিবেশে মা রাধারাণী আবির্ভূত হ'য়ে তাঁর লীলা প্রকাশ করেন ও সাধককে সর্ব্বসময়ে উপদেশ ও কৃপা বিতরণে সাধনপথে নিয়ে চলেন। গুরুসঙ্গ, সেবা ও তজ্জনিত কৃপার ফলে মায়ের এই কৃপা-আবির্ভাব পেয়ে এ অধম দাস বরাবর ধন্য হয়েছে, সাধুকৃপার অমৃতময় ফললাভে এই অতি হীনের জীবনও সার্থক হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গুরুদেবের শ্রীচরণলাভের বহু পূর্ব্ব থেকেই, আমার শৈশবেই, চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ও জগজ্জননীর প্রতি আন্তরিক তীব্র আকর্ষণ বর্ত্তমান ছিল তবে সেই স্ফূর্ত্তি ও সেই আকর্ষণ ছিল অস্পষ্ট; তার মধ্যে স্পষ্টতা বা নিশ্চয়তার অভাব ছিল, ছিল শুধু একটা আকুলতা ও উৎকণ্ঠা। কোথায় আমার মা, কোথায় আমার কৃষ্ণ ব'লে সর্ব্বদাই ছটফট করতাম; ব্যাকুল হয়ে খুঁজতাম তাঁদের।

সিদ্ধ সাধুগুরুর শ্রীচরণলাভে, বিশেষতঃ তাঁর অবিরাম সঙ্গ ও সেবারূপ বারি সিঞ্চনে আমার অন্তঃস্থিত এই বীজ এখন অঙ্কুরিত হ'য়েছে এবং দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হ'য়ে উঠেছে। সে সব অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, অলৌকিক দর্শনের কাহিনী ইতিপূর্ব্বে সম্ভবমত বিবৃত করতে চেষ্টা করেছি। মা রাধারাণীর স্নেহ করুণার কথাও বলেছি, এবং যতদূর সম্ভব শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কৃপার কাহিনী বিবৃত করতে অবশ্যই প্রয়াসী হব। প্রকৃতপক্ষে এ সকল কৃপার কথা বাইরে প্রকাশ করা উচিত নয়, "দেবগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে", কিন্তু "তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে" চৈ: চ: ১।৫।

৩০শে শ্রাবণ রবিবার ভোর রাত্রে মা-কে যেন কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনা ; মাতৃহারা ধেনুবৎসের মত আকুল হ'য়ে কাঁদছি। কিছুক্ষণ পরে ছলনাময়ী মা আমাকে দর্শন দিয়ে শান্ত করলেন। তারপর বললেন, "গুরুরূপে যাঁর শ্রীচরণাশ্রয় পেয়েছ, তাঁর কিঞ্চিৎ মহিমার কথা বলছি শোনো, বৎস। তিনি কালবিজয়ী মহাপুরুষ। প্রাকৃত কাম তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে না, তিনি পাঁচ বছরের শিশুর মত দেহে-মনে প্রাণে সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার। হ্যাঁ, বৎস, তিনি মন্মথের মন মথন করে মদনমোহন হয়েছেন এবং পঞ্চ শরদর্প জিনি স্বয়ং নব কন্দর্পরূপ পরিগ্রহ করেছেন। তোমার বহুভাগ্য ফলে সেই মদনমোহনের শ্রীচরণ লাভ করেছ। এরূপ মহাপুরুষ শুধু পৃথিবীতে নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও দুর্লভ।" তারপর একটু থেমে গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "এখন তোমার উপর তার পরীক্ষা চলছে, বাছা। এ পরীক্ষা তোমার গুরুদেবই করছেন তোমাকে, কাজেই খুব সাবধান।" এই বলে মা অন্তর্হিত হলেন। জেগে উঠে কাঁদতে লাগলাম, মা, মা' কোথায় গেলে, মা ? গুরুদেবের পরীক্ষা ? কিন্তু আমার তো কোনো শক্তিই নেই, মা। শক্তিময়ী মা, তুমি শক্তি না দিলে কেমন ক'রে আমি তাঁর পরীক্ষাসাগর উত্তীর্ণ হব ? তোমাকে ছাড়া আর কাকে জানাব মা, কাকে আঁকড়ে ধরব,—মা, মা, আমায় রক্ষা কর ব'লে। বাইরে আমার আচরণ, ব্যবহার সব ঠিক হয় না জানি ; লোকের সাথে ঠিকমত আচার ব্যবহার ঠিকমত করতে পারিনা, পারি না গুরুদেবের কাছেও। কিন্তু মাগো, তুমি ছাড়া আমার আপনার জন, আমার অন্তরের নিধি আর তো কেউ নেই, মা—তাই শয়নে-স্বপনে-জাগরণে দিবানিশি অন্তরে কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ি, মা, তোমার ওই দুটি রাতুল শ্রীচরণে। আমার এ অন্তরসাধন বাইরের লোক কেউ জানে না—জানেন শুধু অন্তর্য্যামী, আর গুরুদেব, আর দিবানিশি যাকে ডাকি সেই মা তুমি। তাই তো, মা, তোমার এত করুণা, অধম মহাপাপী হলেও এত অপারসীম ক্ষমা, এত সুধাসম স্নেহ, এত তাড়না ভৎর্সনা, এত উপদেশ, এত শাসন অথচ এত সোহাগ। আমার অন্তর জুড়ে রয়েছ যে মা তুমি, সে কথা জান শুধু তুমি আর জানেন গুরুদেব।

স্বীয় উপলব্ধিতে ও স্বপ্নযোগে মা রাধারাণীর এই স্নেহসুধার অজস্র ধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে আমি যেন অমৃতময় হ'য়ে উঠি। তাই আজ সারাদিন দুচোখে অশ্রু উথলে পড়ছে, সমস্ত অন্তর যেন কী এক আনন্দ বেদনায় গুমরে গুমরে উঠছে। মা রাধারাণীর অনুরাগে ভরা চিত্তের এও এক লক্ষণ। ৩০শে শ্রাবণ গুরুদেব সন্ধ্যায় নিজ শ্রীমুখে অমৃতময় সাধু প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করলেন। যে সমস্ত সাধুমহাপুরুষের কথা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন নিত্যানন্দ গোস্বামী, (ল্যাংটাবাবা), প্রেমদাঁচ গোস্বামী, বালা গোস্বামী, হরিদ্বার সূর্য্যকুণ্ডের সমীপস্থ বাঁশগাছের কাছে জনৈক মহাপুরুষ, নীচের

পাহাড়স্থিতা ভৈরবী মা, বাসুবাটির সন্ন্যাসী, বীরচাঁদ গোস্বামী, রাধাচরণ গোস্বামী, বড় চটসাই সাধু, ছোট চটসাই সাধু, কুঞ্জবিহারী সাধু, মথুরানাথ সাধু, গোলাম রহমান মস্তানা ইত্যাদি। এদের আচরিত সাধন পন্থার কথাও কিছু ইঙ্গিতে বললেন। যাঁরা তন্ত্র-মার্গে সাধন করেছিলেন, তাঁদের তন্ত্রসাধন শক্তির কথাও একটু আধটু শোনালেন; যাঁরা অষ্টাদশ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁদের সে সিদ্ধির কিছু চমকপ্রদ বিবরণও জানলাম তাঁর কাছে থেকে। এরূপ কাহিনী অনেকেই অনেক স্থানে শুনে থাকবেন, কাজেই সে সবের বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে দুজন সাধুর সাক্ষাৎকারের একটি মজার কাহিনী—যা তাঁর শ্রীমুখ থেকেই শোনা—উল্লেখ না ক'রে পারলাম না। জনৈক সাধু তাঁর ভক্তমণ্ডলী নিয়ে আশ্রমে তাঁর নিজ আসনে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় দূরে দেখা গেল এক সাধু ব্যাঘ্রে আরোহণ ক'রে তাঁর দর্শনে আসছেন। ব্যাঘ্রে উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি সেই দূরে থেকেই জানালেন যে, তিনি তাঁর দর্শনে এসেছেন। এদিকে আশ্রমস্থিত সাধুর ভক্তগণ তো ব্যাঘ্রারূঢ় এই ভয়ঙ্কর সাধুকে দেখে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল; সকলেই ভাবতে লাগল, এ কত বড় সাধু যে বাঘে চড়ে বেড়াতে পারে? এমন সময় আশ্রমস্থিত সাধু মৃদু হেসে আসনসহ দাওয়া বা রোয়াকটিতে দুটি চাপড় দিলেন, অমনি সেই সাধু তাঁর আসন এবং সমগ্র দাওয়া বা রোয়াকটি স্থানান্তরিত হ'য়ে সেই ব্যাঘ্ররূঢ় সাধুর সমীপে উপস্থিত হ'ল। তখন সেই ব্যাঘ্ররূঢ় সাধু ব্যাঘ্র পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে এঁকে প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বললেন, "আপনার শক্তির কাছে আমার শক্তি অতি নগণ্য। আমি হিংস্র পশুকে বশ করেছি, আর আপনি নির্জীব পদার্থকে নিজ ইচ্ছামত চালাতে সমর্থ।" এসব কাহিনী শুনে মেজদাদা বলেছিলেন, "এরা অনেক অলৌকিক অদ্ভুত ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন সত্য, কিন্তু মায়া জয় ক'রে শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ করেছেন ক'জন?"

অত্যন্ত সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্বটি মেজদাদা প্রকাশ করায়, বিদগ্ধ-শিরোমনি শ্রীগুরুদেব কোনো কথা বললেন না, শুধু হাত জোড় ক'রে ঢুলুঢুলু নয়নে বললেন, "বাবা, বাবা।"

মেজদাদা সত্যকথাটাই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোক সে কথা ভুলে যায়। ভুলে যায় যে অষ্টাদশ সিদ্ধিলাভ দুরূহ হলেও অসম্ভব নয়, কিন্তু প্রেমপ্রাপ্তি "জীবে কভু সম্ভবেনা, সম্ভবেনা,—যদি কারো ভাগ্যে ফলে"। সাধারণ জনগণ বিস্মৃত হয় যে "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ, সেয়ং সাধনসহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা"—ভ. র. সি ১।২৩; মনে থাকেনা কবিরাজ গোস্বামীর বাক্য "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া, কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া"-চৈঃ চঃ ১।৮। এমন যে সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম, সেই প্রেমধনে ধনী আমাদের গুরুদেব; তাঁর কাছে

অষ্টাদশ সিদ্ধি এবং মুক্তি তৃণতুল্য, সিদ্ধিসকল তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফেরে তাঁর সেবার জন্য—এই গোপন ও নিগূঢ় তত্ত্বটি প্রকাশিত হ'য়ে পড়াতেই চতুর-চূড়ামণি গুরুদেব চুপ করে গেলেন।

৩রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার সকালে গুরুদেব আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন তার মধ্যে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য "তোমার ভালই হচ্ছে। তবে এ শ্রীযুগল ভজন, এটা আসক্ত হয় না। পরে সে সাধন পাবে, এখন নয়।"

১৬ই ভাদ্র বুধবার নৌকা ক'রে বেড়াতে যাওয়া হ'ল, বৃহস্পতি-বারেও আবার গঙ্গাবক্ষে নৌকা ভ্রমণ করলেন গুরুদেব। ঐদিন সন্ধ্যায় প্রভু আমাকে উপদেশ দিলেন "গোড়া থেকে কাজ ঠিক না রাখলে কর্মফল কাটে না। গুরু যা বলেন তাই শুনবে—ভাল মন্দ তিনি বুঝবেন। গুরুবাক্যে বিশ্বাস না ক'রে কিছু হ'ল না বললে অধঃপাতে যেতে হয়।"

এবার রাধারাণীর কৃপা আবির্ভাবের কথা বলি। ৫ই ভাদ্র শনিবার পূর্ণিমার দিন ইচ্ছা হচ্ছিল আমার মা রাধারানীকে মনের মত করে সাজাই। আজ সারাদিন মাতৃমূর্ত্তিস্ফূর্ত্তিতে জীবন যেন মাতৃময় হয়ে উঠছে। রাত্রে স্বপ্নযোগে মা আমাকে দর্শন দিয়ে আদর ও সোহাগ করে 'খোকন' ব'লে ডাকছিলেন। তৎপর প্রসন্ন বদনে বললেন, "গুরুদেব সর্ব্বান্তর্য্যামী; তার বাক্যমত চলা উচিত। তোমার কথা তিনি সমস্তই আমাকে বলেছেন। তাঁর কাছে পুনঃ পুনঃ অপরাধ ক্ষমা চাইবে। তাঁরই পরীক্ষা—চৈতন্যদেবের চৈতন্য দেওয়া।" তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "আমাকে ভক্তি করতেই হবে, কারণ আমি ছাড়া তিনি নন। আমি যা বলি, ভক্তি ক'রে তাই শুনবে। আমি তোমায় অন্তরে আশীর্ব্বাদ করি। টিকে থাকলে, যা' চাও তা' ক্রমে ক্রমে পাবে। পাত্র ঠিক হ'লে তবে দেব। আমি তোমায় ক্ষমা করেছি।"

মায়ের এই স্বরূপ দর্শন করে কেঁদে আকুল হলাম। মনে মনে বললাম, মাগো, আমার প্রবল অনুরাগের মধ্যে আপনি আমায় জানালেন, আপনিই আমার মা,—আমার জন্মে জন্মের মা, আমার চিরদিনের চিন্ময়ী জননী। কত অপরাধই না করেছি ঐ চরণে। কাতর কণ্ঠে নিবেদন জানাই-মাগো, নিজগুণে অজ্ঞান সন্তানের সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা ক'রে যাতে মাতৃপাদপদ্ম লাভ হয়, দয়া করে এই মাতৃহীন বালককে সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন, মা।

২৬শে ভাদ্র শনিবার: আজ ইছাপুর হ'তে বহু শিষ্য ও ভক্ত এলেন ঠিক দ্বিপ্রহরে। গুরুদেবকে গঙ্গায় নৌকাভ্রমণে নিয়ে যাবার জন্য আগে থেকেই দুখানা নৌকা ঠিক করা হয়েছিল। গুরুদেব বার হচ্ছেন এমন সময় ইছাপুরের শিষ্যগণের আগমন হ'ল।

গুরুদেব ওঁদের সঙ্গে করেই গঙ্গাতীরে এলেন—সেখানে নৌকা দুটি বাঁধা ছিল। তারপর দুইদলে বিভক্ত হয়ে দুটি নৌকায় উঠে পড়লাম সকলে। আমি ও মেজদা অবশ্য গুরুদেবের নৌকাতে উঠে তাঁর কাছেই বসলাম। শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে নৌকাভ্রমণের অনেকগুলি সুযোগ পেয়েছি, তার মধ্যে দু'একটির বিস্তৃত বিবরণও দিয়েছি। কিন্তু আজকের এই নৌকাযোগে যাত্রার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল গুরুদেবের। এই উদ্দেশ্য অলৌকিক, সাধারণ rational মানুষের চিন্তার বহির্ভূত। আমরা সাধারণ নগণ্য জীব, কাজেই তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিনি, এমনকি বিন্দুমাত্র অনুমানও করতে পারিনি। গুরুদেব প্রথম থেকেই দু'খানি নৌকা বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন, যদিও আমরা তার খবর জানতাম না।

যাই হোক; ইছাপুর থেকে আগত প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে শ্রীগুরুদেব নৌকায় আরোহণ করলেন। গুরুদেবকে নানাবিধ পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হয়েছিল। মেজদাদা ও আমি গুরুদেবের দুপাশে ছিলাম। ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গা, দুই কূল পূর্ণ ক'রে গঙ্গার গৈরিক জলরাশি টলমল করছে। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল নৌকা কোন্ দিকে যাবে। গুরুদেব একবার মেজদার দিকে চেয়ে বললেন, (যেন তিনি কিছুই জানেন না, এইরূপভাবে), "মেজবাবা, গুরুআশ্রমের ঠিক সম্মুখভাগে গঙ্গার অপর পারটি কেমন দেখলে হয় না?" মেজদা গুরুদেবের ভাব বুঝতেন, বললেন, "আজ্ঞে, হাঁ।" তারপর মাঝিকে নির্দেশ দিলেন আশ্রমের ঠিক সম্মুখে ওপারে নিয়ে যেতে। মাঝি একটু ইতস্ততঃ করে বললে, "আজ্ঞে, ওখানটা তো আঘাটা, পারে কাদা হবে। তা' ছাড়া উপরে ঘন জঙ্গল।" গুরুদেব মেজদার দিকে চেয়ে বললেন, "বাবা' আমি তো জঙ্গলেই থাকতাম; বন জঙ্গলই তো আমার জায়গা। মেজদাদা গুরুদেবের মন বুঝে মাঝিদের নির্দেশ দিলেন, "হোক কাদা জল, ওখানেই নিয়ে চল।" তখন আশ্রমের ঠিক বিপরীত পারে যাবার জন্য মাঝি হাল ধরল। ভাদ্রের ভরা গঙ্গার জলরাশি ভেদ ক'রে নৌকা অগ্রসর হ'তে লাগল। মিনিট পনেরো কুড়ি পরে নৌকা অপর পারে ভিড়ল। মাঝি লাগ পুঁতে নৌকা বাঁধল। দেখলাম, ঠিকই; পারে কাদা। গুরুদেবকে ধ'রে ধ'রে সাবধানে নৌকা থেকে নামানো হ'ল। তারপর কাদার উপর দিয়েই তিনি অগ্রসর হলেন। ক্রমে উপরে উঠে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। ঝোপঝাপ, নানা গাছের জঙ্গল, তার মধ্যে কাশফুলের গাছই বেশী, রাশি রাশি দুগ্ধ-শুভ্র কাশফুলের গুচ্ছ বাতাসে হেলছে দুলছে—সে এক অপূর্ব্ব শোভা। গুরুদেব চারিদিক দেখতে দেখতে জঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। আশে পাশে পিছনে ভক্তগণ চলতে লাগলেন। আমি সবদাই গুরুদেবের একেবারে পাশে পাশে ছিলাম। এইভাবে কিছুক্ষণ চলতে চলতে গুরুদেব মাঝে মাঝে দাঁড়াতে

লাগলেন এবং ও অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে কথা বলতে লাগালন, গুরুদেব বল্লেন, "বাবা, আমি তো এইরূপ বনে বনেই থাকতাম। এই নির্জন নদীতট, এই নরম কাদা এই কাশবন—এই তো আমার প্রিয় বাসস্থান ছিল—নয় কি, মেজবাবা?" যেন মেজদাদা গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে সে সময়ে থাকতেন—এইভাবে বললেন। মেজদাও গুরুদেবের ভাব বুঝে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো।" এমন সময় ইছাপুর থেকে আগত গুরুদেবের নতুন শিষ্য Rifle factory-র chemist যতীন মুখার্জীবাবু আমাকে ইঙ্গিতে একটু আড়ালে ডেকে বললেন, "দেখুন, ভাই, আমি একটা camera সঙ্গে এনেছি, গুরুদেবের একটা ফটো নিতে চাই। আপনি যদি দয়া ক'রে এ বিষয়ে গুরুদেবকে একটু জানান।" আমি তাঁর কথা শুনে গুরুদেবকে সব বললাম। গুরুদেব শুনে বললেন, "বেশ তো, তুমি একটা ভাল পছন্দমত জায়গা ঠিক কর।" তখন আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেশ ঘন বন ও কাশফুলের সমারোহের মধ্যে গুরুদেবকে নিয়ে এলাম। গুরুদেব জায়গাটি দেখে খুব খুসী হ'য়ে বললেন, "ঠিক জায়গা পছন্দ করেছ, সুরেন-ধন। আমি এমনি বনেই থাকতে ভালবাসতাম।" গুরুদেবকে প্রসন্ন দেখে আমিও আনন্দচিত্তে যতীনবাবুকে তাঁর camera ready করতে বললাম। যতীনবাবু প্রস্তুত হলেন; শেষমুহূর্তে আমি গুরুদেবের কণ্ঠের মালাগুলি ঠিকমত সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে যতীনবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "Ready তো?" যতীনবাবু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" আমি তখন পাশে স'রে গিয়ে বললাম, "এইবার ফটো নিন্।" যতীনবাবু ফটো নিলেন। হঠাৎ আচমকা গুরুদেব আমাকে খুব ভৎর্সনা ক'রে ব'লে উঠলেন, "হরির লুট? আমার হরি-লুটের ঝুড়ি কৈ? এতদিন আশ্রমে রয়েছ—একটুকুও জ্ঞান হ'লনা?" এই অতর্কিত ভৎর্সনায় আমি তো একেবারে অবাক! ফটো নেওয়ার সঙ্গে হরি-লুটের কী সম্বন্ধ তা' যে কোনো rational মানুষের ধারণার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। যাই হোক, তাঁর বাক্যমত তাড়াতাড়ি হরিলুটের ঝুড়ি তাঁর কাছে নিয়ে এলাম, তখন তিনি দুইহাতে সন্দেশ ও অন্যান্য মিষ্টান্ন নিয়ে যেন কাউকে দিচ্ছেন এইভাবে দাঁড়ালেন। যতীনবাবুকে আমি আবার ready হ'তে ব'লে পাশে স'রে দাঁড়ালাম। যতীনবাবু দ্বিতীয়বার বোতাম টিপে গুরুদেবের দ্বিতীয় ফটো নিলেন।

গুরুদেব এবার ওখান থেকে চ'লে এসে ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন; এবং আনীত হরিলুটের ঝুড়ি থেকে সবাইকে খেতে দিলেন। শিষ্য ও ভক্তগণ হরিলুট খেতে খেতে মহানন্দে গুরুদেবের জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। তারপর ফেরার পালা। গুরুদেবকে তেমনি ধ'রে ধ'রে সতর্কভাবে নৌকায় ওঠানো হ'ল। যথাসময়ে আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। যতীনবাবুকে আমি অনুরোধ করলাম, গুরুদেবের ছবির একটি কপি যেন আমি পাই। যতীনবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই।"

সাতদিন পরের কথা। যতীনবাবু ও ওঁদের নেতা ভুবনবাবু ঠিকই এলেন ঐ দুপুরের গাড়িতে। আমি তখন বাইরে রাধাগোবিন্দমন্দিরের রোয়াকে ব'সে আছি। "আসুন আসুন"—ব'লে তাঁদের অভ্যর্থনা করলাম। তাঁরা কিন্তু আমার দিকে না তাকিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে মন্দির দ্বারের দিকে অগ্রসর হলেন। ব্যাপার কী? আমি তাড়াতাড়ি মন্দিরে গিয়ে গুরুদেবকে সংবাদ দিতেই তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওঁরা দুজনে সিড়ির শেষ ধাপে থেমে গেলেন। তারপর দুই চোখ বিস্ফারিত করে বলতে লাগলেন, "বাবা গুরুদেব, একী দৃশ্য, এ কী ভয়াবহ অলৌকিক দৃশ্য দেখালেন।" এই ব'লে সেদিনের ফটোর একটি enlarged copy বার ক'রে গুরুদেবের সামনে রাখলেন। গুরুদেবও যেন কত বিস্মিত হয়েছেন এই ভাবে দেখতে লাগলেন। ভুবনবাবুর দুইচোখে বিশ্বের বিস্ময় নেমে এল; কাঁপতে কাঁপতে স্খলিত কণ্ঠে তিনি ব'লে গেলেন, "এরা কারা, এরা কারা, বাবা? মানুষ নয়, অথচ মানুষের মত অবয়ব—এই অশরীরী এরা কারা, গুরুদেব?" এই ব'লে তিনি ও যতীনবাবু থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলেন। গুরুদেব শুধু দুই হাত যোড় ক'রে ঢুলু ঢুলু চোখে ওঁদের দিকে চেয়ে বললেন, "বাবা, বাবা।" তারপর খাওয়া দাওয়ার পালা, কুশল প্রশ্ন, হরিলুট ইত্যাদিতে ওদের ভুলিয়ে দিলেন গুরুদেব। এই অলৌকিক ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যা তখন গুরুদেব ওঁদের দিলেন না। যতীনবাবু যখন উপরে উঠে এলেন তখন দুটি ফটোই আমি ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম। প্রথম ফটোটি ঠিকই উঠেছে, সেখানে অলৌকিকত্বের কোনো ছাপ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় ফটোর সামনে বহু অশরীরী প্রেতাত্মার ভীড়। মানুষ নয়, কিন্তু বহু মানুষের ছায়াকৃতি। তারা সবাই যেন ব্যাকুল হ'য়ে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছে গুরুদেবের সামনে, cameraর focus এর field এর মধ্যে তারা সবটা স্থানই জুড়ে রয়েছে,--আর গুরুদেব যেন তাদের লক্ষ্য ক'রে হরিলুট দিচ্ছেন।

"আমার হরিলুট কৈ?'—গুরুদেবের সেদিনকার ভৎর্সনার তাৎপর্য এখন বোধগম্য হ'ল আমার। পরে শুনলাম, জায়গাটা শ্মশান; তবে সাধারণ শ্মশান নয়, ওখানে মৃতদেহ বিধিমত দাহ করা হয় না। দূর দেশ হ'তে আনীত মৃতদেহ অবহেলাভরে এখানে ওখানে ফেলে দেওয়া হয়। ওটা প্রেত-ভূমি। প্রেতাত্মারা প্রেতযোনিতে কষ্ট পাচ্ছিল। তাদের করুণ ও কাতর আর্ত্তি গুরুদেব শুনেছিলেন। তাই তাঁর এই ওপারের গঙ্গাতটে আ-ঘাটের শ্মশান-বিহার। নৌকাভ্রমণ নয়—প্রেতাত্মা উদ্ধার করে এই অভিযান! এর ইঙ্গিত পরে গুরুদেবের মুখেই শুনেছিলাম। কিন্তু অতি নিগূঢ় ও প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা, তাই সর্ব্বসাধারণ্যে তা' প্রচার করেননি, বা করতে আগ্রহ

প্রকাশও করেননি। একমাত্র একান্ত ভক্তদের কাছেই তিনি এই অলৌকিক লীলার তাৎপর্য্য আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছিলেন।

২৮শে ভাদ্র সোমবার রাধাষ্টমী—রাধাষ্টমীর উৎসব গুরুদেব নিঃশঙ্ক আশ্রমেই ক'রে থাকেন। তাই সেই উপলক্ষে সেখানে গেলেন। উৎসব সমাপন ক'রে ১লা আশ্বিন বেলা দশটা নাগাদ আবার গুহাশ্রমে ফিরে এলেন। ৪ঠা সোমবার পূর্ণিমা—সকালে গুরুদেব স্বয়ং আমাকে ডেকে তাঁর প্রসাদ দিলেন। ১০ই সন্ধ্যায় গুরুদেবের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ববিষয়ে অনেক আলোচনা হ'ল—রাত্রে তাঁর শ্রীচরণ সেবার সৌভাগ্য পেলাম। ১৬ই শনিবার দুপুরে গুরুদেব গোমো তপোবনে রওনা হলেন, যাবার আগে আমাকে বার বার গোমো যেতে ব'লে গেলেন।

এবার আমারসাধনজগতে মা রাধারাণীর করুণানির্দেশ ও সতর্ক উপদেশের কথা বিবৃত করব।

২৮শে ভাদ্র জগজ্জননী করুণা ক'রে আমাকে কয়েকটি উপদেশ দিলেন: "(১) মোহ কাটাও, আগুন নিয়ে খেলা; (২) গুরুগতপ্রাণ হও; গুরুধ্যান গুরুজ্ঞান গুরু সারাৎসার কর; (৩) গুরুবাক্য অনুসারে প্রাণপণে সাধনে মেতে থাক; (৪) জপ তপ কর।" মায়ের এই অমূল্য উপদেশমত কাজ করতে পারছি কিনা জানিনা, তবে যে অনুরাগভরা আকর্ষণে তিনি অন্তর্জগতে আমাকে টানছেন, তা সুস্পষ্ট বুঝতে পারছি। ৩০শে বুধবার —মাকে মনে মনে জানাই, মাগো, আমি যে অকূলে প'ড়ে এত আকুল হ'য়ে আপনাকে ডাকি, এত কাঁদি—তবু কি পাষাণী মায়ের হৃদয় গলে না? আমার অপরাধ কি এতই দুর্ভেদ্য যে করুণাময়ী মায়ের এত করুণাও তা' ভেদ করতে পারে না? শুধু কেঁদে কেঁদেই কি জীবন যাবে? আজ সারাদিন সমস্ত প্রাণ কান্নার আবেগে যেন উথলে উথলে উঠছে, সারা দেহ যেন তরঙ্গে থর থর ক'রে কাঁপছে। মা কি তা' দেখছেন না? যিনি তাঁর শ্রীপদে এ অনুরাগ দিলেন, তিনি তো সবই জানেন। মাগো, তুমিও তো শ্রীকৃষ্ণের জন্য কেঁদে আকুল হ'তে, তখন পৌর্ণমাসী তোমায় যে সতর্কবাণী করেছিল, আমার ভাগ্যেও কি তাই হ'ল? "রাধা বাষ্পময়ী ন যাতি বিরতিং লোকস্য নির্ম্মিৎসতঃ, প্রেমাম্বিস্মিতি নন্দনন্দনপরং লোভায়মানা মা কৃথাঃ।"

মা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ বললেন, "গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্—তাঁকে পেয়েছ, মাকে পেয়েছ। গুরুসেবা কর, গুরু প্রসাদ পাও। এখন তাঁর যা' খুসী তা' করুন না কেন? ভক্তি রেখো, তা হ'লেই ফল পাবে পরে। আমার বাক্যমত চলো, তোমার মঙ্গল হবে।" তখন ভোর রাত,—স্বপ্নে কেঁদে ভাসিয়ে দিলাম মায়ের রাঙা চরণ দুটি। মা সান্ত্বনা দিয়ে সোহাগের সুরে বললেন, "ভয় কি-তুমি তো আমাদেরই চরণে আছ, বাছা। ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা করতে হবে। উপযুক্ত হ'লে তবে

তো পাবে। তবে আগে তো দেওয়া যায় না, বাবা। ধৈর্য্য ধর—তোমার ভাগ্য ভাল হবে পরে।"

৪ঠা আশ্বিন সোমবার—অনুরাগভরে মায়ের চরণ স্মরণ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম দুপুরে। মা কৃপা ক'রে দর্শন দিয়ে বললেন, "তুমি তো মূল বস্তুই পেয়েছ। খারাপই হোক আর ভালোই হোক—গুরুর উপর নির্ভর ক'রে চল। পরে ভাল হবে।" কিছুক্ষণ পরে আবার আদর ক'রে বললেন, "অন্তরে যেরূপ ভক্তি ক'রে আমাকে শান্তি দাও, বাইরেও সকলের সাথে সেরূপ দীন ও নীচ হ'য়ে ব্যবহার ক'রে সকলকে শান্তি দিতে হয়, বাবা।" ঘুম ভাঙলে ভাবলাম, সত্যই তো, নিজকর্মদোষে আমি সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারছি না : সত্যই অপরাধ হ'য়ে যাচ্ছে, তাই ধর্মপথে দ্রুত অগ্রসর হ'তেও পারছি না—করুণা ক'রে করুণাময়ী মা পতিত সন্তানকে হাত ধ'রে আবার তুলে নিচ্ছেন।

এদিকে গুরুদেবের লীলা দেখুন। বাহ্যতঃ আমাকে সঙ্গে না নিয়ে গেলেও, আমার মনপ্রাণ তিনি সঙ্গে ক'রেই নিয়ে গেছেন। গোমোয় পৌঁছানোর পরেই তিনি নিজ শ্রীহস্তে আমাকে পত্র লিখলেন ; "১৮ই আশ্বিন—বিচারজ্ঞ উকিল সুরেনধন গো…তুমি আশ্রমে গিয়া শ্রীমত্যা কর্ত্তামাতাঠাকুরাণীর নিকট প্রত্যহ প্রসাদ সেবা করিয়া আসিবে, ইহা ভুলিওনা, বাবা। রবিবার দিন বড়বাবাকে (ভৈরব বাবাকে) প্রসাদ সেবা করাইবে…।" ১৯শে আশ্বিন আবার লিখলেন, "বড়বাবা (ভৈরব বাবা), সুরেনধনকে আসিবার জন্য বলিবে, তাহাকে পাঠাইয়া দিবে।…সুরেনধন, আসিবার সময় ঠিকানার খাতা দুখানি আনিবে। যখন আসিয়াছি, কেহ দেয় নাই ; তুমিও দাও নাই। বাবা, শীঘ্র আইস ; আর কেন বিলম্ব করিতেছ ? সুরেনধন, খাও, খাও বলিয়া আর কাহাকে দিনরাত ডাকিব ?"

পর পর দু'দিন নিজ শ্রীহস্তে স্বয়ং প্রভু এই কীটানুকীটকে, এই অধম পতিতকে দু'খানি পত্র লিখলেন। সেই পত্র দুখানি মস্তকে স্পর্শ ক'রে ও বক্ষে ধারণ ক'রে খুব কাঁদতে লাগলাম। প্রভু, এই নরকের কীট, এই বহু জন্মের মহাপাপীর উপর এত করুণা! আমার সব রাগ অভিমান চোখের জলে ভেসে গেল। আমি গোমো তপোবনে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করবার সিদ্ধান্ত করলাম। ২২শে আশ্বিন শুক্রবার তপোবনে পৌঁছে আকুল উৎকণ্ঠায় আবার সেই রাতুল শ্রীচরণ দর্শন ক'রে প্রণাম ক'রে প্রাণ জুড়ালাম।

গোমো তপোবন

সাধনপথে এ কী পরীক্ষা, এ কী ভয়াল ভয়ঙ্কর বিঘ্ন বিভীষিকা, এ কী সার্থকতা-ব্যর্থতা, আশা-নিরাশা, উত্থান-পতন, আনন্দ-বিষাদের তরঙ্গাঘাত! প্রাণ যে হাঁপিয়ে

উঠছে ; আর যে পারছি না। হে অন্তর্য্যামী গুরুদেব, হে দয়াল প্রভু, হে করুণারূপিণী জননী রাধারাণী—এ চরণাশ্রিত সন্তানকে রক্ষা করুন। দিবানিশি অন্তর আমার আন্দোলিত হ'য়ে উঠছে এই সাধন-সমুদ্রের তরঙ্গদোলায় ; কখনো উঠছি কখনো পড়ছি ; কখনো অনুরাগের বন্যায় ভেসে যাচ্ছি, কখনো নৈরাশ্যের শুষ্ক মরুতৃষায় অন্তর হাহাকার করছে।

১লা কার্তিক—আজ স্পষ্ট উপলব্ধি হচ্ছে সাক্ষাৎ শ্রীনন্দনন্দন যেন ভূতলে অবতীর্ণ হ'য়ে তাঁর শ্রীচরণলাভের জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, ভক্তবৎসল ও শরণাগতপালক। আমি ভবভয়ে ভীত হ'য়ে তাঁর চরণে শরণ নিয়েছি, তিনি আমায় ফেলে দেবেন না ; কোন জন্মে অবশ্যই দয়া করবেন। তবে আমি যে দুঃখ পাচ্ছি, তার কারণ আমার প্রাক্তন কর্ম। সাধনরত সাধকের সাধনক্রিয়ার সঙ্গে তার প্রারব্ধ সংযুক্ত হ'য়ে প্রবল re-action এর সৃষ্টি করে ; এর ফলে সাধকের চিত্তে বিকার, বিভীষিকা, বিরাগ,ও ব্যর্থতার মনোভাব আনয়ন ক'রে তাকে সাধনপথ থেকে বিচ্যুত করার প্রবল প্রবণতা বর্তমান থাকে। এই ক্রিয়া বিক্রিয়ার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে সাধক বিভ্রান্ত, বিপদগ্রস্ত ও অনেক সময় সাধনাভ্রষ্টও হ'য়ে যেতে পারে। সুতরাং সাধকের পদে পদে, প্রতি ধাপে ধাপে কঠিন হতে কঠিনতর পরীক্ষা। একমাত্র ধর্মসাধকগণ এর প্রত্যক্ষ অনুভূতিলাভ করেছেন, অসাধকের এ সব বিভীষিকা কখনো আসেনা। সাধকের চিত্তে তাই রিপুগণ অতি প্রবল হ'য়ে তাকে পথভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে, তাকে অভিভূত, জ্ঞানহারা ও ক্ষতবিক্ষত ক'রে ফেলে। এ সময়ে গুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠাই সাধককে নিশ্চিত পতন থেকে রক্ষা করতে পারে। সাধকের মনে হয়, আমি তো অমৃতের আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করছি, কিন্তু গুরু আমাকে ঘৃণা ক'রে বিষ দিচ্ছেন। সাধককে তখন অনুরাগভরে গুরুদত্ত সেই হলাহলই গ্রহণ করতে হবে। গুরু যাতে সন্তোষ লাভ করেন, তাই করতে হবে। তাঁর জন্য কেঁদে কেঁদে দেহপাত করব, তিনি দয়া করুন বা নাই করুন—এই মনোভাব অবলম্বন করতে হবে।

আজ সন্ধ্যায় শ্রীগুরুদেব তাঁর পরীক্ষা-বিভ্রান্ত শ্রীচরণাশ্রিত এই সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বললেন, "বাবা, আমার যা দেবার তা তো দিয়েছি ; এখন মা রাধারাণীর চরণে শরণ নাও। মা রক্ষা করুন, রক্ষা করুন,—ব'লে তাঁর অভয় শ্রীপাদপদ্ম দুটি আঁকড়ে ধ'রে থাক। মনে প্রাণে মা রাধারাণীর সন্তান হ'য়ে থাক—তিনি ছাড়া এ ভব-সমুদ্রে আর কে রক্ষা করবে, বাবা ? তবে সাধন ক'রে যেতে হবে নিরলসভাবে, বিনা সাধনে কি তাঁকে পাওয়া যায় ?"

গুরুবাক্য হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে সাধন ক'রে যাচ্ছি, আর শয়নে স্বপনে জাগরণে সব

সময়ে মা রাধারাণীর অভয় শ্রীচরণ দু'টি আঁকড়ে ধ'রে তাঁকে ডাকছি। সেই করুণাময়ী জননী সন্তানের আকুল ক্রন্দনে উদাসীন থাকতে পারছেন না, তিনি কৃপা ক'রে এই অসহায় সন্তানকে দর্শন দিয়ে বলছেন, "আমি সব দেখছি। নতুন ক'রে কিছু বলতে হবে না। আমিও কি তোমার জন্য অশান্তি পাচ্ছিনা? তুমি যে আমারই চরণ ধ'রে আছ। স্থির হয়ে জপ তপ, উপাসনা কর। কর্মক্ষেত্রে ঐরূপ হচ্ছে। গুরুর পরীক্ষা। ভয় নেই, সাধতে সাধতে সব বিঘ্ন কেটে যাবে।" মায়ের আশ্বাসবাণীতে মনে বল এল। কিন্তু পরীক্ষা, এ কী কঠিন পরীক্ষা, মা? নিদারুণ দুঃখ, অভিমান—দিনের পর দিন অনশন, প্রাণ কণ্ঠাগত—মনে হ'ল এই বুঝি প্রাণ যায় যায়। মুমূর্ষুপ্রায় হ'য়ে মা, মা ব'লে কেঁদে কেঁদে তন্দ্রাভিভূত হলাম। জগজ্জননীর স্নেহসুধাধারায় আমি যেন ভেসে যাচ্ছি; সেই অমৃতস্পর্শে আমি যেন আবার নবজীবন পেলাম, সেই সুধানির্ঝর থেকে সহসা করুণাময়ী মা রাধারাণী মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে অভয় দিয়ে বললেন "ভয় নেই, ভয় নেই, বৎস। ঝড় তুফান তো থাকবেই এই সাধন জগতে। কিন্তু তাতে বিভ্রান্ত হয়োনা। গুরুবাক্যে নিষ্ঠা রেখে তাঁর বাক্য ঠিক মত পালন কর। গুরুবাক্য কেটোনা। দীন-ভাব ধর। নিষ্ঠা ও ভক্তি রেখে চল। গুরুদেব যখন চরণে রেখেছেন, তখন কৃপা একদিন করবেনই। সবুর করতে হবে, ধৈর্য্য ধরতে হবে। তোমার ভাল হবে, আমি বলছি। পরে দেখে নিও।"

এই ভাবে সাধন সমুদ্রের পরীক্ষাতরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে চলেছে আমার এই জীর্ণ তরণী। সময়ে সময়ে সে তরঙ্গের নির্মম আঘাতে সমস্ত দেহমন ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। সামনে অকূলের কাণ্ডারী উপস্থিত থাকতেও আমি চারদিকে অকূল পাথার দেখছি। প্রাণপণে ডাকছি মা রাধারাণীকে। তবু বিশ্বাস হ'তে চায়না যে তিনি রক্ষা ক'রে চলেছেন। বিশ্বাস চ'লে যাচ্ছে প্রতি নিয়ত তরঙ্গের আঘাতে। গুরুদেব তাই বোধ হয় কৃপা ক'রে আজ সতর্কবাণী শোনালেন। "গুরুর একটি বাক্যের জন্য চব্বিশ পঁচিশ বৎসর ধ'রে অপেক্ষা করতে হয়, সেই গুরুবাক্য তুমি পেয়েছ।" মনে ভাবলাম, ঠিকতো, এসত্য আমি বিস্মৃত হই কেন? সত্যই তো আমি ভাগ্যবান্।

২রা কার্ত্তিক গুরুদেব মোটরে বেড়াতে গেলেন ভক্তগণ সমভিব্যাহারে। আমি আজ আশ্রমেই থাকলাম। সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় তিনি ফিরে এলেন।

৩রা সন্ধ্যায় মীরার গান হ'ল গ্রামোফোন রেকর্ডে। আজ আবেগে সমস্ত প্রাণ আমার উথলে উথলে উঠছে। কেমন ক'রে ঐ শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ ক'রে রাখব? জোর ক'রে কে সে চরণ ছিনিয়ে নিয়ে যায়? মা গো, কী করি, কোথা যাই? দিবা নিশি স্থির হয়ে থাকনা কেন মা, এই সন্তানের হৃদয়ে? তুমি কি এ দাসের মনো-বেদনা বুঝতে পারছনা?

১৪ই রবিবার মনে হচ্ছে আমি নিরাশ্রয় হয়ে অকূলে ভেসে যাচ্ছি। মা, রক্ষা কর, মা, রক্ষা কর—ব'লে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছি। জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে মা দর্শন দিয়ে ভৎসনা ক'রে বললেন, "এতদিন ভেরেণ্ডাগাছ তলায় আশ্রয় নিয়েছিলে কেন, শালগাছ তলায় আশ্রয় নিতে পারনি ?" তারপর সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "ভয় নেই, সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্ম চিন্তা করবে। গুরুর উপর কিছু নেই। দীন হ'য়ে গুরুর নিকট দয়া চাইবে। গুরু যখন চরণে রেখেছেন, তখন উপায় একদিন করবেনই করবেন। ছেড়োনা, ধ'রে থাক। গুরু দয়া করলেই, আমার ও হবে।"

ঘুম ভেঙে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলাম, মা, মা, মা—এ মহাপাপীর কি গতি হবে, মা ? যাঁর পদকমল ব্রহ্মাও ধ্যানে দর্শন পাননা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁর মহিমার অন্ত পাননা, সেই সর্ব্বশক্তিময়ী আমার মা রাধারাণীকে কি আমি পাব, পাব কোনো জন্মে ? আপনি বললেন, "গুরু দয়া করলেই, আমারও হবে"—সেই গুরুর দয়া কোনো দিন কি পাব, মা ?

২২শে সোমবার সন্ধ্যায় গুরুদেব পাহাড় ভ্রমণে গেলেন। গুরুদেবের এই বন ভ্রমণে সেই বৃন্দাবনের বিপিন বিহারের মতই এক অনাবিল আনন্দে মন প্রাণ ভ'রে ওঠে।

২৭শে শনিবার শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে গোমো তপোবন ত্যাগ ক'রে নবদ্বীপ রওনা হলাম। সঙ্গে অনেক লোকজন, বহু কলরব, শিষ্য ও অশিষ্য ভক্তগণের আবেদন নিবেদন প্রার্থনা পূরণ রূপ বহু কাজ। তারি মধ্যে বেলা আড়াইটার এক্সপ্রেসে যাত্রা করা হ'ল। রাত্রি এগারোটায় নিরাপদে নবদ্বীপ গুহাশ্রমে শুভাগমন করলেন গুরুদেব। তাঁর সঙ্গের অলৌকিক প্রভাবে পথে একটুও ক্লান্তি হয়নি—সারা রাস্তা আনন্দেই এসেছি !

সাধনজীবনভোরই পরীক্ষা, এ পরীক্ষার বিরাম নেই। কখনো মনে হয় সব বিফল হ'ল, জন্মের মত পতন হ'য়ে গেল। গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা থাকলে গুরুই সেই সব সঙ্কট-মুহূর্ত্তে সাধককে কেশে ধ'রে টেনে তোলেন, বিদ্যুৎ চমকের মত নিজ স্বরূপ প্রকাশ ক'রে সাধককে সাধনপথে পুনঃস্থাপিত করেন। সাধনজগতের পরীক্ষার এই সব খুঁটিনাটি চমকপ্রদ বিবরণ কিছুপ্রকাশ করছি।

৩০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার—আজ মনে হচ্ছে প্রতিপদেই যেন পদ-স্খলন হবে। যেন দুই পাহাড়ের মধ্যে সরু দড়ির সেতুতে চলেছি—কিছুতেই টাল সামলাতে পারছিনে। প্রাণপণে গুরুপাদপদ্ম স্মরণ করছি, কিন্তু তবু প্রতি মুহূর্ত্তেই ট'লে পড়ছি ; সে সময় গুরুই আমাকে ধ'রে তুলছেন। একী ভীষণ পথ, একী পরীক্ষা।

সারারাত্রি জেগে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করছি। অসহনীয় যন্ত্রণা। আর সহ্য করতে পারিনা, প্রভু। রাত সাড়ে তিনটা থেকে আকুলপ্রাণে তাঁকে ডাকতে লাগলাম।

গুরু কৃপা করলেন। এবার তাঁর স্বরূপজ্ঞানে আমার হৃদয়গুহা আলোকিত হ'ল। সেই ভাস্বর আলোকে দেখছি, তিনি গোলোকের ধন, আর আমি এক মহাপাপী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য জীব মাত্র! বেশ বুঝছি, তাঁর সান্নিধ্যে থেকেও প্রাক্তন কর্ম আমাকে তাঁর শ্রীচরণ থেকে বিকর্ষণ করছে। এ হচ্ছে মায়ার বিকর্ষণ, এর শক্তি রোধ করবার ক্ষমতা, আমার কেন, কোনো জীবেরই নেই। তবু বহুজন্ম ধ'রে তাঁকেই চেয়েছিলাম, তাই বহু কৃপা ক'রে কৃপাময় গুরুদেব নিজশক্তি প্রয়োগ ক'রে এই অধম জীবকে তাঁর শ্রীচরণ সান্নিধ্যে আকর্ষণ ক'রে রেখেছেন। বুঝলাম, অন্তরে ও বাইরে যা' কিছু ঘটছে আমার, সবই আমার মঙ্গলের জন্য করছেন তিনি। এই ষড়-রিপুর প্রবল দাপট, এই অবিশ্বাস, এই রাগ অভিমান—সবই সাধনপথে সাধন ক্রিয়া সঞ্জাত বিকার মাত্র। শুধু গুরুপদে নিষ্ঠা রাখলেই সে সব বিকার বাষ্পের মত মিলিয়ে যায়, বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে গুরুতত্ত্ব পুনঃ প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে। দিনে দিনে যে এই অধমকে তাঁর শ্রীচরণ সেবার যোগ্য ক'রে নিচ্ছেন, তাই বুঝিয়ে দিলেন ভাল ক'রে। গুরুদেব আমাকে অনেক উপদেশ ও সান্ত্বনা দিলেন। তার মধ্যে একটি মূল্যবান্ উপদেশ: "এতো স্কুল কলেজ নয়, যে নির্দিষ্ট পড়াশুনা শেষ হ'লেই তার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকে গেল। এখানে চিরজন্ম শ্রীগুরুপাদপদ্ম সার ক'রে পড়ে থাকতে হবে। একলব্যের মত নিষ্ঠা চাই।"

৮ই অগ্রহায়ণ টিটিলাগড় হতে দুর্গাপদবাবুরা এলেন। পাঁচদিন গুরুচরণে অবস্থান ক'রে ১৩ই অগ্রহায়ণ তাঁরা বিদায় নিলেন।

১১ই ও ১২ই পৌষ দুদিন আশ্রমে গান হ'ল—ভক্তিমূলক সুন্দর গান। সে গানের সুর আমার মানসসরোবরে কত ভাবের তরঙ্গ তুলল। অনেক কাঁদলাম। সম্মুখে আমার গোলোক-বিহারী শ্রীগোবিন্দ—কেমন ক'রে ভক্তিচন্দনমাখা মানসকুসুমে ঐ রাতুল শ্রীচরণ অর্চনা করতে পারব, ঐ সুদুর্লভ রত্নকে আমার হৃদয়ের ধন ক'রে রাখব, তার জন্য আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম। যত গান শুনি, ততই মনের এই আকুলতা উথলে উথলে উঠতে থাকে।

২৫শে রবিবার গুরুদেব বনভোজন উৎসব করালেন মণিপুর আশ্রমে। চাল-ডাল, তরিতরকারি, বাসনপত্র, কাঠকুটো সব ব'য়ে নিয়ে চললাম আমরা সেখানে। দিনটা ছিল দুর্যোগপূর্ণ, দমকা হাওয়া ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। রান্না হচ্ছে বাইরে উনান তৈরী ক'রে; আগুন নিভে যাচ্ছে। জলে ভিজে ভিজে কাদার মধ্যে ছুটোছুটি; ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে সে এক মজার বনভোজন। গুরুদেবের কিন্তু এতেই আনন্দ। আমি বার বার গুহাশ্রমে এসে গুরুদেবকে সংবাদ দিচ্ছি—কতদূর কী হ'ল। দুর্যোগের মধ্যে আমাদের

সব কিছু প্রস্তুতির কথা শুনে গুরুদেব বললেন, "এতেই তো আনন্দ, বাবা। কেমন ছুটাছুটি। কেউবা পিছলে পড়ছে, কেউ ভিজে যাচ্ছে, ফুঁ দিয়ে নিভু নিভু উনান বারবার জ্বালানো হচ্ছে, অবশেষে আধসিদ্ধ তরকারী নামিয়ে ফেলা। সখাদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ পুলিনভোজনে এমনি মজা করেছিলেন। কষ্ট না হ'লে কি আনন্দ হয়?" এই ব'লে গুরুদেব খুব উৎসাহ দিলেন আমায়। শেষে তিনিও ওখানে গিয়ে ভক্তদের সাথে মিলিত হ'য়ে তাদের পরমানন্দ দান করেছিলেন।

২৬ শে সোমবার শ্রীগুরুদেব আমাকে হঠাৎ একটি শ্লোক শোনালেন: "ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্"। হাতযোড় ক'রে প্রশান্ত বদনে শ্লোকটি বললেন; তখন ঐ শ্লোক বলার তাৎপর্য্য ভাল ক'রে বুঝতে পারিনি।

৬ই ফাল্গুন গুরুদেব আমার মন টলমল দেখে সাবধান বাণী শোনালেন, "গুরুর কাছে না এসে নিস্তার আছে কি? কোথায় গেলে উদ্ধার হবে?" গুরুর সাধন পরীক্ষায় বিপর্য্যস্ত হ'য়ে মন যখন টলমল হ'য়ে বিশ্বাসকে শিথিল ক'রে দেয়, তখন সেই মুহূর্ত্তে গুরুদেবই হাল ধরেন—তার বহু নিদর্শন এই অধম শ্রীচরণাশ্রিতের জীবনে হয়েছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে গুরুর স্বরূপ জ্ঞান ও জীবাধম এই কীটের রূপ হৃদয়ঙ্গম হয়—তখন নিদারুণ দৈন্যে সমস্ত প্রাণমন তাঁর দেবদুর্লভ শ্রীপাদপদ্মে লুটিয়ে কাঁদে ও কাতর আর্তি জানায়, "মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন, পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম", মনে হয়, হায় হায়, কোথায় সেই ব্রহ্মাদির দুর্লভ গোলোকপতি, আর কোথায় এই অধম নরকের কীট—"ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্, ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ",—"উদ্বাহুরিব বামনঃ" হ'য়ে চাঁদ পাবার দুরাশা করেছি। তাঁর শিশুসুলভ সুকোমল চরণকমল দুটি দেখে দেখে যেন আশা মেটেনা, তাঁর স্মিত বিকশিত প্রফুল্ল বদন-কমলপানে চেয়ে চেয়ে মনে হয়, কত অমৃত নিঙারিয়ে ঐ মুখসুষমা সৃজন করেছেন বিধাতা, তাঁর সর্ব্ব শ্রীঅঙ্গের ললিত লাবণ্য-জোৎস্নায় স্নাত হ'য়ে আমার সমস্ত চেতনা যেন প্লাবিত হ'য়ে যায়, সমস্ত অন্তর যেন স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে গেয়ে ওঠে, "দেখে এলাম তারে সখি দেখে এলাম তারে, এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।" ভাবি, কতই তো সাধু মহাপুরুষ আছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের চাক্ষুষ দর্শন পেয়েছি এবং যাঁদের প্রতিচ্ছবি দেখেছি, কৈ কারো তো এমন লাবণ্য-শ্রী, এত সুষমা, এত মাধুর্য্য দেখিনি, যার মদনমোহন রূপ, যার "মনোহর মধুর মূরতি নব কৈশোর সদাই হিয়ার মাঝে জাগে!" জ্ঞানী, যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব সাধু অনেকই তো দেখলাম সাক্ষাৎ, ও চিত্রপটে—কৈ কাউকে দেখে তো মনে হয়নি, "এমন পুরুষ কি জগতে আছে?" সমস্ত হৃদয় তো বিস্ময়োৎফুল্ল হ'য়ে এমন ক'রে গেয়ে ওঠেনি "কিবা অপরূপ আ মরি মরি, আনহ হিয়ার মাঝারে ধরি।"

গুরুদেবের আর দুটি অসাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্য সব ভক্তই লক্ষ্য করেছেন: প্রথমতঃ তাঁর অসাধারণ শারীরিক শক্তি। এক মণ বস্তা যা' আমরা দুইহাতেও তুলতে পারতাম না, সেরূপ বস্তা তিনি এক হাতে অবলীলা-ক্রমে স্থানান্তরিত করেছেন। শ্রীগোবিন্দের একটি ধাতুময় বিগ্রহ যা বলবান লোকে দু'জনে ধরাধরি ক'রে উঠিয়েছেন, গুরুদেব তাঁকে একাকী অতি সহজে এ ঘর থেকে ও ঘরে নিয়ে গেছেন। দ্বিতীয়তঃ, গুরুদেব অতিক্রত বেগে চলতে পারতেন এবং তা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। তিনি ছুটে এলেও পিছন থেকে কেউ টের পেতনা।

এদিকে মা রাধারাণীর চরণে আত্মসমর্পিত এই সাধককে কীভাবে সাধনপথে সতর্কভাবে তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তার বিবরণ দিই। ইতিপূর্বে গুরুদেব আমাকে বলেছেন, "বাবা, আমার যা দেবার তোমায় দিয়েছি, যা' করবার করছি। কিন্তু এখন মা রাধারাণীকে প্রাণপণে ডাক। মায়ের দয়া হ'লে তবেই রক্ষা পাবে।" গুরুবাক্য শিরোধার্য্য ক'রে মাকে ডাকি। গুরুদেবকে একদিন কৌতূহলভরে প্রশ্ন করেছিলাম, "গুরুদেব, আমার নিজস্ব একজন মা আছেন, জন্ম জন্ম ধ'রে যাঁকে আমি ডাকছি; তিনি কখনো ধরা দেন, কখনো অদৃশ্য হন; কিন্তু তবু তিনি আমারই মা, নিত্যা চিন্ময়ী মা; এজন্যে শিশুকাল থেকেই সেই মাতৃস্ফূর্ত্তি হয় আমার, কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পাইনা"—"গুরুদেব আমার কৌতূহল মিটিয়ে সহাস্যে বললেন, "আমি সব জানি, বৎস। তিনিই মা রাধারাণী, জগজ্জননী; তিনিই তোমার মা। জন্মে জন্মে তাঁকেই আরাধনা করেছ তুমি। কিন্তু নিজ কর্মমালিন্যে তাঁর স্ফূর্ত্তি ম্লান হয়েছে তোমার চিত্তে। গুরু-পাদপদ্মে একনিষ্ঠা ভক্তি রেখে তাঁর প্রদত্ত সাধনযোগ ঠিক মত ক'রে গুরুকৃপা লাভ করতে পারলে মনের মলিনতা মুছে যাবে এবং নিত্য তাঁর লীলাদর্শন পাবে।" কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "প্রভু, আমার কর্মদোষে আমি তাঁকে হারাতে বসেছি, এ সত্য। প্রাণপণে সাধনও করছি তো গুরুদেব। কবে গুরুকৃপা হবে, তা' আপনিই জানেন। কিন্তু সন্তান ধূলি-কাদা মাখলেও কি মা তার ধূলি ঝেড়ে ,তাকে কোলে তুলে নেন না ?" গুরুদেব বললেন, "মা রাধারাণী তোমাকে ভোলেন নি। তোমার প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ। তুমি কি মাঝে মাঝে তাঁর কৃপা-দর্শন ও আদেশ-উপদেশ-স্নেহ বাণী পাওনা ?" চোখের জলে ভেসে জানাই, "পাই, প্রভু। তবু তো তাঁকে ধ'রে রাখতে পারিনা। নিত্য তাঁর কোলে ব'সে তাঁর কোলের ছেলে হ'য়ে আদর সোহাগ পাইনা।" গুরুদেব বললেন, "ধৈর্য্য ধরতে হবে, বাবা। এখন গুরুবাক্য মত প্রাণপণ ক'রে সাধন ক'রে যাও।"

গুরুদেবের বাক্যে আমি চমকে উঠলাম, "তোমার প্রতি মায়ের অসীম স্নেহ।"—মা, মা ব'লে কাঁদতে লাগলাম। আমার এত ভাগ্য! ধন্য, সত্যই ধন্য হ'ল আজ আমার

জীবন। গুরুদেব তো ঠিকই বলেছেন, "মা তোমাকে ভোলেন নি; মাঝে মাঝে কি তাঁর কৃপা-দর্শন ও কৃপা-নির্দেশ পাওনা।" পাই, সত্যিই পাই। তা'হ'লে সত্যিই তিনি শ্রীরাধারাণী, এবং আমার মা, হ্যাঁ, আমার আপন মা—এবং পরমাশ্চর্য্যের কথা যে গুরুদেব এসবই জানেন!

যে কয়দিন মায়ের আবির্ভাব-স্বরূপে তাঁর দর্শন ও বাণী লাভ ক'রে জীবন ধন্য হয়েছে তার কথা বলছি।

১লা অগ্রহায়ণ—ষড়রিপু প্রবলভাবে বিপরীত দিকে টানছে, গুরুদেবের কৃপা-আকর্ষণে রক্ষা পাচ্ছি। কেঁদে কেঁদে মায়ের চরণে জানাচ্ছি—মাগো, মনের এ দুর্বাসনা কেমন ক'রে দূর হবে, মা? তোমার সন্তান হ'য়ে আমি কেন এ দুঃখ ভোগ করব, মা? কবে তোমার কোলের ছেলে হ'য়ে তোমার আদর সোহাগে প্রাণ জুড়াব, মা? কতদিনে তোমার ঐ সুশীতল চরণকমল সেবার যোগ্য হব, মা? আকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকছি। সেই রাত্রে মা দর্শন দিয়ে বললেন, "গুরুবাক্যমত সাধন ক'রে যাও। সাধন করতে করতেই মনের দুর্বাসনা দূর হয়।" মায়ের শ্রীচরণে প্রণাম করতে গিয়ে চরণে অপূর্ব সৌরভ পেলাম। তারপর মা আমার স্নেহভরে আমায় কত সোহাগের কথা বললেন, কোলে নিয়ে আমাকে আদর করলেন। সেই স্নেহসুধা-ধারায় আমার সমস্ত হৃদয় যেন সিক্ত ক'রে তুলল। মনে হ'ল অমৃত-মন্দাকিনীতে স্নান ক'রে আজ আমি অমর হ'য়ে উঠলাম। তখন রাত্রি ভোর হ'য়ে গেছে। জেগে উঠে নয়নজলে ভাসতে লাগলাম।

২৬শে ও ২৭শে পৌষ—আবার চিত্তে অধৈর্য্য ও অবিশ্বাস জাগ্রত হচ্ছে। সেদিন ভোর রাত্রে দেবী-দর্শন পেলাম; কাতর আর্ত্তি-ভরা ক্রন্দনে জানালাম, "মা, মা, তুমি এত নিষ্ঠুরা হ'লে!"

পর রাত্রে মা আবার দর্শন দিলেন। সারারাত্রি তাঁর দর্শন পাচ্ছি; আঠার মত যেন তিনি চিত্তে বদ্ধ হ'য়ে রয়েছেন। চোখ বুঁজে তন্দ্রা এলেই তাঁকে দেখছি, শুনছি তাঁর বাণী, পাচ্ছি তাঁর আদর স্নেহ। আর মা, মা ব'লে কেঁদে আকুল হচ্ছি। মনে হচ্ছে চারদিক আমার মাতৃময় হ'য়ে উঠল, যেদিকে তাকাই সেদিকেই আমার মায়ের স্নেহসুধা ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে।

৫ই মাঘ—মা দর্শন দিয়ে উপদেশ দিলেন, "জোর ক'রে কি দয়া পাওয়া যায়? সব হবে পরে, ধৈর্য্য ধরতে হবে। সরলমনে সাধন করে যাও।"

৯ই মাঘ—মা আবার দর্শন দিয়ে সান্ত্বনাবাণী শোনালেন, "বৎস, তোমার যা হচ্ছে, তার জন্য বিচলিত হয়োনা। এ সবই সাধনমার্গে গুরুর পরীক্ষা। তুমি স্থির ও ধীর

হ'য়ে সাধন ক'রে যাও। গুরুর কাজ কর। অভিমানে যে সব ভেসে যাচ্ছে, বাছা। গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রেখে গুরুবাক্য পালন করতে হবে। সহ্য ক'রে থাকতে হবে, নৈলে গুরুকৃপা কিসে হবে?" মায়ের কাছে ব'সে ও তাঁর অমৃতময় উপদেশবাণী শ্রবণ ক'রে পরম শান্তিলাভ করলাম। ২১শে ফাল্গুন—শ্রীগুরুদেব গোমো তপোবন যাত্রা করলেন।

এবার নবদ্বীপ থেকে গোমো তপোবনে যাত্রা করতে গুরুদেবের অনেক দেরী হ'য়ে গেল। ২রা ফাল্গুন মাঘীপূর্ণিমা গেছে, তারপর দু'সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছে, তবু তাঁর নবদ্বীপ আশ্রম ত্যাগ করা হচ্ছে না। এটা ওটা কারণ দেখিয়ে মেজদাদারাও বাধা দিতে লাগলেন এবং গুরুদেবও যেন ইচ্ছা ক'রেই দেরী করতে লাগলেন। বিলম্বটা যে তাঁর ইচ্ছাকৃত—এটা বোঝা যেত শেষের দিকে দীর্ঘ সময় ধ'রে গুহা বন্ধ ক'রে তাঁর নিজ কাজে ব্যাপৃত থাকায়। এত বেশী সময় গুহা বন্ধ ক'রে থাকতে তাঁকে সচরাচর দেখিনি এর আগে। তিনি কী কাজে নিযুক্ত থাকতেন তাঁর সিদ্ধ আসনে তা' তিনিই জানেন, তবে আমি যেন এতে বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করতাম। কারণ অবশ্য পরে বুঝেছি, তাঁর সিদ্ধ আসনে শেষবারের মত শক্তি-সঞ্চার ক'রে যাচ্ছেন তিনি।

গুরুদেব গোমো তপোবনে পৌঁছানোর দু'দিন পরেই টিটিলাগড় থেকে দুর্গাপদ বাবুরা এলেন। পূর্ব বৎসরের মত এবারও দোলপূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠান করলেন এখানে গুরুদেব এবং দোল-উৎসবে বেশ ভালই শিষ্যসমাগম হ'ল। এরপর গুরুদেব একদিন ছোট পাহাড়ে গেলেন সমাগত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে। ঐদিন দুর্গাপদবাবুরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এইদিন গুরুদেবের একটি মধুর আচরণ আমাদের বড়ই ভাল লেগেছিল। পাহাড়ের উচ্চস্থানে যখন গুরুদেব উঠেছেন, তখন গোমো ইয়ার্ডে একটি ট্রেন প্রবেশ করছে তীব্র হুইসিল দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে, ট্রেনের হুইসিলের সেই 'কু'-শব্দের একেবারে সঠিক হুবহু অনুকরণ ক'রে, ঠিক পাঁচবছরের বালকের মত, গুরুদেবও 'কু-উ-উ'-ক'রে শব্দ করলেন। ভেবে দেখুন, তিনি একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী গুরু, তার উপর তিনি তখন বহু গণ্য মান্য শিষ্য পরিবৃত হ'য়ে রয়েছেন, এর মধ্যে তাঁর সব রকম গাম্ভীর্য্য ও পরিবেশ বেমালুম বিস্মৃত হ'য়ে তিনি তাঁর 'বালক'-স্বরূপ প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারলেন না। তাঁর লীলায় এইরূপ শিশু-সুলভ-আচরণের অগণ্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বিদ্যমান; ভাগ্যবান্ ভক্তগণ তা' প্রত্যক্ষ ক'রে বিমল আনন্দে অভিভূত হয়েছেন। বাস্তবিক, শ্রীমদ্ভাগবতের "বুধো বালকবৎ"-সংজ্ঞার তিনি মূর্তিমান্ প্রকাশ।

গোমো তপোবনে আসার পর মা রাধারাণী একদিন আমায় সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, "আমি সাধারণ মা নই; আমার সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ নেই, দয়ার। অতএব আমার প্রতি সেই মনোভাবই রাখবে। এমন ভাব কখনো মনে স্থান দিওনা, যাতে আমার দয়া হারিয়ে ব'স। সাবধান।"

মায়ের এই সতর্কবাণী শুনে আমার সর্বশরীর শিহরিত, কণ্টকিত হ'য়ে উঠল। সত্যই তো তাই। তাঁর স্বরূপজ্ঞান বিস্মৃত হ'য়ে যাই কেন? ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অগোচর যিনি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ "যাঁর সদ্গুণগণের অন্ত পান না", সেই "গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী, অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী"র মহিমা এ নগণ্য কীট কী বুঝবে? মনে মনে বহুবার প্রণাম ক'রে কাতরে নিবেদন জানালাম, মাগো, এ জীবাধমের তোমার চরণ পাবার তো কোনই যোগ্যতা নেই। তবু যে মা এ সন্তান তোমারই শ্রীচরণাশ্রিত; ঐ শ্রীচরণ-ছাড়া যেন না হই, তাই দেখো, মা কৃপাময়ি। ৪ঠা চৈত্র শুক্রবার দুর্গাপদবাবুরা বিদায় নিলেন। ৭ই চৈত্র সোমবার গুরুদেব কালীবক্সীদাদার মোটরে মধুবন ভ্রমণোদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দয়া ক'রে এ অধমকে তাঁর সঙ্গে নিলেন। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে গাড়ী চলতে লাগল। দুধারে কী মনোরম দৃশ্য! সাথে স্বয়ং শ্রীগুরুদেব রয়েছেন, তাই যেন ঐ সৌন্দর্য্য আরও আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠছে। ইশ্রি (পরেশনাথ) ষ্টেশনে রেল লাইন পার হ'য়ে গাড়ী ছুটে চলল। তারপর একজায়গায় এসে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে ডানদিকে মধুবনের রাস্তায় মোড় ফিরল। মধুবনের রাস্তার দু' পাশে নিবিড় ঘন অরণ্য। সে দৃশ্য এতই নয়ন-বিমোহন যে ভাষায় প্রকাশ করা যায়না; কালিদাসের সেই "তমাল তালিবন-রাজিনীলা'র "তমালতালি"র জায়গায় "পলাশ-শালি" বসালে ঠিক মানায়। জঙ্গল এত নিবিড় ও পরিবেশ এত নির্জ্জন যেন মনে হয় মানুষের গড়া জগতের কৃত্রিমতার স্পর্শ এড়িয়ে প্রকৃতি দেবী এখানে তাঁর অকৃত্রিম ও অনাবৃত প্রকৃতরূপ দর্শন দিচ্ছেন; তার সঙ্গে গুরুদেবের সান্নিধ্যজাত অপ্রাকৃত আনন্দ-হিল্লোলে মনপ্রাণ তরঙ্গায়িত হচ্ছে। যা' অনুভব করলাম, ভাষায় প্রকাশ করতে তা' অক্ষম। এই নিভৃত জনহীন বন্য প্রকৃতির অনাবৃত পরিবেশ, আর নয়ন সম্মুখে স্বয়ং গুরুদেব—হৃদয়ের প্রতিস্পন্দনে যেন এই আনন্দ স্পন্দিত হচ্ছে, আর সমস্ত রক্তধারায় তার আনন্দ কলরোল, তার হর্ষশিহরণ জাগছে। এই আনন্দ দোলায় দুলতে দুলতে এক সময়ে দেখি মধুবনে এসে গেছি। কালীদাদা নেমে গুরুদেবকে নামালেন। তারপর মধুবনের মেলা-প্রান্তরে গুরুদেবকে নিয়ে সকলে মিলে আনন্দে বেড়াতে লাগলাম। সে যে কী আনন্দ তা কেমন ক'রে লিখে জানাব? বাইরে বেড়িয়ে এমন আনন্দ জীবনে কখনও পাইনি। সঙ্গে গুরুদেব—তাঁর সঙ্গে এই অচেনা অজানা মধুবনের মেলায় সব ঘুরে ঘুরে দেখছি, গুরুদেবকে দেখাচ্ছি। উৎসুক নেত্রে তিনি সব দেখছেন, নানা প্রশ্ন করছেন। কত পসারির দোকান—হরেক রকমের কত জিনিষ। কিছু কিছু জিনিষ কেনাও হ'ল, খাবারও কিছু নেওয়া হ'ল, যদিও আমাদের সঙ্গে হরিলুটের ঝুড়ি ছিল। গুরুদেবের সঙ্গে মেলায় বেড়াচ্ছি—একে কী আনন্দ, কী আনন্দ—তা' আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবনা। আজও সে

আনন্দ-ঘন-মুহূর্ত্তের স্মরণে মন প্রাণ এক অপ্রাকৃত আনন্দ শিহরণে শিহরিত হয়ে ওঠে। গুরুদেবের শ্রীচরণ লাভের পর কোথাও একা দেশভ্রমণ করিনি, ইচ্ছাও হয়নি। মনে হয়েছে, গুরুদেব সঙ্গে না থাকলে সে ভ্রমণ যন্ত্রণা-স্বরূপ; যেখানে তিনি নেই সেখানে, অন্ততঃ আমার মনে, কোনো আনন্দ নেই। জন্মে জন্মে যেন এমনি সৌভাগ্য লাভ করি; যেন ঘরে বাইরে, দেশে বিদেশে, সর্বত্র তাঁর সঙ্গছাড়া না হই, যেন যেখানে তিনি সেখানেই থাকতে পারি।

মেলা দেখা শেষ হ'লে এক জায়গায় ব'সে আমরা সবাই গুরুদেব-প্রদত্ত হরিলুট প্রসাদ খেয়ে নিলাম। তারপর মহানন্দে মধুবনের জৈন মন্দির দেখতে গেলাম। বিস্ময়-বিহ্বল নয়নে চেয়ে দেখলাম সে মন্দিরের অপূর্ব্ব শিল্প নৈপুণ্য, অপরূপ শোভা। গুরুদেবের পাশে পাশে দাঁড়িয়ে সে-মন্দিরের প্রস্তর মূর্ত্তিগুলি দেখছিলাম। মূর্ত্তিগুলি নিঃসন্দেহে অতুলনীয় ভাস্কর্যকুশলতার নিদর্শন, কিন্তু বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করলাম মূর্ত্তিগুলি কিন্তু সবই একজনের—জৈন গুরু গোরখনাথের। গুরুদেব সেই সব গুরু মূর্ত্তিগুলি লক্ষ্য ক'রে আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, "দেখেছ, সুরেনধন, এরা সর্ব্বত্রই ঐ এক গুরুমূর্ত্তিই স্থাপিত করেছে। যেদিকে চাও, সেদিকেই ঐ এক গুরুমূর্ত্তি। তুমিও এমনি করবে, সুরেনধন। গুরুর নাম প্রচার করবে, যেদিকে চাও সেদিকেই গুরুময় করবে, ভিতর বাহির গুরুময় ক'রে তুলবে। এরা ঠিকই করেছে, এরা আর কোনো দেব-দেবী মানে না, কোনো ঠাকুর মানে না, শুধু গুরুই এদের সারাৎসার। তুমিও এমনি করবে। গুরু ছাড়া আর কিছু নেই, বাবা। গুরু ধ্যান, গুরু জ্ঞান, গুরুই সারাৎসার—এইটি জীবনের মূলমন্ত্র ক'রে রাখবে।"

এই অমূল্য উপদেশগুলি আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'ল। প্রতিজ্ঞা ক'রে মনে মনে বললাম, "সেই শক্তি দেবেন, প্রভু। আমি তো আর কিছুই জানিনা আপনাকে ছাড়া।" মন্দির দর্শনান্তে আমরা ঐ একই পথে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে নিরাপদে আশ্রমে পৌছলাম।

এবার বিদায়ের পালা। গোমো তপোবন থেকে বৈদ্যবাটি আশ্রমে যাত্রা। তখন কি জানি শ্রীগুরুদেবের স্থূলশরীরে এ বিদায় চির-বিদায় গোমো তপোবন থেকে? কিন্তু তিনি সবই জানেন এবং তার জন্য সম্পূর্ণভাবে চারিদিকে প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন। একদিন কর্কটার স্থানীয় ভক্তগণকে ডেকে তাদের সাথে অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্ত্তা বললেন, এত বেশীক্ষণ ধ'রে ওদের সঙ্গে আলোচনা করতে গুরুদেবকে এর আগে কখনও দেখিনি। বিশেষতঃ ওদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও সবচেয়ে নিষ্ঠাবান্ ভক্ত মাতুকে আশ্রমটি দেখাশুনা করবার জন্য নানাভাবে বারবার অনুরোধ করলেন। এরূপ আলোচনায় আমি একটু বিস্ময়বোধ করেছিলাম, তবে অশুভের কোনো ইঙ্গিত মনে

আসেনি। ভেবেছিলাম—তিনি তপোবন থেকে যাবার পর আশ্রমটি ভালভাবে দেখাশুনা করার কোনো লোক পাওয়া যায়না সচরাচর, তাই বোধ হয় ওদের সে ভার দিচ্ছিলেন। এদিকে জীবনদাদার মুখে শুনেছি, গুরুদেব তাঁকেও নিভৃতে ডেকে এই আশ্রমের প্রধান দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে আশ্রমটি সর্ব্বভাবে রক্ষা করা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। এমনভাবে একান্তে ডেকে এ বিষয়ে এত কথা আর তো কখনও বলেননি গুরুদেব—তাই তিনিও এতে বেশ বিস্ময়বোধ করেছিলেন। সুরেন রায় দাদা তখন আশ্রমে থেকে আশ্রম দেখাশুনা করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি, আশ্রম থেকে রওনা হবার আগের দিন তিনি তাঁর রোপিত সমস্ত গাছগুলিকে আদর ক'রে চুম্বন করেছিলেন এবং গাছগুলির যথাযথ দেখাশুনা করার জন্য সুরেন রায় দাদাকে বার বার আদেশ করেছিলেন। স্থূলশরীরে চির-বিদায় নেবার পূর্ব্বে মঙ্গলময় প্রভু আশ্রমের তরুলতাগুলিতেও তাঁর কল্যাণস্পর্শের চিহ্ন রেখে গেলেন।

১০ই চৈত্র বৃহস্পতিবার গভীর মধ্যরাত্রিতে গুরুদেব আমাদের নিয়ে যাত্রা করলেন গোমো তপোবন থেকে। ডেরাডুন এক্সপ্রেসে উঠলাম আমরা। পরদিন প্রভাতে পৌছালেন গুরুদেব বৈদ্যবাটি আশ্রমে। এখানে অবস্থানকালে শিষ্য ও দর্শনার্থীর অসম্ভব ভীড় হ'ল। গুরুদেবের কষ্ট দেখে তাঁকে যথাসম্ভব শীঘ্র স্থানান্তরিত করাই শ্রেয়, মনে হ'ল। অবশ্য গুরুদেব পূর্ব্বে থেকেই পুরী যাত্রার সঙ্কল্প ঠিক ক'রেই রেখেছিলেন। গোমো থাকতেই সে সব ব্যবস্থা হয়েছিল। গুরুদেব তাঁর সঙ্গে পুরীতে আমাকে নিয়ে যাবেন কিনা, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিতভাবে কিছুই জানতাম না। একদিন গোমো তপোবনে গুরুদেবের ঘরের সামনের পশ্চিম বারান্দায় ব'সে গুরুদেবকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছি, "বাবা, দয়া ক'রে পুরীতে আমাকে সঙ্গে নেবেন কি?"

গুরুদেব তার উত্তরে বললেন, "তা নইলে প্রত্যেক ষ্টেশনে ষ্টেশনে—এই খড়্গপুর এল, এই কটক, এই ভুবনেশ্বর—এ সব বলবে কে?" গুরুদেবের এই সুন্দর উক্তিতে কত আদর, সোহাগ ও স্নেহ মেশানো আছে, তা ব্যাখ্যা ক'রে বলার প্রয়োজন আছে কি? আমার সমস্ত মন তখন আনন্দ-শিহরণে শিহরিত হ'য়ে উঠল। তাঁর সঙ্গ ছাড়া হব না তাঁর এই ভ্রমণে—এই নিশ্চয়তা পেয়ে পরম শান্তি ও স্বস্তিলাভ করলাম। এ অধম শ্রীচরণাশ্রিতের উপর তাঁর কত কৃপা, তা স্মরণ ক'রে নয়ন অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠল।

যাই হোক, বৈদ্যবাটিতে শিষ্য-ভীড় হ'লেও গুরুদেব নিজে ইচ্ছা ক'রেই তাড়াতাড়ি আসন তুলবার সঙ্কল্প করলেন। এতে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারল না, কারণ এ সবই তাঁর পূর্ব্ব-পরিকল্পিত। যাত্রা করার পূর্বদিন তিনি ভক্ত-সাধারণকে দর্শন দেবার জন্যই বোধহয় বাইরের প্রাঙ্গণে এসে কিছুক্ষণ বসলেন।

১৮ই চৈত্র শুক্রবার ১লা এপ্রিল গুরুদেব বৈদ্যবাটি থেকে শেষ যাত্রা করলেন হাওড়া ষ্টেশনে। বৈদ্যবাটিতে সমাগত প্রায় সব ভক্তই হাওড়া ষ্টেশনে এলেন গুরুদেবের সঙ্গে। ষ্টেশনে পৌঁছে গুরুদেব শিষ্যদের নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকলেন। মদনদাদা, ভূপেনদাদা ও মাষ্টারদাদা টিকিট কাটতে ও মালপাত্র গুছিয়ে নিতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। পুরী এক্সপ্রেসের টিকিট ৭।/০ ক'রে—পাঁচখানা কাটা হল। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করতেই গুরুদেবকে নিয়ে ভক্তগণ এগিয়ে এলেন। গুরুদেবের সঙ্গে মালপত্র ছিল প্রচুর; তাছাড়া বৈদ্যবাটির ভক্তবৃন্দ কয়েক বস্তা নৈনিতাল আলু তখনই গুরুদেবকে দিয়েছিলেন। সুতরাং মোট মালপত্র পাঁচখানি টিকিটের প্রাপ্য মালের চেয়ে বেশী হ'য়ে গিয়েছিল। প্ল্যাটফর্মে কর্ত্তব্যরত টিকিট কালেক্টর মাল দেখে আপত্তি করল এবং মাল নামিয়ে ওজন করতে বললে। আমাদের ভক্তগণ বুঝিয়ে বললেন যে, ভক্তগণ তাঁকে এই সব জিনিষ দিয়েছেন তাঁর খেলা করা অর্থাৎ পরকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য, আর তাও এখনি ষ্টেশনেই এই সব মাল তাঁরা এনে দিলেন— এখন এ সব মাল নামিয়ে ওজন করার আর সময় নেই। কিন্তু চেকার নাছোড়বান্দা। তখন গুরুদেব, সম্ভবতঃ তাকে শিক্ষা দিবার জন্যই, আলুর বস্তাগুলি প্ল্যাটফর্মেই খোলালেন এবং সমাগত ভক্তগণকে সমস্ত আলু বন্টন ক'রে দিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কর্মচারিটি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল! এরপর ভক্তগণ গুরুদেবকে একটি ছোট কামরায় উঠিয়ে আসন পেতে বসালেন। কামরাটি ছোট এবং সমাগত ভক্তগণ সবাই উঠে তাতে ব'সে পড়লেন, অনেকে দাঁড়িয়েও রইলেন। কামরায় আর তিল ধারণের জায়গা থাকলনা। নানাপুষ্পমাল্যে সজ্জিত গুরুদেবের সামনে কেউ করযোড়ে দাঁড়িয়ে, কেউ ব'সে গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। কামরায় অসম্ভব ভীড় দেখে, বিশেষতঃ তার মধ্যে একজন সাধু মহাপুরুষকে দেখে, যাত্রীরা কেউ আর সে-কামরায় প্রবেশ করলনা। অধিকন্তু প্ল্যাটফর্মস্থিত বাইরের বহুলোকও ঐ কামরার সামনে ভীড় ক'রে গুরুদেবকে দর্শন করতে লাগল। কোনো যাত্রী ঐ কামরার সমুখে এলে তারাই 'হাঁ-হাঁ' ক'রে নিষেধ ক'রে বলতে লাগল—'এ একজন সাধুমহাপুরুষের রিজার্ভ গাড়ী।' বলা বাহুল্য, সকলেই কপালে হাত ঠেকিয়ে অন্য কামরার দিকে অগ্রসর হল। এমন বিপুল অভ্যর্থনা হাওড়াস্টেশনে আর কখনও দেখিনি। শিষ্যগণ একে একে প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। গুরুদেব তাঁদের অনেককেই পুরী যেতে অনুরোধ করলেন। অবশেষে ট্রেন ছাড়ার সময় হ'ল; সবুজ আলো দেখিয়ে গার্ড হুইসিল দিল; শিষ্যগণ একে একে নেমে গেলেন;—গুরুদেবের সমবেত জয়ধ্বনির মধ্যে হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা করলাম আমরা।

ছোট্ট কামরাটি কার্য্যতঃ আমাদের রিজার্ভ্‌ড্‌ কামরাই হ'ল কামরাটিতে চারটি

বসবার বেঞ্চি—জানালার দুধারে দু'টি, মধ্যে যুক্তভাবে দু'টি। মধ্যের বেঞ্চির একধারে গুরুদেবের আসন ক'রে দেওয়া হ'ল বেশ ভালভাবেই। গুরুদেবের দিকের জানলার ধারে বসলাম আমি ও খড়্গপুরের দুর্গানাথবাবু, ওপাশের জানলার ধারে বসলেন মায়েরা। গুরুদেব কিছুক্ষণ ব'সে রইলেন। তারপর আমরা তাঁকে শয়ন করতে অনুরোধ করলাম। বহু অনুরোধ করার পর গুরুদেব একটু হেলান দিয়ে অর্দ্ধশায়িতভাবে থাকলেন। আমার চোখে ঘুম তো এলই না, বরং একটি অপূর্ব অননুভূত আনন্দসুধায় সমস্ত হৃদয় যেন ভ'রে ভ'রে উঠতে লাগল। বিপুলবেগে এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে তিমির রজনী ভেদ ক'রে, আর সমুখে শ্রীগুরুরূপী স্বয়ং ভগবান্ গোলোকপতি যেন নিয়ে চ'লেছেন আমাকে, এই অনন্যশরণাগত, এই শ্রীচরণাশ্রিত তাঁর এই ক্ষুদ্র সন্তানকে, যেন কোন্ সুদূর, মধুর, সুন্দরলোকের উদ্দেশ্যে। এই নিভৃত, নির্জন, নীরব নিশীথ পরিবেশে স্বয়ং শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে এই সুদূর যাত্রার, এই একান্ত সান্নিধ্যে থেকে এই নির্জন ভ্রমণের এ যে কী আনন্দ, এ যে কী শান্তি, এ যে কী তৃপ্তি—তা' ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অক্ষম। মনে হ'ল জীবন আমার এতদিনে ধন্য হ'ল, আমার সকল সাধনা সার্থক হ'ল। বার বার প্রার্থনা জানালাম, এ সুখস্মৃতি যেন অক্ষয় হ'য়ে থাকে আমার সারা জনম ভ'রে, আমার মরণকালে, আমার জন্মে জন্মে এমনিভাবে প্রতি জন্মে যেন তাঁর শ্রীচরণসান্নিধ্যে থেকে তাঁর শ্রীপদসেবার অধিকারী হই।

আমি সারাক্ষণই জেগে, বেশ ভালভাবেই জেগে আছি। Timetable খুলছি আর বলছি এই অমুক ষ্টেশন pass করলাম, এই অমুক ষ্টেশন আসছে ইত্যাদি। এই আনন্দসুধা ধারায় ভাসতে ভাসতে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল তা বুঝতেই পারলাম না। ট্রেনের গতিবেগ কমে এল ; হ্যাঁ, এবার আমাদের ট্রেন খড়্গপুর ষ্টেশনে in করছে। আমি লাফিয়ে উঠলাম—খড়্গপুর ষ্টেশনে কিছু ভক্তদের আসার কথা আছে। গাড়ী থামতেই আমি প্ল্যাটফর্মের চারদিকে তাকাতে লাগলাম, দুর্গানাথ বাবুও দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণপরেই ভক্তগণকে দেখতে পেলাম। আমি সোল্লাসে প্রায় চীৎকার ক'রে বললাম, "এই যে গুরুদেব—এই গাড়ীতে ; শীঘ্র আসুন।" ওঁরা ছুটে এলেন, একে একে গুরুদেবের গাড়ীতে উঠলেন। এলেন পুরানো ভক্ত ও শিষ্য লেফ্‌টেন্যাণ্ট এন্. জি. সিংহ, এলেন খড়্গপুরের সমস্ত শিষ্য, তাঁদের আত্মীয়পরিজন, এলেন আরো বহু ভক্ত। ছোট কামরায় এক সঙ্গে অত লোকের জায়গা হ'লনা—শিষ্যগণ একে একে আসছেন আর প্রণাম করছেন। হরিলুটের ঝুড়ি নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি গুরুদেবের পাশে। দুর্গানাথবাবু খড়্গপুরের শিষ্য ও ভক্তদের একে একে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরা হরিলুট নিয়ে একে একে নেমে যাচ্ছেন। অনেক

ভক্ত গাড়ীর মধ্যে উঠতে না পেরে বাইরে থেকেই গুরুদেবকে দর্শন করছেন। সে কী প্রচণ্ড ভীড়, সে কী বিপুল অভ্যর্থনা। প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। কোথা দিয়ে যে সময় চ'লে গেল, বুঝতেই পারলাম না। গার্ড ট্রেনছাড়ার বাঁশী বাজাল ; ভক্তগণ নেমে গেলেন। প্ল্যাটফর্মে সমবেত ভক্তগণ গুরুদেবের জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। তারি মধ্যে আমাদের এক্সপ্রেস তার গন্তব্যপথে আবার যাত্রা করল।

রাত্রি গভীর হ'তে লাগল, কিন্তু আমার চোখে নিদ্রা এলনা। গুরুদেবের দিকে চোখ রেখে ব'সে আছি। তিনিও নিদ্রা যান নি। আমার পক্ষে ঘুম আসা অসম্ভব, কারণ ট্রেন ভ্রমণে এমন আনন্দময় মনের অবস্থা আর কখনো হয়নি। ইতিপূর্বেও গুরুদেবের সঙ্গে ট্রেন ভ্রমণ করেছি বটে, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রেই গাড়ীতে বহিরঙ্গ অভক্ত জনগণের ভীড় থাকায় এমন অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়নি। আনন্দময় গুরুদেবের এত সান্নিধ্যে, গভীর নিশীথের এমন নিভৃত পরিবেশে, এতদীর্ঘ সময়ের অবস্থানের মত এমন দুর্লভ সৌভাগ্য এ জীবনে এই প্রথম ও শেষ। তাই অন্তর আজ আমার অমৃতময় ; এই অমৃতসাগরের স্রোতে অমৃতের সঙ্গী হ'য়ে যেন অমৃতলোকে যাত্রা করছি। সে অমৃত উথলে উথলে উঠছে—অন্তর থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে, চারিদিক অমৃতময় হয়ে উঠছে। এ আনন্দসুধা-স্রোতে মগ্ন হ'য়ে কার চোখে ঘুম আসতে পারে ?

এক একটি স্টেশন আসছে, অমনি গুরুদেব ব'লে উঠছেন, "এ কোন্ স্টেশন এল, সুরেনধন ?" আমি বলছি তার নাম। আশ্চর্য্য এই যে, যে যে ষ্টেশনে ট্রেন থামল, তার কোনোটিতেই কোনো যাত্রী আমাদের গাড়ীতে উঠতে চেষ্টা করল না। এমনি ক'রে বালেশ্বর, কটক, ভুবনেশ্বর পার হ'য়ে এলাম। রাত্রি শেষ হ'য়ে এল। খুর্দ্দারোডে যখন গাড়ী পৌছাল, তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। গুরুদেবকে জানালাম এখান থেকে সোজা লাইন মাদ্রাজের দিকে চ'লে গেছে ; আমাদের গাড়ী বাঁ দিকে মোড় ঘুরে পুরীর দিকে যাবে। প্ল্যাটফর্মে লোকজন যাতায়াত করছে, তাদের কল-কোলাহল শোনা যাচ্ছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোক যেন সুধার প্রলেপ বুলিয়ে দিল চোখে। গুরুদেবের সঙ্গে সেই প্রভাত-শোভা দেখতে লাগলাম। যথাসময়ে খুর্দ্দারোড ষ্টেশন ছেড়ে ট্রেন পুরী অভিমুখে যাত্রা করল। তখন বেশ বেলা হ'য়ে গেছে। প্রভাত সূর্য্য-কিরণে স্নাত হ'য়ে দুদিকের বন-সৌন্দর্য্য ঝলমল করছে। সেই সূর্য্যস্নাত অরণ্যশোভা দেখতে দেখতে আমরা চলেছি শ্রীক্ষেত্র শ্রীপুরী ধামে। গুরুদেব ও খোলা জানালা দিয়ে বাইরের বনরাজির দিকে চেয়ে আছেন। আমার অন্তরে আনন্দসাগরের তরঙ্গ উঠছে। তারি দোলায় দুলতে দুলতে আমি চলেছি। গুরুদেব সঙ্গে আছেন, তাই এত আনন্দ ; তিনি না থাকলে আমার পক্ষে সবই ফাঁকা, সবই অর্থহীন হ'ত। আনন্দময় মুহূর্ত্তগুলি কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। ঠিক নিখুঁত

সময়ে পুরী এক্সপ্রেস পুরী ষ্টেশনে in করল। ১১শে চৈত্র শনিবার সকাল ৮টার কিছু আগেই গুরুদেবের সঙ্গে আমরা পুরীধাম পৌঁছলাম।

ট্রেনে অবশ্য আমার একটু চিন্তা হয়েছিল, অজানা অচেনা নতুন জায়গায় যাচ্ছি গুরুদেবকে নিয়ে, পাছে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় এই ভয়। সাহায্যকারী একমাত্র দুর্গানাথবাবু, তিনিও বিশেষ ভরসা দেন নি। যাই হোক, একটু চিন্তিত হ'য়েই গুরুদেবকে গাড়ী থেকে নামালাম। মালপত্র সব নামিয়ে গোছগাছ ক'রে নিচ্ছি, এমন সময়ে প্ল্যাটফর্মে অদূরে ঐ কারা আসছে? খোল করতাল বাদ্য সহ হরিনাম করতে করতে পুষ্পমাল্যাদি নিয়ে কতকগুলি বৈষ্ণব আসছে না? তাইতো। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়ার দল কেন? একটু বিস্মিত হলাম বৈকি। ওমা, ওরা যে কীর্ত্তন করতে করতে সহাস্যমুখে গুরুদেবের কাছেই আসছে। হ্যাঁ, একেবারে গুরুদেবের সামনে এসে ওরা থামল। আমার অন্তরে কে যেন আনন্দের একটা প্রবল ধাক্কা দিল। বুকটা আমার উল্লাসে যেন কয়েক ইঞ্চি বেড়ে উঠল। বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে দেখি, ওরা সুন্দর পুষ্পমাল্যগুলি গুরুদেবকে পরিয়ে দিল। তারপর একে একে সেই প্ল্যাটফর্মেই শত শত লোকের সমুখেই, ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হ'য়ে গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। তারপর খোল করতাল সহ মহানন্দে কীর্ত্তন করতে করতে গুরুদেবকে নিয়ে চলল। গুরুদেব ও দুর্গানাথবাবু ওদের সঙ্গে বাইরে চলে গেলেন। আমার দিকে অবশ্য কেউই চেয়ে দেখলনা—কিন্তু তাতে আমার মন একটুও দমলনা। আনন্দে আমার বুক ভ'রে উঠেছে তখন। মনে মনে ভাবছি, কী অলৌকিক তাঁর মহিমা। এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানেও কেমন ক'রে তিনি তাঁর ভক্তগণকে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করালেন? হরিনাম কীর্ত্তনের মধ্যে তিনি শ্রীক্ষেত্রে অবতরণ করলেন এবং হরিকীর্ত্তনের সাথেই তাঁর শ্রীক্ষেত্র-যাত্রা সুরু হল।

আমাকে একা ফেলে রেখে গেলেও আমার মন তখন আনন্দে এতই ভরপুর যে আমি একরূপ আনন্দাচ্ছন্ন অবস্থাতেই সব মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চ'লে এলাম। দু'খানা গাড়ীতে সব মালপত্র বোঝাই করলাম। তারপর আনন্দমনে সমুদ্রতীরে গুরুদেবের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসাস্থল 'যুগল—কুটিরে' এসে পৌঁছলাম। মালপত্রগুলি নামিয়ে গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে আমি ছুটে এলাম ভিতরে—গুরুদেব তখন বিশ্রাম করছেন।

পুরীর সমুদ্রতীরে এই সাময়িক বাসাস্থলটি গুরুদেবের খুবই পছন্দ হ'ল। সমুদ্র সৈকতে যে 'Strand road' বা সৈকতপথ গিয়েছে, তারই উপর এই বাড়ীটি। এক দেড় বিঘা বিস্তীর্ণ জমির উপর বাংলোপ্যাটার্ণের এই বাড়ী। মধ্যস্থলে বেশ বড় একটি হলঘর, তার দুই পাশে দু'টি লম্বা ঘর। হলের পিছনে বারান্দা, সমুখে রোয়াক।

বাংলোর পূর্বে বিশেষ জায়গা নেই, কিন্তু পশ্চিম দিকে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ প'ড়ে আছে, সমুদ্র-সৈকতের উড়ন্ত বালিতে তা' ভরা। উত্তর দিকেও অনেক জায়গা—সেখানে ছোট ছোট কতকগুলি ঘর, কূয়া, পায়খানা, ইত্যাদি। হলের পশ্চিম দিকের লম্বা ঘরে গুরুদেবের আসন ক'রে দেওয়া হ'ল। পূবের লম্বা ঘরটি হ'ল আমার ও দুর্গানাথবাবুর। বাসিনী দিদিমায়েরা উত্তরের ছোট ঘরগুলি নিলেন, কোনোটিতে করলেন ভাঁড়ার ঘর, কোনোটি হ'ল তাঁদের রান্নাঘর ইত্যাদি।

লোকমাত্র আমরা কয়জন, কিন্তু ঘর অনেক, উন্মুক্ত প্রান্তর সুবিস্তৃত। ও দিকে সমুখে দক্ষিণ দিকে পুরীর সমুদ্র তার অগাধ জল রাশিতে উন্মত্ত তরঙ্গ তুলে, তার বিশাল বক্ষ বিস্তার করে দিবানিশি আন্দোলিত হচ্ছে। যেমন তার অপরূপ দৃশ্য, তেমনি তার তরঙ্গাঘাতের অবিরাম গুরুগর্জন। একেবারে সামনে, কোনো বাধা বা আড়াল নেই। সুতরাং সমস্ত সমুদ্র যেন আমাদের একেবারে চোখের উপরই তার সমস্ত শোভা, সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত বিস্ময় মেলে ধরল। সন্ধ্যায় এত হাওয়া দিত যে তাতে এই চৈত্রের উত্তাপ বিন্দুমাত্র আমরা উপলব্ধি করতে পারতামনা, এমন কি রাত্রে আমার ঘরের দক্ষিণের জানালাগুলি বন্ধ করতে হ'ত, কারণ অবিরাম হাওয়াতে শীত ধ'রে যেত। গুরুদেব ঘুরে ঘুরে সমুদ্রশোভা দেখে পরম আনন্দ পেতে লাগলেন।

নতুন জায়গায় এসে নতুন ক'রে আশ্রম পাততে হ'ল। উনুন, ঘুঁটে, কয়লা, কাঠ থেকে আরম্ভ ক'রে শিল, নোড়া, মগ, বালতী, হাঁড়ি, গেলাস, হারিকেন, ল্যাম্প, মাদুর ইত্যাদি সবই কিনতে হ'ল। এ বিষয়ে দুর্গানাথবাবু আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন, তাঁর পাণ্ডা ভীমসেনও যথাসাধ্য এগিয়ে এসেছিল। এই পাণ্ডাটি গুরুদেবকে দর্শন ক'রে একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল। পুরীর কোনো পাণ্ডা অন্য লোককে, সাষ্টাঙ্গ তো দূরের কথা, এমনি প্রণামও করে না। এটাই তাদের রীতি। কিন্তু এই ভীমসেন পাণ্ডা গুরুদেবকে ধূলিতে লুন্ঠিত হ'য়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম তো করতই, তাঁর সমুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হ'য়ে তাঁর আদেশের অপেক্ষায় রইত। পুরীর পাণ্ডা মহলে এ একটা রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। গুরুদেব পুরীধামে অবস্থানকালে এমন অলৌকিক লীলা বিস্তার করেছিলেন, যা তিনি অন্যত্র কোথাও দেখাননি। এখানে তিনি একেবারে অপরিচিত, কেউ তাঁকে দেখেনি, তাঁর নামও কেউ শোনেনি। পুরীর পাণ্ডারা বেশ অহঙ্কারী এবং যাত্রীদের তারা নিজের যজমানের মতই মনে করে। আর পুরীর অধিবাসী এবং যাত্রীরা একমাত্র জগন্নাথকেই সম্মান করে। অন্য কোনো সাধু মহান্ত, এমনকি স্বয়ং মহাপ্রভুও, এখানে তেমন পাত্তা পাননা। এমনস্থানে একজন অজানা, অচেনা, চটগায়ে সাধু—যাঁর কোনো প্রচার নেই, বিজ্ঞাপন নেই, নামকরা শিষ্য নেই,—তিনি যে অবহেলিতের মতই র'য়ে যাবেন, এইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি

এখানে তাঁর ইচ্ছামত যে মহিমা প্রকাশ করলেন, চারপাশের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ইতর-ভদ্র, বাঙালী-উড়িয়া, এমন কি মাদ্রাজী জেলেগুলিও যেভাবে তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হ'ল এবং তাঁর দর্শনে ভক্তি গদ্‌গদ চিত্ত হ'য়ে একেবারে উন্মত্ত হ'য়ে উঠল, তা' কখনও কোনো দিন অন্যত্র কোথাও দেখা যায় নি। যতটুকু স্মরণ আছে এবং ডায়েরীতে যেটুকু লিপিবদ্ধ আছে তাই অবলম্বনে পুরীধামের এই অলৌকিক লীলার কিছু কিছু বর্ণনা করতে চেষ্টা করব।

যারা সমুদ্র কখনো দেখেনি, অথবা ক্বচিৎ কখনো দেখেছে, তাদের পক্ষে সমুদ্রশোভা যে কী অপরূপ, তা' সমুদ্রদর্শনকারী সকলেই জানেন। আমাদের সকলেরই প্রায় এইরূপ অবস্থা। গুরুদেব ইতিপূর্বে মাত্র একবার পুরী এসেছিলেন—তাও প্রায় সতেরো বৎসর আগে। আমিও বাল্যকালে একবার পুরী এসেছিলাম। তাই সমুদ্রশোভা দর্শন ক'রে, বিশেষতঃ সমুদ্রের সৈকতে একেবারে তার অতি সান্নিধ্যে অবস্থান ক'রে আমরা পুরাপুরিভাবেই তার সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে লাগলাম। দিবানিশি সেই শোভা দর্শন ক'রে এবং তার বিরামহীন গুরু গর্জন শ্রবণ ক'রে গুরুদেব যেন ঠিক ছোট ছেলের মতই আনন্দে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। আর আমার যে কী আনন্দ তা' ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। সমুদ্রশোভা উপভোগ ক'রে যত না আনন্দ, গুরুদেবের আনন্দে তার শতগুণ আনন্দ হ'তে লাগল আমার। গুরুদেবকে সামনের খোলা বারান্দায় আসন ক'রে দিতাম, গুরুদেব অপলক দৃষ্টিতে সমুদ্রশোভা দেখতেন আর বলতেন, "বাবা, কী শোভা দেখেছ?" কোনো কোনো দিন বিকালে গুরুদেব সমুখের বেলাভূমিতে পদ-চারণা করতেন, আর আমি আনন্দেউৎফুল্ল হ'য়ে বালুকাবেলায় ঝিনুক কুড়াতে ব্যস্ত হতাম। গুরুদেব সঙ্গে বেড়াচ্ছেন এবং আমি তাঁর সাথে সাথে ঝিনুক কুড়াচ্ছি, কখনো ধাবমান কাঁকড়াদের সাথে খেলা করছি—সে কী আনন্দ! কী অপূর্ব আনন্দ! ঝিনুক কুড়িয়ে এনে গুরুদেবকে দেখাচ্ছি,—কত রঙ বেরঙের, কত বিচিত্র রকমের ঝিনুক সব। এইভাবে নিত্য খেলা হ'ত আমার। বলা বাহুল্য আমি প্রায় রোজই সমুদ্রস্নানও করতাম; গুরুদেব অবশ্য সিন্ধুস্নান করেন নি। আমি প্রত্যহ রাস্তার মিউনিসিপ্যাল জলের কল থেকে জল এনে দিতাম গুরুদেবের স্নান ও সেবাদির জন্য। তা ছাড়া বাসায় ভাল ইদারাও ছিল। ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত আমাকে খুবই কর্মব্যস্ত থাকতে হ'ত। কারণ গুরুদেবের সব কাজের ভার মুখ্যতঃ আমার উপরই ন্যস্ত ছিল; বাইরের এবং স্থানীয় পাণ্ডা, মন্দির ইত্যাদির কিছু কাজ দুর্গানাথবাবু করতেন।

প্রথম প্রথম আমরা মাত্র এই ক'জন লোক। অন্য শিষ্যবর্গ কেউ আসেনি তখন। স্থানীয় পাণ্ডা ভীমসেন ছাড়া আর কোনো লোকের সাথে পরিচয় ছিলনা আমাদের।

প্রথম দিন প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতেই ব্যস্ত থাকলাম; আশ্রম পাততে যা'কিছু দরকার সবই কিনতে হল। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২০শে চৈত্র রবিবার গুরুদেবকে নিয়ে মন্দিরে জগন্নাথদর্শনে গেলাম রিক্সা ভাড়া ক'রে। আমি ইতিপূর্বে পুরী এলেও জগন্নাথ দর্শন করিনি। এ একটা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। বোধহয় অন্তরে আমার এই বীজ সুপ্ত ছিল—'তোমার সাক্ষাৎ জগন্নাথের সাথেই জগন্নাথ দর্শন করবে—' তাই তখন কিছুতেই জগন্নাথদর্শনে আমার মন হয়নি। আজ আমার প্রত্যক্ষ জগন্নাথ আমার সঙ্গে রয়েছেন; তাঁকে নিয়ে তাঁর পুত্ররূপে তাঁর অনুগমন ক'রে তাঁরই আর এক মূর্ত্তি দারুময় জগন্নাথকে দর্শন করলাম। আমার জীবনের এ সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা; এবং এ একমাত্র আমার পক্ষেই প্রযোজ্য। কারণ গুরুদেব আমাকে বহুবার স্পষ্ট ক'রে বলেছেন, "বাবা, তোমার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ তোমার এই পাগল ছেলে,—তোমার আর কোনো ঠাকুর, আর কোন দেবদেবী নেই।" তাই আমি পুরী এসেও ইতিপূর্বে জগন্নাথ দর্শন করিনি, দিল্লী-আগ্রা গিয়েও বৃন্দাবনে গোবিন্দ-দর্শনে যাইনি, নবদ্বীপের ছেলে হয়েও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কে তা' জানিনি বা জানবার কোনো আগ্রহও প্রকাশ করিনি। জন্মজন্মান্তর থেকে আমার অন্তরাত্মা যাঁর শ্রীচরণে অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা আছে, সেই পাতাল-প্রভু বিনা আর কাউকেও আমার অন্তর সাড়া দিতে পারে নি। প্রবাদ শুনেছি, শ্রীরাধারাণী অন্ধ হ'য়ে জন্মেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্পর্শেই তাঁর চক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল—প্রথম দর্শন পেয়েছিলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই। তাই জন্ম জন্ম ধ'রে যিনি আমার প্রাণের ঠাকুর,—তাঁকে পেয়েই আমি আমার আরাধ্যদেবকে লাভ করলাম—তার আগে পাইনি, পেতে পারিনা। আমার জীবনে কখনও কোনো দেবদেবীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিনি, কিন্তু গুরুদেবের শ্রীচরণ লাভ করার পরই বুঝলাম—ইনিই আমার অন্তরের ঠাকুর; আমার সমগ্র হৃদয় জুড়ে তাঁরই আসন রচিত রয়েছে, আমার সমস্ত প্রাণমন প্রবলতম আকর্ষণে তাঁরই শ্রীচরণে বাঁধা আছে।

জগন্নাথদেবের সেই অন্ধকার গুহায় গেলাম আমরা, তারপর জগন্নাথদেবকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। গুরুদেব বললেন, "বাবা, কেউ জগন্নাথের জয় দেয়না—দেখেছ?" এই ব'লে তিনি নিজেই সুমধুর কণ্ঠে "জয় জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ" ব'লে জগন্নাথের জয়ধ্বনি দিলেন। গুরুদেবের সেই সুধাসম উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি শুনে সকলেই চমকে উঠল; পাণ্ডারা ছুটে এল দেখতে—কার কণ্ঠে এই সুধাস্বর ধ্বনিত হচ্ছে—জানবার জন্য। সকলেই সবিস্ময়ে গুরুদেবের দিকে চেয়ে রইল। পাণ্ডারা বলাবলি করতে লাগল—এমন অপূর্ব মধুকণ্ঠ তারা এর আগে কখনও শোনেনি। গুরুদেব কিন্তু দাঁড়ালেন না। পাছে লোকভীড় হয়, তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। আমাদের পাণ্ডাকে প্রসাদ আনতে বলা হ'ল। রিক্সা করে গুরুদেব সমুদ্রতীরে বাসায় ফিরে এলেন। সেদিন

রিক্সা ভাড়া লেগেছিল—৮/১০—দু'খানি রিক্সার যাতায়াতে। প্রসাদের মূল্য লাগল—২৮৶; হরিলুট কিনলাম—৬৶৫।

২১শে চৈত্র সোমবার। বাসায় পাক করাও হ'ত এবং কিছু প্রসাদও কেনা হ'ত। কারণ প্রসাদের মূল্য অত্যধিক। সুতরাং আমি দৈনিক বাজারে যেতাম পুরীর মন্দিরের নিকটে এবং গুরুসেবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আসতাম। তার উপর আমাদের সকলের জন্য চাল, ডাল, তরিতরকারী, কাঠ, কয়লা ইত্যাদি এবং গুরুদেবের খেলার জন্য প্রচুর হরিলুট ও রোজ কিনে আনতে হ'ত। আজ পাণ্ডা যে প্রসাদ এনে দিল তার মূল্য এক টাকা দিলাম। আর আমি বাজার থেকে যেসব জিনিষ আনলাম তার মধ্যে মোটা চাল, আতপ চাল, মুগডাল, অড়হর ডাল, কচি ডাল ও দই অন্যতম—এর দরুণ খরচ হল ৬৮/১৫। প্রত্যহই এইরূপভাবে বাজার করতে হয় আমাকে। মাঝে মাঝে গুরুদেবকে নিয়ে জগন্নাথ দর্শনেও যাওয়া হয়।

এর মধ্যে একদিন একটা আশ্চর্য্য স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। বাইরের রোয়াকের সিঁড়িতে বসে আছি। তখন সন্ধ্যার আবছায়া নেমে এসেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল আমার সামনে সদর গেটের আড়ালে বাইরে কতকগুলি লোক উঁকি ঝুঁকি মারছে। একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। কালো কালো লোকগুলি সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে আরো অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। তারা কিছু বলতে চায়, এই মনে ক'রে আমি তাদের ডাকলাম। তখন তারা গেটের বাইরে থেকে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে একজন আমার সামনে এগিয়ে এসে অতি বিনীতভাবে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, "একজন সাধু এসেছেন কি এখানে?" আমি উত্তর করলাম, "হ্যাঁ।" সে তখন বললে, "আমরা কিছু ফুল ও মালা তাঁকে উপহার দিতে চাই।" আমি সানন্দে তাদের বসতে ব'লে ভিতরে গিয়ে গুরুদেবকে তাদের কথা বললাম। গুরুদেবও সানন্দে ও সাগ্রহে বললেন, "বেশ, বাবা, বেশ। আমি যাচ্ছি।" কিছুক্ষণ পরে গুরুদেবকে সামনের হলঘরে নিয়ে এসে বসালাম। তারপর গুরুদেবের আদেশমত ওদের ডাকলাম। ওরা এল। বৃদ্ধ দলপতি আগে আগে দুই হাত যোড় ক'রে গুরুদেবের সামনে এসে দাঁড়াল। তার পিছনে একজনের হাতে একটি সুন্দর থালায় সুসজ্জিত ফুলের মালা ও স্তবক। তার পিছনে আরও অনেকে—সবাই হাত যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তো অবাক্! এরা কারা? আর কী ক'রেই বা গুরুদেবের কথা জানল? আর কেই বা তাদের আসতে বলল গুরুদেবের কাছে? এসব ভেবে আমি আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত। ওদের ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি সাগ্রহে বললাম, "এই হচ্ছেন সাধুবাবা, আমাদের গুরুদেব। তোমরা তাঁকে

প্রণাম কর।" তখন তারা একে একে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল গুরুদেবকে। গুরুদেব তাদের নিবেদিত পুষ্পমাল্য গ্রহণ করলেন এবং তাদের প্রচুর হরিলুট দিলেন।

পরের দিনও তারা এল; সংখ্যায় আজ আরো বেশী। তারপর দিনও এল, আরো কিছু বেশী সংখ্যক লোক, আরো বেশীক্ষণ বসল তারা। তারপর ধীরে ধীরে সবিনয়ে একটি প্রার্থনা জানাল আমাকে। বললে, তারা একটু হরিনাম শুনাতে চায় সাধুবাবাকে,—যদি অনুমতি করেন—। আমি তৎক্ষণাৎ গুরুদেবকে সে কথা জানালাম। গুরুদেবও শুনবামাত্র সানন্দে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পাওয়া মাত্র কয়েকজন লোক, অনুমতির অপেক্ষায় এরা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, মৃদঙ্গ করতাল নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল এবং তাদের মধ্যে বসে পড়ল। তখন ওদের মূল গায়েন গান আরম্ভ করল। গান,—বাংলা গান, কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম, পদাবলী! আমি তো সে গান শুনে বিস্ময়ে হতবাক্! এরা তেলেঙ্গী জেলে, মাতৃ ভাষা তেলেঙ্গী, উড়েভাষা কিছু জানে—কিন্তু শুদ্ধ বাংলায় বাংলা পদাবলী কীর্ত্তন গান! শুধু তাই নয়, সে সব গান তাদের বেশ ভাল ক'রে সাধা! তা'ছাড়া ওরা যেমন সুকণ্ঠ, তেমনি সুন্দর সুর। এমন ভক্তিমাখানো কীর্ত্তন গান বাঙালীর মুখেও কচিৎ শোনা যায়। মাছধরা যাদের জীবিকা, ধর্মশিক্ষাদীক্ষা যাদের কিছুই নেই, বাঙালীর সংস্পর্শে যারা কখনো আসেনি, সেই বস্তিবাসী, অশিক্ষিত, তেলেঙ্গী ধীবরগণের একজন অপরিচিত, অখ্যাত, অজ্ঞাত বাঙালী সাধুর প্রতি একী নির্মল ভক্তি, একী সুমধুর বাংলা কীর্ত্তন অর্ঘ্যে তাঁর পূজোপহার! আমি তো বিস্ময়ে, আনন্দে একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। একজন, দুজন নয়—সকলেই সমবেতভাবে সে-কীর্ত্তনে যোগ দিল। গুরুদেবও খুব-খুসী হ'য়ে তাদের প্রশংসা করতে লাগলেন। এতে তাদের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। পদের পর পদ, আরো বিভিন্ন পদাবলী তারা গাইতে লাগল। সেই সুরের জালে আচ্ছন্ন হ'য়েআমার মন ভেসে গেল সুদীর্ঘ সাড়ে চারশ বছর আগে—যখন স্বয়ং মহাপ্রভু এই পুরীধামে বিরাজ করছিলেন, আর উড়িয়া ভক্তগণ তাঁকে মধুর হরিকীর্ত্তন শোনাচ্ছিলেন। মনে হ'ল সেই দীর্ঘ চার শতাধিক বৎসরের যবনিকা হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে গেছে বুঝি, সেই মহাপ্রভু কি আজ আবার তাঁর শেষ লীলাস্থল পুরীধামে অবতীর্ণ হলেন, আর তাই তাঁর এ দেশস্থ কীর্ত্তনীয়া ভক্তগণ তাঁর উপস্থিতি অন্তরে অনুভব ক'রে যেন কোন্ অদৃশ্য প্রবল আকর্ষণে তাঁর কাছে উপনীত হয়ে তাঁকে আবার কৃষ্ণকীর্ত্তন শোনাচ্ছেন, মধুর মধুর হরিনামের সুরজালে দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন!

ওদের গান শেষ হ'লে আমি আমাদের গুরুনাম 'ভজ নরহরি প্রাণারাম' গান গেয়ে শোনালাম। ওরাও সাগ্রহে সে গান গাইতে লাগল আমার সাথে। তারপর

ওদের প্রাণভ'রে হরিলুট দিয়ে সেদিনের মত বিদায় দেওয়া হ'ল। এইরূপ রোজই হ'ত। বরং দিনে দিনে ওদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে লাগল। বারান্দায় আর তাদের জায়গা হ'ত না; রোয়াকে, রোয়াকের নীচে, এমন কি গেটের বাইরেও দাঁড়িয়ে তারা কীর্ত্তন করত। সে যে কী আনন্দ—তা' লিখে আমি বোঝাতে পারব না। মনে হ'ত, হরি সংকীর্ত্তনের সমস্ত অপ্রাকৃত আনন্দের ভাণ্ডার নিয়ে মহাপ্রভু আবার উদয় হয়েছেন তাঁর শেষ লীলাক্ষেত্র এই শ্রীক্ষেত্রে।

তাদের খুসী করবার জন্য গুরুদেবও অনেক কিছু করলেন। প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে হরিলুট বিতরণ তো আছেই। তার ওপর একদিন ওদের মধ্যে সেবা-মহোৎসব করবার আয়োজন করা হ'ল। ওদের বস্তী আমাদের বাসার ঠিক পিছন দিকে। স্থির হ'ল, চাল-ডাল তরি-তরকারী সব ওদের দেওয়া হবে—ওরা ওদের বস্তীতেই উৎসব করবে। সুতরাং একদিন ওদের সেবা উৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু জিনিষই ওদের দিয়ে দেওয়া হল। ওরা যখন সকলে মিলে ভোজনে ব,সেছিল, তখন আমরা ওদের মধ্যে গিয়ে ওদের উৎসাহ দিয়ে এলাম। ওরা সকলে মিলে গুরুদেবের জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

বিনা প্রচারে এবং কোনরূপ লৌকিক চেষ্টা ব্যতীত গুরুদেব কিরূপে তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত, ভিন্নগোষ্ঠীর সমষ্টি জনতাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ ক'রে তাদের ভক্তিবন্যায় প্লাবিত করেছিলেন, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই তেলেঙ্গী ধীবরগণ। পুরীতে গুরুদেব যতদিন অবস্থান করেছিলেন, তাঁর এই অলৌকিক শক্তির প্রভাব তিনি ততদিনই অতি প্রকটভাবে বিস্তার করেছিলেন। প্রথম দিকেই এইরূপ আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। গুরুদেব পুরীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে চিঠিপত্র যথারীতি আসতে লাগল। একদিন পোষ্টম্যান মনিঅর্ডার নিয়ে এসেছে। গুরুদেব তখন কাজে আছেন। আমি ওকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বা ঘুরে আসতে বললাম। তাতে পিওনটি ক্রুদ্ধকণ্ঠে নানারূপ কথা বলল এবং গুরুদেবের অপমান বা অবজ্ঞাজনক ভাষাও কিছু প্রয়োগ করল। আমি তাকে চলে যেতে বললাম। গুরুদেব একটু পরেই বাইরে এলেন। আমি পোষ্টম্যানের আচরণের কথা তাঁকে সব জানালাম। গুরুদেব বললেন, তোমার মনে কষ্ট হয়েছে, বাবা। সুতরাং এর জন্য আইনানুযায়ী যা' করা প্রয়োজন তা' কর। গুরুদেবের আদেশ পেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ পুরী হেড পোষ্টাফিসে চলে গেলাম এবং একেবারে সরাসরি হেড পোষ্টমাষ্টার মশায়ের কাছে গিয়ে বসলাম! তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে প্রথমে গুরুদেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁর এখানে আগমনের কথা, এবং পরে পোষ্টম্যানের অভ্যকারের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলাম। পোষ্টমাষ্টার মশায় বেশ মনোযোগের সহিতই আমার সব কথা শুনলেন। লক্ষ্য

করলাম, গুরুদেবের কথা যখন বলছিলাম, তখন তাঁর চোখ দুটি আনন্দে যেন ঝলমল করে উঠছিল। আমার সব কথা শুনে পোষ্টমাষ্টার মশায় হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "এমন একজন মহাপুরুষ যে এখানে এসেছেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি নিশ্চয়ই তাঁকে দর্শন করতে যাব।" পোষ্টম্যানের কথা উল্লেখ করে বললেন, "ওর ব্যবস্থা তো আইন মাফিক যথারীতি হবেই"। আমি আনন্দচিত্তে গুরুদেবের কাছে ফিরে এলাম এবং গুরুদেবকে সকল কথা জানালাম। পোষ্টমাষ্টার মশায় গুরুদেবকে দর্শন করতে আসবেন—একথা বললেও আমি নিজে অবশ্য অতটা বিশ্বাস করতে পারিনি। কারণ তখনকার সেই ব্রিটিশ আমলে জেলার হেড পোষ্টমাষ্টারের পদমর্য্যাদা রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ; তদুপরি তিনি বাঙালী নন, উড়িয়া। তাঁর মত এক ব্যক্তি যে একজন অখ্যাত, অজ্ঞাত ও সম্পূর্ণ অপরিচিত বাঙালী সাধুর পরিচয় মাত্র আমার মুখে (আমি তখন একজন নগণ্য বালকমাত্র) শ্রবণ ক'রে তাঁকে দর্শন করবার জন্য এই আধ মাইল পথ হেঁটে এখানে আসবেন এতটা আশা আমি অবশ্য করিনি। মনে ভেবেছিলাম নেহাৎ সৌজন্যবশতঃই তিনি ও কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমার সে সন্দেহকে নির্মূল ক'রে এবং ঠিক তার পরদিনই দ্বিপ্রহরে স্বয়ং পোষ্টমাষ্টার মশায় একজন কেরাণীসহ আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। আমি সানন্দে এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম এবং বসতে আসন দিলাম। তারপর আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ছুটে গিয়ে গুরুদেবকে সংবাদ দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই গুরুদেব হলঘরে এসে তাঁর আসনে বসলেন এবং যুক্তকরে পোষ্টমাষ্টার মশায়কে অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁকে নানা সম্মানজনক ভাষায় পরিতৃপ্ত করতে লাগলেন। মাষ্টার মশায় গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন এবং উঠে বসতেই আমি তাঁকে ও কেরাণীবাবুকে প্রচুর মিষ্টান্ন হরিলুট দিলাম। তাঁরা ভক্তি-সহকারে সেই হরিলুট গ্রহণ করলেন এবং গুরুদেবকে দর্শন ক'রে তাঁরা যে নিজেদের পরম ভাগ্যবান ব'লে মনে করছেন, তা জানালেন। মাষ্টার মশায়ের চোখে মুখে আনন্দ ও বিস্ময়ের তরঙ্গ খেলতে লাগল যেন। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, "আপনাকে দর্শন করে আজ আমার জীবন ধন্য হল; মহাভাগ্য না থাকলে এমন মহাপুরুষের দর্শন হয় না।" পরিশেষে পোষ্টম্যানের আচরণের জন্য নিজে ক্ষমা চাইলেন এবং এরপর থেকে গুরুদেবের প্রতি যাতে যথোচিত মর্য্যাদা ও সম্মান প্রদর্শিত হয়, তার ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন জানালেন। গুরুদেব বললেন, "আবার এসো, বাবা।" মাষ্টার মশায় সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন ক'রে সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

পুরী হেড অফিসের পোষ্টমাষ্টার মশায় আবার এসেছিলেন, একাধিকবার এসেছিলেন। তাঁর পদমর্য্যাদা ভুলে, তিনি অতি দীনভাবে অতি ভক্তিনত চিত্তে

গুরুদেবের দর্শনে বারবার এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর শ্রীচরণ-আশ্রয়লাভ ক'রে তাঁর মন্ত্রশিষ্য হবারও বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। গুরুদেবকে কী চোখে দর্শন ক'রে সেই সুশিক্ষিত, সুউচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত, ভিন্নদেশী সেই প্রবীণ ও গম্ভীর ব্যক্তি এমনভাবে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন, তা তিনি জানেন, আর জানেন গুরুদেব।

পরিচয় শ্রবণ মাত্র আকর্ষণ এবং দর্শনমাত্র মুগ্ধ ও অভিভূত হওয়া—এ একমাত্র গুরুদেবের অলৌকিক শক্তির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। প্রচারে ও প্রচেষ্টায় এ জিনিষ সম্ভবেনা; মনে পরিবর্ত্তন আনলেও হৃদয় পর্য্যন্ত তা পৌছায় না, এমনভাবে অন্তরলোক আলোড়িত হয় না কখনো।

২৪শে চৈত্র—আজও জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া হ'ল। গুরুদেব ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। আজ সব রকম ভোগই কেনা হ'ল, মূল্য দেওয়া হল ৮॥০ টাকা। ভোগের দাম অত্যধিক। গুরুদেবের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি। তিনি ভোগের কিছু তরকারী দেখিয়ে বললেন, "দেখেছ, বাবা, এরা ভোগ ঠিকমত সিদ্ধ করে না।" বাস্তবিকই তাই—তরকারী সব আধসিদ্ধ। গুরুদেব ভোগ রান্না করার স্থানগুলিও দেখলেন।

২৭শে চৈত্র। গুরুদেবের খেলার জন্য মিষ্টি ও নানাবিধ খাবার প্রয়োজন। এক খাবারওয়ালা জুটল, সে প্রত্যহ এসে ফুলুরি ও অন্যান্য খাবার বিক্রয় ক'রে যেত। আর এক বাঙালী মিষ্টান্ন বিক্রেতা নানাবিধ মিষ্টি বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসত প্রত্যহ। অবশ্য বাজারে আমাকে প্রত্যহই যেতে হত—চাল, ডাল, তেল মসলা ও কাঁচা তরি তরকারী কিনতে। ক্রমে ক্রমে শিষ্য-সমাগম বৃদ্ধি পেতে লাগল। কলকাতা থেকে এলেন ভূপেনবাবুরা বারো চৌদ্দজন, মদনবাবুরা তিনচার জন, বৈদ্যবাটী থেকে রাজেনবাবুর এক বিরাট দল এসে উপস্থিত হ'ল, টিটিলাগড় থেকে কমলারা এল। এদের সকলের দেখাশুনা ও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে; সুতরাং আমার কাজের পরিমাণ সেই অনুপাতে বেড়ে গেল। তখনকার দিনের বাজারের একটি তালিকা এই সঙ্গে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম; সে সময়ে জিনিষপত্রের কীরূপ দর ছিল তা এ থেকে জানা যাবে। সাধারণ মোটা চাউল দুই মণ ৬।৵০, কৃষ্ণভোগ সরু আতপ পাঁচ পোয়া ৶০ ঐ সিদ্ধ ৵১৫, ডাল আড়াই সের ।৶০—॥/১০, আলু পাঁচ সের ॥০, গুড় আড়াই পোয়া /১০, সরিষার তেল আধ সের ।/০, কেরোসিন এক টিন ২৸৵০, খালি টিন একটি ৶১০, ছোলা পাঁচ সের ॥৵০, কাপড় তিনটি ১৸৵০ ইত্যাদি।

এই সব শিষ্য এখানে এসে পুরীর দর্শনীয় সব জায়গাতেই গেলেন। গুরুদেবকে তাঁরা তাঁদের সাথে যেতে অনুরোধ করতেন। তাঁদের অনুরোধ সব সময় এড়াতে না পেরে গুরুদেব কোনো কোনো দিন তাঁদের সঙ্গে যেতেন। জগন্নাথদেবের মন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দির ছাড়াও, গম্ভীরা, সিদ্ধবকুল, নরেন্দ্র ও প্রদ্যুম্ন সরোবরে গুরুদেব

গিয়েছিলেন ভক্তদের সঙ্গে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া হ'ল। ১লা বৈশাখও গুরুদেব সব শিষ্যগণকে নিয়ে মন্দিরে দর্শনে গেলেন। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা। মন্দিরে বহু ভিখারী ছিল। গুরুদেবের নির্দেশে তাদের ভিক্ষা দেওয়া হ'ল। গুরুদেব সমস্ত মন্দিরপ্রাঙ্গণ পরিভ্রমণ ক'রে দর্শনীয় সব জায়গাই দেখলেন। মন্দির গাত্রে খোদিত মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ও নিগূঢ় ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন কোনো কোনো অন্তরঙ্গ ভক্তকে। জগন্নাথদেবের "শ্মশান"-ক্ষেত্রে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন এবং পরম শান্তির স্থান বলে মন্তব্য করলেন।

২রা বৈশাখ গুরুদেব হঠাৎ অনেক ছোলা কিনে আনতে বললেন। তারপর ৩রা বৈশাখ বললেন এগুলি দু তিনটি বালতীতে ভিজিয়ে দাও। তাই করলাম আমরা। কিন্তু এত ছোলা ভিজানোর কী প্রয়োজন কিছুই বুঝতে পারলাম না আমরা। এদিকে শিষ্যরা বললেন, "আমরা একলিঙ্গেশ্বর শিব দর্শনে যাব, আপনি দয়া ক'রে আমাদের সঙ্গে যাবেন।" গুরুদেবও তাতে রাজী হ'য়ে গেলেন। স্থির হ'ল, পরদিন অতি প্রত্যূষে শিবদর্শনে যাত্রা করব আমরা। স্থানটি এখান থেকে বোধ হয় ৭।৮ মাইল দূর হবে। কাজেই ৩রা বিকালেই দু'খানি মোটর ট্যাক্সি নিযুক্ত ক'রে রাখা হ'ল। পরদিন ৪ঠা বৈশাখ রবিবার অতি ভোরেই ট্যাক্সি দুটি এসে গেল। গুরুদেবকে নিয়ে আমরা একটা গাড়ীতে উঠলাম। দুর্গাপদবাবু, কাতু, খড়্গপুরের দুর্গানাথ বাবু ইত্যাদি আমরা গুরুদেবের গাড়ীতে বসেছি এমন সময় হঠাৎ গুরুদেব বললেন, "ছোলা ভিজে, আমার ছোলাভিজের বালতীগুলি সব নিয়ে এসো।" আমরা তাড়াতাড়ি ছোলা ভিজের বালতীগুলি গাড়ীতে উঠিয়ে নিলাম। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

যাওয়ার পথে গুণ্ডিচা মন্দিরে গিয়ে সেখানে ঘুরে ঘুরে সব দর্শন করা হ'ল। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণচিহ্ন ব'লে বর্ণিত স্থানটিতে সকলে প্রণাম করলেন। পাশের পুষ্করিণীটিও দেখলাম আমরা, যেখান থেকে জল তুলে মহাপ্রভু তাঁর ভক্তগণ সহ গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন করতেন। সেদিন নরেন্দ্র সরোবরেও যাওয়া হয়েছিল। অবশেষে আমরা একলিঙ্গেশ্বর শিবের স্থানে এসে পৌঁছলাম। নিভৃত নির্জ্জন জায়গা। পাশে কোনো লোকালয় দেখতে পেলাম না। গুরুদেব নামলেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলাম। শিষ্যরা শিবদর্শন করলেন এবং এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। গুরুদেব কিন্তু বেশী দূর এগোলেন না। তিনি ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ দিকে নির্জ্জন বনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে তেঁতুলগাছের বন। গুরুদেব ঊর্দ্ধে বৃক্ষশাখার দিকে চাইলেন। তারপর ডাকলেন, "আয়, আয়, আয়।" আমি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি বৃক্ষশাখায় বহু হনুমান বসে আছে—খাদ্যাভাবে তারা শীর্ণ কলেবর। সেই ক্ষীণতনু, কৃশকায় হনুমানগুলি উৎসুক দৃষ্টিতে গুরুদেবের দিকে চেয়ে থাকল,—কিন্তু

হঠাৎ কেউ নেমে এলনা। কারণ তারা জীবনে বোধ হয় এমন ভাবে কোনে মানুষের আহ্বান পায়নি, তাই তারা শুধু উৎসুক হ'য়ে চেয়ে রইল। তারপর গুরুদেব আমাকে যেন ভৎ'সনার কণ্ঠে বললেন, "ছোলা, আমার ছোলা ভিজে কৈ ?" আমি ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ী থেকে ছোলার বালতীগুলি নামালাম, ভক্তগণও আমাকে সাহায্য করলেন। ছোলাভিজের বালতীগুলি একে একে গুরুদেবের কাছে নিয়ে এলাম। তখন গুরুদেব সেই হনুমানদের ছোলা দিলেন, তারাও তখন একে একে নেমে এসে গুরুদেবের হাত থেকে ছোলা নিতে লাগল। তাদের সন্দেহ ও দ্বিধা তখন কেটে গেছে; তারা বুঝেছে তাদের শ্রীরামচন্দ্র আজ অবতীর্ণ হয়ে সুদূর আট মাইল দূর থেকে তাদের বুভুক্ষা-ক্লিষ্ট অবস্থার কথা অবগত হয়ে ছুটে এসেছেন—তাদের নিজহাতে খাওয়াতে। তাই একে একে তারা সবাই নেমে এল, সবাই গুরুদেবের হাত থেকে ছোলাভিজে খেতে লাগল। হনুমানের মেলা ব'সে গেল, হনুমান-মহোৎসব আরম্ভ হ'ল। আমাদের শিষ্যগণ ছাড়াও যেসব দর্শনার্থী শিবদর্শনে এসেছিল, তারা অধিকাংশই শিবদর্শন ভুলে গুরুদেবের এই অপূর্বে হনুমান-সেবা-উৎসব দর্শন করতে লাগল। রীতি-মত ভীড় জমে গেল গুরুদেবের আশে পাশে। তার মধ্যে কিছু সাহেব মেমও ছিল। হনুমান সেবা সম্পূর্ণ করে গুরুদেব ট্যাক্সিতে এসে উঠলেন। এবার স্পষ্টই বোঝা গেল, গুরুদেব কেন শিবদর্শনে এসেছিলেন। বরাবর বাসায় এসে ট্যাক্সী দাঁড়াল। ভাড়া হ'ল সাড়ে সাত টাকা—আজকের ভাড়ার টাকাটা কমলারা দিল। খাবার ও মিষ্টি কেনা হ'ল ৬।৶/, দর্শন আদিতে খরচ হল ১।•

বৈষ্ণবাটির শিষ্যরা এবার আবদার ধরলেন যে তাঁরা সাক্ষী গোপাল দর্শনে যাবেন, গুরুদেবকে তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে। গুরুদেব কিন্তু কিছুতেই রাজী হ'লেন না· হাতযোড় ক'রে বললেন,"বাবা, এই অধম সন্তানই তো তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে—আর কেন এদিক ওদিক ঘুরে মরা ?" এই মহাবাণী,এই পরম সত্য তাঁর শ্রীমুখে শ্রবণ করার পরও আমাদের গুরু-জ্ঞান হয়না, এর চেয়ে আর কী দুর্দৈব হতে পারে ?

এদিকে দর্শনার্থীর ভীড় ক্রমশঃ অত্যধিকরূপে বাড়তে লাগল। কোনো পরিচয় নেই, প্রচার নেই—অথচ সকাল, দুপুর, বিকাল, এমন কি রাত্রি দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত এত অধিক সংখ্যক দর্শনার্থীর সমাবেশ হ'তে লাগল যে আমিও সামলে উঠতে পারতাম না, গুরুদেবেরও শান্তিভঙ্গ হ'ত। এটা যে তাঁর শেষলীলারই অপরিহার্য্য অঙ্গ—তা কি তখন বুঝতে পেরেছি ?

পুরীতে এসেই প্রথমদিকে একদিন গুরুদেবকে ও ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে গম্ভীরা মঠ ও সিদ্ধ-বকুল হরিদাসমঠে গিয়েছিলাম। গম্ভীরা আশ্রমের একটি আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়ল—এটির প্ল্যান অনেকাংশে নবদ্বীপের গুহাশ্রমের মতই।

গুরুদেব সবই ঘুরে ঘুরে দেখলেন। সিদ্ধবকুল হরিদাস মঠে ঠাকুর ভোগের জন্য কিছু প্রণামীও দেওয়া হ'ল। আমাকে প্রত্যহই বহুবার বাজারে ও দোকানে যেতে হ'ত— সেই সূত্রে আমি বহুবার জগন্নাথ-মন্দির, গম্ভীরা মঠ ও হরিদাসের সিদ্ধপীঠ দর্শন করেছি। বিশেষ ক'রে মহাপ্রভুর লীলাস্থল গম্ভীরামঠ ও ঠাকুর হরিদাসের পীঠটি আমার খুবই ভাল লাগত। গুরুদেব একদিন হঠাৎ আমাকে বললেন, "বাবা আমি তোমার সাথে নির্জনে গম্ভীরামঠে যাব।" সময় নির্ব্বাচন হ'ল ঠিক সন্ধ্যা।

গোধূলির আবছায়া অন্ধকারে বার হলেন গুরুদেব এই অধম মহাপাপীকে তাঁর একমাত্র সঙ্গী ক'রে। শুধু গুরুদেব ও আমি, আর তৃতীয় ব্যক্তি নেই। সদর সমুদ্রপথ ছেড়ে বাসার পিছন খিড়কী দিয়ে গলিপথে বার হ'লাম আমরা। পথ একেবারে নির্জ্জন। ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলেন গুরুদেব। নিভৃত পথের দুপাশের নিস্তব্ধ বনশোভায় গুরুদেব খুব আনন্দ পেলেন। পথিপার্শ্বে দ্রষ্টব্য যা'কিছু আছে, সবই আমি গুরুদেবকে দেখাতে লাগলাম। চলতে চলতে পথের একটি মোড়ে এসে গুরুদেব থামলেন। স্থানটি অতি নিভৃত। গুরুদেব সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। বেশীর ভাগ কথাই হ'ল আশ্রম প্রসঙ্গে। গুরুদেবের কথার মর্ম বোঝা বড় দুষ্কর; খাপছাড়া কথা, মনে হয় একটার সাথে আর একটার কোনোই সম্পর্ক নেই। তার উপর একটা কথা বলেই তাকে চাপা দেন অন্য প্রসঙ্গ অবতারণা করে। কাজেই সব গোলমাল হ'য়ে যায়। গুরুদেব একবার বললেন, "ট্রাষ্ট্ বেশী লোক নিয়ে করা ভাল কি? দু'জনই ভাল।" তারপরই বললেন, "আর তুমি? গুরুদেব রাধাগোবিন্দ তোমাকে চরণে স্থান দিয়েছেন, তুমি চিরদিন তাঁদের ছেলে হয়ে তাঁদের চরণেই থাকবে। আশ্রম দেখাশুনা করবে, সন্ধ্যা পূজা দেবে, অতিথি ঠাকুর সেবা করবে।" আমি গুরুদেবের এই কথায় বাধা না দিয়ে পারলাম না; বললাম, এসব কথা আমাকে বলছেন কেন, বাবা? আমি তো অতি নগণ্য; আমার উপর বহু পূজনীয় শিষ্যরা রয়েছেন—"গুরুদেব আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "বাবা, যারা……, তারা কখনো নিঃস্বার্থভাবে গুরু আশ্রম দেখতে পারবে না। আমি সব ভেবেই তোমার কথা বলছি, বাবা। আর তা' ছাড়া তোমার ভাবনাই বা কী? গুরুর আদেশে তুমি বিয়ে করবেনা। সংসারে ফিরে যাবেনা, চাকুরীও করবেনা; আশ্রমে প'ড়ে থাকবে; গুরু-রাধাগোবিন্দ তোমাকে দেখবেন; তোমার কোনো চিন্তা থাকবেনা, সুরেনধন।" কথাগুলি শুনতে একটুও ভাল লাগল না আমার, মনটা যেন অকারণে বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। ও কথাগুলি চাপা দিয়ে অন্যপ্রসঙ্গে আসতে পারলেই যেন বাঁচি—এইরূপ মনে হ'ল। গুরুদেব ও তা বুঝলেন সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ান্তরে এসে বললেন, "চল, বাবা, যাই—অন্ধকার হ'য়ে আসছে।"

বিমনা হয়ে আমিও আবার সেই নির্জন পথে অগ্রসর হলাম। এই নিভৃত নির্জন নীরব পরিবেশে একাকী গুরুদেবের সঙ্গে পথ চলতে আমার খুবই ভাল লেগেছিল; কিন্তু হঠাৎ আশ্রমের বৈষয়িক কথা, বিশেষতঃ আমার উপর আশ্রমের ভার দেওয়ার কথা শুনে মনটা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হ'য়ে পড়ল। গুরুর সব বাক্যই মন দিয়ে শুনতে হয় জানি, তবু এটা যেন রোগীর তিক্ত ও কটু ঔষধ সেবনের মতই বিস্বাদ লাগল আমার। বিষয় আমার কাছে সত্যই বিষবৎ লাগে, তাই বহির্জগতে আমি সর্ববিষয়ে পরাজিত ও চিরদিন অপদার্থ ব'লে গণ্য। বিষয় ছেড়ে অমৃত লাভের লোভেই গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করেছি, জেনেছি যে ঐ শ্রীপাদপদ্মই চিরশান্তি, চির আনন্দ, চির অমৃতের আধার—তবু আজ আবার সেই গুরুদেবই বিষয়ের দায়িত্ব দিতে চাইছেন? তা'ছাড়া শিষ্যদের মধ্যে আমি তখন একেবারে শেষসারির অন্তর্ভুক্ত, আমার উপর কত কত বয়োজ্যেষ্ঠ, পূজনীয়, জ্ঞানী, গুণী ও ভক্তপ্রবর রয়েছেন—যাঁরা আমার নমস্য ও গুরুদেবের অনেক প্রিয়। তাঁদের সকলকে বাদ দিয়ে একেবারে এই নগণ্য কীটানুকীটকে বেছে নিচ্ছেন কেন তিনি? প্রথমে ভেবেছিলাম এটা একটা খেলা তাঁর; আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হয়তো তিনি কিছু চিন্তা করছিলেন, এবং আমাকে তার কিছু জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যখন একে একে আমার বয়োজ্যেষ্ঠগণকে নাকচ করতে লাগলেন, তাঁদের দোষ গুণ বিবৃত করে, তখন বুঝলাম এটা তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, খেলামাত্র বা কথার কথা নয়। আমার বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যগণ সম্বন্ধে তিনি যে সব মন্তব্য করেছিলেন তা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হবেনা ব'লে আমি সেগুলি ফাঁক রেখে দিতে বাধ্য হলাম। কারণ তাঁরা অনেকে গত, এবং কেউ কেউ বর্তমান থাকলেও, কারো বক্তিগত কথা—যা শুধু গুরুদেবই জানতেন—প্রকাশ করা কোনো ক্রমেই উচিত নয়। অনেকক্ষণ ধরেই তিনি কথা বলেছিলেন, এবং তাতে আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত তো দিলেনই, উপরন্তু অধিকাংশ শিষ্যের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে দিয়ে বললেন তাদের কী কী কারণে তিনি কাছে রেখেছিলেন, এবং পরিশেষে আমার কর্তব্য, আমার ধর্ম সম্বন্ধেও বিস্তৃত উপদেশ দান করলেন।

গম্ভীরা মঠে যখন পৌছলাম তখন ঠিক সন্ধ্যা হয়েছে। ঠিক বিধিমতই, মঠের বহির্বাটিতে সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের আরতি আরম্ভ হয়েছে। গুহাশ্রমেও শ্রীগুরুদেব বিধিমত ঠিক সন্ধ্যা-লগ্নেই (অর্থাৎ দিবা রাত্রির সন্ধিক্ষণে) সন্ধ্যারতির আদেশ দিয়েছেন। গুরুদেব দূর থেকে আরতি দর্শন ক'রে আমার সঙ্গে ভিতরে গেলেন। ধীরে ধীরে গম্ভীরার দ্বার সমুখে এসে বসলেন। মহাপ্রভুর কাঁথা, করঙ্গ দর্শন করলেন স্থির দৃষ্টিতে—তারপর সাষ্টাঙ্গ প্রণত হলেন। চারদিক নীরব, নিথর,

নিস্তব্ধ—একটি প্রাণীর সাড়া নেই সেই নিভৃত গম্ভীরার গহন নিঃসঙ্গতায়। যেন এক অসহনীয় স্তব্ধতা, মৃত্যুর মত মূক মৌন অন্ধকার; প্রলয়ের মত প্রশান্তিপূর্ণ সুষুপ্তি। মনও যেন তার গতিবেগ হারিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে চায়। গম্ভীরার পরিবেশ নির্জন বটে। তবে আর কোনোদিন এমন মৃত্যুসম মৌনতা লক্ষ্য করিনি। কিন্তু গুরুদেব। তিনিও কি এই নিভৃত পরিবেশে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট, পাঁচমিনিট—আর কতক্ষণ মানুষ প্রণত হ'য়ে থাকতে পারে? গুরুদেব সেইরূপ সাষ্টাঙ্গ প্রণতাবস্থায় নীরব, নিশ্চল, নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলেন। আমার মন যেন এবার এক আশঙ্কায় দুলে উঠল, তবে কি গুরুদেবের কিছু হ'ল? এরূপ মানসিকআশঙ্কায় যখন নীচু হয়েগুরুদেবকে দেখতে যাচ্ছি,এমন সময়েগুরুদেব উঠলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উঠে আবার প্রণাম করলেন গুরুদেব। গম্ভীরার অভ্যন্তর, বহির্ভাগ, আশপাশ সব ভাল করে দর্শন করলেন। এদিক, ওদিক ঘুরলেন আমায় নিয়ে। তারপর মধ্যবর্ত্তী বাড়ীটিও ঘুরে ঘুরে দেখলেন। পরিশেষে বহির্বাটিতে এসে পৌছলেন। তখন সেখানে তুলসী-আরতি হচ্ছে, তুলসী মন্দির পরিক্রমা ক'রে। গুরুদেব সব দেখলেন, শুনলেন। তারপর আমাকে বললেন, "দেখেছ, বাবা, এরা ঠিক বিধিমতই আরতি করে; তুলসী আরতিও করছে, আমাদের ছেলেদের মত ফাঁকিবাজ নয়। ঠাকুর সেবা পূজা করতে হ'লে তার নিয়ম, সময় এবং বিধিগুলি ঠিক ঠিক করতে হয়।" তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে এসে বললেন, "কিন্তু তোমার এ সব নয়, সুরেনধন। এ সব হচ্ছে বিধিমার্গের ভক্তদের জন্য। যার যে line, গুরু তা ঠিক ক'রে দেবেন। নিজ ইচ্ছামত চলতে গেলে কিছুই হবেনা।" এবার আমায় একটু আদর ক'রে বললেন "তোমার ভাবনা কী, সুরেনধন? তোমার এই পাগল ছেলে আছে, তোমার আর আলাদা রাধা-গোবিন্দ নেই।" গুরুর সেই মহাবাক্য শ্রবণ ক'রে আমার দুই চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সেইখানেই সাশ্রুনেত্রে গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে পরিপূর্ণ হৃদয়ে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার হৃদয়ান্ধকারের মাণিক, আমার জন্মজন্মের প্রভু, আমার অন্তরবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমি সেই নিভৃত গলির পথে বাসায় ফিরে এলাম।

গম্ভীরা মঠের প্রধান সেবাইতের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়েছিল। তিনি বাঙালী না হলেও বাংলা বোঝেন ও একটু বলতেও পারেন। ভদ্রলোক অমায়িক ও মিষ্টভাষী, অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। তাঁর বিনয়নম্র ব্যবহার আমার খুব ভাললাগায় —সে কথা গুরুদেবকে জ্ঞাপন করলাম। তিনি একথালা মিষ্টি সাজিয়ে ও কিছু ঠাকুর প্রণামী দিয়ে আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেবাইত ভদ্রলোক তো অবাক! গুরুদেবের কথা তাঁকে বিবৃত করতে সুরু করলে তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্য ও শ্রদ্ধা-

সহকারে তাঁর কথা শুনলেন এবং আমার হাত দিয়ে গুরুদেবকে মিষ্টান্ন প্রসাদ ও প্রণামী পাঠালেন। দেখলাম উনি গুণগ্রাহী; মহাপুরুষের পরিচয় পাওয়ামাত্র তিনি তাঁর যথাযোগ্য সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করতে বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা করেননি। গুরুদেবকে সেই সব নিয়ে গিয়ে দিলে, তিনি উক্ত সেবাইতের ব্যবহারে খুব খুশী হ'লেন।

দেখতে দেখতে বৈশাখ মাসের ৯ দিন পার হয়ে গেল। গুরুদেব এবার পুরী ত্যাগ ক'রে ভুবনেশ্বর যাত্রা করবেন। এখানকার পালা শেষ হ'ল। বাড়ীভাড়া ইত্যাদি সব মিটিয়ে দেওয়া হ'ল। পাণ্ডা বিদায়, অগণিত ভক্ত জেলে ও অন্যান্য ভক্তবিদায়, এমন কি মেথরানী বিদায়—সে এক করুণ দৃশ্য! সকলেই গুরুদেবের বিয়োগব্যথায় বিধুর, সকলেরই চোখে জল, সকলেরই মন যেন মুচড়ে উঠছে। সকলেই বলে, কতলোক পুরী ধামে আসে যায়, কিন্তু এমন তো কখনো হয় না। যাবার সময় বহু জিনিষ প'ড়ে রইল—কাঠ, কয়লা ঘুঁটে, শিল-নোড়া, ডালা কুলা, কেরোসিন তেল, খালি টিন ইত্যাদি সে-কত দ্রব্য তা লিখে শেষ করা যায় না। তরি তরকারীই যে কত পড়ে রইল, কুম্‌ড়াই প্রায় একঘর বোঝাই থাকল। তাও আমি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথাসাধ্য বেঁধে নিয়েছিলাম, আবার আর এক জায়গায় আশ্রম পাততে হবে তো। কিন্তু যা নিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী জিনিষ প'ড়ে রইল। সংসারী লোকের মন কেমন করে; বাসিনী দিদিমা বললেন, "গুরুদেব, এত জিনিষ পড়ে রইল!" গুরুদেব একটু হেসে গান ক'রে শোনালেন, "যেদিন যেতে হবে, সব পড়ে রবে, কিছুই সঙ্গে যাবেনা...।"

১০ই বৈশাখ। এত মালপত্র ফেলে রেখে গেলেও বাকী যা আমি সঙ্গে নিলাম তাও একটা ঠেলাগাড়ীতে তুলে তাতে আঁটল না। গুরুদেবের মোটরে তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি তুলে দিলাম। বাকী মাল আরও দু'তিনটী রিক্সাতে চাপালাম। গুরুদেবকে নিয়ে দুর্গানাথবাবু মোটরে রওনা হলেন। বাকী মালপত্র সব নিয়ে আমি, মদনদাদা, কমলা, শম্ভুর মা ইত্যাদি তাঁদের পশ্চাৎ যাত্রা করলাম। দুর্গানাথবাবু ষ্টেশনে পৌছে টিকিট কেটেছিলেন। ওদিকে পুরী এক্সপ্রেস তখন প্ল্যাট্‌ফর্মে প্রবেশ করেছে। দুর্গানাথবাবু গুরুদেব ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে চ'লে গেলেন। কিন্তু তখন ষ্টেশনে কুলি না পাওয়ায় মালগুলি নিয়ে আমি, মদনদাদা, কমলা বাইরেই রইলাম। কুলির জন্য চারদিকে খোঁজা খুঁজি করতে লাগলাম—কিন্তু কোথায় কুলি? সমস্ত ষ্টেশন ঘুরে কোথাও একটি কুলিরও সন্ধান পেলাম না। কেউ তাদের কোনো পাত্তাও জানাতে পারল না। এদিকে সময় ব'য়ে যাচ্ছে, ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে, ট্রেন ছাড়বার সময় হ'য়ে এল। আর পাঁচ মিনিট, চার মিনিট,

তিন মিনিট, দু'মিনিট—আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। হায়, হায়—কী হবে? এতগুলি মালপত্র আমাদের পক্ষে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, অন্ততঃ পক্ষে ১৪/১৫ জন শক্তিশালী কুলিছাড়া এত মাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে গাড়ীতে তোলা যাবে না। তবে কি মাল নিয়ে আমাদের প'ড়ে থাকতে হবে? গুরুদেব কত চিন্তিত হবেন! কী হবে, কী হবে—হে গুরুদেব! অন্তিম মুহূর্ত্তে একী সঙ্কট! ভাবতে আর পারিনে, ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেল…সহসা একী!! কোথা থেকে ভোজবাজীর মত ২০।২৫ জন কুলি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'ল আমাদের সামনে, তারপর চীৎকার ক'রে বললে, "কোথায় সাধুবাবার মাল?" স্তম্ভিত হতচকিত, বিমূঢ় হয়ে আমরা তিনজনে ওদের মালপত্র দেখিয়ে দিতেই মুহূর্ত্তমধ্যে সব মালপত্র তাদের মাথায় উঠে গেল। তারা ছুটল, তাদের পিছু পিছু ছুটলাম বিস্ময়াভিভূত আমরাও। ট্রেনের গার্ড তখন ঘন ঘন বাঁশী বাজাচ্ছে, আর নিশান উড়াচ্ছে। মালগুলি মুহূর্ত্তমধ্যে একটি কামরায় উঠে গেল, আর তার পিছনে আমরাও। ভোঁ দিয়ে ইঞ্জিন ছাড়ল। বাইরে মুখ বার করে আমি শুধালাম, কুলি, তোমরা কজন? তারা কী উত্তর দিল শোনা গেলনা। আমি আন্দাজ ক'রে কিছু টাকা পয়সা বাইরে ছুড়ে দিলাম। প্ল্যাট্‌ফর্ম অদৃশ্য হয়ে গেল। বিমূঢ় হয়ে আমরা তিনজনে ভাবতে লাগলাম, ঐ কুলিগুলি কি পৃথিবীর মানুষ, না কোনো অপার্থিব দূত? শেষ মুহূর্ত্তে অতগুলি কুলি একসঙ্গে কোথা থেকে এল, কে তাদের পাঠাল একেবারে অন্তিম মুহূর্ত্তে?

যাত্রীভর্ত্তি একটা রেলের কামরায় সহসা অতগুলি মালপত্র ছুড়ে ঢুকিয়ে দেওয়ায় ও তার সঙ্গে তিনজন যাত্রী সেই শেষ মুহূর্ত্তে প্রবেশ করায়, পূর্ব্বতন যাত্রীদের স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাঁরা কেউই তা হননি। বরং আমাদের অবস্থা দেখে তাঁরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হ'য়ে উঠলেন। তাঁরা আমাদের বসতে জায়গা ক'রে দিতে চাইলেও, আমরা কেউই বসলাম না; বরং তাঁদের অনুরোধ করলাম তাঁরা যেন আমাদের একটু সাহায্য করেন মালগুলি নামাতে ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে। কারণ সেখানে Stoppage অতি অল্প, সেই অল্প সময়ে আমরা নিজে অত মাল নামাতে সমর্থ হব না। তাঁরা সানন্দে স্বীকৃত হলেন, এবং আমাদের চিন্তা করতে নিষেধ করলেন। আমরা মালগুলি গুছিয়ে গুণে তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম। ওদিকে গুরুদেব কোথায় কী ভাবে উঠেছেন তা আমরা জানি না; তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে শম্ভু, কাতু ও গুরুদাসীই বা কোথায় তাও কিছুই জানি না। যথাসময়ে ট্রেণ ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে উপস্থিত হতেই যাত্রীদের সহযোগে কতকগুলি ভারী মাল আমি ও মদনদাদা নীচে ফেলে দিলাম, তারপর ত্বরিতে নেমে গিয়ে ছোট মাল গুলি নামিয়ে নিলাম। সব মাল না নামানো পর্য্যন্ত

কমলা ট্রেণ থেকে নামতে চাইল না, ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নেমে এল। আমি ছুটে গিয়ে গুরুদেবের সন্ধান নিলাম। হ্যাঁ, তিনি ঠিকমত নেমেছেন, এবং তিনটি বাচ্চাও। মালপত্রগুলি রেললাইনের ধারে প্ল্যাটফর্মের কোথায় যে কীভাবে ছিটকে পড়েছে তা জানি না। সেগুলি খুঁজে বার ক'রে ঠিকমত গুছিয়ে নিতে হবে এখন। এই অন্ধকার রাতে এটা দুঃসাধ্য কাজ। তখন ভুবনেশ্বর তৃতীয় শ্রেণীর ষ্টেশন, উঁচু প্ল্যাটফর্ম বা ভাল আলোর ব্যবস্থা নেই। যাই হোক, আমরা তিনজনে অতিকষ্টে মালগুলি গুছিয়ে নিয়ে ও কুলি সংগ্রহ ক'রে তাদের মাথায় চাপিয়ে অগ্রসর হলাম। গুরুদেবের নিজস্ব প্রয়োজনীয় কয়েকটি দুর্লভ দ্রব্যের প্রতি আমার সর্ব্বদা সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি থাকত। বিশেষতঃ গুরুদেবের সাথে বাইরে বেরোলে এ বিষয়ে আমার একাগ্র মনোযোগ রইত। এখানেও গুরুদেবের পিছু পিছুই আমি ছিলাম এবং তাঁর হরিনামের ঝুলি যে বহন করছিল তার ঠিক পাশেই আমি ছিলাম। এতগুলি কুলি দেখে টিকিট চেকার একবার আমাদের দাঁড় করাল, তারপর কিছু কথাবার্ত্তার পর ছেড়ে দিল। গুরুদেব পার হয়ে গেলেন, তাঁর পিছনে তাঁর হরিনামের ঝুলি পার হ'ল। ঠিক তারপরেই আমি চলেছিলাম। ষ্টেশনের টিম্‌টিমে সেই স্বল্প আলোকে কিন্তু আমার সতর্ক দৃষ্টি এড়ালোনা যে গুরুদেবের হরিনামের ঝুলির উপর থেকে কতকগুলি ছেঁড়া কাগজের মত কী যেন নীচে পড়ে গেল। 'কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ তো—যাক্ না পড়ে'—একথা কিন্তু আমার মনে এলনা। গুরুদেবের হরিনামের ঝুলি থেকে যা পড়ে গেছে, তা আমার প্রাণস্বরূপ—তাই তড়িদ্বেগে, সকলের অলক্ষ্যে, সেই প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে আধো আলোছায়ার অস্পষ্টতার মধ্যে আমি সেই আপাতঃ অপ্রয়োজনীয় ছেঁড়া কাগজগুলি সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে নিয়ে যত্ন ক'রে পকেটে রাখলাম। তারপর গেট পার হয়ে এলাম। একে একে পার হয়ে এল প্রায় বিশজন কুলির মাথায় আমাদের রাশি রাশি মাল। ছুটে নীচে এলাম। দেখি একখানি মাত্র বাস। গুরুদেব ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে দুর্গানাথ বাবু তখন বাসে উঠলেন। মালপত্রের ভার নিয়ে থাকলাম আমি ও মদনদাদা। দু'খানি গরুগাড়ী ভাড়া ক'রে মালপত্র সব উঠিয়ে আমি ও মদনদাদা সেই গাড়ীতে উঠে বসলাম। রাত্রির ঘন অন্ধকার ভেদ ক'রে গভীর জঙ্গলের পাশ দিয়ে আমাদের সেই অচেনা পথে গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ ক'রে। একেবারে জনহীন পথ। বনের কাছে গা ছম্‌ছম্ করার কথা। কিন্তু মালপত্রগুলি যে সব গুছিয়ে আনতে পেরেছি এই আনন্দ ও তৃপ্তিতে তখন আমার মন ভরপুর। এইভাবে ধীরগতিতে চলেছি প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী রাস্তা, এমন সময় দেখি সামনের দিকে হ্যারিকেন, হাতে দুজন ব্যক্তি দ্রুত এগিয়ে

আসছে আমাদের অভিমুখে। তারা কাছে আসতেই দেখি আমাদেরই দুর্গানাথবাবু আর একটি লোক সঙ্গে ক'রে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন। ব্যাপার কী! গাড়োয়ান গাড়ী থামাল। দুর্গানাথবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, "খুব গুরুতর সমস্যায় পড়েছি; গুরুদেবের একটি অতি প্রয়োজনীয় দুর্লভ খাতা হারিয়ে গেছে। তিনি হতাশায় একেবারে উন্মত্তপ্রায় হয়েছেন। অন্ততঃ আমাদের তাই মনে হচ্ছে। আমাদের উপর কঠোর আদেশ—সারা রাস্তা এবং সারা ষ্টেশন, যেখানে যেখানে মালপত্র ছিল, সব জায়গায় তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে হবে ঐ সুদুর্লভ খাতাটির জন্য, দরকার হ'লে সারারাত সন্ধান করতে হবে, দেখতে হবে খুঁজে দিনের আলোয়, কারণ ঐ খাতা তাঁর প্রাণস্বরূপ। ঐ খাতা না পেলে তিনি বাঁচবেন না—এইরূপ ভাব দেখাচ্ছেন। আমাদের মনে হচ্ছে খাতার জন্য তিনি যেন একেবারে পাগল হয়ে গেছেন। আমাদের অবস্থা বুঝে দেখুন। সারা রাস্তা খুজতে খুঁজতে আসছি। এখন কী ভোগান্তি আছে তা', তিনিই জানেন।" এই ব'লে তিনি হাঁফাতে লাগলেন। আমি ব্যগ্রকণ্ঠে বললাম, "গুরুদেব সেই খাতার সম্বন্ধে কিছু পরিচয়-চিহ্ন ব'লে দিয়েছেন?" দুর্গানাথবাবু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, খাতার প্রথম পাতায় যা' লেখা আছে, তাই বলেছেন। খাতা খুলে দেখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।" আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ছেঁড়া কাগজগুলি বার ক'রে বললাম, "দেখুন তো এগুলো।" হ্যারিকিনের স্তিমিত আলোকে সেই ছিন্ন খাতার প্রথম পত্রে একবার চোখ বুলিয়েই দুর্গানাথবাবু উল্লাসে চীৎকার ক'রে বললেন, "এই সেই খাতা, সেই দুর্লভ রত্ন, যার শোকে তিনি উন্মত্তপ্রায় হয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন। আমি আর একটুও দাঁড়াব না।" এই ব'লে তিনি খাতাটি নিয়ে ছুটলেন। সঙ্গের লোকটি পিছু পিছু গেল।

যথাসময়ে বিন্দুসরোবর-তীরে আমাদের বাসায় এসে পৌঁছলাম। মালগুলি নামিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেছি, গুরুদেব প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "বাবা, তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ—গুরু তোমার মঙ্গল করবেন।" আমি অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেললাম। গুরুদেব বললেন, "গুরুর জিনিষ অমনিভাবে নিজের প্রাণ স্বরূপই মনে করতে হয়। ঐ জিনিষ খোয়া গেলে আজ যে আমার কী হ'ত।" এই ব'লে তিনি পুনরায় আমাকে আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন "তুমি প্রকৃত শিষ্যের মতই কাজ করেছ।"

গুরুদেবের শ্রীচরণে এতদিন রয়েছি—কিন্তু এমন অন্তর খুলে আশীর্বাদ তিনি আর কখনো করেননি। আমার কেবলই মনে হ'তে লাগল গুরুদেবের সমস্ত হৃদয়সাগর মন্থিত ক'রে ঐ যে আশিষ-সুধা বর্ষিত হ'ল তার অমৃত ধারায় স্নান ক'রে আমি যেন

আজ এক অমৃতময় জীবন লাভ করলাম, যেন এক অনন্ত আনন্দময় আশ্রয় প্রাপ্ত হলাম।

বাসাটির চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম—অতি মনোরম বাসা-বাড়ীটি। বিন্দুসরোবরের ঠিক পূর্ব্বপারে রাস্তার একেবারে উপরে। উঁচু পাথরের সিঁড়ি দিয়ে প্রাঙ্গণে উঠতে হয়; জায়গাটি উঁচু—ঠিক গুহাশ্রমের মত। তারপর প্রাঙ্গণের ওপারে পাথরের ঘর ও তার সমুখে বারান্দা। ভিতরে বারান্দার সমুখে দক্ষিণে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। বাড়ার উত্তরে ও পশ্চিমে রাস্তা, পূর্ব্বে বহু বিস্তীর্ণ পোড়ো-মাঠ, দক্ষিণও অনেকটা খোলা। কাজেই বাড়ীর চারদিকই খোলা। গুরুদেবও বাসাটি দেখে খুশী হলেন। পশ্চিমের সদর রাস্তায় তিন চার মিনিট হাঁটলেই বাজার ও ভুবনেশ্বরের মন্দির। আর একেবারে সমুখে বিন্দুসরোবর তো আছেই। অতি সুনির্ব্বাচিত, সুসন্নিবিষ্ট ও সুষমাময় হয়েছে এই বাসাটি। আমাকে বাইরের প্রায় সব কাজই করতে হ'ত। সুতরাং আমি বেশীর ভাগ সময় ঘুরে ঘুরেই বেড়াতাম। জায়গাটি পুরীর মত সহর নয়, ঘন বসতি নেই, একেবারে পাড়াগাঁয়ের মত। তবে রাস্তাগুলি পরিষ্কার ঝর ঝর করছে; দুধ কুণ্ডের ব্যবস্থা অতি সুন্দর; বিন্দু সরোবরের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপমন্দির ও চারদিকের বাঁধানো ঘাটগুলিও অতি মনোরম। কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দির অবহেলিত; প্রাঙ্গণ অপরিচ্ছন্ন, মন্দিরে পায়রার বাসা ও চারিদিকে তার ময়লায় ভর্ত্তি। দর্শনার্থী ক্বচিৎ কখনো দেখা যায়। যদিও শিল্পকলায় পুরীর মন্দিরের চেয়ে এ মন্দির কোনো অংশেই ন্যূন নয়, তথাপি মন্দির-মার্জনা, সেবা পূজা-পরিচর্য্যা ও দর্শনার্থী-সমাগম ইত্যাদিতে দুই মন্দিরে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখানকার বাজারও খুব ছোট। জিনিসপত্র বিশেষ পাওয়া যায় না, দোকানপাটের সেই রকম; দোকানের সংখ্যা ও লাপট্য অনেক কম। ক্ষুদ্র একটি পোষ্টাফিস, মন্দ নয় আছে। বড় বাড়ী বলতে আমাদের বাসার দক্ষিণ দিকে দুটি বৃহৎ ধর্মশালা শশোভিত বিরাজ করছে। বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ী—মাঝে মাঝে যেতাম আমি ঐ ধর্মশালা দুটিতে। আর সবই ফাঁকা মাঠ ধূ ধূ করছে, তার মধ্যে মধ্যে ছোট এক একটি মন্দির যেন মাঠের মধ্যে ঝোপের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এ রকম মন্দিরের সংখ্যা অনেক, তবে তারা সবই অবহেলিত। কে জানে কী কারণে অত অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির সৃষ্ট হয়েছিল এখানে সেখানে।

ভুবনেশ্বরে গুরুদেব মাত্র দশদিন ছিলেন, কিন্তু একদিনও বাসার বার হননি, গুরুদেবের সেবার জল এবং আমাদের পানীয় জল আমি দুধ কুণ্ড থেকে প্রত্যহ নিয়ে আসতাম। দুধ-কুণ্ডে যেতে আমার খুব ভাল লাগত, দিনে তিন চার বার ওখানে যেতাম আমি। ভক্তগণ সকলে গিয়েছিলেন ওখানে স্নান করতে এবং

খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। পথিমধ্যে বাগানগুলিও আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। এখানেও প্রত্যহ ভুবনেশ্বরের প্রসাদ আনা হ'ত, আর কিনে আনতাম এখানকার প্রসিদ্ধ খাজা। আমি সারাদিন নানা কাজে প্রায় ঘুরেই বেড়াতাম। সকালে গুরুদেবের জন্য নানাপ্রকার গাছের পাতা সংগ্রহ করতে হ'ত, আর মদনদাদার সঙ্গে সকালে বিকালে পুব দিকের মাঠ থেকে ঘুঁটে কুড়োতাম। খুব আনন্দ পেতাম এসব কাজে। গুরুদেবের এক মজার খেলা ছিল, যেখানে যেতেন সেখানেই বলতেন, "একটা আশ্রম করলে হয় না, বাবা?" এই খেলার আশ্রম করবার জন্য কলকাতায়, পুরীতে অনেক ছুটাছুটি করেছি, এখানেও করলাম। কিন্তু আসলে এসবই তাঁর খেলার খেয়াল মাত্র; এইভাবে কতজনকে নিয়ে কত খেলাই তিনি করেছেন।

পুরীতে আমি সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে একদিন তরঙ্গাঘাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে অচৈতন্য-প্রায় হয়েছিলাম। আর এখানে কাতু একদিন, ১৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার, দ্বি-প্রহরে সমুখের বিন্দুসরোবরের জলে খেলা করতে গিয়ে ডুবে গেল। আমরা কেউ জানতাম না, এবং তার বাঁচবারও কোনো আশা ছিল না। সামনের রাস্তা দিয়ে দুপুরে বড় একটা কেউ যাতায়াত করে না, সুতরাং তার ডুবে যাওয়ার খবর কারুরই জানবার কথা নয়। কিন্তু গুরুর অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল এবং গুরুপ্রেরিত হয়েই সে সরোবরের দিকে ঠিক সেই সময়েই একবার চাইল। চেয়ে দেখে জলের উপর কয়েকটি ছোট ছোট আঙুল নড়চড় করছে। মুহূর্তে সে ব্যাপারটি বুঝে নিল এবং তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারপর এক ডুবে কাতুকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে দিল। কাতু তখন জল খেতে খেতে ছিটকে পড়ল। তাকে কোলে ক'রে ডাঙ্গায় উঠিয়ে বসাতে সে হাঁফাতে হাঁফাতে বাসার দিকে এগোতে লাগল। লোকটিও তাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাছে এসে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল। শুনে আমরা তো সবাই হতভম্ব। সবচেয়ে ব্যস্ত হলেন গুরুদেব স্বয়ং। হাত জোড় ক'রে বললেন, "বাবা, গুরুদেবই ওকে আজ বাঁচিয়েছেন। এক মুহূর্ত এদিক ওদিক হ'লে ওকে কি আর ফিরে পেতে? ওর বাবাকে তা' হ'লে আমি কী জবাবদিহি করতাম?" এই ব'লে গুরুদেব কাঁদতে লাগলেন। তারপর সেই লোকটিকে এক থালা মিষ্টি, একটি নতুন বস্ত্র কিছু পয়সা এবং বহু ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিলেন। এরপর থেকে কাতুকে আমি চোখে চোখে রাখতাম। কিন্তু বিপদ যখন আসে, চোখের সামনে রেখেও তার বিপদ এড়ানো যায় না। একদিন বিকালে আমার কাছেই শম্ভু, কাতু ও গুরুদাসী তিনজন খেলা করছিল রাস্তার উপরে আমাদের বাসার সিঁড়িতে। খেলতে খেলতে হঠাৎ গুরুদাসী একেবারে উপর থেকে নীচের

সিঁড়িতে প'ড়ে গেল। পাথরের সিঁড়ি, তার উপর পড়েছে একেবারে মাথা নীচু ক'রে। বেশ জোর আঘাত হয়েছে; মাথা কেটে দরদর বেগে রক্ত পড়তে লাগল। চীৎকার ক'রে মদনদাদাকে ডাকলাম। সকলে ছুটে এলেন, ওকে কোলে ক'রে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বহুক্ষণ চেষ্টার পর কোন রকমে রক্ত বন্ধ হ'ল। একজন স্থানীয় চিকিৎসককে ডাকা হয়েছিল। আঘাত গুরুতর নিঃসন্দেহে। তবে মদনদাদা ওকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন না, বললেন, "গুরুর কাছে আছে, এর চেয়ে আর বেশী নিরাপদ কোথায় থাকবে?" এইভাবে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন গুরুদেব ভুবনেশ্বরে এসে দুটি শিশুকে।

গুরুদেবের আসন তোলার সময় হয়ে এল। যেখানে যেখানে চিঠি লিখতে হবে, সব লিখে দিলাম, যাবার আগের দিন সব গোছগাছ ও বাঁধাবাঁধি করতে লাগলাম। বাড়ীভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হ'ল। পাণ্ডা ইত্যাদি বিদায় করা হ'ল। সেদিন আর বাসায় পাক না ক'রে প্রসাদ এনে খাওয়া হ'ল। ২০শে বৈশাখ সন্ধ্যায় গরুর গাড়ী ক'রে মালপত্র নিয়ে যাত্রা করলাম। গুরুদেব ও অন্যান্য সকলে বাসে যাত্রা করলেন। ট্রেনে প্রচণ্ড ভীড় থাকায় হাওড়ার বুকিং বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, ফলে আমাদের বাধ্য হয়ে খড়্গপুর পর্যন্ত টিকিট কাটতে হ'ল। এত মাল নিয়ে কেমন ক'রে অল্প সময়ে গুরুদেব ও অন্যান্যদের ট্রেনে উঠাব—এরজন্য দুর্ভাবনা হ'ল। কিন্তু যাঁকে "ভাবিলে ভাবনা যাবে", সেই ভবভয়হারী পারের কাণ্ডারী স্বয়ং শ্রীগুরুদেব সঙ্গে থাকতে আর ভাবনা কী? হ'লও তাই। মালপত্র নিয়ে তিনটি দলে আমরা বিভক্ত হলাম। তারপর ট্রেন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করামাত্র, বিচ্ছিন্নভাবে আমরা ট্রেনে উঠে পড়লাম। আমি অবশ্য গুরুদেবের সঙ্গে, তিনি যে-কামরায় উঠলেন, সেই কামরাতেই উঠে পড়লাম। ভীড় ছিল বটে, তবে সেই কামরাতেই গুরুদেবের শিষ্য একজন মাদ্রাজী রেলওয়ে অফিসার ভেঙ্কটরাম নাইডু দৈবক্রমে উপস্থিত ছিলেন। তিনি গুরুদেবকে খুব খাতির যত্ন করলেন। গুরুদেবের কোনো অসুবিধাই হ'ল না। গভীর রাতে খড়্গপুরে এক্সপ্রেস পৌঁছাল। আমি প্ল্যাটফর্মে নেমেই নিতাইদাদাকে ডাকতে লাগলাম। দেখি তিনি তো এসেছেনই, তা ছাড়া আরো বহু ভক্ত ও শিষ্য উপস্থিত হয়ে গুরুদেবকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের প্রণাম নিতে এবং হরিলুট বিতরণ করতে করতে প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে গুরুদেব খড়্গপুর থেকে যাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে আমাদের হাওড়ার টিকিট কেটে এনেছেন দুর্গানাথ বাবু। রামরাজাতলায় এসে ট্রেন থামলে অন্য কামরা থেকে কমলা এসে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করল। তারপর হাওড়ায় পৌঁছে দেখি—প্ল্যাটফর্ম শিষ্য ও ভক্তে পরিপূর্ণ। গগনভেদী জয়ধ্বনির মধ্যে গুরুদেব অবতরণ করলেন। ভক্তগণের সঙ্গে সেদিন সে কী পুষ্প-সমারোহ! সেই সব বিবিধ মনোরম পুষ্পমাল্য

পরিয়ে দিলেন তাঁরা গুরুদেবকে। তারপর তাঁর খেলার জন্ম হরিরলুট এল—খাস্তা গুট্‌কে কচুরির ঝুড়ি। আজানুলম্বিত মাল্যশোভিত হয়ে গুরুদেব মুঠো মুঠো ক'রে কচুরির রাশি বিতরণ করতে লাগলেন শিষ্য-অশিষ্য ভক্ত-অভক্ত, যাত্রী, রেলওয়ে কর্মচারী, কুলিবৃন্দ, এমন কি পুলিশের লোককেও। কত কচুরির রাশি যে বিতরণ করলেন তার ইয়ত্তা নেই—কিন্তু আশ্চর্য্য, তবু কচুরি শেষ হয় না, যেন সেই মধুসূদন দাদার দইয়ের ভাণ্ড।

ভুবনেশ্বরে ট্রেনে উঠবার আগে দুর্ভাবনা হয়েছিল, ট্রেনে উঠেই সে দুশ্চিন্তার অবসান ঘটালেন গুরুদেব। বেশ ভালভাবেই বসতে পেরেছিলেন, তার উপর পেলেন একজন রেলওয়ে অফিসারের খাতির যত্ন। খড়্গপুরে এসে বহু শিষ্যের সশ্রদ্ধ ও ও সভক্তি অভ্যর্থনা পেলেন। আর হাওড়া ষ্টেশনে যা' পেলেন, তা' অবর্ণনীয়। সে কী বিপুল অভ্যর্থনা, সে কী স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। শিষ্য-অশিষ্য, ভক্ত-অভক্তের সে কী প্রাণমাতানো উন্মাদনা, পুষ্পসজ্জার সে কী সমারোহ, প্রসাদ-বিতরণের সে কী দাক্ষিণ্য! হঠাৎ এক আনন্দ-উন্মাদনার প্লাবন এল যেন সেই প্রভাতে হাওড়া ষ্টেশনে। সেই বন্যা উথলে উঠল আমাদের অন্তরলোকে এবং আমাদের হৃদয়পাত্রের কিনারা ছাপিয়ে বাইরের জনসাধারণকেও সে আনন্দবন্যা স্পর্শ ক'রে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

এমনি আনন্দতরঙ্গদোলায় দুলতে দুলতে গুরুদেবকে নিয়ে এসে বর্দ্ধমান লোক্যাল ট্রেনে তুলে দিলাম। আশ্চর্য্য! এখানেও দেখি, রয়েছেন আমাদের গুরুভ্রাতা রেলওয়ের একজন পদস্থ কর্মচারী, হাওড়ার Claims Inspector দয়ালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে সাগ্রহে ও সসম্মানে একটি একেবারে খালি সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় নিয়ে গিয়ে উঠালেন। সঙ্গে দুর্গানাথ বাবুও গেলেন। আমি থাকলাম নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দকে নবদ্বীপ নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়ে। ঠিক সময়েই ট্রেন ছাড়ল। আমাদের আকুল অশ্রু-সজল দৃষ্টির সমুখ দিয়ে গুরুদেব নেমারী যাত্রা করলেন।

অলৌকিক লীলা

শ্রীভগবান্ যখন এই প্রাকৃত বিশ্বে অবতীর্ণ হন, তখন ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীজনই তাঁর স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বিচার ক'রে তাঁকে জানতে পারেন। বস্তুতঃ, "অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার,' মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার। আকৃতি-প্রকৃতি—এই স্বরূপ লক্ষণ, কার্য্যদ্বারায় জ্ঞান—এই তটস্থ লক্ষণ।" —চৈঃ চঃ ২।২০। শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত তনুর কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞগণ সে সকল অবগত আছেন, ভগবান্ অবতীর্ণ হ'লে তাঁর অঙ্গে সেসব লক্ষণ দেখে তাঁরা বুঝতে পারেন যে ইনিই ভগবান্, কারণ সেসব লক্ষণ অন্য কোনো জীবে সম্ভবে না; তাঁর সমান কেউ হয় না, অধিক তো নয়ই "অতুল্যাতিশয়ৈঃ"—ভাঃ ১০।১০,৩৪। দ্বিতীয়তঃ তাঁর আচরণ-আদি অলৌকিক—দেহধারীদের মধ্যে যা' একান্ত দুর্লভ—"দেহিষু অসঙ্গতৈঃ বীর্য্যৈঃ"—ভাঃ ১০।১০,৩৪। তবে সেই সব অলৌকিক শক্তি তিনি অবতার কালে সব সময়েই প্রকাশ করেন না, "কভু তো লৌকিক রীতি যেন ইতর জন, কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন"—চৈঃ চঃ ৩।৮, "এমত অচিন্ত্যলীলা গৌরচন্দ্র করে, নবদ্বীপে সব ভক্ত সহিতে বিহরে"—চৈঃ ভাঃ ২।১৮, "অচিন্ত্যচরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ—ইথে তর্ক করি' কেহ না কর সংশয়, কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয়। অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার, চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্র ব্যবহার।" —চৈঃ চঃ ১।১৭। "প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব, অলৌকিক কর্ম, অলৌকিক অনুভাব"; কিন্তু তথাপি "দেখিয়াও না দেখে যত অভক্তের গণ, উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ—চৈঃ চঃ ১।৩। এ সকল অলৌকিক লক্ষণ ও গুণাবলী শ্রীপুরুষোত্তমেই পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তবে সিদ্ধ মহাপুরুষগণের অর্থাৎ ভগবদনুগৃহীত ভক্তগণের অঙ্গে ও আচরণে ভগবৎগুণের কিছু কিছু অংশ বিন্দুবিন্দুরূপে দৃষ্ট হয়—"জীবেষ্বপি বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্কচিৎ" —ভ, র, সি ১।২।১২। যেমন, তাঁরা ভগবানের মত সত্যসঙ্কল্প ও ত্রিকালজ্ঞ হন এবং তাঁদের আজ্ঞা ভগবদাজ্ঞার মত অমোঘ হয় "যথা সঙ্কল্পয়েৎ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্ ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাপ্নুতে। যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্, কুতশ্চিন্ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম। মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ, তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা"—ভাঃ ১১।১৫।২৬-২৮; অর্থাৎ মৎপরায়ণ ভক্ত সত্যসংকল্প আমাতে মন যোজনা ক'রে যখন যা' সঙ্কল্প করেন, তাই লাভ করেন, আমার আজ্ঞার ন্যায় তাঁর আজ্ঞা অমোঘ হয় এবং তিনি ত্রিকালজ্ঞ হন। আবার "বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ" এবং "মনো ময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনুবায়ুনা, মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ" —ভাঃ ১১।১৫।২০-২১, অর্থাৎ

তিনি দূর থেকে বিশ্বকে দর্শন করেন এবং শরীর ও মন অনুগামী বায়ু দ্বারা আমাতে ধারণা করার প্রভাবে, তাঁর মন যেখানে যায়, শরীরও সেখানে গমন করে। এর অর্থ এই যে তিনি একস্থানে ব'সেই বিশ্বের সর্ব্বত্র সব কিছু দর্শন করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে মন সহ দেহকে অন্যত্র আবির্ভাব-প্রকাশে স্থানান্তরিত করতে সমর্থ হন।

পাগলপ্রভুর 'আকৃতি-প্রকৃতি' বা স্বরূপলক্ষণের কথা অন্যত্র বিবৃত হয়েছে,—এক্ষণে তাঁর সমগ্রলীলাব্যাপী অগণিত অলৌকিকলীলা সমূহের মধ্যে, বিশাল বারিধি হ'তে কয়েকটি বারি-বিন্দু আহরণের মত, কয়েকটি মাত্র ঘটনা, যা' এই দীন দাসের ভাগ্যে স্বচক্ষে দর্শনলাভ হয়েছে, অথবা অন্যান্য বিশ্বস্ত ভক্তগণের মুখশ্রুত নির্ভরযোগ্য বিবরণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি,—তারই কিছু কিছু উদ্ধৃত করতে প্রয়াসী হব। তাঁর এই অলৌকিক লীলাবলীকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে :

(১) **ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ**—(ক) রেলের ইঞ্জিন বিকল ক'রে, অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে ইচ্ছামত ট্রেন থামানো ; (খ) সমস্ত ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাওয়া ; (গ) ক্যামেরা-লেন্সের সমুখে নিজেকে অদৃশ্য করা ; (ঘ) ক্যামেরার পর্দ্দায় অশরীরীর মূর্ত্তি প্রকাশ করানো।

(২) **ইচ্ছাশক্তিদ্বারা যে কোনো বস্তুপ্রাপ্তি**—(ক) এক গ্রাস অন্ন অফুরন্ত হওয়া ; (খ) শূন্যস্থানে পাওনাদারের পাওনা অর্থ ঠিক হিসাবমত প্রাপ্তি ; (গ) পৌষ মাসে শূন্যগুহায় ভক্তের বাসনাপূরণের জন্য পাকা লিচুর আবির্ভাব।

(৩) **ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজ শরীর নিয়ন্ত্রণ**—(ক) বিষাক্ত সর্পবিষ অন্যের দেহ হ'তে নিজ শরীরে গ্রহণ ও ভোগ ; (খ) বহু আর্ত্তের মারাত্মক ব্যাধি আপন দেহে গ্রহণ ও ভোগ ; (গ) ইচ্ছামত নিজের ওজন উল্লেখযোগ্য ভাবে কম ও বেশী করা। (ঘ) বিষাক্ত ওল ভক্ষণ।

(৪) **ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে অপরের শরীর নিয়ন্ত্রণ**—(ক) ইচ্ছামত বহু রোগীর রোগ আরোগ্য ; (খ) আত্মসমর্পিত ভক্তের নিশ্চিত মৃত্যু ফাঁড়া হ'তে উদ্ধার।

(৫) **ইচ্ছামত অপরের মন নিয়ন্ত্রণ**—(ক) গোমো আশ্রমে অনুসন্ধানকারী C. I. D. Inspector মুগ্ধ হয়ে যাওয়া ; (খ) কলকাতা বড়বাজারের দুর্দ্দান্ত 'সখি' গুণ্ডার মন পরিবর্ত্তন ; (গ) ভক্ত সাধকের চিত্তে অপ্রাকৃত ভাবরাজ্যের আবির্ভাব ; (ঘ) বহু দর্শনার্থীর মন পরিবর্ত্তন।

(৬) **ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ইতর প্রাণী বশীকরণ**—(ক) ব্যাঘ্র-হরিণ-শৃগালাদির একসাথে সেবন, অর্থাৎ তাঁর প্রদত্ত প্রসিদ্ধ 'শিবা-ভোগ' ; (খ) নিঃশঙ্ক আশ্রমে ব্যাঘ্র নিয়ে খেলা ; (গ) গুহাশ্রমে বিষাক্ত গোখুরা সাপ, ইঁদুর, বিড়াল সহ ক্রীড়া।

(৭) **ইচ্ছাশক্তিদ্বারা প্রেতাত্মা দর্শন করানো**—(ক) নিঃশঙ্ক আশ্রমে রঘুনাথ

দাদা ; (খ) গোমো আশ্রমে অশ্বিনীদাদা ; (গ) নবদ্বীপ গুহাশ্রমে নলিন মুখার্জ দাদা।

(৮) **ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করা**—(ক) বর্দ্ধমান ষ্টেশনে মাল-বিভ্রাট, অনুরূপ ঘটনা পুরী ষ্টেশনে ; (খ) নবদ্বীপ মণিপুর আশ্রম থেকে কলমগাছ চোরের মোহপ্রাপ্তি।

(৯) **ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে প্রাকৃতিক শক্তি-নিয়ন্ত্রণ**—(ক) নিঃশঙ্ক আশ্রমে ঝড়বৃষ্টিকে গণ্ডী বেঁধে দেওয়া ; (খ) গোমো আশ্রমে আগুন নেভানো : (গ) অনুরূপ ঘটনা মতিহারীতে।

(১০) **জ্ঞানী-গুণী জনের বিমুগ্ধ হওয়া**—(ক) মন্ত্রী ব্যোমকেশবাবু ; (খ) ষ্টেশন মাষ্টার আলেকজাণ্ডার সাহেব ; (গ) তান্ত্রিকসাধু ; (ঘ) হিপনটিষ্ট ; (ঙ) ম্যাজিসিয়ন রামবাবু ; (চ) সঙ্গীতজ্ঞ দাসুবাবু।

(১১) **অন্তর্দৃষ্টি বা ত্রিকালজ্ঞত্ব**—(ক) বর্ত্তমান, অর্থাৎ অন্তর্য্যামিত্ব ; (খ) অতীত ; এর উদাহরণ বহু শিষ্য ও অশিষ্যের পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জ্ঞাপন, জাতিস্মরতা ক্ষমতা দান ; (গ) ভবিষ্যৎ—বহু ভক্তের জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী, সতর্কীকরণ, বিশেষতঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে দয়া।

(১২) **দূরদৃষ্টি**—আশ্রমে নিজ আসনে ব'সে ভক্ত শিষ্যদের ক্রিয়াকলাপ দর্শন ; সংবাদ না দিয়ে হঠাৎ আগমনরত শিষ্যদের জন্য প্রস্তুতি ; ষ্টেশনে ট্রেনের স্থিতি-গতি দর্শন ও সেই মত নির্দ্দেশ। অন্ধকারে পথহারা শিষ্যগণের সমুখে আলোক-দান ও হরিধ্বনি শ্রবণ করানো।

(১৩) **বাক্‌সিদ্ধি, অর্থাৎ তাঁর বাক্য বা আজ্ঞামত কার্য্য হবেই হবে**—(ক) মুস্কিল-আসান, অর্থাৎ যে কোনো সমস্যাপীড়িত ব্যক্তি কোনো সমস্যা তাঁর কাছে নিবেদন করলে, তার সমাধান অবশ্যম্ভাবী ; (খ) শান্তিদান, অর্থাৎ অশান্তিক্লিষ্ট নরনারী তাঁর সমুখে এসে বসলেই পরমশান্তিলাভ করবে ; (গ) আনন্দদান, তাঁর কাছে এলেই কিছু না কিছু আনন্দ পাওয়া যাবে ; (ঘ) অপ্রাকৃত ভাব রাজ্যে প্রবেশ—ভক্ত সাধক তাঁর সেবা ক'রে তাঁর কৃপায় অপ্রাকৃত ভাব লাভ করেছেন।

(১৪) **আবির্ভাব-মূর্ত্তিতে প্রকাশ ও বাক্যালাপ**—(ক) বৈদ্যবাটিতে রাজেনদাদা ; (খ) কলকাতায় অশ্বিনীদাদা, (গ) কলকাতায় হৃষীদাদা ; (ঘ) টিটিলাগড়ে কমলা।

(১৫) **অলৌকিক ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি দর্শন-দান**—(ক) নবদ্বীপে মদনদাদা, (খ) নবদ্বীপে মাষ্টারদাদা, (গ) গোমোয় সুরেন রায়, (ঘ) নবদ্বীপে সনাতনী মা (ঙ) নবদ্বীপে বামুন মা (চ) নবদ্বীপে রাণীমা ও ভেঁচুর মা (ছ) স্বপ্নে কমলা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে নরহরিপ্রভুর সমস্ত লীলাই মুখ্যতঃ মাধুর্য্য-মণ্ডিত। এই মাধুর্য্যময়ী লীলায়, কোনো কোনো স্থলে, লীলার পুষ্টিসাধনের জন্য ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হয়েছে; ঠিক যেমন অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলাকে বহুস্থলে প্রয়োজন মত ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করেছেন। পরন্তু এতে তাঁর লীলার মাধুর্য্য কোনোক্রমেই খণ্ডিত হয়নি, বরং সেই মাধুর্য্য আরো মহিমময় হ'য়ে উঠেছে। নিছক ঐশ্বর্য্য প্রকাশের জন্য কখনও তাঁর অলৌকিক লীলাবলীর প্রকাশ হয়নি, তাঁর মাধুর্য্যময়ী ক্রীড়ার সহায়ক ও পরিপূরকরূপেই যোগমায়া কর্তৃক এই সব ঐশ্বর্য্যের প্রকটীকরণ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মাধুর্য্যই 'ভগবত্তা সার'-চৈঃ চঃ ২।২১, এবং সেই মাধুর্য্য হ'ল সর্ব্বাবস্থায় লীলা-চরিত্রের চারুতা, ও কায়মনোবাক্যে সকল চেষ্টার মনোহারিত্ব—"মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা"—উঃ নীঃ মঃ—৩।৬৪।

পাতালপ্রভুর মাধুর্য্য-লীলা-পুষ্টি অনুরোধে যে সকল ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হয়েছে, তার মধ্যে (১) গোমো ষ্টেশনে সব ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাওয়া, (২) তান্ত্রিক সাধুর দিব্য দর্শন, (৩) পশ্চিমা সাধুর 'রামজী' দর্শন, (৪) সুরেন রায়ের চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি-দর্শন (৫) হিপনটিষ্টের মূর্চ্ছা, (৬) নবদ্বীপে আমার পুলিশ-বিভ্রাট, (৭) বর্দ্ধমান ও পুরীষ্টেশনে মাল-বিভ্রাট, (৮) ভূতের ফটো উঠা, (৯) গুরুদেবের যুগপৎ ভারী ও হাল্কা হওয়া—এগুলি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য লীলাগুলি এবারে যথাসাধ্য বিবৃত করতে চেষ্টা করব।

(১) ইচ্ছাশক্তিদ্বারা যন্ত্র-নিয়ন্ত্রণ; ইচ্ছামত ট্রেন থামানো: মানুষের ইচ্ছামত চলন্ত ট্রেন থামানো যায়—একথা যদি আমি বলি, তবে এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে কেউ বিশ্বাস করবে? কোন মানুষের ইচ্ছাশক্তি যে যন্ত্রের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে, এটা আমিও কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না, যদি না আমাদের গুরুদেবের কাছে আমি নিজে তা' প্রত্যক্ষ করতাম। বিভিন্ন ভক্তদের মুখে বিভিন্ন সূত্রে এইরূপ বহু ঘটনার কথা আমি শুনেছি; তাঁরা সকলেই যে পরস্পর যুক্তি ক'রে গুরুদেবের মহিমা বাড়ানোর জন্য সাজিয়ে এসব বলেছেন, তা' হ'তে পারে না; কারণ এ সব ভক্তদের মধ্যে পরস্পর যোগসূত্র তো নেই-ই, এমনকি অনেকে অনেককে চেনেন ও না, এবং যাঁরা আমাদের শিষ্যই নন, এমন বাইরের লোকের মুখেও এসব ঘটনা শুনেছি। কিন্তু আপনারা জানেন, আমি মূলতঃ একজন গোঁড়া বাস্তববাদী বৈজ্ঞানিক, এবং যাকে বলা যায় ঘোর 'নাস্তিক'। বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা নেই—এমন কোনো কথা, কোনো ঘটনা আমি অন্তরের সঙ্গে মানতে পারিনি। একথা আমার অন্তর্য্যামী প্রভু জানতেন, বেশ ভাল করেই জানতেন—তাই বারে বারে আমাদের এই স্বল্প পরিসর, অতি সীমাবদ্ধ বস্তু-বিজ্ঞানের বেড়াজাল ভেঙে, মহত্তর ও উচ্চতর

অবস্তু-বিজ্ঞানের অসীম পরিধির মহাতেজোময় শক্তি বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ক্ষণিকমাত্র দর্শন করিয়ে এই ঘোর 'নাস্তিক'কে আস্তিক করেছেন, এবং আমাদের অতি ক্ষুদ্র, সামান্য বস্তু-বিজ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি যদি গুরুদেবের সাহচর্যে না আসতাম, তাঁর কিঞ্চিৎ কৃপালাভ ক'রে সেই অবস্তু-বিজ্ঞান-জগতের ক্ষণিক দর্শনও না পেতাম, তবে হয়তো জগতের অন্যান্য লক্ষ লক্ষ তথাকথিত বস্তুবিজ্ঞানাভিমানীর মত আমিও এসব জিনিব নিছক 'গাঁজাখুরি' ব'লে হেসে উড়িয়ে দিতাম।

সাধারণ প্যাসেঞ্জার, অথবা এক্সপ্রেস, এমন কি মেল ট্রেন—যে ট্রেনেই গুরুদেব ভ্রমণ করুন না কেন, সে ট্রেনের গতিবিধি তাঁর ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত হবেই—একথা তাঁর একান্ত ভক্তগণ জানতেন। তবে লোক-দেখানোর জন্য সব ট্রেনই যে তিনি নিয়ন্ত্রিত করতেন, তা নয়; তাঁর লীলা-অনুরোধে বিশেষ প্রয়োজন হ'লেই সে-ট্রেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হ'ত। আবার অনেক সময়ে নিজে ট্রেনের যাত্রী না হয়েও, আশ্রমে নিজ আসনে ব'সেই কোনো ভক্ত শিষ্যের জন্য ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। এরূপ বহু ঘটনার কথা বহু শিষ্যের মুখে শুনেছি, এখানে তার দু'একটি মাত্র বিবৃত করব।

সন ১৩৩২ সাল ৭ই চৈত্র রবিবার ইং ২১শে মার্চ ১৯২৬ সালে শ্রীগুরুদেব নবদ্বীপ থেকে গোমো রওনা হলেন। গোমো যাওয়ার পথে আসানসোলে বম্বে মেলে উঠলেন। ধানবাদ থেকে ট্রেন ছাড়ার পরই গুরুদেব সচকিত হয়ে সঙ্গী শিষ্যকে একবার শুধালেন, "বাবা, রাধাশ্যামবাবা তেঁতুলমারির ষ্টেশনমাষ্টার, না?" শিষ্যটি বললেন, "আজ্ঞে, হ্যাঁ"। গুরুদেব বললেন, "তা' হ'লে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে 'রাধাশ্যামদাদা রাধাশ্যাম দাদা' ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকো।" শিষ্যটি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, "আজ্ঞে, এটি মেল ট্রেন, তেঁতুলমারি ষ্টেশনে তো এ ট্রেনটি থামবে না, একেবারে গোমো গিয়ে থামবে।" গুরুদেব তা' শুনে একটু বিরক্ত হ'য়েই বললেন, "আঃ, তা' হোক না কেন; তুমি খুব জোরে চীৎকার ক'রে ডাকো যাতে শুনতে পায়।" এটা যে একেবারেই 'ছেলেমানুষী' হচ্ছে, তা' যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি বুঝতে পারেন। একে তো মেল ট্রেন থামবে না ঐ ছোট ষ্টেশনে; তারপর এ হচ্ছে চলন্ত ট্রেন, আর সেই 'রাধাশ্যামদাদা' আছেন এখান থেকে তিন চার মাইল দূরবর্তী রেল কোয়ার্টার্সে (রাত্রে ষ্টেশনমাষ্টার নিজ বাসায় থাকেন)। এখান থেকে তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে ডাকা যাতে তিনি শুনতে পান—এরূপ কথা নেহাৎ শিশু, অজ্ঞান বা পাগল ছাড়া কেউ বলবে না। এমন অসম্ভব আদেশ শুনেও শিষ্যটি গুরুদেবের আজ্ঞামত 'রাধাশ্যামদাদা' ব'লে যথাসম্ভব চীৎকার ক'রে জানালার বাইরে গলা বাড়িয়ে ডাকতে লাগলেন। ডাকতে ডাকতে একটু থামলেই গুরুদেব বলতে লাগলেন, "আঃ থেমোনা; ডাকো, আরো

জোরে, আরো চীৎকার ক'রে ডাকো—যাতে শুনতে পায়।" শিষ্যটিও তাঁর আদেশমত রীতিমত চীৎকার ক'রে রাধাশ্যামদাদাকে ডাকতে লাগলেন। কয়েক মিনিট মাত্র—মেল ট্রেন তেঁতুলমারী ষ্টেশনে এসে পৌছাল। গাড়ী পূর্ণ গতিবেগেই চলেছে, আর শিষ্যটিও ডেকে চলেছেন—'রাধাশ্যামদাদা, রাধাশ্যামদাদা।' গাড়ী প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করল,—এমন সময় একী! হঠাৎ এক ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ী থেমে গেল ঠিক প্ল্যাটফর্মে। তখনো শিষ্যটির ডাকের বিরাম নেই—'রাধাশ্যামদাদা, রাধাশ্যামদাদা'—সহসা প্ল্যাটফর্ম থেকে উত্তর এল, "হ্যাঁ, এই যে আমি:" একথা কে বল্লে? স্বয়ং রাধাশ্যামদাদাই তো—গুরুদেবের কামরাটি ঠিক যেখানে থেমে পড়েছিল, সেইখানে প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে রাধাশ্যামদাদাই বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে বলছেন, "কে ডাকে? হ্যাঁ, এই যে আমি।" শিষ্যটি তখন চীৎকার ক'রে বললেন, "গুরুদেব, গুরুদেব, যাচ্ছেন এই গাড়ীতে।" "গুরুদেব!"—ব'লে আনন্দে, বিস্ময়ে রাধাশ্যামদাদা একলাফে কামরায় উঠে এসে গুরুদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হলেন। তারপর গুরুদেব তাঁর সঙ্গে যা' কিছু তাঁর প্রয়োজন ছিল সেই মত সব কথাবার্ত্তা বললেন। শেষে হরি-লুট দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। ট্রেনও আবার চলতে শুরু করল—হঠাৎ কলটা বিগড়ে গিয়েছিল!

এ সম্বন্ধে পরে রাধাশ্যামদাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে জানা গিয়েছে যে উক্ত রাত্রে তিনি যথারীতি খাওয়া-দাওয়া ক'রে শুয়েছেন, এমন সময়ে তন্দ্রাঘোরে দেখেন কিনা—গুরুদেব তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকছেন। ছাঁৎ ক'রে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। মনটা ভাল লাগল না। গুরুদেবের দর্শন অনেকদিন হয়নি। কবে গোমো আসবেন তারও কোনো সংবাদ পাননি—তাই তন্দ্রাঘোরে গুরুদেবকে ডাকতে দেখে তাঁর জন্য বড়ই মন কেমন করতে লাগল। গরমে ঘুমও আসছে না, তাই ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন। ঠিক ঐ সময়েই মেলটি ওখানে pass করার কথা। কিন্তু আজ কী জানি কেন মেলটি হঠাৎ প্ল্যাটফর্মে থেমে গেল এবং যেখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক তার সামনের গাড়ীতেই রয়েছেন গুরুদেব এবং তাঁর দুর্ব্বোধ্য নির্দ্দেশে তার শিষ্যটি তাকেই নাম ধ'রে ডেকে চলেছেন।

রাধাশ্যামদাদার মুখে এ কথা শুনে আমরা সবাই স্তম্ভিত হলাম। গুরুদেব তাঁর ইচ্ছামাত্র রাধাশ্যামদাদাকে তন্দ্রাঘোরে দর্শন দিয়ে আহ্বান ক'রে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্মে আনিয়েছেন এবং ঠিক তাঁর সমুখে এসে ইচ্ছামত এঞ্জিন বিকল ক'রে ট্রেন থামিয়েছেন। শিষ্যটি অবিরাম চীৎকার ক'রে না ডাকলে রাধাশ্যামদাদা শুনতে পেতেন না বা জানতেও পারতেন না—এইজন্যই গুরুদেবের পূর্ব্বোক্ত ঐরূপ পাগলের মত আদেশ—অবিরাম চীৎকার ক'রে ডেকে যাও। লোক দেখানোর জন্য তিনি ট্রেন থামান নি; লীলা-অনুরোধে যোগমায়া-সৃষ্ট এই অঘটন-ঘটনা।

এরূপ ঘটনা হামেশাই ঘটেছে—বহু শিষ্যের নিকট বহু রকম বৃত্তান্ত শুনেছি। শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, আমাদের গুরুদেবের কাছে এটা আদৌ একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, বরং গুরুদেব ট্রেনে উঠলে সে-ট্রেনের গতি তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে এটাই স্বাভাবিক ধ'রে নিয়েছিলাম আমরা। সেসব অগণিত ঘটনার একটিমাত্র বিবৃত করলাম। কিন্তু শিষ্য নন, অথচ গুরুদেবকে কিছুটা জানেন, এমন একজন ব্যক্তির মুখে এইরূপ ট্রেন বিপর্যয়ের কাহিনী যা' শুনেছি তা' এবার বলব।

ঘটনাস্থল ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন। গুরুদেব মেমারী থেকে নবদ্বীপ আসছেন। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে গাড়ী বদল ক'রে নবদ্বীপের ট্রেনে উঠলেন। ভক্তরা গুরুদেবকে ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কেটে দিয়েছিলেন, সুতরাং গুরুদেবকে নিয়ে তাঁর সঙ্গী শিষ্য কাটোয়া লোক্যালের একটি ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় উঠলেন। সেই কামরায় একজন ফিরিঙ্গী সাহেব যাত্রী ছিল। সেটা ব্রিটিশ আমল—ফিরিঙ্গী সাহেবদের দুর্দান্ত প্রতাপ। কাজেই একজন ছেঁড়া চট্ গায়ে দেওয়া সাধু ফকীরকে তারা স্বীয় কামরায় সহ্য করবে কেন? তীব্র ভর্ৎসনা ক'রে সেই সাহেব গুরুদেবকে সেই কামরা থেকে নামিয়ে দিয়েছে। গুরুদেবও নীরবে নিঃশব্দে গাড়ী থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের এক কোণে একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেন। এদিকে ট্রেন ছাড়ার সময় হ'ল, গাড়ির হুইসিল হ'ল এবং সবুজ নিশানও উড়তে লাগল। ড্রাইভার এঞ্জিন চালাবার জন্য কল ঘুরালেন —কিন্তু একী! এঞ্জিন চলে না। ড্রাইভার বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু অবশেষে হতাশ হয়ে নেমে এসে গার্ডকে সংবাদ দিতে এলেন; গার্ডও বিলম্ব দেখে এদিকেই আসছিলেন। পথিমধ্যে ড্রাইভারের কাছে সব শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেন। অবশেষে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে সংবাদ দিতে গেলেন দু'জনে। ষ্টেশনমাষ্টার সব শুনে প্রয়োজনীয় expert staff সঙ্গে নিয়ে এঞ্জিনে এলেন। কিন্তু সকলের সব চেষ্টা নিষ্ফল হ'ল। তখন ষ্টেশন মাষ্টার অর্ডার দিলেন যে লোকো-শেড থেকে একটি নতুন এঞ্জিন আনিয়ে ট্রেনে লাগানো হোক এবং পুরাতন এঞ্জিনটি মেরামতের জন্য লোকো-শেডে রক্ষিত হোক। সেইমত কাজ করা হ'ল। নতুন এঞ্জিন এনে লাগানো হ'ল ট্রেনে। এইবার গার্ড পুনরায় হুইসিল দিলেন ট্রেন ছাড়বার জন্য, কিন্তু সকলকে হতচকিত ক'রে এ এঞ্জিনও বিকল হয়ে গেল। কিছুতেই চালানো গেল না তাকে। সব দেখে শুনে ড্রাইভার ও গার্ড হতাশ হয়ে পড়লেন। ট্রেনভরা যাত্রী নেমে এসে এঞ্জিনের কাছে ভীড় করল, আর বিমূঢ় ষ্টেশনমাষ্টার মশায় মাথার ঘাম মুছতে মুছতে ধীরপদক্ষেপে নিজ অফিসের দিকে যাত্রা করলেন। প্ল্যাটফর্মে যেতে যেতে হঠাৎ ষ্টেশনমাষ্টার মশায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ হ'ল প্ল্যাটফর্মস্থিত একটি বৃক্ষতলে। ঐ গাছের তলায় মুদিত নয়নে ব'সে আছেন— উনি কে? বহু বিখ্যাত মহাশক্তিশালী, সিদ্ধ মহাপুরুষ 'পাতাল বাবা' না? মাষ্টার

মশায় থমকে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখে নিলেন—হ্যাঁ, ছেঁড়া চট্ গায়ে তিনিই তো। মাষ্টারমশায় পাতাল বাবাকে জানতেন, অবগত ছিলেন তাঁর অসীম শক্তি ও অলৌকিক লীলার কথা, পেয়েছিলেন তাঁর অপূর্ব্ব মহিমা ও করুণার পরিচয়। নিমেষমাত্র। পর মুহূর্ত্তেই তিনি ছুটে এলেন তাঁর কাছে, পায়ের জুতা খুলে খালি পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর করযোড়ে বিনীতভাবে বললেন, "সাধুবাবা, আপনি এখানে? এখানে একাকী এমনভাবে গাছতলায় ব'সে কেন? গুরুদেবও করযোড়ে তাঁকে অভিবাদন ক'রে প্রচুর হরিলুট মিষ্টান্ন দিলেন। মাষ্টার মশায় নতমস্তকে সেই হরিলুট গ্রহণ করলে সঙ্গের শিষ্যটি বললেন, "গুরুদেব নবদ্বীপ যাবেন, তাই—।" মাষ্টারমশায় বললেন, "এই তো নবদ্বীপের ট্রেন, তা' আপনি এখানে ব'সে কেন?" তখন শিষ্যটি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল। গভীর মনোযোগের সহিত মাষ্টারমশায় সব কথা শুনলেন, তারপর শিষ্যটিকে টিকিট দুটি দেখাতে বললেন। শিষ্যটি টিকিট দুটি দেখাতে মাষ্টারমশায় সে দু'টি নিয়ে করযোড়ে গুরুদেবের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি দয়া ক'রে আমার সঙ্গে আসুন।" তারপর সেই নির্দ্দিষ্ট ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় উঠে সেই ফিরিঙ্গী সাহেবকে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় ভৎর্সনা করলেন, গুরুদেবকে অপমান ক'রে নামিয়ে দেবার জন্য। আইনতঃ সেই ফিরিঙ্গী অপরাধ তো করেছেই, তার উপর এমন একজন মহাশক্তিশালী মহাপুরুষের নিকট অপরাধ হয়েছে, যাঁর ইচ্ছায় যে কোনো অঘটন ঘটতে পারে—যেমন আজ এই ট্রেনের এঞ্জিনের ঘটেছে। তারপর সংক্ষেপে তাঁর শক্তির মহিমা বিবৃত ক'রে বললেন, "এঁকে তুষ্ট করতে পারলে, জগতে সব দিকেই সুমঙ্গল হয়, আর ইনি রুষ্ট হ'লে কেউ পরিত্রাণ করতে পারে না। অতএব কাল বিলম্ব না ক'রে তুমি এঁর কাছে ক্ষমা চাও, নইলে তোমার নিস্তার নেই, এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও। এঁর প্রতি তোমার অবমাননার জন্যই আজ আমাদের এই চূড়ান্ত লাঞ্ছনা, এই এঞ্জিন বিকল।" তখন সেই ফিরিঙ্গী করযোড়ে গুরুদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সাদরে তাঁকে সেই কামরায় বসতে আহ্বান জানাল। মাষ্টার মশায়ও গুরুদেব ও তাঁর সঙ্গীকে সেই কামরায় বসিয়ে প্রণাম ক'রে আনন্দে নেমে গেলেন।

ষ্টেশনমাষ্টার ছুটলেন, ছুটে এলেন এঞ্জিনের কাছে। সোল্লাসে ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি চলে যান আপনার আগেকার এঞ্জিনে," তারপর জোর দিয়ে বললেন, "আমি বলছি, সেই এঞ্জিনই চলবে।" হতচকিত ড্রাইভার তখন তার পূর্ব্বের এঞ্জিনে গিয়ে কল ঘুরাতেই এঞ্জিন চালু হ'ল। এদিকে নতুন এঞ্জিনও আবার চালু হ'ল; তাকে যথাস্থানে রেখে এসে পুরাতন এঞ্জিন আবার এসে ট্রেনে লাগল এবং সকলের মনে আনন্দ-বিস্ময়ের তরঙ্গ তুলে ট্রেন ছেড়ে দিল।

উপরোক্ত ট্রেনের যাত্রী আমার বন্ধু একজন শিক্ষিত গ্রাজুয়েট শিক্ষকের মুখে এই কাহিনী আমি শুনেছি।

যন্ত্রের উপর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের যেমন বস্তুবিজ্ঞানে কোনো ব্যাখ্যা নেই, ক্যামেরার চোখকে ফাঁকি দেওয়াও তেমনি পদার্থবিদ্যার বিস্ময় এবং কলেরা-রোগীকে বাসি ভাত-তরকারী, কাঁঠাল ও পুরাতন অজীর্ণ-রোগীকে বাসি চানাচুর, বাদাম, ফুলুরি বেগুনি প্রচুর পরিমাণে খাইয়ে, অথবা ভীষণভাবে জ্বরাক্রান্ত রোগীকে পচা পান্তা ভাত পেট ভরিয়ে ভোজন করিয়ে সম্পূর্ণ নিরাময় করার দৃষ্টান্তও চিকিৎসাশাস্ত্রের কল্পনার বহির্ভূত। এসব ঘটনা আশ্রমে এত বেশী ঘটেছে, যে আমরা এসবে আর মোটেই আশ্চর্য্য হতাম না। শুধু জানতাম, তিনি ইচ্ছাময়, যা' ইচ্ছা করবেন তাই হবে।

কিন্তু আমাদের ইচ্ছায় যে এসব কিছুই হয় না, তাও ভাল ক'রেই জানতাম। আগেই বলেছি, লোক-দেখানোর জন্য, কাউকে চমক লাগানোর উদ্দেশ্যে, বা নাম জাহির করবার নিমিত্ত, অথবা কোনো বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তির প্রার্থনায়, অনুরোধ বা চাপে প'ড়ে—এসব কাজ প্রভু কখনো করতেন না। এসবই ঘটত তাঁর লীলা-অনুরোধে—যে-লীলা ছিল মধুর হ'তে মধুর। কিন্তু তবু ক্ষুদ্র জীব আমরা, আমাদেরও ইচ্ছা হয় বৈকি। মাঝে মাঝে মনে হ'ত—আজ যদি এমন ঘটত! তা' হলে আমি নিজে বেশ দেখতে পেতাম সেই অলৌকিক লীলা। যা' অপরের মুখে শুনেছি, তা' নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম, উপলব্ধি করতাম, স্বয়ং জড়িত থাকতাম সেই লীলার মধ্যে। তিনি তো ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করলে সবই পারেন; দেখান না কেন আজ এইরূপ লীলা। কিন্তু তা' হ'ত না। কোথায় ক্ষুদ্র জীব আমি, আর কোথায় লীলাময় প্রভু। কিন্তু তবু ভক্তের আন্তরিক আবেদন বৃথা যায় না; ভগবান্ তা' শোনেন। এবং যখন সে-আবেদনের তীব্রতা একেবারে চরমে উপস্থিত হয়, তখনই তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হয়। পূর্ব্বেই বলেছি, আমি মূলতঃ একজন বস্তুবিজ্ঞানাভিমানী। সব ঘটনাই বস্তুবিজ্ঞানের মাপ-কাঠিতে মেপে দেখবার চেষ্টা করি, যদিও বারে বারে তিনি তা-বস্তুবিজ্ঞানের অসীম পরিধির দুর্জ্ঞেয় শক্তির বিদ্যুৎ-ঝলসানো আলোক-দীপ্তি ক্ষণিকমাত্র-দর্শন করিয়ে আমাকে চৈতন্য দিয়েছেন, তবু বার বার আমি সে দুর্জ্ঞেয় শক্তির কথা বিস্মৃত হয়েছি—এবং আবার তিনি কৃপা ক'রে সে শক্তির দর্শনদানে আমাকে চমৎকৃত ও ধন্য করেছেন।

যদিও বহুবার বহু ভক্তের মুখে শুনেছি, গুরুদেব ইচ্ছামাত্র ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তবু আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে একটা ঔৎসুক্য ছিল নিজে তা' প্রত্যক্ষ করবার। আমি তো গুরুদেবের সঙ্গে ট্রেনে ভ্রমণ করি, কৈ, আমার ভাগ্যে তো এমন অলৌকিক লীলার দর্শনলাভ ঘটে না। যদি ঘটত, বেশ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হ'ত

আমার। এটা আমার একটা ফাঁকা ঔৎসুক্যমাত্র ছিল না; ট্রেনে উঠেই এ কথা আমি ভাবতাম এবং গভীর ভাবেই ভাবতাম। গুরুদেবকে কেমন ক'রে স্বচ্ছন্দে ও আরামে ট্রেনে ভ্রমণ করানো যায়, তার জন্য আমি সর্ব্বভাবে প্রাণপণে চেষ্টা করতাম। তাঁর সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্ব্বদা আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। একথা তিনি জানতেন এবং জানতেন ব'লেই ট্রেনে উঠে আমার সব কথা শুনতেন। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমার দৃষ্টি কত সূক্ষ্ম ছিল এবং আমার প্রচেষ্টা কত গভীর ও আন্তরিক ছিল, তা' একমাত্র তিনিই জানতেন। তাই ট্রেনে উঠে আমি যা' বলতাম তিনি সেইমতই কাজ করতেন, বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করতেন না। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমার প্রচেষ্টার এই সুগভীর আন্তরিকতার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রায় জীবন-মরণ-সমস্যার সন্ধিক্ষণে সেই লীলাময় প্রভু, সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ একদিন তাঁর ভক্তের একান্ত-বাঞ্ছিত বাসনা পূর্ণ ক'রে তাঁর অলৌকিক ও অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করলেন। স্থান—ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন। উক্ত ষ্টেশনে ট্রেন পরিবর্ত্তন ক'রে গুরুদেব নবদ্বীপ আসছিলেন। গুরুদেবের সঙ্গে পুরুষ সঙ্গী আমি একাই ছিলাম। নবদ্বীপের ট্রেন এলে দেখা গেল ট্রেনে অত্যন্ত ভীড়। সামনের একটি কামরায় গুরুদেবকে নিয়ে উঠলাম এবং অনেক কষ্টে, অনেক অনুনয় বিনয় ও হাতযোড় ক'রে একটু জায়গা করিয়ে নিয়ে গুরুদেবকে বসালাম। কিন্তু গুরুদেবের পাশে উপবিষ্ট লোকগুলির এতটুকুও ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না; তারা গুরুদেবকে তাচ্ছিল্য ক'রে এমনভাবে তাঁকে চেপে বসল যে গুরুদেব খুব কষ্ট ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাদের বলতে গিয়ে আমি অপমানিত হলাম এবং গুরুদেবও ইঙ্গিতে আমাকে কিছু বলতে নিষেধ করলেন। আমি তখন নিরুপায় ও কিছুটা বিরক্ত হয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলাম—দেখি যদি অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত খালি কামরা থাকে—এই সঙ্কল্প নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে বেশ কিছুটা দূরে ইঞ্জিনের প্রায় কাছাকাছি একটা বেশ খালি কামরা দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম গুরুদেবের কাছে। তাঁকে উঠতে বললাম। তিনিও আমার ইঙ্গিত মাত্রেই আমার সঙ্গে নেমে এলেন প্ল্যাটফর্মে। গুরুদেব আমার পিছু পিছু চলতে লাগলেন। আমিও দ্রুত পদক্ষেপে এগোতে লাগলাম। আমরা পূর্বে ছিলাম গার্ডের গাড়ীর কাছেই, এবং যে-গাড়ীর উদ্দেশে এখন যাচ্ছি, এটা একেবারে ইঞ্জিনের কাছে। কাজেই অনেকদূর হাঁটতে হবে। এদিকে আমরা যখন পূর্ব্বের কামরা থেকে নেমেছি, তখনই গার্ড গাড়ী থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই গাড়ী ছাড়ার হুইসিল দিচ্ছিলেন এবং সবুজ আলোর লণ্ঠন দোলাচ্ছিলেন। আমরা যখন প্ল্যাটফর্মে চলেছি, তখনই ট্রেন চলতে শুরু করেছে। এদিকে আমাদের উদ্দিষ্ট কামরা এখনও অনেক দূরে। আমি ছুটছি এবং কেবলই পিছনপানে চেয়ে বলছি, "বাবা, একটু

তাড়াতাড়ি আসুন।" গুরুদেবও আমার সঙ্গে ছুটছেন প্রাণপণে, কিন্তু গাড়ীর গতিবেগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কী করি, কী করি—আতঙ্কিত হয়ে আমি প্রাণপণে ছুটছি এবং কেবলই পিছনপানে চেয়ে বলছি, "গুরুদেব, গুরুদেব, তাড়াতাড়ি—আরো জোরে জোরে ছুটুন।" আতঙ্কে আমার প্রাণ শিউরে উঠছে! আমি গুরুদেবকে নিয়ে এইভাবে চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে ছুটছি, ট্রেনের গতি বেড়ে যাচ্ছে; আমাদের সেই কামরা এখনও একটু দূরে,—কিন্তু সেই কামরায় পৌঁছেও তখন কি গুরুদেবকে নিয়ে সেই চলন্ত ট্রেনে উঠতে পারব? অথচ না উঠলেও নয়, অন্য কামরায় শিষ্য-মায়েরা ও আমাদের মালপত্র রয়েছে। কী হবে তা' হ'লে? ভাবতেও আর পারছি না। জীবন মরণের এই চরম সন্ধিক্ষণে আমার বহু-প্রার্থিত সেই অলৌকিক শক্তি—শক্তিময় ভগবান্ প্রকাশ করলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ এই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে ভক্তের বহু-আকাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ করলেন—চলন্ত ট্রেন সহসা থেমে গেল! আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গুরুদেবকে নিয়ে আমার সেই যথানির্দ্দিষ্ট কামরায় উঠে পড়লাম। একটি নিরিবিলি স্থানে গুরুদেবকে আসন ক'রে বসিয়ে দিলাম। তারপর জানালার ধারে এসে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলাম কী ব্যাপার। হঠাৎ চলন্ত ট্রেন থেমে গেল কেন? আমি যখন গুরুদেবকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ছুটছিলাম, তখন প্রায়ই পিছন পানে চেয়ে গুরুদেবকে দেখছিলাম তিনি ঠিকমত আসছেন কিনা। সেই সময়েই আমার নজরে পড়েছিল, গার্ডের সবুজ আলোর লণ্ঠনটি দোলাতে দোলাতে হঠাৎ তাঁর লণ্ঠনের আলোটি দাউ দাউ ক'রে জলে ওঠে এবং সেই আগুন নেভাতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সে-আগুন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। গার্ডের পাশে প্ল্যাটফর্মস্থিত রেল কর্মচারীরা এসে ভীড় করলেন এবং সমবেতভাবে আগুন নেভাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এখন জানালার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি যে আগুন এখনো নেভেনি, গার্ড লণ্ঠনটিকে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্যই ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখনো আগুন নেভানোর চেষ্টা হচ্ছিল এবং সেখানে রীতিমত ভীড় জমে গিয়েছিল। এর কিছুক্ষণ পরে গার্ড নতুন লণ্ঠন নিয়ে যাত্রা করলেন, ট্রেন ছাড়ল। এবার আমি গুরুদেবের কাছে এসে বসলাম। গুরুদেব বেশ স্বচ্ছন্দভাবে এবং আরামে বসেছিলেন। আমাকে ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করলেন, "সুরেনধন, ট্রেনটা অমন হঠাৎ থেমে গেল কেন?" আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে উঠল, দুই চোখ ছলছল করতে লাগল; মনে মনে সেই অসীম শক্তিধর মহৈশ্বর্য্যশালী প্রভুর শ্রীচরণে বললাম, "হে ভক্তবৎসল ভগবান্, হে অন্তর্য্যামী প্রভু, ভক্তের প্রার্থিত বাসনা পূর্ণ করতে এ তোমারই এক লীলা, প্রভু। এর কারণ জগতের মধ্যে জানেন শুধু আপনি এবং মর্ম্মে মর্ম্মে অবগত আছে শ্রীচরণাশ্রিত এই দীন দাস। আর কেউ এর কারণ অবগত নয় এবং

অবগত হবেও না কখনো।" তবু বাইরের লীলা-সামঞ্জস্য রাখতে হবে,—তাই মুখে বললাম, "গার্ডের লণ্ঠনে আগুন ধ'রে গিয়েছিল, গুরুদেব—তাই—।"

ক্যামেরা লেন্সের সম্মুখে নিজেকে অদৃশ্য করা

এবার ক্যামেরার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি নিখুঁত ক্যামেরা নিয়ে এক ব্যক্তির সামনে গিয়ে তার ফটো নিলাম; কিন্তু সে ব্যক্তি ফটো তোলাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করাতে আমার ক্যামেরায় তার ছবি উঠল না—একথা এই বিংশ শতাব্দীর যুগে কোন্ সুস্থ মস্তিষ্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করবে? বৈজ্ঞানিক কেন, কোনো সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও তা' বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এমন অবিশ্বাস্য, এরূপ অসম্ভব ঘটনা শুধু একবার বা ক্বচিৎ ঘটেনি। বহুবার বহুস্থলে তা' ঘটেছে। নির্ভর-যোগ্য ব্যক্তির মুখে শোনা এরূপ দুটি ঘটনার কথা বিবৃত করছি।

প্রথম ঘটনাটি শুনেছি গুরুদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য হুগলীর বিশিষ্ট উকীল এবং তদানীন্তন বঙ্গীয় বিধানসভার মাননীয় সদস্য প্রখ্যাত কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত গৌরহরি সোম মহাশয়ের মুখে। সেবার আমাদের বৈষ্ণবাটি নরহরি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা-বৎসর। প্রধানতঃ সোম মহাশয়ের উৎসাহ ও প্রচেষ্টাতেই উক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। অবশ্য স্থানীয় ভক্তবৃন্দ অধিকাংশই এসেছিলেন ষ্টেশনে গুরুদেবকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে; হরিনাম-সঙ্কীর্তনের দলেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। গৌরহরি সোম মহাশয়ের মত বিশিষ্ট ব্যক্তির গুরুদেব আসছেন—সুতরাং ষ্টেশনে খবরের কাগজের রিপোর্টার এবং প্রেস ফটোগ্রাফাররাও উপস্থিত ছিলেন। গুরুদেবকে মধ্যস্থলে নিয়ে তাঁর দুইপাশে তাঁর ভক্তগণ যখন ষ্টেশনের ওভারব্রিজে উঠছিলেন, প্রেস ফটোগ্রাফারগণ তাঁদের একটু দাঁড়াতে বললেন কারণ তাঁরা গুরুদেবের ফটো নেবেন। সোম মহাশয় গুরুদেবকে একটু দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন। গুরুদেব তাঁর দিকে চেয়ে একবার শুধালেন, "কেন বাবা?" গৌরহরি দাদা বললেন, "এই এঁরা সব খবরের কাগজের লোক, আপনার ছবি তুলবেন।" গুরুদেব বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে বললেন, "আমার ছবি! কেন, বাবা?" সোম মহাশয় বললেন, "খবরের কাগজে আমাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠার খবর বার হবে, তার সঙ্গে আপনার ছবিও বেরোবে।" গুরুদেব এই শুনে যেন কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমার ছবি? ছি ছি, আমার তো এই দশা—ছেঁড়া চট্-গায়ে পাগল একজন, আমার ছবি কি খবরের কাগজে দিতে আছে? তোমরা বাবু লোক, সুন্দর চেহারা—তোমাদের ছবি বার করতে বল ওদের।" গৌরহরি দাদা গুরুদেবের কথায় একটু হেসে ফটোগ্রাফারদের ছবি তুলতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর ভক্তবৃন্দ বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে ধুমধামের সহিত গুরুদেবকে আশ্রমে নিয়ে এলেন।

পরদিন গুরুদেব আশ্রমের উৎসবাদি ও ভক্তবৃন্দকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন, গতকালকার ওকথা তখন আর তাঁর কিছুই স্মরণ ছিল না। গৌরহরি দাদা যথাসময়ে আশ্রমে এলেন এবং উৎসবাদি পরিচালনা ও ভক্তদের সাথে দেখাশুনা করতে লাগলেন। আজ কিন্তু তাঁকে বরাবরই অত্যন্ত গম্ভীর ও কিছুটা বিষণ্ন দেখা যাচ্ছিল। গুরুদেবও সেদিনের উৎসবাদি ও ভক্তদের নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে গৌরহরিদাদার এই ভাব-পরিবর্ত্তন তিনি লক্ষ্য করেন নি। হঠাৎ একসময়ে গুরুদেব সেটা লক্ষ্য করলেন। গৌরহরিদাদাকে বললেন, "বাবা আজ তোমাকে অমন গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?" গৌরহরি দাদা কোনো উত্তর না দিয়ে মুখটি নীচু ক'রে রইলেন। গুরুদেব তখন খুব উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী বাবা, কী হয়েছে?" তারপর হঠাৎ মনে পড়ায় নিজেই বললেন, "আচ্ছা, বাবা, কাল যে বলছিলে তোমাদের সব ছবি খবরের কাগজে বার হবে—তা' কেমন ছবি বার হ'ল তোমাদের, দেখি,—নিয়ে এসো তো।" গৌরহরিদাদা এবার মুখ তুললেন, করযোড়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "আপনাকে আমরা এখনো কিছুই চিনতে পারি নি। আপনি ইচ্ছাময়, যা' ইচ্ছা করবেন তাই হবে—কারও সাধ্য নেই আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা আপনার ফটো তুলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে আপনার ফটো ওঠে নি। সুতরাং কা'র ছবি আর ছাপা হবে কাগজে?"—গুরুদেব শুধু একটু "হুঁ" ব'লে নীরব হলেন।

গৌরহরি দাদা আমাকে বললেন,—যে-সে অ্যামেচার ফটোগ্রাফার নয়, ওরা প্রেস ফটোগ্রাফার, ওই ওদের নিত্য পেশা। যথারীতি দু'বার ক'রে snap নিয়েছিল ওরা সবাই। ছবিতে ওভারব্রিজ আছে, ভক্তগণ সব আছেন, নেই শুধু গুরুদেব—কারও কোনো কপিতে তিনি নেই। প্রেস-ফটোগ্রাফাররা বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্! এমন অসম্ভব ব্যাপারের কথা ওরা কখনো শোনেনি, কখনো দেখেনি, কখনো কল্পনাও করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি শুনেছি আমাদের প্রাচীন শিষ্য শ্রীরামকালি ঘোষ মহাশয়ের মুখে। একদিন তিনি আশ্রমে এসেছেন গুরুদর্শন করতে, তাঁর নতুন জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে। জামাতা বাবাজীবন একটি নতুন ক্যামেরা কিনেছেন এবং সখ মিটিয়ে ছবি তুলে বেড়াচ্ছেন। আশ্রমেও ক্যামেরাটি সঙ্গে আনতে ভোলেন নি। সকাল প্রায় ন'টা নাগাত গুরুদেব মন্দির দুয়ার খুললেন। গুরুদেব দ্বারের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, ভক্তরা এগিয়ে এসে একে একে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন তাঁকে। রামকালি দাদা এবং তাঁর পশ্চাৎ নবজামাতাও প্রণাম করলেন। গুরুদেব প্রত্যেককেই হরিলুট দিলেন। এরপর রামকালিদাদা গুরুদেবকে নিবেদন করলেন যে নবজামাতার সাধ হয়েছে নিজহাতে তার নতুন ক্যামেরায় গুরুদেবের একটি ছবি তুলবে। গুরুদেব হাত যোড় ক'রে বিনীতভাবে বললেন, "ছি ছি—আমার কি ছবি তুলতে আছে? আমি এই ক্ষেপা, পাগল, ভিখারী,

—আমি কি ছবি তোলার যোগ্য ? তোমরা বাবুলোক, সভ্যভব্য, সুপুরুষ—তোমাদের ফটো নাও। ছিঃ, আমার ছবি তোলার কথা মনেও এনো না।" গুরুদেবের এ কথায় রামকালিদাদা হতাশ হলেন। কিন্তু নব জামাতা একটুও দমলেন না। রামকালিদাদা পুরাতন শিষ্য, তিনি গুরুদেবের মহিমা কিছুটা অবগত ছিলেন, জানতেন যে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাঁর ছবি তুলতে পারে না। কিন্তু নবীন আগন্তুক, উৎসাহী নব যুবক, জামাতা বাবাজীবন তার কিছুই বুঝলেন না। তিনি গুরুদেবের মৌখিক আপত্তি একান্তই নিরর্থক এই জ্ঞানে নিজ ক্যামেরায়, গুরুদেবের অজ্ঞাতসারেই, পরপর দুটি snap shot নিলেন। মুখে আর কিছু বললেন না, কারণ উৎসাহী যুবক ভাবলেন যে তাঁর অভীপ্সিত কাজ হয়ে গেছে, বৃথা বাদ প্রতিবাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এইরূপে এক আধুনিক, সুচতুর ও সুদক্ষ নব যুবক এক পাগলা সাধুর মৌখিক আপত্তি মূল্যহীন জ্ঞানে নিজকার্য্য 'সিদ্ধ' ক'রে গৃহে ফিরে গেলেন। কিন্তু ক্যামেরার ছবি যখন দোকান থেকে তৈরী হয়ে তাঁর হাতে এলো, তখন তিনি আর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। বিস্ময়বিমূঢ় নেত্রে বারবার চেয়ে দেখতে লাগলেন—ছবিতে মন্দির, মন্দিরের দুয়ার, আশেপাশের দৃশ্যাবলী সব নিখুঁতভাবে উঠেছে—কিন্তু মন্দির দ্বারের সমুখ ভাগ ফাঁকা, সেখানে গুরুদেবের চিহ্নমাত্র নেই। দু'বার ছবি নিয়েছিলেন, দুটিরই ঐ এক দশা। তাঁর সব উৎসাহ, সব কর্মকুশলতা, সব চাতুরী একেবারে অর্থহীন হয়ে গেল—একজন ক্ষেপা পাগল সাধুর শুধুমাত্র একটু ইচ্ছাশক্তির কাছে। ছবি দু'খানি হাতে ক'রে তিনি আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন—এ কী ক'রে সম্ভব হ'ল ? ক্যামেরার লেন্সের সমুখে গুরুদেব তো ছবি নেওয়ার সময় সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ছিলেন ; তবে কোন্ শক্তিবলে তিনি ক্যামেরার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেই মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়েছিলেন ? এ কী অদ্ভুত বিস্ময়, এ কী অচিন্তনীয় ব্যাপার ! কে এর ব্যাখ্যা করবে ?

কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না, আমিও পারি নি। কারণ আমি যখন ভক্তদের মুখে এসব কাহিনী শুনতাম, তখন কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে তা' বিশ্বাস করতে পারতাম না। ভাবতাম, কোথাও নিশ্চয়ই কোনো ফাঁক ছিল—হয় যন্ত্রের, নয় ফিল্মের, নয়তো ভক্তদের বিবরণে। এ কেমন ক'রে সম্ভব হবে ? সুতরাং সব শুনেও মনে আমার সন্দেহের কাঁটা বর্ত্তমান ছিল। অন্তর্য্যামী প্রভু তা' অবগত ছিলেন। তাই তিনি করুণা ক'রে এই অবিশ্বাসী, বস্তু-বিজ্ঞানাভিমানীকে জ্ঞান দেবার জন্য এই অধমের দ্বারাই একটি লীলা অনুষ্ঠান করালেন।

স্থান—গোমো তপোবন, সময়—সন ১৩৪৪ সাল বৈশাখ মাস। সে সময় কান্তিদাদা আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি গুরুদেবের অনুগৃহীত ফটোগ্রাফার ; গুরুদেব ইচ্ছা ক'রেই

তাঁর দ্বারা অনেক ছবি তুলিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি, গুরুদেবের আদি কৃপাপাত্র অনুমোদিত ফটোগ্রাফার ছিলেন শ্রীযুক্ত ভোলানাথ অধিকারী। ফটোগ্রাফি তাঁর পেশা ছিল। গুরুদেবের 'যোগাসনে', 'পুষ্পচয়ন' প্রভৃতি আদি বিখ্যাত ছবিগুলি তাঁরই তোলা। কান্তিদাদা গোমো তপোবনে এসে গুরুদেবের অনেক ফটো তুললেন। গুরুদেবের ছবির ব্যাপারে আমার একটি অন্তরের বাসনা ছিল, সেটি হচ্ছে গোমো তপোবনে গুরুদেবের এক 'বিশেষ' ভঙ্গীর ছবি। পূজা করার জন্য গুরুদেবের এই 'বিশেষ' ভঙ্গীর একটি ছবি পাবার জন্য আমার অভিলাষ ছিল। কিন্তু আমার নিজের ক্যামেরা না থাকায় আমার এ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করতে পারি নি। কান্তি-দাদা আমার চেয়ে অনেক বয়োঃজ্যেষ্ঠ ও স্বভাবগম্ভীর—তাই তাঁকেও একথা জানাতে পারি নি। এমন সময় আশ্রমে এল প্রায় আমারই সমবয়সী একজন নতুন জামাই বাবু। হাতে তার খুব ভাল একটি জার্মান ক্যামেরা। তার ইচ্ছা গুরুদেবের কিছু ছবি তোলে। সে ইচ্ছার কথা সে আমাকে জানাল। আমি তার ক্যামেরাটি নিয়ে গুরুদেবের কাছে গেলাম এবং ক্যামেরাটির গুণ বর্ণনা ক'রে গুরুদেবের কয়েকটি ছবি তুলবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমার ভাগ্যক্রমে গুরুদেব অনুমতি দিলেন। তখন ১১ই বৈশাখ আমরা সাধ মিটিয়ে গুরুদেবের অনেক ছবি তুললাম। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যে সঙ্কল্প লুক্কায়িত ছিল সে কথা স্মরণ ক'রে জামাইবাবুকে বললাম, "ওহে, জামাইবাবু, সব ফিল্ম শেষ ক'রো না, গোটা দুইতিন রেখে দিও।" সে জানালে দু' তিনটি আছে আরো। তখন আমার সঙ্কল্পের কথা তাকে জানালাম। তারপর গুরুদেবের কাছে ধর্ণা দিলাম। প্রথমে সাক্ষাৎভাবে তাঁকে বলতে সাহস হ'ল না, অন্যান্য প্রাচীন শিষ্যদের মারফৎ জানালাম। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য! গুরুদেবকে কিছুতেই রাজী করান গেল না। আমি খুব দুঃখ ক'রে একজন প্রভাবশালী প্রাচীন শিষ্যকে একথা জানালাম এবং গুরুদেবকে রাজী করানোর জন্য কাকুতি-মিনতি করলাম। গুরুদেব এ কথায় আর একজন প্রাচীন শিষ্যকে মধ্যস্থ রেখে বললেন, "দেখুন তো, আমি কখন কী খেয়ালে থাকি সব সময়ে সব অবস্থায় কি আমার ফটো নিতে আছে?" তিনি চুপ ক'রে রইলেন। আমি যাঁকে অনুরোধ ক'রেছিলাম তিনি গুরুদেবকে বুঝিয়ে বললেন, "ওতো কিছু অন্যায় আবদার করে নি, পূজা করবার জন্য আপনার একটা ফটো নিতে চেয়েছে মাত্র। নিন্, আর জিদ্ করবেন না। এইবার ওকে ফটো তুলতে দিন।" গুরুদেবকে এই কথা ব'লে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কৈ, তোমার ক্যামেরা নিয়ে এসো।" আমি এক লাফে বাইরে গিয়ে জামাইবাবুকে নিয়ে এলাম ক্যামেরাসহ। আমরা দু'জনেই বেশ ভাল ক'রে ফোকাস্ ক'রে দেখে নিলাম, যাতে ছবি খুব স্পষ্ট হয়। তারপর দু'বার ক্লিক্, ক্লিক্—দু'খানা স্ন্যাপ্ নিলাম।

এরপর আনন্দমনে জামাইবাবুকে বললাম, "তুমি বাড়ী গিয়েই দু'খানা প্রিন্ট্ আমাকে পাঠিয়ে দিও।" তাকে দুটো টাকাও অগ্রিম দিলাম।

জামাইবাবু ঠিক কথা রেখেছিলেন। ঠিক সময়েই তিনি খামভর্ত্তি সব কটা প্রিন্ট্ পাঠিয়ে দিলেন। আমি সাগ্রহে খামটি খুলে পরম ঔৎসুক্যভরে ফটোর পর ফটো উল্টিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় আমার সেই বাঞ্ছিত ফটো, কোথায়? কোথাও নেই তো। পরিশেষে জামাইবাবুর ক্ষুদ্র পত্রখানি প'ড়ে বিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। সে লিখেছে, "অন্য সব ফটো ঠিকই উঠেছে, তাদের কপিও পাঠালাম কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যে-ফটো আমরা অত যত্ন ও আগ্রহভরে তুলেছিলাম, সেই বাঞ্ছিত ফটোর দুট নেগেটিভই একেবারে অন্ধকার—কিছুই ওঠে নি, তার একটা প্রিন্ট পাঠালাম, দেখো।" নেড়েচেড়ে একটা কালো প্রিন্ট পেলাম,—গুরুদেবের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কালো ছাপ,—আমাদের দু'জনের নিজেদের হাতে যত্ন ক'রে তোলা, আমাদের অবাধ্যতার প্রতিচ্ছবি !!

হতাশায় আমি ভেঙে পড়িনি। কারণ আমার নতুন ক'রে নতুন জ্ঞান লাভ হ'ল। বিজ্ঞানাভিমানী আমার অন্তরে তাঁর বস্তুবিজ্ঞানোত্তর অসীম শক্তি সম্বন্ধে যে-সন্দেহের কাঁটা অবিরাম বিঁধত আমাকে, আজ সে-কাঁটা অপসারিত হ'ল। আমাকে দিয়েই আমার নিজের কাঁটা তিনি তুললেন। সেই কালো ছাপের প্রিন্টটি হাতে ক'রে দু'চোখ আমার জলে ভ'রে এলো।

(২) ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যে কোনো বস্তু প্রাপ্তি ঃ এক গ্রাস অন্ন অফুরন্ত হওয়া

মধুসূদন দাদার দইয়ের ভাঁড়ের কাহিনী অনেকেই শুনে থাকবেন। মধুসূদন দাদা প্রদত্ত সেই ছোট্ট শিশুটির অবহেলিত ছোট্ট দইয়ের ভাঁড়টি কী প্রকারে অফুরন্ত ভাণ্ডার হয়ে পণ্ডিত মশায়ের মুস্কিল আসান করেছিল, কী ক'রে পণ্ডিত মশায় ও ভক্তগণ সেই মহাভক্ত ভাগ্যবান্ শিশুটির স্পর্শে ধন্য হয়েছিলেন, তাও অবগত হয়ে থাকবেন। কিন্তু সেটা অনেকেই নিছক গল্প ব'লেই উড়িয়ে দেন। বলেন, তাও কি কখনো সম্ভব হয়? অল্প একটু ভাঁড়ের দই কি অফুরন্ত হ'তে পারে? কিন্তু তা' যে হ'তে পারে, তা' আমরা সুদৃঢ়ভাবেই জানি, কারণ তা' আমরা প্রত্যক্ষ করেছি একাধিকবার এই গুরুআশ্রমে। এক্ষেত্রে মধুসূদন দাদা হচ্ছেন স্বয়ং গুরুদেব এবং ভাগ্যবান্ শিশুটি কোনো সুকৃতিসম্পন্ন ভক্ত। যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি—এটির প্রত্যক্ষ নায়ক হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাষ্টার দাদা। স্থান গোমো তপোবন, সময় অপরাহ্ন। গোমো ষ্টেশন থেকে পাঁচ ছয় জন ভক্ত দর্শনার্থী সাধু-দর্শনে এসেছেন। গুরুদেব তাদের দর্শন দিয়ে বললেন, "বাবা, তোমরা আশ্রমে এসেছ, এখানে কিছু প্রসাদ পেয়ে যাও।"

তারা সমস্ত হ'লে গুরুদেব মাষ্টারদাদাকে ডাকলেন। বললেন, "দুপুরে যে খিচুড়ি রান্না হয়েছিল, সে প্রসাদ এদের পেট ভ'রে খাইয়ে দাও।" মাষ্টার দাদা একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, "আজ্ঞে, সেই খিচুড়ি প্রসাদ তো আর নেই, দুপুরেই সব শেষ হ'য়ে গেছে।" গুরুদেব শুনে মাথাটি নীচু ক'রে শুধু একবার বললেন "হুঁ!" তারপর মাথাটি তুলে বললেন, "দেখ দিকি, বাবা, হাঁড়ির তলায় যদি কিছু লেগে থাকে—তাই ভাগ ক'রে দাও এদের।" মাষ্টার দাদা মুখে বললেন, "যে আজ্ঞে"; কিন্তু তিনি নিজে পরিবেশন করেছেন দুপুরে এবং জানেন অবশেষ এমন কিছু নেই, যদি বা সামান্য একটু আধটু তলায় লেগে থাকে, তা' এই পাঁচ ছয় জনকে পেট ভ'রে খাইয়ে দেওয়ার কল্পনাও করা যায় না। তবু মুখে বললেন, "যে আজ্ঞে।" এই ব'লে তিনি রান্নাঘরে গিয়ে হাঁড়িটি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, হ্যাঁ, তলায় সামান্য একটু অবশেষ লেগে আছে বটে। গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে ওদের ছয়জনকে পাতা ক'রে দিয়ে বসালেন এবং হাঁড়ি নিয়ে এসে সেই তলায় লেগে থাকা সামান্য একটু খিচুড়ি থেকে অতি সন্তর্পণে একটু, একটু, ক'রে ছয় জনকেই বিতরণ করলেন। ভয়ে তিনি হাঁড়ির ভিতর চাইছিলেন না, হাতে যা' ওঠে তাই দিচ্ছিলেন। ছয় জনেই সেই একটু খানি প্রসাদই খেয়ে বললেন, "বাঃ, অতি উত্তম প্রসাদ।" মাষ্টার দাদার যেন কী একটা প্রেরণা জাগল, সোৎসাহে বললেন, "আর একটু নেবেন?" ওঁরা সমস্বরে বললেন, "থাকে তো দিন্ না।" "এই যে, এই নিন্," ব'লে মাষ্টারদাদা হাঁড়ির ভিতর না চেয়ে শুধু হাতটি ঢুকিয়ে আবার সেই প্রথম বারের মতই, বরং একটু বেশী ক'রে, ছয় জনকেই সমভাবে বণ্টন ক'রে দিলেন। সেই দ্বিতীয় বারের দেওয়া প্রসাদও তাঁরা খেয়ে শেষ ক'রে বললেন, "অতি চমৎকার! এমন খিচুড়ি প্রসাদ কোথাও খাই নি।" মাষ্টার দাদা যেন কোন্ অজ্ঞাত প্রেরণায় বললেন, "তা হ'লে আর একটু একটু দিই।" ওরা সানন্দে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এ রকম প্রসাদ আর কোথায় পাব?" মাষ্টারদাদা এবারও হাঁড়ির ভিতর না তাকিয়ে শুধু হাত প্রবেশ করিয়ে হাতে যা' উঠতে লাগল, অর্থাৎ দ্বিতীয়বারের মতই, বরং আরো একটু, অধিক পরিমাণে, ছয় জনের প্রত্যেককে পরিবেশন করলেন। ওরা তা' সব শেষ ক'রে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে বললেন, "আঃ, আজ আমরা সত্যই ধন্য হলাম। সাধু বাবার আদেশে তাঁর আশ্রমে যে প্রসাদ পেলাম এমন কখনো পাই নি।" মাষ্টারদাদা তখন আনন্দপ্রেরণায় মরীয়া হয়ে বললেন, "তা হ'লে আর একটু দিই?" ওরা এবার জানালেন. "আজ্ঞে, আর না। আমাদের পেট ভ'রে গেছে। পরম তৃপ্ত হলাম আমরা।" মাষ্টারদাদা হাঁড়িটি নিয়ে যেতে যেতে এবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন, হাঁড়ির ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ, একটি কণাও আর নেই কোথাও। ওদের সবারই পেটও ভরেছে, অমনি মধুসূদন দাদার ভাঁড়ও ফুরিয়েছে।

শূন্যস্থানে পাওনাদারের পাওনা অর্থ ঠিক হিসাব মত প্রাপ্তি

শ্রীগুরুদেব কীভাবে মা রাধারাণীর উপর যোলোআনা নির্ভর করতেন, তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করছি। গুরুদেবের আশ্রমের তথাকথিত 'জমিদার' খাজনা নিতে এসেছে গুরুদেবের কাছে। জমিদার যদিও ভিখারী, তথাপি তার 'জমিদারী' মেজাজ যাবে কোথায়? তম্বি গম্বি ক'রে গুরুদেবের কাছে খাজনা চাইছে। গুরুদেব করযোড়ে বিনয়নম্রকণ্ঠে বললেন, "বাবা, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, যখন খুসী বললেই টাকা পাব কোথায়, বাবা? সবুর কর দু-একদিন, ভক্তরা দিলেই তোমার পাওনা মিটিয়ে দেব।" "সবুর কর"—শুনে জমিদার মহারাজ তো চ'টে আগুন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "আমি এক মিনিটও সবুর করব না। আমার পাওনা টাকা এক্ষণি মিটিয়ে দিতে হবে।" গুরুদেব তেমনি করযোড়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন, "দেখি, মা রাধারাণীকে ব'লে; তিনি যদি দেন তবে তো দিতে পারব। নৈলে পাব কোথায়?"

ক্রুদ্ধ জমিদার মহারাজ বিকৃত কণ্ঠে বললে, "মা রাধারাণী দেবে—ও সব ভড়ং আমার কাছে চলবে না। বের কর টাকা।" গুরুদেব কিন্তু অপরিবর্ত্তিত, শান্ত ও নম্রকণ্ঠে বললেন, "মা ছাড়া আর কে দেবে আমায়? মা, ওর পাওনা টাকা দিয়ে দিন, মা। দেখুন তো জমিদার বাবা, ঐ চাতালটার কোণটা হাতড়ে, মা কিছু দিয়েছেন কিনা।" জমিদার মশায় চাতালের কোণ অনুসন্ধান ক'রে বললে, "ওখানে আবার কী থাকবে, কিছুই নেই।" গুরুদেব আবার হাতযোড় ক'রে বললেন, "আর একবার ভাল ক'রে দেখুন তো বাবা।" দ্বিতীয় বার চাতাল সন্ধান ক'রে জমিদার মশায় বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে একটা টাকা পেয়েছি।" গুরুদেব এবার শুধালেন, "আর কত পাওনা, বাবা?" জমিদার বললে, "আরো ন' আনা।" গুরুদেব বললেন, "দেখুন আর একটু খুঁজে।" জমিদার আবার হাতড়াতে হাতড়াতে কিছু পয়সা পেল এবং তা' গুণে দেখল ঠিক ন'আনাই হয়েছে। জমিদার একটু আশ্চর্য্য হ'য়েই বললে, "ঠিক পাওনা টাকাটাই পেয়ে গেলাম দেখছি। অথচ প্রথমে দেখেছি ওখানে কিছুই ছিল না। তারপরেও এক টাকার বেশী খুঁজে পাই নি। অথচ ঠিক একেবারে গুণে গেঁথে পাওনা টাকা কে এখানে রাখল? আশ্চর্য্য কাণ্ড তো!" গুরুদেব কিন্তু তেমনি নম্রমধুর কণ্ঠে বললেন, "বাবা পেয়েছেন তো? মা আপনার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন তো?"

এ ঘটনার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত দাদা—যিনি এখনো জীবিত।

শূন্য গুহায় পৌষ মাসে টাট্‌কা পাকা লিচুর আবির্ভাব

উপরোক্তরূপ অলৌকিক ঘটনা আরও অনেক ঘটেছে এই আশ্রমে। তবে সে সকল গুরুদেবের লীলা অনুরোধে বা নিতান্ত সঙ্কট-জনক মুহূর্ত্তেই ঘটেছে—লোকদেখানো

বা ম্যাজিক দেখিয়ে চমক লাগানোর ব্যাপার এটা নয়। এরূপ লীলাদর্শন ও তাতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার। গুরুদেবের লীলাঅনুরোধে আরও যেসব অসম্ভব ও অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, তার একটির দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মামার বাড়ীর আব্দার বা খোকা খুকুর বায়না মা-দিদিমা বুদ্ধি দ্বারা পূর্ণ করতে পারে। কিন্তু দুষ্টু ছেলের আব্দার যদি দুরভিসন্ধিমূলক হয়, তবে তা পূরণ করা যায় না। এরূপ একটি ঘটনার কথা এখন বলছি। ঘটনাটি ঘটেছিল আমি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করার বহু পূর্ব্বে, আমি তখন হয়তো পাঁচ ছয় বছরের শিশু মাত্র। ঘটনাটির বিবরণ শুনলাম কিন্তু অনেকদিন পরে, অনেকটা আকস্মিকভাবে; ইং ১৯৫২ সালে যখন শ্রীরাধাগোবিন্দের নতুন বারান্দা নির্মাণ হচ্ছে তখন। বারান্দার জাফ্‌রীতে গুরুদেবের ও রাধাগোবিন্দের নাম খোদাইয়ের জন্য যে লেখক-মিস্ত্রী এল, সে আমাদেরই পাড়ার, আমাদের প্রতিবেশী শিবুমিস্ত্রী। শিবুদা বয়সে আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়। কথায় কথায় আমি শুধালাম, "শিবুদা, আমাদের গুরুদেব বর্ত্তমানে আপনি তাঁকে দর্শন করেছেন?" শিবুদা আমার দিকে চেয়ে যেন কতকটা ধমকের সুরেই বললে, "তার মানে? তোমরা এখন না হয় তাঁর শিষ্য হয়ে আশ্রমে রয়েছ। নৈলে তোমরা আর তাঁর মহিমার কথা কতটুকু জান? ছোট বেলা আমরা পাতাল-বাবার কাছে প্রায় প্রত্যহই এসেছি। প্রথম প্রথম আসতাম মিষ্টি খাবার লোভে, এবং খানিকটা হুজুগে পড়ে মজা দেখার জন্য। তারপর বয়স যেমন বাড়তে লাগল, মাথায় দুষ্ট বুদ্ধিও তত জাগতে লাগল। তাঁকে অনেক জ্বালাতন করেছি, অনেক বায়না করেছি। অনেকভাবে লুকিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছি—প্রত্যেক বারই পরাস্ত হয়েছি এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি। এই বনচারী বাগানে ও নবদ্বীপে অনেক সাধু ছিল, সবাই আমাদের পরীক্ষায় ফেল করেছে—এই এক পাতালসাধুবাবাই আমাদের মত দুর্দ্দান্ত, দুর্দ্ধর্ষ, বদমায়েস ছেলেদের শত অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য ক'রে আমাদের শুধু ক্ষমাই করেন নি, তাঁর ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দেখিয়ে আমাদের বিহ্বল ও মুগ্ধ করেছেন এবং আমাদের মত পাষণ্ডের হৃদয়ে চিরতরে তাঁর মহিমার আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তোমরা আর তার কী জানবে, সুরেন?" শিবুদা ব'লে গেল, "ভক্ত হয়ে তোমরা তাঁর মহিমা যতটুকু না জেনেছ, আমরা প্রচণ্ড পাষণ্ড হয়ে তোমাদের চেয়ে বহু গুণে তাঁর মহিমার পরিচয় পেয়েছি। আর সে সব কথা কখনো ভুলবার নয়। আমি একা নই,—নবদ্বীপে তাঁর অভক্ত, শত্রু ও পাষণ্ডের সংখ্যাই বেশী ছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, তারা প্রত্যেকেই তাঁর মহা মহিমার পরিচয় পেয়ে অভিভূত ও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়েছে।'' শিবুদাকে বললাম, "তাঁর মহিমার দু'একটা দৃষ্টান্ত দিন না, শুনি।" শিবুদা

বললে, "তাঁর মহিমার, তাঁর অলৌকিক ও আশ্চর্য্য লীলার অন্ত নেই—কত আর বলব? এক কথায় বলি শোন—তিনি যা' খুসী তাই করতে পারতেন। হ্যাঁ, যাকে বলে 'হয়'কে 'নয়' করতে এবং 'নয়' কে 'হয়' করতে পারতেন। এত শক্তি ছিল তাঁর। তবে সব সময়েই যে তা' করতেন তা' নয়—তিনি তা' পারতেন, এবং উপযুক্ত সময় হ'লে সে শক্তি প্রকাশ হ'ত। সে যাই হোক, সে সব তো অনেক কথা। এখন মনে পড়ছে, ছেলে বেলার একটা কুমতলবপূর্ণ আজগুবি আব্দারের কথা যা' ত্রিভুবনে কেউ পূর্ণ করতে পারত না, এক এই অচিন্ত্য শক্তিমান্ পাতালের সাধুবাবা ছাড়া। আমরা তখন প্রায়ই এসে নানা আব্দার ক'রে তাঁকে জ্বালাতন করতাম। তিনি সস্নেহে আমাদের সব আব্দারই রক্ষা করতেন। যখন তখন সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, রাজভোগ—এসব তো পেট ভ'রে পেতামই, তা' ছাড়া ফলমূলও যখন যা' চাইতাম, তাই তিনি দিতেন। একদিন আমরা এক মতলব এঁটে এলাম যে সাধুবাবাকে আজ জব্দ করতে হবে; এমন জিনিস চাইব যা' তিনি দিতে পারবেন না। অনেক মতলব ক'রে শেষে আমরা ঠিক করলাম—এখন তো পৌষ মাস, এখন আমরা বেশ পাকা টাটকা বোম্বাই লিচু চাইব, যা' তিনি কোনোক্রমেই দিতে পারবেন না। যেমন কথা তেমনি কাজ। আমরা পাড়ার যত বদ্ ছেলে সমবেত হয়ে তাঁর কাছে এসে ঐ আজগুবি বায়না ধরলাম। সাধুবাবা তো শুনে অবাক। বিস্মিত হয়ে বললেন, "বাবা, কেউ কি কখনো কস্মিন্ কালে শুনেছে যে পৌষমাসে পাকা বোম্বাই লিচু পাওয়া যায়? এ যে অসম্ভব, বাবা। যা' পৃথিবীতে হয় না, প্রকৃতি দেবী যা' দেন না, সে জিনিস আমি কোথা থেকে পাব? এমন অসম্ভব আব্দার ছেড়ে তোমরা আর কোনো ফল, যা' এ সময়ে মেলে, বা মিষ্টান্ন যা' চাও, আমি আমার মা রাধারাণীর কাছে চেয়ে তাই তোমাদের দিচ্ছি।" শিবুদা-রা কিন্তু নাছোড়বান্দা। প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, "আমরা ওসব কিছু জানি না, কিছু শুনতে চাই না, আমাদের বোম্বাই লিচু চাই-ই। নৈলে আপনাকে এমন জ্বালাতন করব যে—।" সাধুবাবা কত হাতযোড় করলেন, কত কাকুতি-মিনতি করলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে? চোরা না মানে ধর্মের কাহিনী। অবশেষে কাতরকণ্ঠে সাধুবাবা বললেন, "মা, রাধারাণী, আপনি সবই দেখছেন, সবই শুনছেন—এদের এ আব্দার আমি কেমন ক'রে কোথা থেকে পূরণ করব? যা' করতে হয়, আপনিই করুন, মা।" এই ব'লে সাধুবাবা শিবুদাকে ডেকে বললেন, "ঐ সিঁড়ির কোণে খুঁজে দেখ তো, মা রাধারাণী তোমাদের জন্ম কিছু দিয়েছেন কিনা।" শিবুদা সেই প্রায় অন্ধকার চাতালের কোণে হাতড়াতে হাতড়াতে দেখে—হাতে কী একটা ঠেকল যেন, কতগুলি পাতা মনে হচ্ছে; তাড়াতাড়ি সেগুলি আঁকড়ে ধ'রে তুলে চোখের সামনে

মেলে ধরতেই সে একেবারে হতভম্ব। একী দেখছে সে চোখের সামনে। এখনি টাটকা গাছ থেকে ভাঙা, টাটকা পাতাসহ একগুচ্ছ বেশ বড় বড় লাল টকটকে পাকা বোম্বাই লিচু !! দেখে দেখে শিবুদার আর বিশ্বাস হয় না, বাইরে এসে সবাইকে দেখাল সে। সবাই দেখে চমকে উঠে একসঙ্গে ব'লে উঠল, "কী আশ্চর্য্য, এযে সত্যই টাটকা বোম্বাই লিচু।" শিবুদা বললে, "দাঁড়া খেয়ে দেখি—এ আবার ভানুমতীর ভেল্‌কী নয় তো ? এখনি হয়তো উড়ে যাবে।" এই ব'লে একটা লিচু ছাড়িয়ে টপ্‌ ক'রে মুখে দিয়ে দেখে—"ওঃ, কী মিষ্টি, কী রসে ভরা রে! নে, নে—সবাই এক একটা নে।" সবাই সেই পৌষ মাসে প্রাণ ভ'রে পাকা বোম্বাই লিচু খেতে লাগল। সাধুবাবা শুধু করযোড়ে বললেন, "বাবা, তোমাদের পছন্দমত জিনিস আমার মা তোমাদের দিয়েছেন, তোমরা পেয়েছ তো ?" এই কাহিনী বর্ণনা করতে করতে শিবুদার দুই চোখ ছলছল ক'রে উঠল ; বললে, "তখন কি আমরা বুঝেছি, তিনি কী ছিলেন—এখন তা' মর্মে মর্মে বুঝি।"

এইরূপ কত অজ্ঞাত ভক্ত-অভক্তের অভিজ্ঞতায় পরমপুরুষ পাতালদেবের কত অলৌকিক লীলা সমূহ সঞ্চিত আছে ও ছিল, কে তাদের সন্ধান রাখে ?

(৩) ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজ শরীর নিয়ন্ত্রণ ঃ

বিষাক্ত সর্পবিষ অন্যের দেহ হতে নিজ শরীরে গ্রহণ

এরূপ একটি লোমহর্ষক দৃষ্টান্তের কথা আমি জানি। অন্যান্য অনুরূপ ঘটনাবলীর কথাও শুনেছি। এখানে একটির মাত্র বর্ণনা করছি। বর্দ্ধমানের ভক্ত শিষ্য আশুতোষ লাহার স্ত্রীকে একদা একটি বিষধর সর্প দংশন করে তার পায়ের আঙুলে। সে অনন্যচিত্ত হয়ে একাগ্রভাবে গুরুদেবকে স্মরণ করে। সর্প বিষে প্রথমে তার শরীর নীল হয়ে যায় এবং দ্রুত ও নিশ্চিত মৃত্যুর সব লক্ষণই প্রকট হয়ে পড়ে। কিন্তু একান্তচিত্তে গুরুস্মরণ প্রভাবে ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। পরদিন সে আকুলচিত্তে নবদ্বীপে গুরুদেবের কাছে ছুটে আসে। এসে গুরুদেবকে প্রণাম করতেই সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, তাকে ঠিক যেখানে সেই ভীষণ সর্পটি কামড়েছিল, গুরুদেবের চরণের ঠিক সেই স্থানে ন্যাকড়া দিয়ে পটি বাঁধা। অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে সে শুধাল, "গুরুদেব, আপনার পায়ের আঙুলে ন্যাকড়া বাঁধা কেন ? কী হয়েছে ?" গুরুদেব করযোড়ে শুধু বললেন, "মা, তুমি যে একান্তচিত্তে স্মরণ করেছিলে ?" গুরুদেব চরণের ন্যাকড়া খুলে দেখালেন, সেখানে সাপের কামড়ের স্পষ্ট দাগ—ঠিক যেস্থানে শিষ্যাটিকে কামড়েছিল সেইখানে, জায়গাটি নীল হয়ে গেছে। শিষ্যাটি হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল, আকুল কণ্ঠে বললে, "হে করুণাময় প্রভু, একী আপনার করুণার নিদর্শন ! এ অধম শরণাগতের সর্পবিষ

আপনি নিজে গ্রহণ করলেন নীলকণ্ঠ হয়ে? কেন একাজ করলেন প্রভু, কত কষ্ট পেয়েছেন এই অধম মহাপাপীর জন্য?" গুরুদেব হাতযোড় ক'রে শুধু বলতে লাগলেন, "মা, মা।" ঘটনাটি শুনেছি শ্রীসত্যহরি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ভগিনী মন্দাকিনী দেবীর মুখে—তাঁরা এর প্রত্যক্ষদ্রষ্টা।

বিষাক্ত ওল ভক্ষণ

মহাদেব হলাহল পান ক'রে নীলকণ্ঠ হয়েছেন—একথা সকলেই অবগত আছেন। সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত সেই তীব্র কালকূট আর কেউই সহ্য করতে পারতেন না—এক শঙ্কর ছাড়া। সেইরূপ মহাপুরুষগণ অবিশ্বাস্য শক্তির অধিকারী। তাঁরা যেসব আচার আচরণ করেন, তা' তাঁদেরই সাজে। সাধারণ মানুষ সে সব অনুকরণ করতে গেলে ধ্বংস হয়ে যাবে, মহাপুরুষের "ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"—চৈঃ চঃ। "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ, বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্। ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্, তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা"—ভাঃ ১০।৩৩।২৯-৩০ অর্থাৎ, সাধারণ ব্যক্তিগণ মনদ্বারাও এই সব আচরণ অনুষ্ঠান করবে না, করলে মূঢ়তা বশতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। রুদ্র ভিন্ন অপরে সমুদ্রোৎপন্ন বিষ পান করলে বিনষ্ট হবে। ঈশ্বরগণের ধর্মব্যতিক্রম ও সাহস দৃষ্ট হয়। সর্ব্বভুক্ বহ্নির ন্যায় তাঁদের এসব আচরণ সাজে। তাঁদের পক্ষে এ দোষের নয়। আমাদের গুরুদেবের ক্রিয়াকলাপও ছিল তেমনি অদ্ভুত, অলৌকিক ও দুর্ব্বোধ্য। 'তিনি অসীম শক্তিধর, তাঁর ভাণ্ডারে অকল্পনীয় আধ্যাত্মিক রত্ন সঞ্চিত রয়েছে—কিন্তু তিনি কাউকেও কিছু দেন না, এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত কৃপণ'—এইরূপ ধারণা অনেক অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ শিষ্য ও সাধকেরও হ'তে দেখেছি। 'তিনি যখন ইচ্ছা ক'রে কিছু দেবেন না, তখন তাঁকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়েই তাঁর আচরিত ক্রিয়া কলাপ, অর্থাৎ সাধন কার্য্য কিছু করা যাক না কেন, ঠিক ফল পাওয়া যাবে'—এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে কিছু শিষ্য সাধক প্রায় ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছেন, কাউকে বা গুরুদেব আসন্ন সর্ব্বনাশ থেকে উদ্ধার করেছেন। আমাদের একজন অতি প্রাচীন গুরুভ্রাতা নবদ্বীপ রামসীতা ঠাকুরের পূজারী শ্রদ্ধেয় সতীশদাদা গুরুদেবের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। নিষ্ঠাসহকারে গুরুসেবা ক'রে তিনি সাধনপথেও বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি 'জ্যোতি-দর্শন'-রূপ সাধনে ফলপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। 'জ্যোতি-দর্শনে' তিনি প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্ত্তী সাধন যে শ্মশানের ক্রিয়াকলাপ তাও তিনি গুরুমুখে শুনেছিলেন। এই পরবর্ত্তী সাধনের জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং পুনঃ পুনঃ গুরুদেবকে এর জন্য নিবেদন করতে

লাগলেন। কিন্তু গুরুদেব বললেন যে তখনও তার সময় হয় নি। সতীশদাদা মনে ভাবলেন, এটা গুরুদেবের নিছক কৃপণতা। তিনি সহজে কিছুতেই দেবেন না তাঁর অগাধ 'ধন-রত্ন' ভাণ্ডারের চাবি কাঠি। সুতরাং তিনি অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়ে এবং গুরুদেবের প্রতি কিছুটা রাগ ক'রেই তাঁকে না জানিয়ে, লুকিয়ে, শ্মশানে গিয়ে গুরুমুখে শোনা সাধনক্রিয়া করতে লাগলেন। ফল যা' হবার তাই হ'ল। সতীশদাদা পাগল হয়ে বাড়ী ফিরলেন। গুরুদেব হা-হুতাশ করতে লাগলেন। গুরুর প্রতি বিশ্বাস রাখতে না পেরে এমন একটি ভাল সাধক সন্তান তাঁর এ জন্মের মত ধ্বংস হয়ে গেল। সতীশদাদা আর সারেন নি, সেই পাগল অবস্থাতেই তাঁর দেহপতন হয়।

আর একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। গুরুদেব সেবার পুরী যাচ্ছেন—ইংরাজী ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে। হাওড়া ষ্টেশনে এসে ষ্টেশনের কাছে বড়বাজারে কোনো এক ভক্ত শিষ্যের গৃহে গমন করলেন তিনি। সেখানে সেই ভক্তশিষ্যটি গুরুদেবের প্রিয় সেবার জিনিস একটি ওল সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন। ওলটি অদ্ভুত— অতি বৃহৎ আকার, ওজন আধমণেরও বেশী। দেখে গুরুদেব খুব প্রীত হলেন। তারপর বললেন, "একটি ছুরি আনতো, বাবা।" ছুরি এলে গুরুদেব সেই ছুরি দিয়ে ওলের গা থেকে অল্প একটু খণ্ড কেটে নিয়ে তা' কাঁচাই মুখে দিয়ে কচ কচ ক'রে চিবিয়ে সেবা ক'রে বললেন, "অতি উত্তম ওল, বাবা; যত্ন ক'রে রেখে দিও, আমি পুরী থেকে ফেরার পর আমাকে পাঠিয়ে দিও।" গুরুদেব তারপর ষ্টেশনে চ'লে গেলেন। তখনও ট্রেন ছাড়তে অনেক দেরী। এদিকে সেই বাড়ীতে জনৈক ভক্তের মনে একটা বাসনা জাগল। সে ভাবল, গুরুদেবের প্রসাদ পাওয়া তো খুবই দুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু এই ওলটি তো গুরুদেব সেবা করেছেন, অতএব ওর কিছু অংশ যদি আমিও কেটে নিয়ে একটু খাই, তবে গুরুদেবের প্রসাদই পাওয়া হ'ল। তবে কাজটি লুকিয়ে করতে হবে। এই কথা ভেবে সে গোপনে সেই ওল থেকে সামান্য একটু অংশ কেটে নিয়ে অতিকষ্টে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। কিন্তু খেয়েই তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠল। মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল। সারা শরীর যেন দাবদাহে জ্বলতে লাগল। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে সে গোঙাতে লাগল। তার গোঙানি শুনে লোকজন ছুটে এল। তখন সে কোনো রকমে জানাল ঐ ওল খাওয়ার কথা। কিন্তু তার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যেতে লাগল। ডাক্তার এলেন, সব দেখে শুনে বললেন, "অবস্থা এখন আয়ত্তের বাইরে; ঐ ওলটি মারাত্মক বিষাক্ত, সে-বিষের ক্রিয়া পূর্ণভাবে ক্রিয়া করছে শরীরে, বাঁচানো আর সম্ভব নয়।" সে-বাড়ীর

মালিক, গুরুদেবের যিনি প্রধান শিষ্য, ছুটলেন হাওড়া ষ্টেশনে গুরুদেবের কাছে। সব কথা খুলে বললেন তাঁকে। গুরুদেবও শুনবামাত্রই ছুটে এলেন। দেখলেন তাকে। তারপর সকলকে সরে যেতে বললেন। সকলে সরে গেলে দুয়ার বন্ধ ক'রে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে দুয়ার খুলে হাতযোড় ক'রে সকলকে বললেন, "বাবা, এ যাত্রা গুরু ওকে বাঁচিয়েছেন। দেখো, ওলটি সাবধানে রেখো।" নীলকণ্ঠ যে-হলাহল অবলীলাক্রমে পান করেছিলেন, একজন সাধারণ জীবের তা' সইবে কেন?

(৪) ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে অপরের শরীর নিয়ন্ত্রণ: মারাত্মক ব্যাধি আরোগ্য—নানাবিধ উপায়ে

সাধারণ লোক গুরুদেবের কাছে ধর্ণা দিত প্রধানতঃ এই ক'টি কারণে:—

(১) কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যখন চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্যের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ত তখন তাঁর চরণে শরণ নিত; (২) আর আসত মৃতবৎসা জননী অথবা সন্তানহীনা নারী সুস্থ সন্তানলাভের আশায়; (৩) কেউ মামলা মোকর্দ্দমায় জয়লাভের বাসনায়; (৪) কেউ পরীক্ষায় ভাল ফললাভের কামনায়; (৫) কেউ আর্থিক উন্নতির প্রার্থনায়; (৬) এবং সাধারণভাবে সাংসারিক লোক তাদের অশান্তির জ্বালায় মানসিক শান্তিলাভের আশায়। এদের সকলের কামনাই তাদের প্রার্থনার আন্তরিকতা অনুযায়ী ফলপ্রসূ হ'ত। এই সব প্রার্থনার মধ্যে প্রথম দু'টি চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত। সকল রকমের চিকিৎসা—ডাক্তারী, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদিতে ব্যর্থ হয়ে প্রার্থীরা নিরুপায় হয়েই তাঁর শ্রীচরণে শরণ নিত; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ফল লাভ করত। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমি নিজে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল দুয়ার থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে তাঁর চরণে শরণাগত হয়েছিলাম, এবং কীভাবে তাঁর অপার মহিমা অবগত হয়েছিলাম তা পূর্ব্বে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, রোগমাত্রই জীবের কুকর্মের দণ্ডভোগ। গুরুদেব রোগীকে দেখবামাত্র তার কুকর্মের প্রতিচ্ছবি ও তজ্জনিত দণ্ডভোগের পরিমাপ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতেন। ভোগব্যতীত কোনো কর্মেরই অবসান হয় না। তবে সাধু গুরুর শ্রীচরণে শরণ নিলে সেই ভোগ সহ্য করবার শক্তি জাগে, যার ফলে অসুখ আর অসুখ ব'লে বোধ হয় না; মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয় এবং দেহের কষ্টের দিকে আদৌ আর মন যায় না। অবশ্য যে যতটুকু শরণ নিতে পারে, তার ততটুকুই কৃপা লাভ হয়। যে শুধু নিজ স্বার্থের দিকে ষোলো আনা দৃষ্টি রেখে শুধু ফাঁকি দিয়ে রোগ সারাতে আসে, তার কিছুই ফললাভ হয় না। অবশ্য যার ভোগ কম, তার আপনা-আপনিই সেরে যায়, কিন্তু যার কুকর্মের তীব্রতা অধিক এবং ভোগও দীর্ঘ তার রোগ

সারে না। গুরুদেব তাই রোগী দেখবামাত্র বলতেন, "ভোগ আছে," "সারবে না, বিলম্ব আছে; অমন কুকর্ম করেছিলে কেন, তখন ভাবতে পার নি?" এবং যার ভোগ কম তাকে বলতেন, "ভয় নেই, সেরে যাবে।" কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, রোগ সারা না সারা, বিলম্বে বা দ্রুত ফল পাওয়া, অথবা 'কর্মক্ষয়' হওয়া—সবই নির্ভর করে প্রার্থীর শরণাগতির তারতম্য অনুসারে। যে যতটুকু শরণাগত হ'তে পারেন, তার ততটুকু কর্মক্ষয় কাটল। যে কোনো ফললাভের আশা না ক'রে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে তাঁর চরণে, আমার আমি ভুলে গিয়ে তাঁরই ধন হয়ে রইব, এইরূপ ভাবতে পারে—তার দীর্ঘতম ভোগকালও কখন যে লুপ্ত হয়ে যায় তা' সে বুঝতেই পারে না, নিশ্চিত মৃত্যুও তখন তার কাছে এগোতে পারে না। পূর্ব্বেই বলেছি এর জ্বলন্ত উদাহরণ এই অধম স্বয়ং।

বস্তুতঃ, আমাদের গুরুদেবের কাছে যারা আসত—শিষ্য-অশিষ্য, ভক্ত-অভক্ত—তাদের মধ্যে অধিকাংশই কোনো না কোনো কঠিন ব্যাধি নিরাময়ের জন্য আসত। তাই এটা অনেকটা নিত্য নৈমিত্তিক, দৈনন্দিন ঘটনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কত যে কঠিন যক্ষ্মা, পুরাতন জ্বর, পক্ষাঘাত, শূলবেদনা, কলেরা, বসন্ত, ঘোর উন্মাদ রোগ, এমন কি মারাত্মক সর্পদংশনও তাঁর ইচ্ছামাত্র সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়ে গেছে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য। শুধু তাঁকে যারা জানত, তারা এটুকু বিশ্বাস করত যে তিনি সর্ব্বশক্তিময়, তাঁর ইচ্ছা হ'লে যে কোনো দুঃসাধ্য ব্যাপারই সহজসিদ্ধ হ'তে পারে। এইরূপভাবে রোগ আরোগ্যের ব্যাপারে তিনি সব সময় কিন্তু একই প্রকার পন্থা অবলম্বন করতেন না। কখনো রোগীকে তরল ঔষধ দিতেন, কখনো ভস্ম বা মচাবস্তু, কখনো আশ্রমের ধূলি বা মাটি, কখনো পূজার নির্মাল্য দিতেন। কখনো শুধু আশ্রমে বসে প্রসাদ পাওয়াতেই অসুখ সেরে যেত। কখনো কাউকে কবচ দিতেন ধারণ করবার জন্য। কখনো বা নিজ শরীরে রোগীর রোগ গ্রহণ ক'রে নিজে ভোগ ক'রে তাকে রোগমুক্ত করতেন। আবার কখনো শুধুমাত্র সঙ্কল্প দ্বারাই এ কার্য্য সিদ্ধ করতেন। যে সাড়ে চার বৎসর আমি তাঁর নিত্যসঙ্গ লাভ করবার সৌভাগ্য পেয়েছি, তারমধ্যে বহু দৃষ্টান্ত আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি এবং আরও অনেক চমকপ্রদ কাহিনী নির্ভরযোগ্য প্রাচীন শিষ্যদের মুখে শুনেছি। চিকিৎসাশাস্ত্রের কল্পনার বহির্ভূত রোগ আরোগ্যের এইরূপ দুই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই এখানে লিপিবদ্ধ করব।

আমার ভগিনীপতি দুর্গাপদবাবু তখন সুদূর টিটিলাগড়ে চাকুরী করেন। কিন্তু তবু প্রায়ই গুরুদর্শনে আসেন। অবশ্য আসবার কিছুদিন আগে থেকেই প্ল্যান ঠিক করেন এবং যোগাড়যন্ত্র করতে থাকেন। কিন্তু সেবার এখানে আসার কোনোই পূর্ব্ব-পরিকল্পিত বাসনা ছিল না। একদিন যেন হঠাৎ কী এক অদম্য প্রেরণায় তিনি ঠিক ক'রে

ফেললেন যে সেইদিনই গুরুদর্শনে যাত্রা করবেন। ছুটির দরখাস্ত করামাত্র ছুটিও পেয়ে গেলেন; বাসায় তাড়াতাড়ি খবরও পাঠালেন, কারণ কমলাকে প্রস্তুত হ'তে হবে। ওরা যাত্রা করলেন এবং যথাসময়ে নবদ্বীপ ষ্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছাল। ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছানোর আগেই কমলা বার বার বলতে লাগল, "দেখো, গুরুদেব ঠিক ষ্টেশনে লোক পাঠাবেন।" দুর্গাপদবাবু সাধারণ বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, তাই তিনি ওর কথায় তেমন আস্থা স্থাপন করতে না পেরে বললেন, "কেমন করে পাঠাবেন? আমরা তো কোনো সংবাদ দিয়ে আসছি না।" কমলা তবু বললে, "দেখো, ঠিক পাঠাবেন। তিনি কি সাধারণ মানুষ যে তাঁকে আগে থেকে সংবাদ দিতে হবে? তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, তিনি ভক্তবৎসল ভগবান্, তা' কি জান না?"

এদিকে গুহাশ্রমে গুরুদেব সহসা জনৈক শিষ্যকে ডেকে আদেশ করলেন, "যাও বাবা, এই হরিলুট নিয়ে ষ্টেশনে যাও। এই ট্রেনে আমার কমলা মা ও দুর্গাপদবাবা আসছেন। কমলা মাকে বলবে যেন ঐ হরিলুট সেবা ক'রে তবে ট্রেন থেকে নামে।" সে গুরুদেবের আদেশ শুনে অবাক হ'ল; এই তো গতকালই দুর্গাপদবাবুর চিঠি এসেছে— সাধারণ চিঠি, তাতে এখানে আসার কোনো ইঙ্গিতই নেই। হঠাৎ পাগলা বাবার এ কী পাগলামী? শিষ্যটি তাই প্রথমে গুরুদেবের আদেশ পালনে তেমন গা করল না। এদিকে সময় চ'লে যাচ্ছে। গুরুদেব আবার তাকে ডেকে ভৎর্সনা ক'রে বললেন, "এখনো যাওনি, বাবা? যাও, যাও শীঘ্র যাও।" সে তখন যাত্রা করল। কিন্তু তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না গুরুদেবের কথায়। সুতরাং ঘুরে ঘুরে, কোথাও বসে, কোথাও জিরিয়ে নিয়ে, যখন ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাল, তখন ট্রেন এসে গেছে।

ওদিকে ট্রেন ষ্টেশনে এসে পৌঁছানো মাত্র দুর্গাপদবাবু বাইরে প্ল্যাটফর্মে নামতে নামতে কমলাকে বললেন, "কৈ, কোথায় গুরুদেবের লোক?" ঠিক সেই সময়ে শিষ্যটি দ্রুতপদবিক্ষেপে ট্রেনের গাড়ীগুলির ভিতর দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে। প্ল্যাটফর্মে দুর্গাপদবাবুকে দেখে চীৎকার ক'রে বললে, "এই যে দুর্গাপদবাবু, আপনারা এসেছেন? গুরুদেব হরিলুট দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন"—এই ব'লে সে কমলার হাতে হরিলুট দিল এবং গুরুদেবের আদেশ জানিয়ে গাড়ীতে উঠে মালপত্র নামাতে লাগল। অন্তর্য্যামী প্রভুর এই ভক্তবৎসলতার নিদর্শন দেখে কমলা ও দুর্গাপদবাবু উভয়েরই দুই চোখ ছলছল করতে লাগল। তাঁকে উদ্দেশে প্রণাম ক'রে ওরা প্রসাদ খেল। আশ্চর্য্য হ'ল শিষ্যটিও।

যে কয়দিন গুরুদেবের শ্রীচরণে থাকার কথা সে কয়দিন অবস্থান ক'রে তাঁর লীলা দর্শন ক'রে ওদের বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে এল। বিদায়ের দিন সকালে ওদের গোছগাছ ঠিক হয়ে গেছে। ষ্টেশনে যাবার জন্য আশ্রম গেটে ওদের গাড়ী

দাঁড়িয়ে রয়েছে—এখন কেবল গুরুদেবের আদেশের অপেক্ষা। গুরুদেবকে মন্দিরে প্রণাম ক'রে দুর্গাপদবাবু বললেন, "গুরুদেব, এবার আমাদের যাত্রা করতে হবে, দয়া ক'রে আদেশ দিন।" গুরুদেব একবার বললেন, "এখনি না গেলে হয় না, বাবা?" দুর্গাপদবাবু জানালেন, "ছুটি ফুরিয়ে গেছে, না গেলে চাকরীর ক্ষতি হবে।" গুরুদেব শুধু একটু সংক্ষিপ্ত "হুঁ" ব'লে মন্দিরের দ্বার বন্ধ করলেন, বিদায় আদেশ দিলেন না। ওদিকে কমলা ভিতরে গুরুদেবকে প্রণাম করলে গুরুদেব যেন একটু পরিহাস ক'রেই বললেন, "ওমা, বাবা বলছে—এখনি তোমাদের যেতে হবে, না গেলে 'ক্ষতি' হবে।" 'ক্ষতি' কথাটার উপর গুরুদেব পরিহাসসূচক জোর দিলেন। তারপর গুরুদেব ছুট ক'রে কোথায় চলে গেলেন, চঞ্চল গোপালের মত,—আর তাঁর দেখাই নেই। ওদের বিদায়হরিলুটও দিলেন না। এদিকে ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে, দুর্গাপদবাবু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন।···

···এমন সময় হঠাৎ এ কী! ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলেন দুর্গাপদবাবু। কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে উপরে উঠে এসে বৈঠকখানায় শুয়ে পড়লেন। দারুণ শীত ক'রে কেঁপে প্রবল জ্বর এল তাঁর। কমলা ছুটে এল। গায়ে নানা আবরণ চাপিয়েও শীত যায় না। কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব এলেন। কমলাকে হাতযোড় ক'রে বললেন, "দেখলে তো, মা। গুরুদেব ঐ জন্তই বাবাকে আটকে রেখেছেন। যাও, বাসায় নিয়ে যাও এবং ভাল ক'রে বাবার সেবাযত্ন কর।" গুরুদেবের দণ্ডপাণিতলার আশ্রমে ওরা ছিল, সেখানেই গাড়ী ক'রে ওদের নিয়ে যাওয়া হ'ল।

দিনে দিনে জ্বরের প্রকোপ বাড়তেই লাগল। কমলাকে সদা সর্ব্বদাই রোগীর কাছে থাকতে হ'ত। তাই তার প্রসাদ আমি নিয়ে যেতাম এবং দু'বেলা গুরুদেবকে রোগীর সংবাদ জানাতাম। ক্রমশঃ রোগীর অবস্থা খারাপই হ'তে লাগল এবং আমি সমস্ত অবস্থাই গুরুদেবকে বিশদভাবে জানাতে লাগলাম। কমলা ও আমি শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে একান্তভাবে শরণ নিয়ে তাঁর শ্রীচরণ-আশ্রয়ে আমরা আছি—এরূপ নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় সেই সঙ্কটপূর্ণ দিনগুলি অতিবাহিত করতে লাগলাম। কিন্তু রোগীর অবস্থা ভাল তো দূরের কথা, ক্রমশঃই মারাত্মকভাবে খারাপ হয়ে উঠল। এখন রোগী সম্পূর্ণ বেহুঁস, গাত্রতাপ ১০৬°/১০৭°। সর্ব্বদাই মাথায় জলপটি লাগিয়ে বাতাস করা এবং গুরুদেবের শ্রীচরণামৃত একটু একটু সেবন করানো ছাড়া আর কিছুই করিনি আমরা। কোনো কোনো শিষ্য রোগীকে দেখতেও আসতেন। কিন্তু অবস্থার ক্রমাবনতি লক্ষ্য ক'রে একদিন মেজদাদা (সত্যহরি বাবু) গুরুদেবের সামনে আমাকে বললেন, "এ স্পষ্টতঃই malignant malaria, তার সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান; এখন meningitis অবস্থায় এসেছে। Quinine injection ছাড়া এর অন্ত কোনো ঔষধ নেই। তোমরা কিছুই

করছ না, একটা ডাক্তারও ডাকলে না। এভাবে ফেলে রাখলে এ আর বেশীক্ষণ বাঁচবে না। বিনা চিকিৎসায় এরূপ মারাত্মক ব্যাধিপীড়িত রোগীকে মেরে ফেলে শেষ কালে গুরুদেবের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপানো অন্যায় হবে।" মেজদাদা একটা কথাও ভুল বলেন নি। স্বয়ং গুরুদেব মেজদাদার কথা সমর্থন ক'রে হাতযোড় ক'রে বললেন, "মেজবাবা, তুমি বিদ্বান্, জ্ঞানবান্—তুমি ঠিকই বলেছ। দেখো দিকি, এখন কী করি আমি?" মেজদাদা বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়তে লাগলেন। তারপর মেজদাদা বাড়ী চ'লে গেলেন। গুরুদেবও মন্দির দ্বার বন্ধ করলেন। আমি অপরাধীর মতই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে খুট্ ক'রে শব্দ হ'ল। গুরুদেব দ্বার খুললেন; হাতে তাঁর একটি পাত্র। আমার দিকে করুণাঘন নয়নে চেয়ে বললেন, "কী করব? তোমাদের যে বিশ্বাস!" এই 'বিশ্বাস' কথাটি তিনি যথাসম্ভব জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন। তারপর ঔষধের পাত্রটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যাও, এখনি গিয়ে বাবাকে খাইয়ে দাও।" আমি ছুটতে ছুটতে গেলাম নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যার নিকট। রোগী তখন সম্পূর্ণ অচৈতন্য, সব বিষয়ে অশুভ লক্ষণ, মাথায় আইস্ ব্যাগ, অবিরাম বাতাস, আর মাঝে মাঝে একটু একটু জল মুখে দেওয়া হচ্ছে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঔষধের পাত্রটি কমলার হাতে দিয়ে বললাম, "কমলা, কমলা, গুরুদেব এই কথা ব'লে ঔষধ দিলেন।" এই ব'লে গুরুদেবের কথাগুলি সব তাকে বললাম। সে সজল নয়নে ঔষধটি মাথায় ঠেকিয়ে রোগীর মাথায় স্পর্শ করিয়ে তাকে খাইয়ে দিল।

রোগীর জীবনে পরদিন সূর্য্য আবার উঠলেন, রোগী নিশ্চিত মৃত্যুমুখ থেকে আবার জীবিত মর্ত্ত্যভূমে ফিরে এল। চোখ মেলে চাইল রোগী। হ্যাঁ, গুরুদেব তাকে বাঁচিয়েছেন, আবার জীবনের আলোক দেখতে পেল সে। রোগীর জ্বর সম্পূর্ণ ছেড়ে গেছে।

আমাদের চোখ জলে ভ'রে এল। নবীন উষায় যেন নবজীবন লাভ ক'রে আমরা সকলে মিলে সেই জগৎ-জীবন জগদীশ্বরের, আমাদের জীবন্ত ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করলাম।

বিদায় নেবার সময় গুরুদেব কমলাকে স্পষ্টই বললেন, "ওখানে থাকলে বাবাকে কি ফিরে পেতে, মা? কেবল অর্থদণ্ডই হ'ত।"

বাস্তববাদী মেজদাদা এই রোগ-আরোগ্যের কোনো কারণ খুঁজে পাননি, কেউ পাবেও না কখনো। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করলাম,—হঠাৎ প্রেরণা দিয়ে দুর্গাপদ-বাবুকে নবদ্বীপে তাঁর-শ্রীচরণ সমীপে নিয়ে আসা, অন্তর্য্যামী প্রভুর ষ্টেশনে লোক পাঠানো, বিদায়ের দিনে ওঁদের বিদায় দিতে ইতস্ততঃ করা, এবং পরিশেষে আমাদের 'বিশ্বাসে'র দৃঢ়তার সুকঠিন পরীক্ষা—এই সবই সেই ভক্তবৎসল

ভগবানের, সেই অন্তর্য্যামী গুরুদেবের তাঁর একান্ত ভক্তদের প্রতি তাঁর করুণারই নিদর্শন।

বলা বাহুল্য, এই লীলায় তাঁর (১১) সংখ্যায় কথিত 'অন্তর্দৃষ্টি' ও (১২) সংখ্যার 'দূরদৃষ্টি'রও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রয়েছে। অনন্যশরণ ও একান্ত ভক্তকে রক্ষা ও তাদের স্বীয় মহিমা জ্ঞাপনই এই লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য।

নিম্নের ঘটনা দুটি আমাদের গুরুদেবের পরমভক্ত মতিহারীর ডাক্তার কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা। কান্তিদাদা তখন নতুন ডাক্তার হয়ে একদিন গুহাশ্রমে এসেছেন। মন্দিরে প্রবেশ ক'রে গুরুদেবকে প্রণাম করবামাত্র, গুরুদেব তাঁকে হরিলুট প্রসাদ দিয়েই বললেন, "ডাক্তার বাবা, তোমার একটি রোগী আছে, যাও দেখে এসো একটি।" কান্তিদাদা শুধালেন "কোথায়?" গুরুদেব বললেন, "উপরে, ঐ রান্নাঘরে।" কান্তিদাদা উপরে উঠে এসে রান্নাঘরে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, এক মুমূর্ষু রোগিণী শুয়ে আছে, তার জ্ঞান-চৈতন্য নেই, একেবারে বেহুঁস—এসিয়াটিক কলেরার শেষ অবস্থা। রোগিণীকে ভাল ক'রে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গেলেন। একবার নাড়ী পরীক্ষা করলেন; অতিকষ্টে একটু অতি ক্ষীণ জীবনস্পন্দন কখনো পাওয়া যায় মাত্র। মুখচোখ ব'সে গেছে, সমস্ত অঙ্গ হিমশীতল। ডাক্তার হিসাবে যা' দেখবার দেখে তিনি একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গুরুদেবের কাছে আসতেই, গুরুদেব উৎসুক হয়ে শুধালেন, "কেমন দেখলে, ডাক্তার বাবা?" কান্তিদাদা বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "একেবারে শেষ অবস্থা, রাত্রিটা টেঁকে কিনা সন্দেহ।" গুরুদেব শুধু একবার "হুঁ" ব'লে চুপ করলেন। তারপর বললেন, "যাও বাবা, ঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে এসো।" কান্তিদাদা আর কী করেন? ঘরের শিকলটা দিয়ে এলেন। কিন্তু নবীন ডাক্তারের মনে কেবলই একটি কাঁটা বিঁধতে লাগল—হায়, হায়,—একেবারে বিনা চিকিৎসায়, কোনো medical help দেওয়ার চেষ্টা না ক'রে, বেঘোরে রোগিণীটি প্রাণ হারালো গুরুদেবের এই আশ্রমে। সময়মত medical help পেলে হয়তো ওভাবে ওর মৃত্যু হ'ত না। কিন্তু এখন ও সব রকম চেষ্টার বাইরে চ'লে গেছে। হায়রে! চিকিৎসা বিজ্ঞানে উপায় থাকলেও, অজ্ঞতা ও অবহেলা বশতঃ এইরূপ কত নিরীহ লোকের যে প্রাণ যায়! আর তা' ছাড়া এতে আশ্রমেরও তো সুনাম হবে না। নতুন পাশ করা ডাক্তারের মনে এইভাবে অনুতাপের কণ্টক বিঁধতে লাগল।

পরদিন প্রত্যূষে কান্তিদাদা মন্দিরে প্রবেশ ক'রে গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই দেখেন যে গুরুদেব একথালা বাসি অন্ন তরকারী সাজিয়ে নিয়ে হাতে

ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন এবং কান্তিদাদাকে বলছেন, "ডাক্তার বাবা, এই নাও,—এই তোমার রোগিণীর পথ্য; ওকে খেতে দিয়ে এসো।" কান্তিদাদার মনে হ'ল তিনি কানে ঠিকমত শুনছেন কিনা;—গুরুদেব কার কথা বলছেন? রোগিণী তো তিনি একজনই দেখেছেন, সেই কলেরা-রোগিণী; সে নিশ্চয়ই এখন মারা গেছে, তবে? তার কথাই বলছেন নাকি, এই বাসি ভাতের থালা নিয়ে তাকেই খাওয়াতে হবে? একি পরিহাস? একটি অবহেলিত মৃত রোগিণীকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা? এ কথা অন্য কেউ যদি বলত, তবে তার সমুচিত জবাব তিনি দিতেন; কিন্তু থালা হাতে যিনি দাঁড়িয়ে, তিনি স্বয়ং গুরুদেব এবং তিনিই এ আদেশ করছেন। ডাক্তারবাবুর মনের ক্রোধ সহসা ধাক্কা খেল অপরিসীম বিস্ময়ের আঘাতে। তিনি নির্ব্বাক হয়ে গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে তাঁর প্রদত্ত বাসি ভাত তরকারীর থালাটি গ্রহণ করলেন। থালা নিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে তিনি ভাবছেন, ঘরে ঢুকে তিনি তো দেখতে পাবেন একটি মৃতদেহ; আর যদিও বা কোনো ক্রমে সে এখনো বেঁচে থাকে, তবু এসিয়াটিক কলেরা রোগীর এই কি পথ্য? তা' ছাড়া এসব সে এখন খেতেই বা পারবে কেন? এতে তার রুচিই হবে না। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ডাক্তারবাবু ঘরের শিকলটি খুলে যা' দেখলেন, তাতে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। যাকে তাঁর সামনে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ব'সে থাকতে দেখছেন, সে কি কালকের সেই মুমূর্ষু রোগিণী! না এ প্রেতমূর্ত্তি সুস্থ শরীরে বেশ কাপড়-চোপড় গুছিয়ে প'রে ব'সে তাঁর চোখে ধাঁধা লাগাচ্ছে। ঐ যে তাঁর দিকে বেশ ভাল ক'রে চেয়ে ও কথাও বলছে—হাঁ, বেশ সুস্পষ্ট, সবল কণ্ঠের স্বর, দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতার নামগন্ধও নেই—"কান্তিদাদা নাকি? গুরুদেব আমার জন্য কিছু খাবার পাঠিয়েছেন? দিন, দিন, বড় খিদে পেয়েছে।" ধীরে ধীরে এগোলেন ডাক্তারবাবু, বাসি ভাত তরকারীতে পরিপূর্ণ থালাটি তার সামনে রাখলেন। সে তখন গো-গ্রাসে খেতে লাগল সেই বাসি ভাত তরকারী। ডাক্তারবাবুর দু'চোখ সজল হয়ে উঠল। হাঁ, এ সেই রোগিণীই বটে,—তার প্রেতাত্মা নয়। কিন্তু কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে তার এ পরিবর্ত্তন আনা সম্ভব হ'ত না। তাই ডাক্তার বাবু সজল চোখে সেই অসীম শক্তিশালী ভগবানের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম ক'রে বললেন, "হে ভগবান্, যে বলে সে তোমার মহিমা জানে সে জানুক,—কিন্তু আমি আজ শুধু এই বলতে পারি যে তোমার অপার মহিমার এক বিন্দুও আমি অবগত নই।"

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল হৃষীকেশ তীর্থে ইং ১৯২৬ সালের মে মাসে। গুরুদেব ভক্তগণের সাধ মেটাতে এ সময়ে তাদের তীর্থযাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন।

কান্তিদাদাও গুরুদেবের সঙ্গে আছেন। কান্তিদাদার সঙ্গে দু'এক জন বন্ধু আছেন। একদিন কান্তিদাদার ইচ্ছা হ'ল, গুরুদেবকে না জানিয়ে বাসে ক'রে একটু ইচ্ছামত বেড়িয়ে আসি। গুরুদেবকে জানালে হয়তো তিনি যেতে দেবেন না, আর তাঁর নিজের খুশী মাফিক বেড়ানোও হবে না। গুরুদেব তখন বিশ্রাম করছিলেন, এই সুযোগে কান্তিদাদা তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে এলেন এবং রাস্তায় বাস-ষ্ট্যাণ্ডে এসে বাসের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ওমা একী! বাস আসার আগেই গুরুদেব সদলবলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অ্যাঁ! গুরুদেব জানলেন কী ক'রে যে ওঁরা লুকিয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছেন? আশ্চর্য্য তো! উঃ, এরূপ অন্তর্য্যামী প্রভুর কাছে তো কিছুই লুকাবার যো নেই দেখা যাচ্ছে। অতএব—লজ্জায় কান্তিদাদার যেন মাথা কাটা গেল। বাস এসে গেল, গুরুদেবের সঙ্গে সবাই বাসে উঠে হৃষীকেশে নামলেন। গুরুদেব বাস থেকে নেমেই ভক্তগণসহ দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলেন। কান্তিদাদাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন, কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পরই তাঁর পেট ব্যথা ক'রে উঠল; তিনি শৌচক্রিয়ার জন্য মাঠের দিকে গেলেন। পায়খানা করতে ব'সেই জলের মত দাস্ত হ'ল, তারপরই অবসন্ন হয়ে সেই খানেই শুয়ে পড়লেন। তাঁর বন্ধুটি এগিয়ে এসে দেখলেন—তাঁর আর উঠবার ক্ষমতা নেই, অবস্থা মুহূর্ত্তে সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। বন্ধুটি ছুটলেন গুরুদেবের কাছে। তাঁর কাছে কান্তিদাদার অবস্থা সব জানালেন। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! এমন পরম দয়াল প্রভু এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারেন!—ভাবলেন বন্ধুটি। গুরুদেব ফিরেও চাইলেন না বা দেখতেও এলেন না মুমূর্ষু কান্তিদাদাকে; শুধু তাচ্ছিল্যভরে মৃদুস্বরে একবার বললেন, "ঐ একটু গঙ্গাজল মুখে দাও তার।" তারপর তাঁর শিষ্যদের সাথে কথাবার্ত্তা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন। গুরুদেবের এই উদাসীনতায় বন্ধুটি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু কী আর করবেন তখন? ফিরে এসে কান্তিদাদাকে গুরুদেবের কথা সব জানালেন। তখন কান্তিদাদা ওঁকে গঙ্গাজল এনে খাইয়ে দিতে বললেন। গঙ্গাজল খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কান্তিদাদার মনে হ'ল যেন তিনি নবজন্ম লাভ করেছেন; তিনি উঠে বসলেন। বন্ধুটি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "থাক্ থাক্ উঠতে চেষ্টা করোনা এখন। বড় দুর্ব্বল হয়েছ।" কান্তিদাদা মৃদু হেসে বললেন, "না, দুর্ব্বল আর নই। গুরুদেব আমার মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করেছেন।" বন্ধুটি রীতিমত বিস্ময়ে বললেন, "কেমন করে? তিনি তো তোমাকে গ্রাহ্যই করলেন না। ফিরেও চাইলেন না তোমার দিকে, তোমার কথা শুনতেই চাইলেন না।" কান্তিদাদা উঠতে উঠতে বললেন, "বাইরের চোখে তাঁকে দেখতে হয় না, অন্তরের পথে তাঁর আনা গোনা—এবং আমার অন্তরেই এসেছেন তিনি ও

শক্তি সঞ্চার করেছেন। তাঁর মহিমা বুঝবে কে ?" এই ব'লে তিনি বেশ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চললেন গুরুদেবের অভিমুখে। যেতে যেতে বললেন, "আমার যে একটা মারাত্মক দুর্গ্রহ আসছে, তা' তিনি আগে থেকেই জানতে পেরেছেন। সেই দুর্গ্রহই আমাকে টেনে এনেছিল মরণের ফাঁদে. গুরুদেবকে না জানিয়ে। কিন্তু তিনি অন্তর্য্যামী, তিনি ভক্তবৎসল, তিনি পরম করুণ, তিনি তাঁর শ্রীচরণ আশ্রিত ভক্তের একমাত্র রক্ষক। তাই ছুটে এসেছেন এই অবাধ্য সন্তানের পিছু পিছু, এই দুর্গ্রহদুষ্ট আশ্রিত জনকে বাঁচাবার জন্য। আমাকে রক্ষা করার জন্যই আজ তাঁর এই অভিযান—এ কথা বুঝতে পারলে না ?" এই বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ জলে ভ'রে এল।

তৃতীয় ঘটনাটি শুনেছি আমাদের অতি প্রিয় ও পরম গুরুভক্ত শ্রদ্ধাস্পদ মাষ্টার দাদার মুখে। মাষ্টারদাদা তখন বহুদিন থেকে পুরাতন অজীর্ণ রোগে ভুগছিলেন। কলকাতায় তাঁর বহু পরিচিত সুচিকিৎসক ছিলেন এবং সৎপরামর্শ দাতারও অভাব ছিল না। বিধান রায় থেকে আরম্ভ ক'রে বহু ডাক্তার, বহু কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন। সে সবে বিফল হয়ে টোটকা চিকিৎসাও কিছু করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। অবস্থা দিন দিন খারাপই হ'তে লাগল। পরিশেষে তিনি প্রায় কঙ্কালসার হয়ে গেলেন, মেজাজ অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয়ে উঠল, কিছুই যেন আর ভাল লাগে না। তখন একদিন তাঁর মনে হ'ল—যাই, একবার গুরুদর্শন ক'রে আসি। এদিকে মাষ্টার দিদি তো তাঁর এ সঙ্কল্প শুনে কেঁদে আকুল। এই অবস্থা নিয়ে কী ক'রে আশ্রমে যাবেন ? সেখানে কে তাঁকে দেখবে ? বিশেষতঃ ঘণ্টায় ঘণ্টায় যাঁর পায়খানা যেতে হয়, তাঁর মত এই দুর্ব্বল শরীরে, এত অসহায় অবস্থায়—মাষ্টার দিদি কেঁদে ফেললেন। মাষ্টার দাদা কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না ; মৃদুকণ্ঠে শুধু বললেন, "আমার গুরু সহায় আছেন।" এই ব'লে গোছগা'ছ করতে লাগলেন। মাষ্টার দিদি তাঁর জিদ্‌ দেখে অনন্যোপায় হয়ে তাঁর যা' কিছু গু'ছিয়ে দিয়ে বললেন, "থেকোনা—আজই চ'লে এসো।"

মাষ্টারদাদা গুরু স্মরণ ক'রে যাত্রা করলেন। গুরুদেব তখন মেমারীর নিকট নিঃশঙ্ক আশ্রমে অবস্থান করছেন। মাষ্টারদাদা নিরাপদে আশ্রমে পৌছিয়েই গুরুদেবের দর্শন পেলেন। গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে উঠে বসতেই গুরুদেব তাঁকে স্বহস্তে হরিলুট দিয়ে বললেন, "খাও, বাবা খাও।" কিন্তু গুরুদেব আঁজলা ভরে যে দ্রব্য তাঁকে খেতে দিলেন, তা' দেখে তিনি চমকে উঠলেন—চানাচুর, বাদাম ভাজা, তাও কম নয়, গুরুদেবের হাতের এক আঁজল ভরা। মাষ্টার দাদা একবার ভাবলেন, বলি, "আমি কঠিন দুরারোগ্য অজীর্ণ ব্যাধিতে ভুগছি।" কিন্তু

পরমুহূর্ত্তেই তাঁর মনে হ'ল, গুরুদেব অন্তর্যামী ভগবান্, তিনি সবই জানেন ; সুতরাং তিনি স্বহস্তে তাঁকে যে-প্রসাদ খেতে দিলেন, তাঁর শ্রীহস্তস্পর্শধন্য সেই পবিত্র প্রসাদ কিছুতেই ত্যাগ করা যেতে পারে না, তাতে তাঁর যাই হোক না কেন। এই ভেবে তিনি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে (বলা বাহুল্য, পুরাতন অজীর্ণ রোগে এরূপ দুষ্ট ক্ষিধে ও অপাচ্য দ্রব্যে রুচি হয়েই থাকে) মচ্‌মচ্ শব্দে চানাচুর বাদাম ভাজা খেতে লাগলেন। গুরুদেব মাষ্টারদাদার মুখে তৃপ্তির চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে বললেন, "এই নাও, আর এক মুঠো খাও।" এই ব'লে আবার এক আঁজলা সেই চানাচুর দিলেন। মাষ্টার দাদা নিমেষের মধ্যে সে সব শেষ ক'রে ফেললেন। গুরুদেব তখন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "খাবে, বাবা, আর কিছু ?" মাষ্টার দাদার যেন রাক্ষসী ক্ষুধা জেগে উঠল ; তিনি হ্যাঁ, না কিছুই বললেন না। গুরুদেব বুঝতে পেরে বললেন, "দাঁড়াও, দেখি, আর কিছু আছে কিনা।" তারপর ঘর থেকে একটি ঝুড়ি নিয়ে এসে বললেন, "এই নাও, তোমার জন্যই রয়েছে ; কালকের ফুলুরি, বেগুনি ও সিঙাড়া—হোক্ বাসি, খেয়ে ফেল।" মাষ্টার দাদা সাগ্রহে দু-হাত পেতে সে সব তেলে-ভাজাগুলি নিলেন এবং গো-গ্রাসে খেতে লাগলেন। তাঁর পেট প্রায় ভ'রে গেল। গুরুদেব তাঁর পরিতৃপ্ত মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "খুব ভাল লাগল, নয়, বাবা ?" মাষ্টার দাদা উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবা।" তারপর গুরুদেব অন্যান্য শিষ্যদের সাথে কথাবার্ত্তা ও আলাপ-আলোচনায় রত হ'লেন। মাষ্টারদাদার সঙ্গে আর কোনো কথা হয় নি। দুপুর বেলা স্নান আদি সেরে মাষ্টার দাদা ব'সে আছেন। গুরুদেব হঠাৎ একটি বাল্‌তী হাতে মাষ্টারদাদার কাছে এসে বললেন, "বাবা, ক্ষিধে পেয়েছে না ?" মাষ্টার দাদা তো আশ্চর্য্য ! সত্যিই বেশ ক্ষিধে পেয়েছে। এই তো কিছু আগে এত খেলাম, কিন্তু দুপুর না হ'তেই আবার এত ক্ষিধে ! সানন্দে বললেন, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" গুরুদেব তখন বললেন, "পাতা নিয়ে ব'সে পড় দেখি।" মাষ্টার দাদা তখন পাতা নিয়ে বসলেন ; গুরুদেব সেই পাতভর্ত্তি খিচুড়ি ঢেলে দিয়ে বললেন, "নাও, বাবা, খেয়ে নাও। গরম গরম খিচুড়ি, অড়হর ডালের খিচুড়ি, খুব উৎকৃষ্ট স্বাদ, খেয়ে দেখ।" স্বাদ দূরের কথা, সেই গরম খিচুড়ির সুগন্ধেই মাষ্টার দাদার ক্ষিধে আরো বেড়ে গেল। তিনি পেট ভ'রে সেই দুষ্পাচ্য অড়হর ডালের খিচুড়ি খেলেন। গুরুদেব আরো দু'বার খিচুড়ি দিয়ে গেলেন। তারপরে রাত্রেও যথা-রীতি প্রসাদ খেয়ে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে ভাবছেন তিনি—আজ যা' খেলাম, তাতে এখনো পর্যন্ত তো খারাপ কিছুই হয় নি। এতক্ষণ গুরুদেবের সন্নিকটে থেকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই পেয়েছি, নিজের রোগের কথা ভুলেই গেছি। কিন্তু রাত্রে বা প্রভাতে কী হয় কে জানে ? এই ভেবে শ্রীগুরুচরণ স্মরণ করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে

পড়লেন। এক ঘুমে রাত কেটে গেল। ভোরে 'জয় গুরু' ব'লে উঠেই ভাবছেন, বাঃ, এমন সুন্দর ঘুমতো বাড়ীতে হয় না। তারপর বাইরে পুষ্করিণীর ধারে মাঠে এলেন শৌচকৃত্যে। পায়খানা করতে করতে তিনি বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। এমন সুন্দর স্বাভাবিক দাস্ত তাঁর গত ছয় মাসে একদিনও হয় নি। মল এঁটে গেছে এবং পেটে কোনো যন্ত্রণা বা শরীরে দুর্ব্বলতার লেশমাত্র নেই। এও কি সম্ভব! ভাবতে ভাবতে উঠে এলেন তিনি। চলতে চলতে তাঁর মনে হচ্ছে, নতুন প্রভাতে যেন নব-জীবন পেয়েছেন তিনি; দেহে-মনে-প্রাণে একী স্বচ্ছন্দতা, একী সুস্থ ভাব, একী আনন্দ! কোথায় তাঁর রোগ? রোগ তাঁর একেবারে সেরে গেছে—হ্যাঁ, একদিনেই। গুরুদেবকে তিনি তাঁর ব্যাধির কথা কিছুই জানান নি —শুধু ব্যাকুল হয়ে, অতিষ্ঠ হয়ে, শান্তির কামনায় সেই শান্তিময়ের চরণোপান্তে ছুটে এসেছিলেন। আর সেই অন্তর্য্যামী প্রভু, সেই ভক্তবৎসল ভগবান, সেই নিরুপায়ের উপায়, সেই করুণাময় গুরুদেব তাঁর সব ব্যাধি সমূলে নিরাময় ক'রে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গুরুদেবের প্রতি তাঁর স্থির বিশ্বাস আছে কিনা, তা' পরীক্ষা করবার জন্যই তাঁকে অজীর্ণ ব্যাধির পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য কুপথ্যগুলি পেট ভরে খেতে দিয়েছেন। সেই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন; তিনি সানন্দে ও সাগ্রহে তাঁর শ্রীহস্তপরিবেশিত কুপথ্যগুলি, তাঁর রোগের পক্ষে বিষ হ'লেও, অমৃত জ্ঞানে সেবা করেছেন। তাই সেই অন্তর্য্যামী করুণাময় প্রভু তাঁকে করুণাও করেছেন অকৃপণভাবে, একদিনেই তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধির সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয়েছে!

ভাবতে ভাবতে তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বেয়ে পড়ল। গুরুদেবকে এসব তিনি কিছুই জানালেন না। তাঁর স্নেহরসে অভিষিক্ত হয়ে আরো দু'তিন দিন তাঁর শ্রীচরণে রয়ে গেলেন। এদিকে কলকাতায় মাষ্টার দিদি ভেবে আকুল হ'তে লাগলেন। শেষে একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সংবাদ নেবার জন্য। লোকটিকে দেখে মাষ্টার দাদা বিরক্ত হয়ে তাকে ভৎর্সনা করলেন। বললেন, "আমি কি ছেলেমানুষ?" লোকটি বললে, "আপনার এত অসুখ!—মা ভাবলেন, যদিবা খারাপ কিছু হয়ে থাকে—তাই—" মাষ্টারদাদা হেসে বললেন, "আমি কোথায় এসেছি, সে জানে না? এখানে কি খারাপ হয়? আমি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছি। যা' চলে যা'! আমি আরো কিছুদিন থাকব।"

গুরুদেব কিন্তু বাধা দিয়ে বললেন, "না বাবা। মা বুঝবে না। বিশ্বাস হবে না তার। তুমি যাও, চলে যাও। আর দেরী করো না।"

অপরের মারাত্মক ব্যাধি নিজ শরীরে গ্রহণ ও তা' ভোগ ক'রে তাকে রোগমুক্ত করার বহু দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে একটি অতি সাংঘাতিক Pox রোগীর বৃত্তান্ত

জানি। তার অসুখ সারবার নয়। কিন্তু তার আত্মীয় স্বজন এমন ভাবে গুরুদেবের কাছে কেঁদে পড়ল যে দয়াময় প্রভু নিজ শরীরে তার রোগ গ্রহণ ক'রে রোগীকে সুস্থ ক'রে তুললেন। তিনদিন গুরুদেব গুহার দ্বার খুললেন না। যেদিন দ্বার খুললেন—দেখা গেল তাঁর মুখে ও গায়ে বসন্তের দাগ!! এ ছাড়া নাছোড়বান্দা একান্ত শরণাগত বহু ভক্তের বহু মারাত্মক ব্যাধি তিনি নিজ শরীরে গ্রহণ ও ভোগ ক'রে তাদের রোগমুক্ত করেছিলেন। এরূপে গুরুদেবের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙে পড়েছিল। গুরুদেব তাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন, "যখন পাপ করেছিলে (তিনি প্রত্যেকের কৃত কুকর্মের বিবরণ ব্যক্ত ক'রে বলতেন), তখন জ্ঞান ছিল না?" তথাপি সেই করুণাময় প্রভু, তাঁর স্বভাব কারুণ্যবশতঃই, আর্তের কাতর ও হৃদয় ভেদী আর্তি শ্রবণ ক'রে ঠিক থাকতে পারতেন না, এবং অনেক সময়েই পাপীর পাপ নিজে গ্রহণ করতেন এবং স্বয়ং রোগাক্রান্ত হয়ে তাদের মুক্ত করতেন। সেইজন্য আমি শেষের দিকে রোগীদের রোগ আরোগ্যের আবেদন নিয়ে তাঁর কাছে আসতে দিতাম না, সাধ্যমত তাদের ঠেকিয়ে রাখতাম। কিন্তু সব সময় পারতাম না। সেই সব স্বার্থান্ধ পাপীর সংস্পর্শ থেকে সর্ব্বদা তাঁকে দূরে রাখতে অসমর্থ হতাম।

(৫) ইচ্ছামত অপরের মন নিয়ন্ত্রণ: গোমোয় CID Inspector মুগ্ধ

গোমো তপোবন আশ্রমে ইং ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এক স্বনামখ্যাত দুর্দ্ধর্ষ CID Inspector রায়বাহাদুর জে. এন. মুখার্জী আশ্রমে এলেন enquiry করতে। তিনি এসেই সদম্ভে তাঁর পরিচয় দিলেন। আশ্রমের ভীত চকিত শিষ্যগণ সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবকে এই সংবাদ দিলেন। বলা বাহুল্য, আশ্রমবাসীরা সকলে ভয়ে কাঁপতে লাগল। কারণ সেই ব্রিটিশ আমলে পুলিশের অত্যাচার কত ভয়ানক ছিল, বিশেষ ক'রে একজন জাঁদরেল রায়বাহাদুরের প্রতাপ কত প্রচণ্ড, তা' তখনকার মানুষ মাত্রেই হাড়ে হাড়ে অবগত ছিল। কিন্তু স্বয়ং গুরুদেব হাসিমুখে বললেন, "ওঁকে দুয়ারের সামনে এসে ডাকতে বল।" শিষ্যরা সেই কথা বলাতে Inspector সাহেব গুরুদেবের মন্দিরদ্বারের সমুখে ব'সে ডাকলেন, "সাধুবাবা, দর্শন দিন।" তাঁর ডাকার পরই গুরুদেব মন্দির দ্বারটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ক'রে শুধু কৌপীনমাত্র পরিধান ক'রে করযোড়ে সেই রায়বাহাদুর CID Inspectorএর সমুখে দণ্ডায়মান হলেন। Inspector সাহেব বিস্ফারিতনয়নে গুরুদেবের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন বারংবার। যতই দেখতে লাগলেন, ততই তাঁর বিস্ময় বৃদ্ধি পেতে লাগল, বারবার দর্শন ক'রে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবে তিনি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। অতবড় ঝানু CID Inspector এর মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হল না, বিপুল বিস্ময়ে তিনি একেবারে হতবাক্ হয়ে গেলেন। তাঁকে

অনেকক্ষণ এইরূপ নীরব দেখে গুরুদেবই সেইরূপ করযোড়ে অতি মৃদু ও নম্রকণ্ঠে বললেন, "Inspector বাবা, আপনি দয়া ক'রে enquiry করতে এসেছেন, দেখুন, সব দেখুন। আমি তো সবই আপনার কাছে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছি। দেখুন, ঘরে আসুন, যা' প্রশ্ন করতে হয় করুন।" সেই পরম প্রবীণ ও বহুদিনের অভিজ্ঞ CID Inspector সাহেবের দুই চোখ ছলছল ক'রে উঠল ; কম্পিত কণ্ঠে তিনি একটু একটু ক'রে বললেন, "সাধুবাবা ক্ষমা করুন ; আপনাকে চিনতে পারি নি। আপনি যে কী জিনিস, তা' আপনাকে দেখার আগে আমি একটুও বুঝতে পারি নি। আমার এ প্রগল্‌ভতা, এ ধৃষ্টতার জন্য আমি করযোড়ে আপনার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি। কিন্তু কী করবো, সরকারী হুকুম তামিল করতেই আপনার আশ্রমে আপনার কাছে আমাকে আসতে হয়েছে। কিন্তু আপনি যে এমন জিনিস—" তাঁর কথা শেষ না হ'তেই গুরুদেব তেমনি হাতযোড় ক'রেই বললেন, "ঠিকই করেছেন আপনি। সরকারী হুকুম মতই কাজ করেছেন। আসুন, ঘরে আসুন সব enquiry ক'রে দেখুন।" তখন করযোড়ে রায়বাহাদুর সাহেব মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "কোনো প্রয়োজন নেই আর, সাধুবাবা। আমি আপনাকে দেখেই সব বুঝেছি। আমাদের অভিজ্ঞ চোখ। আপনার বা আপনার আশ্রমস্থিত কোনো ব্যক্তি দ্বারা কারো কোনো অনিষ্ট হ'তে পারে না। আপনি মঙ্গলময়, আপনি সকলের কল্যাণব্রতই সাধন করছেন। এ আমি বেশ ভাল ক'রেই বুঝেছি। আপনি মহত্তম, আপনার দর্শনে আজ আমি ধন্য ও পবিত্র হলাম। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।" এই ব'লে তিনি গুরুদেবকে ভক্তিভাবে প্রণাম করলেন। গুরুদেবও তাঁকে বহু মিষ্টান্ন হরিলুট দিয়ে বাড়ী যেতে বললেন। গুরুদেবের কাছে বিদায় নেবার পর সেই Inspector সাহেব আশ্রমস্থিত শিষ্যদের ডেকে তাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন ; শুধালেন, "আচ্ছা, এক বৎসর আগে এই আশ্রমে এই সাধুবাবার কাছে কোনো সাহেব এসেছিলেন কি ?" এক বৎসর আগের কথা। অনেকে ভুলেই গিয়েছিলেন। পরে একজন শিষ্য মনে ক'রে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে,—একজন সাহেব এসেছিলেন। কী নাম যেন,—হ্যাঁ, Sprat সাহেব।" রায়বাহাদুর বললেন, "Exactly ! তাঁর কথাই বলছি। তিনি একজন আন্তর্জাতিক communist গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, meerut conspiracy case এর আসামী। সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার তাঁকে arrest করেছেন। তাঁর diaryতে গত বৎসরে এই সময়ে এই আশ্রম ও এই আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ সাধুবাবার নামোল্লেখ আছে। তাই সরকার পক্ষে এই enquiryর হুকুম। তিনি কেন এখানে এসেছিলেন, এখানের সঙ্গে তাঁর কী সম্বন্ধ—এটা জানা সরকারের প্রয়োজন। এখন দয়া ক'রে আমাকে বলুন, তিনি এখানে কেনই বা এসেছিলেন এবং কী কী করেছিলেন।" তখন সেই শিষ্যটি

সবিস্তারে Sprat সাহেবের কথা বর্ণনা করলেন। সাহেব এসেই গুরুদেবের নামোল্লেখ ক'রে তাঁর দর্শন প্রার্থনা করেন। গুরুদেব সাহেবকে দর্শন দিলেন। দর্শন ক'রে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে সাহেব বললেন, "আমি যা' শুনেছি তা' সত্য দেখছি। আপনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী। আপনি ভূত ও ভবিষ্যৎ সবই জানেন। আপনি জীবমাত্রেরই মঙ্গল করেন। আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসু হয়ে এসেছি। আপনি নিশ্চয়ই আমার অতীত ও বর্ত্তমানের সব বিষয় অবগত আছেন। সে সব আপনাকে খুলে বলার কোনো প্রয়োজন নেই, তা' আমি জানি। তবে আমি যে ভবিষ্যৎ পন্থা নিতে যাচ্ছি, তাতে আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। এই প্রসঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কাছে কয়টি প্রশ্ন করছি। দয়া ক'রে আপনি তার উত্তর দিন। প্রথম, আমি যে কার্য্য করতে অগ্রসর হচ্ছি, তাতে সফল হব কিনা। দ্বিতীয়, আমি সরকার কর্ত্তৃক বন্দী হব কিনা। তৃতীয়, আমার জীবনের কোনো আশঙ্কা আছে কিনা।" গুরুদেব সব শুনে দুয়ার বন্ধ ক'রে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ পরে শিষ্যদের দ্বারা মিষ্টান্ন হরিলুট দিয়ে ব'লে দিলেন, "সাহেবকে ব'লে দাও যে তার জীবনের কোনো আশঙ্কা নেই।" শিষ্যরাও সাহেবকে সেই মত বললেন। সাহেব শুধালেন, "কিন্তু আমার আর দুটি প্রশ্নের উত্তর?" শিষ্যরা বললেন, "আমাদের যা' আদেশ করেছেন, তাই বললাম।" সব শুনে সাহেব বিদায় নিলেন। গভীর মনোযোগের সহিত রায়বাহাদুর Sprat সাহেবের সব বৃত্তান্ত শুনলেন এবং পরম পরিতৃপ্ত হয়ে সাধুবাবাকে বারবার প্রণাম জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। বলা বাহুল্য, Sprat সাহেবের প্রথম দুটি আশা পূর্ণ হয় নি, তাই গুরুদেবও সে প্রশ্নের উত্তর দেন নি। আর Sprat সাহেব যে অন্ততঃ ইং ১৯৪৫ সালেও জীবিত ছিলেন ও বোম্বেতে বাস করতেন, তা' আমি সংবাদপত্রে দেখেছি।

এইবার বড়বাজারের দুর্দ্দান্ত 'সখি' গুণ্ডার কথা বিবৃত করব। কলকাতার এই কুখ্যাত গুণ্ডা গুরুদেবের কাছে ছিনতাই করতে এসে কীভাবে তাঁর অলৌকিক প্রভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছিল তাই শুনুন। অবশ্য এর বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। গুরু আশ্রমে অবস্থান ক'রে, গুরুর শিষ্য হয়েও, নিছক বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় 'চক্রান্ত' ক'রে যে সব 'ধূর্ত্ত' চোর গুরু আশ্রমে চুরি করেছে, তাদের তিনি ক্ষমা তো করেনই নি, উপরন্তু তাদের যথোচিত এবং 'আদর্শ' সাজা দিয়েছেন সকলের সম্মুখে, publicly এবং চিরজীবনের জন্য ত্যাগ করেছেন। তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—'চোর পঞ্চানন', এবং আরো কিছু নির্ব্বোধ বিষয়লোভী, যারা নিজেদের খুব 'চালাক' মনে ক'রে থাকে। মজার কথা এই যে কলিযুগে এদের সমর্থকই বেশী। তারা এই সব বিষয়লোলুপ কুচক্রীকে মাথায় তুলে নৃত্য করতে সাতিশয় গর্ব্ব ও আনন্দ বোধ করে!

দুর্জ্জনদের দুষ্কীর্তি লিখে লেখনী কলঙ্কিত করার ইচ্ছা নেই আমার। তারচেয়ে 'রত্নাকর' সদৃশ কুখ্যাত সখি গুণ্ডার শুভ পরিবর্ত্তনের কথা শুনুন। অনেকদিন আগেকার কথা। গুরুদেবের তখন কোনো স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় নি। গুরুদেব একদিন কিছু মূল্যবান্ বস্ত্র কাঁধে ফেলে কলকাতার বড়বাজারের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পিছন হ'তে কে যেন একটি দামী কাপড় ছিনিয়ে নিল। গুরুদেব জানতে পেরেও পিছন ফিরে তাকালেন না, উপরন্তু আরো যে কাপড়গুলি তাঁর কাঁধে রাখা ছিল, সেগুলিও পিছনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন এবং কোনোদিকে না চেয়েই, যেন কিছুই ঘটেনি এইভাবে হন্ হন্ ক'রে এগোতে লাগলেন। সখি গুণ্ডাই কাপড় ছিনিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু গুরুদেবের আচরণে সে একেবারে স্তম্ভিত। যার দামী কাপড় সে ছিনিয়ে নিল, সে তা' জানতে পেরেও একবার পিছন ফিরে দেখলও না, উপরন্তু বাকী কাপড়গুলি তাকে দিয়ে দিল! এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে, থাকতে পারে? সেই দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখার জন্য ছুটে এল। তারপর গুরুদেবের সামনে এসে তাঁর পথরোধ ক'রে দাঁড়াল, এবং অপলকদৃষ্টিতে তাঁকে দর্শন করতে লাগল। সেই কঠিন হৃদয় কুখ্যাত গুণ্ডার দুই চোখে বিস্ময়ের বন্যা নেমে এল। এমন মানুষ সে আর কখনো দেখেনি না, কখনো না। একী অপূর্ব্ব জ্যোতি, একী তেজ, একী মাধুর্য্য! আনন্দে বিস্ময়ে সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে একবার শুধাল, "কে আপনি?" গুরুদেব করযোড়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "আমি, আমি মেথরের ছেলে—পাগল, ক্ষেপা—।" গুণ্ডার দুই চোখ তখন ছল ছল ক'রে উঠল; বললে, "আমি বড়বাজারের কুখ্যাত সখি গুণ্ডা; আমি মানুষ চিনি। অনেক মানুষ দেখেছি, অনেককে ঠকিয়েছি। আমার কাছে লুকালে চলবে না। আপনি একজন মহাপুরুষ, ছদ্মবেশে ঘুরছেন। আপনাকে যখন পেয়েছি, তখন কিছুতেই ছাড়ব না। অনেক পাপ করেছি জীবনে; আপনি দয়া ক'রে আপনার চরণাশ্রয় দিন এই দস্যুকে, এই মহাপাপীকে উদ্ধার করুন।" এই ব'লে সে তাঁর চরণে পড়ল। রত্নাকরের মতই এই দুর্দ্দান্ত দস্যুর কঠিন হৃদয় বিগলিত হয়েছিল গুরুদেবের দর্শনে। সে গুরুদেবের শ্রীচরণআশ্রয় পেল। পূর্ব্ববৃত্তি সব চিরতরে পরিত্যাগ ক'রে গুরুদেবের একান্ত ভক্তরূপে পরিগণিত হ'ল। সেই নবজন্মপ্রাপ্ত সখি দাদাকে তাঁর শেষ বয়সে আমিও দর্শন ক'রে নয়ন সার্থক করেছি।

মন-পরিবর্ত্তনের আর একটি প্রকৃষ্ট ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বৈদ্যবাটির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, দুর্দ্ধর্ষ দস্যুসদৃশ শক্তিশালী ও বহু অসম সাহসিক কার্য্যের কর্ত্তা রাজেনবাবু। বৈদ্যবাটির সকলেই তাঁর ভয়ে কাঁপত এবং ঐ অঞ্চলের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবসম্পন্ন ও শক্তিশালী ব্যক্তি। তিনি পূর্ব্বজীবনে গুরুদেবের বহু নিন্দাবাদও করেছেন, তাই

তথাকার শিষ্যবৃন্দ গুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করেছিল, "প্রভু, আপনি কৃপা ক'রে এই 'রত্নাকর'কে উদ্ধার করুন, নতুবা আমরা আর টি'কতে পারছি না।" ভক্তবৎসল গুরুদেব তাঁদের প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন; রাজেনবাবু সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁর একান্ত ভক্তরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি পরিবর্তিত জীবনে মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট নিজের পূর্ব্বের দুষ্কীর্তিসমূহ কীর্ত্তন করতেন এবং গুরুদেব কী ক'রে তাঁর সমস্ত পূর্ব্ব স্বভাব আমূল পাল্টে দিয়েছেন তা' বলতে বলতে তাঁর দুই চক্ষু অশ্রু-সজল হয়ে উঠ্‌ত। আমি নিজে তাঁর মুখে তাঁর পূর্ব্ব জীবনের অনেক কীর্ত্তি কাহিনী শুনেছি; সে সব কথা তিনি কিছুই গোপন করতেন না, বরং খোলাখুলি ব'লে আনন্দ পেতেন এবং এমন ব্যক্তিকে যিনি আমূল পরিবর্ত্তিত করতে পারেন সেই মহামহিমময় গুরুদেবের মহিমা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করতে করতে নয়নজলে ভেসে যেতেন। সেই ভক্তাগ্রগণ্য রাজেন দাদার মুখে শোনা গুরুদেবের মহিমার কিছু কিছু বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করব।

এছাড়া রয়েছে নবদ্বীপে তাঁর প্রসিদ্ধ 'সাত জগাই-মাধাই' এর কাহিনী। একথা স্বয়ং শ্রীগুরুদেবের মুখে বহুবার শুনেছি। মহাপ্রভুর 'জগাই মাধাই'এর মতই এরা গুরুদেবের শুধু নিন্দাবাদ ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, বহুপ্রকারে উৎপীড়ন, অত্যাচার ও বিরুদ্ধ চক্রান্ত ক'রে তাঁকে নাস্তানাবুদ করেছে। গুরুদেব কী ভাবে এ সকল অত্যাচার নীরবে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে, হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন এবং কী প্রকারে জগজ্জননী রাধারাণীর করুণার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেছিলেন, তাই বলছি। বস্তুতঃ, জগজ্জননী যে আমাদের গুরুদেবের দ্বারে বাঁধা ছিলেন, সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। প্রথম দিকে এই নবদ্বীপে চারাদকেই গুরুদেবের শত্রু ছিল। এই সকল শত্রু বেশ প্রতাপশালী— থানার দারোগা, অবসরপ্রাপ্ত দারোগা ও পুলিশ ইন্স্‌পেক্টার, পোষ্টমাষ্টার, স্থানীয় জমিদার, স্থানীয় তথাকথিত 'শিক্ষিত ও ভদ্র মহোদয়গণ', পাড়ার মাতব্বরেরা, আর দুষ্টু ছেলের দল, গুণ্ডা ও পাষণ্ডের পাল তো আছেই। অভিমন্যুকে যেমন সপ্তরথী মিলে আক্রমণ করেছিল, এরা তেমনি সব দিক থেকে গুরুদেবের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা চালিয়েছিল। অন্য যে কোনো ব্যক্তি, তা' সে যতবড় প্রতাপশালীই হোক না কেন, এই অসহনীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেশত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে বাধ্য হ'ত। তখন প্রায় সারা নবদ্বীপই তাঁর শত্রু। তাঁকে সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্বদিক দিয়ে এমন উৎপীড়িত ক'রে তুলেছিল এরা, যে এই অবিচ্ছিন্ন ও অসহনীয় উৎপীড়নের, বাণবর্ষণের মধ্যে কেমন ক'রে তিনি অক্ষত দেহে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে ও প্রশান্ত মনে অবস্থান ক'রে নিজ নিগূঢ় ধর্মসাধন চালিয়ে গেছেন; সমস্ত নবদ্বীপের প্রবল প্রতিরোধরূপ প্রলয়ঙ্কর তুফানের মধ্যেও নিজ সাধন-শিখাকে নিবাত নিষ্কম্প রেখে সিদ্ধি

লাভ করেছেন, তা' আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের কল্পনারও অতীত। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর চিত্তে উদ্বেগ, আশঙ্কা বা অস্থিরতার লেশমাত্র দেখা যায়নি; সেই আনন্দরস-বিগ্রহমূর্ত্তিখানি সদাই কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর হয়ে থাকত। একদিন এমনি এক অত্যাচার জর্জ্জরিত দিনে নবদ্বীপস্থ কোনো প্রিয় ভক্ত শিষ্য গুরুদেবকে নিভৃতে বলেছিলেন, "গুরুদেব, আমরা তো সংসারী মানুষ, সর্ব্বদা আপনার কাছে থাকতে পারি না। কিন্তু যখন তখন যে সে এসে আপনার প্রতি অত্যাচার করে। শুধু দু'চার জন নয়, নবদ্বীপের অধিকাংশই আপনার শত্রু। এরূপ শত্রুপুরীতে আপনি থাকবেন কেমন ক'রে? চলুন, গুরুদেব, আপনাকে নিয়ে অন্য কোনো শান্তিপূর্ণ জায়গায় চ'লে যাই।" গুরুদেব সব শুনে মাথাটি নীচু ক'রে শুধু বলেছিলেন, "মা রাধারাণী যদি আমাকে এখানে রাখতে চান, তবে এখানেই থাকব বাবা,—আর তিনি যদি এখানে আমাকে না রাখেন, তিনিই অন্যত্র নিয়ে যাবেন।"

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে তিনি সম্পূর্ণরূপে সেই মা রাধারাণীর উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন, অন্য কারো উপর নয়। তিনি ছিলেন তাঁর কোলের শিশুর মত, তাঁর 'অবোধ সন্তান'। কাজেই বাইরের লোক কে কী করছে, সে বিষয়ে তিনি ভ্রুক্ষেপও করতেন না। কোন্ শত্রু তাঁর শত্রুতা করছে, আর কোন্ ভক্ত তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে—এ সব বিষয়ে তিনি গ্রাহ্যই করতেন না। শুধু জানতেন মাকে; মা যা' করছেন তাই হচ্ছে, রাধারাণী যা' করবেন তাই হবে। তবে এই সব শত্রুরাও ক্রমে তাঁর চরণে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করেছে নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার ক'রে, ও গুরুদেবের মহিমা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করেছে। আর যে সব ভক্ত, তা' সে যত সামান্য ব্যক্তিও হোক না কেন, একদিনের জন্যও গুরুদেবের দুর্দ্দিনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের ঋণও তিনি জীবনে ভোলেন নি।

এই সব জগাই-মাধাইএর সকলেই পরে অপরাধ স্বীকার ক'রে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করেছে। বাহুল্যভয়ে সকলের বিবরণ দিলাম না। গুহার মধ্যে বোমা তৈরী করা হয়, এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ পেয়ে থানার দারোগা গুহাশ্রমে enquiry করতে আসে। নির্ম্মম ও অশোভন ভাবে অত্যাচার ক'রে সে enquiry চালায়। সেই দারোগা এক সপ্তাহ মধ্যেই মফঃস্বলে enquiry করতে গিয়ে ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়ে চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে যায়। নবদ্বীপের আর একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি যে বহু অনিষ্টের মূল ছিল, কিছুদিন পরে দুরারোগ্য শূল-ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। সকল প্রকার চিকিৎসায় বিফল হয়ে ও যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ঐ ব্যক্তি কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। অবশেষে কী এক প্রেরণায় মরীয়া হয়ে সে একদিন গুরুদেবের চরণে এসে শরণ নেয়। গুহাশ্রমে

এসে সে গুরুদেবের সমুখে গুহাদ্বারে কেঁদে পড়ে এবং তার পূর্ব্বকৃত সব অপরাধ অকপটে স্বীকার ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। তার এ যন্ত্রণা যে গুরুদেবকে নিন্দা ও তাঁর অনিষ্ট চেষ্টার ফল এ কথা জানিয়ে তাকে রক্ষা করার জন্ম কাতর আবেদন জানায় গুরুদেবের চরণে। তার করুণ আর্ত্তিতে ব্যথিত হয়ে গুরুদেব তাকে ক্ষমা করেন এবং আশ্রমে প্রসাদ পেতে বলেন। প্রসাদ পেয়ে তার এতদিনকার এত যন্ত্রণা নিমিষে নির্ম্মূল হয়ে আরোগ্য হয়ে গেল; সে পরম শান্তিতে আশ্রমের মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে তার বাড়ীর লোক বহুক্ষণ তাকে বাড়ীছাড়া দেখে তার আত্মহত্যার আশঙ্কায়, গঙ্গাতীরে ও অন্যান্য স্থানে তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। অবশেষে গুহাশ্রমে এসে তার সন্ধান পেল। এসে দেখে সে পরম শান্তিতে গুহাশ্রম প্রাঙ্গণে শুয়ে আছে। তাকে বাড়ী যেতে বলায় সে বললে যে, গুহাশ্রমে এসে সাধুবাবার শরণ নেওয়ায় তাঁর দয়ায় তার সব অসুখ, সব যন্ত্রণা সেরে গেছে। সে আর বাড়ী যাবে না, বাড়ী গেলেই আবার সেই শূলবেদনা ফিরে আসবে। সে সাধুবাবার আশ্রমেই থাকবে। একথায় তার বাড়ীর লোক কান্নাকাটি করায় গুরুদেব বললেন, "সৎভাবে থাকলে আর তোমার ব্যাধি যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না। যাও বাবা, বাড়ী ফিরে গিয়ে সৎভাবে জীবনযাপন কর।" এইভাবে গুরুদেবের কাছে আশ্বাসবাণী পেয়ে সে বাড়ী ফিরে গেল। সেই থেকে সে গুরুদেবের পরমভক্ত হয়ে বাকী জীবন তাঁর গুণকীর্ত্তন ক'রে শান্তিতে কাটিয়েছিল।

আর দু'জনের কথা বলছি—এদের আমি ভাল ক'রে জানি; এরা আমার নিকট-প্রতিবেশী। এদের মধ্যে একজন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, শক্তিশালী দস্যুতুল্য। এই লোকটিকে পাড়ার সকলেই সমীহ ক'রে চলত। পাড়ায় কোনো আগন্তুকই তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তার শাসানি ও উৎপীড়নের হাত থেকে রেহাই পেত না। তার নিজের মুখে গুরুদেবের সম্বন্ধে যা' শুনেছি তাই এখন বলছি: তার মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্বে সে ব্যক্তি আশ্রমে এসে আমাকে ব'লে গেছে—"সুরেন, তোমরা আর কতটুকু জেনেছ পাতালের সাধুবাবাকে? নবদ্বীপের যেখানে যেখানে সাধু, মহাপুরুষ, পণ্ডিত ও বিখ্যাত লোক আছে, প্রত্যেককে পরীক্ষা করেছি আমরা। কামিনী-কাঞ্চনের এই কঠিন পরীক্ষাতে কেউই পার হ'তে পারে নি—একমাত্র এই পাতালের সাধুবাবা ছাড়া।" চোখ দুটি বিস্ফারিত ক'রে সে বললে, "হঁ্যা, সাধু বটে! শুধু সাধু নয়, এক আশ্চর্য্য রত্ন, একেবারে খাঁটি সোনা, একটুকুও খাদ নেই, সুরেন।" এই বলতে বলতে সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী পাষণ্ডের চোখ ছলছল ক'রে উঠল। সে আরও বললে, "তোমার বহু ভাগ্য যে এমন দুর্লভ মহাপুরুষকে গুরুরূপে পেয়েছ, আর নবদ্বীপের মহাভাগ্য যে এমন দুর্লভ রত্ন হৃদয়ে ধারণ করেছে। এমন সাধু হয়না, হয়না, হয়না—কখনো হবেনা—এ আমি জোর গলায় বলতে পারি। অনেকে বলে ভগবান্ দর্শন করেছে; কিন্তু জান, সুরেন,

এই পাতালের সাধুবাবা বিশ্বজননীকে শুধু বশ করেন নি, তাঁকে চিরদিনের তরে তাঁর দুয়ারে বেঁধে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই জগৎ জননীর কোলের ছেলে—কামিনী-কাঞ্চন তাঁকে কী করবে? মায়ের কোলে শিশুর যেমন কামিনীতে লোভ থাকতে পারেনা, তিনিও ছিলেন তেমনি। আর কাঞ্চনে কী দরকার তাঁর? সমস্ত বিশ্বের ঐশ্বর্য্য যাঁর ভাণ্ডারে, সেই জগৎজননী যাঁর দুয়ারে বাঁধা, তাঁর আর পৃথক ঐশ্বর্য্যে কী প্রয়োজন? মায়ের কাছে যখন যা' চাইবেন, তাই পাবেন। তিনি এমনি সাধু ছিলেন, সুরেন। শুধু আমি একা নই। তাঁর আরো অনেক পাষণ্ডী শত্রু ছিল; সবাই ক্রমে ক্রমে বুঝেছে তিনি কী জিনিস।" বলতে বলতে তার দুই চোখ ছলছল ক'রে উঠল।

ঠিক অনুরূপ কথা শুনেছি আমাদের পাড়ার আর একজন 'জগাই-মাধাই'-এর মুখে, ঠিক তার মৃত্যুর কিছুকাল আগে।

এ ছাড়া আছে বহু দর্শনকারীর মনের শুভ পরিবর্ত্তন। আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানতাম, কোনো ব্যক্তির স্বভাব যতই ক্রূর কঠিন হোক না কেন, তাঁর কাছে একবার এলে মন অন্ততঃ সাময়িকভাবেও সরল ও কোমল হ'তে বাধ্য; যে কোনো ব্যক্তির অনমনীয় মনোভাব গুরুদেবের ইচ্ছাশক্তির কাছে নমনীয় হয়ে মাথা নত ক'রে তাঁর ইচ্ছামত কাজ করবেই। এর এত অসংখ্য দৃষ্টান্ত নিত্য সংঘটিত হ'তে দেখেছি যে, তার বিশেষ কোনোটির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(৬) ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ইতর প্রাণী বশীকরণ: শিবাভোগ

গোমো পাহাড় তপোবন আশ্রমে রাত্রিকালে শিবাভোগ দেওয়া গুরুদেবের একটি নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান মধ্যে গণ্য ছিল। শিবা-ভোগ অর্থ শুধু শিয়ালের জন্য ভোগ নয়—এর সাথে বাঘ, চিতা, নেকড়ে, বুনো শূয়র ও হরিণও আসত এবং অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে তারা স্বভাব বৈরিতা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়েই তাঁর হাতের দেওয়া ভোগ ভোজন করত। হ্যাঁ—বাঘ ও হরিণ একেবারে পাশাপাশি। এ রকম নিত্যই ঘটত। এরূপ ঘটনা সাধারণের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার বলেই মনে হবে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণিত মহাপ্রভুর লীলা স্মরণ করলেই সব সন্দেহের নিরসন হবে। মহাপ্রভু কারিখণ্ডের বনপথে ভ্রমণ কালে যে ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়েছিলেন, গুরুদেব গোমোপাহাড় ও নিঃশব্দ মহাশ্মশানের বনভূমিতে নিত্যই সে লীলা বিলাস করতেন। অনেক ভক্তই সে লীলা দর্শন করেছেন। তার মধ্যে দু'জন শিষ্য দাদা যে লীলা দেখেছেন, আমি এখানে সেটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। আসানসোল থেকে ওঁরা একদিন আশ্রমে এসে পৌঁছালেন গভীর রাতে। গুরুদেব তখন শিবাভোগের জন্য খিচুড়ি ভোগের বালতী, পাতা ও জল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। তাঁদের আসতে দেখে

কৃপা ক'রে তাঁদের সঙ্গে নিলেন। একজন খিচুড়ির বালতী ও অন্যজন পাতা, জল ইত্যাদি হাতে নিয়ে গুরুদেবের অনুগমন করলেন। বনের মধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গুরুদেব ওঁদের দাঁড়াতে বললেন; ওঁরা সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গুরুদেব তখন ওঁদের হাত থেকে পাতা নিয়ে অল্প কিছুদূরে গিয়ে পাশে পাশে সাজিয়ে দিলেন। তারপর পাতে খিচুড়ি পরিবেশন করলেন। পরিশেষে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে যেন কাদের আহ্বান করলেন। গুরুদেবের আহ্বান শোনামাত্র প্রথমেই ছুটে এল একটি বুনো শিয়াল, যে শিয়ালের দাড়ি আছে,—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল খাঁড়া-ওলা বুনো শূয়র, তারপর ছুটতে ছুটতে এল হরিণ। ওরা সকলেই পাশাপাশি খেতে লাগল আনন্দের সহিত। কিন্তু তারপরই হেলতে দুলতে যিনি এলেন তাকে দেখে শিষ্য দাদাদের নাড়ী প্রায় ছেড়ে যাবার উপক্রম হ'ল। বিশেষতঃ ওঁদের মধ্যে যিনি বর্ষীয়ান, তিনি কাঁপতে কাঁপতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক শিষ্যটির হাতটি শক্ত ক'রে ধ'রে স্খলিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "ও ভাই, ও যে বা-া-া-া-ঘ! অপর শিষ্যটিও নিজে কাঁপতে কাঁপতে তাঁকে সাহস দিয়ে বললেন, "ভয় কী আছে—গুরুদেব রয়েছেন।" সেদিন জ্যোৎস্না রাত—প্রাণীগুলিকে চিনে নিতে কারোরই কষ্ট হ'ল না। গুরুদেব তাদের দু'বার তিনবার ক'রে পরিবেশন করলেন। তারা প্রত্যেকে সানন্দে, সাগ্রহে—হ্যাঁ, বাঘের ঠিক পাশেই সেই হরিণটিও—গুরুদেবের দেওয়া প্রসাদ চকচক্ ক'রে খেয়ে, তারপর পাশে রাখা জলপাত্র থেকে জলপান ক'রে একে একে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চ'লে গেল। গুরুদেবের ইঙ্গিতে তখন ওঁরা বালতীটি নিয়ে এলেন। বর্ষীয়ান শিষ্যদাদা তখন বোধ হয় বুকে হাত দিয়ে দেখলেন যে, হঁ্যা—তিনি তখনও বেঁচে আছেন।

এই ভাগ্যবান ভক্তদ্বয় একদা যা' স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা' গুরুদেবের দৈনন্দিন কর্ম ছিল।

বাঘকে নিয়ে গুরুদেব কত খেলা যে করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। হিংস্র বাঘ তাঁর কাছে পোষা কুকুর বিড়ালের মতই ছিল। দৈবাৎ কোনো ভাগ্যবান্ ভক্ত শিষ্য সে সব লীলা দর্শন করেছেন। ভগবানের কাছে স্বভাব বৈরী জীবগণ যে তাদের বৈরীভাব ভুলে যায়, তার বর্ণনা যেমন শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তেমনি সাক্ষাৎ মহাপ্রভুও তাঁর জীবনে উদাহরণ দেখিয়েছেন। বৃন্দাবন গমনকালে বনপথে হিংস্র জন্তুদের মধ্যে তিনি যে লীলা করেছেন তার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ছিলেন সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য। তিনি সে সব অবিশ্বাস্য রোমহর্ষক লীলা নিজমুখে সবিস্তারে ভক্তদের শুনিয়েছেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমাদের গুরুদেবও বনের হিংস্র পশুদের সাথে অনুরূপ লীলা করেছেন; শুধু দু'চার দিন নয়, এ লীলা ছিল তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। অনেক ভক্ত সে সব লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। এর

মধ্যে রঘুনাথ মহান্ত দাদার বর্ণিত কাহিনীটি বলছি। নিঃশব্দ শ্মশান আশ্রমে রঘুনাথ দাদা একটি চালাঘরে শুয়ে আছেন। সন্ধ্যার কিছু পর থেকেই ঘরের খুব কাছেই অবিরাম ব্যাঘ্রগর্জন। অন্য স্থানে এরূপ ঘরের পাশেই ব্যাঘ্রগর্জন শুনে মানুষ ভয়ে কণ্টকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আশ্রমস্থিত ভক্তগণ জানেন যে গুরুদেবের আশ্রমে কোনো ভয় নেই; বাঘ আশে পাশে ঘুরে বেড়ালেও আশ্রমের কোনো ক্ষতি করবে না। সুতরাং সেই অবিরাম ব্যাঘ্রগর্জনের মধ্যেই ওঁরা নিশ্চিন্তেই শুয়ে আছেন। তার কিছুক্ষণ পরে মনে হ'ল বাঘেরা যেন কিছু দূরে সরে গেছে এবং কিছু দূর থেকেই তাদের ডাক শোনা যেতে লাগল মাঝে মাঝে। হঠাৎ গুরুদেব প্রায় মধ্যরাত্রে রঘুনাথ দাদাকে ডেকে বললেন, "চল' বাবা, বটতলায় যাই।" কয়েকটি ডোবা ও মাঠ পেরিয়ে বটতলায় যেতে হয়। বটতলার আসন ঘর ঘিরে দু' প্রস্থ বেড়া আছে। বাইরের বেড়ার কাছাকাছি এসেছেন, এমন সময় রঘুনাথ দাদার চোখে পড়ল—আসন ঘরের দাওয়ায় দুয়ারের দু' পাশে দুটো অগ্নিচক্ষু জ্বল্ জ্বল্ করছে। বুঝতে দেরী হ'ল না যে দুয়ারের দু' পাশে দুটো বৃহৎ ব্যাঘ্র শুয়ে আছে। গুরুদেব রঘুনাথ দাদাকে বাইরের বেড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে বললেন, "এখানে দাঁড়াও, বাবা।" এই ব'লে গুরুদেব ভিতরে চ'লে গেলেন। তারপর ঘরের রোয়াকে উঠে গিয়ে যা' দেখালেন—তা' প্রায় অবিশ্বাস্যের মতই শোনাবে। দুটি দুষ্টু ছেলে যদি দুয়ারের দু' পাশে ব'সে থাকে, তাদের যেমন ভর্ৎসনা ক'রে দুই কান ধরে উঠিয়ে দেন তার পিতামাতা, গুরুদেব ঠিক তেমনি ভাবে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন তাদের এবং শেষে, ঠিক যেমন দুটি বিড়ালকে ঘাড় ধরে তুলে ফেলে দিই আমরা, ঠিক অনুরূপ ভাবে সেই অমিত শক্তিশালী মহাপুরুষ দু' হাতে তাদের দুটি ঘাড় ধরে তুলে বেড়ার ওপাশে ফেলে দিলেন। তারাও ঠিক বিড়ালের মতই যেন কত অপ্রস্তুত হয়ে, যেন কত অপরাধীর ন্যায় ঝুপ ঝুপ ক'রে অপর প্রান্তে প'ড়ে ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল। রঘুনাথ দাদা স্বচক্ষে এ লীলা দর্শন করেছেন, এবং তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে এই অত্যাশ্চর্য্য, এই অবিশ্বাস্য কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গুরুদেবের এই বাঘ নিয়ে ও ভূত-প্রেত নিয়ে অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে সেই বয়োবৃদ্ধ প্রবীণতম সন্ন্যাসী ভক্ত সজলচক্ষে আমাকে বলেছিলেন, "ভেবেছিলাম, কাউকে এ লীলা শোনাবো না, কারণ কেউ তা' বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু ভাবলাম, আমি ম'রে গেলে এ লীলার কথা জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে, তাই তোমার মত ভক্তকে জানিয়ে গেলাম।"

হিংস্র জীবজন্তু যেমন তাঁর কাছে এলে তাদের পারস্পরিক স্বভাব-শত্রুতা ভুলে যেত, গৃহপালিত পশুগণ তেমনি তাঁর প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করত।

হনুমান, কুকুর, গরু, বিড়াল, ইঁদুর, আরশোলা, পাখী প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। গোমো তপোবনে গুরুদেব যখনই আশ্রম থেকে পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন, কুকুর-কুল কিছু আগে থেকেই সে-খবর জানতে পারত। এমন কি আমরাও তখন কিছু জানি না, কিন্তু ওরা সব আগে থেকেই গেটের বাইরে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রায়ই আশ্রমের দিকে ফিরে চাইছে গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষায়। তারপর পাহাড়ের উপর পথ দেখিয়ে আগে আগে তারাই চলত, এবং প্রত্যেক বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত। আমরা যখন গুরুদেবের জয় দিতাম, তখন ওরাও ওদের ভাষায় সমস্বরে ধ্বনি করত। আর গুরুদেব যখন গোমো থেকে নবদ্বীপ যাত্রা করতেন, সেদিন ট্রেনে গুরুদেব যে বেঞ্চিতে বসতেন, ওরা তার তলায় শুয়ে থাকত। ট্রেন থেকে তাদের নামিয়ে আনতে খুব বেগ পেতে হ'ত। গুরুদেব আশ্রম ছেড়ে কোথাও গেলে তাঁর সঙ্গী হবার প্রবল বাসনার একটি অপরূপ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি নবদ্বীপ আশ্রমের একটি ঘটনায়। বর্ষাকালে ভরা গঙ্গায় প্রায়ই ভক্তগণ গুরুদেবকে গঙ্গায় নৌকাভ্রমণে নিয়ে যেতেন। সেবার ভরা ভাদ্রের গঙ্গা দু'কূল ছাপিয়ে উঠেছে, সেই গঙ্গায় একখানি বড় নৌকা ক'রে গুরুদেব ভক্তগণসহ গঙ্গা-ভ্রমণে যাত্রা করলেন। গুরুদেবের একপাশে মেজদাদা, অপর পাশে হরিলুটের ঝুড়ি নিয়ে আমি ছিলাম। গঙ্গার তীরবর্তী স্থানগুলি আমরা তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। নৌকা তখন মাঝগঙ্গা দিয়ে দেয়ারা-পাড়াঘাট ছাড়িয়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। যেমন তীব্র স্রোত, তেমনি উত্তাল তরঙ্গ। সূর্য্যকিরণে চারদিকে লাল জল ঝলমল করছে। আমরা সবাই গঙ্গার সেই শোভা দর্শন করছি। এমন সময় গুরুদেব হঠাৎ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "বাবা, বাবা, শীঘ্র নৌকা থামাও।" মাঝিরা নৌকা থামাল। গুরুদেব আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "ঐ দেখ—দেখতে পাচ্ছ, প্রাণপণে সাঁতার দিচ্ছে ঐ কুকুরটি? হ্যাঁ, আমাদের আশ্রমের কালী কুকুর, শীঘ্র ওকে নৌকায় তুলে নাও।" তাইতো! আমরা সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম, সত্যিই অদূরে জলের ঢেউয়ের উপর ছোট একটি কালো কুকুরের মাথা দেখা যাচ্ছে। ওঃ! প্রাণপণ ক'রে তার সে কী আকুল প্রয়াস, শুধু গুরুদেবের অনুগমন করবার বাসনা! কেউ তাকে ডাকে নি, কিন্তু তবু সে ছাড়ে নি। এতক্ষণ এই ভরা ভাদ্রের প্রবল স্রোতে সে এসেছে প্রাণপণে সাঁতার কেটে গুরুদেবের পিছনে পিছনে। গুরুদেব বললেন, "গুরুর জন্য এমন আকুলতা কোনো শিষ্যের হয়েছে কি?" আমরা নৌকা ভিড়িয়ে তাকে তুলে নিলাম। গুরুদেব তাকে কোলে নিয়ে আদর ক'রে কিছু হরিলুট খেতে দিলেন। তারপর তীরে নৌকা নিয়ে গিয়ে আরো হরিলুট খেতে দিলেন। একজন ভক্তসহ তাকে আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন।

(৭) ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রেতাত্মা দর্শন করানো ঃ

বস্তুবিজ্ঞানী বা বাস্তববোধসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই 'অশরীরী'দের অস্তিত্বে বিশ্বাস করবেন না। তবে সাধারণের মধ্যে কেউ কেউ তাদের বিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসীরা তাদের মানসিক বিকারগ্রস্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব'লে মনে করে। যারা বিশ্বাস করে তাদের সে বিশ্বাসের ভিত্তি কী তা' আমি জানি না। একজন বস্তুবিজ্ঞানাভিমানী হিসাবে আমি কোনোক্রমেই এসব বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু গুরুদেবের কাছে আসার পর থেকে সুদৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি। এই দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণ—শ্রীগুরুদেবের নিজ মুখের বাক্য, তাঁর ক্রিয়া-কলাপ, এবং ভক্তদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনী। এ সব সাধারণভাবে অবিশ্বাস্য কথা গুরুদেব সাধারণভাবে কাউকেই জানান নি। তাঁর সেবারত ভক্তগণ তাঁর কাছে কথাপ্রসঙ্গে, বা তাঁর ক্রিয়াকলাপে দৈবাৎ কখনো কখনো এ সবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছেন। আর যে সকল ভক্ত এই সকল অশরীরীদের প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন, তাঁদের এই দর্শনও দৈবাৎ এবং তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য। পরন্তু কোনো উৎসুক জিজ্ঞাসু ব্যক্তি গুরুদেবকে এ বিষয়ে প্রশ্ন ক'রে কোনো সদুত্তর লাভ করতে পারে নি। আসল কথা, কাকে কী জানাতে হবে, কী কী ক্রিয়া-কলাপ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে, কার কতটুকু যোগ্যতা, কতখানি পূর্ব্বজন্মের সাধন-ক্রিয়া করা আছে—এ সবের বিচার বিশ্লেষণের ভার সম্পূর্ণরূপে গুরুদেবের নিজের, এতে কারো কিছু বলার বা তর্ক করার নেই। কারণ, "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"। তাই সাধারণভাবে তিনি জনসাধারণকে কোনো উপদেশ দেন নি, বা জনারণ্যে বক্তৃতাও করেন নি। ব্যক্তিবিশেষের সাধনোপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ীই তাকে বিশেষ বিশেষ তত্ত্বসাধন করিয়ে নিয়েছেন। অনেক তত্ত্ব আছে যা' অযোগ্য ব্যক্তিকে জানালে তার সমূহ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। তাই যেমন মহাপ্রভুর তেমনি গুরুদেবের শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে বহু স্তরভেদ আছে। যে যে-স্তরের সাধক, সে সেই স্তরের তত্ত্ব জ্ঞাত হবে ও তদনুযায়ী সাধনক্রিয়া করবে। অযোগ্য ব্যক্তি অনাবশ্যকভাবে তত্ত্বানুসন্ধানী হ'লে তার ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। 'অশরীরী-তত্ত্ব'—এইরূপ একটি গূঢ়তত্ত্ব। এ বিষয় সর্ব্ব সাধারণ্যে প্রকাশিতব্য নয়, একমাত্র যোগ্য সাধকই তার কিছু কিছু অবগত হ'তে পারে। এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা অনুসারে গুরুদেব কৃপা ক'রে যেটুকু জানিয়েছেন, তার সারাংশ মাত্র প্রকাশ করতে পারি।

অশরীরীগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর। প্রথম, সাধারণ জীবের মৃত্যুর পর কোনো কোনো জীব অসাধারণ মৃত্যুর জন্য পরজন্মলাভের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তর্বর্ত্তী কাল প্রেতযোনিত্ব প্রাপ্ত হয়ে নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। দুষ্কর্মের তীব্রতা অনুযায়ী এদের ভোগকাল

বা প্রেতযোনিত্ব কম বেশী দিন স্থায়ী হয়। সধবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী জীবিত থাকা পর্য্যন্ত সাধারণত পুনর্জন্ম হয় না, এরাও প্রেতযোনিতে অবস্থান করে। এরা কখনো কখনো জীবিত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয়, প্রলয়কর্ত্তা শিবের অনুচর 'ভূত'গণ। তাঁরা শিবের আজ্ঞায় তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকেন; ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের কোনো ক্ষতি করেন না। সাধারণ মানুষ এদের কখনো দেখতে পায় না, বা এদের সাথে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও পায় না। সিদ্ধ মহাপুরুষগণ বা শিবভক্তগণই এঁদের দর্শন বা এঁদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। তৃতীয়, সিদ্ধ মুনি ঋষি ও দেবতাগণ। এঁরাও একমাত্র সিদ্ধ মহাপুরুষগণের দর্শন-যোগ্য ও তাঁদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এই তিন শ্রেণীর অশরীরীগণের সহিতই আমাদের গুরুদেবের প্রত্যক্ষ নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর একদল প্রেতাত্মা গুরুদেবের সাথে ফটোয় উঠে গেছে,—তার ইতিবৃত্ত পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। প্রধানতঃ শ্মশানেই এদের বিচরণস্থান। যেখানে অপমৃত্যু হয়, সেখানেও তাদের প্রত্যক্ষ করা যায়। এইরূপভাবে প্রেতযোনিপ্রাপ্ত কিছু শিষ্যের গুরুদেবের কাছে আগমন ও তাদের দুঃখযন্ত্রণা বিজ্ঞপ্তির কথা গুরুদেবের কাছে ও ভক্তদের মুখে শুনেছি। কিছু কিছু 'উপদ্রুত' গৃহকে (অর্থাৎ 'ভূতের বাড়ী'কে) উপদ্রব মুক্ত করবার জন্যও গুরুদেবকে কখনো কখনো কোনো কোনো স্থানে যেতে হয়েছে। এদের সদগতির জন্য শ্মশানেও গুরুদেবের ক্রিয়াকলাপের কথা শুনেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিবানুচর 'ভূত'গণও গুরুদেবের অনুগত ও তাঁর ভক্ত ছিলেন। কেউ কেউ চিরদিনের জন্য তাঁর সেবায় নিযুক্তও ছিলেন। এরূপ একজনের নাম—'বীর অবধূত'। গুরুদেব তাঁকে নাম ধ'রে ডাকতেন; বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করতেন। বন্ধ আশ্রমের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যেত তাঁদের দ্বারা, তাঁরা গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। নবদ্বীপ, নিঃশঙ্ক ও গোমো আশ্রমে তাঁর এরূপ সেবা-পরায়ণ ভূতগণ নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া শ্মশানেও এঁদের নিয়ে গুরুদেব বহু ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকতেন। এই সকল 'ভূত' গণের সেবা দর্শনও কোনো কোনো যোগ্য ভক্ত লাভ করেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর অশরীরী মহাপুরুষগণ ও দেবদেবীগণ নিত্য গুরুদেবের মন্দিরে প্রণাম করবার জন্য আগমন করতেন, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়। সেইজন্য গুরুদেব আমাদের সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছেন, "মন্দিরের দুয়ারের সমুখে কেউ ব'সোনা।" কেন বসতে নিষেধ করছেন, তাও খুলে বলেছিলেন আমাকে। গুরুদেবের সিদ্ধপীঠে, সিদ্ধ আসনে প্রণাম করবার জন্য, ঐ মহাপীঠস্থানের মহাপবিত্র ধূলি মাখবার জন্য দেবতারাও কত আগ্রহী, তা' বার বার শুনেছি তাঁর মুখে।

শ্মশান-সাধনার জন্য ক্বচিৎ কেউ যোগ্যতা লাভ করে। তবে শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ ছিটে ফোঁটা কিছু দর্শন ও অনুভূতি লাভ করেছেন—তাঁদের মধ্যে রঘুনাথ মহান্ত

দাদা, অশ্বিনীকুমার দত্ত দাদা, নলিন দাদা, ননী দাদা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীদাদা কীভাবে এইরূপ প্রেত-দর্শন করেছিলেন ও শ্রীগুরুদেবকে অন্যান্য বিভিন্ন মূর্তিতে দর্শন ক'রে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাঁর নিজ মুখ থেকে শ্রুত বর্ণনা উদ্ধৃত করছি। গুরুদেবকে আবির্ভাব মূর্তিতে দর্শনের পর (এর বিবরণ পরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হবে) অশ্বিনী দাদা তাঁর স্থূল মূর্তি দর্শনের জন্য প্রবল আগ্রহ ও প্রেরণা অনুভব করলেন। বেলগেছিয়ার শিষ্য ভুবন মালাকারের নিকট জানতে পারলেন যে গুরুদেব তখন গোমো তপোবন আশ্রমে অবস্থান করছেন। সেখানে যাবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে তিনি গোমো আশ্রমের ঠিকানা ও পথ নির্দেশ নিলেন। বাসায় এসে ভাবলেন, তাই তো, যাই কী ক'রে ? হাতে একটিও পয়সা নেই। ভাবতে ভাবতে সহসা তাঁর নিজের হাতের দিকেই নজর পড়ল। হাতে একটিও পয়সা নেই বটে, তবে হাতের আঙুলে একটি আংটি আছে—ভাল পাথর বসানো সোনার আংটি। এই আংটিটি বেচলে তো কিছু পাওয়া যাবে। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। আংটিটি বেচে ফেললেন। নবীন যুবক, হাতে টাকা পেয়েই নিজের জন্য প্রথমে ভাল জামা, কাপড় ও জুতা কিনলেন। হ্যাঁ, যা' বাকী থাকল তাতে ট্রেন-ভাড়া হয়ে যাবে। রাত্রিটা কোনোরকমে কেটে গেল। ভোর হবার আগেই তিনি হাওড়া ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করলেন। ষ্টেশনে পৌঁছে গোমোর টিকিট কিনলেন। হ্যাঁ, আরো কিছু পয়সা থাকল। এক টাকায় বড় কমলালেবু আটটা কিনে ফেললেন। তারপর পশ্চিমগামী প্রথম প্যাসেঞ্জার ট্রেনেই উঠে বসলেন।

গোমো ষ্টেশনে যখন পৌঁছলেন, তখন বেলা পড়ে এসেছে। প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে ষ্টলে চা ও জল খাবার খেয়ে নিয়ে ওখানেই দু'চার জনকে শুধালেন, "এখানে এক সাধুবাবা থাকেন, তাঁর আশ্রমে যেতে হ'লে কোন্ পথে যেতে হবে ?" ওরা সামনের পথটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "এই পথটা শেষ হ'লে পাহাড়ের ধার দিয়ে যাবে।" উনি সেইমত চললেন। কিন্তু কোথায় পথ ? পাহাড়ের ধারে কোনো পথই দেখলেন না। এদিকে সন্ধ্যা নেমে এল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। অশ্বিনীদাদা দেখলেন আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে একটা গাছতলায় শুয়ে রাত কাটালেন। পরদিন ভোরে উঠেই আবার চলতে শুরু করলেন। কিন্তু কোথায় চলবেন ? তিনি যতই চলেন, ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় এসে উপস্থিত হন। পরিশেষে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে একটা বেল-গাছতলায় বসে পড়লেন। একটা বেল প'ড়ে ছিল গাছতলায়। সেটি ভেঙে খেয়ে সেদিনের মত ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন। এমন সময় দেখলেন কিছুদূরে একটা সাদা-জামাপরা মোটামত লোক পথের উপর দিয়ে যাচ্ছে। দেখেই তিনি তার পিছু

নিলেন। ভাবলেন, যাই হোক, এতক্ষণে এখানে একটা মানুষের দেখা পাওয়া গেল। ওকে শুধালে পথের কিছু সংবাদ পাওয়া যাবে। এই মনে ক'রে তিনি দ্রুতপদে এগোতে লাগলেন। দ্রুত, আরো দ্রুতগতিতে এবং পরিশেষে প্রায় ছুটে চলতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাঁর সঙ্গে সেই লোকটির দূরত্ব একই থেকে গেল—বাড়লও না, কমলও না। অশ্বিনীদাদা এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে পড়লেন। পরিশেষে তিনি যখন হাঁপাচ্ছেন, তখন লোকটিকে আর দেখা গেল না। অশ্বিনীদাদাও অবাক হয়ে সেখানে থেমে পড়লেন। এমন আজগুবি কাণ্ড তো তিনি কখনো দেখেন নি। অবাক্ হয়ে ভাবছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একজন মিশ্‌কালো কাঠুরিয়া একটা গাছতলায় কাঠ কাটছে। অশ্বিনীদাদা একটু আশ্বস্ত হয়ে ভাবলেন, যাক্, তা' হলে আর একজন মানুষের দেখা পাওয়া গেল। এগিয়ে এসে তাকে শুধালেন, "ওহে বাপু, এখানে এক সাধুজীর ডেরা আছে, তা' কোথায় বলতে পার?" সে একবার মাত্র তাঁর দিকে চেয়েই বললে, "ঐ হোথা—উদিক্।" অর্থাৎ সে পাহাড়ের বিপরীত দিক দেখিয়ে দিল। তা' হ'লে পাহাড় পার হ'তে হবে—উনি আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে নিলেন। সে বললে, "হুঁ, বুলছি তো।" অশ্বিনীদাদা পাহাড়ে উঠলেন। গভীর জঙ্গল, পথ বলতে কিছু খুঁজে পেলেন না। অনেকক্ষণ সেই জঙ্গলে ঘুরে দেখলেন, তিনি এক জায়গাতেই রয়ে গেছেন, কিছুই অগ্রসর হ'তে পারেন নি। পথ না পেয়ে তিনি পুনরায় পাহাড় থেকে নেমে এলেন এবং সেখানকার একমাত্র মানুষ সেই মিশ্‌কালো কাঠুরিয়ার কাছে ফিরে এসে তাকে আবার শুধালেন, "কী হে, কোথায় সাধুর ডেরা? কোনো পথই তো খুঁজে পেলাম না।" সেই কাঠুরিয়াটি এবার বিরক্ত হয়ে কর্কশকণ্ঠে জবাব দিল, "বুল্‌লাম তো ঐ উদিক্ যা'—আর বিরক্ত করিস্ নি।" অশ্বিনীদাদা আর কী করেন, পুনরায় উঠলেন পাহাড়ে। পথ থাক আর না থাক, এবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে উঠতে লাগলেন। ঝোপ্ জঙ্গল ভেঙে, গড়ানো পাথরে পিছলে প'ড়ে, কখনো হোঁচট খেয়ে, কোনো রকমে পাহাড়ের মাথায় উঠলেন। তারপর ওদিকে নামতে লাগলেন। প্রায় নেমে এসেছেন, জঙ্গলটা এখানে যেন আরো ঘন হয়ে উঠেছে—হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে তিনি চম্‌কে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন,—এক বৃহৎ ব্যাঘ্র তাঁর দিকে চাইতে চাইতে পাশের জঙ্গল থেকে বার হয়ে এল এবং ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে লাগল। ঐ রাস্তা ছাড়া আর গতি নেই, তিনিও ধীরে ধীরে তার পিছু পিছু এগোতে লাগলেন। বাঘটি চলে আর পিছু ফিরে ফিরে তাঁর দিকে চায় এবং জিভ চাটতে থাকে। অশ্বিনীদাদা মুহূর্ত্তে বুঝে নিলেন, এতো এখনি তাঁকে খাবে, কিন্তু তার আগে একবার দেখে নেব। এই ভেবে তিনি প্রস্তুত হয়ে তাঁর পায়ের দুই

দাবনায় দুই চাপড় মারলেন। দেখলেন, বাঘটি দাঁড়াল, বোধহয় প্রস্তুত হবার জন্য। এমন সময় অশ্বিনীদাদার খুব প্রস্রাবের বেগ পেল। তিনি মনে মনে বললেন, দাঁড়া, প্রস্রাবটা ফিরে নিই—তারপর তোকে দেখে নিচ্ছি। এই ব'লে সেখানেই তিনি প্রস্রাবে বসলেন। প্রস্রাব শেষে উঠে দাঁড়াতেই সামনে চেয়ে দেখেন—কৈ, সামনে বাঘ নেই তো! তিনি ভাল ক'রে চোখ মেলে চারদিক খোঁজ ক'রে কোথাও বাঘ দেখতে পেলেন না। এতো ভারী আশ্চর্য্য কাণ্ড! ভাবতে ভাবতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নীচে নেমে এলেন। সামনে একটু ফাঁকা জায়গা। তারপরই সমতল জমিতে বৃক্ষলতা-ঘেরা একটি আশ্রম মনে হচ্ছে যেন! হ্যাঁ, তাই তো। ঐ তো মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল দেখা যাচ্ছে। কে একজন মধুর কণ্ঠে হরিধ্বনি দিচ্ছে যেন—সেই সাধুই বোধ হয়। তা' হ'লে তিনি এসে গেছেন। দ্রুত পদক্ষেপে তিনি এগোতে লাগলেন। সামনের লোহার গেটটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দ্রুত চ'লে এলেন। ঐ তো কে একজন সাধু দুয়ারের সামনে হরি-বোল্, হরি-বোল্ বলছেন। কী মধুমাখা কণ্ঠস্বর! অশ্বিনী-দাদা ছুটে এলেন এগিয়ে। কিন্তু দুয়ারের সামনে আসার আগেই দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল।

আবেগে, উত্তেজনায় তখন অশ্বিনীদাদা উন্মত্তপ্রায় হয়েছিলেন, সুস্থমস্তিষ্কে ধীরভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতাও ছিল না। তাঁর সামনে দুয়ার বন্ধ হ'তে দেখে তি'ন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে সমুখের খোলার চালের এক খণ্ড কাষ্ঠদণ্ড ভেঙে নিয়ে তাই দিয়ে গদাগম্ গদাগম্ ক'রে দুয়ারে আঘাত করতে লাগলেন। দুয়ার ভেঙে যায় আর কি! তখন গুরুদেব জানালা খুলে দুই হাত যোড় ক'রে বললেন, "শান্ত হও, বাবা, শান্ত হও", এবং অনেক মিষ্টান্ন হরিলুট তাঁকে দিলেন। অশ্বিনী-দাদা সে সব মিষ্টান্ন ছুড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার ক'রে বললেন, "আমি মিষ্টি খেতে আসিনি, আমি তোমার কাছে এসেছি, তোমাকে চাই।" গুরুদেব পুনরায় যুক্তকরে বিনীতকণ্ঠে বললেন, "বাবা, কিছু খাও, খেয়ে শান্ত হও। পরে সব পাবে।" এইভাবে অনেকক্ষণ স্তুতিমিনতি করার পর অশ্বিনীদাদা একটু শান্ত হলেন, কিছু খেলেন। তারপর গুরুদেব সেইরূপ মিষ্টকণ্ঠে বললেন, "বাবা, তোমার জন্য গরম গরম খিচুড়ি তৈয়ার ক'রে রেখেছি। নাও, পাতা নিয়ে ব'স।" একথা বলাতে একজন শিষ্য তাঁকে পাত ক'রে দিয়ে গরম খিচুড়ি ঢেলে দিলেন। গুরুদেব তাঁর সামনে এসে বলতে লাগলেন, "খাও, বাবা, পেট ভ'রে খেয়ে নাও। দু'দিন কিছু খাওনি। তার উপর বাঘ দেখে ভয় পেয়েছ—।" অশ্বিনীদাদা চমকে উঠলেন। ভাবলেন, দু'দিন না খাওয়ার কথা হয়ত আন্দাজ ক'রে বলা যেতে পারে, কিন্তু বাঘ দেখে ভয় পাওয়ার কথা—এতো তিনি নিজে, আর সেই বাঘ ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কেউ

জানে না। তবে সেই বাঘ কি তুমি? ওঃ, তাই হবে। তাই পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে আচমকা মিলিয়ে যাওয়া। তাই অমন ক'রে ফিরে ফিরে চাওয়া। এ তোমারি লীলা। আর সেই সাদা জামা গায়ে মোটা লোকটি—যার দূরত্ব কিছুতেই কমছিল না; আর সেই মিশ্ কালো কাঠুরিয়াটা—সবই তোমারি লীলা। একান্ত শরণাগত পথহারা পথিককে পথ-দেখানোর এসবই এক একটি খেলা তোমার! তুমিই তিনদিন আগে আচমকা আমার ঘরে গিয়ে আবির্ভাব মূর্ত্তিতে দেখা দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে আসছ—কখনো সাক্ষাৎ নিজমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়ে, কখনো অন্য মানুষের বেশে, আর কখনো বা বাঘের ভয়ঙ্কর রূপে। নইলে এমন অবেলায় আমার জন্য গরম খিচুড়ি কে রেঁধে রাখবে, আর আসার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অমন মধুর হরিধ্বনি দিয়ে কে আমাকে ডেকে নেবে? এসব পাকা ব্যবস্থা,—আগে থেকেই ছক্ কেটে তুমি ঠিক ক'রে রেখেছ।

পেট ভ'রে গরম খিচুড়ি খেয়ে অশ্বিনীদাদা বিশ্রাম করতে গেলেন। তাঁর জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা হ'ল কুয়াতলার বৈঠকখানার পূর্ব্ব দিকের ঘরটি। ওখানে শুয়ে তিনি গা গড়াচ্ছেন। একটু বিড়ির নেশা আছে; বিড়িতে টান দিয়ে বিড়ির কৌটা আর দেশলাইটি পূর্ব্বদিকের জানালায় রেখে দিয়ে তিনি শুয়ে শুয়েই সেই গোধূলি সন্ধ্যায় পূর্ব্বদিকে বাগানের সৌন্দর্য্য দেখছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল—কিছু দূরে ঐ বেলগাছটিতে একটি লোক ব'সে আছে এবং তাঁরই দিকে চেয়ে আছে। লোকটি তার হাতটি এই দিকে বাড়াল। গাছটা এখান থেকে বেশ কিছু দূর হবে—কিন্তু একী আশ্চর্য্য কাণ্ড! তার হাতটি ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে একেবারে তাঁর ঘরের জানালা পর্য্যন্ত এল এবং টপ্ ক'রে ঐ জানালা থেকে তাঁর বিড়ির বাক্স ও দেশলাইটি নিয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে অশ্বিনীদাদার চোখের সমুখে এই ভয়ঙ্কর ভূতুড়ে ব্যাপার ঘটে গেল। অশ্বিনীদাদা লাফিয়ে উঠলেন, ছুটতে ছুটতে গুরুদেবের দ্বারের সামনে এসে আবার দুয়ারে বে-পরোয়া আঘাত করতে লাগলেন। গুরুদেব ব্যতিব্যস্ত হয়ে দ্বার খুলে হাত যোড় ক'রে বললেন, "আবার কী হ'ল, বাবা?" অশ্বিনীদাদা চীৎকার ক'রে বললেন, "কী হ'ল? জানেন না যেন—সব ন্যাকামি পেয়েছ? ওসব ভূত-টুত আমি গ্রাহ্য করিনে, ভূতের ভয় দেখিয়ে আমাকে কাবু করতে পারবে না। তোমার ভূতে কেন আমার বিড়ি-দেশলাই নিয়ে যায়?" এই ব'লে চোখ রাঙিয়ে ঘুষি পাকিয়ে এলেন গুরুদেবের দিকে। গুরুদেব তখন হাত যোড় ক'রে বললেন, "বাবা, দিয়ে যাবে, আবার তোমার জিনিষ তোমাকে ফেরত দেবে। শান্ত হও। ওদের অপরাধ হয়ে গেছে। ওরা তোমাকে তো জানে না, তাই একটু রসিকতা করেছে তোমার সঙ্গে।" অশ্বিনীদাদা তখন শান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখলেন, রসিক ভূতটা গুরুদেবের কথা শুনেছে, বিড়ি-দেশলাই ঠিক নির্ভুলভাবে যথাস্থানে রেখে দিয়েছে।

পরদিন গুরুদেবের সঙ্গে অশ্বিনীদাদার বোঝাপড়া হ'ল। গুরুদেব ওঁকে এবার নিঃশঙ্ক আশ্রমে যেতে আদেশ করলেন। উনিও সে আদেশ মেনে নিলেন। বিদায়ের সময় হরিলুট দিয়ে শেষে বললেন, "বাবা, তোমার তো টিকিটের পয়সা নেই, এই নাও টিকিটের দাম।" এই ব'লে হাওড়া পর্য্যন্ত টিকিটের দামটি দিয়ে দিলেন। অশ্বিনীদাদা গেট পর্য্যন্ত এগিয়েছেন, এমন সময় একজন শিষ্য ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "এই নিন, আরও আট আনা পয়সা গুরুদেব দিলেন; ট্রেনে জলখাবার ও কলকাতার বাসভাড়ার জন্য। অশ্বিনীদাদা চলতে চলতে আশ্রমের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটি পার হয়েছেন, এমন সময় আর একটি শিষ্য ছুটে তাঁর কাছে এসে আবার চার আনা পয়সা দিয়ে বললে, "গুরুদেব দিলেন।" অশ্বিনীদাদা কৌতূহলী হয়ে শুধালেন, "এটি আবার কিসের জন্য।" শিষ্যটি বললে, "মুখে তো কিছু বললেন না। শুধু মুখে হাত দিয়ে যা' দেখালেন, তাতে বোঝায়—।" অশ্বিনীদাদা বললেন, "হ্যাঁ, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। বিড়ির পয়সাও যে আমার নেই, তাও সাধুবাবা বুঝতে পেরেছেন,—এবং সেটুকু অসুবিধাও তিনি আমার রাখবেন না।" পথ চলতে চলতে তিনি ভাবতে লাগলেন, গীতায় যে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—তা' এই সাধুবাবা সেই শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কি কিছু কম করুণ!

দ্বিতীয় শিষ্য যিনি 'অশরীরী'দের প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন, তিনি আমাদের প্রাচীনতম শিষ্য রঘুনাথ মহান্ত দাদা। নিঃশঙ্ক আশ্রমে গুরুদেব একদিন গভীর রাত্রে শ্মশানে যাচ্ছিলেন শ্মশান-পূজা ও ভোগ দেওয়ার জন্য। সেদিন তিনি কৃপা ক'রে রঘুনাথ দাদাকে সঙ্গে নিলেন। ঘন গাছ ঘেরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে রঘুনাথ দাদা থমকে দাঁড়ালেন। অল্প চন্দ্রালোকে বেশ দেখা গেল সামনের একটি আমগাছের ডালে কে একজন পা ঝুলিয়ে বসে আছে, তার পা দু'টি কিন্তু অস্বাভাবিক-রূপে দীর্ঘ হয়ে মাটি পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। মনে হচ্ছে কে যেন দুই পা দিয়ে পথ আটকে বসে আছে। গুরুদেবও সামনে দাঁড়ালেন, এবং গুরু যেরূপ অবাধ্য শিষ্যকে তার অশোভন ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করেন, ঠিক সেইরূপে কঠিন কণ্ঠে তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। গুরুদেবের সেই শাসনবাক্য শোনার পর সেই অশরীরী তার পা দু'টি সরিয়ে নিল এবং ওঁরা চলে গেলেন। শ্মশানে পৌঁছে গুরুদেব পূজা ও ভোগ দিলেন। রঘুনাথ দাদা একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। অশরীরীদের ভোজন সময়ে তাদের আহার করার স্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলেন।

তৃতীয় শিষ্য নলিন মুখার্জী দাদা 'অশরীরী'দের চোখে না দেখলেও, তাদের ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন। একদিন গুরুদেব নিঃশঙ্ক আশ্রম থেকে নবদ্বীপ আশ্রমে এলেন। পৌঁছাতে বেশ রাত হয়ে গেছে। তখন নবদ্বীপ গুহাশ্রম গুরুদেবের

অনুপস্থিতিকালে তালাবদ্ধ থাকত। গুরুদেব চাবি দিয়ে তালা খুললেন। তারপর তিনটি তুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে 'বীর অবধূত' ব'লে আহ্বান করলেন। অমনি ভিতর থেকে খিল খুলে গেল। বেশ স্পষ্টই শোনা গেল, যেন কেউ ভিতর থেকে খিল খুলে দিল। অথচ দেখা গেল ভিতরে কোনো প্রাণী নেই। নলিন দাদা সময়মত গুরুদেবকে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে, গুরুদেব শুধু করযোড়ে বলেছিলেন, "বাবা, বাবা।"

নিঃশঙ্ক মহাশ্মশানে সাধনেচ্ছু বহু সাধুর মৃতদেহ হয় তালগাছে ঝুলানো থাকত, নয়তো ডোবার কাদায় অর্দ্ধেক পোঁতা দেখা যেত। আমাদের প্রবীণ শিষ্য ননীদাদা এ সবের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন। অযোগ্য সাধকের এই দুর্দ্দশা ঘটত। একমাত্র গুরুদেবই এই ভয়াল, ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে শ্মশানকে আনন্দ-বৃন্দাবনে পরিণত করেছিলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সিদ্ধ ঋষিগণকে কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন ব'লে জানি না, তবে কোনো কোনো ভাগ্যবান্ ভক্ত তাঁদের জ্যোতি দর্শন করেছেন। স্বয়ং গুরুদেব এঁদের নিত্য গুহামন্দিরে আগমন ও গুহার সিদ্ধ আসনে প্রণাম করার কথা বারবার আমাকে বলেছেন। গুহামন্দিরে সর্ব্ব দেবদেবী আসেন—একথা কমলাকে বলেছেন তিনি। আসলে স্বর্গের দেবতাগণ সূক্ষ্মদেহে পুণ্যকর্মের জন্য সুখভোগ করেন, কিন্তু তাঁরা কেউই মায়ামুক্ত নন। মহ, জন, তপ ও সত্য লোকের সিদ্ধ ঋষিগণও বহু বিভূতি ও সিদ্ধি লাভ করেন সত্য; কিন্তু তাঁরাও কেউই মায়ার প্রলোভনকে সম্পূর্ণরূপে জয় ক'রে মায়ার পরপারে গমন করতে সমর্থ হন নি। এমন কি সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ব্রহ্মাও একেবারে মায়ামুক্ত নন। কিন্তু তাঁরা জানেন যে সিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত সম্পূর্ণরূপে মায়ামুক্ত; এবং ভগবানের দুরত্যয়া মায়াকে জয় করতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে এই মায়ামুক্ত কৃষ্ণভক্তগণের দর্শন, স্পর্শন ও কৃপা লাভ করতে হবে। তাঁরা দয়া ক'রে এই সাধন প্রক্রিয়া জানালে, সেই সাধন করতে করতে বহু জন্ম পরে তবে মায়ামুক্ত হবার আশা করা যেতে পারে। তাই যতক্ষণ না তাঁরা কৃষ্ণভজনোপযোগী স্থূল মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁরা এঃ সব সিদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তগণের দর্শন, স্পর্শন ও প্রণামাদির দ্বারা তাঁদের কৃপালাভের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন। তাই গুরুদেবের মন্দিরে প্রত্যহ মহ, জন, তপ ও সত্যলোকের এত ঋষির সমাবেশ হত।

(৮) ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করা:

যখনই গুরুদেবের সমুখে কোনো সমস্যার উদ্ভব হ'ত, আমরা নিশ্চিত জানতাম, তিনি এমনই অলৌকিক ও আশ্চর্য্য পরিবেশ সৃষ্টি করবেন, এমনভাবেই সকলের মন পরিবর্ত্তিত ও মুগ্ধ করবেন, যে সাধারণ বুদ্ধিতে যার কোনো সমাধান অসম্ভব, সে সব সমস্যার অতি সরল ও আনন্দময় সমাধান ও সমাপ্তি ঘটবেই। এরূপ দৃষ্টান্ত তাঁর

লীলায় এত বেশী ঘটেছে, যে কারো পক্ষেই তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। সে সব অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে কয়েকটির মাত্র সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করব। ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমান ও পুরী ষ্টেশনে মাল বিভ্রাটে সে কথা বলা হয়েছে। নিম্নে অপর কয়েকটি চমৎকৃতিজনক ঘটনার উল্লেখ করছি।

নবদ্বীপ মণিপুর আশ্রমে আম ও ফুলের কলম গাছ চুরি

মণিপুর আশ্রমে সদ্য-প্রোথিত কয়েকটি ফল ও ফুলের কলম-গাছ-চোরের লোম-হর্ষণ অভিজ্ঞতার কথা শুনুন। যে দিন ঐ *সুন্দর সুন্দর* কলমের চারাগুলি মণিপুর আশ্রমের বাগানে বসানো হ'ল, ঠিক তার পরের দিন দুপুরেই জনৈক ফেরীওলা— 'ভাল ফুলের কলম চাই, ভাল আমের কলম চাই'—ব'লে চীৎকার ক'রে ফেরী করতে করতে গুহাশ্রমের গলিতে এসে পড়ল। ভাল 'কলম' বিক্রী হচ্ছে শুনে আশ্রমবাসী ভক্তবৃন্দ তাকে আশ্রমের ভিতরে ডাকল। 'কলম' ভর্ত্তি ঝুড়ি নিয়ে ফেরীওলা আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করলে সেবকবৃন্দ সেই 'কলমে'র চারাগুলি দেখে চমকে উঠল। এইগুলিই তো তারা গতকাল মণিপুর আশ্রমে বসিয়েছিল। সকলে তাকে শুধাল, "তুমি এ 'কলম' কোথা থেকে পেলে ?" সে প্রথমে সত্য কথা অস্বীকার ক'রে নানা কল্পনার আশ্রয় নিল। একজন এই অবসরে মণিপুর আশ্রমে গিয়ে সব দেখে এল, সেখানে কলমগুলি সত্যই চুরি হয়েছে। খবর নিয়ে জানা গেল, উক্ত লোকটিও ঐ আশ্রমের পাশেই থাকে। তখন আর তার পরিত্রাণের কোনো উপায়ই থাকল না। আশ্রমবাসী সেবকগণ থানায় সংবাদ দিতে প্রস্তুত হলেন। বেচারা চোর তখন শঙ্কিত হয়ে উঠল। সে কি জানে ঐ মণিপুর আশ্রম এই পাতালবাসী সাধুবাবার ? হায়রে হায়—এ কী পরিতাপের বিষয় ! যার জিনিষ সে চুরি করেছে, দৈবচক্রে তারই কাছে সেই চোরাই মাল নিয়ে এসেছে বিক্রী করতে ! এই প্রসঙ্গে স্বয়ং মহাপ্রভু কীভাবে শিশুকালে অপহৃত হয়ে চোর কর্তৃক নিজ গৃহেই আবার আনীত হয়েছিলেন, তা' স্মরণ করুন। এদিকে আশ্রম সেবকগণ নাছোড়বান্দা; হাতেনাতে যে ধরা পড়ল, তাকে পুলিশে দেওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করলেন তাঁরা। চোর তখন নিরুপায় হয়ে প্রায় কেঁদে ফেলল। তখন দয়াময় গুরুদেব তাকে দর্শন দিলেন এবং অভয় দিয়ে বললেন, "এরূপ কাজ আর কখনো করো না বাবা।" তারপরে তাকে পেট ভ'রে খাইয়ে ও কিছু পয়সাকড়ি সাহায্য দিয়ে বিদায় দিলেন।

চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমায়েস্ বা পুলিশ দেখে মানুষ মাত্রেই ভীত হয়ে পড়ে। গুরুদেব এই নবদ্বীপধামে বহু শক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন্ন শত্রু নিয়ে বাস করেছেন। দু'চারজন অনুরাগী ভক্ত ছাড়া নবদ্বীপে কেউই তাঁর মিত্র ছিল না। ছিলনা স্বয়ং মহাপ্রভুরও, যার জন্য তাঁকে তাঁর লীলাস্থল পরিবর্তিত করতে হয়েছিল সুদূর

পুরীধামে। সেখানে পুরীর রাজাই ছিলেন তাঁর পরমভক্ত, অপরে কা কথা। সুতরাং সেখানে মহাপ্রভু নিশ্চিন্তে নির্ব্বিঘ্নে ভক্তগণকে নিয়ে লীলা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের গুরুদেব এই নবদ্বীপে শত শত শয়তানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও নির্ব্বিকার ছিলেন। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ গুরুদেবকে নবদ্বীপ ছেড়ে অন্য অনুকূল পরিবেশে চলে যেতে বার বার অনুরোধ করলেও তিনি যান নি, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। পরন্তু সেইসব প্রভাবশালী পাষণ্ডের দল একে একে শুধু তাঁর পদানতই হয় নি, অনেকে তাঁর ভক্তও হয়েছে। তিনি যে-নির্য্যাতন, নিপীড়ন ও অবিরাম অত্যাচার সহ্য করেছেন, তা' ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। তিনি যদি প্রকৃতই ভীত হতেন এই শত্রুদের উৎপীড়নে, তবে তিনি এ স্থান ছেড়েই যেতেন। কিন্তু ভীত হওয়া দূরের কথা, তিনি তাদের আদৌ গ্রাহ্যই করেন নি, এবং সেই সব পাষণ্ডকুল পরিণামে হতচকিত হয়ে একে একে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। কেউ কেউ বা পরমভক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। গুরুদেবকে সম্যক্‌রূপে বোঝবার সাধ্য কোনো জীবের নেই। চোর, ডাকাত বা পুলিশ অফিসারকে দেখে কখনো তিনি এমন ভাণ করতেন যেন তিনি কতই ভীত হয়েছেন এবং ভক্তস্থ আশ্রমস্থ শিষ্যদেরও অতিমাত্রায় সতর্কিত ক'রে দিতেন; আবার কখনো বা তাদের সামনে তিনি এমন ঐশ্বর্য্য প্রকট করতেন যে ঝানু গোয়েন্দা অফিসার, দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত বা কুটিলতম শয়তানও মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়ে যেত। এ সেই মহাপ্রভুর "কভু তো লৌকিক রীতি, যেন ইতর জন; কভু স্বতন্ত্র, করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন। কভু রামচন্দ্র পুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়, কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণ প্রায়।" প্রায় প্রত্যেকদিনই ছোট বড় এমনি ঘটনা ঘটত। কাজেই তার সামগ্রিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। দু'একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র বিবৃত করছি।

স্থান—গোমো তপোবন, সময় ইং ১৯২৬ বা ২৭ সালের এপ্রিল মাস। আশ্রমে তখন পুরুষ শিষ্যদের মধ্যে আছেন দুই দাদা। বিকালের দিকে দু'জন হিন্দু-স্থানী ষণ্ডা-মার্কা গুণ্ডা আশ্রমে এসে উপস্থিত। তারা আশ্রমে কারো সাথে কোনো কথা বলল না, বাগানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে পশ্চিম প্রান্তে বৈঠক খানার দাওয়ায় ঘাঁটি গেড়ে বসল। তাদের চেহারা এমন যে দেখেই ভয় হয়। আমাদের শিষ্যদাদা 'ভীতু' মানুষ, অন্যজন তখন বালকমাত্র। শিষ্যদাদা ভীত হয়ে গুরুদেবকে ওদের কথা বলাতে গুরুদেব এমনভাব দেখালেন যেন তিনিও অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। গুরুদেব অনেক মিষ্টান্ন দিয়ে দাদাকে ব'লে দিলেন, "এই সব মিষ্টি ওদের দিয়ে, বেশ নম্র হয়ে, ভাল ভাবে ওদের চ'লে যেতে বল।" গুরুদেবের আদেশমত তখন তিনি ওদের কাছে গিয়ে কথা বলতেই ওরা এমন রুক্ষ ও কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল যে আমাদের দাদার আত্মারাম তো খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম! ওরা শিষ্যটির কথা, এমন কি গুরুদেবের

প্রসাদও কানেই তুলল না, মিষ্টিও নিলনা,—উপরন্তু সেখানে গ্যাঁট্ হয়ে বসে গাঁজা টানতে লাগল। এসব কথা গুরুদেবকে বলাতে তিনি যেন আরো ভীত হয়ে পড়েছেন —এরূপ ভাব দেখালেন। মায়েরা যে যেখানে কাজ করছিলেন, তাদের সেই সেই ঘরের বাইরে থেকে তালাবদ্ধ ক'রে রাখা হ'ল। গুরুদেবও অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে চারি দিকে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। এ'দিকে শিষ্যদাদাটিকে ডেকে চুপি চুপি আদেশ করলেন, "যাও, শীঘ্র ছুটে ষ্টেশনে চ'লে যাও। সেখানে গিয়ে আমাদের শিষ্য পঞ্চানন বাবাকে সব জানাও।" শিষ্যটি জামা পরতে উদ্যত হ'লে গুরুদেব তাঁকে ভর্ৎসনা ক'রে বললেন, "বাবুর মত গেলে হবে না; ওদের আরো চর আছে, তোমায় ধ'রে ফেলে যদি তো মেরে ফেলবে। চাকর ভিখ্নার ময়লা কাপড়টা পর, আর গামছা মাথায় বাঁধ। তা' হ'লে তোমাকে ওরা চাকর মনে ক'রে হয়ত অব্যাহতি দিতে পারে।" দাদা তো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চাকর সেজে যেতে উদ্যত হলেন। গুরুদেব আবার সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, "সামনের গেট দিয়ে গেলে ওরা এখনি তোমাকে কেটে ফেলবে।, ঐ পিছনের খিড়কী দিয়ে বনে বনে যাবে। ছুটে যেও, রাস্তায় কোথাও থেমোনা।" দাদার ভয়ে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কোনো রকমে 'যে আজ্ঞে' ব'লে ছুট দিলেন। ষ্টেশনে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে পঞ্চাননদাদাকে সব জানালেন। পঞ্চাননদাদা শিষ্যটির এই বেশ, তার ভয়চকিত বিহ্বল দৃষ্টি ও কথা বলার ভঙ্গী দেখে ও শুনে মুহূর্ত্তে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ষ্টেশনের সমস্ত কুলিকে সমবেত ক'রে সকল কথা বুঝিয়ে দিলেন। কুলিরা গুরুদেবের পরমভক্ত ছিল। তারা গুরুদেবের আশ্রমে ডাকাত এসেছে শুনবামাত্র হুঙ্কার দিয়ে উঠল। যার যে লাঠি সোটা ছিল সব নিয়ে, আলো নিয়ে, প্রায় একশত কুলি পঞ্চাননদাদার সঙ্গে যাত্রা করল আশ্রম অভিমুখে। শিষ্য দাদাটি আগেই ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে গুরুদেবকে সব সংবাদ দিলেন। গুরুদেব সব শুনলেন। কিন্তু তখন তাঁকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখা গেল রান্নাঘরে রান্নাবান্নার তদারকি করতে। প্রায় একশত লোকের খাবার জন্য খিচুড়ি চাপানো হয়েছে রান্নাঘরে, তার দেখাশুনা করছেন গুরুদেব। ওমা! কোথায় শিষ্যদাদার মুখে সংবাদ শুনে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, না সেদিকে গ্রাহ্য না ক'রে তিনি খিচুড়ি রাঁধাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন! কিছুক্ষণ পরেই দূর থেকে শতকণ্ঠে গুরুদেবের গগনভেদী জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে সে মিছিল, সে জয়ধ্বনি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হতে লাগল। ডাকাত দুটি প্রথমে ওদিকে তত খেয়াল করেনি; পরে যখন বুঝল সেই বিরাট মিছিল আশ্রমের দিকেই আসছে, তখন তাদের টনক নড়ল। হতচকিত হয়ে উঠে পড়ল এবং আশ্রমের গেটের দিকে এগোতে লাগল। ওদিকে তখন কুলিদের মিছিল আশ্রমের গেটের সমুখে এসে পড়েছে, তাদের গগনভেদী

জয়ধ্বনিতে ডাকাতদের বুক কাঁপতে লাগল। শত মানুষের বূ্যহ ভেদ ক'রে তখন আর তাদের অগ্রসর হবার ক্ষমতা ছিল না, তারা সেখানে বসে পড়ল। কিন্তু বসে কি রক্ষা আছে? কুলিরা এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং টেনে তুলল। তারপর কর্কশ কণ্ঠে গালাগালি দিতে লাগল। দস্যুদ্বয় ভয় পেয়ে বললে, "আমরা এখনি চ'লে যাচ্ছি।" কিন্তু যেতে দিলে তো—। কুলিরা তাদের হিড়্ হিড়্ ক'রে টানতে টানতে গুরুদেবের মন্দির সামনে নিয়ে এল এবং গালি দিয়ে বললে, "তোরা সাধুবাবাকে অপমান করেছিস, জোর ক'রে তাঁর পবিত্র আশ্রমে ঢুকেছিস্—সহজে তোদের ছাড়া হবে না। আগে সাধুবাবার কাছে ক্ষমা চা'; তিনি যদি ক্ষমা করেন, তবে ছাড়ব।" কী আর করে—বেচারা ডাকাত দুটি! অবশেষে হাতযোড় ক'রে গুরুদেবের কাছে ক্ষমা চাইল। গুরুদেব বললেন এখানে প্রসাদ পেয়ে যেতে। কিন্তু তারা কিছু খাবেনা জানাল। কুলিরা গর্জন ক'রে উঠল—"খাবেনা? ওদের ঘাড় খাবে।" তারপর সেই একশত কুলিদের ভোজন-উৎসব হ'ল। ভোজনান্তে প্রণাম সেরে কুলিরা প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে ঐ ডাকাত দুটিকে ষ্টেশনে নিয়ে গেল। সেখানে তাদের G. R. P. কে সমর্পণ ক'রে দেওয়া হ'ল। পুলিশ তাদের দুজন কুখ্যাত পলাতক ডাকাত ব'লে সনাক্ত ক'রে থানায় চালান ক'রে দিল।

দেখুন গুরুদেবের কী অপূর্ব্বলীলা। তিনি আশ্রম শুদ্ধ সকলকে ভয় বিহ্বল করিয়ে স্বয়ং শতাধিক ভক্ত কুলির ভোজন-উৎসব-সমারোহের আনন্দে মেতে থাকলেন। অর্থাৎ সব ব্যাপারটিই তাঁর এক আনন্দ-অভিনয় মাত্র। এই প্রসঙ্গে ডাকাতদেরও এমন শিক্ষা দিলেন, যা' তারা জন্মে ভুলবে না। কুলিদের ভক্তির প্রাবল্য প্রদর্শনও এই লীলার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

গুরুদেবের 'জগাই-মাধাই'রা যে ক্রমে তাঁর পদানত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল এবং কেউ কেউ পরম ভক্তরূপেও পরিবর্ত্তিত হয়েছিল, তা' ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হয়েছে। সাময়িকভাবে তাঁকে অবমাননা ক'রেও যে কেউ অব্যাহতি পায় নি, তারও অগণিত দৃষ্টান্ত আছে। বস্তুতপক্ষে, মহতের অবমাননা করলে যে অপরাধ হয়, সেই অপরাধীকে স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারেন না। যে মহতের নিকট অপরাধ হয়েছে, তিনি ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেউই তাকে রক্ষা করতে পারে না। এ তথ্য মহাভক্ত অম্বরীষের প্রতি দুর্ব্বাসা ঋষির অপরাধ থেকে আরম্ভ ক'রে, মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীবাসের প্রতি চাপাল গোপালের অপরাধ, অদ্বৈতের নিকট স্বয়ং শচীমাতার অপরাধ প্রভৃতি কাহিনীতে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে যারা অপরাধী হয়েছিল, তাদের দুর্দ্দশা ও শেষ পরিণতির অজস্র বাস্তব ঘটনা ঘটে গেছে। তার দু-একটি লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করব। শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন "আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং

লোকানাশিষ এব চ, হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বানি পুংসো মহদতিক্রমঃ", অর্থাৎ মহতের অবমাননা করলে তার আয়ু, লক্ষ্মীশ্রী, যশ, ধর্ম, ইহলোক, পরলোক এবং সর্ব্ব শুভের সামগ্রিক বিনাশ সাধিত হয়ে থাকে। আবার কোনো মহাপুরুষ বা ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণে অপরাধ হ'লে সেই ভক্ত হয়তো তাকে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু তবু ভগবান্ তাকে ক্ষমা করেন না,—"ভক্তের স্বভাব, অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে; কৃষ্ণের স্বভাব, ভক্ত নিন্দা সহিতে না পারে"—চৈঃ চঃ। সুতরাং মহতের সঙ্গে অতি সাবধানে, অতি সতর্ক হয়ে ব্যবহার করতে হয়, তাঁর শ্রীচরণে অপরাধ হ'লে আর নিস্তার নেই। এক্ষণে একটি ছোট ঘটনার কথা বিবৃত করছি, যার সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। গুরুদেব তখন গোমো আশ্রমে। গুরুদেবের চিঠিপত্রাদির সমস্ত ভার আমারই উপর। ওখানকার পোষ্টাফিস ষ্টেশন ছাড়িয়ে আরো মিনিট দশেকের রাস্তা অর্থাৎ আশ্রম থেকে প্রায় চল্লিশ মিনিট। আশ্রমে দৈনিক চিঠি বিলি হ'ত না, সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন পিওন মনিঅর্ডার বিলি করতে আশ্রমে আসত। সপ্তাহের অন্যান্য দিন আমি পোষ্টাফিসে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসতাম, এবং মনিঅর্ডার থাকলে খোঁজ নিয়ে আসতাম। পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টার ও অন্য কেরাণীবাবুর সহিত আমি আলাপ করবার চেষ্টা করলেও ওরা আমাকে তেমন আমল দেয় নি। পিওনটিও একটু রুক্ষ মেজাজের ও উদ্ধত স্বভাবের ছিল। পিওন তার নির্দ্দিষ্ট দিনে যখন আশ্রমে আসত তখন মনিঅর্ডার সই করবার জন্য গুরুদেবকে সব কাজ ফেলে ছুটে আসতে হ'ত। পিওনের একটুও তর সইত না। এমনি একদিন পিওন এসেছে আশ্রমে মনিঅর্ডার ও চিঠি নিয়ে এবং মনিঅর্ডার বিলি ক'রে চ'লে গেছে। হঠাৎ বাজার থেকে আসার পথে রাস্তার মাঝে গুরুদেবের একটি চিঠি পড়ে থাকতে দেখলাম। চিঠিটি কুড়িয়ে নিয়ে গুরুদেবকে দিলাম এবং পিওনের কাজের অসতর্কতা ও অবহেলার কথাও আলোচনা করলাম। পরদিন পিওনকে আমরা তার এই গাফিলতির কথা জানাতে সে তো চ'টেই অস্থির; বললে, "রাস্তায় চিঠি পড়েছিল তা' কী হয়েছে? ওরকম সাধুর চিঠি রাস্তায় পড়ে থাকে।" পিওনের এই উদ্ধত উত্তর শুনে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল। গুরুদেবের প্রতি এই অপমানসূচক বাক্য ও তার এই অবহেলাজনিত ঔদ্ধত্য আমাকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলল। সে ভেবেছে—সাহেব-সুবো নয়, কোনো রেলের অফিসার বা কর্মচারীও নয়, সামান্য একজন সাধু, তার আর কী মর্য্যাদা আছে? তাই এই তাচ্ছিল্য, এই অবমাননা, এই স্পর্দ্ধা। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে গুরুদেবকে গিয়ে সব কথা জানালাম এবং বললাম, "দয়া ক'রে আদেশ দিন, আমি এর নামে complaint করব উর্দ্ধতন অফিসে।" গুরুদেব আদেশ দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ Divisional Superintendent-এর বরাবর complaint করলাম। Complaint letter post করবার পাঁচদিন পরের কথা।

আশ্রমের বারান্দায় বসে আছি, এমন সময় দেখি যে গেটের কাছে একজন বিহারী ভদ্রলোক একজন ভৃত্যসহ আশ্রমে আসছেন। আমি গেটের নিকটে ছুটে এলাম এবং তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। ভদ্রলোক আমার নাম ক'রে বললেন, "এই নামের এক ব্যক্তির একটি postal complaint এর enquiry করতে আমি এসেছি। আমি এই circle এর Postal Inspector. আমি তাঁকে অভিবাদন ক'রে আশ্রমের ভিতরে নিয়ে এলাম এবং বললাম, "আমিই complainant." তারপর আমার নিজের পরিচয় এবং আমার গুরুদেবের পরিচয় দিয়ে সমগ্র ব্যাপারটি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। তিনি ধীরভাবে সব শুনে বললেন, "গাফিলতি শুধু postman-এরই নয়, postal staff এরও। সামগ্রিকভাবে বিচার হবে।" গুরুদেব তখন কাজে ছিলেন। তিনি দ্বার খুললে তাঁর কাছে গিয়ে Inspectorএর আগমনের কথা জানালে তিনি খুব খুসী হলেন এবং তাঁকে দর্শন দিতেও স্বীকৃত হলেন। গুরুদেবকে দর্শন করবামাত্র Inspector কী রকম যেন অভিভূত হয়ে গেলেন; তাঁর সর্ব্বাঙ্গে পুলক, কম্প ও দুই চোখে অশ্রু দেখা গেল। তিনি করযোড়ে তাঁর সামনে বসে রইলেন। তারপর গুরুদেব প্রদত্ত হরিলুট তাঁকে দিলাম, তিনি ভক্তিভরে তা' গ্রহণ করলেন। কিছু হরিলুট বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীর জন্য নিয়ে যেতে বললেন গুরুদেব, তাও তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে নিলেন। তারপর complaintএর কথা। গুরুদেব আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "বাবা, আমার এই বিদ্বান্ ছেলেটি যা' বলে, তার অভিযোগ শুনে আইনমত বিচার করো, বাবা।" Inspector করযোড়ে বললেন, "সে আপনাকে আর বলতে হবে না, ঠিক আইন মাফিকই সব অভিযোগের বিচার হবে।" তারপর গুরুদেব দরজা বন্ধ করলে, Inspector আমার দিকে চেয়ে অশ্রু ছলছল চোখে বললেন, "এতো সাধারণ সাধু নয় —এতো সেই সাক্ষাৎ ভগবান্। আপনারা মহাভাগ্যবান্ যে সেই সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গে রয়েছেন। এঁর দর্শনে আজ আমারও জীবন ধন্য হ'ল। আমি আবার শীঘ্রই আসব।" এই ব'লে তিনি সেদিনের মত বিদায় নিলেন। তারপর দিন তিনেক পর তিনি আবার আশ্রমে এসে উপস্থিত। এবার ওভারসিয়র, আরদালী প্রভৃতি আরও কিছু লোক সঙ্গে এসেছে। যথারীতি enquiry সম্পন্ন হ'লে ওঁরা গুরুদেবের কাছে এলেন। গুরুদেবের দর্শনে সকলেই মুগ্ধ, Inspector তো একেবারে অভিভূত। এবার তিনি সত্যই কেঁদে ফেললেন, তাঁর সঙ্গী লোকদেরও প্রায় ঐ একই দশা। গুরুদেব তাঁদের সকলকেই কৃপা করেছেন, তাই সকলেই তাঁকে চিনতে পেরেছে। সকলকে প্রচুর হরিলুট মিষ্টান্ন বিতরণের পর গুরুদেব একবার আমার দিকে দেখিয়ে বললেন, "Inspector বাবা, এই বিদ্যাসাগর ছেলেটি যে অভিযোগ করেছিল, তার কী করলে, বাবা?" Inspector করযোড়ে বললেন, "বাবা, আপনি

তো স্বয়ং ভগবান্; বিচারকর্তা আপনিই, আপনি যা' বিচার করবেন, তাই হবে। আমরা বিচার করবার কে?" তাঁর ভক্তিতে গুরুদেব সন্তুষ্ট হলেন। তারপর তাঁকে প্রচুর হরিলুট দিলেন এবং বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীর জন্য নিয়ে যেতে বললেন। Inspector সেগুলি ভক্তি ক'রে মাথায় স্পর্শ ক'রে বেঁধে নিলেন। এরপর গুরুদেব যার বহু করলে complaint সম্বন্ধে আমি তাঁর সাথে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, "এ হেন সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ যিনি, তাঁকে যে অবমাননা করেছে, তার কঠোরতম সাজা হবে। শুধু তার নয়, পোষ্টমাষ্টার ও তার ষ্টাফেরও যথেষ্ট গাফিলতি আছে, তারাও রেহাই পাবে না।" Inspectorএর এই সিদ্ধান্তের কথা গুরুদেবকে জানালে গুরুদেব তাঁকে বিদায় দেবার সময় বললেন, "দেখো, বাবা, লোকটার যেন চাকুরী একেবারে চ'লে না যায়।" Inspector করযোড়ে বললেন, "আপনি যা' বলবেন, তাই হবে। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করব না আমি। তবে আইনতঃ, তার কঠোর সাজা হওয়া উচিত।" গুরুদেব বললেন, "আইন মতই কাজ ক'রো, বাবা। তবে দেখো, যেন লোকটা একেবারে না খেয়ে মারা না পড়ে।" Inspector বললেন, "আজ্ঞে, তাই হবে।" বিদায় নেবার সময় তিনি সজলচক্ষে বললেন, "দয়া ক'রে এই অধমকে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিন। এমন দুর্লভ রত্ন আর তো কোথাও মিলবে না।" গুরুদেব বললেন, "আবার এসো, বাবা।" তিনি সায় দিয়ে বললেন, "আজ্ঞে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব।"

এদিকে পোষ্টাফিসে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। Postman suspended—তার স্থলে অন্য postman এসেছে। Postmaster এবং তার Staffকে gross negligence of duties—এই chargeএর explanation call করা হয়েছে। তারা সবাই সন্ত্রস্ত। Inspector খুব কড়া মন্তব্য ক'রে গেছেন। Postman এই দারুণ দুঃসংবাদ শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেছে, তাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তার প্রবল জ্বর, সে প্রলাপ বকছে। আর পোষ্টমাস্টার ও তার সহকর্মী দু'জনে বিকালে হন্তদন্ত হয়ে আশ্রমে এসে উপস্থিত। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে তাঁরা আমাকে তাঁদের করুণ অবস্থার কথা ব'লে আমার পায়ে ধরতে এলেন। আমি সঙ্কুচিত হয়ে স'রে এসে বললাম, "আমি কে, আমার কাছে অমন করছেন কেন? আপনাদের অপরাধ হয়েছে ঐ মহাপুরুষ, সিদ্ধসাধুর কাছে—যাঁর মর্য্যাদা আপনারা কিছুই বোঝেন নি এতদিন, উপরন্তু আপনাদের postman এবং আপনারাও তাঁর প্রতি উদ্ধত ব্যবহার ক'রে এসেছেন। ক্ষমা চাইতে হবে তাঁর কাছে; তাঁর চরণে গিয়ে পড়ুন, একান্তভাবে তাঁর শরণ নিন। তবে যদি কিছু উপায় হয়।" একথা বলার পর গুরুদেবের শ্রীচরণে গিয়ে তাঁরা হত্যা দিয়ে পড়লেন। শ্রীগুরুদেব তাঁদের হরিলুট মিষ্টান্ন আদি দিয়ে হাত যোড় ক'রে বললেন,

"আমি ভিখারী সন্ন্যাসী; আমি আপনাদের আইন কানুন কী বুঝি? যা' করতে হয় আপনাদের Inspector বাবাই করবেন। আর এই যে রোগা ছেলেটি দেখছেন, একে সামান্য ভাববেন না, ইত্যাদি।" গুরুদেব দুয়ার বন্ধ করলে, ওঁরা আবার আমার কাছে ধর্ণা দিলেন। আমি হেসে বললাম, "এটা তো সত্য যে আপনারা এতদিন ওঁকে ওঁর যথোচিত মর্য্যাদা দেন নি। সামান্য ভিখারী সন্ন্যাসী ব'লে অবজ্ঞাই ক'রে এসেছেন তার ফল যাবে কোথায়? প্রকৃত সাধু মহাপুরুষের অবমাননা ভগবান সহ্য করেন না। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। কাজেই ফলভোগ আপনাদের কিছু করতেই হবে। তবে হ্যাঁ, আপনারা যখন তাঁর শরণ নিয়েছেন, এবং এইরূপ শরণাগতি যদি অব্যাহত রাখেন, তবে তাঁর দয়া হ'তে পারে, এবং আপনাদের কর্মভোগ কিছু কম হ'তে পারে। সেটা যাতে মারাত্মক পর্য্যায়ে না পৌঁছায়, তা' তিনি দেখবেন। তবে আপনারা তাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করবেন, তাঁর প্রাপ্য মর্য্যাদা দেবেন এবং যাতে তাঁর দয়া আকর্ষণ করতে পারেন, সেজন্য মাঝে মাঝে তাঁব কাছে আসবেন।" ওঁরা সাগ্রহে বললেন, "রোজই আসব। আপনি দয়া ক'রে সাধুবাবাকে আমাদের অবস্থা একটু বুঝিয়ে বলবেন।" এই ব'লে হাতযোড় ক'রে, বহুত মিনতি জানিয়ে, সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

তারপর থেকে প্রায় রোজই বিকালে আসতেন তাঁরা। আমি প্রায়ই কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলতাম ওঁদের সঙ্গে। কিন্তু পোষ্টম্যানের খবর যা' পেলাম তা' একটুও আশাপ্রদ নয়। আতঙ্কে বেচারার nerves সব শিথিল হয়ে গেছে, সে তখনও শয্যাশায়ী। পোষ্টমাস্টার বললেন, "সে এ যাত্রা আর উঠবে কিনা সন্দেহ। বেচারার পরিবার পথে বসবে।" শু'নে আমারও মনে কিছু সহানুভূতি জাগল। গুরুদেব তো পূর্ব্বাহ্নেই ব'লে রেখে'ছেন, "বাবা, ওকে একেবারে মেরো না।" দেখা যাক, কী হয়। ওর অনুশোচনা যদি খাঁটি হয় এবং ও অনুতাপে দগ্ধ হয়ে শুদ্ধ হয়, তবে ওব সাজারও অবসান হ'তে পারে। সবটাই ওর কর্ম ও প্রায়শ্চিত্তের তীব্রতাব উপর নির্ভর করছে।

দিন সাতেক পর Inspector আবার সদলবলে আশ্রমে এলেন। গুরুদেবকে যথাযোগ্য সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন ক'রে জানালেন, তাঁর অবমাননা ও অবজ্ঞাকারীদের সরকার পক্ষ কীভাবে সাজা দিয়েছেন। সব শু'নে গুরুদেব পোষ্টম্যানকে পুনরায় চাকুরীতে বহাল করতে অনুরোধ করলেন Inspectorকে। তবে বললেন, "আইন মাফিক যথাযোগ্য সাজা ওকে দিও, ওর কাজের বিধি-নিয়ম ঠিক ক'রে বেঁধে দিও, ওকে শাসন ক'রো যাতে ভবিষ্যতে এইমত কাজ আর না করে। তবে দেখো, পরিবার সহ যেন ও খেতে না পেয়ে না মরে।" Inspector করযোড়ে বললেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" তারপর আমার কাছে এসে বললেন, "বলুন, সাধুবাবার আর কিছু সেবায় লাগতে পারি

কিনা।" আমি সানন্দে বললাম, "অবশ্যই পারেন। প্রথম, আশ্রমে প্রত্যহ চিঠি বিলির ব্যবস্থা করুন।" উনি হেসে বললেন, "Granted." আমি বললাম, "বেলা দশটার মধ্যে যাতে পিওন আশ্রমে এসে পৌঁছায়, তার ব্যবস্থা করুন।" উনি একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "বেশ, তাও Granted." তারপর বললেন, "বলুন, আর কী প্রকারে সেবা করতে পারি।" আমি বললাম, "Postal staff যাতে গুরুদেবের যথোচিত মর্য্যাদা দেয়—", উনি বাধা দিয়ে বললেন, "সে আর আপনার বলতে হবে না। ওরা সাধু বাবাকে মাথায় ক'রে রাখবে। ওদের গাফিলতির কুফল ওরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।"

এর পরের কাহিনী আর না বললেও চলে। পোষ্টম্যান শুধু যে দৈনিক আসত তাই নয়, ছুটতে ছুটতে আসত এবং আশ্রমে এসেই শঙ্কিত মুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করত, "বাবু, দশটা কি বেজে গেছে?" আমি গম্ভীর মুখে বলতাম, "না, এখনও কিছু বাকী আছে।" তারপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে করযোড়ে ব'সে রইত। আর Postal staffও সেই থেকে একান্ত অনুগত ও বশংবদ হয়ে রইল আশ্রমের।

মহাপুরুষের কাছে থাকতে হ'লে এজন্য অত্যন্ত সাবধান হ'তে হয়, যাতে ভুলেও কোনো অপরাধ না হয়ে পড়ে। এইমত সিদ্ধসাধক গুরুদেবের নিন্দাবাদ কানে শুনতে নেই; যদি কোথাও সেরূপ নিন্দাবাদ হয়, তবে সেখান থেকে স'রে আসতে হয়। মহতের নিন্দকের মুখদর্শনও পাপ। "সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়, জন্মে জন্মে অধঃপাত চারি বেদে কয়"— চৈঃ ভাঃ ২।২০; "বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা না শুনিবে"— চৈঃ চঃ ২।২২। মহাপুরুষের নিন্দাই যখন এত গর্হিত, তখন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা সাধু দ্রোহিতা ও সাধুস্ব অপহরণ আরো কত ভয়াবহ ও বীভৎস পাপ কার্য্য তা' সহজেই অনুমেয়; নিন্দকের মুখদর্শন পাপ, দ্রোহী ও অপহারকের ছায়া মাড়ানোও উচিত নয়, তার নাম করাও মহাপাপ। শুধু তাই নয়, এই সকল বিষয়লোভী ব্যক্তির যারা সাহায্যকারী, এমন কি সমর্থক তারাও ওর সঙ্গে সমভাবে দণ্ডভোগ ক'রে থাকে—একথা শ্রীমদ্ভাগবত উদাত্ত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেছেন: "যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োর্বৃত্তিং স জায়তে বিড্‌ভুগ্‌বর্ষাণাময়ুতায়ুতম্। কর্ত্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ, কর্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎফলম্"—ভাঃ ১১।২৭।৫৪-৫৫, অর্থাৎ স্বদত্ত বা অন্যদত্ত দেব-বৃত্তি যে হরণ করে, সে অযুত বৎসর বিষ্ঠাভোজী ক্রিমি জন্ম লাভ করে। সহকারী ও অনুমোদকেরও ঐ একই ফল, কারণ তারাও উক্ত কর্মের অংশী। অধিক কর্ম করলে, ফলও অধিক হয়। আবার ধর্মস্থানে ধর্মের ভাণ ক'রে যারা অধর্মে লিপ্ত থাকে, তারা সাধারণ পাষণ্ড হ'তে আরও ভয়ঙ্কর। শ্রীনারদীয় পুরাণ বলছেন, "প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্, য একো যাত্যধঃ স্বয়ং, বক-বৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্য-

পরানপি," অর্থাৎ, প্রকাশ্য পণ্ডিত জন বরং ভাল, কারণ সে একাই অধোগামী হয়, কিন্তু বক ধার্মিক ভণ্ড নিজের সঙ্গে অপরকেও অধঃপাতিত করে। অর্থাৎ, তাকে ধার্মিক ভেবে যারা তাকে সাহায্য করে, শ্রীমদ্ভাগবতের অমোঘ বাক্য অনুযায়ী তার "কর্মণাং ভাগিনঃ" হ'য়ে "ভূয়ো ভূয়সি তৎফলম্" অবশ্যই প্রাপ্ত হয়; 'সারথি' অর্থাৎ সহকারী ও 'অনুমোদিতা'র কোনো ক্রমেই রেহাই নেই, শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য কখনো বৃথা হবে না। সেই জন্যই শাস্ত্র বার বার বলছেন, "ততো দুঃসঙ্গমৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্,"—ভাঃ ১১।২৬।২৬, এবং "ত্যজ দুর্জ্জন সংসর্গং, ভজ সাধু সমাগমম্।"—মোহ-মুদ্গর।

(৯) ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে প্রাকৃতিক শক্তি-নিয়ন্ত্রণ : ঝড়-বৃষ্টিকে গণ্ডী বেঁধে দেওয়া

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠক অবগত আছেন, "কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ, আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ-নিবারণ"—১।১৭। এক্ষণে আমাদের গুরুদেব কর্তৃক ঝড়-বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের একটি অত্যদ্ভুত ও চমকপ্রদ বিবরণ শ্রবণ করুন। এর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীমত্যা মন্দাকিনী দেবী ও শ্রীউমাপতি ঘোষ দাদার নিকট যেরূপ শুনেছি তাই বর্ণনা করছি। স্থান নিঃশঙ্ক আশ্রম, সময় বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব। আশ্রম প্রাঙ্গণে অতিথি সেবার জন্য পাতা করা হয়েছে। এখনি অন্ন পরিবেশন করা হবে। এমন সময় সমস্ত আকাশ কালো ক'রে পশ্চিমে ঘোর ঘনঘটায় মেঘের উদয় হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হ'ল। ঝড় তখন আসছে,—হ্যাঁ, ঐ দূরে পুকুর পাড় পর্য্যন্ত এসেছে, সেখানে প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ হয়ে গাছপালা ধরাশায়ী হচ্ছে। ভক্তগণ এই আসন্ন বিপদ দেখে ব্যস্ত হয়ে গুরুদেবকে সব জানাল। গুরুদেব সব দেখে নিজ আসনে গিয়ে দ্বার বন্ধ করলেন। এদিকে দ্রুত বেগে অব্যাহত গতিতে ঝড় এগিয়ে আসছে। এই এলো, এলো; আশ্রমের সীমায় এসে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু সেই সীমাতে এসে ঝড় সুস্পষ্টরূপে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। আশ্রমের চতুষ্পার্শ্বস্থ সীমানার বাইরে দুই ধারে ঝড় এগিয়ে চলল, সীমানা অতিক্রম ক'রে দ্রুতবেগে অগ্রসর হ'ল, আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য চলতে লাগল, সেই সঙ্গে নামল প্রবল বারিধারা, কিন্তু অবিশ্বাস্যরূপে আশ্রমের গণ্ডীর ভিতরে কিছুই হ'ল না, গাছের পাতাও নড়ল না, এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল না; নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে গুরুদেবের আশ্রমের অতিথি-সেবা সম্পন্ন হ'ল। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সেদিনের সমবেত বহু শত অতিথিগণ। কিন্তু একথা আজ-কি কেউ হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারে ?

অগ্নি-নির্ব্বাপণ

স্থান—গোমো তপোবন, প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা আমাদের শ্রীহৃষীকেশ আঢ্য দাদা। আশ্রমের ইঁদারার কাছে একটা শুকনা শালগাছ ছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে হঠাৎ দেখা গেল

গাছটিতে দৈবক্রমে অগ্নি-সংযোগ হয়েছে। গাছটি দাউ দাউ ক'রে জলছে। কাছেই অন্যান্য গাছপালা ও ঘরবাড়ী রয়েছে। সংবাদ শোনা-মাত্র হৃষীদাদা অন্যান্যের সঙ্গে বালতী নিয়ে ছুটলেন। অভিপ্রায়, ইদারা থেকে জল তুলে প্রজ্জলিত গাছে দূর থেকে জল ছিটিয়ে দেওয়া। কিন্তু প্রবল অগ্নির সেই দেদীপ্যমান্ লেলিহান্ শিখার কাছে এ প্রচেষ্টা নিতান্তই নগণ্য। তবু সেই আশাতেই তাঁরা গেলেন, যদি কিছু করা যায় এই অভিপ্রায়ে। এদিকে সংবাদটি গুরুদেবের কর্ণগোচর হ'ল। তিনি তৎক্ষণাৎ মায়েদের বাড়ীর ভিতর দিয়ে ওদিককার, অর্থাৎ ইদারার দিকের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে সেই অগ্নিকাণ্ডের দিকে দৃষ্টি করা মাত্র—এক অত্যাশ্চর্য্য, অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল। সমগ্র বৃক্ষ তখন অগ্নি কবলিত, তার উজ্জ্বল শিখা ঊর্দ্ধশাখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গ্রীষ্মের হাওয়ার দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে—কিন্তু সেই দ্রুত বর্দ্ধমান্ প্রজ্জলিত ঊর্দ্ধমুখী অগ্নিশিখা গুরুদেবের দৃষ্টিপাতমাত্র যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত তড়িৎ-গতিতে নত হয়ে ভূমি স্পর্শ করল। মনে হ'ল যেন অগ্নিদেব গুরুদেবকে দর্শন ক'রে তাঁকে ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করবার জন্য ঊর্দ্ধশির আভূমি আনত ক'রে, সেই মাটিতে শুয়ে প'ড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ক্রমবর্দ্ধমান্ বিন্ধ্য পর্ব্বত কেমন ক'রে অগস্ত্যঋষিকে দর্শন ক'রে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে স্থির হ'য়ে গেছে, সে কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সে বৃত্তান্ত সকলে বিশ্বাস করে না, কারণ তার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা কেউ নেই। কিন্তু ঊর্দ্ধমুখী এই অগ্নিদেবের গুরুদেবকে দর্শন মাত্র ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করা ও স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের স্বয়ং হৃষীদাদা, যিনি আজিও বর্ত্তমান।

মতিহারীতে গুরুদেবের পরম ভক্ত শিষ্য ইন্দুভূষণ ও কান্তিভূষণ ব্যানার্জ্জী দাদা সপরিবারে বাস করতেন। সেখানে একবার এক প্রলয়ঙ্কর বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। সেই অগ্নি নির্ব্বাপণের কোনো উপায় নেই দেখে তাঁরা একান্তচিত্তে নিরুপায়ের উপায়, সর্ব্বান্তর্য্যামী গুরুদেবকে ডাকতে থাকেন। ভক্তের আকুল আহ্বানে ভক্ত-বৎসল ভগবানের আসন টলল। ভক্তগণ সবিস্ময়ে দেখলেন সেই প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অগ্নি-দীপ্ত শ্রীশ্রীপাতালপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা ভক্তিভাবে তাঁর বন্দনা করতে লাগলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই ভয়াবহ অগ্নি বিস্ময়কর ভাবে নির্ব্বাপিত হয়ে গেল।

(১০) জ্ঞানী-গুণীজনের বিমুগ্ধ হওয়া :

অতি উচ্চ শিক্ষিত ও পরম পণ্ডিত মন্ত্রী শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

ঘটনাটি ঘটে এই নবদ্বীপ গুহাশ্রমে এক অপরাহ্নে। আমাদের অশ্বিনী দত্ত দাদা তখন আশ্রমে উপস্থিত। বিকালে দু'জন বিশেষ সম্মানিত দর্শনার্থী এলেন সাধুবাবার

দর্শনে—একজন কৃষ্ণনগরের মহারাজ বাহাদুর ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়, আর একজন অতি উচ্চ শিক্ষিত ও সুবিখ্যাত শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। দু'জনেই তদানীন্তন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মন্ত্রী ছিলেন। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী তখন অথর্ব্ব হয়ে পড়েছেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারেন না। তাঁকে তাঁর ভৃত্যগণ কোলে ক'রে উপরে নিয়ে এসে গুহার সামনে বসাল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেশ ভক্তিনম্রচিত্তে গুরুদেবকে দর্শন করতে লাগলেন এবং তাঁকে দর্শন ক'রে পরম পরিতৃপ্ত হলেন। গুরুদেব তাঁকে দু'একটি কথা বললেন, কিন্তু প্রথমে তিনি তাঁর কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না এবং সে বিষয়ে গুরুদেবকে বললেনও তিনি। গুরুদেব হাত যোড় ক'রে নম্রকণ্ঠে বললেন, "বাবা, অত বড় বিদ্বান্ আপনি—এই মূর্খ, অবোধ, ক্ষেপা সন্তানের কথা বুঝতে পারছেন না?" এই ব'লে ধীরে ধীরে তাঁকে আরো কয়েকটি কথা বললেন। এবার চক্রবর্ত্তী মহাশয় অত্যন্ত অভিভূত ও বিহ্বল হয়ে বললেন, "সাধুবাবা, আমি এত বই, এত শাস্ত্র পড়েছি—যে তাতে কয়েকটি লাইব্রেরী ভর্ত্তি হয়ে যায়, কিন্তু আপনি যা' বললেন এখনি, এমন কথা তো কোথাও পড়ি নি, কোথাও শুনি নি। একী জ্ঞান দিলেন আজ আপনি।" গুরুদেব করযোড়ে নম্রমধুর কণ্ঠে বললেন, "বাবা, চতুর্ব্বেদের অধিকারী হয়েও চশমা-বিনা চোখে দেখে না।" তারপরই হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "মেঘ ঘনিয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি বাড়ী যাও।" সাধুবাবার এই বাক্যটি দ্ব্যর্থমূলক। বাস্তবিকই তখন আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, একটু পরেই বৃষ্টি নামবে; তাই গুরুদেব তাঁদের তাড়াতাড়ি উঠতে বললেন। আর একটি গভীর অর্থ এই যে, ব্যোমকেশবাবুর জীবনাকাশে দুর্য্যোগের ঘন মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, শীঘ্রই দারুণ বিপর্য্যয় আসবে। ব্যোমকেশবাবু তা' কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁর কৃপায় তিনি তাঁকে কিছুটা বুঝতে ও চিনতে পেরেছিলেন। এটা যে নিছক আকাশের মেঘের কথা তিনি বলেন নি, তাঁর জীবনগগনের দুর্য্যোগঘন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করছেন, মহাপণ্ডিত মহাবিদ্বান্ ব্যোমকেশবাবু তা' বুঝেছিলেন। তাই তাঁর ললাট কুঞ্চিত হয়েছিল বিদায় সময়ে। গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল, জামাতা বসন্তবাবুর কারাদণ্ডে ও অন্যান্য নানাবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিয়ে।

মনস্তত্ত্ববিদ্ ও ম্যাজিসিয়ান্ শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সন ১৩২৭ সাল রাসপূর্ণিমার সময় বেঙ্গুনিয়ার-ডাক্তার হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবদ্বীপ যাত্রা করছেন তাঁর গুরুদেব পাতালপ্রভুর দর্শনে। ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্রকে বললেন, "চল্‌না, আমার সঙ্গে আমার গুরুদর্শন ক'রে আসবি।" কৌতূহলী রামচন্দ্র বললেন, "তোমার গুরু যদি ম্যাজিক দেখাতে পারে তা' হ'লে যাব।" হরিচরণবাবু বললেন, "ইচ্ছা করলেই পারেন।" তরুণ মনস্তত্ত্ববিদ্ রামচন্দ্র 'ম্যাজিক' দেখার আশায়

নবদ্বীপ এলেন। নবদ্বীপে এসে সারাদিন বড় বড় ঠাকুর দেখলেন, তারপর আশ্রমের টিনের চালা ও দর্মা দিয়ে ঘেরা ধর্মশালায় শুয়ে পড়লেন। দিনে প্রসাদ পেলেন মোটা চালের অন্ন, একটা লাব্‌ড়া ব্যঞ্জন, ডাল ও টক—তাতেই কত শান্তি। পরদিন রাস-পূর্ণিমা। ভোরবেলায় সাধুবাবা ডাকলেন ওদের সকলকে। তরুণ রামচন্দ্রকে দেখে গুরুদেবের কৃপা হ'ল, বললেন, "তোকে মন্ত্র দেব।" রামচন্দ্র স্পষ্ট জবাব দিলেন, "আমার মন্ত্র কুলগুরুর কাছে হয়ে গেছে, আর নেব না আপনার কাছে।" গুরুদেব করযোড়ে নম্রমধুর কণ্ঠে বললেন, "এই পণ্ডিত অজ্ঞান সন্তানকে জ্ঞান দিয়ে উদ্ধার কর, বাবা।" উত্তরে তরুণ ম্যাজিসিয়ান্ বললেন, "ঐ যে মন্দিরের ডালায় পয়সাগুলি রয়েছে, ঐগুলি গিনি ক'রে দেখাতে পারেন যদি, তবে আপনার কাছে মন্ত্র নেব।" রামচন্দ্র যে ম্যাজিসিয়ান্ ও মনস্তত্ত্ববিদ্ একথা সাধুবাবা তখন কিছুই জানেন না। তথাপি তাঁর কথার উত্তরে তিনি রামচন্দ্রকে বললেন, "ম্যাজিসিয়ান্ বাবা, আমি এক বোকা, পাগল, অজ্ঞান সন্তান তোমার,—আমি কি তোমার মত ম্যাজিক দেখাতে পারি? আমি সত্যিই তোমার নির্ব্বোধ শিশু সন্তান—দেখ, দেখ, বাবা, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ আমাকে।" রামচন্দ্র গভীর মনোযোগের সহিত সাধুবাবার কথাগুলি শ্রবণ করলেন। শুনে অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন, সহসা,—একী, একী হ'ল তাঁর—তাঁর সামনে তিনি কাকে দেখছেন? এ কি তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম? না, তাও তো নয়—অবিশ্বাসী তরুণ ম্যাজিসিয়ান্ স্পষ্টই দেখলেন—তাঁর সমুখে পাঁচ বৎসরের একটি শিশু, —ফুলের মত সুকোমল, সুপবিত্র, সুকুমার একটি দেবশিশু দণ্ডায়মান !!! উদীয়মান মনস্তত্ত্ববিদ্ ও ম্যাজিসিয়ান্ সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হয়ে সেই সুগুপ্ত গোকুলের গোপালের, সেই প্রচ্ছন্ন পাতালবাসী পরম পুরুষের শ্রীপাদপদ্ম দু'টি আঁকড়ে ধরলেন। ম্যাজিসিয়ানের আজ চূড়ান্ত ম্যাজিক দর্শন হয়েছে; অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন, "ক্ষমা করুন দেব, কৃপা ক'রে এই অধমকে শ্রীচরণাশ্রিত করুন।" ভোরে বাসি বস্ত্রেই তাঁর দীক্ষা হ'ল। কৃপাপ্রাপ্ত এই পরম ভক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরবর্ত্তী জীবনে পাতালপ্রভুর বহু কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন। তারমধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবৃত করছি।

সন ১৩৪১ সালে রামচন্দ্র দাদা গুরুদর্শনে এসেছেন। বিদায় নেবার সময় গুরুদেব তাঁকে তিনখানি ফটো দিয়ে বললেন, "বাবা, এই ফটো তুমি, তোমার দাদা ও তোমার ভাইপো নেবে। সকলের ফটোতেই পিছনে নাম লেখা আছে। নাম দেখে যেটি যার নিও।" উনি যত্ন সহকারে ফটো তিনটি সুটকেশের ভিতর পেতে কাপড় জামা চাপা দিয়ে নিয়ে এলেন। কলকাতায় ফিরে সকালে বাজারে যাবার সময় বললেন, "আমি বাজার থেকে এসে আমার ফটোটি বাঁধাতে দেব।" এই ব'লে ছাতুবাবুর বাজারে গেলেন। ফেরার পথে সেণ্ট্রাল এভিনিউ পার হচ্ছেন, এমন সময়—'গেল-গেল' শব্দ!

রামবাবুর যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলেন তিনি একটি বাস্ ও মোটরের মাঝখানে প'ড়ে আছেন। বাজারগুলি চারদিকে ছড়িয়ে গেছে, তিনি কিন্তু অক্ষত অবস্থায় আছেন। ঠিক বিপদের সময়েই তিনি বিপদভঞ্জন শ্রীগুরুদেবের অভয় শ্রীচরণ স্মরণ করেছিলেন একান্তভাবে—তাই কি ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁকে রক্ষা করেছেন? রাস্তার লোকে বলাবলি করছে, "মাথাটা খুব বেঁচে গেছে, মশাই।" বাড়ী ফিরে এসে ফটো বাঁধাবার উদ্দেশ্যে সুটকেশ খুললেন,—দেখেন, একী! তাঁর নাম লেখা ছবিটি মাথা থেকে কেটে দু'খানা হয়ে গেছে, অথচ অন্য দু'খানা ঠিকই আছে। ভক্ত রামবাবু বুঝলেন ভক্তবৎসল গুরুদেব নিজের মাথায় আঘাত নিয়ে তাঁর মাথা বাঁচিয়েছেন। পরদিনই তিনি নবদ্বীপ যাত্রা করলেন। আশ্রমে এসে মন্দিরে প্রবেশ ক'রেই তিনি একেবারে চিত্রার্পিতের মত নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন—দেখেন গুরুদেব মাথায় একটি পটি বেঁধে ব'সে আছেন!! তাঁকে দেখেই গুরুদেব বললেন, "বাবা, এসেছিস্। মাথাটা তোর খুব বেঁচে গেছে।" রামবাবু হাউ হাউ ক'রে কেঁদে আছড়ে পড়লেন সেই ভক্তরক্ষাকারী ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে! "হে প্রভু! হে করুণাময়! শ্রীচরণাশ্রিতের আঘাত এইভাবে নিজ অঙ্গে ধারণ করলেন প্রভু! কোমল অঙ্গে কেন আঘাত নিলেন প্রভু? যুগে যুগে তুমি ভক্তের বোঝা, ভক্তের আঘাত নিজ অঙ্গে ধারণ করেছ—আজও তোমার সে স্বভাব গেল না!"

সঙ্গীতজ্ঞ দাসুবাবু

বেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি কথা আছে, "যেনাশ্রুতং শ্রুতংভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি"—ছান্দোগ্য ৬·১।৩—অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি মূলতত্ত্ব, সেই স্বয়ং ভগবানকে জানলে, কিছুই আর অজ্ঞাত থাকে না, সকল বিষয়েই পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয়—জানবার, শুনবার বা চাইবার আর কিছুই থাকে না। গীতাতেও "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভম্" শ্লোকে ঐরূপ কথাই বলা হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন-সময়েও ঐরূপ কথাবার্ত্তাই হয়। এগুলি সবই শাস্ত্রবাক্য, অর্থাৎ theory মাত্র; এর জ্বলন্ত বাস্তব উদাহরণ বা practical illustration দেখলাম আমাদের শ্রীগুরুদেবের মধ্যে। তাই এখন যদি বলি, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, সর্ব্ববিদ্যা পারদর্শী এবং বিজ্ঞানময় সত্তা ছিলেন, তা' হ'লে কিছুই অতিশয়োক্তি হবে না। বহু ক্ষেত্রে আমি তার সুদৃঢ় প্রমাণ পেয়েছি। দর্শন ও সর্ব্ব ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে খাঁটি ও প্রকৃত জ্ঞান তো তাঁর ছিলই, বস্তুবিজ্ঞান সম্বন্ধেও সঠিক জ্ঞান, তার অকিঞ্চিৎকরত্ব ও অবস্তু-বিজ্ঞানের মহামহিমময় ঐশ্বর্য্য তিনি বহুবার দেখিয়েছেন। এখন সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বলব। গুরুদেব যেমন কোনো স্কুল-কলেজে পড়ে লেখাপড়া শেখেন নি,

তেমনি কোনো সঙ্গীতজ্ঞের কাছে সঙ্গীতবিদ্যাও সাধেন নি। কাজেই সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর কোনো জ্ঞান বা কৃতিত্ব থাকার কথা নয়। তবে তাঁর কণ্ঠস্বর মধু হ'তে মধুময় ছিল; তাঁর মধু কণ্ঠের হরিধ্বনিতে আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ হ'ত; মাঝে মাঝে তিনি হরিনাম গান করতেন, তাও সকলকে পরমানন্দ দান করত। তিনি গান শুনতেও ভালবাসতেন, যদি সে-গানে সত্যকার সুর ও ভক্তিরস বর্তমান থাকত। এখন আমাদের সত্যহরি দাদার (মেজদাদার) এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র, ডাক নাম দাসু, বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত বিষয়ে কঠোর সাধনা করেছিল। বহু গুণী সঙ্গীতজ্ঞের কাছে তালিম নিয়ে, বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত সে সঙ্গীত সাধনা ক'রে তখন একজন নামকরা গাইয়ে ব'লে খ্যাতিলাভ করেছিল। কলকাতাতেই সে থাকত, কখনো কখনো নবদ্বীপে বেড়াতে আসত। যে সময়ের কথা বলছি, তখন সে নবদ্বীপে এসেছিল। সত্যহরি দাদা তাঁর এই গুণী ও খ্যাতিমান্ ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা সপ্রশংসভাবে গুরুদেবের কাছে বলতে লাগলেন। গুরুদেবও আগ্রহ সহকারে তাঁর কথা শুনলেন। তারপর বললেন, "বাবা, তোমার গাইয়ে ভাইপো-কে একবার এখানে নিয়ে এসো, একটু গান শোনাবে আমাকে।" মেজদাদা বললেন, "সে কি আর আসতে পারবে? এখানে এলেই তার চারদিকে ডাক পড়ে; আগে থেকেই সব engagement হয়ে আছে। যেটুকু সময় এখানে থাকে, বাঁধা রুটিনের মত সব কাজ করতে হয়, একটুও ফুরসৎ পায় না। এমনি তার নামডাক হয়েছে যে কেউই তাকে ছাড়তে চায় না।" এই ব'লে মেজদাদা সগর্বে গুরুদেবের দিকে চাইলেন। গুরুদেবও চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললেন, "তাই নাকি, বাবা?" তারপর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "তা' একবার ব'লে দেখো—যদি একবার সময় ক'রে এই পাগল ছেলের কাছে এসে একটু গান শুনিয়ে আমাকে জ্ঞান দিয়ে যেতে পারে।" মেজদাদা তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, ব'লে দেখব। আমি অনুরোধ করলে আমার কথা সে এড়াতে পারে না।" তারপর দিন মেজদাদা যখন এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর তরুণ সঙ্গীতজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্র দাসুও এল। উভয়ে প্রণাম ক'রে বসার পর, গুরুদেব তাকে বহু আদর ক'রে হরিলুট মিষ্টি দিলেন এবং নম্রমধুর কণ্ঠে করযোড়ে বললেন, "আমার গাইয়ে বাবা, যখন আমার প্রতি কৃপা ক'রে আমাকে দর্শন দিতে এসেছ, তখন তুমি যে বিদ্যা শিখে এত খ্যাতিলাভ করেছ, সেই সঙ্গীত দু'একটি শুনিয়ে এ অধম সন্তানকে জ্ঞানদান কর, বাবা।" দাসু আগ্রহ সহকারে গুরুদেবের কথাগুলি শুনল। তারপর মন্দিরের চারদিকে চেয়ে দুটি তানপুরা যন্ত্র দেখতে পেয়ে উৎসুক হয়ে মেজদাদাকে জিজ্ঞাসা করল, "এ তানপুরা দুটি কার?" মেজদাদা হেসে বললেন, "ও দুটি গুরুদেবেরই।" আরও ঔৎসুক্য বেড়ে গেল দাসুর; বললে, "উনি কি গান করেন তানপুরা বাজিয়ে?" মেজদাদা ঘাড় নেড়ে

ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, "না, ঠিক গান নয়—এই একটু আধটু হরিনাম করেন আর কি।" দাসু তখন আগ্রহ সহকারে গুরুদেবকে বললে, "আপনি যখন তানপুরা সহযোগে হরিনাম করেন, তখন আপনার কণ্ঠের হরিনাম একটু শোনান আগে।" গুরুদেব হাতযোড় ক'রে অতি বিনীতভাবে বললেন, "বাবা, তুমি একজন সুবিখ্যাত গাইয়ে, তোমার কাছে এ পাগল ক্ষেপার কণ্ঠ কি লাগে? তোমায় আমি কী শোনাব, বাবা? তোমার সাধাগলার গান শুনতেই তো তোমাকে ডাকিয়ে এনেছি। দয়া ক'রে যখন এতদূর এসেছ, তখন তোমার মত বিখ্যাত গাইয়ের গান শুনে আমি ধন্য হব, সেই বাসনাই আমি করি। আমি কি তোমার কাছে গাইতে পারি, বাবা? আমার কি তোমার মত সঙ্গীত-সাধনা আছে, না গানের গলা আছে যে তোমায় গান শোনাব?" এত বলা সত্ত্বেও দাসু বললে, "আমি তো গাইতেই এসেছি এবং আপনাকে আমার গান শোনাবও। কিন্তু তার আগে আপনার কণ্ঠের হরিনাম একটু শুনতে চাই। আপনি গান জানেন আর না জানেন, তাতে ক্ষতি কী? শুধু একটু হরিনাম শোনান আপনার।"

দাসুর এই মিনতিপূর্ণ অনুরোধে গুরুদেব তাঁর তানপুরা ধরলেন। তানপুরার কানগুলি ঘুরিয়ে সুর মিলাতেই দাসু চমকে উঠল। এক নিমিষেই এমন নিখুঁতভাবে সুর মিলাতে পারেন ইনি! সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইল দাসু তার কাকার দিকে। মেজদাদাও হাসতে হাসতে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। এদিকে গুরুদেব 'বীরাসনে' ব'সে তানপুরা কোলে নিয়ে তখন নয়ন নিমীলিত করেছেন। তানপুরার সুরঝঙ্কারের সাথে সাথে তাঁর কণ্ঠ সরব হয়ে উঠেছে। ধীরে,—ধীরে,—ধীরে—তানপুরার সুরের সঙ্গে গুরুদেবের কণ্ঠস্বর মিলে মিশে এক হয়ে গেল। তারপর গুরুদেবের মধু-কণ্ঠ থেকে নেমে এল যেন সুরের সুধা-স্রোত—সে সুরের স্রোত লহরী তুলে লহমায় লহমায় অপূর্ব্ব লীলা বৈচিত্র্যে দিক্‌বিদিক্ পরিপূরিত ক'রে তুলল। কর্ণে প্রবেশ ক'রে সে সুরলহরী যেন মানসগগনে কোন্ অদৃশ্য রেখায় অপূর্ব্ব রাগরূপ বিকশিত ক'রে তুলল, সে রূপ যেন অপরূপ সুষমামণ্ডিত হয়ে সমস্ত মনকে আনন্দসুধারসে অভিষিক্ত ক'রে তোলে। সে সুরের তরঙ্গ সকলেরই সৌন্দর্য্যরসবোধকে সচকিত ক'রে এক সুন্দরের জগৎ, এক আনন্দরসময় ভুবনে নিয়ে এল। যে সঙ্গীতজ্ঞ, যে বিচার ক'রতে জানে, সে শুধু আনন্দে নয়, বিস্ময়েও অভিভূত হ'ল,—আর যে সাধারণ ব্যক্তি সেও আনন্দরসে নিমগ্ন হয়ে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। বিস্ময়ের পর বিস্ময়, আরো আরো বিস্ময়!—সঙ্গীতজ্ঞ দাসু সে-সঙ্গীত শ্রবণে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে রইল। তারপর সে অপূর্ব্ব সঙ্গীতসুধাস্রোত যখন ধীরে ধীরে থেমে এল, গুরুদেব চক্ষু উন্মীলন ক'রে তানপুরা নামিয়ে দুই কর যুক্ত ক'রে 'গাইয়ে' দাসুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তখন

সেই বিস্ময়াহত, অভিভূত, সঙ্গীতাভিমানী দাস্থ সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়ে করযোড়ে কম্পিতকণ্ঠে বললে, "সাধুবাবা, এ কী অপূর্ব্ব জিনিষ শুনলাম আজ আপনার কণ্ঠে। এমন অপরূপ বস্তু তো আর কোথাও পাই নি, কোথাও শুনি নি—কোথাও না, কোথাও না।" চক্ষু দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত ক'রে সে বলতে লাগল, "এ যে রাগ-রাগিনীরা মূর্ত্ত হয়ে বিরাজ করছে আপনার কণ্ঠে। এমন কণ্ঠস্বর, এমন সুর-সৃষ্টি তো মানুষে করতে পারে না। আপনি সেই সুর-স্রষ্টা, রাগ-রাগিণীর রূপকার সাক্ষাৎ শঙ্কর। অপরাধ ক্ষমা করুন; আপনাকে চিনতে না পেরে, বুঝতে না পেরে—নিজের অতি সামান্য অ-আ-ক-খ বিদ্যা জাহির করতে এসেছিলাম সুরের সম্রাটের কাছে। না জেনে অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন নিজগুণে"—এই ব'লে আবার সে প্রণাম করল। গুরুদেব সস্নেহে বললেন, "ওঠ, ওঠ বাবা। এবার তুমি তোমার গান একটি আমায় শোনাও।" দাস্থ করযোড়ে অতি বিনীতকণ্ঠে বললে, "মাফ্ করুন, মাফ্ করুন। এ অধমের ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন। আপনার কাছে আমি! আমি তো ছার—কোনো গাইয়েই আপনার কণ্ঠ শুনে আর আপনার কাছে গলা খুলবার স্পর্দ্ধা করবে না। আপনাকে না জেনে মনে মনে অহঙ্কার করেছিলাম। এখন সে অহঙ্কার, সে ধৃষ্টতা আমার চূর্ণ হয়েছে, দয়া ক'রে সে প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করুন।" গুরুদেব বললেন, "বাবা তুমি যে অনেক সেখেছ।" দাস্থ বললে, "আজ্ঞে, হ্যাঁ, প্রভু। বহু সেধে সুরের সামান্য বর্ণ পরিচয় মাত্র হয়েছে। আর আপনি সুরের সম্রাট, কণ্ঠে আপনার সমস্ত রাগ-রাগিণী বিরাজ করছে। আপনার সঙ্গে অন্য যে কোনো গাইয়ের তুলনা করতে যাওয়াটাই ধৃষ্টতা, নিছক পাগলামী। আজ যে জিনিষ শুনলাম, জগতে তা সম্ভবে না। আপনার কাছে এসে আজ আমার জীবন ধন্য হ'ল। যে সুর শুনলাম, তা' জীবনে কখনো ভুলবার নয়।"—এই ব'লে প্রণাম ক'রে সে বিদায় নিল। যাবার সময় গুরুদেব তাকে প্রচুর হরিলুট দিয়ে বিদায় করলেন।

এখন গুরুদেবের মাহাত্ম্যের কথা একবার ভেবে দেখুন। তিনি কখনো কোনো সঙ্গীতজ্ঞের কাছে সঙ্গীতবিদ্যা শেখেন নি,—অথচ একজন রীতিমত অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ তাঁর গান শুনে কী অভিমত প্রকাশ করল, তাই ভাবুন।

"কভু তো লৌকিক রীতি যেন ইতর জন"

প্রকৃত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ, এমন কি শ্রীভগবান্‌ও অবতীর্ণ হয়ে, সর্ব্বদা অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেন না। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মকেই তাঁরা সাধারণতঃ মেনে চলেন। শ্রীভগবানও তাঁর যোগমায়া শক্তি কর্ত্তৃক মুগ্ধ হয়ে তাঁর ভগবত্তা-বুদ্ধি ও অলৌকিকত্ব বিস্মৃত হন। একমাত্র লীলা অনুরোধে স্বয়ং যোগমায়াই অঘটন ঘটনা ঘটিয়ে অলৌকিকত্বের সৃষ্টি করেন। একথা বিস্মৃত হয়ে শ্রীভগবানের, তথা মহাপুরুষগণের,

সব লীলাতেই অলৌকিকত্বের অস্তিত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করলে, তাঁদের লীলা-মাহাত্ম্যকেই ক্ষুণ্ণ করা হবে। ভয়েরও ভয় হয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জটিলা-কুটিলার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকতেন,—সখীদের ভর্ৎসনা বাক্যে ভীত হয়ে পড়তেন; সর্ব্বান্তর্য্যামী হয়েও শ্রীরাধারাণী ও সখীদের গতিবিধি কিছুই টের পেতেন না, সর্ব্বশক্তিময় হয়েও আত্মীয়স্বজনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। এ সবই ঘটেছে তাঁর লীলা-অনুরোধে। লৌকিক লীলা না থাকলে নর লীলাই অর্থহীন হয়ে পড়ে—তবে তাঁদের লীলায় অলৌকিকত্বের মিশ্রণ অবশ্যই থাকবে। সাধারণ লীলার লৌকিকতা এইরূপে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, এক্ষণে শিষ্য সাধারণের প্রতি গুরুদেবের কয়েকটি মূল্যবান্ উপদেশের কথা উল্লেখ কর'ছি। তাঁর আশ্রমস্থ শিষ্যগণের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এ সব উপদেশ। শ্রীগুরু-আশ্রমে যারা থাকবে, আশ্রম-সেবার খরচের ভার যাদের উপর পড়বে, এটি তাদের উপর প্রযোজ্য। শ্রীগুরুদেব বহুবার বহু রকমে বলেছেন, "গুরুর একটি পয়সাকে নিজের শরীরের রক্তের মত মনে করবে। বাজারে, দোকানে যেখানেই গুরু-আশ্রমের পয়সা খরচ করবে, সেখানেই একটি পয়সার জন্যও দর কষাকষি করবে, জিনিসপত্র দেখে নেবে, বাবুর মত ব'সে থেকো না।" তিনি তাঁর শ্রীহস্তলিখিত পত্রে লিখেছেন, "মজুরদের দর কমাবার চেষ্টা করবে। যাতে কম খরচে হয়, তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে।" শ্রীগুরুদেব তো সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়, তাঁর কি কিছু অভাব ছিল? সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যাঁর ঘরে বাঁধা, তিনি 'কম' খরচের জন্য প্রাণপণে প্রয়াস করতে এবং বাজারে দোকানে 'এক পয়সা'র জন্যও দর কষাকষি করতে আদেশ করেছেন। আশ্রমস্থ প্রত্যেক শিষ্যেরই এই আদেশ নিষ্ঠাসহকারে পালন করতে হবে, নতুবা গুরু-অপরাধী হ'তে হবে। আর গুরুর ধন অপচয় বা অপহরণ করলে যে কী ভয়ানক সাজা হয়, তা' তিনি স্বহস্তে বহুস্থানে লিখে রেখে গেছেন। 'অন্তরঙ্গ' বা 'বহুদিনের' শিষ্য হ'লেই কেউ সব দিক দিয়ে সৎ হয় না, বহু মলিনতা তার থাকতে পারে। তার অনেক প্রমাণ আছে। মহাপ্রভুর লীলায় তাঁর দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গী কৃষ্ণদাস, অন্তরঙ্গ ভক্ত ছোট হরিদাস, অদ্বৈত প্রভুর ভক্তিবিরোধী অপরাধী শিষ্যগণ, নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সঙ্গী 'পড়ুয়া'গণ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। আমাদের আশ্রমে এর একটি জলন্ত উদাহরণ—বহুদিনের অন্তরঙ্গ শিষ্য পঞ্চানন, যাকে গুরুদেব 'চোর পঞ্চানন' আখ্যা দিয়েছিলেন—এবং তাকে শুধু জন্মের মত অপরাধীই করেন নি, সর্ব্বসমক্ষে তাকে বহু সাজাও দিয়েছিলেন। সেই কুখ্যাত 'চোর পঞ্চাননের' পথে যারা পা বাড়াবে, তাদের ইহকাল ও পরকালে—কোনোমতেই নিস্তার নেই, শ্রীমদ্ভাগবতের অমোঘ দণ্ডবাক্য তাদের ও তাদের সমর্থকদের ভোগ করতেই হবে। আশ্রমস্থ প্রত্যেক শিষ্যেরই এটি সর্ব্বাগ্রে মনে রাখা উচিত।

আশ্রমের দৈনন্দিন খরচ ও উৎসবাদির ব্যাপারে প্রত্যেক শিষ্যকেই ঐ ভাবে তাঁর আদেশ তো পালন করতে হবেই, উপরন্তু মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স বা অন্যান্য দেয় খরচ সম্বন্ধেও ঐ একই উপদেশ প্রযোজ্য। মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্স বাড়ালো, তা' আমরা কি করব? এরূপ যদি কেউ ভাবে, তবে সে অপরাধী। গুরুদেব স্বয়ং আমাদের দিয়ে অনুরূপ ক্ষেত্রে কী কঠোর পরিশ্রম করিয়ে নিয়েছেন, তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। গুরুদেবের নতুন মন্দির নির্মাণের পর আশ্রমের ট্যাক্স হঠাৎ বেড়ে গেল। গুরুদেব তাই শুনে বেশ ক্রুদ্ধ হয়েই বললেন, "আবেগের বশে ঘর-বাড়ী, মহোৎসব ও হৈ চৈ কেউ কেউ করতে পারে, কিন্তু আশ্রমের নিত্য সেবা ও নিত্য খরচ দেখে কে? তারপর মেজ দাদাকে ও আমাকে আদেশ করলেন, "বাবা, তোমরা দু'ভাইয়ে প্রাণপণে চেষ্টা কর—যাতে গুরু-আশ্রমের ট্যাক্স কমে।" কাজটা আদৌ সহজ ছিল না। কারণ মিউনিসিপ্যালিটির বৈষয়িক ব্যক্তিগণ কেউই সাধু-সন্তের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। সুতরাং আমরা বেশ মুস্কিলেই পড়লাম। সে যাই হোক, আমিই উদ্যোগী হয়ে মেজদাদাকে নিয়ে প্রত্যেক কমিশনারের বাড়ী গিয়ে তাদের কাছে ধর্ণা দিতে লাগলাম। মাসাধিক কাল অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে বহু সাধ্য সাধনা করতে থাকলাম। এক দিন, দু'দিন নয়—একমাসের বেশী। অবশেষে বিচারের দিন এল। আমরা দু'জনে অফিসে গেলাম। আমাদের দুশ্চর তপস্যার ফল ফলল, বর্দ্ধিত ট্যাক্স কমিয়ে পুরাতন ট্যাক্সই বহাল হ'ল।

এই ব্যাপারে অনেক ভক্ত হয়তো ভাবতে পারেন—গুরুদেব তো সর্ব্ব-শক্তিময়, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়; তাঁর আশ্রমের ট্যাক্স বাড়লই বা কেন, আর তা' কমাবার জন্য বহিরঙ্গ বৈষয়িক লোকদের অত তোষামোদি, অত সাধ্যসাধনারই বা কী প্রয়োজন ছিল? কিন্তু তাঁদের মনে রাখতে হবে একটা সার্ব্বজনীন সত্য যে জীবের স্বসুখ-ইচ্ছাপূরণ করতে কৃত কর্মের জন্যই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সকল ঘটনা ঘটে থাকে, আদৌ ঈশ্বরের ইচ্ছায় নয়। ঈশ্বর শুধু কর্মফল দাতা, জীবের কর্মফলকে তিনি কার্য্যকরী করেন মাত্র। অবশ্য যে সব একান্ত ভক্ত তাঁদের 'অণুস্বাতন্ত্র্য' সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে শ্রীভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন, একমাত্র তাঁরাই শ্রীভগবানের লীলাশক্তির গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করেন, যেখানে সব কিছুই ঈশ্বরেচ্ছায় হয়, তার বাইরে নয়। যেখানে জীব স্বাতন্ত্র্য খাটায়, সেখানে ভগবান্ নির্ব্বিকার। জীবের অপচেষ্টাতেই ট্যাক্স বেড়েছিল, জীবের সৎ চেষ্টা দ্বারাই তা' কমাতে হবে; আপনা আপনি তা' কমতে পারে না। এই উপলক্ষে আমাদের দ্বারা গুরুসেবার কার্য্যও কিছু করিয়ে নিলেন। গুরুর জিনিষ নিজের জিনিষ, এইরূপ মনে ক'রে আমরা যে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলাম, ধর্ম জগতে সেও একটি মহাশিক্ষার বস্তু। কারণ নিজেকে যত ভুলতে পারব এবং তাঁকে যত

-আপন করতে পারব, ততই এ পথে আমরা এগোব। গুরুদেব বলেছেন, "কবে আমার আমি ভুলে যাব, তোমার আমি হয়ে রব—সেদিন আমার কবে হবে হরি?" তাঁকে এবং তাঁর আশ্রমকে যত আপন ব'লে জ্ঞান করতে পারব, ততই আমরা এপথে উন্নতি করব। জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যের উপর ভগবানের কোনো ক্ষমতা নেই। স্বয়ং মহাপ্রভুও তাঁর শত্রুদের মুখ বন্ধ করতে পারেন নি। নবদ্বীপ তথা বাংলা দেশই পরিত্যাগ ক'রে উড়িষ্যায় আশ্রয় নিলেন। সেখানেও তাঁর নিন্দাকারীর অভাব হয় নি; তবে পার্ষদ ভক্তগণ, বিশেষতঃ উড়িষ্যার সার্ব্বভৌম নৃপতি রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর পরমভক্ত রূপে পরিগণিত হওয়ায় এবং পণ্ডিত সার্ব্বভৌম, রায় রামানন্দ আদি প্রভাবশালী পার্ষদবর্গের সহায়তাতেই সেই সব অসৎ লোকের অপচেষ্টা কতকটা স্তব্ধ হয়েছিল।

গুরুদেব তাঁর শিষ্যবর্গের ঠিকানা কাউকেই জানাতেন না এবং কোনো শিষ্যকে তাঁর বিনা আদেশে অন্য শিষ্য-বাড়ীতে যেতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যারা গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে, তাদের বহু অনর্থ ও অমঙ্গল সংঘটিত হয়েছে। একমাত্র গুরু-আদেশ বহন ক'রে তাঁর প্রেরিত দূত হয়েই অন্য শিষ্য-বাড়ী যাওয়া বিধি ছিল। গুরুদেব আমাকে কয়েক বার তাঁর কলকাতার শিষ্যদের বাড়ী পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে যতদূর মনে পড়ে কালিঘাটের রাণীমা, বৌবাজারের গিরিশ লাহা, শ্যামবাজারের রাইমোহন মালাকারের কাছে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যই পাঠিয়েছিলেন। তবে বাগবাজারের ফটিক্ দাদার কাছে এমনিই পাঠিয়েছিলেন, বিশেষ কোনো কাজের জন্য নয়। গুরুদেব বলেছিলেন, "বাগবাজারে আমার এক ভক্ত শিষ্য মা আছেন, তার কাছে হরিলুট দিয়ে এস। আর সে বাড়ীতে একটি 'ফটিক' ব'লে ছেলে আছে, তার সাথেও দেখা ক'রো। ছেলেটি খুব বিদ্বান্।" গুরুদেবের আদেশমত বাগবাজার ষ্ট্রীটে সেই শিষ্য-মায়ের সাথে দেখা ক'রে গুরুদেব-প্রদত্ত হরিলুট দিলাম। দেখলাম তিনি প্রকৃতই একজন অনুরাগী ভক্ত, কিন্তু সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গুরুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন না। তিনি গুরুদেবের নাম ক'রে খুব কাঁদলেন। তারপরে 'ফটিকে'র কথা জিজ্ঞাসা করায়, যে যুবকটি এল, দেখলাম সে বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। সে আমার কাছে অকুণ্ঠভাবে গুরুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতে লাগল। অতি শৈশবে সে যখন গুরুদেবের কাছে আসে, তখন তাকে দেখেই গুরুদেব বলেছিলেন, "বাবা, তুমি তো খুবই বিদ্বান্, তোমার জীবনে অতি উচ্চ শিক্ষালাভ হবে।" তারপর একটু চিন্তিত হয়ে মাথা নীচু ক'রে বলেছিলেন, "কিন্তু তোমার সমুখে দুর্গ্রহ রয়েছে, সেটা কাটিয়ে উঠতে পারলে তবে তো?" ওর অভিভাবকরা সেই কুগ্রহ কাটিয়ে দেবার জন্য গুরুদেবের কাছে কেঁদে পড়লেন। গুরুদেব কৃপা ক'রে সেই দুষ্টগ্রহের কুফল কাটিয়ে দিতে সম্মত হলেন। এর কিছু দিন পরেই ফটিকের একটি মারাত্মক accident হয়। কী

accident সেটা আমার ঠিক মনে নেই এখন। তবে অত্যাশ্চর্য্যরূপে সেই accident-এ তার কিছুই ক্ষতি হ'ল না। সাধুবাবার কৃপাতেই নিছক দৈবক্রমেই দৈব দুর্ব্বিপাক থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। তারপর থেকেই তার বিদ্যায় উন্নতি। কৃতিত্বের সহিত একের পর এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তখন M.Sc.তে First Class পেয়ে Chemistry-তে গবেষণা-রত ছিল। আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে সে আমাকেও ভাইয়ের মত স্নেহ দেখাল। সে বললে, "আমি একজন বাস্তববাদী বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তবু পাতালবাবার এই অলৌকিক শক্তি বিশ্বাস করতেই হবে। শুধু তাঁর শক্তিই নয়, তাঁর করুণা এবং মাধুর্য্যও মানুষ মাত্রকেই অভিভূত না ক'রে পারে না। তাঁর কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।" এরপর আরো দু'একবার তার কাছে গিয়েছি। সে পরে D. Sc. হয়েছে, তাও সংবাদ পেয়েছিলাম। তারপর আর যোগাযোগ নেই। তার 'ভাল' নাম এবং উপাধিও ভুলে গেছি—বোধ হয় কোনো 'মিত্র' হবে।

গুরুদেব যেমন নিজে তৃণতুল্য নীচ ও নিরভিমান হয়ে প্রত্যেক জীবকেই তার ন্যায্য সম্মান অপেক্ষাও অধিকতর সম্মানে ভূষিত করতেন, তেমনি অপর দিকে প্রতিষ্ঠা, ধন, কুল ও বিদ্যামদে মত্ত ও উদ্ধত ব্যক্তিগণকেও তাদের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করিয়ে যথোপযুক্ত জ্ঞান দান করতে সচেষ্ট হতেন। প্রকৃত গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও যশ, অর্থ, কুল বা পাণ্ডিত্যের জন্য অহঙ্কার প্রদর্শন করেন না,—কিন্তু এর বিপরীত দৃষ্টান্তই এই জগতে বেশী। এরূপ মোহান্ধ বহু ব্যক্তির বৃথা দর্প ও মোহ ভঙ্গ করেছেন গুরুদেব, তার মধ্যে আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট দু'একটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। এই নবদ্বীপের একজন অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গুরুদেবের দর্শনে এসেছেন। দর্শন ক'রেই তিনি নিজের বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও সম্মানের কথা নিজেই সরবে ঘোষণা করতে লাগলেন। গুরুদেব অতি দীনভাবে করযোড়ে বললেন, "বাবা, আমি এক মূর্খ, অজ্ঞান, পাগল সন্তান আপনার; আপনি দয়া ক'রে অ-আ-ক-খ শিখিয়ে জ্ঞান দিয়ে এই মূর্খ সন্তানকে মানুষ ক'রে নিন ও সৎ উপদেশ দিয়ে ধন্য করুন।" শিক্ষক মহাশয় ভাবলেন ছেঁড়া চট গায়ে ঐ ক্ষেপা সাধু সত্যই অশিক্ষিত, লেখাপড়া-জ্ঞান কিছুই নেই; সুতরাং তাঁকে একটু শাস্ত্রোপদেশ দেওয়া প্রয়োজন। এই মনে ক'রে তিনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত থেকে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশাবলী মুখস্ত বলতে শুরু করলেন। শিক্ষক মহাশয় কয়েক লাইন বেশ ভালই আবৃত্তি করলেন, তারপর সহসা থমকে চুপ ক'রে গেলেন। খানিকটা ইতস্ততঃ ক'রে পরের অংশ স্মরণ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। ভদ্রলোক এ জন্য যথেষ্ট বিব্রত ও প্রবল অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। গুরুদেব এতক্ষণ হাতযোড় ক'রে তাঁর আবৃত্তি

শুনছিলেন। হঠাৎ থেমে যাওয়ার পর তাঁর এই দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা লক্ষ্য ক'রে সেই দর্প-হারী মধুসূদন তখন পরের অংশগুলি সুস্পষ্ট কণ্ঠে আবৃত্তি ক'রে গেলেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তো একেবারে হতভম্ব! ঐ ছেঁড়া চট পরিহিত সাধু তা'হলে সবই জানেন! হায়রে, বৃথাই তিনি অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছেন। ভদ্রলোকের জ্ঞান হ'ল। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে করযোড়ে তিনি ঐ প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন।

এর পরের কাহিনীটি গোমো তপোবন আশ্রমের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা। এই অধম শ্রীচরণাশ্রিতকে গুরুদেব এই ঘটনার সহিত কৃপা ক'রে জড়িত রেখেছিলেন। একদিন আশ্রমে ব'সে আছি এমন সময়ে এক যুবক ভদ্রলোক আশ্রমে এলেন। আমি তাঁকে জুতা খুলে আশ্রমে ঢুকতে বললাম। তারপরে আশ্রমের বারান্দায় বসিয়ে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলাম। ভদ্রলোক Englishএ M.A., High Court-এ translator এর কাজ করেন। গোমো পাহাড়ের বুনো জঙ্গলে এক ভিখারী সাধুর আশ্রমে এসে তিনি ভাবলেন এখানকার সাধু ও তাঁর চেলারাও অশিক্ষিত, বর্ব্বর ও বুনো শ্রেণীরই হবে। সুতরাং বেশ একটু অহমিকা নিয়ে এবং আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সহকারেই কথা বলছিলেন তিনি। তারপর আমি তাঁকে গুরুদেবকে ডাকতে বলায় তিনি কয়েকবার ডাকলেন এবং তখন গুরুদেব দ্বার খুলে দর্শন দিলেন। গুরুদেব তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়নম্র মধুর কণ্ঠে যুক্তকরে তাঁকে শুধালেন, "বাবা, কোথায় থাকেন, কী করেন?" ভদ্রলোক উদ্ধত গর্ব্বে উত্তর করলেন, "আমি একজন ইংরাজীর এম. এ, কলকাতা হাইকোর্টে চাকুরী করি, গোমোয় বেড়াতে এসেছি।" তার অহঙ্কারপূর্ণ কথা শুনে গুরুদেব খুব নম্র মৃদু কণ্ঠে বললেন, "বাবা, তোমার পাশে এই যে রোগা ছেলেটিকে দেখছ, একে চেন?" ভদ্রলোক তেমনি উদ্ধত কণ্ঠেই বললেন, "না।" গুরুদেব তখন তেমনি হাতযোড় ক'রেই বললেন, "বাবা, একটি বিষয়ে এম.এ. পাশ ক'রেই অত অহঙ্কার দেখাচ্ছ,—এ যে কত বিষয়ে এম.এর বিদ্যার অধিকারী তাতো তোমার জানা নেই।" ভদ্রলোক এবার সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন। গুরুদেব এবার সুস্পষ্ট কণ্ঠেই বললেন, "এর পরিচয়—এ বিদ্যা-সাগর। তুমি একবিন্দু লাভ ক'রেই নিজের গর্ব্ব ধ'রে রাখতে পারছ না। কিন্তু যে সাগরের অধিকারী, সে দৈন্যে মাটিতে মিশিয়ে আছে।" গুরুদেবের কথা শেষ হ'তেই ভদ্রলোক সপ্রশংস ও সশ্রদ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে হাতযোড় ক'রে প্রায় অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, "মাফ করবেন, আমি আপনাকে না জেনে নিজ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছি। বাস্তবিক আপনি যে—", আমি ওঁকে বাধা দিয়ে বললাম, "আমি হয়তো কিছুই নই, কিন্তু ইনি আমার গুরুদেব, আমার মাথার মণি, আমার পরম পূজ্যতম। এঁকে যে-সে সাধু মনে করবেন না। কিছু না দেখে শুনে,

না বুঝে সুঝে, যার তার কাছে আমি মাথা নত করি নি, যাকে তাকে আমি মহত্তর মানুষ ব'লে গণ্য করি নি।" আমার কথা শুনে উনি আবার গুরুদেবের দিকে সশ্রদ্ধ চোখে চাইলেন। আমি গুরুদেবকে প্রণাম করলাম, আমার দেখাদেখি তিনিও গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। তাঁর বিদ্যাদর্প চূর্ণ করলেন গুরুদেব। তিনি যতদিন গোমোতে ছিলেন, প্রায়ই গুরুদেবের দর্শনে আসতেন এবং তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

নিঃশঙ্ক আশ্রমে এক মহাপণ্ডিত ও তার্কিকের সঙ্গে গুরুদেবের বহুক্ষণ ব্যাপী তর্ক হয়েছিল। অবশেষে সেই পণ্ডিত গুরুদেবের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে তাঁর অনুগত হয়েছিল—এ কাহিনী ভক্তদের মুখে শুনেছি।

তদানীন্তন বিহারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ও মানী ব্যক্তি রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ ব্যানার্জ্জী ছিলেন গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত। গুরুদেবের কাছে সমবেত ধন ও মানমদ-গর্ব্বিত বহু তথাকথিত অর্থ ও প্রতিষ্ঠাভিমানীকে এই প্রবলপ্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যান্বিত রায় বাহাদুরের নাম শ্রবণে সঙ্কুচিত ও স্তিমিত হ'তে দেখেছি। অনুরূপভাবে অনেক জাতিকুলাভিমানী গর্ব্বিত সমাজপতিগণ গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত নিত্যানন্দবংশাবতংস গোস্বামীগণের নাম শ্রবণ ও সাক্ষাৎ দর্শনে চমকিত ও লজ্জিত হয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছেন। এইরূপে নানাভাবে সেই দর্পহারী গুরুদেব বৃথা গর্ব্বাভিমানীগণের গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রে তাদের জ্ঞান দান করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ, নীচ শূদ্রদ্বারায় করেন ধর্মের প্রকাশ।"

সাধন-প্রসঙ্গ

ধর্মপথ যে কত কঠিন, কত যে অসংখ্য তার স্তর, স্তরে স্তরে তার কত যে কঠিন পরীক্ষা তা' ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গপ্রভাবে জানতে পেরেছি। গুরুদেব বলতেন, "বাবা, ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করতে হ'লে দশ বারো বৎসর ধ'রে কত কঠোর পরিশ্রম, কত নিরলস অধ্যয়ন, অক্লান্ত অভ্যাস, কত শিক্ষকের কাছে শিক্ষণ, তাড়ন, ভর্ৎসন; দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে কত রকমের পরীক্ষা। তারপর সেইসব পরীক্ষা যথাযথভাবে পাশ করলে তবে ধাপে ধাপে প্রমোশন, ফেল করলে সাজা ও স্থিতাবস্থা—এই রকম কত কষ্ট ক'রে তবে 'ম্যাট্রিক' হওয়া যায়। আর এই দুস্তর ভবসাগরের পারে যেতে হ'লে এমনি ভাবে গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা, সাধন-ভজন, কত পরীক্ষা, কত উত্থান-পতন, কত অসংখ্য নাকানি-চোবানি খেয়েও যদি সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে গুরুপাদপদ্মে বিশ্বাস স্থির রেখে সাধন কার্য্য করা যায়, তবে তো ধাপে ধাপে

প্রয়োজন হবে। মহাপ্রভুও তাই রঘুনাথদাসকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন,—"ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধুকূল।" শ্রীগুরুদেব বলেছেন, শ্রীগুরুপদে অটল নিষ্ঠা সহকারে একাদিক্রমে যদি বারো বৎসর সেবা করা যায়, তবে তাকে গুরুদেব 'শিষ্য' পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর চলে আবার পরীক্ষা। পরীক্ষায় পাশ করলে পরবর্ত্তী সাধন, তারপর আবার পরীক্ষা—এইরকম চলে জন্ম জন্ম ধ'রে। প্রথমে অবশ্য দীক্ষা, তারপরে শিক্ষার অনন্ত স্তর আছে। আত্মতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্বের সাধন ক্রমে ক্রমে লাভ করা যায়, একেবারে নয়। এর মধ্যে অধিকারী ভেদে কাউকে যোগমার্গে, কাউকে তন্ত্রমার্গে, কোনো কোনো সাধন ক্রিয়া করতে দেন তিনি। শ্মশান সাধনাও শেষ স্তরে সাধন করতে হয়।

সিদ্ধিলাভ করার পর মহাপুরুষগণ অষ্টসিদ্ধি লাভ করলেও লোক দেখাতে তার প্রয়োগ করেন না। দৈবাৎ তার প্রকাশ হয়ে থাকে, একথা বারবার গুরুদেবের মুখে শুনেছি। লীলা অনুরোধে সব কিছুরই প্রকাশ হয়। এসব ছাড়াও সিদ্ধ সাধুরা অনেক দুর্লভ দ্রব্যগুণের বিষয় অবগত থাকেন। দৈহিক ও মানসিক ব্যাধিতে তার আশ্চর্য্য প্রয়োগ হ'তে দেখেছি গুরুদেবের কাছেই। আবার 'স্বর্ণ-নির্মাণ'-এর মতো বৈষয়িক জগতের অত্যাশ্চর্য্য ও প্রায় অবিশ্বাস্য ক্ষমতাও কোনো কোনো সাধুর থাকে, তাও গুরুদেবের মুখে শুনেছি। গুরুদেবের সন্ন্যাসগুরু প্রেমচাঁদ গোস্বামী অজস্র স্বর্ণের বাঁট তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি বিপদেও পড়েছিলেন, যেমন হয়ে থাকে, অর্থাৎ আশ্রমস্থ কোনো বিষয়-লোভী শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় পুলিশ enquiry হাঙ্গামায়। অন্যান্য প্রভাব প্রতিপত্তিশালী শিষ্যের হস্তক্ষেপে অবশ্য হাঙ্গামা কেটে যায়, কিন্তু সেই থেকে তিনি আর স্বর্ণ প্রস্তুত করেন নি। একথা শুনে বিংশ শতাব্দীর একজন বিজ্ঞানী হিসাবে এই Formula জানবার জন্যে আমার এত আকুল আগ্রহ হয়েছিল যে, গুরুদেব আমার আগ্রহ দেখে আমার ঔৎসুক্য প্রশমন করেছিলেন। শুনে অবাক হয়েছিলাম যে বিজ্ঞানে অতি শক্তিশালী Re-actor দ্বারাই যা' প্রস্তুত করা একমাত্র সম্ভব, কেমন ক'রে এক ভিখারী সন্ন্যাসী সেই অসম্ভব কার্য্য সামান্য খরচে, সামান্য একটি প্রক্রিয়ায় সম্ভব করেছিলেন। অবশ্য গুরুদেব নিজে কখনো এ প্রক্রিয়া কার্য্যতঃ রূপায়ণ করেন নি, কারণ তাঁর ভাষায় "এতে তো শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম মিলবে না,—এতে কী হবে ?" সনাতন গোস্বামীর মতো 'পরশমণি'কে তিনি অবহেলাভরে যমুনার জলেই ফেলে দিয়েছিলেন ; কারণ তিনি যে-ধনে ধনী হয়েছিলেন, তার কাছে এই 'পরশমণি' কতই না নগণ্য!

শ্রীগুরুদেব যে সদা সর্ব্বদাই নিত্যবৃন্দাবনে বিরাজ করতেন, আমি বহুবার এ তথ্য উপলব্ধি করেছি। গুরুদেব কখনো কখনো আপন মনে তানপুরা বাজিয়ে সুধামধুর কণ্ঠে

গান করতেন, "হৃদি-বৃন্দাবনে বাজিছে বাঁশরী, ছড়াইয়া সুধারস প্রেম মাধুরী।" গুরুদেব কৃপা ক'রে আমাকে জানিয়েছেন, "নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি হয়, এর মাধুর্য্য সুধারসকেও ছাড়িয়ে যায়।" গুরুদেব যখন এই গানটি করতেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে নিত্যবৃন্দাবনের বংশীধ্বনির এই সুধাস্রোত আমিও কিছুটা অনুভব করতাম, যেন সেই বংশীধ্বনির তরঙ্গে তরঙ্গে হৃদয় আমার দুলে দুলে উঠত, যেন সেই সুধাস্রোতে স্নান ক'রে আমিও অমৃতময় হয়ে উঠতাম। আবার কখনো গভীর বিরহ-বেদনায় করুণ কণ্ঠে গেয়ে উঠতেন,—"কী সুখ জীবনে মম, যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ না রহে চির-নিমগন,—কী সুখ জীবনে মম?"

কিন্তু কোন্ সাধনায় এই নিত্যবৃন্দাবনধাম পাওয়া যায়, এই চির-আনন্দময়, মধু হ'তে মধুময় শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমময় সেবা লাভ করা যায়,—ঔৎসুক্য বশতঃ সে সব দুঃসাহসিক প্রশ্নও করেছি তাঁকে। একদিন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করতে করতে যখন "গোপ্যস্তপঃ কিমচরণ্" শ্লোকটি আবৃত্তি করছি, তখন কৌতূহলভরে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এই যে তপস্যা, এই যে সাধনার কথা বলা হয়েছে, সে কোন্ সাধনা, যা' সাধন ক'রে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই আনন্দমাধুর্য্যময় রূপ নিত্য উপভোগ করেন?" গুরুদেব আমার এই দুঃসাহসিক প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে আমাকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, "তুমি কী বুঝবে এই দুর্লভ সাধনার কথা? এ যে অনেক দূরের বস্তু, স্বয়ং ব্রহ্মারও অগোচর।" তারপর শান্তকণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, "গুরুদেব যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে সেই পথ ধরে চল। ক্রমে ক্রমে পাবে লোকে ভব সিন্ধুকূল।" আর একবার মনে আছে, গোমো তপোবনে আমি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের সনাতন শিক্ষায় মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণরূপবর্ণনা পাঠ করছি—"সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়।" এমন সময় ঔৎসুক্য বশতঃ শ্রীগুরু-দেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই চন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণরূপের তুলনাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না গুরুদেব।" এবারও গুরুদেব কিছুটা ভর্ৎসনার সুরেই বললেন, "তুমি কেমন ক'রে বুঝবে, বাবা? এ যে একেবারে মট্কার সাধন! যে শিশু অ-আ ক-খ শেখে, সে যদি পি.এইচ.ডি, ডি. এস. সি'র তত্ত্বকথা জানতে চায়, তবে বললেও সে কি তা' বুঝবে? এ উচ্চতম স্তরের ব্যাপার; 'চন্দ্র-সাধন' কঠিনতম সাধন, এ একেবারে শেষ পর্য্যায়ে সাধ্য।" শুনে মাথা নীচু ক'রে রইলাম।

আর একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ ও ষট্চক্র ভেদের কথা। গুরুদেব কৃপা ক'রে জানালেন, "বিভিন্ন মার্গে বিভিন্ন পন্থা। যোগমার্গে, তন্ত্রমার্গে, বৈষ্ণবমার্গে পৃথক পৃথক প্রক্রিয়া। গুরুকৃপা হ'লেই সব জানতে পারবে।" একবার 'ত্রিতাপ' অনলের কথা প্রশ্ন করেছিলাম, যা' সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুকে করেছিলেন;

সেই সনাতন প্রশ্ন, "কেন জারে তাপত্রয়?" গুরুদেব বললেন, (১) মায়ানল, (২) কামানল, (৩) জঠরানল,—জীবমাত্রেই এই ত্রিতাপে দগ্ধ হচ্ছে। এদের প্রশমনের জন্ম পৃথক পৃথক সাধন আছে। গুরুকৃপা হ'লে ক্রমে সে সব সাধন পাবে। প্রত্যেক দেহ-ধারী আত্মারই এই আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ের জ্বালা সহ্য করতে হয়। এরা শান্ত হলে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপও দূর হয়। এরপর অষ্টপাশের কথা শুধালাম। গুরুদেব কৃপা ক'রে বললেন, "(১) লজ্জা, (২) ঘৃণা, (৩) ভয়, (৪) শোক, (৫) নিন্দা, (৬) কুল, (৭) শীল, (৮) জাতি—এই অষ্টপাশ মুক্ত হওয়ার জন্ম আলাদা সাধন আছে। প্রয়োজনবোধে গুরু যোগ্য শিষ্যকে এসব সাধনক্রিয়া উপদেশ করেন। তারজন্তে ব্যস্ত হয়োনা। গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠাই হ'ল আসল। নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা কর, তাঁর চরণে ভক্তি রাখ। তিনি প্রয়োজন মতো সাধন করিয়ে নেবেন। 'ত্রিতাপ' অনল সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই যে—জঠরানলে আহুতির নামই 'যজ্ঞ', সাধারণ আগুনে ঘি-ঢালা নয়। জীবসেবাই যজ্ঞ। তাই শ্রীগুরুদেব জীবসেবারূপ নিত্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন।

শ্রীগুরুদেব জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, তন্ত্রমার্গ ও বৈষ্ণবমার্গের সর্ব্বপ্রকার সাধন-পন্থার সাধন ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন কচিৎ কোনো অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি আপাতঃবিরোধী বিষয়গুলিতেও সমভাবে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, সাধনজগতে পাতালপ্রভু ছিলেন সেইরূপ একজন সর্ব্বমার্গের সাধক, সাধকদের মধ্যে একটি versatile genius. সাধারণ শিষ্যরা কে তার কতটুকু বুঝবে? এই সার্ব্বজনীন সাধনার জন্তেই গুরুদেব সকল মার্গের সাধককে সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন —কঠোর যোগী, উদ্ধত তান্ত্রিক, ভয়ঙ্কর কাপালিক, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব থেকে মুসলমান ফকির পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই তিনি মেলামেশা করেছেন এবং সকলেই তাঁকে পরম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখে দেখেছেন। বহু বয়োবৃদ্ধ সিদ্ধ মহাপুরুষ গুরুদেবকে 'বন্ধু' ব'লে আলিঙ্গন করেছেন, হিমালয়স্থ ধ্যানমগ্ন মহাতাপস গুরুদেবকে দর্শনমাত্র মহাসমাদর করেছেন, বহু নামজাদা তান্ত্রিক ও কাপালিক নিঃশঙ্ক মহাশ্মশানে সাধন করতে এসে যেখানে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই মহাশ্মশানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে পাতালদেব মহাশ্মশানকে আনন্দময় বৃন্দাবনে পরিণত করেছেন। যেসব মুসলমান ফকির সাধারণ হিন্দুসাধুদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন, তাঁরা গুরুদেবকে পরম শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। নবদ্বীপের অতিবৃদ্ধ ন্যাংটাবাবা গুরুদেবকে সন্তানস্নেহে বুকে ক'রে রেখেছেন, গুরুদেবও তাঁকে মাথার মণিস্বরূপ জ্ঞান করেছেন—উভয়েই উভয়কে চিনেছিলেন। এইরূপে সকল মার্গেরই সাধকগণ গুরুদেবের কাছে উপদেশ

ও শিক্ষা নিতে আসতেন। যাঁরা নিজের নাম প্রচার করতেই আগ্রহী বেশী, এরকম তথাকথিত 'জগদ্বিখ্যাত' বাজারে সাধু অনেকেই পাতালপ্রভুর নিকট উপদেশ নিয়ে গেছেন। তাঁরা যে প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত, পাতালদেব তাঁদের দেখামাত্র সে কথা জানিয়ে বলেছেন যে তাঁদের সে আশা পূর্ণ হবে, তাঁরা 'জগদ্বিখ্যাত' হবেন। কিন্তু গুরুদেব নিজে বালকের ন্যায় যেন কতকটা বোকার মতোই প্রশ্ন করতেন, "মানুষের কাছে নাম জাহির ক'রে কী লাভ আছে, বাবা? তাতে কি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মে অনুরাগ হবে?" কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠা এ তিনই তাঁর কাছে মলবৎ পরিত্যাজ্য ছিল। কিন্তু তথাপি অষ্টাদশ সিদ্ধি বা অন্যান্য বিভূতি মূলক ঐশ্বর্য্য কর-যোড়ে তাঁর পিছু পিছু ফিরত, তাঁর লীলা-অনুরোধে তাঁকে সেবা করবার জন্যে।

সাধক অবস্থায় শ্রীগুরুদেবের সাধন ক্রিয়াকলাপের সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। জানবার কথাও নয়। কারণ, আমি এসেছি গুরুদেবের অন্ত্যলীলার শেষ সাড়ে চার বৎসরের শুরুতে। তবে মেজদাদা ও অন্যান্য প্রাচীন শিষ্যদের কারো কারো কাছে ছিটেফোঁটা যা' শুনেছি, তাতেই জেনেছি সাধনক্রিয়ায় তিনি যে কত দুরূহ কৃচ্ছ্র-সাধন করেছেন, তা' সাধারণ মানুষের শক্তি ও সহ্যের সীমার বাইরে। এমন কি আমাদের মতো কলিহতজীব সেসব কল্পনাও করতে পারে না। পৌষ মাঘ মাসের দুরন্ত শীতে তুষার শীতল সরোবরের জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে তিনি কঠোর 'জল'-তত্ত্ব সাধনা করেছেন, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের প্রখর গ্রীষ্মে অগ্নি-কুণ্ডের মধ্যস্থলে ব'সে কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা দিয়ে তিনি 'তেজ'-তত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেছেন, রুদ্ধ গুহার গহন অন্তরালে সমাধিস্থ হয়ে সারাজীবন তিনি 'ক্ষিতি' তত্ত্ব সাধন করেছেন। আর, মহাযোগেশ্বররূপে প্রাণায়ামাদি কঠিন যোগক্রিয়ায় সমাহিত হয়ে বায়ু বা 'মরুৎ'-তত্ত্বে সিদ্ধ হয়ে ষট্‌চক্র ভেদ করতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারে পরমশূন্য স্থানে জগজ্জননী কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত ক'রে সেই নিত্যবৃন্দাবন ধামে পরমপুরুষের সঙ্গে মিলিত করেছেন এবং শূন্য বা 'ব্যোম'-তত্ত্ব সাধনা করেছেন। এসব সাধনা তিনি একাকী নির্জ্জন অরণ্যপ্রদেশেই করেছেন। এসকল সাধনক্রিয়াসময়ে তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রায় স্তব্ধ হয়ে যেত। আহার, নিদ্রা, শয়ন—দিনের পর দিন কিছুই হ'ত না। ধ্যানভঙ্গে কখনো কখনো বনের লতাপাতা, তৃণ বা বনজ ফল সেবা ক'রে তিনি জীবনধারণ করেছেন; পুলের নীচে নরম কাদামাটিতে শয়ন করেছেন। সাধন অন্তে যখন তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু ন্যাংটাবাবার কাছে আসতেন, তখন ন্যাংটাবাবা তাঁর আহার বা শয়নের কথা শুধালে তিনি ঐসব উত্তর দিতেন। একথা আমি শ্রীগুরুদেবের নিজের মুখে শুনেছি। ন্যাংটাবাবা তাঁর ঐসব কথা শুনে পরম স্নেহভরে তাঁকে আদর ক'রে কোলে টেনে নিতেন। ন্যাংটাবাবার স্নেহ করুণার কথা বলতে বলতে গুরুদেবের

দুই চক্ষু সজল হয়ে উঠত। তারপর আছে শ্মশান সাধনা। সেসব ব্যাপার তো আমাদের ধারণা ও কল্পনার বাইরে। সে সাধনায় তিনি অবলীলাক্রমে সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং সারাজীবনই সেসব ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। নিঃশঙ্ক মহাশ্মশানে তাঁর শ্মশান-সিদ্ধিলাভের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। এসব প্রত্যেক সাধনাতেই কত কষ্ট, কত পরিশ্রম, কত ধৈর্য্য তাঁকে ধরতে হয়েছিল, তা' সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে সত্যই বলেছেন, এই সাধনা "অতি পরম দুর্লভ জানিবে নিশ্চয়" (বঙ্গানুবাদ)। শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে লিখেছেন, "সেয়ং সাধনসহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা"। মহাপ্রভুও সনাতন শিক্ষায় বলেছেন, "প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতন ধন, অনেক দুঃখেতে মিলয়; দেহগেহ পুত্রদার, বিষয় বাসনা আর, সর্ব্ব আশা যদি তেয়াগয়।" নারদপঞ্চরাত্রে বলেছেন, "জায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।" গীতায় ভগবৎ সাধকের লক্ষণে বলছেন, "শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ, তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ, অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ"—আমাদের শ্রীগুরুদেব সেই সুকঠোর সাধনার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন।

মহাপুরুষ লক্ষণ

এই গ্রন্থের 'বস্তু-নির্দ্দেশ' প্রকরণে সিদ্ধ মহাপুরুষের বিস্তৃত লক্ষণাবলী বিবৃত করা হয়েছে। মহাপুরুষগণ যেসব অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন, 'অলৌকিক লীলাবলী' বর্ণনার প্রারম্ভে তারও কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। এক্ষণে পাতালপ্রভুর কিছু কিছু অদ্ভুত গুণ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করব। শ্রীশ্রীপাতালদেবের শ্রীঅঙ্গ যে অতি শক্তিশালী বিদ্যুতের আধার ছিল, তিনি ইচ্ছা করলেই সে বিদ্যুৎশক্তি বিচ্ছুরণ করতে পারতেন, এর বহু নিদর্শন পেয়েছি। তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করতে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণাঙ্গুলি থেকে মাথায় বিদ্যুৎস্ফুরণের স্পষ্ট নিদর্শন কখনো কখনো দেখতে ও শুনতে পাওয়া যেত। Discharge spark গুলি বেশ ভালোভাবেই দেখতে পাওয়া যেত এবং কাছে থাকলে discharge এর শব্দও সুস্পষ্ট শোনা যেত। আর প্রণামান্তে শরীর, মন ও হৃদয়ে যে নব জীবন, নব প্রেরণা ও অপরিসীম আনন্দ উথলে উঠত, তা' অবর্ণনীয়। তিনি যে সত্যই সীমাহীন শক্তির উৎস ছিলেন, তা' আমার দু'একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাবে। শাস্ত্রে পড়েছি, "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল, ভক্তভুক্তি অবশেষ তিন মহাবল," এবং শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণধূলি, প্রসাদ, চরণামৃত যে শিষ্যের একান্ত বাঞ্ছিত—তাও জানি। তাই গুরুদেবের চরণধূলি, চরণধৌত জল ও ভোজন-অবশেষ প্রসাদ পাওয়ার জন্যে আমার সর্ব্বদাই একটা দারুণ আকাঙ্ক্ষা ছিল। যোগ্যতা

অনুযায়ী গুরুদেব সে আশা মাঝে মাঝে পূরণ করতেন, তবে তা' আমার ইচ্ছামতো নয়, তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে, তাঁরই ইচ্ছায়। এসব সুদুর্লভ মহাবস্তু লুকিয়ে নেবার বা জোর ক'রে আদায় করবার অপচেষ্টা শিষ্যের পক্ষেই যে মারাত্মক ক্ষতিকর, তা' গুরুদেব একদিন আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। গুরুদেব যে-আসনে বসতেন, সেই আসন ও তার চারপাশের জায়গা খুবই অগোছালো অবস্থায় থাকত। আমি কোনো কোনো দিন একটু গুছিয়ে রাখতাম, কিন্তু গুরুদেবের তা' লক্ষ্য হওয়ামাত্র তিনি আমাকে ভৎ‌র্সনা করতেন। তারপর থেকে তাঁর অসাক্ষাতে কিছুই করতাম না। তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি নিয়ে একটু আধটু গোছগাছ করে রাখতে চেষ্টা করতাম। এরকম অগোছালো আসনের তলায় গুরুদেবের শ্রীচরণের বহু ধূলি জমা হয়ে থাকত। গুরুদেবের আসনের চারপাশে হরিলুটের হাঁড়ি, দইয়ের হাঁড়ি এবং বহু কাগজপত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো থাকত। একদিন দৈবাৎ গুরুদেবের চরণ স্পর্শে একটি দইয়ের হাঁড়ি উল্টিয়ে পড়ে গেল। পাত্রস্থিত দই আসনে ও আসনের নিচে, আশেপাশে গড়িয়ে পড়ল। আমি ছুটে এসে গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে মাটিতে পড়া সমস্ত দই হাঁড়িতে তুললাম এবং আসনটি কাচতে দিয়ে চারপাশ পরিষ্কার ক'রে দিলাম। কাজ শেষ ক'রে দইয়ের হাঁড়িটি নিয়ে গুরুদেবকে বললাম, "গুরুদেব, এই দইটি আমি খাব।" আমার কথা শোনামাত্র গুরুদেব দইয়ের হাঁড়িটি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। তারপর সেখানে দইয়ের হাঁড়িটি কর্তামায়ের হাতে দিয়ে কর্তামাকে বললেন, "কর্তামা, এই দই আসনের তলায় পড়ে গিয়েছিল। আসনের তলার ধূলিমাখা এই দই সুরেনধন তুলেছে। এখন সে বলে কি—এই ধূলিমাখা দই সে খাবে। তাই তাড়াতাড়ি উপরে নিয়ে এলাম, যথাস্থানে রেখে আসুন। সুরেনধনের কি এত ধূলি সহ্য করবার শক্তি আছে, কর্তামা?" গুরুদেবের কথাগুলির প্রত্যেকটি আমি সুস্পষ্ট শুনতে পেলাম। সব শুনে মুখ নিচু করে রইলাম। ওই ধূলির মধ্যে এত শক্তি নিহিত ছিল যে তা' সহ্য করবার শক্তি আমার ছিল না। তাই করুণাময় প্রভু আমার হাত থেকে সেই দইয়ের হাঁড়ি কেড়ে নিয়ে গেলেন। গুরুদেবের ভোজন অবশেষরূপ 'থাটি' প্রসাদও সেইরূপ সুদুর্লভ ছিল। যোগ্যতা অনুযায়ী কখনো কখনো কোনো ভাগ্যবান্ শিষ্য এই দুর্লভ প্রসাদ পাবার অধিকার লাভ করত। এরূপ আরো বহু দৃষ্টান্ত আছে; যেখানে আপাতঃদৃষ্টিতে পক্ষপাতমূলক বোধ হলেও গুরুদেব তাঁর ভুক্তি-অবশেষ প্রসাদ, শ্রীচরণজল ও ধূলি, এমন কি শ্রীচরণস্পর্শ সম্বন্ধেও অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তার কারণ এগুলির প্রত্যেকটিই অসীম শক্তির আধার। যেমন শরীরের Resistance অনুযায়ী Electric Voltage দেহের পক্ষে ক্ষতিকর, এমনকি মারাত্মক হ'তে পারে, তেমনি শিষ্যের সাধনোপযোগী

যোগ্যতা অনুসারেই সে গুরুশক্তি ধারণ করতে সমর্থ হবে, এবং তার বিচারক একমাত্র গুরুদেব স্বয়ং।

ইতিপূর্ব্বে বলেছি, গুরুদেব মা-ব্রহ্মময়ীকে তাঁর দুয়ারে বেঁধে রেখেছিলেন। সর্ব্ব সময়ে, সর্ব্ব স্থানে এবং সর্ব্বজীবে তিনি মাতৃদর্শন করতেন। গুরুদেব সকলকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবার জন্যে কেন বারবার অনুরোধ করতেন, আমার সন্দিগ্ধমনে এরকম প্রশ্ন জাগে। আমার সেই সন্দেহ দূর করার জন্য গুরুদেব বললেন, "বাবা, মা থেকে জনম, মায়েতেই অন্তিমে মিশে যেতে হবে। ধরণী মা—তাঁর থেকেই সব জীবদেহের উৎপত্তি, আবার তাঁরই কোলে সকলকে শেষ আশ্রয় নিতে হবে। মাটি বা পৃথিবী হচ্ছেন মায়েরই প্রকাশ; তাঁর উপর লুটিয়ে পড়ে তাঁতে আত্মসমর্পণ করার নামই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।" শুনে আমি স্তম্ভিত হলাম। এ জ্ঞান তো কারো নেই। এরপরে এর খাঁটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি কৃপা ক'রে এই অধমের চিত্তে স্ফুরিত করেছেন—যথাস্থানে তা' সন্নিবেশিত হবে। গুরুদেব আরো বলেছেন, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব মেয়েই মা।" বারবার জানাচ্ছেন তিনি, "মা-ছাড়া আর বিশ্বে কিছুই নেই। চেতন, অচেতন ব্রহ্মাণ্ড মায়েরই প্রকাশ। একথা ভুলে গিয়ে মাকে যে অন্য চোখে দেখে—সেই অসুর।" একী অভিনব জ্ঞান দিলেন প্রভু! এ দিব্যদৃষ্টি যার লাভ হয়েছে, মা-তো আর তার কাছে দূরের বস্তু নয়, সে যে সর্ব্বদাই মায়ের কোলে বসে আছে।

অনেকদিন আগেকার গুরুদেবের একটি প্রহেলিকা বাক্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল। একদিন একটি ভাবী বর বিয়ের জন্য সদলবলে বাজনাবাদ্য ক'রে সমুখের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। বিয়ের বাজনার শব্দ কানে আসতেই গুরুদেব হায়, হায় ক'রে কান্নার সুরে ব'লে উঠলেন, "হায়, হায়—ঐ শোনো, বাবা, আবার একজন মরতে যাচ্ছে।" সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন, গুরুদেবের ভুল হয়েছে মনে করে, বলে উঠলেন, "আজ্ঞে, মরতে নয়, লোকটি বিয়ে করতে যাচ্ছে।" গুরুদেব মাথাটি নীচু করে বেশ জোর দিয়েই বললেন, "আঃ, তাই তো বলছি, বাবা।"

বিবাহ-বন্ধন যে যুবক-যুবতী উভয়কেই নিশ্চিত ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, ধর্মের পথে কাঁটা দেয়, তা' মহাপ্রভু স্বয়ং নিজ আচরণে এবং প্রকৃত ধর্মপথের পথিকরূপ গোস্বামীগণকে, মহান্ত বৈষ্ণবগণকে সুস্পষ্ট আদেশ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। সামান্যমাত্র প্রত্যবায়ের কী ভয়ঙ্কর শাস্তি হয়, ছোট হরিদাসের কঠোরতম দণ্ডই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সমস্ত শাস্ত্রও সুস্পষ্টভাবে তাই নির্দ্দেশ দিয়েছেন, "সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু", "আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি", "ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ, যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ," "যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেব বিনির্মিতা, তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্।" ধর্মপথে পুরুষের

পক্ষে স্ত্রী যেমন নরকের দ্বারস্বরূপ, মুক্তিকামী স্ত্রীর পক্ষেও পুরুষসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, ভাগবতে (৩.৩১।৪১,৪২ শ্লোকে) এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শ্রীগুরুদেবও মহাপ্রভুর মতোই শাস্ত্রানুমোদিত এই আচরণই বারবার উপদেশ করেছেন।

বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত তথাকথিত 'সাধু'রা শিষ্যদের নিয়মিত উপদেশ দিয়ে থাকেন। কোনো কোনো 'বাজারে' সাধু আবার বক্তৃতাও দিয়ে থাকেন, কেউ কেউ বা বিদ্যা জাহির করতে বইও লেখেন। আমাদের গুরুদেব এর কোনোটাই করেন নি। স্বয়ং মহাপ্রভুও এসব থেকে দূরে ছিলেন। আমাদের গুরুদেব শিষ্য বা অশিষ্য দর্শনার্থীর সামনে যেসব কথাবার্ত্তা বলতেন, তাতে শাস্ত্রকথা, ধর্মতত্ত্ব বা গূঢ় উপদেশের লেশমাত্র ছিল না; কথা বলতেন, সন্দেশ, রসগোল্লা, খাওয়া-দাওয়া, বা ইট-কাঠ-চুন-সুরকি ও মিস্ত্রীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে। অনভিজ্ঞ তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা তাই পাতালদেবের কাছে এসে তাঁর কথাবার্ত্তায় একেবারে হতাশ হতেন। উপরন্তু তাঁর কথাবার্ত্তা ছিল একেবারে অসম্বদ্ধ, হেঁয়ালিপূর্ণ, এমনকি প্রলাপবৎ, অনেকটা পাগলের পাগলামি ভরা কথা। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান যাঁদের হয়েছে, একমাত্র তাঁরাই বুঝতেন যে স্বয়ং মহাপ্রভুর মতোই তাঁর আচার, আচরণ ও আলাপ বাতুলের ন্যায়, মহাপ্রভুর মতোই "আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস," মহাপ্রভুর মতোই তিনি ছিলেন "এক বাতুল", এবং তাঁরই ন্যায় পাতালপ্রভুরও "প্রলাপ বাদ", যা' "কহিবার কথা নহে, তথাপি বাউলে কহে, কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়?" গুরুদেব ছিলেন সেইরূপ একজন বাতুল, রায় রামানন্দ বা স্বরূপ গোস্বামীর মতো বাতুলই তাঁর প্রলাপময় বাক্য বুঝতে সমর্থ হ'ত। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সাধারণ লৌকিক ধর্মোপদেষ্টার মতো ফাঁকা উপদেশ দিতেন না। কারণ ফাঁকা কথায়, তা' সে যতই মূল্যবান হোক না কেন, কোনো তত্ত্বজ্ঞান হয় না। স্বয়ং ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী উপদেশ দান ক'রে বলেছিলেন, "আমার উপদেশ শুনে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি কৃপা ক'রে তোমাকে বুঝবার সামর্থ্য প্রদান করি।" এই ব'লে তিনি ব'লেছিলেন—"তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।" ফাঁকা উপদেশে, বা মেঠো বক্তৃতায়, বা শাস্ত্র পাঠ ক'রে তত্ত্বজ্ঞান হ'তে পারে না, কখনো না। এইজন্তে মহাপ্রভুও "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়", এবং বার বার বলেছেন, "সাধুকৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি নয়।" গুরুদেব তাই ফাঁকা উপদেশ দিতে বিরত ছিলেন। যোগ্যশিষ্য গুরুসেবার ফলে গুরুকৃপা লাভ করলে গুরুদেবের আচার আচরণেই সেই সেই শিষ্যের চিত্তে ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় আলোক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠা, ধর্মপথের তিন প্রধান প্রতিবন্ধককে সুদূরে বর্জ্জন করার ফাঁকা উপদেশ দিলেই হবে না, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তের আচরণে তা' সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পাতালপ্রভু তাঁর

সকল আচরণে, তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে এ তিনের আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। আমি সর্ব্বপ্রকারে তাঁকে পরীক্ষা ক'রে তবে এ উক্তি করবার স্পর্দ্ধা রাখি। পাঁচ বছরের ছোট ছেলেরও মনে যদি কোনো বিকার, কোনো কুটিলতা জাগা সম্ভব হয়, তাঁর অন্তরে তাও ছিল না। কাঞ্চন যে তাঁর কাছে সত্যই লোষ্ট্রবৎ, এরও ভূরি ভূরি প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। যখন যে অর্থ প্রণামী স্বরূপ পেয়েছেন, তখনই তা' খরচ ক'রে ফেলেছেন। 'স্বর্ণ-নির্মাণ' প্রণালী ভালো ক'রে জেনেও কখনো তা' কাজে প্রয়োগ করেন নি এবং যখন তাঁর শূন্য ভাণ্ডার, অথচ পাওনাদার জুলুম করছে তখন মা রাণারাণীর কাছে ভিক্ষা চেয়েছেন এবং জগজ্জননী তৎক্ষণাৎ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছেন। নিখিল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী যাঁর দুয়ারে বাঁধা, তিনি কি কখনও কাঞ্চনের কাঙাল হ'তে পারেন? আর প্রতিষ্ঠা? "প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেল পলাইয়া"—যেমন মাধবেন্দ্রপুরীর বিষয়ে খাটে, আমাদের পাতালদেবও তেমনি ছিলেন। 'প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা'—এ তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ লাভ ক'রে তিনি নিজেকে অধম, মহাপাপী, পাগল, পাপোষ, মেথরের ছেলে – ইত্যাদি কথা শুধু মুখেই বলতেন না, কার্য্যতঃ ভক্তদের চরণধূলি মাথায় নিতেন, ভক্তপদরজে গড়াগড়ি দিতেন, নিজে সকল জীবের পদতলে অর্থাৎ গুহার মধ্যে থেকে সাধন করতেন এবং অতি দীনভাবে, অতি নম্র মধুর কণ্ঠে নিজেকে অতি নীচ, অতি হেয়জ্ঞান ক'রে কথা বলতেন। সকলকেই বলতেন, 'গুরুদেব', সকলকেই বলতেন, "এ মহাপাপী, পাগল, অজ্ঞানকে জ্ঞান উপদেশ দিয়ে যান; আমি মোহান্ধকারে ডুবে আছি, আমার চোখের ঠুলি খুলে দিন"—ইত্যাদি কাতর মিনতি, আর্ত্তি ও দৈন্যভরা ছিল তাঁর সব কথা, সব আচরণ। অন্তরঙ্গ শিষ্যরা তাঁর মহিমা প্রকাশ করতে চাইলেও তিনি স্বয়ং মহাপ্রভুর মতোই ছলনা ক'রে নিজের স্বরূপ ঢাকা দিয়ে নিজেকে অতি নীচ, ঘৃণ্য ও জঘন্য মহাপাপী ব'লে প্রচার করতেন। ঠিক মহাপ্রভুর মতোই অতি অন্তরঙ্গ ও ভাগ্যবান্ ভক্ত ছাড়া আর কারো নিকট তিনি স্বীয় স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করেননি; মহাপ্রভুর মতোই দৈবাৎ কোনো মহাভাগ্যবানের কাছে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে তা' তাঁর লীলাকালে গোপন রাখতে কঠোরভাবে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে স্বীয় স্বরূপ দর্শন দানের পর মহাপ্রভু বাক্য—"কারো স্থানে ইহা নাহি কহিবে সর্ব্বথা, যাবৎ থাকয়ে মোর এই অবতার", সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে অনুরূপ সতর্কবাণী—"যে কিছু দেখিলে তুমি প্রকাশ আমার, সঙ্গোপন করিবে, পাছে জানে কেহ আর।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও অনুরূপ উক্তি রয়েছে—রায় রামানন্দকে বলছেন, "গুপ্তে রাখিহ, কাঁহা না করিহ প্রকাশ, আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস" (২।৮), বৈষ্ণববেশী রাজা প্রতাপরুদ্রকে—"তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল, কাঁহা না কহিও ইহা—নিষেধ করিল" (২।১৪)।

সাধারণ মানুষ আমরা যে সকল জিনিষ মহা মূল্যবান মনে ক'রে তাদের আদর যত্ন করি, তিনি ছোট শিশু বা উন্মাদ পাগলের মতোই সেসব জিনিষ তুচ্ছ বা নগণ্য জ্ঞান করতেন। আমি নিজে সেই সময়ের দশ টাকার নোট, যা' ভক্তগণ প্রণামী দিয়েছেন, তা' তাঁর অবহেলায় এখানে-সেখানে, আনাচে-কানাচে প'ড়ে থাকতে দেখেছি। বৈষ্ণবাটিতে তাঁর আসনের তলা থেকে কোনো শিষ্য কর্তৃক প্রদত্ত একশত টাকার একটি নোট চুরি হ'ল—তিনি নির্বিকার, গাহ্যই করলেন না। কত উপাদেয় চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় মিষ্টান্ন ও খাদ্য দ্রব্যাদি যা' ভক্তগণ তাঁর সেবার জন্য উপহার দিতেন, ঠিক মহাপ্রভুর গম্ভীরায় ভক্ত-দত্ত উপহার সমূহের মতোই, সেসব আর উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য গুহা মন্দিরে পচে নষ্ট হ'ত, তিনি খেয়ালই করতেন না। একবার কোনো ভক্ত প্রদত্ত একটি উৎকৃষ্ট দইয়ের হাঁড়, কাগজপত্র ও কাপড-চোপড়ের তলায় প্রায় সপ্তাহ দুয়েক চাপা প'ড়ে ছিল। একদিন আমি সেই দইয়ের হাঁড়ি উদ্ধার ক'রে গুরুদেবের কাছে নিয়ে গেলাম। দইটি পচে ছাতা ধ'রে গেছে, রং বিকৃত এবং উৎকট দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। গুরুদেব সেই পনেরো-ষোলো দিনের পচা, ছাতাধরা দই হাতে ক'রে নিয়ে অম্লান-বদনে একটু সেবা ক'রে উৎফুল্ল নয়নে আমাকে বললেন, "নাও, সুরেনধন, অতি উৎকৃষ্ট জিনিষ। তোমার পক্ষে এ খুব উপকারী।" গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে আমি তাঁর প্রদত্ত সেই দুর্গন্ধযুক্ত, পচা, ছাতা ধরা দই অবশ্যই খেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর বাক্য—"অতি উৎকৃষ্ট জিনিষ, তোমার পক্ষে খুব উপকারী"—আমার কাছে অনেকদিনই রহস্যময় ছিল। গুরুদেবের অন্তর্দ্ধানের প্রায় দশ বারো বছর পরে হঠাৎ সংবাদপত্রে একটি ছোট সংবাদ দেখে আমি চমকে উঠলাম। সংবাদটি এই রকম: গবেষণাগারে গবেষণা ক'রে স্থির হয়েছে যে পচা দইয়ের ছাতা থেকে এক অতি মহামূল্যবান্ ঔষধ প্রস্তুত সম্ভব, যা' চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনতে সমর্থ। সংবাদটি প'ড়ে আমার দুই চোখ ছলছল ক'রে উঠল। তখন থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে কথিত গুরুদেবের সেই রহস্যময়, অথচ 'অমোঘ' বাণীটি স্মরণপথে উদিত হলো—"নাও, সুরেনধন—এ অতি উৎকৃষ্ট জিনিষ, তোমার পক্ষে খুব উপকারী।" ব্রহ্মার সেই কথা বারবার মনে হ'তে লাগল "জানন্ত এব জানন্তু কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রভো, মনসো বপুষো বাচো মহিমা তব গোচরম্।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বর্ত্তমানে আমরা যে ভিটামিনকে একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান খাদ্যোপাদান রূপে গণ্য করি, সেই ভিটামিন আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে গুরুদেব খাদ্য দ্রব্যাদি ও ফলমূল খোসা না ছাড়িয়ে ও রন্ধন করা দ্রব্যের জল না ফেলে সেবা করতে উপদেশ দিয়ে এসেছেন এবং আশ্রমেও সেই রীতি বরাবর পালন করা হয়েছে।

গরদের কাপড়কে আমরা কত মূল্যবান্ মনে ক'রে কত যত্নে বাক্সে রেখে দিই।

কোনো ভক্ত গুরুদেবকে একটি সূক্ষ্ম গরদের বস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। সেটি গুহা-মন্দিরের এক কোণে ধুলায় ধূসরিত হয়ে পড়েছিল। একদিন হঠাৎ আশ্রমের একটি ভক্তের হাতের আঙুল কেটে যায়। গুরুদেবকে সেকথা জানালে, গুরুদেব স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, "ন্যাকড়া বেঁধে জলপটি দিয়ে দাও, বাবা।" এখন যে বলতে এসেছিল, সে ছেঁড়া ন্যাকড়া খুঁজে পাচ্ছিল না। গুরুদেব তাকে এদিক-ওদিক খুঁজতে দেখে বললেন, "কী খুঁজছ, বাবা?" লোকটি বললে, "জলপটি দেবার জন্য এই একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া খুঁজছি।" গুরুদেব পাশে চেয়ে সেই কোণে গোঁজা গরদের কাপড়টি দেখতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে সেই গরদের কাপড়ের এক প্রান্ত ছিন্ন ক'রে সেই ছিন্ন গরদের কাপড় তার হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, ছেঁড়া ন্যাকড়া, বাবা। এখুনি জলপটি বেঁধে দাও।" লোকটি তো একেবারে হতভম্ব। নতুন, মহামূল্যবান্ অতি সূক্ষ্ম গরদের বস্ত্র ছিন্ন ক'রে জলপটির ন্যাকড়া করলেন তিনি! তিনি কি শিশু, না উন্মাদ!!

(১১) অন্তর্দৃষ্টি বা ত্রিকালজ্ঞত্ব :

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, সিদ্ধ মহাপুরুষগণ শ্রীভগবানের মতো সত্যসঙ্কল্প ও ত্রিকালজ্ঞ হন। বস্তুতঃ এই 'ত্রৈকালিকী বুদ্ধি' মহাপুরুষত্বের একটি নিশ্চিত প্রমাণ। কোনো জীবের জীবনের ত্রিকাল, অর্থাৎ ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী তাঁর জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায়, Graph paper-এ অঙ্কিত curve-এর মতো তাঁর চিত্তপটে জীবের জীবনালেখ্যের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মূর্ত্তির আকার সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। বস্তুতঃপক্ষে জীবের জীবনপ্রবাহ Space-time continuum-এ অতীত হ'তে ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত তার প্রারব্ধ কর্মফলের একটি shape গঠন ক'রে রাখে—যে shape একমাত্র ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ বা তাঁর সিদ্ধ ভক্তগণেরই গোচর, অপরের নয়। তাই কোনো জীবকে দেখা মাত্র তাঁরা সেই জীবের ত্রিকালব্যাপ্ত shape বা আকৃতিটি স্পষ্ট দেখতে পান এবং যে কোনো প্রাণী বা মনুষ্যের জন্মের আদি হ'তে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঘটনাবলী, অতীত-বর্ত্তমান ভবিষ্যতের বিবরণ নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতে পারেন, এতে তাঁদের বিন্দুমাত্র ভুল হয় না। পাতালপ্রভু এইরূপ একজন মহাপুরুষ। তাঁর ত্রিকালজ্ঞত্ব মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকটিত হ'ত। এটা তাঁর একটা স্বাভাবিক লক্ষণরূপেই গণ্য করতাম আমরা এবং তাই কোনো আগন্তুক ব্যক্তিকে একবার দেখেই যখন তাঁর জীবনের অতীত ঘটনাবলী বর্ণনা ক'রে যেতেন, অথবা বর্ত্তমানে তার অন্তর-স্থিত ভাবনা, স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিতেন, তখন আমরা একটুও বিস্ময় বোধ করতাম না। এইভাবে কারো অতীতের ভালো মন্দ কাহিনী এবং

অন্তরের গোপনতম কামনা যখন তিনি প্রকাশ্যে প্রকট ক'রে দিতেন, তখন সেই ব্যক্তি বিস্ময়ে অভিভূত, চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়ে তাঁর শ্রীচরণে শরণ নিত। আগন্তুক দর্শনার্থী-গণের মধ্যে এরূপ ঘটনা এত বেশী ঘটত যে আমরা এতে আর আশ্চর্য্য হতাম না, জানতাম এ তাঁর স্বাভাবিক ও সাধারণ গুণ। সুতরাং এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা আমাদের কাছে অনেকটা 'অবান্তর'ই মনে হয়। তথাপি দু'একটি ঘটনার সামান্য বিবরণ দিচ্ছি। ইছাপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য (তখন তিনি মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান ও রাইফেল ফ্যাক্টরির ক্যাশিয়ার পদে অধিষ্ঠিত) সে সময়ে শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করেছেন। তিনি প্রায়ই তখন গুরুদর্শনে নবদ্বীপ আসতেন। এমনি একদিন যাত্রাপথে পথিমধ্যে তাঁর প্রতিবেশী যুবক কালিসহায় চ্যাটার্জীর (পরবর্ত্তী জীবনে ইনি বিখ্যাত কমিক অভিনেতা) সঙ্গে দেখা। কালিবাবু মধুসূদনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় চলেছেন?" মধুসূদনবাবু উত্তর দিলেন, "নবদ্বীপে, গুরুদর্শনে।" কালিবাবু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, "নবদ্বীপে আপনি গুরু করেছেন? কেন, আর কোথাও জায়গা পেলেন না?" মধুসূদনবাবু ওঁর মন জানবার জন্যে বললেন, "কেন বলতো, কালি?" কালিবাবু স্পষ্ট উত্তর দিলেন, "নবদ্বীপের মতো খারাপ জায়গা আর আছে? চারদিকেই তো ওখানকার দুর্নাম শুনি। ওখানে কেউ ভালো লোক আছে? ছি ছি— এমন জঘন্য জায়গায় গুরু ক'রে আপনার মতো ভালো লোক প্রতারিত হয়েছে।" মধুসূদন বাবুর খুব মজা লাগল কালিসহায়ের কথা শুনে। সোজাসুজি ব'লে বসলেন, "কালি, চলো আমার সঙ্গে নবদ্বীপে। একবার দেখে আসবে আমার গুরু কত খারাপ লোক এবং কতভাবে আমাকে প্রতারণা করেছেন। তুমি ঠিক ধরতে পারবে। চলো, চলো, —এখনি চলো।" মধুসূদনবাবুর অনুরোধ কালিসহায়ের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই তিনি আমতা আমতা ক'রে বললেন, "যেতে আমার আপত্তি নেই। তবে এখনই আপনার সঙ্গে কী ক'রে যাই? প্রস্তুত হয়ে আসিনি তো।" মধুসূদনবাবু বললেন, "কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তো আছি।" এই ব'লে মধুসূদনবাবু রাস্তা থেকেই ধ'রে নিয়ে এলেন সেই চতুর ও অবিশ্বাসী যুবককে নবদ্বীপে তাঁর গুরু আশ্রমে। নবদ্বীপে এসে মধুসূদনবাবু ও অন্যান্য শিষ্যগণ মন্দির মধ্যে গুরুদেবের কাছে চলে গেলেন। কালিসহায় অশিষ্য হওয়ায় বাইরে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মধুসূদনবাবুর গুরুদেবকে দর্শন করতে লাগলেন—সমালোচকের চোখ দিয়ে। গুরুদেব কালিসহায়কে দেখেই বললেন, "এসেছ বাবা? আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম," ইত্যাদি। কালিসহায়বাবু মনে মনে বললেন, "আমি একটি ঘুঘু লোক। ও সব 'বুক্নি' দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবেন না। 'লোক-পটাবার' ওসব বুলিতে আমার মন ভেজে

-না। আপনি কত বড় 'সাধু' তা' আমি দেখে নেব এবং মধুসূদনবাবুকে বুঝিয়ে তাঁর ভুল ভেঙে দেব।" বলাবাহুল্য, গুরুদেব বহু কথা ব'লে কালিসহায়কে আদর স্নেহ করলেও, কালিসহায়বাবু একটি কথাও বললেন না। যা' স্থির করবার মনে মনেই করলেন। পরদিন প্রভাতে মধুসূদনবাবুরা আবার সকলে গুহামন্দিরে প্রবেশ করলেন গুরুদর্শনে এবং কালিসহায় আজ একাকীই জানালার বাইরে থেকে সবকিছু পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। গুরুদেব আজ কিন্তু মন্দির মধ্যে তাঁর শিষ্যভক্তগণকে নিয়েই মেতে থাকলেন, বাইরে কালিসহায়ের দিকে একবার চেয়েও দেখলেন না। কালিসহায় একমনে সাধুবাবার ক্রিয়াকলাপ দর্শন ও শ্রবণ করতে লাগলেন। শিষ্যদের সঙ্গে তিনি অনেক 'আবোল-তাবোল' বকছিলেন। সেগুলি এতই অসংবদ্ধ যে তার কোনো অর্থই হয় না। কিন্তু সাধুবাবার 'চালাকি' ধরবার জন্যে আমাদের 'চতুর' যুবক কালিসহায় আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গেই পাতালবাবার সব কথাই শুনছিলেন। কালিসহায় শুনছেন, হ্যাঁ, শুনছেন—মনে হচ্ছে এবার যেন সাধুবাবা কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা ক'রে যাচ্ছেন তাঁর শিষ্যদের কাছে। ঘটনাগুলি এক এক যতই বিবৃত হ'তে লাগল সাধুবাবার মুখে, ততই কিন্তু আমাদের 'চতুর' অবিশ্বাসী যুবক কালিসহায়ের চোখ দুটি সজাগ হয়ে উঠতে লাগল, ক্রমে ক্রমে সে চোখ দুটি বিস্ময়ে একেবারে বিস্ফারিত হয়ে গেল, বজ্রাহতের মতোই চমকে উঠলেন অবিশ্বাসী যুবক কালিসহায় চ্যাটার্জি। "একি, এ কার জীবনের কথা বলছেন সাধুবাবা ওই শিষ্যদের কাছে। এ যে হুবহু কালিসহায় চ্যাটার্জির জীবনের অতীত ইতিহাস—হ্যাঁ, একেবারে নির্ভুল, নিখুঁতভাবে, তার গোপনতম, নিভৃততম, অন্তরের কথা পর্য্যন্ত ফাঁস ক'রে দিলেন ওদের কাছে।" নাস্তিক, অবিশ্বাসী যুবক এবার আবেগে কাঁপতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ জানালা বন্ধ হয়ে গেল। মধুসূদনবাবু উপরে এসে কালিসহায়কে মুচকে হেসে শুধালেন, "আমার গুরুদেবকে কেমন দেখলে, কালি?" কালিসহায় তখন বিস্ময়ে বজ্রাহত, মুখ দিয়ে তাঁর কোনো কথা বেরলো না। মধুসূদনবাবু সব বুঝলেন। হেসে বললেন, "যাও, স্নান ক'রে এস। সাধুবাবার দয়া হয়েছে তোমার ওপর, তোমাকে দীক্ষা দেবেন।" অবিশ্বাসী কালিসহায়ের দুই চোখে অশ্রু ছলছল করে উঠল, অতি কষ্টে বললেন, "আমার অপরাধ হয়েছে মধুসূদনবাবু। আমি ওঁকে চিনতে পারিনি। কিন্তু দীক্ষা নেবার জন্যে আমি তো প্রস্তুত হয়ে আসিনি—।" মধুসূদনবাবু বুঝিয়ে বললেন, "তারজন্যে আমি তো আছি ওটা গৌণ, তাঁর কৃপাই মুখ্য—সেটা তুমি পেয়েছ।"

এরূপ ঘটনা এত অজস্র এই আশ্রমে ঘটেছে—যে আমরা ওটাকে গুরুদেবের দৈনন্দিন লীলা ব'লেই গণ্য করতাম। মতিহারির খ্যাতনামা শিষ্য শ্রদ্ধেয় কাকদাদা

একদিন পুষ্পচন্দন নিয়ে গুরুদেবের শ্রীচরণ পূজা করতে যাচ্ছেন, গুরুদেব হঠাৎ বাধা দিয়ে বললেন, "থাক্, বাবা। ওই হাতে তুমি জীবহত্যা করেছ—ওই হাত গুরুর চরণ স্পর্শযোগ্য নয়।" কান্তিদাদা লজ্জাবনত বদনে সে অপরাধ স্বীকার করলেন এবং সেই থেকে চিরদিনের মতো বন্দুক ত্যাগ ক'রে 'শিকার' করা বন্ধ ক'রে দিলেন। আর একদিন এক প্রাচীন শিষ্য এসেছেন গুরুদর্শনে তাঁর নব জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে। শ্বশুর মশায় গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ ক'রে। তাঁর দেখাদেখি নব জামাতাও সেইভাবে প্রণাম ক'রে শ্বশুর মশায়ের মতোই সাধুবাবার চরণ স্পর্শ করতে গেলেন। সাধুবাবা চমকে দু'হাত পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "ওই হাতে যে বহু জীব বলি দিয়েছ বাবা। ওই হাত তো আর সাধুগুরুর চরণ স্পর্শের যোগ্য নয়।" শ্বশুর মশায় চমকে উঠলেন, তিনি এ সংবাদ জানতেন না; জামাতা বাবাজীবন অধোবদন হয়ে রইলেন। এইভাবে জীবের অতীত ও বর্ত্তমান মানস প্রক্রিয়া বর্ণনের এত অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে বাহুল্য ভয়ে সেসব বিবৃত করতে বিরত হলাম। প্রয়োজনবোধে অনুরূপভাবে ভক্ত দর্শনার্থী বা শিষ্যগণের ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করে গেছেন এবং তার প্রত্যেকটি পরে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। আমি যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করি, তার কিছু পরই তিনি কৃপা ক'রে আমাকে আদেশ করলেন: "(১) পরীক্ষা দিওনা, (২) চাকুরি ক'রোনা, (৩) বিয়ে ক'রোনা, (৪) সংসারে ফিরে যেওনা, (৫) যাবজ্জীবন আশ্রমে প'ড়ে থেকো: আমি তোমাকে মঠের কর্ত্তা ক'রে রাখব, গুরু তোমায় দেখবেন। তুমি আশ্রমে থেকে গুরুর মহিমা প্রচার করবে। চারিদিক গুরুময় করবে। তুমি গুরুকে অমর ক'রে বাঁচিয়ে রাখবে।" এরপর গুরুদেব ক্রমে ক্রমে আমার নিজের সম্বন্ধে যা' বলেছেন, তাও এইসঙ্গে লিপিবদ্ধ করছি, "বাবা, তুমি বহু জন্ম থেকে আমার কাছে রয়েছ। গত জন্মে তুমি কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলে।" একদিন কথায় কথায় বললেন, "বাবা, সুরেনধন, তুমি যে আমার গাইয়ে বাবা"—বলা বাহুল্য তখন আমি গানের 'গ'ও জানতাম না; পরে অবশ্য Theoretical Cla·sical Music-এর চূড়ান্ত সাধনা করেছি এবং বিলম্বে হ'লেও কিছু কণ্ঠসাধনাও করেছি। কিন্তু গুরুদেব যখন আমাকে 'গাইয়ে বাবা' আখ্যা দিয়েছিলেন, তখন সেটা দুর্বোধ্য পরিহাসের মতোই শুনিয়েছিল।

পাতালপ্রভু যে কি অকল্পনীয় শক্তির আধার ছিলেন, তার নিদর্শন স্বরূপ জনৈক সাঁওতাল বালককে সাময়িকভাবে 'জাতিস্মরতা' ক্ষমতা প্রদানের একটি চমকপ্রদ বিবরণ দিচ্ছি। গুরুদেব তখন নিঃশঙ্ক আশ্রমে। একদিন জনৈক সাঁওতাল তার ছেলেকে নিয়ে গুরুদেবকে দর্শন করতে এলো। গুরুদেবকে দর্শন ক'রে সে জানাল যে তার একটি প্রার্থনা আছে সাধুবাবার কাছে। এই ব'লে সে তার ছেলেটিকে দেখিয়ে

দিয়ে বললে যে এ কিছুতেই কোনো কাজকর্ম করতে চায় না, দিনরাত 'বাবুর' মতো বসে থাকে। শাসন করলে বা মারলেও কথা শোনে না। ছেলেটি বড়ই আরামপ্রিয়, অলস ও শৌখীন। সে নিজে এর কোনো প্রতিকার করতে না পেরে তাই সাধুবাবার কাছে নিয়ে এসেছে ছেলেকে। এর একটা বিহিত সাধুবাবাকে করতে হবে ব'লে সে ছেলেটিকে সাধুবাবার কাছে এগিয়ে দিল। তারপর বললে, ছেলেটি স্বভাবে যেমন আরামপ্রিয়, দেখতেও সেইরূপ বাবুদের ঘরের ছেলের মতো। গুরুদেব তখন একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিলেন সাঁওতাল বালককে—সাঁওতালের শেষ কথাগুলি বোধহয় তাঁর শ্রুতিগোচর হয়নি। গুরুদেব দেখছেন, অপলক দৃষ্টিতে দেখছেন—তারপর আপন মনেই অস্ফুট কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "ও—আপনি? আপনি এসেছেন এই সাঁওতাল ঘরে?" তারপর সাঁওতালের দিকে চেয়ে বললেন, "বাবা, উনি তো কাজ করবেনই না। উনি যে বাবুর সেরা বাবু, এই গাঁয়ের বড় জমিদারবাবু।" এই ব'লে জমিদারবাবুর নাম করতেই সাঁওতাল ব'লে উঠল, "হাঁ, উ তো বারো চোদ্দ বছর আগে মারা গেছে।" গুরুদেব হাত দুটি যোড় ক'রে বললেন, "তিনি তোমার পুত্ররূপে তোমার ঘরে এসেছেন।" ঠিক এই সময়ে দৈবক্রমে সেই জমিদার বাড়িরই জনৈক লোক গুরুদেবের কাছে এসেছিল। গুরুদেবের মুখে এই সব বিস্ময়কর কথা শুনে সে চমকে উঠে বললে, "সাধুবাবা, এসব কী বলছেন আপনি?" গুরুদেব তেমনি করযোড় মৃদুকণ্ঠে বললেন, "সত্যই বলেছি বাবা। তোমাদের বড় কর্তাবাবু এই সাঁওতালের ঘরে তার পুত্ররূপে এসেছেন।" বিস্ময়াহত হয়ে ভদ্রলোক বললেন, "তার প্রমাণ?" গুরুদেব তেমনি নম্রকণ্ঠেই বললেন, "এ অধম পাগলের কথায় বিশ্বাস হ'ল না বুঝি?" এই ব'লে তিনি সাঁওতাল বালকটিকে স্পর্শ ক'রে তাকে সাময়িকভাবে 'জাতিস্মরতা' ক্ষমতা প্রদান ক'রে বললেন, "যান বাবা, আপনার বাড়ী একবার ঘুরে আসুন।" গুরুদেব এইকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাঁওতাল বালক কারো নির্দেশ ব্যতীতই হন্ হন্ ক'রে হাঁটতে শুরু ক'রল এবং এ জীবনে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও পরিচিতের মতোই রাস্তা চিনে নিজবাড়ী অর্থাৎ জমিদার গৃহে উপনীত হ'ল। জমিদারবাড়ীর সেই ভদ্রলোক ও সাঁওতাল তার পিছু পিছু এলো। জমিদার গৃহে পৌছেই বালক বেশ সহজভাবেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করল এবং পূর্ব্ব পরিচয়ের মতো একে একে সব ঘরে ঢুকে তার পরিচয় দিতে লাগল। অবশেষে দোতলায় উঠে ছুটে গিয়ে 'কর্তাবাবু'র ঘরে প্রবেশ ক'রে চীৎকার ক'রে বললে, "এই তো আমার ঘর, এই আমার খাটবিছানা, এই আমার বাক্স তোরঙ্গ—এতে এই এই জিনিষ আছে।" এদিকে বাড়ীময় হুলস্থুল পড়ে গেছে। সকলেই এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখে ছেলেটির চারপাশে জমা হয়েছে। তার মধ্যে বাড়ীর বৃদ্ধা কর্ত্তাগিন্নি ঠাকরুণকে দেখে বালকটি বললে,

"ওই তো আমার গিন্নি। গিন্নি, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না, এরি মধ্যে ভুলে গেলে ?" এই ব'লে দু'একটি গোপন কথাও শুনাল যা' কর্ত্তা ও গিন্নি ছাড়া কেউ জানত না। এরপর ছুটে সিঁড়িতে গিয়ে দেখাল, "এই তো এখানে আমার চোর-কুঠুরি। এখানে আমি টাকা রাখতাম।" এইসব চমকপ্রদ ব্যাপারের পর বাড়ির আর কেউই তাকে অবিশ্বাস করতে পারল না। সকলেরই চোখে জল, বাড়ির মৃত 'কর্ত্তা' আজ আবার 'নব কলেবর' গ্রহণ ক'রে ফিরে এসেছেন। সকলেই তাকে নানারূপে অভ্যর্থনা ক'রে সমাদর করতে লাগল এবং সাঁওতালকে বললে, "যা' তুই ঘরে ফিরে যা,—তোর ছেলে আমাদের কর্ত্তাবাবু। এই-ই তাঁর বাড়ি, এখানেই তিনি থাকবেন।" সাঁওতাল তখন সজল চক্ষে করযোড়ে বললে, "উ কথাটি বল্‌বি না, বাবু। উ আমার ছেলে, আমার ঘরেই থাকবে। উকে আমি সাধুবাবার কাছে নিয়ে এসেছি। আবার তাঁর কাছেই নিয়ে যাব। সাধুবাবা কি বলে দেখ তোরা।" ওর যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে সকলেই বললে, "সেই ভালো। সাধুবাবা কী বলেন দেখা যাক।" এদিকে সাঁওতাল বালক তার 'ঘর' ফিরে পেয়ে আর নড়তে চায় না। একরকম জোর ক'রেই তাকে নিয়ে সকলে সাধুবাবার কাছে এলো। সাধুবাবা সব শুনে হাতযোড় ক'রে বললেন, "কেমন বাবা, প্রমাণ পেলে তো ?" তারপর জমিদারবাড়ির লোকদের উদ্দেশ ক'রে বললেন, "বাবা, কর্ম অনুযায়ী জন্ম হয়। জমিদার কর্ত্তাবাবুর কর্মসূত্রেই সাঁওতাল গৃহে জন্ম হয়েছে। জন্মান্তর হ'লে পূর্ব্বজন্মের কারো সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ থাকেনা, স্মৃতিও থাকেনা। এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে. একথা আমি মুখে বললেও তোমাদের কারো বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই ওকে সাময়িকভাবে জাতিস্মর ক'রে দিয়েছিলাম। এ জন্মে ও আর তোমাদের কেউ নয়। ও সাঁওতালেরই ছেলে।" এই ব'লে হস্তস্পর্শে আবার তার পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট ক'রে দিলেন। সে তখন আর জমিদারদের কাউকেও চিনতে পারল না এবং সাঁওতাল পিতার কোলের কাছে এসে বসল। গুরুদেব তাকে উপদেশ দিলেন, "বৎস, বাপের কথা অনুযায়ী কাজকর্ম করো এবার থেকে। অলস হয়ে বসে থেকো না। বাপ-মা যা' বলে তাই মন দিয়ে করো।" সাঁওতাল খুশী হয়ে তাকে ঘরে নিয়ে গেল—সেও তার পর থেকে ভালো হয়ে গেল।

ভবিষ্যৎদৃষ্টি

গুরুদেব কৃপা ক'রে কোনো কোনো ভক্ত বা শিষ্যের ভবিষ্যৎ বিপদের সতর্কীকরণ ক'রে দিতেন। এরকম ঘটনাও এত অসংখ্য যে তাদের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। বেশীর ভাগ শিষ্যই কোনো কাজ আরম্ভ ক'রে, অথবা কোনো মামলা, পরীক্ষা বা কঠিন ব্যাধির ভবিষ্যৎ জানতে চাইত। গুরুদেবও সতর্কতা সহকারে তার নির্ভুল উত্তর দিয়ে

দিতেন—এরকম আমরা বরাবরই প্রত্যক্ষ করেছি। এদিকে ছোট ছোট শিশুদের কাউকে ডাক্তারবাবা, কাউকে উকিলবাবা, কাউকে ইঞ্জিনিয়ার, কাউকে ক্যাশিয়ার, কাউকে অফিসার ইত্যাদি আখ্যায় আহ্বান ক'রে তাদের অভিভাবকদের চমৎকৃত ক'রে দিতেন—কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে এরা প্রত্যেকেই পাতালপ্রভুর 'অমোঘ' বাক্য সফল ক'রে ডাক্তার, উকিল বা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। এরও অজস্র দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। তবে তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী বেশীর ভাগই বর্ষিত হ'ত করুণারূপে কোনো ভক্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির ভবপারের কিছু সম্বল প্রদানের প্রচেষ্টায়। এর দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। ইতিপূর্ব্বে একনিষ্ঠ ভক্তশিষ্য জ্যোতিষ সরকার ও নগেন রাহা প্রমুখের কথা বিবৃত করেছি। সাধারণ আগন্তুক যাত্রী দর্শনার্থীর উপরও কখনো কখনো প্রভুর করুণা বর্ষিত হ'ত—এবং এইভাবে তিনি তাদের আসন্ন 'শেষ যাত্রা'র জন্যে কিছু 'সম্বল' দান করতে চেষ্টা করতেন। তবে সাধারণ জীব সবসময়ে তা' গ্রহণ করতে পারত না; অহঙ্কার, অবজ্ঞা ও জিদবশতঃ তাঁর কথা অগ্রাহ্য করত। এরকম একজন হতভাগ্যের কথা মনে পড়ছে, তারই সংক্ষেপ বর্ণনা করছি। গুরুদেব একদিন কোনো কার্য্যোপলক্ষে আশ্রমের বাইরে নিচে কুয়ার কাছে শিষ্যদের সহিত গমন করেছেন। এমন সময় সেখান দিয়ে নবদ্বীপের একজন ব্রাহ্মণ যাচ্ছিলেন। শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁর পরিচিত। সেই শিষ্যটিকে দেখে তিনি বললেন, "ওহে, তোমাদের পাতাল সাধুবাবা কোথায়? তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না?" শিষ্যটি বললে, "আজ্ঞে, তিনি আপনার নয়ন সমুখেই বিরাজ করছেন—দর্শন করুন।" ব্রাহ্মণ গুরুদেবকে দেখে একটু ভ্রূকুটি ক'রে বললেন—"ও।" গুরুদেব করযোড়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁর বহু সম্মান প্রদান করলেন। তারপর সেইভাবেই মিনতিপূর্ণ বাক্যে তাঁকে আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসাদ পেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু কিছুতেই রাজী হ'লেন না। তাঁকে বেশ ভালো ক'রেই বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে ব্রাহ্মণেই পাক করেছে ও ঠাকুরের ভোগ দিয়েছে; সেই ব্রাহ্মণের হাতেই পরিবেশিত অন্নপ্রসাদ তিনি পাবেন—এতে আপত্তির কী থাকতে পারে? কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ নানাপ্রকার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ ক'রে নিজের অহঙ্কার প্রকাশ করতে লাগলেন এবং জানিয়ে দিলেন তিনি যেখানে-সেখানে খান না। গুরুদেব কিন্তু তথাপি করযোড়ে আবেদন করতে ছাড়লেন না, কিন্তু সেই দাম্ভিক ও উদ্ধত ব্রাহ্মণ অবশেষে গুরুদেবকে প্রায় অপমান ক'রে দর্পিত পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। তিনি চলে গেলে গুরুদেব ব্রাহ্মণের পরিচিত আশ্রমের শিষ্যটিকে বললেন, "বাবা, তুমি আগামীকাল এই সময়ে ওই ব্রাহ্মণের খবর নিয়ে আমাকে জানিও তো।" বলা বাহুল্য, এরপরে সকলেই এই উদ্ধত আগন্তুক ব্রাহ্মণের কথা ভুলে গেল—এবং সেই শিষ্যটিও তার পরদিন ওই ব্রাহ্মণের

সংবাদ নিতে বিস্মৃত হ'ল। কিন্তু তার পরদিন উক্ত শিষ্যটির পথিমধ্যে হঠাৎ ওই ব্রাহ্মণটির পুত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল। পুত্রটির পরনে 'কাচা' পরা—ওই পরিচিত শিষ্যটিকে দেখেই সে কেঁদে ফেলল। শিষ্যটি বিস্মিত হয়ে ব্যাপার কী শুধাতে সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "বাবা আমাদের ছেড়ে গেছেন।" শিষ্যটি আরো আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "এইতো গত পরশুই তাঁকে দেখলাম খাসা সুস্থ শরীরে আমাদের আশ্রমে।" পুত্র জানাল, "আশ্রম থেকে এসে কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি কয়েকবার পায়খানা যান ও বমি করেন। ডাক্তার এসে পৌছানোর আগেই সব শেষ।" শিষ্যটি এসে সবকথা গুরুদেবকে জানালে, তিনি করযোড়ে বললেন, "বাবা, আমি দেখেই বুঝেছিলাম—ওর শিয়রে শমন—চব্বিশ ঘণ্টাও কাটবে না। তাই কত চেষ্টা করলাম বাবা, ওকে দুটি রাধাগোবিন্দের প্রসাদ সেবা করাতে। মৃত্যুর পূর্ব্বে দেহেতে সে-প্রসাদ থাকলে ভব-পারের জন্যে ওর কত যে উপকার হ'ত।" এই ব'লে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। শিষ্যরা বললেন, "আপনি তো কতই চেষ্টা করলেন। ওর দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য গ্রাহ্য না ক'রে ওর শেষ সম্বলের জন্যে প্রাণপণেই চেষ্টা করেছেন প্রভু। কিন্তু ওর কঠিন কর্ম ওকে সে করুণা কিছুতেই নিতে দিল না। বিষয়ীর অন্ন ও সাধুর অন্নে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন" এবং সাধুর স্থানে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রসাদ যে দেবতারাও বাঞ্ছা করেন—এ মহাসত্য ও কিছুতেই বুঝল না। ওর কর্মই ওকে তার যথানির্দ্দিষ্ট পথে নিয়ে গেল, আপনি চেষ্টা ক'রে কী করবেন?"

এরকম হতভাগ্য ও সৌভাগ্যবান বহু লোককে দেখেছি, মৃত্যুর পূর্ব্বে যাদের পরকালের 'সম্বলে'র জন্যে গুরুদেব প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন। এরই নাম প্রকৃত 'দান', একেই বলে যথার্থ 'দয়া'।

(১২) দূর-দৃষ্টি :

শ্রীভগবৎপাদপদ্মে যুক্তচিত্ত যোগীর দূর থেকে শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতা লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন "বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ"—১১।১৫।২০। পাতালপ্রভুর দূর-দৃষ্টির এত অজস্র ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, সে সবের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। এক্ষেত্রেও মাত্র দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করব। গুরুদেব যখনই কোনো শিষ্য বা ভক্তের প্রতি মনোযোগ দিতেন, তখনই নিজ আসনে বসেই দূর থেকে তার ক্রিয়াকলাপ সুস্পষ্ট দর্শন করতে পারতেন। আমার নিজের 'পুলিশ-বিভ্রাট'-এ চমকপ্রদ ঘটনায় এর উল্লেখ করেছি। এরকম ঘটনা প্রত্যেক ভক্ত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তাঁর কাছে কিছুই গোপন করবার জো ছিল না, ইচ্ছামাত্রই বহুদূরস্থিত শিষ্যেরও সব ক্রিয়াকলাপ নিখুঁতভাবে দেখতে ও তার কথাবার্তা নির্ভুলভাবে শুনতে পেতেন তিনি। কোনো ভক্ত হয়তো

আকুল হয়ে তাঁর দর্শনে আসছে, পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টি; অবশেষে কোনো গৃহের অলিন্দে আশ্রয় নিল সে। গুরুদেব কিন্তু সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখেছেন তার প্রতি,—সে আসতেই বললেন, "অমুকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলে—নয়, বাবা?" দুর্গাপদবাবুর আসন্ন মৃত্যু ফাঁড়া থেকে উদ্ধার করে যখন তাঁকে আকর্ষণ ক'রে আনছিলেন গুরুদেব, তখন তিনি কোনো সংবাদ না দিলেও গুরুদেবের তীক্ষ্ণ নজর ছিল দুর্গাপদবাবুর প্রতি। তাই তিনি যে ট্রেনে নবদ্বীপ পৌঁছাবেন, একেবারে সঠিকভাবে সেই ট্রেনেই লোক পাঠালেন আশ্রম থেকে তাঁকে আনবার জন্যে। এরূপভাবে সংবাদ না দিয়ে বহু শিষ্যই হঠাৎ অসময়ে বা গভীর রাত্রে আশ্রমে এসে পৌঁছাত। স্টেশন থেকে আশ্রমে আসতে, বিশেষতঃ গোমোর পাহাড় ও জঙ্গলময় পথে, এসব শিষ্যকে বহু বিঘ্ন-বিপদের সম্মুখীন হ'তে হ'ত। কিন্তু ভক্তবৎসল প্রভু কি ভাবে এইসব হঠাৎ আগমনরত ভক্তগণের বিঘ্ন-বিনাশ ক'রে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন, সেসব চমকপ্রদ কাহিনী সাধারণ মানবজ্ঞানের ও বিশ্বাসের প্রায় বহির্ভূত। এরকম ঘটনাও অসংখ্য ঘটেছে, তার মধ্যে মাত্র দু'একটি বর্ণনা করছি। শ্রদ্ধেয় মাস্টারদাদার মুখে শুনেছি, একদিন তিনি এইভাবে গুরুদেবকে কোনো সংবাদ না দিয়েই হঠাৎ গুরুদর্শনে এসেছেন গোমোয়। স্টেশনে যখন নামলেন তখন রাত্রি গভীর। সঙ্গে আলোও ছিল না। তথাপি গুরুদেবের প্রতি গভীর অনুরাগে সেই নিশুতি রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারেই আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করলেন। পাহাড়ের কাছে নিবিড় অন্ধকারে রাস্তা ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না, কখনো বিপথেও চলে যাচ্ছেন। তার ওপর আবার পাহাড় থেকে ঘন ঘন ব্যাঘ্র গর্জ্জন শোনা যেতে লাগল। এবার তিনি সত্যই ভয় পেলেন এবং একমনে ভয়হারী গুরুদেবকে ডাকতে লাগলেন। সহসা পাহাড়ের উপর থেকে মধুর কণ্ঠে হরি-ধ্বনি শোনা গেল, মাস্টারদাদা চমকে দাঁড়ালেন—হাঁ, এ ধ্বনি সুস্পষ্ট গুরুদেবের কণ্ঠনিঃসৃত, নইলে এমন মধুর ধ্বনি আর কোথায় আছে? মাস্টারদাদার হৃদয় সাহসে ও ভরসায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। ঐ তো গুরুদেব রয়েছেন কাছেই—তবে আর ভয় কিসের? আশায়, আনন্দে তিনি বুক ফুলিয়ে চলতে লাগলেন এবং যতক্ষণ না আশ্রমের সন্নিকটবর্ত্তী হলেন, ততক্ষণই অদূরে সেই হরিধ্বনি শুনতে শুনতে অগ্রসর হলেন। আশ্রমে এসে দেখেন সেখানেই গুরুদেব তাঁর জন্যে দুয়ার সমুখে দাঁড়িয়ে মধুর হরিধ্বনি দিচ্ছেন। মাস্টারদাদা আকুল হয়ে গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণত হলেন। গুরুদেব বললেন, "বাবা, পথে কোনো ভয় পাওনি তো?" মাস্টারদাদা সজল কণ্ঠে বললেন, "ভয়হারী আপনি যে বরাবর হরিধ্বনি শুনিয়ে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন—।" গুরুদেব তাঁর জন্যে টাটকা গরম প্রসাদও তৈরী করিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। শিষ্যদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানলেন, গুরুদেব কোথাও যাননি,

আশ্রমেই ছিলেন। কিন্তু তাঁর একজন ভক্ত আসছে ব'লে তার জন্যে গরম প্রসাদ রান্না করিয়েছিলেন।

বৈদ্যবাটির রাজেনদাদা শ্রীগুরুচরণে আশ্রয়লাভের কিছুদিন পরেই যখন প্রথম গোমো তপোবনে গুরুদর্শনে যান, তখনকার অভিজ্ঞতা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করছি। ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই গুরুদেবের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছেন। গোমো যাবার ইচ্ছাও হচ্ছে, কিন্তু হাতে পয়সা নেই তখন। হঠাৎ এক ব্যক্তি কিছু টাকা তাঁকে দিয়ে গেল। ওই টাকা থেকে গুরুসেবার কিছু জিনিষ কিনে ওঁরা সস্ত্রীক গোমো তপোবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ওঁরা হঠাৎ যাত্রা করলেন, সুতরাং পূর্ব্বে কোনো পত্রাদি দিয়ে গুরুদেবকে জানানো সম্ভব হয়নি। গভীর রাত্রে গোমো স্টেশনে পৌঁছে কুলিদের মাথায় মোট চাপিয়ে দু'জনে আশ্রম অভিমুখে রওনা হলেন। সূচীভেদ্য অন্ধকার, জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। কুলিদের লক্ষ্য ক'রে তাঁরা অতি কষ্টে চলেছেন ওদের পিছু পিছু। ওঁর স্ত্রীর খালি পায়ে পাথরের কুচি ও কাঁটা বিঁধছে, এবড়ো খেবড়ো পাথরে কোথায় কখন পা দিচ্ছেন বুঝতে পারছেন না। তার ওপর সেই গভীর নির্জ্জনতায় ওঁদের ভয় হ'তে লাগল এই নির্জ্জনতা ও অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কুলিরা কিছু খারাপ করবে না তো? বিশেষতঃ দিদির খুবই কষ্ট হচ্ছে অন্ধকারে পা ফেলতে, কিছুই বুঝতে পারছেন না, একটা টর্চ্চও নেই সঙ্গে। মনে মনে আকুল হয়ে গুরুদেবকে ডাকছেন। এমন সময়ে ওঁদের বিস্মিত ও হতচকিত ক'রে কোথা থেকে একটা আলো এসে পথের উপরে প'ড়ে সামনের পথ আলোকিত ক'রে দিল। আরো আশ্চর্য্য, ওঁরা পথ চলতে চলতে বরাবরই সেই আলো পেলেন। একমনে গুরুদেবকে ডাকতে ডাকতে ওঁরা আশ্রমের সীমানার বহির্দ্বারে পৌঁছে দেখেন, সেই গভীর রাতে আশ্রমের কয়েকজন শিষ্য ওঁদের অভ্যর্থনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁরা পৌঁছতেই ওঁদের আদর ক'রে ভিতরে নিয়ে এলেন। ওঁরা ভিতরে এসে সবিস্ময়ে দেখেন মন্দির দুয়ারের সমুখে স্বয়ং গুরুদেব ওঁদের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁদের দেখেই গুরুদেব ওঁদের সাদরে কাছে ডেকে নিলেন। তারপর ওঁর স্ত্রীকে বললেন, "মা, পথে বড় ভয় করছিল, নয় মা? বড় অন্ধকার লাগছিল? তা, গুরুদেব তোমাদের আলো দিয়েছিলেন তো, মা? নির্ব্বিঘ্নে আসতে পেরেছ তো?" গুরুদেবের শ্রীমুখে এসব কথা শুনে ভক্তিতে, পুলকে ওঁদের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল। অশ্রুসজল চোখে ওঁরা কেবল বললেন, "আপনি এত দয়াল, প্রভু?" গুরুদেব তখন হাসতে হাসতে ভিতর থেকে সেই গভীর রাত্রে সদ্য পাক করা গরম গরম খিচুড়ি এনে ওঁদের খেতে দিয়ে বললেন, "খাও মা, খাও বাবা।" অন্তর্য্যামী প্রভু অন্তরে ওঁদের আগমন বার্ত্তা অবগত হয়ে ভক্তের আগে আগে এসেছেন পথ দেখিয়ে, অন্ধকার পথ আলোকিত করেছেন নিজ ব্রহ্মজ্যোতির আলোকে, অভ্যর্থনার

জন্মে বহির্দ্বারে লোক রেখে দিয়েছেন এবং সেবার জন্য গরম প্রসাদ তৈরী করিয়ে স্বয়ং দ্বারে এসে ভক্তকে ডেকে নিয়েছেন। স্বয়ং ভগবান কি এর চেয়ে বেশী করুণাময় ?

গোমো তপোবনে অন্ধকার রাত্রে আগমনরত শিষ্যদের নিয়ে এরকম এতঅজস্র ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে তার সংখ্যা নিরূপণ করাই দুরূহ, বর্ণনা তো দূরের কথা। এবার নিঃশঙ্ক আশ্রমে সংঘটিত ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনার কথা বিবৃত করছি। এটি উমাপতি ঘোষ দাদার মুখে শুনেছি। মেমারী স্টেশন থেকে নিঃশঙ্ক আশ্রমে আসতে হ'লে অনেকটা রাস্তা মাঠে মাঠে আসতে হয় এবং অপরিচিত লোকের পক্ষে রাস্তা ঠিক করা একরূপ অসম্ভবই বলা যায়। দু'জন ভক্ত আগন্তুক এভাবে আসতে আসতে পথ হারিয়ে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। এমন সময়ে গুরুদেব আশ্রমে নিজ আসনে বসেই হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "দু'জন নতুন লোক আশ্রমে আসছে। তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। তোমরা শীঘ্র দু'জনে গিয়ে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসো।" এরপর তিনি নিজ আসনঘরের দ্বার বন্ধ ক'রে ধ্যানমগ্ন হলেন। এদিকে সেই আগন্তুক দু'জন পথ হারিয়ে এদিক-ওদিক চাইছে, এমন সময় একটি সুন্দর কিশোর বালক তাদের বললে, "তোমরা কোথায় যাবে ?" ওরা সাধুবাবার আশ্রমের নাম করাতে বালকটি বললে, "আমিও সেখানে যাচ্ছি, এসো আমার সঙ্গে।" আগন্তুক দু'জন বালকটির পিছু-পিছু কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তারপর আর বালকটিকে কোথাও দেখতে পেল না। বালকটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ওরা অবাক হয়ে এই বিস্ময়কর ঘটনার কথা ভাবছে, এমন সময় আশ্রম থেকে গুরুদেব কর্তৃক প্রেরিত লোক দুটি ওদের দেখতে পেয়ে শুধালেন, "আপনারা কি সাধুবাবার আশ্রমে যাবেন ? সাধুবাবা আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন !" বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়—আগন্তুক ভক্তদ্বয় ভাবতে লাগলেন—সেই বালকবেশী পথ-প্রদর্শকই বা কে এবং হঠাৎ কোথায়ই বা সে মিলিয়ে গেল, আর কেমন ক'রেই বা তাদের আগমন বার্ত্তা জেনে সাধুবাবা এই দূত পাঠিয়ে দিলেন তাদের এগিয়ে নিতে ? এসব কথা সবিস্তারে আশ্রমবাসীদের জানালে আশ্রমের সেবকবৃন্দ হেসে উত্তর দিলেন, "আপনারা বিস্মিত হ'লেও আমরা এতে আদৌ আশ্চর্য্য কিছু দেখি না। এরূপ ঘটনা হামেশাই আশ্রমে ঘটে থাকে। আমাদের গুরুদেব সর্ব্বান্তর্য্যামী। আপনাদের আগমনবার্ত্তা আগে থেকেই জেনেছেন তিনি এবং লোকও পাঠিয়েছেন তাই। শুধু যে জানতে পেরেছেন অন্তরে তাই নয়, মাঠের মধ্যে পথহারা অবস্থায় আপনাদের স্পষ্ট দেখতেও পেয়েছেন তিনি। তারপর লোক পাঠিয়েও যখন বুঝলেন তারা আপনাদের ধরতে পারবে না, তখন নিজেই বালক-বেশে আবির্ভাব মূর্ত্তিতে আপনাদের দেখা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন,

যে পর্যন্ত না তাঁর প্রেরিত লোক ছুটির কাছাকাছি হয়েছেন। তারপরই অদৃশ্য হয়েছেন। এরূপ ঘটনা কি ছুটি চারটি? বহু বহু বার এরকম ঘটনা ঘটেছে।"

গোমো আশ্রমের আর একটি ঘটনার কথা বলি। এটি নলিনাক্ষ ব্যানার্জী দাদার মুখে শোনা। নলিনাক্ষ দাদা কোলিয়ারিতে কাজ করতেন। রায়বাহাদুর হরিপ্রসাদ ব্যানার্জীর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন তিনি, আরো কিছু কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ের ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। ফলে তিনি দিনের বেলা অবসর পেতেন না। গুরুদেবের কাছে আসতেন রাত্রে এবং না জানিয়ে, হঠাৎ। কারণ রায়বাহাদুরের কখন কী খেয়াল হবে তার কিছুই ঠিক নেই। এমনি এক রাত্রি দ্বিপ্রহরে নলিনাক্ষ বাবু হঠাৎ আশ্রমে এসে উপস্থিত। তখন আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই সুখনিদ্রায় সুষুপ্ত। আশ্রমে প্রবেশ ক'রেই নলিনাক্ষবাবু চারদিকে চেয়ে ভাবছেন—তাই তো, আশ্রমের সবাই দেখছি ঘুমিয়ে পড়েছে, গুরুদেবও এত রাতে নিশ্চয়ই এখন বিশ্রাম করছেন। তাঁকে বিরক্ত করা তো উচিত নয়ই, এমনকি শিষ্যদেরও কাউকে এ সময় জাগানো ঠিক হবে না। বারান্দায় গিয়ে এখন শুয়ে পড়ব, তারপর ভোরে উঠে যা' হয় তাই হবে। এই রকম ভাবতে ভাবতে তিনি আশ্রমের বারান্দায় এসে মন্দির দুয়ার সমুখে প্রণাম করছেন,—হঠাৎ শুনলেন দুয়ারে খুট্ ক'রে শব্দ হ'ল। তারপর উঠে বসতেই—অবাক্ কাণ্ড, দুয়ার খুলে স্বয়ং গুরুদেব হাতে একটি থালা ভর্তি গরম খিচুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—হতচকিত, বিস্ময়াভিভূত নলিনাক্ষবাবুর দিকে করুণাঘন নয়নে দৃষ্টিপাত ক'রে মধুরকণ্ঠে বললেন, "তোমারই জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি, বাবা। নাও, এই গরম গরম খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে নাও।" সেই প্রবীণ ভক্ত নলিনাক্ষদাদার দুই চোখ ছলছল ক'রে উঠল, বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে দুই হাতে গরম খিচুড়ির থালা নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে মনে মনে বললেন: হে প্রভু, হে অন্তর্যামিন্, হে ভক্তবৎসল, হে করুণাময়—ভক্তের প্রতি তোমার একী সজাগ দৃষ্টি, একী অসীম স্নেহ, একী অপার করুণা! নিজ জননীও তার সন্তানের প্রতি কি এত স্নেহ, এত ভালোবাসা দেখাতে পারে? সজলচক্ষে তখনি সে-প্রসাদ গ্রহণ করতে করতে নলিনাক্ষ দাদা ভাবতে লাগলেন, যে বলে গুরুদেবের মহিমা সে সব জানে, সে জানুক—আমি কিন্তু আজ জানলাম তাঁর মহিমা, তাঁর করুণা, তাঁর স্নেহের কোনো সীমা নেই।

একেবারে অনুরূপ ঘটনার বিবরণ শুনেছি শ্রদ্ধেয় মাস্টারদাদার মুখে তাঁর বড় সম্বন্ধীর ক্ষেত্রে। কান্তিদাদা এবং আরো অনেক ভক্ত ও শিষ্যের মুখে আরো অনেক লীলার কথা শুনেছি যেখানে তাঁর ভক্তবৎসলতা, তাঁর অন্তর্যামিত্ব ও অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হয়েছে। বাহুল্যবোধে সেগুলির বর্ণনা দিলাম না।

শুধু শিষ্যদের আগমন নয়, তাদের গৃহে গমনের পরও তাদের যেসব অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা, সেগুলির প্রতিও গুরুদেবের সজাগ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এমনিতে তো বিদায়ের সময় শিষ্যদের প্রচুর হরিলুট মিষ্টান্ন, এমনকি চাল, ডাল, তরিতরকারী আদি সাজিয়ে বেঁধে দিয়ে বলতেন, "বাবা, আপনি আমার গুরুদেব। রাস্তায় যদি কেউ বলে এত জিনিষপত্র নিয়ে কোথা থেকে আসছ, তাহলে বলবেন যে পাতালের পাগলা একটা শিষ্য আছে আমার, সেই শিষ্যবাড়ি থেকে আসছি।" কলকাতা বাগবাজারের মদনদাদা গোমো তপোবনে এসেছিলেন গুরুদর্শনে। রাত্রে দেরাদুন এক্সপ্রেসে তিনি কলকাতা ফিরবেন। বিদায় কালে গুরুদেব প্রচুর জিনিষপত্র বেঁধে দিয়েছেন; যতই তিনি বলেন, আর দিতে হবে না, ততই গুরুদেব এটা-ওটা দিতে থাকেন। অবশেষে গুরুদেব এক বোতল খাঁটি সরিষার তেল এনে বললেন, "বাবা এই খাঁটি সরিষার তেলের বোতলটি নিয়ে যাও, এমন জিনিষ কলকাতায় পাবে না।" এবারে মদনদাদার ধৈর্য্যচ্যুতি হলো, একটু বিরক্ত কণ্ঠেই বললেন, "আজ্ঞে না, তেলের বোতল আর নিতে পারব না। এত জিনিষ দিয়েছেন তাই কেমন ক'রে নিয়ে যাব ভাবছি।" গুরুদেব তবু আর একবার অনুরোধ করলেন, "নেবে না, বাবা?" উনি সাফ জবাব দিয়ে বললেন, "আজ্ঞে না।" এই ব'লে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। ট্রেন সেদিন একটু বিলম্বেই পৌঁছেছিল। বাগবাজারের বাসায় পৌঁছেই বললেন, "দিদি, রান্নাবান্না সব হয়েছে তো? অফিসের আর দেরী নেই কিন্তু। এখনি খেতে বসব?" দিদি ওঁকে অবাক ক'রে দিয়ে বললেন, "রান্না তো চাপাতেই পারিনি; ঘরে এক ফোঁটাও তেল নেই যে।" দিদির কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মদনদাদা দাঁড়িয়ে রইলেন। রান্নার তেল ঘরে নেই এক ফোঁটাও!! তাঁর দুই চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। তেলের বোতল নিয়ে দোকানে যেতে যেতে ভাবলেন, হে অন্তর্য্যামিন্, হে প্রভু—একী তোমার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আমার রান্নাঘরের ভাণ্ডারেও তোমার সজাগ দৃষ্টি—আমার এই অসুবিধা হবে ব'লে সেটুকুও মোচনের উদ্দেশ্যে তেলের বোতল দেবার জন্য তোমার এত আগ্রহ। এ কী করুণা, এ কী স্নেহ, এ কী ভক্ত বাৎসল্য! জীবাধম আমি, তোমার অপার মহিমার কীই বা বুঝব?

দূর-দৃষ্টির আর একটি অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন—গুরুদেব আশ্রমে তাঁর নিজ আসনে বসেই দূরস্থ ট্রেনের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করতেন। এর সঙ্গে তিনি ইচ্ছামতো ট্রেনের স্থিতি গতি নিয়ন্ত্রণও করতেন। এরূপ দৃষ্টান্তও অসংখ্য রয়েছে। মাত্র দুটির উল্লেখ করছি। স্থান—গোমো তপোবন, কাল—নিদাঘতপ্ত বৈশাখের দ্বিপ্রহর। ঠিক এই সময়ে গোমো স্টেশন থেকে বি. এন. আর-এর একটি ট্রেন ছাড়ে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে গোমো স্টেশনেই উক্ত ট্রেনের যাত্রা শুরু এবং সেটা ব্রিটিশ আমল।

সুতরাং ওখান থেকে ট্রেন ছাড়ার বিলম্ব হওয়া কল্পনাই করা যায় না। গুরুদেবের এক প্রিয় ভক্ত শিষ্য ওই দিন ওই ট্রেনে যাত্রা করেছেন। ট্রেন ছাড়তে তখন আর পাঁচ-সাত মিনিট দেরী আছে, এমন সময় গুরুদেব ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠলেন, "ঐ যাঃ, এই আমটি বাবাকে দিতে ভুলে গেছি। বাবা, তোমরা কেউ স্টেশনে গিয়ে আমটা বাবাকে দিয়ে এসো। নইলে আমি বড় দুঃখ পাব।" গোমো স্টেশন আশ্রম থেকে প্রায় আধ ঘণ্টার পথ—সময় মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট; কাজেই ছুটে গিয়েও কেউই ট্রেন ছাড়ার পূর্ব্বে স্টেশনে পৌছাতে পারবে না,—এটা সকলেই বুঝলেন, কিন্তু সামনা-সামনি গুরুদেবকে প্রতিবাদ করতে পারলেন না। কাজেই সকলেই নীরবে বসে রইলেন। অবশেষে বড়দাদা (সুরেন নন্দী দাদা) বললেন, "বাবা, ট্রেন ছাড়তে আর পাঁচ মিনিট বাকি, এখন ছুটে গিয়েও কেউ ট্রেন ধরতে পারবে না। সুতরাং এখন আর লোক পাঠিয়ে কোনো ফল হবে না।" সব শুনে গুরুদেব একবার মাথাটি নিচু করলেন। তারপরই সহসা আবেগভরে ব'লে উঠলেন, "বাবা, কেউ নেই এখানে যে স্টেশনে আমটা পৌছে দিতে পারে?" গুরুদেবের এমন আবেগপূর্ণ আবেদন শুনে একজন ভক্তশিষ্য উঠে এগিয়ে এসে বললেন, "আজ্ঞে, আমি যাব; দিন আমায়।" শিষ্যটি আম নিয়ে ছুটলেন। যতই তিনি ছুটুন না কেন, সেই অগ্নিসম রৌদ্রতাপের মধ্যে তিনি কিছুতেই পনেরো-বিশ মিনিটের আগে স্টেশনে পৌছাতে পারেন নি। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি প্ল্যাটফর্মে ঢুকে সবিস্ময়ে দেখলেন যে ট্রেনটি তখনো দাঁড়িয়ে। যাঁকে আমটি দেওয়ার কথা সেই শিষ্যটিও জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকেই তাকিয়েছিলেন। উভয়ে উভয়কেই দেখতে পেলেন। গুরুদেব প্রেরিত শিষ্যটি ওঁকে আমটি দিয়ে বললেন, "গুরুদেব পাঠিয়ে দিলেন।" তিনি আমটি মাথায় ঠেকিয়ে গ্রহণ করা মাত্র ট্রেন ছেড়ে দিল। এক মিনিটও আর দাঁড়াল না। শিষ্যটির স্টেশন পর্য্যন্ত এই ছুটে আসা ও ট্রেন ছাড়ার মধ্যে এরূপ নির্ভুল সময়ের হিসাব কে ঠিক ক'রে রেখেছিল, কে ট্রেনকে ঠিক ঐটুকু সময়ের জন্যেই দেরী ক'রে ছাড়তে বাধ্য করেছিল—এর কোনো জবাব বিজ্ঞানে নেই।

দ্বিতীয় ঘটনাটির স্থান মেমারী স্টেশন। ওই স্টেশন থেকে আমাদের নিঃশঙ্ক আশ্রম প্রায় দেড় ঘণ্টার হাঁটাপথ। ঘটনাটি শ্রদ্ধেয় মাস্টার দাদার মুখে শোনা। তখন তিনি নিঃশঙ্ক আশ্রমে গেছেন গুরু-দর্শনে। গুরুদেব একদিন হঠাৎ তাঁকে বললেন, "বাবা, কলকাতায় মা খুব ভাবছে তোমার জন্যে; এখনি এই ট্রেনে তুমি যাত্রা কর।" মাস্টার দাদা ঘড়ি দেখে শুধু একবার মাত্র বললেন, "আজ্ঞে, এই ট্রেন ছাড়তে আর তো আধ ঘণ্টাটাক দেরী, কিন্তু—।" গুরুদেব ওঁকে থামিয়ে বললেন, "'জয়গুরু' ব'লে যাত্রা করো তো।" মাস্টারদাদা আর দ্বিরুক্তি না ক'রে হরিলুট ইত্যাদি বেঁধে নিয়ে

যাত্রা করলেন। মাস্টারদাদা স্থূলকায় ছিলেন, বেশী জোরে হাঁটতে পারতেন না, কাজেই অনেকটা গজেন্দ্রগতিতেই তিনি চলতে লাগলেন। মনে মনে ভাবছেন, ট্রেন পাব না সে তো জানা কথা। গুরুদেবের আদেশে শুধু চলেছি, সুতরাং তাড়াহুড়া করার কোনো অর্থ হয় না। মধ্যপথে আবার তাঁর পায়খানার বেগ হলো; তিনি থেমে পুঁটুলি আদি রাস্তার ধারে রেখে, কাপড় ছেড়ে গামছা পরলেন, তারপর নির্জ্জন জায়গা খুঁজে পায়খানায় বসলেন। শৌচান্তে পুষ্করিণীতে নেমে গামছা কেচে শুদ্ধ হয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রে আবার সেই ধীরপদবিক্ষেপে চলতে শুরু করলেন। তিনি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্নচিত্তে চলেছেন, বিন্দুমাত্র তাড়া নেই; কারণ তিনি নিশ্চিত যে এ ট্রেন তিনি পাবেন না। ঘণ্টা দেড়েক পরে তিনি স্টেশনের কাছে এসে পৌঁছালেন; এমন সময় দেখা গেল একটি লোক ছুটতে ছুটতে তাঁর দিকে আসছে। লোকটি তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু সে তাঁর কাছেই এসে থামল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "মশায় কি হাওড়া যাবেন?" মাস্টারদাদা তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ—কিন্তু কেন বলুন তো?" লোকটি বললে,—"আজ্ঞে, একটি week-end ticket আছে হাওড়ার, আপনি যদি দয়া ক'রে নেন।" এই ব'লে সে একটি week-end ticket-এর অর্দ্ধেক অংশ মাস্টারদাদার হাতে দিল। মাস্টারদাদা টিকিটটি ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে ঠিক আছে দেখে বললেন, "কত দিতে হবে আপনাকে?" সে বললে, "যা' দাম হয় তাই দেবেন।" মাস্টারদাদা পকেট থেকে পয়সা বার ক'রে তাকে দিলেন। বলা বাহুল্য, এতে তাঁর আর্থিক দিক দিয়ে কিছু লাভ তো হ'লই, উপরন্তু টিকিট কাটবার জন্যে তাঁকে আর টিকিট কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল না। মাস্টারদাদা বেশ বিস্মিত হলেন এবং প্ল্যাটফর্মে ঢুকে আরও বিস্ময়ে দেখলেন একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে যে। "এটা কি কলকাতা যাবে?" তিনি ট্রেনের এক যাত্রীকে শুধাতেই সে বললে, "হ্যাঁ, মশায়, আপনি উঠুন—আপনার জন্যেই যে ট্রেন ছাড়ছে না। শীঘ্র উঠুন"—এই ব'লে সেই যাত্রীটি মাস্টারদাদার হাত ধ'রে তাঁকে ট্রেনের কামরায় উঠিয়ে নিল। ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

আপনারা ভেবে দেখুন, গুরুদেব কীভাবে মাস্টারদাদার গতিকে ও ট্রেন ছাড়ার সময়কে নিখুঁত ও নির্ভুল ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তিনি বরাবর উভয়ের প্রতি শুধু দৃষ্টিই রাখেন নি, উভয়ের স্থিতি-গতিকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণও করেছেন। মাস্টারদাদা এসে ট্রেনে না ওঠা পর্য্যন্ত তিনি ট্রেনকে ছাড়তে দেননি এবং তিনি ট্রেনে ওঠা মাত্র এক সেকেণ্ডও বিলম্ব করাননি ট্রেন ছাড়তে। ঘটনা দুটি আগাগোড়া নাটকীয়। কিন্তু এরূপ নিখুঁত নাটকীয় ঘটনা, দুটি চারটি নয়, অসংখ্য ঘটেছে গুরুদেবের লীলায়।

(১৩) বাক্-সিদ্ধিঃ

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলেছেন, "মৎপরায়ণ ব্যক্তির আজ্ঞা আমার আজ্ঞার ন্যায় কোথাও প্রতিহত হয়না", "কৃতশ্চিন্ন ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম"—১১।১৫।২৭, অর্থাৎ তিনি বাক-সিদ্ধি লাভ করেন। এই 'অপ্রতিহতাজ্ঞা' বা 'বাক্-সিদ্ধি'র বহু বহু দৃষ্টান্ত আমরা গুরুদেবের বাক্য বা আজ্ঞায় পেয়েছি। বেশীর ভাগ দর্শনার্থীই তাঁর কাছে আসত কোনো সমস্যা সমাধানের প্রার্থী হয়ে এবং সেই সমাধানের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর অমোঘ 'বাক্য' প্রার্থনা করত। তারা জানত তিনি যে 'বাক্য' দেবেন, তার কখনও খণ্ডন হবে না, সে 'বাক্যে' প্রতিটি শব্দ সফল হবেই; এবং প্রকৃতপক্ষে হ'তও তাই। এই বাক্-সিদ্ধি ছিল তাঁর স্বাভাবিক গুণ এবং এরূপ 'বাক্য'-দানও প্রায় তাঁর দৈনন্দিন কার্যই ছিল, সুতরাং তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যহই এরূপ ঘটনা ঘটত। তার মধ্যে আমি একটি চমকপ্রদ ও প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা বলছি। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত দাদা একদিন গুরুদেবের কাছে বিদায় নিচ্ছেন। বিদায় নেবার সময় গুরুদেব তাঁকে হরিলুট দিচ্ছেন। অশ্বিনীবাবু যেখানে যাবেন, সেখানে আরো কিছু ভক্ত আছেন, তাঁদের জন্যও হরিলুট নিয়ে যেতে হবে। এরকম হরিলুট বিতরণের জন্য অনেককেই আদেশ করতেন গুরুদেব। কাকে কী হরিলুট ক'টি ক'রে দিতে হবে তা' একেবারে ফর্দ্দ ক'রে দিতেন। আমিও এরূপভাবে হরিলুট বিতরণের জন্য নিয়ে গেছি অনেকবার, কাজেই এটা গুরুদেবের আশ্রমের একটা সাধারণ ব্যাপারই। কিন্তু অশ্বিনী দাদার ক্ষেত্রে এটা অ-সাধারণ হয়ে উঠল—কাঁঠালের কোয়া-বণ্টনের ব্যাপারে। গুরুদেব একটি আস্ত কাঁঠাল দিলেন এবং বললেন, "এই কাঁঠালটি প্রথমে অবিনাশ ভৌমিক বাবার বাড়িতে নিয়ে যাবে; এবং সেখানেই কাঁঠালটি ভেঙে প্রথমে অবিনাশ বাবাকে (তাঁর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রোয়া) দেবে, কারণ অপর জায়গায় ভাঙা কাঁঠাল তিনি নেবেন না।" তারপর কোন্ ভক্তকে ঠিক ক'টি ক'রে কাঁঠালের রোয়া দিতে হবে তা' গুরুদেব ব'লে গেলেন এবং অশ্বিনীদাদা কাগজে লিখে নিলেন। গড়গড় ক'রে ব'লে গেলেন গুরুদেব, একটুও ভেবে চিন্তে বললেন না। লেখা শেষ হ'লেই গুরুদেব আদেশ করলেন, "যাও, যাও, বাবা। আর একটুও দেরী ক'রোনা।" অশ্বিনীদাদাও কাঁঠাল নিয়ে বেরিয়ে প'ড়ে ট্রেনে উঠলেন। তারপর যথা সময়ে উল্টাডিঙ্গিতে অবিনাশ ভৌমিকের বাড়ীতে পৌঁছে সেখানে কাঁঠালটি ভাঙলেন এবং প্রত্যেক ভক্তকে বণ্টন করলেন। অতি আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে সকলকে ঠিকমত বণ্টন করা হ'লে আর একটিও রোয়া অবশিষ্ট থাকল না, এবং কারও ভাগে একটিও কম পড়ল না—ফর্দ্দ মাফিক

একেবারে ঠিক ঠিক বন্টন হ'ল। দেখেতো সবাই একেবারে হতভম্ব। গুরুদেব কি X-ray চক্ষু দিয়ে কাঁঠালের ভিতরে য়োয়াগুলি দেখেছিলেন এবং একটি একটি ক'রে গুনে রেখেছিলেন? বলুন, এর কী ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে দেবে? অথচ গুরুদেব ভেবে চিন্তেও কিছু বলেন নি। লীলাময় প্রভু খেলাচ্ছলে যা' মনে হয়েছে গড়গড় ক'রে তাই ব'লে গেছেন। আর লীলার সহায়কারিনী অঘটন-ঘটন পটীয়সী মা যোগমায়া তাঁর বাক্য সিদ্ধ ক'রে লীলাটি নিখুঁত ক'রে তুলেছেন এবং ভগবদ্বাক্য প্রমাণ করেছেন—"তস্য চাজ্ঞা যথা মম"।

মুস্কিল-আসান, শান্তিদান, আনন্দদান

মায়াবদ্ধ জীবমাত্রেই কোনো-না কোনো সমস্যায় জর্জ্জরিত। সুতরাং কোনো সময়েই কারো মনে পূর্ণ শান্তি নেই, আর শান্তি না থাকলে নির্ম্মল বা প্রকৃত আনন্দও থাকতে পারেনা। এর কোনো সমাধান কোনো মানুষই কখনো খুঁজে বার করতে পারেনা, অথবা এমন কোনো স্থান বা ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারে না যেখানে গমন করা মাত্র এগুলি লাভ করা যায়। কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হ'তে দেখলাম আমরা আমাদের জীবনে। কোথায় সেই স্থান এবং কোথায় সেই ব্যক্তি? সেই পরম প্রকাম্য পুরুষ হচ্ছেন শ্রীশ্রী পাতালপ্রভু, সেই বহুজন বাঞ্ছিত স্থান তাঁর পবিত্র আশ্রম। এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এই অধম লেখক স্বয়ং এবং আরো অসংখ্য, অগণিত ত্রিতাপ জ্বালা জর্জ্জরিত, অশান্তি প্রপীড়িত, নৈরাশ্য-নিমজ্জিত, নিরানন্দ-নরনারীবৃন্দ। এর মধ্যে যে কেউ 'আত্মসমর্পণে'র ভাব নিয়ে পাতালপ্রভুর শ্রীচরণে শরণ নিয়েছে, তারই মুস্কিল-আসান ও অশান্তি-নিরসন হয়েছে এবং পরিণামে বিমল আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হয়েছে। যে যতটুকু আত্মসমর্পণ করতে পেরেছে, তার ঠিক তদনুরূপই এই সব সমস্যার সমাধান হয়ে ততটুকু অশান্তি নিরাকরণ ও আনন্দলাভ হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর সমীপস্থ থেকে তাঁর সেবাকার্য্য ক'রে তাঁর তুষ্টি বিধানের দ্বারা। কর্ম অনুরোধে তাঁর শ্রীচরণ থেকে দূরে স'রে গেলে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভাষায় তাঁর field of force-এর আওতার বাইরে চলে গেলে এ প্রভাব আর থাকেনা—এর প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব প্রমাণ আমি বারে বারে পেয়েছি। এ থেকে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি এক পরম শান্তি ও নির্ম্মল নিত্য-আনন্দের চরম ঘনীভূত সত্তা, যার প্রচণ্ড শক্তিশালী 'field'-এর আওতায় এসে জীব আত্মসমর্পণ করতে পারলে, সেই field-এর প্রভাব কিছু-না কিছু পেতে বাধ্য। অবশ্য এর ফলাফল সেই জীবের আত্মসমর্পণ-ক্ষমতা, অর্থাৎ তার 'প্রারব্ধ' কর্ম মালিন্যের পরিমাণের উপরই নির্ভরশীল হবে; কিন্তু তথাপি এ দেখা গেছে যে বাস্তব ক্ষেত্রে

অধিকাংশ জীবই কম বেশী কিছু-না কিছু এই অবশ্যম্ভাবী ও অসম্ভব প্রভাব পেয়েছেই—এবং প্রত্যেকেই মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকারও করেছে—যে মুস্কিল-আসান, শান্তি ও আনন্দের একমাত্র স্থান হ'ল গুহাবাসী পাতালপ্রভুর শান্তিময় শ্রীচরণযুগল।

অপ্রাকৃত ভাবের উদয়ীকরণ

যোগমার্গে অষ্টাদশ সিদ্ধিলাভ ক'রে যোগী স্বয়ং প্রভূত ক্ষমতা অর্জ্জন করেন সত্য, কিন্তু অপরের সমস্যা সমাধান, অপরকে শান্তি ও আনন্দদানের শক্তি তাঁর থাকেনা। আর অপ্রাকৃত আনন্দময় ভাবরাজ্যে প্রবেশ করানোর ক্ষমতা তো আরো বহুদূরের বস্তু। যে ভক্তসাধক ভক্তিমার্গে সাধনা ক'রে তার চরম সার্থকতা লাভ করেছেন, অর্থাৎ যাঁর সুদুর্লভ 'কৃষ্ণপ্রেম' লাভ হয়ে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাপ্রাপ্তি হয়েছে, একমাত্র তিনিই এসব অসাধ্য সাধন ও অসম্ভব সম্ভব করতে পারেন। কিন্তু এ 'বস্তু'র সুদুর্লভতা সম্বন্ধে কারো বিশেষ জ্ঞান আছে কি? হাটে-বাজারে, যন্ত্রতন্ত্রে, বেশভূষার বাহ্যাড়ম্বরে, বিদ্যা-বাগ্মিতার বহ্বাস্ফোটে, প্রচার কার্য্যের সুকৌশলে, এমনকি যোগ সিদ্ধির ভোজবাজীর আড়ালে এ দুর্লভ 'রত্ন' লুক্কায়িত থাকে কি? শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বাক্য একবার স্মরণ করুন: "ধর্মচারি মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ, কোটি-কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত, কোটি মুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণ ভক্ত।"—২।১৯, আর সেই ভাগবদ্বাক্য "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ, সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।"—৬।১৪.৫ সেই 'সুদুর্লভ প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ' একজনকে ভাগ্যক্রমে ধরণীদেবী স্বীয় অঙ্কে লাভ ক'রে ধন্যা হয়েছিলেন, সেই 'সুদুর্লভ' একটি রত্ন ছিলেন শ্রীশ্রীপাতালদেব। সকলেই জানেন "মহৎকৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি নয়, কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।" —চৈঃ চঃ ২।২২, আরও "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ"—ঐ, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ"—১১।২০.৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব বলেছেন "কেনাপি পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্‌ভক্তসঙ্গ তৎকৃপাজাত মঙ্গলোদয়েন" অর্থাৎ পরম স্বতন্ত্র ভগবৎভক্তসঙ্গ কৃপায় যে মঙ্গলের উদয় হয়, তাতেই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ সম্ভব, এবং অপ্রাকৃত ভাবের আবির্ভাব হওয়ার আশা থাকে। সেই সুদুর্লভ রত্ন, সেই পরম স্বতন্ত্র ভগবৎ ভক্ত শ্রীশ্রীপাতালদেবের দুর্লভসঙ্গ ও সেবাদ্বারা যে ভাগ্যবানগণ তাঁর যৎকিঞ্চিৎ কৃপালাভ করেছেন তাঁরাই এই অপ্রাকৃতভাব রাজ্যে প্রবেশের দুর্লভ সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। তার মধ্যে এই অধম শ্রীচরণাশ্রিত দীন দাস একজন হবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে নিজ জীবনকে অতি ধন্য জ্ঞান করেছে। শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর কৃপালব্ধ সেই সব অপ্রাকৃত ভাব রাজ্যের কিছু কিছু বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করার ক্ষীণ ও অক্ষম প্রয়াস করা

হয়েছে; কিন্তু "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ যৎকৃপা"—সেই কৃপাম্বুধি পাতালপ্রভুর অসীম করুণা রাশির এক বিন্দুর মহিমাও কি বর্ণনা করতে পেরেছি? তবু বারবার মুক্তকণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে, সরবে ঘোষণা করব, "পেয়েছি, পেয়েছি—যা' পেয়েছি তা' কেউ পায় না, যা' পেয়েছি তার তুলনা নেই। যা' পেয়েছি তা' কোনো জন্মে ভুলবার নয়, এবং সে সবই সেই দুর্গম পাহাড়চারী, বিবিক্তবনবাসী, সেই শ্বাপদসহচর সেই গহন গোপন গিরিগুহাশ্রয়ী, সেই প্রচ্ছন্ন-পাগল, কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদ, মহাবাতুল শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর কৃপা-কণিকার মহামহিমায়।"

(১৪) আবির্ভাব-মূর্ত্তিতে প্রকাশ :

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হয়েছে যে অপরের সমস্যা-সমাধান, দুঃখ-নিবৃত্তি এবং শান্তি ও আনন্দদান—সকল সিদ্ধ সাধকের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ এসব সমস্যা ও তজ্জন্য দুঃখ মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশজনিত, এই "মনোব্যসঙ্গ" বা মনের মায়াভি-নিবেশ একমাত্র "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি", অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত সিদ্ধ সাধুগণই ছিন্ন করতে সমর্থ, এবং এই সাধুমহাত্মগণ "ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থাঃ", অর্থাৎ শ্রীভগবৎসেবাকেই তাঁরা পুরুষার্থ ব'লে মনে করেন। এ সকল উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২৬২৬, ৫।৫।২)। ঐ ভাগবতই বলছেন, অপ্রাকৃতভাবের উদয় হ'তে পারে একমাত্র এইরূপ সিদ্ধ কৃষ্ণভক্তসঙ্গ, সেবা ও তজ্জাত কৃপা দ্বারা, "সতাং প্রসঙ্গাৎ"—৩।২৫।২৪ এই শ্লোকে। স্মরণ রাখতে হবে এই সকল সিদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণের ভক্তিসাধনা "অহৈতুকী", "অব্যবহিতা" এবং কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী; তাঁদের সাধনা "পরমধর্ম্মে"'র, যে ধর্ম "প্রোজ্ঝিত কৈতব", অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার স্বসুখভোগ বাসনা, অষ্টাদশ সিদ্ধি ও চতুর্ব্বিধ মুক্তি কামনা বর্জ্জিত। সুতরাং যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে যাঁরা অষ্টাদশ সিদ্ধিলাভ করেছেন, বা জ্ঞানমার্গের সাধনায় মুক্তিলাভ করেছেন, সেই সকল "কৈতব"-ধর্ম্ম সাধকদের কেহই এ ক্ষমতা লাভ করতে পারেন না। তাঁরা নিজের সকল দুঃখের নিবৃত্তি করতে পারেন, নিজে পরম সুখ, চরম ঐশ্বর্য্য, অলৌকিক ক্ষমতাসমূহ অর্জ্জন ক'রে বিশ্ববাসীকে চমক লাগিয়ে দিতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রভুত্বও করতে পারেন, কিন্তু অপরের কিছুই করতে পারেন না। তাঁদের সব সিদ্ধি নিজের সুখের জন্য, ভগবৎসেবা সুখের নিমিত্ত নয়; সুতরাং আত্মকেন্দ্রিক এই কৈতব ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করলেও, পরের দুঃখদূর করার প্রবৃত্তিও জন্মায় না এবং সে ক্ষমতাও লাভ হয় না। সে শক্তি আছে একমাত্র সর্ব্বপ্রকারে আত্মসুখসন্ধানশূন্য কৃষ্ণ-সেবাবাসনাময় নিষ্কিঞ্চন সিদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণের।

তবে এইরূপ সিদ্ধ ভক্তগণের আচরণেও যে সর্বপ্রকার অলৌকিক শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখা যায়, তা' সিদ্ধযোগীগণের অষ্টাদশ সিদ্ধির ইচ্ছাকৃত প্রয়োগের মত প্রতীয়মান হ'লেও, বাস্তবিক পক্ষে আদৌ তা' নয়। ভগবৎ সেবার জন্য অথবা ভক্তবাৎসল্য বা ভক্তের প্রতি করুণা, অথবা শিষ্যের সাধন পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁদের ইচ্ছা হ'লে, তাঁদের সেই সেই বাসনাজাত লীলার পরিপূর্ণ পুষ্টি সাধনের জন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি মা যোগমায়াই সেই সব অচিন্ত্য ও অলৌকিক লীলার বিস্তার করেন। এমনকি স্বয়ং ভগবানও যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর লৌকিক লীলার পুষ্টির জন্য এই যোগমায়া শক্তিই স্বয়ং ভগবানের ভগবত্তা, সর্বজ্ঞতা ও সর্ব-শক্তিমত্তা আবৃত ক'রে রাখেন এবং নানা অলৌকিক ও অসম্ভব লীলা প্রদর্শন করান।

ভক্তবৎসলতা গুণে গুণী সিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত কখনো কখনো ভক্তের প্রতি করুণা প্রদর্শন, অথবা ভক্তপরীক্ষণের উদ্দেশ্যে দূরস্থ ভক্তগণের সম্মুখে আবির্ভূত হ'তে ইচ্ছা প্রকাশ করলে মা যোগমায়া কখনো তাঁর নিজ প্রকাশমূর্ত্তি, কখনো অন্য মনুষ্য বা ব্যাঘ্রাদি পশুমূর্ত্তি প্রকট করেন। এই আবির্ভাব অবিকল অষ্টাদশসিদ্ধির 'মনোজব', অর্থাৎ মনের মত দ্রুতগতিতে দেহকে চালানো, এবং 'কামরূপতা', অর্থাৎ অভিলষিত যে কোনো প্রাণীর রূপধারণ করার মত প্রতীয়মান হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি "মনোময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনুবায়ুনা, মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ" ১১।১৫।২১ স্মরণীয়। এটি অবশ্য অষ্টাদশ সিদ্ধিরই একটি সিদ্ধি। কিন্তু সিদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণের লীলায় অনুরূপ অলৌকিকতারই প্রকাশ হয়ে থাকে। তারই কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

রাজেনদাদা এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এটি তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি। বৈদ্যবাটির প্রখ্যাত রাজেনদাদা কীভাবে গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হলেন, তার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর দীক্ষা গ্রহণের কিছুদিন পরেই গুরুদেব বৈদ্যবাটি থেকে গোমো তপোবনে চলে গেলেন! রাজেনদাদা এক জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে বনপথের সরু গলি দিয়ে চলেছেন। কিছুদূর চলেছেন তিনি, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন—একী আশ্চর্য্য! গুরুদেব, স্বয়ং গুরুদেব যে সম্মুখে দাঁড়িয়ে! সেই চট্টপরিহিত গুরুদেব দু'হাত বাড়িয়ে পথ আগলে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! বিদ্যুৎ চমকের মত রাজেনদাদার একবার মনে হ'ল, গুরুদেব তো এখন গোমো তপোবন আশ্রমে, তবে এখন বৈদ্যবাটিতে এলেন কেমন ক'রে? বিশেষ ক'রে এই রাত্রিকালে, এই নির্জ্জন বনপথে? রাজেনদাদার মনের সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে সুধামধুর কণ্ঠে বললেন গুরুদেব, "কোথায় যাচ্ছ, রাজেন বাবা?...যাও, ঘরে ফিরে যাও।" রাজেনদাদা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলেন,—তা' হ'লে তো আর কোনো ভুল নেই, স্বয়ং গুরুদেবই তো। এই ভেবে কাঁপতে কাঁপতে

বললেন, "আর যাবনা, প্রভু— এই ফিরে যাচ্ছি।" এই ব'লে তিনি গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। প্রণাম ক'রে উঠে দেখেন গুরুদেব আর কোথাও নেই। তিনি যথাস্থানে অন্তর্হিত হয়েছেন। রাজেনদাদা বুঝলেন গুরুদেব যেখানে থাকুন না কেন, তাঁর শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণ কোথায় কী করছেন, সব তিনি জানতে পারেন এবং ইচ্ছা হ'লে এইভাবে তার সাক্ষাতে আবির্ভূত হয়ে সাক্ষাৎভাবে আদেশ নির্দ্দেশও দিতে পারেন। এমন গুরু যিনি, যিনি সর্ব্বদা শরণাগত দাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তার ভাল মন্দ দেখেন, শত শত ক্রোশ দূরে থাকলেও, প্রয়োজন হ'লে যিনি দর্শন দেন ও কথা বলেন—এমন ভক্তবৎসল, এমন করুণার নিধি, এমন অন্তর্য্যামী কর্ণধার থাকতে আমাদের আর ভয় কী আছে? অক্রূরের সাথে আমরাও বলি— "কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য"—ভাঃ ১০।৪৮।২৬, অর্থাৎ যিনি ভজনরত ভক্তের সকল অভিলাষ পূর্ণ করেন, সেই হ্রাসবৃদ্ধিরহিত ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃদ্ ও কৃতজ্ঞ তোমা ব্যতীত কোন্ পণ্ডিত অপর কারো শরণ নেবেন?

দ্বিতীয় ঘটনাটি অশ্বিনীকুমার দত্ত দাদার মুখে শুনেছি। এই ঘটনার সময়ে তাঁর বয়স আঠারো-উনিশ হবে। বেলগাছিয়াতে একটি ছোট তিন টাকা ভাড়া ঘরে তিনি একাকী থাকতেন। ভাল সাধুদর্শনের জন্য তাঁর মনে বরাবরই একটা আকুল আগ্রহ ছিল। তিনি প্রথম থেকেই বলশালী, তেজী ও জেদী ছিলেন; স্বাস্থ্যও তাঁর তদনুরূপই ছিল। একদিন সকালে তিনি খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে গীতা পাঠ করছেন। পাঠ করতে করতেই তাঁর একটু তন্দ্রা ভাব এল। ঘুম নয়, সামান্য একটু আচ্ছন্নভাব—যে অবস্থায় বাইরের অনুভূতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। সেই অবস্থাতেই তিনি বুঝলেন কে যেন ঘরে প্রবেশ করল,—মানুষের পদধ্বনি তিনি স্পষ্টই শুনলেন, অথচ এ সময়ে তাঁর ঘরে কারোরই তো আসার কথা নয়,—তবে কে এল? এই কথা বিচার করতেই তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্নভাব সম্পূর্ণভাবে কেটে গেল। তিনি চোখ মেলেই দেখেন, তাঁর সামনে একজন সাধু দণ্ডায়মান। অশ্বিনীদাদা একলাফে উঠে তাকে ধরতে গেলেন, অমনি সেই সাধু অন্তর্হিত হলেন, হাঁ—একেবারে শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। অশ্বিনীদাদা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সবশক্তি, সব তেজ, সব দম্ভ যেন সেই বিলীয়মান সাধুর সঙ্গে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। একজন নবযুবকের সুদীপ্ত ইন্দ্রিয়চেতনা ও সবল দেহমনের নিকট এ দৃশ্য যেন একেবারে অসহ্য। একজন আগন্তুকের পদধ্বনি তিনি স্বকর্ণে শুনেছেন এবং চোখ মেলে সুস্পষ্ট ভাবে তাঁকে দেখেছেন, সবল বাহু দ্বারা তাঁকে ধরতে গিয়ে তাঁর এ কী হ'ল! সেই আগন্তুক সাধু তাঁর সব শক্তি, সব ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়ে একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। নিজে চোখে না দেখলে অশ্বিনীদাদা এ

ব্যাপারকে গাঁজাখুরী আজব কাহিনী ব'লেই উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু নিজের চোখকে, নিজের কানকে, নিজের বাহুকে তো তিনি অবিশ্বাস করতে পারেন না। এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখার পর তিনি কিছুক্ষণ মূহ্যমান হয়ে বসে রইলেন। তারপর ভাবেন, কেবলই ভাবেন সেই অদ্ভুত সাধুর কথা। কে ইনি? কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে?

দিন দুই পরে কী একটা কাজে তিনি বেলগাছিয়াতেই নিকটস্থ প্রতিবেশী ভুবন মালাকারের বাসায় গেছেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই তিনি দেখেন ঘরের দেওয়ালে একজন সাধুর বাঁধানো-ফটো টাঙানো আছে। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। স্থির দৃষ্টিতে সেই ফটোর দিকে চেয়ে রইলেন। হ্যাঁ, ঠিকই বটে; না, কোনো ভুল নেই। ইনিই, এই সাধুই গত পরশু সকালে তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন এবং অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়েছিলেন। ছুটে এলেন অশ্বিনীদাদা গৃহস্বামীর নিকট, আবেগভরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এই সাধু? কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে?" ভুবনবাবু তাঁর আগ্রহ দেখে শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "উনি আমার গুরুদেব। 'পাতাল সাধুবাবা' ব'লে সাধারণের মধ্যে পরিচিত। নবদ্বীপ, গোমো ও মেমারী-নিঃশঙ্কে তাঁর আশ্রম আছে। এখন তিনি গোমো আশ্রমে আছেন। সেখানে গেলে তাঁর দর্শন পেতে পার।"

অশ্বিনীদাদা সবকথা শুনে তার পরদিনই গোমো আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন এই অদ্ভুত সাধু দর্শনে—এবং সেখানে তিনি কী অদ্ভুত পরীক্ষা, কী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা' ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় হৃষীকেশ আঢ্যদাদা এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দীক্ষা নেওয়ার কয়েকমাস পরেই ঘটনাটি ঘটে। হৃষীদাদা গুরুদেবের কাছে এসেছেন আর একজন শিষ্যের সহিত। গুরুদেব নানা কথার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যপালনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার বিষয় উপদেশ দিলেন। হৃষীদাদা গুরুদেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলিকাতা টালায় তাঁর মামার বাড়িতে ফিরে গিয়ে এই উপদেশ পালন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু একদিন অকৃতকার্য্য হলেন। এতে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি ম্রিয়মাণ হয়ে একাকী তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। ঘরের দুয়ারটি খোলাই ছিল। মধ্যরাত্রে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন দুয়ার দিয়ে কেউ যেন ঘরে প্রবেশ করছেন। হ্যাঁ, স্পষ্টই দেখতে পেলেন—তিনি শ্রীগুরুদেব। বাইরে রাস্তার আলো ঘরে ঢুকেছে, সেই আলোতে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন, চটের আলখাল্লা পরিহিত স্বয়ং শ্রীগুরুদেব ঘরে ঢুকে তাঁর শয্যার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। 'গুরুদেব এসেছেন, আর আমি শুয়ে আছি!'—এই ভাবনায় তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উঠে বসতে চাইলেন, কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারলেন না, সমস্ত শরীর তাঁর কে

যেন অবশ ক'রে দিয়েছে। তারপর দেখলেন, গুরুদেব ধীরে ধীরে পিছু হ'টে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঠিক তারপরই হুবীদাদার শারীরিক অবশতা চলে গেল। তিনি উঠে পড়লেন ও বাইরে সর্ব্বত্র গুরুদেবকে অন্বেষণ ক'রে কোথাও আর দেখতে পেলেন না।

চতুর্থ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছে কাতুর মা কমলা। তখন তারা সুদূর টিটিলাগড়ে। কমলা মাত্র কয়েকমাস হ'ল তখন দীক্ষা নিয়েছে। সে সময় গুরুপাদপদ্মে তার প্রবল অনুরাগ। গুরুদেব তাকে শুধু মন্ত্রজপ করতেই আদেশ করেন নি, গুরুদেবের পূজা, ভোগ আদি সেবাও যথাসাধ্য করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সেইমত সেও অনুরাগের সাথে গুরুদেবের সেবা করে, ভোগ দেয়। একদিন গুরুদেবকে ভোগ নিবেদন ক'রে সামনে বসে জপ করছে ও তাঁর ধ্যান করছে। মনে মনে অনুরাগের সহিত সে ভাবে যেন গুরুদেব এসে ভোগ সেবা করেন। প্রত্যহই এরূপ করে। কিন্তু সবদিন মানুষের সমান ভাগ্যোদয় হয়না—এ সৌভাগ্য "কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন।" সেদিন তার জীবনের এক শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত; জপশেষে ভোগ সরাবার উদ্দেশ্যে চোখ মেলতেই সামনে সুস্পষ্ট দর্শন পেল, গুরুদেব স্বয়ং এসে সামনের চেয়ারটিতে বসেছেন, এখন চেয়ার থেকে নেমে জলের গেলাসটি হাতে নিয়ে সেবা করলেন। তারপরই তিনি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। এভাবে ভোগ নিবেদন ক'রে প্রায় পাঁচশত মাইল দূর থেকে ধ্যান ক'রে গুরুদেবকে সাক্ষাৎ আনিয়ে তাঁকে সেবা করানোর মত মহাভাগ্য আর কয়জনের হয়েছে তা' জানিনা; কিন্তু এরূপ ভাগ্য যারই হোক না কেন, সে ধন্য, সে আমাদের নমস্য। গুরুদেব একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—"কমলা-মা আমার প্রাতঃস্মরণীয়া।"

পঞ্চম ঘটনাটি ঘটেছে আরও আশ্চর্য্যরূপে। টিটিলাগড়ে কমলাদেরই প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধা ভক্ত-মার কমলাদের মুখে গুরুদেবের কাহিনী শুনে ও তাঁর ফটো দেখে গুরুদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করবার প্রবল অভিলাষ হয়। কমলারা কিন্তু কখনও গুরুদেবকে সেকথা জানায়নি। অথচ পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গুরুদেব একদিন নিজেই ওদের শুধালেন, "মা তোমাদের ওখানে এক বৃদ্ধা ভক্ত-মা আমাকে দেখতে চায়, নয়?" ওরা শুনে তো স্তম্ভিত। অশ্রু ছলছল নয়নে চেয়ে বললে, "আজ্ঞে, হ্যাঁ, তার বড়ই আগ্রহ।" গুরুদেব বললেন, "পাবে দর্শন পাবে।" সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভুর অন্তর্য্যামিত্ব ও ভক্তবাৎসল্যের সাক্ষাৎ প্রমাণ পেয়ে ওরা অভিভূত হয়ে কাঁদতে লাগল। এর কিছুকাল পরেই গুরুদেব অন্তর্ধান করেন। এর মধ্যে সেই বৃদ্ধা মা গুরুদেবের কাছে আসতে পারেন নি ও তাই তাঁর দর্শনও হয়নি। কিন্তু সেই সত্য-সঙ্কল্প প্রভুর 'অমোঘ' বাক্য কি তবে বিফল হ'ল? না, বিফল হয়নি। গুরুদেব

দেহরক্ষার কিছুদিন পরে সেই বৃদ্ধা মা একদিন জপ করতে করতে গুরুদেবের আবির্ভাব-মূর্ত্তির সুস্পষ্ট দর্শন পেলেন। গুরুদেব অন্তর্ধান করার পরও যে নিত্য-বর্ত্তমান, এবং তাঁর বাণী যে অমোঘ ও অকাট্য, এটি একটি তার সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় প্রমাণ।

(১৫) ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি—"কভু স্বতন্ত্র, করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন"—চৈঃ চঃ

সাধকের সাধনোচিত যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রীভগবান্, বা তাঁর ভক্তকৃপাতেই শ্রীভগবৎতত্ত্ব অন্তরে স্ফুরিত হয়। "প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নঃ"—ভাঃ ১০।১৪।২৯, "কৃপাবিনা ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে" চৈঃ চঃ ২।৬ কখনোবা তাঁর কৃপায় তাঁর দর্শনলাভও হয়ঃ"যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তংদ্রষ্টুমর্হতি"—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৩৮।১৬, "প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার, ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার"—চৈঃ চঃ ২।১০; বস্তুতঃ, "দেখিলেও না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন"—চৈঃ চঃ ২।৬। আবার কখনো কখনো "স্বরূপলক্ষণ আর তটস্থলক্ষণ, এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ। অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার', মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার"—চৈঃ চঃ ২।২০। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাঁর কৃপা প্রয়োজন, কারণ "ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্—ভাঃ ১০।১৪।২৯, অর্থাৎ কৃপাব্যতীত বহু কাল ধ'রে সাধন বা শাস্ত্রালোচনা ক'রেও কেউ তাঁর তত্ত্ব জানতে পারে না। সুতরাং ভগবৎতত্ত্বের অন্তরে স্ফুরণই হোক, বা অবতাররূপে অবতীর্ণ হ'লে তাঁকে চিনবার ও বুঝবার ক্ষমতাই হোক, সবই তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। এ কৃপা আবার জন্মে জন্মে একনিষ্ঠভাবে সিদ্ধ সাধুগুরু চরণাশ্রয়ে তাঁর সেবা ও কৃপা দ্বারাই লভ্য।

এইরূপ কৃপাপ্রাপ্ত কোনো কোনো ভাগ্যবান ভক্ত আবার তাঁর সাধনোচিত শ্রীভগবানের স্বরূপমূর্ত্তিরও দর্শন পেয়ে থাকেন। মহাপ্রভুর লীলায় এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'সাতপ্রহরিয়া' ভাবে তাঁর সাধারণভাবে 'মহাপ্রকাশ' ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে শচীদেবী-জগন্নাথমিশ্র, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীধর, মুরারীগুপ্ত, সার্ব্বভৌম পণ্ডিত রায় রামানন্দ, রাজা প্রতাপরুদ্র, কাশী মিশ্র, তৈর্থিক বিপ্র আদি বহু ভক্তগণকে তিনি বিভিন্ন ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি দর্শন দিয়েছেন এবং তাঁর লীলাকালে সেগুলি গোপন রাখতেও নির্দ্দেশ দিয়েছেন। শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর লীলায় কোন্ কোন্ ভাগ্যবান ভক্ত এইরূপভাবে তাঁর ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি দর্শন ক'রে ধন্য হয়েছেন, তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমি অবগত নই। তবে কয়েকজন এইরূপ দর্শন-ধন্য ভক্তের প্রত্যক্ষ দর্শনের বিবরণ তাঁদের মুখ থেকে শ্রবণ ক'রে তার বিবরণ দিচ্ছি।

মদনমোহন ঘোষদাদা

এই পরমভাগ্যবান্ গুরুভক্ত শ্রীগুরুদেবের যে পরম ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তি দর্শন পেয়েছিলেন তার সঠিক ও নিখুঁত বর্ণনা তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন, "গুরুদেব বলেছিলেন একথা কাউকেও প্রকাশ ক'রোনা। তবে এখন তাঁর অবর্ত্তমানে তোমাদের মত ভক্তদের কাছে প্রকাশ করতে কোনো বাধা নেই। মহাপ্রভুও তাঁর ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি যাঁকে যাঁকে দর্শন করিয়েছিলেন, তাঁদের সে বিষয়ে গভীর গোপনতা অবলম্বন করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন তাঁর প্রকটলীলা কালে। তথাপি তাঁর অপ্রকটে তাঁর চরিতলেখকগণ সেইসব অলৌকিক লীলা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তোমাকে দিয়ে যখন তিনি তাঁর লীলা-সঙ্কলন করাচ্ছেন, তখন তোমাকে সব প্রকাশ করাই উচিত।" এই ব'লে তিনি বলতে লাগলেন: "গুরুদেব অপ্রকট হওয়ার প্রায় বৎসরাধিক পূর্ব্বে আমি এক শনিবারে সস্ত্রীক ও শিশুপুত্র শম্ভুসহ গুহাশ্রমে এসেছি। গুরুদেব ভক্তগণকে সন্ধ্যাপ্রণাম সারিয়ে নিয়ে তাদের হরি-লুট দিয়ে বিদায় করেছেন। গুহামন্দিরে কেবল আমরা তিনজন আছি। একটু পরেই গুরুদেব ভিতর গুহা থেকে আমাদের ডাকলেন। আমরা মন্দির দুয়ার দিয়ে ভিতর গলিতে প্রবেশ করতেই গুরুদেব বললেন, "হারিকেনটা ওদিকে সরিয়ে রাখ, যাতে ভিতরে আলো আসতে না পারে।" এই কথা ব'লে তিনি ভিতর গুহায় চলে গেলেন। তারপর আমাদের ডেকে বললেন, "বাবা, তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে এই ভিতর গুহার সামনে এসে প্রণাম ক'রে বস। খোকা ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাক।" আমরা গুরুদেবের বাক্যমত শম্ভুকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে দু'জনে ছোটগুহার দুয়ারের সামনে এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে যেই উঠে বসেছি, অমনি সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র একেবারে চমকে উঠলাম। সবিস্ময়ে দু'জনেই দেখি আমাদের নয়ন সম্মুখে অতি সমুজ্জ্বল, পরমৈশ্বর্য্যমণ্ডিত এক মহাজ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি —তাঁর সেই ভাস্বর জ্যোতির্মণ্ডল চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে সেই নিবিড় অন্ধকারময় গুহাভ্যন্তর দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অতুল ঐশ্বর্য্যময়, পরমোজ্জ্বল দীপ্তিতে দীপ্যমান্ সেই নয়ন-ঝলসানো মূর্ত্তির দিকে চেয়ে থাকা যায়না—এতই তেজ তার, এতই ঐশ্বর্য্য তার। বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলাম আমরা। তারপর ধীরে ধীরে সে মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। গুরুদেব শুধু বললেন, "এ তথ্য কোথাও প্রকাশ ক'রোনা এখন।"

মাস্টারদাদা

মাস্টার দাদা ও দিদি গুরুদেবকে নিজ শিশু সন্তানের মতই ভাবতেন। তাঁদের কোনো সন্তানাদি হয়নি, এবং এজন্য সাধারণ সাংসারিক মানুষের মত মনে

একটা অভাববোধ, অতৃপ্তি ও তজ্জন্য দুঃখও হ'ত। তাঁরা একথা গুরুদেবকে জানালে গুরুদেব আবেগভরে বললেন, "বাবা, আমিই তো তোমাদের অবোধ অজ্ঞান সন্তান, তোমাদের কোলের ছেলে। আমার মত আর কে তোমাদের চিরদিন এমন 'মা','মা', 'বাবা', 'বাবা' ব'লে ডাকবে, এমন আদর-আবদার করবে ? আমার এই 'মা' ডাকে, আমার এই 'বাবা' আহ্বানে তোমাদের প্রাণে কি তৃপ্তি হয়না, সন্তানের অভাব পূরণ হয়না ?" ওঁরা দু'জনে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হয় বাবা। আপনিই আমাদের কোলের কচি ছেলে, আমাদের বুকের মানিক, আমাদের আদরের আনন্দ গোপাল। একথা প্রকৃতই সত্য, কিন্তু এতদিন ঠিক এভাবে মনকে বোঝাতে পারিনি।" গুরুদেব বললেন, "এবার থেকে ঠিক বোঝাতে পারবে, আর সন্দেহ হবে না, আর কোনো সংশয় থাকবে না।" এই ব'লে ছোট গুহার দিকে অগ্রসর হয়ে ভিতর থেকে শিশুসুলভ কচি কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "মা, বাবা, একবার চেয়ে দেখ তো আমাকে।" মাস্টার দাদা ও দিদি উভয়েই ছোট গুহার দিকে উঁকি দিয়ে চাইতেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন,—কোথায় গুরুদেব ? তিনি তো নেই। তবে ঠিক তাঁরই মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান একটি তিন-চার বৎসরের সুকুমার, সুকোমল শিশু ; তার নবীন, নধর শ্রীঅঙ্গের ললিতলাবণ্যে চারিদিক ঝলমল করছে। মাস্টারদাদা আবেগভরে বললেন, "দেখ, দেখ চেয়ে—ঐ আমাদের গোপাল, সেই ব্রজের যশোদা-দুলাল, সেই নন্দ-নন্দন ; আমাদের নয়নমণি আমাদের জীবন ধন্য ক'রে কী রূপে দর্শন দিয়েছেন ! দেখ তাঁর সারা অঙ্গে কী মাধুর্য্য, অধরে কী মধুর হাসি, কী নয়ন বিমোহন রূপ !" তাঁরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন তাঁকে—উঠে দেখেন সে রূপ অন্তর্হিত হয়েছে। গুরুদেব হাত যোড় ক'রে বলছেন, "বাবা, আর তো ভুল হবে না ?"

সুরেন রায়দাদা

সুরেন রায়দাদার 'চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি' দর্শনের কথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হয়েছে।

কৃষ্ণনগরের পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীমত্যা সনাতনী দেবী

এই প্রথম তাঁর গুহাশ্রমে আগমন। পাতালপ্রভুর দর্শন আশায় তিনি অন্যান্য যাত্রীর সহিত গুহা মন্দিরের জানালার সমুখে বসে আছেন। গুহামন্দিরের জানালা খুলতেই তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেব দুই বাহু তুলে নৃত্য করছেন। দেখে তিনি এতই অভিভূত হলেন যে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানহারা হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। তাঁকে মূর্চ্ছিতা হয়ে মাটিতে প'ড়ে যেতে দেখে কেউ কেউ তাঁর কাছে ছুটে এল। কিন্তু পাতালবাবা সকলকে নিষেধ করলেন তাঁকে স্পর্শ করতে। তারপর প্রভু নিজে জানালার

কাছে উঠে এসে কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন মূর্চ্ছিতা সনাতনী-মায়ের চোখে মুখে। ধীরে ধীরে তাঁর জ্ঞান সঞ্চার হ'ল। তিনি বিস্মিত হয়ে গুহার অভ্যন্তরে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। পাতালপ্রভু তাঁকে গুহার ভিতরে ডাকলেন। মন্দির ভিতরে গিয়েও তিনি সতৃষ্ণ নয়নে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলেন। কিন্তু না, কোথাও সেই মুনি-মনোহর মদনমোহন মহাপ্রভুকে দেখতে পেলেন না। সামনে যাঁকে দেখছেন, ইনি তো একজন সাধু মহাপুরুষ। কিন্তু একটু পূর্ব্বেই এখানে যাঁকে দেখেছেন সেই ভুবন-মোহন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কোথায় গেলেন? চারিদিকেই তিনি চেয়ে চেয়ে তাঁকে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কোথায় লুকালেন তিনি? পাতাল প্রভু তখন তাঁকে স্পষ্ট ক'রে বললেন, "মা. তুমি যাঁকে খুঁজছ তিনি আমার গুরুদেব। ভাগ্যক্রমে একবারই তাঁর দর্শন পেয়েছ। তাঁকে কি বারবার দেখা যায়, মা? বহু জন্মের সাধনের ফলে সে সুদুর্লভ স্বরূপমূর্ত্তির দর্শন পেয়েছ। এখন গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে তাঁর সাধনা কর, মা।" বলা বাহুল্য, তিনি সেই দিনই পাতালদেবের শ্রীচরণ আশ্রিতা হয়ে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করলেন। সেই মুহূর্ত্ত থেকে গুরুমূর্ত্তি তাঁর চিত্তপটে একেবারে লগ্ন হয়ে রইল। তিনি যখন গাড়ীতে ক'রে কৃষ্ণনগরে ফিরছিলেন, তখন সেই গাড়ীতেও তাঁর পাশে সর্ব্বদা গুরুদেবকে দেখতে পেলেন।

নবদ্বীপ বুড়াশিবতলার বামুন-মা

নবদ্বীপ বুড়াশিবতলার বামুন-মা একজন প্রাচীন ভক্ত। গুরুদেবের কাছে মন্ত্র নিয়ে তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন, "গুরুদেব, আমার ইষ্টদেব কে? গুরুমন্ত্র জপ করতে করতে কোন্ দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করব?" গুরুদেব একটু হেসে, একটু নেচে-কুঁদে ছেলেমানুষের মতই বললেন, "ইষ্টদেব আবার কে? এই ছেঁড়াচটু গায়ে পাগল ছেলেটাকেই মনে মনে স্মরণ করবে, মা।" বামুন-মা সেই থেকে গুরুবাক্য অনুযায়ী মন্ত্রজপ-সময়ে গুরুদেবের মূর্ত্তিই ধ্যান করেন। একদিন তুলসীতলায় বসে জপ করতে করতে যেই গুরু-মূর্ত্তিকে ধ্যান ক'রে তাঁকে প্রণাম ক'রে উঠে বসেছেন, অমনি সবিস্ময়ে দেখেন তাঁর সামনে গুরুদেবের মধ্যে এক মহাজ্যোতির্ম্ময় 'ওঁ'-মণ্ডল, এবং তার ভিতর বিদ্যুৎ-ঝলকের মতই দেখতে পেলেন—যুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রূপ!! বামুন-মায়ের সর্ব্বশরীরে শিহরণ জেগে উঠল। গুরুদেবের বাক্য কানে বাজতে লাগল—"ইষ্টদেব আবার কে? এই ছেঁড়াচটু গায়ে পাগল ছেলেটাকেই মনে মনে স্মরণ করবে মা।"

রানীমা ও ভেঁচুর মা

এঁরা দু'জনে গুহাশ্রমের ভিতর বাড়িতে বসে বসে গুরুদেবের প্রসঙ্গই আলোচনা করছেন। এমন সময়ে দু'জনেই শুনতে পেলেন গুরুদেব খড়ম পায়ে খট্ খট্ শব্দ ক'রে নিমতলার গলি দিয়ে আসছেন। সম্ভবতঃ ভিতরে এই দিকেই আসবেন। এই আশায় তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছেন। কিন্তু ভিতরে যিনি এলেন তিনি তো গুরুদেব নন,—দীর্ঘকেশী নীলাম্বর পরিহিতা এক নারী! দু'জনেই সবিস্ময়ে দেখলেন এই নারীমূর্ত্তি! পরে সে মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল; সামনে দেখলেন—গুরুদেব এসেছেন। তাঁরা যুগপৎ এ মূর্ত্তি দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

গোমো পাহাড় তপোবনের বড় পাহাড়ে গুরুদেবের আসনে উজ্জ্বল জ্যোতিদর্শন পেয়েছিলেন রানীমা।

কাতুর-মা কমলা

কমলার তখনো দীক্ষা হয়নি। গুরুদেবকে সে দেখেনি বা তাঁকে জানতও না। তাঁর আশ্রমও সে তখনো দেখেনি। সে তখন থাকে টিটিলাগড়ে। সে সময়ে কোনো একটি সমস্যায় প'ড়ে সে একমনে ভগবানকে ডাকতে থাকে। তখন একদিন অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় তার মানস নয়নের সমুখে একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য ভেসে উঠল। সে দেখল—তার সামনে একটি ঠাকুরমন্দির, তার সঙ্গে সংলগ্ন প্রশস্ত রোয়াক ও তার পর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণে এক মুনি-মনোহর মূর্ত্তি মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁর চতুর্দ্দিকে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কমলা মহাপুরুষের সমস্ত অবয়ব সুস্পষ্ট দেখতে পেল—তাঁর সমস্ত অঙ্গ অতি উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করছে, এবং তাঁকে ঘিরে রয়েছে এক সুবিস্তৃত জ্যোতির্ম্মণ্ডল, ঠিক সূর্য্যদেবের কিরণ মণ্ডলের মত। কিন্তু সে জ্যোতি সূর্য্যের মত তপ্ত নয়, পরন্তু চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ-শীতল—যেন সমস্ত মন প্রাণকে সুধা স্রোতে প্লাবিত ক'রে দিচ্ছে। সেই কিরণধারায় স্নাত হয়ে কমলার মনপ্রাণ যেন পরম শান্তি ও আনন্দে ভ'রে উঠল। তখন সেই মহাপুরুষ তাকে তার সমস্যার সমাধান কল্পে কিছু উপদেশ প্রদান করলেন।

পরে যখন কমলা আশ্রমে এল, তখন সে আশ্চর্য্য হয়ে দেখল,—এই আশ্রম, এই ঠাকুরঘর, রোয়াক ও প্রাঙ্গণই সে ইতিপূর্ব্বে দেখেছে। যখন সে গুরুদেবকে দর্শন করল তখন সে চম্‌কে উঠল। এই তো—হুবহু এঁকেই সে দেখেছে তার আধো স্বপ্ন আধো জাগরণক্ষণে, তার মানসনয়নের সমুখে। সে স্পষ্ট চিনতে পারল—ইনিই সেই সুস্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্মণ্ডল বিকিরণকারী পরমানন্দময় মহাপুরুষ! তাঁর দিকে চেয়ে সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে রইল।

অষ্টসাত্ত্বিক ভাবোদয়

সন ১৩২৭ সালে নিঃশঙ্ক আশ্রমে বৈশাখী পূর্ণিমায় 'রাধাগোবিন্দ' নাম কীর্ত্তন করতে করতে তাঁর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় ও অবশেষে তিনি সংজ্ঞাহীন বা সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। ঠিক মহাপ্রভুর মতই তখন ভক্তগণ তাঁর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে রাধাগোবিন্দ নাম করতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে প্রভু হুঙ্কার দিয়ে উঠে আবার নাম কীর্ত্তন করতে শুরু করেন। ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল নবদ্বীপ মণিপুর আশ্রমে সন ১৩৩৭ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ। সংজ্ঞাহীন হয়ে প্রায় কুড়ি মিনিট ছিলেন। ঘটনাটি শুনেছি প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মাস্টারদাদা ও কর্ত্তামায়ের নিকটে।

—•—

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীপাতাল প্রভুর সঙ্গীত-সুধা-সংগ্রহ

ভূমিকা

প্রভু নরহরি ভাবাবেশে বহু কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা ও সাধনতত্ত্ব সমন্বিত সঙ্গীত তাঁর সুধামধুর কণ্ঠে গান করতেন। এসব সঙ্গীত তাঁর কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। কবি ব'লে পরিচিত হবার জন্য তিনি কোনো সঙ্গীত রচনা করেন নি এবং সে উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত সঙ্গীত প্রচার বা প্রকাশের বিন্দুমাত্রও প্রয়াস করেন নি। সাড়ে চার বৎসর তাঁর সঙ্গে নিত্য অবস্থান কালে, তাঁর সুধাকণ্ঠে ভাবময় যে সকল সঙ্গীত আমি নিজে শ্রবণ করেছি, তা' সবই লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলাম। প্রাচীনতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় রঘুনাথ মহান্তদাদার নিকটে ও অতিপ্রাচীনা শিষ্যা গৌর ঘোষের মাতাঠাকুরাণীর কাছে গুরুদেবের সঙ্গীত ব'লে পরিচিত কিছু কিছু সঙ্গীত সাগ্রহে সংগ্রহ করেছি। পরে বহু আয়াসসাধ্য অনুসন্ধান চালিয়ে প্রায় দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় তাঁর স্বহস্ত লিখিত কিছু কিছু পত্র ও সঙ্গীত সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি। সে সমস্তই এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত করা হ'ল। এসব সঙ্গীতের প্রত্যেকটিই যে নির্ভুলভাবে তাঁরই রচিত, একথা জোর ক'রে বলতে পারব না। হয়তো তিনি অন্য কোনো মহাজনপদ গেয়েছেন এবং আমি বা অপরভক্ত তা' লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছি। তাঁর স্বহস্ত লিখিত সঙ্গীতও যে অপর কোনো মহাজনের নয়, একথাও নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না। হয় তো কোনো সঙ্গীত শুনে তাঁর ভাল লেগেছে এবং তিনি তা' লিখে রাখতেও পারেন। তবে তাঁর স্বনামভণিতাযুক্ত সঙ্গীতগুলি তাঁরই রচিত ব'লে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে— এবং সেইসব সঙ্গীতের রচনাশৈলী বিচার ক'রে সন্নিবেশিত সঙ্গীতগুলিও যে তাঁরই, তাই অনুমান হয়।

এইসব সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় বক্তব্য আছে,—সেটি না বললে এ সঙ্গীত-সুধা সংগ্রহের কোনো অর্থ হয়না। যাঁরা ধর্মতত্ত্বের সাধক নন, বা যাঁরা সাধন ক'রেও তার চূড়ান্ত সার্থকতা অর্জ্জন করতে পারেন নি, সেইসব সাধারণ কবিরা যেসব সঙ্গীত বা অন্য প্রবন্ধাদি রচনা করেন, সেসব থেকে এ সঙ্গীত মূলতঃ পৃথক। পার্থক্যটা এত বেশী যে তা' বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। প্রকৃত কথা এই যে, সাধারণ কবি ও সিদ্ধসাধকের সঙ্গীত বা অন্য রচনা ও বাক্যের অনেকাংশে একেবারেই মিল নেই। কারণ, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মায়াবদ্ধ সাধারণ লেখক বা কবিগণ যে পথে চলেন, সিদ্ধ মহাপুরুষ ঠিক তার বিপরীত মার্গাবলম্বী।

একথা শুনতে বিস্ময়কর বা অপ্রিয় বোধ হ'লেও খাঁটি সত্য। সাধকগণ অতিদুরূহ ও সুদুর্গম সাধনপথে তিলে তিলে অগ্রসর হয়ে যে অসাধারণ, অলৌকিক, অপ্রাকৃত ও সাধারণের অননুভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও ঘাত-প্রতিঘাতের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অর্জ্জন করেন, তা' অসাধকের অকল্পনীয়, ধারণারও অতীত। প্রভু নরহরি এই দুর্গম সাধনমার্গে অগ্রসর হয়ে বহু কৃচ্ছ্রসাধন করতঃ দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং চরম ও পরম সার্থকতার সুদূর উপকূলে পৌছেছেন। এসব সঙ্গীত সেই সুদুর্লভ সাধন সার্থকতার চমকপ্রদ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পদে সুসমৃদ্ধ ও সালঙ্কৃত। প্রাকৃত কবিগণের কবিতায় যেমন কাব্যরস, ছন্দোমাধুর্য্য ও শব্দালঙ্কার তার মুখ্য সৌন্দর্য্য,—সিদ্ধ সাধকের ভাব সমুদ্রমন্থিত এই সঙ্গীত সুধাপাত্র তেমনি তার অপ্রাকৃত ভাবরাজ্যের অতুলনীয় ও অননুভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ও ভাবালঙ্কারে সমৃদ্ধ। এর প্রত্যেকটি শব্দ যে-অমূল্য সাধন-সম্পদ ও অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য্যের আধার, দুর্গম সাধনমার্গ সমূহের দুর্লভ অভিজ্ঞতা প্রসূত উপলব্ধিতে পূর্ণ, মায়ার পরপারের পরব্যোম ও গোলোক বৃন্দাবনের সাক্ষাৎ অনুভূতিলব্ধ ভূষণে ভূষিত, মায়িকজগতের মায়াবদ্ধ কবিসম্রাটগণের কাব্যেও তার ছায়ামাত্রের আভাস মিলবে না।

কৃষ্ণলীলাত্মক সঙ্গীত

(১)

কালিন্দীর কূলে, কদম্বের মূলে, পত্রাসনোপরি বসরে ভাই ;
হেরে, রাখালরাজা হরি নয়ন শীতল করি—আনন্দের আর সীমা নাই।
আনন্দিত মনে পুষ্প অন্বেষণে, চল মিলি' মোরা সকলে যাই,
নানাজাতিফুলে ওচরণ কমলে, মনসুখে কত সাজাইব তাই।
চম্পক বেল টগর নীলপদ্ম, বিনিসূতায় হার গাঁথি' লয়ে সদ্য,
গলদেশে দিয়া প্রফুল্লিত হিয়া, স্তব করি এসো মিলি' সবাই।
কেহ সুবাতাস করে মৃদুহাস, কেহ সংকীর্ত্তন কারী,—
আহা মরি ! মরি ! কী রূপ মাধুরী ! দেখিলে ভুলে সতী নারী।
কিবা মৃদুহাসি, শোভে মুখশশী, অমৃত জ্যোছনা ঝরে সদাই।
কোটিচন্দ্র জিনি' নখচন্দ্রশোভা, যুগলচরণ মুনিমনো লোভা,—
যে হেরেছে সে কভু না ভুলিবে, অপরূপ আভার তুলনা নাই।
শ্রীদাম বলে, হরি ! কীরূপ মাধুরী, দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ বেশে—
নয়ন চকোর ভাবেতে বিভোর, সুধা পিবে প্রেমাবেশে ॥

[অসমাপ্ত]

(২)

ওভাই, বাজাও বাঁশী, কালোশশী, চল সবে গোষ্ঠে যাই—
সবে মিলি' মিলি' বাহু তুলি' সংকীর্ত্তনে নাচি ভাই।
আর কেন কর বেলা, তপনতাপে শুকায় গলা,
ডাকে গাভী সবে হাম্বারবে, বিলম্বে আর কাজ নাই।
তুমি মোদের প্রাণধন, তাই এত করি যতন,
বিপদ হ'লে রাখ কোলে—সে-করুণার সীমা নাই।
যদি বনে পুনঃ যায়রে জীবন, কে বাঁচাবে ওরে ভাই ?
ব'সে রবে তরুমূলে, আনন্দে ফল আনব তুলে,
দিব তোমার চন্দ্রাননে যে-ফলে সুমিষ্ট পাই।

আনন্দে মগন হইব, সকল কষ্ট পাসরিব,
শত্রুভয় নিবারিব, নির্ব্বিঘ্নে রহিব সদাই।
ওহে ভবভয় হারী, যাই হে তোমায় বলিহারী,
নরহরি কহে, হে কৃষ্ণ, ব্রজবালক ধন্য সবাই॥

(৩)

আয়রে আয় রাখাল সবে আয়রে চ'লে আয়রে ভাই,—
আমরা বনে এসে আপন দোষে হারিয়েছিরে প্রাণ কানাই।
আজ মোদের ধেনুগণ, তারা না শুনে বারণ,
সহজপথে বাগ মানেনা, পলায় ছুটে, পাছে ধাই।
ঐ দেখ যায়রে বেলা, চ'লে আয়রে এই বেলা—
আমরা রাখাল রাজে রাখালসাজে দেখব পাই কিনা পাই।
তারে সকলে মিলে, প্রাণ খুলে ডাকিলে,
ব্রজবিহারী বংশী ধারী আসেন কিনা দেখব তাই॥

(৪)

আহা মরি! কী-আনন্দ আজি নন্দভবনে—
অকূলের কাণ্ডারীহরি 'মা' বলেন চাঁদবদনে।
ত্রিলোক-পালক বালক বেশে জন্ম নিলেন শুনতে পাই—
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন ভূতলে উদয় এতদিনে।
চল, চল, চল সবে—একবার দেখে আসি,
পাপতাপ দূরে যাবে হেরিলে সে-রূপ নয়নে।
ব্রজবাসী নারীগণে দেয় হুলু ধ্বনি,
শঙ্খঘণ্টা নানাবাদ্য সংখ্যা না হয় গণনে।
আচণ্ডালে দেখছে সবাই সফল করি' জীবনে,
কেবল, দেখলে নাকো নরহরি জ্ঞানচক্ষু বিহনে॥

(৫)

আহা কী অতুলানন্দ! বৃষভানুভবনে—
জন্মিলেন ত্রিলোকতারিণী তরাতে জগজনে।

রূপের নাহিক সীমা, ও কী দিব উপমা,
প্রতিনখচন্দ্রে কোটিচন্দ্র কে দেখেছে কোন্ খানে ?
নাম রেখেছেন রাধা, নামে যায় ভবক্ষুধা,
একবার, হেরে নয়ন সফল কর, ভয় কি আছে শমনে ?
কহে নরহরি, গুরু পারের কাণ্ডারী,
দাও হে মোরে জ্ঞান চক্ষু, আমি যাব দরশনে ॥

(৬)

বাজাও হে শ্যাম, মোহন বাঁশী-শুনিতে হয় বাসনা,
না শুনিলে ঐ মধুরধ্বনি মরমে পাই বেদনা ।
চরণে চরণ দিয়ে, দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ হইয়ে,
আধো-আধো মধুর হাসি বারেক হাসনা ।
মনপ্রাণ ল'য়ে হরি' লুকাও কেন ওহে হরি,
মনো মোহন মূরতি ধরি' আবার এসো না ।
শুন ওহে কালো বরণ, আর ক'রোনা কাল-হরণ,
দেখা দিয়ে ঘুচাও মোর এ বিরহ-যাতনা ।
অস্ত যায় যে দিনমণি, গৃহে যাবে চিন্তামণি,
এল আঁধার, ঘরে আমার বাদী ছ'জনা ॥

(৭)

রাধার বামে রাধারমণ, বারেক দেখা দিও হে,
আমার, এই বাসনা, কালোসোনা, পূর্ণ ক'রে নিও হে ।
বৃকভানুসুতাবামে মধুর মধুর ঠামে,
হৃদিবৃন্দাবনধামে যুগলে উদিও হে ।
যেজন জানে ভজন সাধন, নিজগুণে হয় উত্তরণ,
আমার, নাই কড়ি-বল ভয় যে কেবল,
ঐ যুগল শ্রীচরণ-তরণীতে তরিও হে ॥

গৌরলীলাত্মক সঙ্গীত

(১)

মনচোরা গৌরহরি, সর্ব্বস্ব লয়েছো হরি'
তবু তব মন পাইনা—এ দুঃখ কারে জানাইব ?
মনে করি থাকি ভুলে,
সদাই যে ভাসি অকূলে,
দাও হৃদে ঐ যুগলচরণ, তাপিত প্রাণ জুড়াইব,
শ্রীচরণ-সুধাপানে ভবক্ষুধা এড়াইব।
প্রাণ থাকিতে প্রাণ-কান্ত তোমারে না ভুলিব ;
কাজ কি কুলশীলমানে ?
প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে প্রাণে,
প্রেমেমাখা সুধারস-আস্বাদে মন মজাইব।
নরহরি কয়, দীন দয়াময়,
দিওনা দুঃখ, এসো অসময়,
বিরহেতে জ্বলে পরাণ, কিসে নির্ব্বাণ করিব ?

(২)

নীরদ শ্যাম অঙ্গ লুকায়ে ত্রিভঙ্গ কীভাবেতে হয়েছ গৌরাঙ্গ বরণ ?
নাহি ব্রজের ভাব, হয়েছে ভাব, করেতে ক'রেছ করঙ্গধারণ।
ব্রজে যখন ছিলে, 'রাধা' বলে বাঁশী কত,
এখন সে-ভাব গেল, হলে পাগলের মত,
বল হরি-বোল্, নাইকো সে-বোল্, রাধারাণীরে কোথা করিলে গোপন ?
যে-রাধানামে দিবানিশি করিতে গুণগান,
এখন নাই সে নাম, হরি-বলাই গান,
রাধানামের বাঁশী কী করিলে, গোপীচোরা ভাব করি' সম্বরণ ?
কোথায় পিতা নন্দ, কোথা মা যশোদা,
কোথায় শ্রীদাম-সুদাম, কোথায় নন্দের বাধা ?
রাধানামে সাধা-নাম, সেই মধুর নাম হয়েছে বিস্মরণ।

কই পীতধড়া, কই মোহন চূড়া ;
কোথা সে শ্রীরাধা বিরহবিধুরা,
কোথায় গোষ্ঠলীলা সবি বিস্মরিলা,
অষ্টসখীর কথা ভুলেছ এখন ॥

(৩)

নাম বিলাতে নদীয়াতে এসেছেন গৌর নিতাই,
অযাচকে নাম দিতেছেন, এমন দয়াল দেখি নাই।
ছেড়ে সংসারের খেলা, ছুটে আয়রে এই বেলা,
হরি-নাম নিলে পর ত'রে যাবি বারে বারে ডাকছি তাই।
দাও মনের গোল ছেড়ে, ওরে তোর আপন কেরে ?
যখন, যাবার বেলায় সব প'ড়ে রবে, তবে কিসের ধনের বড়াই ?
কহে দীন নরহরি, পারের কাণ্ডারী হরি,
ঐ চরণে শরণ লব মিছে কেন দুঃখ পাই ?

(৪)

বন্দে গুরু গৌরহরি, ব্রজবিহারী হরি—
তোমায় গণসহিতে বিনয়েতে সাষ্টাঙ্গে প্রণমি' স্মরি।
গৌর আমার উদয় হলেন নবদ্বীপধামে,
নিত্যানন্দ উদয় হলেন একচক্রা গ্রামে,
সচন্দনতুলসী দিয়া হুঙ্কারি 'আনিল বরি'।
শ্রীঅদ্বৈতের পূজার বলিহারী যাই,
সত্যত্রেতা দ্বাপর কলি—এমন দেখি নাই—
সবার আগে এলেন তিনি শান্তিপুর নগরী।
তৃণাদপি নীচ হয়ে সদা লবে নাম,
বৃক্ষ হতে সহিষ্ণু, আর হবে নিষ্কাম,—
নিজে নিরভিমান প্রভু ভক্তমনে প্রদান করি'।
প্রভু এবার জানা যাবে তোমার কৃপা বল,
একবার আসি' হও হে সদয়, দেখুক সকল,
কহিছে দীন কাঙাল গোঁসাই নরহরি ॥

২৬

(৫)

এসো প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা ক'রে মোরে,
সঙ্কীর্ত্তন সুধারসে, হৃদয় দাও ভ'রে।
বসহে হৃৎপদ্মাসনে গোপনে এই পদ্মবনে,
তোমা হেরে মত্ত হই, তব নামামৃত পান ক'রে।
সঙ্কীর্ত্তন সুধারাশি বড় আমি ভালবাসি,
না বলালে দিবানিশি, দুঃখ রয় অন্তরে।
স্ব-চেতনে রাখ আমায়, প্রাণ সঁপিলাম ও-রাঙা পায়,
আশা-বিষে সদা জ্বলি পড়িয়ে ভব-ঘোরে।
মনোসাধ পূর্ণ কর, ভবব্যাধি আমার হর,
নরহরি যেন না আর ডোবে ভব-সাগরে॥

(৬)

গৌর-বিচ্ছেদে ভক্তের দুর্দ্দশা বর্ণন

গৌর বিনে সইগো ঘরে রইব আমি কেমনে?
জানিনা তন্ত্র মহামন্ত্র, গৌর পাব কোন্ সাধনে?
গৌর মোর জীবনের জীবন, সঁপেছি পদে সব প্রাণমন,
কতদিনে গৌরচাঁদে বসাব হৃৎপদ্মাসনে?
শ্রীগৌর আমার মনোমোহন, দেখলে ভুলে সকল ভুবন,
আমি, চাতকিনী পিপাসিনী, গৌর, চরণবারি বিহনে।
এই পতিতে দিলে চরণ,—নাম ধরেছ পতিতপাবন,
জানবে জগজ্জনে, ওসে গাইবে ত্রিভুবনে।
সর্ব্বস্বধন তুমি আমার, প্রাণ যে যায় বিনা তোমার
চরণ দরশনে, ঐ পদ পরশনে।
মনোদুঃখ বলিব কা'য়, সহি সব গঞ্জনায়,
আপন ক'রে রাখ পায় জীবনে-মরণে।
মনে করি ভুলে থাকি, গৌর-গুণে ঝুরে আঁখি,
অন্তরেতে তোমায় রাখি অতি সংগোপনে॥

(৭)

যেজন গৌর-চরণে প্রাণ সঁপেছে গো একেবারে,
নয়নমুদে থাকে, শুধু গৌর-রূপ নেহারে।
বারি বহে দু'নয়নে, সদাই গৌর জাগে মনে,
দেখেনা আর অন্যজনে, কে ভুলাতে পারে তারে ?
শুনেনা আর আন্ বারতা, শুনলে মনে পায় সে ব্যথা,
কী বলব তার গুণের কথা, কেবা তা বর্ণিতে পারে ?
তাঁর, আত্মসুখের নাই কামনা, যেমন ব্রজে ব্রজাঙ্গনা,
মায়ায় অন্ধ রয় যে-জনা, সাজা তারি বারে বারে।
তিনি, নয়তো কভু নিরানন্দ, হেরে সবাই সদানন্দ,
বলতে গৌর-নিত্যানন্দ উথলে প্রেম-জোয়ারে ॥

(৮)

জীবন-যৌবন করেছি অর্পণ, তুমি মোর সখা একা,
মোরে কৃপা কর, মনোদুঃখ হর, হৃদিমাঝে দাও দেখা।
কে আছে এমন, এ মনোবেদন বলিব কাহারে আর ?
কেন, আসি' দেখা দাও, পলকে পলাও, ওহে মোর গুণাধার ?
দিয়ে প্রেমধন পুনঃ নিতে মন, ছলনা এ কী তোমার,
কোথায় দাঁড়াব, কাহারে জানাব, এ বিরহ-বেদন-ভার ?
তব মধুনাম, অমৃতের ধাম নিত্যহৃদয়ে লেখা,
মুছিলে মোছেনা, ধুইলে ঘোচেনা, যেন পাষাণের রেখা।
সঁপেছি জীবন, তনুপ্রাণ মন, ওচরণ-কমলে,
মম মন হরি', হে গৌরহরি, যেও নাকো আর চ'লে।
বলি যা' বলাও, খাই যা' খাওয়াও, সকলি সঁপেছি স্বামী,
বিনা শ্রীচরণ নাহি মোর ধন, জান সবি অন্তর্যামী।
তুমি, পতিত-পাবন, ত্রিতাপ-নাশন, অখণ্ড-প্রেম-আধার,
ঐ প্রেম-রত্নাকরে, প্রেমের সায়রে, ডুবায়ো মন আমার ;
পাই যে-সাধনে তোমা-হেন ধনে, যেন, হয় সে-সাধন শেখা ॥

(৯)

কী কারণে গৌর হ'লি ওরে ভাই কানাই ;
কেন কাঙাল হলে, পাগল কে ক'রেছে ভাই ?
নয়নেতে বারিধারা, বলরে এ কেমন ধারা,
কভু হওরে দিশাহারা হয়ে ধরাশায়ী ?
কে এমন করিল তোমা', তাহার কাছে যাই ।
বাজাতে ভাই মধুর বাঁশী, হাসিতে সুমধুর হাসি,
গোপীর মন ক'রে উদাসী রাখিতে সদাই ;
বিপরীতভাব দেখে ধৈর্য্য ধরতে পারি নাই ।
বনফুলের মালা ফেলে, হরি নামের মালা কোথায় পেলে,
পীতধড়া বাঁশীচূড়া রাখলে কোন্ ঠাঁই ?
রাধারমণ কালোবরণ দেখাও প্রাণ জুড়াই ।
বল্‌রে ভাই শ্রীগোবিন্দ, কোথায় আছে পিতা নন্দ,
কোথায় মা যশোদা তোমার নবলক্ষ গাই ?
কেনরে তোর কৌপীন-পরা, দেখে কি প্রাণ যায়রে ধরা,
মনে হয় ত্যজিয়ে জীবন দুঃখানল নিভাই ।
আমায় দে ঐ কৌপীন প'রে কাঙাল হয়ে বেড়াই ॥

(১০)

ছেড়ে সুখের বৃন্দাবন, নদীয়াতে এসে এখন,
পথে পথে বেড়াও করি' হরি-নাম সঙ্কীর্ত্তন ।
ভবপার করিতে কর নামের মালা করে ধারণ ।
ছেঁড়া কাঁথা গলে দিয়ে, নিত্যানন্দ সঙ্গে নিয়ে,
মহাপাপী উদ্ধারিতে কৌপীন-ধারণ ;
হরি ব'লে কেঁদে কেঁদে নাম দিয়ে কর চেতন ।
দাসে বাচাও গৌরহরি, ভবকূপে ডুবে মরি,
মায়া মোহে মত্ত হয়ে সদা তোমা পাসরি ;
ঐ চরণ-সেবী নরহরি মাগে হে গৌর অধম-তারণ ॥

(১১)

এ অধমে দয়া ক'রে একবার এসো হে গৌর কণ্ঠভরে,
সংকীর্ত্তন তোমা বিনে শূন্য হলো হে—।
তুমি, প্রেমানন্দের চূড়ামণি, আমি, ভক্তিধনে নই যে ধনী,
নিজগুণে কৃপাময় দেখাও পদ কমল হে।
যদি না আস পতিত ব'লে, কেন পতিতপাবন হ'লে,
ওহে, ভক্ত-জীবন কণ্ঠে লগন কর কীর্ত্তন-কল্লোল হে।
নদীয়া নইলে রইতে নার, নদীয়া কর হৃদয় আমার,
নিত্যানন্দ সঙ্গে এসো রঙ্গে, হেরি চরণ যুগল হে ॥

(১২)

একথা বল্‌ব কারে, মনের দুঃখ মনে রহিল—
হৃদয়ের ধন গৌর রতন, কোন্‌খানে লুকাইল ?
হেরব ব'লে নয়ন ভরে, ছিলাম বড় আশা করে,
এবার আমার মায়া ঘোরে লাভে মূলে হারাইল।
গুরু-বাক্য করি ঐক্য, হ'লনা সাধন পক্ক,
শুধু ভরমের সাথে সখ্য, সাধনের দিন ফুরাইল।
রাখতাম যদি যতন ক'রে, সতত হৃদি পিঞ্জরে,
সকল জ্বালা ঘুচিতরে, এখন পারের সম্বল হরিল।
নরহরি কয়রে খেদে, মায়ায় মোরে রাখল বেঁধে,
মন কেন সময়ে সেধে নিতাই-পদ না ভজিল ॥

(১)

রেখে আমায় গেলে এ ভব-সংসারে—
কোথা গেলে প্রাণ-সখা পাব হে তোমারে ?
কোথা ওহে প্রাণ-কান্ত হৃদয়-রতন ?
পড়িলাম ঘোর বিপদে, দেহ দরশন,
প্রাণপাখী কখন ফাঁকি দেবে যে হে,—
পরিত্রাণ কর হরি তরঙ্গ মাঝারে।
কামানলে দগ্ধ সদা হইতেছি অতি,
সুমতিকে দেয় তাড়া আসিয়া কুমতি,
প্রমাদ ঘটিল লোভাবেশে,—
হাল ধরেনা অবোধ মাঝি, তরী ঘোরে পাথারে।
কী সাধ্য আমার, আমি অভাজন,
কেমনে ঘুচিবে বল এ ভব-বন্ধন ?
বারে বারে যন্ত্রণা সহে না হে,
দেখাও হে পথ, ঘুচাও আপদ নরহরির এবারে ॥

(২)

ভবনদীর বিষম স্রোতে যায় বুঝি প্রাণ এবার ওরে—
অষ্টপাশে মন বাঁধা সে, খুলিব তায় কী ক'রে ?
সাঁতার দিব কেমন ক'রে, ব্যথাতে যে প্রাণ বিদরে,
মায়া-কুম্ভীর বাস করে, সুযোগ পেলে খাবে ধ'রে।
যারা আমায় ব'লে আপন, শিশুকালে করে পালন,
তারা কোথা গেল এখন, পড়লাম আমি বিষম ঘোরে।
যাদের জানি আপন ব'লে তারাই আমায় ফেলে গোলে,
তাদের, বিনয় ক'রে বলি কত, ডাকিয়ে সকাতরে।
কোথা হে ভব-কাণ্ডারী, পার কর এ তুফান ভারী,
নরহরি ধৈর্য্য ধরি' শ্রীগুরু-চরণ ধরবে ॥

(৩)

ভুলায়ো না আর মায়ায় আমায়, ক'রনা বিপথগামী—
দীনের সম্বল দীনবন্ধু, ওহে জগত-স্বামী।
মনে আমার এই ভাবনা, অনিত্য করি কামনা,
কামানলে ঝাঁপ দিয়ে পাছে পুড়ে মরি আমি!
রক্ষা কর সর্ব্বক্ষণ, ওহে শ্রীমধুসূদন,
নিষ্কাম যদি কর এবার, তবে তো হব নিষ্কামী।
ত্রাণকর প্রাণপতি, নইলে দাসীর হয় দুর্গতি,
তুমি যে অগতির গতি, আমি তব কৃপা-কামী।
নরহরি কয় প্রাণসখা, হয় কোন্ সাধনে প্রাণ রক্ষা,
যাতে যায় ভবক্ষুধা, বল তাই অন্তর্যামী॥

(৪)

কোথায় দয়াল হরি, এসো দয়া করি'
তব প্রেমে ডুবাও মন মোর!
যেন, রহি নিশিদিন বাহ্যজ্ঞানহীন
প্রেমানন্দে হয়ে ভোর।
শ্রীপাদপদ্মমধু পান করি বঁধু
ঘুচাই আসা-যাওয়া-ভব ঘোর,
রিপুরা ও ফাঁদে যেন নাহি বাঁধে,
কোন্‌ভাবে কে বা মনচোর?
রিপুদর্পহারী শত্রুখর্ব্বকারী
রাখ সদা নির্ব্বিঘ্ন অন্তর,
সব নিও হরি', ক্ষতি নাহি হরি,
নাম যেন না হই বিস্মরণ,—
নরহরি কয়, সুপথ যেথা হয়,
দাও সেই যুগল চরণ॥

(৫)

আমার, প্রাণনাথ বিহনে প্রাণ রাখিব কেমনে
তাই ভাবি দিবস রজনী,
মোর, ঘোর রিপুগণ তাতে ভীষণ শরাঘাতে
অস্থির করিছে মন তরণী।
ওহে, তুমি ছেড়ে গেলে হরি, শূন্য দেহ রবে পড়ি
রহিবে না গৌরব তোমার,
তুমি, যে ভাবেতে দাও রাখি, সেই ভাবে আমি থাকি,
তবে কেন বাড়াও বিকার ?
প্রভু, লোভাবেশে যদি মরি, ওহে দীন-বন্ধু হরি,
তাই ডাকি পতিত-পাবন,
ওহে, কোথা শ্রীমধুসূদন, ঘুচাও মনোবেদন,
আনন্দে থাকি হে সর্ব্বক্ষণ।
আমায়, দিয়েছ দুর্লভ জনম, ঘুচাও মায়ার ভ্রম,
থাকি যেন সরল অন্তরে,
ওহে, বস হৃৎপদ্মাসনে, পূজা করি সযতনে,
নয়ন-বারি-মন-পুষ্প ভ'রে ॥

(৬)

এ অধমের গতি কী হবে, ওহে অধম তারণ ?
সকলি দেখি নিরুপায়, বিনা তোমার অভয়চরণ।
ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্ব'লে মরি, উপায় কী তার বল করি ?
ঐ চরণবারি দিয়ে হরি শীতল কর দারুণ দহন।
শরণ লব কেমন ক'রে, ঘুরে মরি ভব-ঘোরে,
সরল হয়ে দাঁড়াতে যাই, বাঁকা হয়ে করি গমন।
মুখে বলি সাধুর মত, অন্তরে মহাকাল যেমন।
কাঙাল নরহরি বলে, তোমায় জানে দয়াময় সকলে—
মোরে, পতিত দেখে পদ-কমলে দিও শরণ পতিত-পাবন ॥

(৭)

ওহে, বিপদভঞ্জন মধুস্থদন দাওহে চরণতরী,
এসে, এ অকূলে পার করহে, অকূলের কাণ্ডারী হরি।
নিরুপায়ের ভাবনা কত, সকলি তুমি জান তো,
তাই, পতিতজনে উদ্ধারিতে, এলে গৌরাঙ্গ রূপ ধরি'।
দেখিতেছ গেল বেলা, ভুলে যাও মন ধূলাখেলা,
নরহরির বিষম জ্বালা—কেবল 'আমার আমার' করি॥

(৮)

ভেবে দেখ হায় কেউ কারো নয়, মিছে মায়ায় জড়ালে—
ভজ্‌লি না মন গুরুচরণ, বন্দী রইলি মায়াজালে।
থাকতে দেহে জীবন করলি না তার অন্বেষণ,
নরহরি তাই কয়রে কেঁদে, কী হবে সে অন্তিমকালে?

(৯)

এ সংসারে সব খোয়ালাম ভজন-সাধন হ'লনা—
গুরুবাক্য ফেলে দূরে, পরের শুনি মন্ত্রণা।
যারে বল আপন ও-মন, সে করবে দূরে বর্জ্জন,
কাল আগত হবে যখন, রাখবে কে তা' বলনা?
কে তোমার তুমি বা কার, কার জন্য কু-ব্যবহার,
মিথ্যা কথায় কী ফল তোমার, মনে তাই ভাবনা?
এত কষ্টে ধন-উপার্জ্জন, একটি সঙ্গে যায় না রে মন,
পারে যাবে ল'য়ে কী ধন, তার উপায় তো কর না।
শ্রীগুরু সে পরম রতন, গুরু বিনা সব অকারণ,
ওরে আমার অধম মন, শ্রীগুরু-চরণ ভুলো না॥

(১০)

অসময়ে অভয়চরণ দাও হে দয়াল গৌরহরি—
ওহে, কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু, পার কর হে কৃপা করি'।

তুমি জগৎ-জীবন, ভকতের প্রাণধন,
নিজগুণে কৃপা ক'রে কর সুধা-বরিষণ।
ওহে চিন্তামণি, চিন্তাফণি বিষানলে জ্বলে জীবন;
আমি, অধম ব'লে অধমতারণ নিলাম শরণ ঐ শ্রীচরণ।
যেভাবে যে তোমায় ডাকে, সেই মূরতি দেখাও তাকে,
আমার, ছয়রিপুতে ঘটায় বাধা, পাইনা তাই দরশন।
দেখা যদি না পাই তব, তোমার অভয় নামটি লব,
ঐ নামের জোরে ডঙ্কা মেরে কালের শঙ্কা দূর করি।
কোথায় যাব, কারে শুধাব, কোথায় গেলে গৌর পাব,
এবার, পেলে দেখা হৃদয়-সখা হৃৎপদ্মে রাখব ধরি'।
গোঁসাই নরহরি বলে, পাবি গৌর সোনার কমলে,
থাক্‌রে তুই মৃণাল ধরি' তাঁরি আশায় হৃদয় ভরি'॥

(১১)

অষ্টপাশের এ বন্ধন আর কবে মন খুলব রে?
হেলাতে খুলিনি তখন, শক্ত হল বাঁধন এখন,
সময় যে হারালাম—এ কথা কারে বল্‌ব রে?
পাঁচটি কাঁটা ফুটে গেছে, দেখনা তার দাগ রয়েছে,
দাগ মিলাবে, পারে যাবে, তাহার উপায় কর রে।
গুরুবাক্য উপাসনা একদিনও তো ঠিক হ'ল না,
লাভ পাবে কি, মূল হারালে, দেখনা হিসাব ক'রে।
বাহিরে যে সাধুর মত, ভিতরে কু-কার্য্যে রত,
কতদিন আর রব ভুলে, যাবার দিন যে হলরে।
কী বলিবে এলে শমন, ভেবে একবার দেখলি না মন,
থাকলে স্মরণ গুরু-চরণ, শমন জয় করব রে।
নরহরি কয়রে মন, ধর এবার গুরু-চরণ,
ঐ অভয় চরণ-ভেলা পেলে ভব-পারে যাব রে॥

(১২)

বলছ যারে আপন ও-মন, সঙ্গে সে কি যাইবে ?
আনল যেজন, কোথায় সেজন, তারে কখন খুঁজিবে ?
ভেবে দেখ ওরে ও-মন, কিজন্য ভবে আগমন,
আসা-যাওয়ার দারুণ বেদন ভুলি' কি মায়ায় মজিবে ?
অনিত্য আত্ম-পরিজন, সময়ে সব বিস্মরণ,
আসবে যখন নিতে শমন, কেউনা রাখতে পারিবে।
কেন বিষয় গণ্ডগোল, সত্য ভুলি' মিথ্যা বোল্,
তখন, কোথায় রবে, কি বা লবে, কোথায় জমা রাখিবে ?
দুঃখের দুঃখী যেজন তাঁরে, ভক্তি-রজ্জু দিয়ে বাঁধনারে,
সেই, শমনদমন মধুসূদন কৃতান্তের ভয় নাশিবে।
নরহরি বলে রে মন, ভক্তি বিনা পায়না সে-ধন,
শরণ নিয়ে জপ নিতি, মনোব্যথা ঘুচিবে ॥

(১৩)

কেন বল ভাবনা এত, কর গুরু-পদ ভজনা,
ঠিকের ভয় কি এতই বেশী, নামে যায় ভব যাতনা।
জপ সদা কালো বরণ, আর করোনা কাল হরণ,
ঠিকের যদি যায় রে জীবন, মধু-সূদন নাম কেউ লব না।
সামান্য প্লেগের কথা, ভুলো মন দিও না ব্যথা,
ভবক্ষুধা নাশে নাম, তা' জেনেও কর ভাবনা।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ নিত্যবস্তু প্রেমানন্দ,
শরণে যায় নিরানন্দ, কেন আছ ভ্রমে বলনা ?
অকূল ভবনদীপারে যাবে যদি ভাব তাঁরে,
গুরু-চরণ কর্ণধারে ধ'রে পারে চলনা ॥

(১৪)

করুণা-নিধান করুণা কর দীনজনে,—
সকল সম্বল, ও-পদ কমল, কিছু নাই তোমা বিহনে,
দিন আগত, ক্ষীণ তনুমন, ভাবি কী উপায় হবে শেষক্ষণে।

মায়াতে ভুলিয়া রয়েছি আমি, তুমি বিশ্বাধার অন্তর্যামী,
করহে প্রভু মোরে নিষ্কামী, দুরাশা-বৃক্ষ নিধনে।
কত বল সহিব আর, এ যন্ত্রণার নাহি পার,
এ পতিতে প্রভু কর নিস্তার কৃপাবারি বারষণে।
করেছি জীবনে কত না পাপ, তাই পাই নিতি এত পরিতাপ,
হরিনামামৃতে যায় যে ত্রিতাপ, নাহি রহে ভয় শমনে।
যত অপরাধ মোর ক্ষমা কর, ওহে গুণাতীত গুণের আকর,
তোমা বিনা কে আর দয়ার সাগর, তরাইতে এই পতিত জনে?
দীন নরহরির এই নিবেদন, ওহে পতিতপাবন শ্রীমধুসূদন,
মন যেন মোর রয় সর্ব্বক্ষণ রাতুল যুগল ঐ শ্রীচরণে॥

(১৫)

কর্ম-ঘোরে ঘুরায় মোরে বারে বারে আসি যাই—
বল্‌গো ওরে কেমন ক'রে এ তাপিত প্রাণ জুড়াই?
নামের মালা রাখলে তুলে ভাসতে হয় কেবল অকূলে,
তরঙ্গেতে তরী দুলে তার কিনারা তো নাই।
মন প্রাণ যে হরিল, কোথায় বল তার ঠাঁই?
দেখায়ে রূপ মাধুরী মন প্রাণ করে চুরি,
আছে যে মোর হৃদয় জুড়ি', কেমন ক'রে তারে পাই?

(১৬)

সাধের জনম পেয়েছ যদিরে, হরিপদ কর সাধনা,
দিওনা হেলা, রবেনা বেলা, মায়া পাশে বাঁধা থেকনা।
কর গুণময়ের সৎগুণ গান, কর হরিনাম প্রেমসুধাপান,
সুমধুর স্বাদ পানে ঘুচে সাধ, রয়না বিষাদ-ভাবনা॥

(১৭)

অর্থে কি ভুলাবে রে মন, কিসের ভাবনা তার, যেজন
সকল ভাবনা করি' অর্পণ গুরু-পদে সঁপেছে প্রাণ।
গুরু যে সর্ব্বস্বধন, অমূল্য হৃদয়-রতন,

যে পেয়েছে তাঁর দরশন, সদা চরণ-সুধা করিছে পান—
তার তুল্য নাইরে সুখ, সদা চরণসুধা করে যে পান।
ঐ চরণ-চিন্তা করে যারা, জীয়ন্তে মরা হয়রে তারা,
চিত্ত নিত্য আত্মহারা, আন্‌-কথা শোনে না কান।
কামের মাঝি শ্রীচৈতন্য, শরণ নিলে হন প্রসন্ন,
গোঁসাই গুরুর কৃপাধন্য, হবেই তখন দিব্যজ্ঞান।।

(১৮)

আমার, যায় যায় এ পাপ-জীবন—
আমি, বৃথা ভবে এলাম গেলাম, হলনা ইষ্ট-সাধন।
পড়িয়ে অনিত্য মায়ায়, ভুলিয়ে ছিলাম হে তোমায়,
তাই, ভয় হ'তেছে সদাই, রক্ষা কর হে বিপদভঞ্জন।
চিক্কণ চাকীর লাগি' হয়েছিলাম অনুরাগী,
কামিনী-কাঞ্চনভোগী হয়ে ত্যাগী ঐ অমূল্যধন।
হিংসাহার গলায় প'রে, বেড়িয়েছি দম্ভ ক'রে,
গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা—এই ব্রত ক'রেছি পালন।
নরহরির এই উপার্জ্জন, কী হবে হে অধমতারণ,—
এই দাসের পাষাণহৃদে পদ দাও হে পতিতপাবন।।

(১৯)

আশানদীর কূলে এসে কেন ভুলে আছ মন,
তরঙ্গ হতেছে ভারী, পার হবিরে আর কখন?
শুনরে মন মূঢ়মতি, কৃষ্ণেতে না হ'ল রতি,
গুরুভক্তি গাঢ় রতি, ও তোর হ'লনা সাধন।
ডুবে সুখের আশা-নীরে, আসা-যাওয়া ঘুরে ফিরে,
এবার তোর কর্মে কীরে যাবেরে জীবন?

(২০)

যায় যাবে প্রাণ আমার যাবে, হরিনাম তো আর ভুলিব না;
লোকে বলে বলুক মন্দ, কারো বারণ মানিব না।

যারা 'আমার আমার' করে, তারাই আমার পরাণ হরে,
মরণকালে কেউ কারো না—
এসেছিলাম ল্যাংটা বেশে, যেতে হবে ল্যাংটা বেশে,
সঙ্গে কিছুই লব না ॥

(২১)

পরের জন্য কেন ভাবগো সবে ?
উঠবে কান্নাকাটি, পরে ছড়া-ঝাঁটি
দিয়ে ঘরের বাহির ক'রে সে লবে।
ভাঙা খাঁচায় কভু থাকেনা পাখী, একথা কাহার জানিতে বাকি
খাওয়ালে কি তারে তোমার হবে ?
যে হয় তোমার আপনজন, তারে খুঁজিলি না ওরে ও-মন,
নরহরি পড়ি' অকূল পাথারে, মায়াঘুম তার ভাঙিবে কবে ?

(২২)

ব'সে কি আর ভাবছ রে মন, ক্ষ্যাপা কেন হ'লি এমন ?
ত্রিজগৎ আরাধ্য যিনি, তাঁরে হলি বিস্মরণ।
সেই কথা মনে করনা, কেন পাপে মাতায় স্ব-বাসনা,
অসময়ে ফল হয়না, সময়ে না করলে সাধন।
এই বেলা তাঁরে ডাকরে, কেন ঘুরছ মিছা মায়া-ঘোরে,
শমন যখন ধরবে তোরে, বাঁচাবে কে বল্‌রে তখন ?
যা' কিছু সব প'ড়ে রবে, একলা পথে যেতে হবে,
আপন ভাব যাদের ভবে, কেউ না সাথী হবে রে মন।
গায়ে দিয়ে শালের জোড়া, হাতে গোলাপফুলের তোড়া,
আতর-গন্ধে হয়ে অন্ধ কর যুবতীর অন্বেষণ।
যে মুক্ত করে ভবের বাঁধন, ভুলেছ সে গুরুর সাধন,
কামেতে মজিয়া এখন সবধন দিলি বিসর্জ্জন।

হরিনাম সুধাসিন্ধু পান করনা একবিন্দু,
মুখের কথায় ভবসিন্ধু-পারে যায় কার সাধ্য এমন ?
লঘু-গুরু বিচার ক'রে বেড়াস না একদিনের তরে,
চলনা সৎপথ ধ'রে, কুপথে ধাও সর্ব্বক্ষণ ।
নরহরি কয় কাতরে, দয়া কর শ্রীগুরু মোরে,
নয়তো এ ভব-সাগরে অকূলে ডুবে জীবন ॥

(২৩)

অনিত্য আর ভেবোনা মন, কর গুরু-পদ সার ভাবনা—
সকলি অনিত্য ভবে, মিছা কেন আর কামনা ?
ভবার্ণব পার করিতে গুরু বিনা নাই অন্যজনা ।
জোয়ারের বারি যেমন দ্রুতবেগে করে গমন,
তেমনি আমার চঞ্চল মন ছুটায় সদা বাসনা ।
পবন হইতে দ্রুতগতি, তাই কর এত দুর্গতি,
দয়া করি' মম প্রতি শ্রীগুরুপদে মজনা ।
বুঝাব কত তোমারে, ঘুরায়ো না আর বারে বারে,
ভবার্ণব করে যে পার, এ মায়ায় তাঁরে ভুলনা ।
থেকোনা আর পরের কথায়, পুড়ায়ো না মিথ্যা ব্যথায়,
সত্য নাম সুধাপানে ঘুচাও ভব-যাতনা ।
যে-চরণ-তরী বিনে গতি নাই সে-নিদান-দিনে,
এ দীনে কয়, শরণ নিয়ে কর তাঁরি উপাসনা ॥

(২৪)

পারে যদি যাবে রে মন, ভাব গুরুর অভয়চরণ ;
ধরি' সেই চরণ-তরী ভাব গুরু-গৌরহরি,
অকূলের কাণ্ডারী হরি মনে প্রাণে লও শরণ ।
ভকতে সে ধন বিকায়, অভক্তে কভু না পায়,
দিনে দিনে দিন যায়, দিন থাকিতে কর স্মরণ ।
জীবের দুঃখনাশ তরে প্রভু নিতাই নাম ধরে,
নাম দেন অকাতরে আসা-যাওয়া করি' মোচন ।

ভবব্যাধি নাশিবে যদি, গুরুদত্তা মহৌষধি
পান কর মন নিরবধি, ষড় রিপু হবে দমন।
গুরুপদে প্রাণ স'পিলে কী করবে কাল-কুটিলে,
নিকটেতে থাকিলে বে সেই কালভয়বারণ ?

(২৫)

অষ্টবজ্রটানে যেন শেল হানে, শূন্যময় হেরি সকল ভুবন,
তোমা বিনে কে আব তরাবে এবার, ওহে কাল-ভয়-নিবারণ ?
চম্‌কে ওঠে মন কীসেরি কাবণ, ওহে শ্যামচাঁদ নীরদবরণ,
তুমি, হ'রেছ সকল, রেখেছ কেবল বাকী মোর এ জীবন।
এ দাসে মাযাপাশে বেঁধে কিহে নাশে, রক্ষা কর ওগো বিপদভঞ্জন,
মুক্তকর মায়া, দেহ পদ-ছায়া, এ পতিতে তার পতিতপাবন ॥

(২৬)

মন, ভ্রান্তিতে ভূলনা বাধাকান্তের চবণ ;
মায়ায়, ম'জো নাকো, কথা রাখ, হরিনাম কর গ্রহণ।
নাম বিনে আর গতি নাই, নাম নিয়ে ব্যথা ঘুচাই,
এ পরম সুধারে তাই সদা কর আস্বাদন।
ছাড়রে মায়ার কর্ম, সাধরে আপন ধর্ম,
ঘুচে যাবে এ দারুণ ভবের বন্ধন।
হেলা ক'রে গেল বেলা, চেয়ে দেখ ফুরায় মেলা,
ছেড়ে ভবের ধূলাখেলা যেতে হবে শমনভবন ;
ক'রোনা আর অবহেলা হরিপদে মজাও মন।
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, এ অধমে দাও কৃপাবিন্দু,
তব দাসী হব, সেবায় রব আনন্দে হয়ে মগন ;
ঐ রূপ হেরি' নরহরি জুড়াবে তাপিত নয়ন ॥

(২৭)

অনিত্য ভাবনা ভেবে কেন মর সর্ব্বক্ষণ,
মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি, কোথায় রবে পরিজন ?
বেলাবেলি চল চলি' করিতে সাধন,
অসময়ে কভু না হয় সে-আশা-পূরণ।
কাচ পেয়ে কাঞ্চনমণি কর অযতন,
জান না দিন গত হ'লে ধরিবে শমন।
নষ্ট হ'লে আসলধন ছাড়বে নাকো মহাজন,
গুরুপদে স'পিয়া মন কর তত্ত্ব-সাধন।
হ'লে দয়া যাবে মায়া, নিশ্চিন্ত হবে তখন,
ঘুচে যাবে আসা-যাওয়া, সদানন্দে হবে মগন ॥

(২৮)

কী আশার আশে আছ বসে, ওরে ক্ষ্যাপা মন,
অভয়পদ কর ভেলা, নয় অকূলে হবে মগন।
অকূলের কাণ্ডারী, দীনবন্ধু মুরারি,
দীনহীনের ভাব হ'লে, তার পাবি দরশন।
নামে ভব ক্ষুধা যায়, নামে ত্রিতাপ জুড়ায়,
নিষ্ঠা হ'লে কষ্ট যাবে, দুর্মতি হবে দমন।
পেয়ে দুর্লভ জনম, হারায়ো না এ ধন,
কী করিতে ভবে এলে, কী পেয়ে হও বিস্মরণ ?
দীন নরহরি কয়, এতো বাঁকার কর্ম নয়,
সরলে স্বরূপের দয়া, অধম তোর নাই স্মরণ ॥

(২৯)

দেবেনা, দেবেনা দিন দেখতে—
এখন ডাকরে দিন থাকতে ॥

(৩০)

হরি, হরি শব্দ কর রাত্রি দিনে—
হরিনামের ফল বুঝিবে সে দিনে,
যেদিন পার হবি অকূল ভব সাগরে ;
হৃদি কলেবর, সে যে পরের ঘর,
ভাড়া দিয়া বাস ভাড়াটে ঘরে।
যখন নোটিশ দিবে, উঠে যেতে হবে চিরতরে ॥

(৩১)

ভাই-বন্ধু-দারা-সুত—ছিলাম কার বেগারে ভাই,
এখন কী-ধন লয়ে যাই ?

(৩২)

বল, বল মধুর স্বরে বল, বল হরি বোল্,—
কে আমার, কে আমার ব'লে কেন বাধাও গণ্ডগোল ?

(৩৩)

ক্ষ্যাপা চৈতন্য—
কবে ক্ষ্যাপার মাঝে হব গণ্য ?
কবে বলবে, ওটা গেছে, হরিনামে ক্ষেপেছে,
সেইদিন আমি হব গো ধন্য।
নিতাই চৈতন্য ভজেছিল খড়দহের এক গোঁসাই,
সে, ভিটেয় ঘুঘু চরিয়েছিল, তার বংশে বাতি দিতে কেহ নাই ॥

(৩৪)

কী হবে আর বাঁধ বাঁধিলে ?
জল শুকালে, মীন পলালে, কী হবে আর বাঁধ বাঁধিলে ?
হ'লে অসময় সেই রসময় কভু না মিলে ॥

(৩৫)

অকারণ কেন রে মন কর ভাবনা,
সদাই ভাব গুরুপদ, যাবে ভব-যাতনা।
বহুবার ভ্রমণ ক'রে, মানব জনম পেয়েছ রে,
আবার ঘোর ভবঘোরে, মেটে নাকি বাসনা ?
সদা তীর্থ ভ্রমণ ক'রে, সাধের জনম গেল ওরে,
সৎগুরু ধ'রে ঘরের তীর্থ-তত্ত্ব জান না।
চিন্‌লিনা অমূল্য ধন, বেহুঁসে তোর যায় জীবন,
অকূল পাথারে এখন পারের উপায় দেখনা।
নরহরি কয় এ ধরায়, অধরারে ধরা না যায়,
সঁপি, গুরুপদে মন-কায়, কর অন্তরে সাধনা॥

(৩৬)

বন্ধু হ'রে নিল পথের সম্বল, তাই দেখে শমন হাসিছে কেবল,
এ দীনে সে-দিনে দিও চরণকমল, নইলে ঋণের দায়ে বাঁধিবে আবার।
বাণিজ্য করিতে ভবে আসা হ'ল, উপার্জনের মধ্যে হিংসাদি কেবল,
স্বখাত-সলিলে ডুবিতে হইল, কামাদি কুম্ভীরে টানে অনিবার।
নরহরির নাই ভক্তিধনবল, তবে কিসে পাব ও পদসম্বল,
নিজগুণে যদি দাও চরণে স্থল, নইলে এ অগতির গতি নাহি আর।
অনিত্য সুখেতে হারালাম সম্বল, তাই তো শমন শাসিছে প্রবল,
শুনি' সে শাসনে, দেখি' আপনধনে, কী আছে কী দিব ভাবনা অপার॥

(৩৭)

ভাব মন, গুরুপদ সার—
গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর ;
এই ভব-পারাবারে গুরু কর্ণধার।
গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে-পাপী নরকে মজে,
তার তুল্য কি পাপী আছে এ ভুবনে আর ?

গুরু বিনা ধ্রুব বনে কৃষ্ণ নাহি পায়,
পঞ্চম বৎসরের শিশু কাঁদিয়া বেড়ায়;
মন্ত্র দিলেন নারদঋষি, সদয় হলেন কৃষ্ণ আসি'
হেরিয়া সে মুখশশী বলেন, বৈকুণ্ঠ তোমার ॥

(৩৮)

গুরু ছেড়ে অন্যমতি করিলে হবে দুর্গতি,
ভবনদী পারে কভু যায়না সে জনা।
আসলে গলদ হ'লে, ব্যভিচারী তারে বলে,
জেনেও কি মন তুমি তাহা জান না?
গুরুনিষ্ঠা রাখ মন, যাবে নিত্য বৃন্দাবন,
কালভয় যাবে, হবে শমন দমন।
শিক্ষাগুরু কৃপা যারে, রাধাকৃষ্ণ মিলে তারে,
ঘুচে যায় অনায়াসে ভবের বন্ধন।
'হা গুরু গোবিন্দ' ব'লে, না কাঁদিলে সকলে,
শেষের দিনে কোথায় পাবে, পারে যাবার বল্?
অখণ্ড গোলোক ধামে বিরাজিত রাধাশ্যামে,
অন্তিমেতে সেই তো শুধু পারের সম্বল।
মিছে তর্কাতর্কি কর, শাস্ত্র ঘেঁটে কেন মর,
বৃথা বাদ অনুবাদে নাহি প্রয়োজন—
শিক্ষাগুরু বাক্য ধর, জীয়ন্তে যদি সে মর,
তবে প্রাপ্তি হবে তব মদন-মোহন ॥

(৩৯)

মন মজরে গুরুপদে, গুরু বিনা বন্ধু নাই,
সরলে সতত থাক, নাইকো পারের ভাবনাই।
স্বরূপ-সাধন বর্ত্তমানে, একর্ম নয় অনুমানে,
অনুমানে বেদের সাধন, এ ভাবনায় তারে না পাই।
অন্তরের ধন গুরু-চরণ অন্তরে রাখ সদাই,
পাবে দেখা হৃদয় সখা ব্যথাহারী সেই কানাই।

আমার এবার গতি নাই, কেঁদে নরহরি বলে তাই,
ডাকিলাম না কো মনে প্রাণে, কেমনে পাব গোঁসাই ?

(৪০)

আনন্দধামেতে এসে কেন ভুলে আছ মন ?
ভুলোনা দেখে ভোজের বাজী এ সকলি অকারণ।
নিত্যবস্তু ধন, তাই করগো যতন,
অযতনে রাখিলে ফেলে হারাবে রতন।
হারাইলে পিতৃধন, যাবে জনমের মতন,
দুর্লভ জনম পেয়ে পারের সম্বল কর অর্জ্জন।
আছে হৃদয় ভিতরে, দেখ জ্ঞান চক্ষু ধ'রে—
এযে, অকূল পাথার, পার হওয়া ভার, হয়না দিক তার নিরূপণ।
ক্ষ্যাপা নরহরি কয়, কূলে গুরু আমার রয়,
সাধ অধরারে ধ'রে, সদা নাম কর আস্বাদন॥

(৪১)

বল জয় গুরু-গোবিন্দ, যাবে মনের নিরানন্দ,
অনুরাগ হবে, ধর্ম ধন পাবে, অন্তরে জাগিবে সদানন্দ।
আমার আমার বোল্, এইটি গণ্ডগোল, কৈতব সব করহ বন্ধ ;
শুদ্ধ হ'লে কায়া যাবে মোহ মায়া, হবে গুরুর দয়া, ঘুচবে অহং-দ্বন্দ্ব।
পাবে যদি ভক্তি, রাখি' স্থিরমতি, সাধ নিতি, গুরু চরণ বন্দ' ;
কি করবে আপদে, স্থান পাবে শ্রীপদে, নয়ন ভরে হেরবে নিত্যানন্দ।
বিষম গোলে পড়ি' বলে নরহরি, এই ভাবনার আর নাইকো অন্ত—
পতিতপাবন গুরু, বাঞ্ছা-কল্পতরু, মজাও শ্রীচরণে মন-মকরন্দ॥

(৪২)

মিছে কেন আশাজালে জড়িয়ে দিলে দিন রজনী,
ঘরে ঠাকুর না চিনিয়া পায় কি কেহ চিন্তামণি ?
একে ভাঙা ঘরে বাসা,
তাহে কালপক্ষ-বাসা,
কোন্‌দিন ভাঙ্‌বে সুখের আশা, কর্মসূত্রের সে বন্ধনী॥

(৪৩)

অহঙ্কারে মত্ত হয়ে পরমতত্ত্ব পাসরিলে,
কারে জামিন দিয়ে সেদিন মুক্ত হয়ে এসেছিলে ?
জাননা দিন গত হ'লে, কালে নিয়ে যাবে চ'লে,
বুঝাবে তায় কি ব'লে, উপায় কিছু না করিলে ?
মুখে বল করি ধর্ম, সকলি তো হয় অধর্ম,
নিত্যকর্ম পরম মর্ম জেনেও কিছু না ভজিলে।
পেয়েছ সব পরিজন, ভেবেছ তাদের আপন,
ভাঙিলে সে সুখ-স্বপন, ছোঁবেনা কেউ তুমি মরিলে।
আদর কর অলঙ্কার, তুচ্ছ ক'রে নামের হার,
সঙ্গে যাবে কোন্ অলঙ্কার, গুরুর কাছে না জানিলে ?
পশুজন্মে যখন ছিলে, কত দুঃখ জানাইলে—
সময়েতে না ভজিলে, অসময়ে কি কথায় মিলে ?

(৪৪)

নামামৃতপান কর নিতি, যাবে ভব-যাতনা ;
সকলি অনিত্য—তাই মনে কর ভাবনা।
ভবার্ণবে তুফান ভারী, যন্ত্রণা আর সইতে নারি,
স্বসুখাশা দাও নিবারি', আর আমায় ঘুরায়ো না।
সতত সরল হইয়ে গুরুপদে মন মজাইয়ে,
নিরানন্দ ত্যাগ করিয়ে সদানন্দে মেতে থাক না।
শুদ্ধভক্তি ভরি' মনে বসাও তাঁরে হৃদাসনে,
নয়নজলে দাও চরণে পুষ্পাঞ্জলি পূজার্চ্চনা।
পঞ্চানন পঞ্চাননে সেই নামামৃত আস্বাদনে,
মৃত্যুঞ্জয় নাম ভুবনে করিলেন ঘোষণা।
কাতরে কয় নরহরি, ওহে দীনবন্ধু হরি,
ক্ষতি নাই যদি মরি, পতিত-পাবন নাম ছেড়োনা॥

(৪৫)

শ্রীগুরুভজন-সিদ্ধ মহাপুরুষের স্বভাব বর্ণন

শ্রীগুরু ভজন করে যেজন সেজন শুদ্ধাচার,
সরল সে জন, পায় দরশন, বলি বারংবার।
সর্ব্বস্ব করি' অর্পণ পেলেন তিনি পরমধন,
মহানন্দে সদামগন, দেখলে হবে চমৎকার।
নাশুনে আন্ বারতা, সহজ মানুষ সনে কথা,
নাইকো যাঁহার লোকাচার, কিসের ভাবনা আছে তাঁর।
আত্মসুখে নয় উন্মুখী, হরি নামামৃত পানে সুখী,
নামের লহরী লয়ে করেন গলার হার।
বাহ্যভাব ত্যাজ্য ক'রে, আছেন গুরুর চরণ ধরে,
সহজ মানুষ কে চিনতে পারে, বিনা মিষ্ট তার ?

(৪৬)

এ বাজারে এসে আমার ব্যাপার করা হ'লনা—
এলাম হেথা জমার জন্য, দেখি হ'ল খরচ গণ্য,
হিসাব দিতে গিয়ে শেষে, ঠিকে তো হায় মিল্‌ল না।
আসল বস্তু নাইকো স্মরণ, গোলেমালে কাল হরণ,
যায়না সঙ্গে ধন জন, মনে তো তা' পড়ল না।
ঘর বেঁধে সাধ ক'রে ভূত পুষি যে ভিতরে,
বাগ পেলে মারে ধরে, দয়া তারা করল না।
কেহ বলে জপ কর ভাই, ঠিক পারিলে ভয় কিছু নাই,
যখন দম্‌কা আসে আচম্‌কা, কি উপায় হবে বলনা ?
দীন নরহরি বলে, সাধগে যাই গঙ্গার জলে,
শ্রীচৈতন্য আছেন মাঝি, তাই ভাঙাতরী ডুবল না॥

(৪৭)

নাম এনেছে বর, ভবক্ষুধাহর, হরে কৃষ্ণ বল মনরে—
এই নাম নিষ্ঠা করি' বল বদন ভরি', দিবানিশি পান কর রে।
এনামের অন্ত, না পায় অনন্ত, ভব ভবসুখ ত্যজি' উন্মত্ত,—
হয়ে, কী ছার সুখে মত্ত হারাও পরমতত্ত্ব,
পারের পরম অর্থ কোথায় পাব রে ?
ত্রিগুণ অতীত, বেদবাক্যাতীত, এজগতে নাম কেই বা জানিত,
জীবের দেখি' ক্লেশ করুণা-আবেশ নিতাই নামধন আনিল রে।
দ্বারে দ্বারে ফেরে, বলে নাম নেরে, পার হবি ভব-সাগরে ;
পাবি প্রেমধন অমূল্য রতন, ত্রিতাপজ্বালা হবে দূর রে।
আমার আমার ভুলে যাও, নামে প্রাণ বাঁচাও,
পিও শান্তিবারি ভব ভয়হারী, গুরু বাক্য করি' ঐক্যরে ॥

(৪৮)

আমার আমার কর, ঘুরে ফিরে মর, আমাতেই আছে আমার যে জন ;
তবে কেন আর ভাব আত্মপর, পথ হারায়ো না অন্ধ যেমন।
শিক্ষাগুরু-চরণ, করগো ধারণ, কৃপা হ'লে পাবে ভজন-সাধন,
সাধিলে যাইবে আসার চিন্তন, দেখিতে পাইবে শ্রীগুরু-চরণ।
শমন আসিয়া তাহার কী করে, শ্রীগুরু শ্রীপদ হৃদয়ে যে ধরে,
ঐ চরণ যে সেবে, কালে ফাঁকি দেবে, বৃথা হাসা কাঁদা ঘুচিবে তখন।
ভবনদী মাঝে প'ড়ে যদি মরি, কেশে ধরে তুলে নিও গৌর হরি,
এ অধম আছে শ্রীচরণ ধরি', মায়া মোহে মুগ্ধ ক'রো না জীবন।
গোঁসাই নিতাই বলে, শোন্‌রে নরহরি, স্থিরচিত্ত হও, দেখবে গৌরহরি,
রবেনা ভাবনা, যাবেরে যাতনা, হিংসা নিন্দা তম কররে দমন ॥

(৪৯)

কবে তব প্রেমে পাগল হইব,
নামসুধাপানে জ্বালা জুড়াইব ?
ছেঁড়া কাঁথা গায় করি' শুধু সার, ভুলিব অসার সব সংসার,
তব নামামৃতে তাপ নিবারিব ?

কবে ত্যজব মায়া-মোহের করম, জাতি-কুল-শীল-মানের ভরম,
শ্রীচৈতন্যে স্ব-চৈতন্যে নিরখিব ?
কবে বৃন্দাবনে করব মাধুকরী, ঘৃণা-লজ্জা-ভয় সকল পাসরি',
কবে তাঁর নামে হাসিব কাঁদিব ?
নরহরি বলে, শোন্‌রে ওরে মন, হরিনামে যায় সকল বেদন,
হ'লে সরল চরণ-কমল পাইব ॥

(৫০)

কামানলে যায় জীবন জ্ব'লে,—
কোথায় রবে ভজন-সাধন দেহ ভস্মীভূত হ'লে ?
নাশ সুধা রাশি রাশি, যায় যে সবি জলে ভাসি',
এখন কি আর বালির বাঁধে রাখতে পারে সে-কল্লোলে ?
কাম-কুম্ভীরে ছিঁড়িয়া খায়, অস্থির সদা প্রাণ যাতনায়,
নেভাতে নারে জলে প্রবল এ অনলে।
গুরুবাক্য শ্রবণ ক'রে রেখেছি চরণ হৃদে ধ'রে,
আসবে কেমন ক'রে শমন, শমন-দমন পদকমলে ?
কাঙাল নরহরি কহে, ছেড়োনাকো কামের ভয়ে,
জপ অন্তরেতে মদন-মোহন, পাড়ি দাও গৌর গৌর ব'লে ॥

(৫১)

পরের কথায় ভুলো না—
ভণ্ড যারা মজায় তারা, বলে কভু ভালো না।
জানায় যারা ভালবাসা, তারাই ভাঙে সুখের বাসা,
মিছে কর তাদের আশা, মনে বুঝে দেখো না।
সুজনের সঙ্গে চল, গুরু-চরণ-যুগল
ভজলে যাবে মায়ার ছল অনিত্য কামনা।
যেওনাকো নদীর ধারে, রক্ষা ক'রো আপনারে,
কৃপাময়ের কৃপা হ'লে, যাবে ভব-যন্ত্রণা।
যেজন্য এই ভবে আসা, এখন কৈ সে আছে আশা ?
কেবলমাত্র ক্ষুৎ-পিপাসা, এ মায়ার খেলা খেলো না।

নরহরির ভাবনা এই, আমি মরি ক্ষতি নেই;
ধন হরি ওহে হরি, নামে কলঙ্ক এনো না ॥

(৫২)

আহামরি কী আনন্দ, হরি বল বদনে—
হরি বল বদনে, ঐ নাম শুনরে শ্রবণে।
হরি নামে কতসুধা জানেন পঞ্চানন,
তাই, মত্ত দিবানিশি পান করেন পঞ্চ আননে।
জপ সদা হরিনাম, ভব-ব্যাধি হবে আরাম,
সাধরে অধরে ধ'রে, রাখরে যতনে।
হৃদয় রতন হরি চরণ, আর ধন সব মিছে,
যাবার বেলা একলা যাবে, প'ড়ে রবে সব পিছে।
নরহরি বলেরে মন, এই বেলা কর সাধন,
নয় দরজা খোলা আছে, পাখীর পলায়নে ॥

(৫৩)

আমার বল ভেবে কী ভাবে ?
একলা এলে, একলা যাবে।
আমারে চিনেছে যেজন, জীয়ন্তে মরেছে সে জন,
শ্রীচৈতন্যের কৃপা যাঁরে, সে-কৃপা তাঁরে চিনাবে।
ঘরের ভিতর চোর পুষিলে, আসল বস্তু খোয়াইলে,
মহাজনে জিজ্ঞাসিলে কিধন লয়ে তাঁরে দেখাবে ?
সিন্দুকে ধন ভরা আছে, চাবি দিলে পরের কাছে,
ধনহীন হয়ে পাছে আসামী হয়ে দাঁড়াবে।
যে তোমার হয়রে আপন, ভক্তি-ডোরে কর বন্ধন,
মনে মনে কর পূজন, অমূল্য ধন দেখতে পাবে ॥

(৫৪)

গুরুপদ যে করে সার, কাজ কিরে তার বেদাচার ?
নাই প্রয়োজন আন্-সাধনে, সঁপে যে মন গুরু-চরণে,

মন্দ বলুক অন্যজনে, তাতে কী বা ক্ষতি তার ?
কোসাকুসি কীতার কাজে, মিশেছে যে গুরুর মাঝে,
হারায় দিশা দিবানিশি, গুরু নামে মত্ত চিত্ত যার।
কাঙাল নরহরি কয়, ভাগ্য মোর মন্দ হয়,
এখনো গেলনা দ্বন্দ্ব, আনন্দ কি হবে আর ?

(৫৫)

ভরমে ভক্তি করি, তাই সাধন হ'লনা ;
মুখে বলি তোমার হ'লাম, কাজে অন্যমনা।
ক-খ ছেড়ে চূড়ায় চড়তে করি বাসনা,
গুরু ছেড়ে গোবিন্দ যে হয়না ভজনা।
স্থিররতি কেমনে পাই, 'তৃণাদপি' হ'তে পারি নাই,
অহঙ্কারে মত্ত, জানে আত্মখবর ক'জনা ?
ষোলো দিকে ষোলোভাবে গুণ টানিছে ষোলোজনা,
এসো ত্রিবেণীতে নিতাই, নইলে প্রাণে বাঁচব না ;
তোমার সুখে সুখী ক'জন, সবার আত্মসুখ কামনা।
উপরে জ্যোতি, পোড় দিলে পর পিতল যায় জানা,
বিচারেতে বিদ্যাবাগীশ, নিজে কিন্তু দিন কাণা।
এ দীন নরহরি কয়, বাইরের ছটা নাহি রয়,
অগ্নি-পরীক্ষাতে প্রমাণ হয়, যে জনে মেকী সোনা ॥

(৫৬)

চকমকির পাথর যদি প'ড়ে থাকে জলে,
ভিতরে তার সাধের আগুন গোপনেতে জ্বলে।
তুলে এনে ঠুক্‌লে পরে ফিন্‌কি দেয় যারা,
ভবের জলে তেম্‌নি জেনো ভক্তজনের ধারা।
ধৈর্য্য ধ'রে যে ভক্তজন করে ভক্তি-সাধন,
আজ নয় কাল পাবেই পাবে সে-চরণ কমলে ॥

(৫৭)

কার জন্য ভাব, মন গুরু-পদাম্বুজে মজাবে ;
গুরুপদে প্রাণ সঁপিলে সকল দুঃখ দূরে যাবে ।
নিজ গরজ থাকিতে, ভাই, ভবপারের ধন নাহি পাই,
কৃষ্ণ-সুখের সুখী হইলে তবে পরমানন্দ পাবে ।
আত্মসুখার কার্য্য তো নয়, ব্রজ গোপী সাক্ষী সে রয়,
আনুকূল্য-অনুশীলন রাধাকান্তে সে মিলাবে ।
নরহরি বলে রে মন, করলে ভবে কর্ম সে কোন্,
পরকে দিয়ে আপন ধন, শেষে দেউলে বনাবে ॥

(৫৮)

দিন গেল মন শুতে খেতে—
গুরুমন্ত্র উপাসনা করলি নাকো জীবনেতে,
স্বরূপ-শ্রীরূপতত্ত্ব সাধলি নাকো সময়েতে ।
গয়াগঙ্গা বারাণসী, মন, যেতে চাও পুণ্য লাভেতে—
সর্ব্ব তীর্থ শ্রীগুরুপদে, দেখলি না নয়নেতে ।
থাকিতে অমূল্যধন, কেন যাও বৃন্দাবন ;
কল্পবৃক্ষ শুকাইলে ফলে কি ফল সে-বৃক্ষেতে ?
কাঁচারস ট'কে গেলে, ভিয়ান্ হয়না সে-রস জ্বেলে,
সময়েতে না সাধিলে, কী হবে কাল হ'লে যেতে ?
নরহরি বলিছে, ও-মন, হরিপদে মজনা,
ভ্রান্তিতে পড়িয়ে সদা ভব-ঘোরে থেকোনা ।
মিছে কর আমার আমার, চেনোনা কে আপন তোমার,
প্রাণপণে চিন্তা কর, দেখতে পাবে সাধনেতে ।
যেদিন এসেছি ভবে, বলেছি ভজিব কেশবে,
এখন লোভ লাগি' লাভে মূলে হারাইলে অন্তিমেতে ।
নষ্ট হ'লে আসল ধন, ছাড়িবে না মহাজন,
গুরুপদে সঁপিয়ে মন, কর ইষ্ট-সাধন ।
হ'লে দয়া যাবে মায়া, মুছে যাবে চিন্তা-ছায়া,
ঘুচে যাবে আসা-যাওয়া, দেখবে তাঁরে নয়নেতে ॥

(৫৯)

অনিত্য ভাবনা ভেবনা, কর হরি-সঙ্কীর্ত্তন মন ;
রাধাকৃষ্ণ বল, যথা রাধাকৃষ্ণ তথা বৃন্দাবন।
যে-নামের লাগি', শিব যোগী ত্যাগী,
মনে অনুরাগে হয়েছে বিরাগী,
সব ত্যজি' শ্মশানবাসী হয়েছে সেই পঞ্চানন।
রাধাকৃষ্ণ বল, একবার হৃদয়মাঝে কর দরশন,
রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন—
শ্যামকুণ্ড থেকে একবার রাধাকুণ্ডে কর
রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন॥

(৬০)

ভাবিলে ভাবনা যাবে, ভাব তাঁরে অন্তরে—
যে-পদ ভাবিয়া শিব শ্মশানে বাস করে।
জীবে কি বুঝিতে পারে, তর্কে না জানিবে তাঁরে,
ভাবিতে গুণিতে দেখ, শেষের দিন আসিল রে।
নাম সুধাপানে ভোলা সকল ভুলিল রে,
মৃত্যুঞ্জয় নাম তার হ'ল কিসে ভাবরে।
নিত্যধনকে নেত্রে হেরে অম্বর না পরে,
ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, তাঁরে চিন্‌বে কি এ ভণ্ডরে ?

(৬১)

কবে, আমার আমি ভুলে যাব, তোমার আমি হয়ে রব,
সেদিন আমার কবে হবে হরি ?
কতগুণের তুমি আমার, ওহে সর্ব্ব গুণাধার,
কেমনে তোমারে পাসরি ?
তোমারে ধরিয়া বুকে, সময় যাপিব সুখে,
করিব শ্রীচরণ-চুম্বন—
সমুদ্রে নদী মিশিবে, নিজ সুখ পাসরিবে,
বহিবে আনন্দ-লহরী॥

(৬২)

কৃষ্ণ-প্রেম কি চাইলে মিলে,
গোপী-ভাবাশ্রিত সখীর অনুগত না হইলে ?
জীবে কভু সম্ভবে না, সম্ভবে না ;
যেমন, উলুকে রবির কিরণ দেখে না—
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম ভাগ্যে না ফলিলে।
যে প্রেম কবিরাজ লিখিলেন,
যেন জাম্বুনদ-হেম—
তারে পাথর ব'লে পরশ রতন ফেলে দিলে ॥

(৬৩)

মিছে কেন আশাজালে, জড়িয়ে রও দিন গণি ?
মায়া-প্রেমে মজলে শেষে কাঁদতে হবে দিন-রজনী।
দুঃখের দুঃখী হয় যে যার, লেনা-দেনা সঙ্গে তার,
খণ্ড প্রেমিক প্রেম পাবেনা, অখণ্ড প্রেম শিরোমণি।
মানুষ পেলে মনের মত, বলবে খুলে কথা যত,
উভয়ে অখণ্ড হ'লে ব্রজরাস দেখবে ধনী।
নরহরি যায়রে ব'লে, কৃষ্ণ-প্রেম পেতে হ'লে,
সার ভেবে হৃদে ধর গুরু-চরণ-তরণী ॥

(৬৪)

ভাব না জেনে প্রেমনদীতে ভেসে যেওনা,
সে যে অকূল পাথার, কূল মেলা ভার,
বৃথা সাঁতার দিওনা।
প্রেমের কথায় উল্টে মাতায়,
যায়না মনো-বেদনা ;
মুখের কথায় প্রেম নাহি পায়,
না করিলে সাধনা।
প্রেম নদীর কূলে রইলে ভুলে,
এ ফাঁসি গলে রয় লগনা,
তখন হয় বিরাগী অনুরাগী,
সয় না যাতনা।

যাহার নাই প্রেমের গন্ধ, সেই বাধায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব
কর্মকাণা হয় সে জনা।
অন্ধে দেখে হাতী যেমন, তেমনি তাহার উপাসনা।
নিষ্কামী নির্বিবকারী, তারাই প্রেমের অধিকারী—
যতসব আহিরী নারী, গোপী ব্রজাঙ্গনা;
নরহরি বলে, হাটে যায় না কেনা প্রেমের সোনা॥

(৬৫)

সহজ-মানুষে কে চেনে সহজেতে?
ও তার, আচারে নাই চিহ্ন, বিচারে বিভিন্ন,
হেমাব্জবরণ শুনি শ্রবণেতে।
সংস্কার-জনি অযোনি-সম্ভব,
দেবনর লোকে সে-ধন দুর্লভ,
বিধি-কৃষ্ণ-বিষ্ণু যারে ভাবেন ভব;
তারে, কেমনে জানিবে জীব ক্ষুদ্রেতে?
ভরতমুনি একদিন রেবানদীর কূলে,
মধুর মানুষ লীলা দেখেন তরুমূলে,
সেকথা জানালে গোলোকনাথে খুলে,
ঢাকা দিলেন তিনি সোমরসছলনেতে।
সেই অনুরাগে এলেন বৃন্দারণ্য,
গোপীসহ খেলা কৈল লীলা ধন্য,
তারে না পাইয়া হইলেন চৈতন্য,
লয়ে ভাব দৈন্য এলেন এ যুগেতে।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর ক'রে গৌর লীলা,
গুপ্তে সুমাধুর্য্য ভাব আস্বাদিলা,
'নিত্য' 'নিত্য' করি' কত যে কাঁদিলা,
কে বুঝে সে-লীলা জীবে ব্রহ্মাণ্ডেতে?
নরহরি বলে, বলব সে কী-কথা,
কইতে জিহ্বায় বাধে, মর্মে পাই ব্যথা,
শোন্‌রে ক্ষ্যাপা, সেতো নাহি যথা তথা—
রূপ-রসেতে গাঁথা জলেরি পথেতে॥

মা তৃ-ব ন্দ না

(১)

সতত তোমারে ডাকি, ওমা বিপদবারিণী,
তাপিত তনুর তাপ, হর ত্রিতাপ হারিণী।
কভু হর, কভু হরি, গৌরাঙ্গ জগত-গোঁসাই,
নারায়ণ নরকান্ত, তুমি গো বটপত্র শায়ী।
ওমা, দশভুজা জগদ্ধাত্রী, তুমি জীবের মুক্তিদাত্রী,
সকলি তোমারি খেলা ত্রিজগত প্রসবিনী।
ডাকিতে জানিনা তোমায় কী ব'লে ডাকিতে হয়—
নিজগুণে দয়াময়ী দীনে যদি হও সদয়।
তবে তো দেখিগো ভালো, নহে তো পরাণ যায়,
নিরুপায়ের উপায় ঐপায়, হে মা পতিত তারিণী॥

(২)

তোমা বিনা তরিবে কে এ পতিত জনে?
কৃপা করি' ঘুচাও মা এ ভব-বন্ধনে।
হায় মা কী তোর ভবের খেলা, জেনেও হারালাম বেলা,
কোন্ দিন ভাঙবে সাধের মেলা, সেদিনের ভাবনা নাই—
এ আনন্দ নিরানন্দ সাধের দেহ পতনে।
নরহরি তাই যে ডাকে পড়িয়ে বিষম বিপাকে,
মন যেন ঐ পদে থাকে, এই ভিক্ষা চাই—
মাগো, কাঙাল দেখে ও-চরণ তোমার রেখোনা গোপনে॥

(৩)

হৃদয়েরি ব্যথা হৃদয়েতে গাঁথা রহিল আমার,
কী করিব, কোথা যাব, ত্রিতাপে জ্বলি অনিবার।
মা'র কাছে গেলে দুঃখ নাহি রয়,
মম ভাগ্যফলে মা কৈ গো সদয়,

এ দুঃখেরি কথা কাহারে জানাব,—
শুনিয়া করিবে এ শোকের প্রতিকার।
পিতার ধর্ম তুই সন্তানে দেখালি,
তাইকি পাষাণী অকূলে ভাসালি ?
আমি ম'রে যাই, তাহে ক্ষতি নাই—
না ছাড়িব কভু নামটি তোমার।
দীন নরহরি ঐ করেছে সম্বল,
কী করিবে শমন, কী আছে তার বল ?
পাছে হ'রে নাও চরণ-কমল—
তার চেয়ে বিপদ নাহি তো মা আর ॥

(৪)

দানব দলনী দুর্গে, এইবার দীনে দে মা চরণ,
সঙ্কটনাশিনী মাগো, সঙ্কটে করহ মোচন।
ভীষণ তরঙ্গ মাঝে ফেলে রাখা কি তোমায় সাজে ?
সতত চঞ্চল চিত, হয়না সময় ডাকার মতন।
কেমনে পূজিব পদ, সতত ঘিরে বিপদ,
শান্তি দে মা শান্তিময়ী, শান্তিতে পূজিব চরণ।
নরহরি কাতরে কাঁদে, রেখো না মা মায়ার ফাঁদে,
ত্রিতাপেতে জ্বলে মরি, হ'লনা অভীষ্ট-সাধন ॥

(৫)

সমুখে এসে দাঁড়াও গো মা, হেরি তোমার ঐ যুগল চরণ,
আসার আশা পূর্ণ হবে, শীতল হবে দুটি নয়ন।
পাপী তাপী তুমি তার, তাই, দীন-তারিণী নাম তোমার,
অধম পাতকী মা আমার, এবার উপায় কর এখন।
দয়াময়ী নাম ধর, কেন, দয়াদানে কুণ্ঠা কর,
মা যদি হও কঠিনা, কে আর বাঁচাবে জীবন ?
কত ঘুমাবি মা মূলাধারে, নয় দরজা মুক্তাগারে,
কখন শমন আসবে দ্বারে, জানিনা তার নিরূপণ।

দাওমা শ্রীচরণ বারি, পানে শমন ভয় নিবারি,
তোমা বিনা ক্ষেমঙ্করী, কে করিবে সঙ্কট মোচন ?
অকূল এ ভব-সাগর, তরঙ্গ ভীষণতর,
নিজগুণে পার কর, দিয়ে তোমার অভয়চরণ।
ভব-বিরিঞ্চি-বাসবে, ঐ চরণ ভাবে সবে,
নামের গুণে ভব ভবে ভব-ক্ষুধা করে বারণ।
শুনেছি বেদ-পুরাণেতে, কালভয় যায় ও নামেতে,
স্বগুণে নির্গুণময়ী এদাসের আশা কর পূরণ ॥

(৬)

শান্তি দাও মা শান্তিময়ী, অভয় চরণেতে ধরি,
মায়াতে মোহিত চিত, ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে মরি ॥

(৭)

মা গো, জাগো, কুল কুণ্ডলিনী মাগো—
আমায় কাম-কুম্ভীরে টেনে খায় ॥

(৮)

রাধা গোবিন্দ নামে মজ ওরে মন—
ঐ নাম, পান কররে দিবানিশি, ছোঁবেনা আর কাল শমন।
রাধানাম সুধা সিন্ধু, পান করলি না একবিন্দু,
মুখের কথায় ভবসিন্ধু পারে যায় কার সাধ্য এমন ?
দিন হ'লে ছাড়বে না শমন, জেনেও কি জাননা মন,
বুঝাইলে বোঝনাকো, থাকতে চোখ অন্ধ যেমন।
নামে তরে অধমজন, নামে পায়রে প্রেমধন,
রাধা নামের মালা প'রে জুড়াবে তাপিত জীবন।
আসা-যাওয়ার যে যন্ত্রণা, জপলে নাম আর পাবনা,
আসার পথে আর যাবনা ভাবলে মায়ের অভয় চরণ।
নরহরি তাই তো বলে, রইলে ভুলে মায়ার ছলে,
মিলবে না সে পদ কমলে, সময়ে না হ'লে সাধন ॥

রাধাগোবিন্দ নাম শুনায়ো নিদানে,
শেষের দিনে ঐ মধুনাম শুনায়ো শ্রবণে,
তোমরা সবে বলবে 'রাধা' 'রাধা' বুলি,
স্কন্ধে দিবে আমার রাধা নামের ঝুলি,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখাইবে ভক্তপদধূলি,
নয়নমুদে চ'লে যাব বৃন্দাবনে।
এখন জিহ্বা স্ববশ আছে, বলি বাহু তুলি,'
পাব দেখা ভক্তি যদি রয় চরণে।
সঙ্গের সম্বল ঐ কেবল রাধা-নাম,
মায়ায় ম'জে ভুলোনা কেউ বল অবিরাম,
নাম গাহিতে হবে তখন পাগলের মতন,
অনিত্য বাসনা আর আসিবে না মনে।
অকৈতবে ভজনেতে, ঘরে রও আনন্দে মেতে,
জিহ্বা গেলে কুপথেতে বেঁধে রেখো ঐ চরণে॥

সঙ্গীত-সুধা সংগ্রহ

গুরুকৃপা-দীপিকা-টীকা

শ্রীশ্রীনরহরি সঙ্গীত-সুধা প্রধানতঃ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) কৃষ্ণলীলাত্মক, (২) গৌরলীলাত্মক, (৩) সাধন উপদেশ সমন্বিত, (৪) মাতৃবন্দনামূলক। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গীতেই ধর্মসাধন পথের ক্রিয়া, উপদেশ, সাধকের প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ অভিজ্ঞতা, নানা ভাবোদয়ের প্রকাশ এবং কোনো কোনো সঙ্গীতে সিদ্ধ সাধকের ভাবমুদ্রার আভাসও আছে। এইসব নিগূঢ় ও সুদুর্লভ অভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি একমাত্র গুরুকৃপাবলেই বোধগম্য হয়, বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা নয়। সেই পরম করুণাময় নরহরি প্রভু কৃপা ক'রে তাঁর এই অধম শ্রীচরণাশ্রিতের অন্তরে যে সকল অনুভূতি স্ফুরিত করেছেন, তারই কিঞ্চিৎ এই 'গুরুকৃপা-দীপিকা-টীকা'য় সন্নিবেশিত করতে চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, এসব অনুভূতি সবই শাস্ত্র-বচন সমর্থিত—সে সকল বচনও যথাসাধ্য যথাস্থানে উদ্ধৃত করব; সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর আজ্ঞামত—"সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন"—চৈঃ চঃ ২।২৪।২৫৫।

কৃষ্ণলীলাত্মক সঙ্গীত

কৃ ১, ২ ॥ অন্তশ্চিন্তিত দেহে কৃষ্ণলীলা স্মরণ। কৃষ্ণরূপ, তাঁর পূজার আয়োজনার্থ পুষ্পচয়ন ও অন্যান্য সেবা এবং গোষ্ঠলীলার বর্ণনাগুলি এতই সুস্পষ্ট, প্রাণবন্ত ও মর্ম্মস্পর্শী যে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়—এ বর্ণনা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভব নয়।

কৃ ৩ ॥ কৃষ্ণবিরহাকুল রাখালগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ; অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে কৃষ্ণসখার অনুগত হয়ে সেই লীলা-স্মরণ। এই ধ্যান-মঙ্গল লীলাও অনুরূপভাবে হৃদয়গ্রাহী। তাঁকে প্রাণখুলে ডাকলে তিনি যে আসবেনই—এই দৃঢ় প্রত্যয়ের সুস্পষ্ট ছাপ আছে এই সঙ্গীতে।

কৃ ৪ ॥ কৃষ্ণ জন্মদিনে সিদ্ধভক্তের দর্শন। এই দর্শনে তিনি যে অপূর্ব্ব আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হন, তার কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করেছেন এই সঙ্গীতে। তিনি স্পষ্ট দেখছেন, যিনি ত্রিলোকপালক বিষ্ণু, যিনি অকূল ভবসাগরের একমাত্র কাণ্ডারী—তিনি আজ লীলা-অনুরোধে বালকবেশে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে মাতৃক্রোড়ে 'মা' 'মা' ব'লে ডাকছেন। তিনি যে বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন—ভূতলবাসীর আজ কী সৌভাগ্য! তাঁকে দর্শন ক'রে তারা তাদের পাপ তাপ নিবারণ করছে। আজ আর কোনো বাধা নেই, আচণ্ডালে তাঁকে দর্শন করছে। কিন্তু এ দর্শনের জন্য চাই দিব্যচক্ষু—সাধনপক্ক অপ্রাকৃত নয়ন।

কৃ ৫ ॥ অনুরূপভাবে বর্ণনা করছেন রাধাজন্মদিনে রাধারাণীদর্শনের চিন্ময় আনন্দ। তাঁর ভুবনমঙ্গলরূপ ধ্যানে একটি অনুপম দৃশ্যের কথা প্রকাশ করেছেন—সেটি তাঁর অপরূপ 'নখ-চন্দ্র'। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণরূপ বর্ণনায় যে নখ-চন্দ্রের কথা বলেছেন—এ সেই নখ-চন্দ্র-কান্তি, "পদনখচন্দ্রগণ তলে করে নর্ত্তন"—২।২১।১০৭, শ্রীমদ্ভাগবতেও বলেছেন : "ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে" ১১।২।৫৪, এবং "যৎপাদপঙ্কজ পলাশবিলাস" ৪।২২।৩৯—অর্থাৎ ভগবানের পদাঙ্গুলি নখমণির স্নিগ্ধকান্তি দ্বারা ভক্তের হৃদয়তাপ দূরীভূত হয়, এবং যাঁর পাদপদ্মের অঙ্গুলি-গুলির কান্তিস্মরণমাত্র ইত্যাদি। বাস্তবিকই, কৃষ্ণ ও রাধা-অঙ্গ চন্দ্রময়। সাধনার উচ্চতমস্তরে এই 'চন্দ্র'-সাধনায় চন্দ্রময় রাধাকৃষ্ণতনু ভক্তের অপ্রাকৃত চিত্তে উদিত হন। 'নখ-চন্দ্রে' সেই রূপেরই ইঙ্গিত আছে।

রাধানাম ভবক্ষুধা অপহরণকারী। কৃষ্ণনামের মত এ নামও "ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্"—চৈঃ চঃ ৩।২০।১৩। পারের কাণ্ডারী শ্রীগুরুর কৃপা হ'লে জ্ঞানচক্ষু লাভ হয়—তখনই এই রূপ দর্শন হয়। এ রূপ দর্শন পেলে আর "ভয় কি আছে শমনে", অর্থাৎ তাকে আর জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে পড়তে হয় না। ভগবান্ বলেছেন, "তান্ মৃত্যোরতি পারয়ে"—ভাঃ ৩।২৫।৪০, অর্থাৎ আমি তাদের মৃত্যুপথ থেকে পরিত্রাণ করি। "ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে"—ভাঃ ১০।৮২।৪৪, অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তিই জীবের অমৃতত্ব প্রদান করে।

কৃ ৬ ॥ সিদ্ধসাধকের কৃষ্ণরূপদর্শন ও বংশীধ্বনি শ্রবণ লালসা। লুকাও কেন ?—লীলাময় হরির ভক্তের কাছে লুকোচুরি খেলা। এর প্রকাশ হয়েছিল ভক্তভাব অঙ্গীকৃত স্বয়ং মহাপ্রভুর,—তাঁর শ্রীমুখোচ্চারিত শ্লোকে—"প্রাপ্ত প্রণষ্টাচ্যুত বিত্ত আত্মা" —অর্থাৎ "প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া, তার গুণ সঙরিয়া মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল"—চৈঃ চঃ ৩।১৪।৩। আবার অন্তিম সন্নিকট জ্ঞানে এবং জীব ষড়রিপুর বশীভূত ব'লে সাধকরূপে দৈন্য সহকারে কাতরোক্তি প্রকাশ করছেন,—"এল আঁধার, ঘরে আমার বাদী ছ'জনা।"

কৃ ৭ ॥ যুগলরূপ স্মরণ। বৃন্দাবনধাম যে হৃদয়েই অবস্থিত, এবং সেই হৃদয় বৃন্দাবনেই তাঁর যুগলরূপ আবির্ভাব সম্ভব তারই সুদৃঢ় প্রত্যয় ভরা এই সঙ্গীত। এই যুগলরূপ দর্শন তখনই সম্ভব, যখন জীব দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর কৃপালাভ করে। তার জন্য চাই উপযুক্ত সাধন এবং সাধনসম্বল 'কড়ি-বল'। কড়ি-বল এর অর্থ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য। বহু জন্ম সাধনবলে সাধুগুরু কৃপাতেই তা' লাভ করা যায়। প্রভু নিজ স্বভাবসিদ্ধ দৈন্যে বলছেন, "আমার, নাই কড়ি-বল, ভয় যে কেবল।"

গৌর লীলাত্মক সঙ্গীত

শ্রীকৃষ্ণই যে কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এই লীলাতেই যে রাধাভাবে প্রেমাস্বাদনের পরম চমৎকারিতা ও ভক্তগণের তথা, সাধারণ জীবের প্রতি করুণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে, তারই নিদর্শন বহন করছে এই সঙ্গীতগুলি।

গৌ ১॥ "মনচোরা গৌরহরি"—পূর্ব্বজন্মের সাধনা না থাকলে, গৌরহরি কারো মনোহরণ করতে পারেন না। এই সাধন দ্বারাই সাধক তার সর্ব্বস্ব গৌরহরির শ্রীচরণে সমর্পণ করতে পেরেছে। কিন্তু সাধক তবু তাঁর মন পাননা—ভক্তের কাছে এই হচ্ছে ভগবানের লুকোচুরি খেলা। তাই অভিমান হয় ভক্তের। তাঁকে ভুলে থাকার জন্য দুর্জ্জয় অভিমান করেন; রাধারাণীর মত বলেন, "ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য, যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ"—চৈঃ চঃ ৩।১৭।৫১। কিন্তু বাইরে চেয়ে দেখেন, সেখানে তো তাঁর আপন কেউ নেই,এ যে অকূল ভব পারাবার, এখানে সতত ভবক্ষুধা, ত্রিতাপ জ্বালা। তাই পরমুহূর্ত্তেই বলেন, না, না, ঐ যুগল চরণ দাও সখা, নইলে যে জীবন জলে যায়। ঐ "অঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়ানিরস্ততাপে"—ভাঃ ১১।২।৫৪, অর্থাৎ ঐ শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলি কান্তির জ্যোৎস্নায় জীবন জুড়াই।

"শ্রীচরণ-সুধাপানে ভবক্ষুধা এড়াইব"—ভবক্ষুধা বা স্বসুখ বাসনা থাকতে তো তোমাকে পাবনা। না, না, আর অভিমান করব না; প্রাণ থাকতে তোমায় ভুলব না, তুমিই যে আমার প্রাণকান্ত। মহাপ্রভুর মতই বললেন, "মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ" —চৈঃ চঃ ৩।২০।১০। কাজ নেই আমার কুলশীলমানে, প্রেমে আমি তোমায় হৃদয়ে বেঁধে রেখে দেব। হে নাথ, আমার অসময়ে এসে তুমি দয়া ক'রে এই বিরহ তাপিত প্রাণ শীতল ক'রো।

গৌ ২॥ যেন কোনো পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুকে বহুদিন পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন-ভাবে দেখে বন্ধুর বিস্ময়প্রকাশ। সাক্ষাৎ দর্শনের অনুভূতিতে এর প্রত্যেকটি পংক্তি যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

গৌ ৩॥ গানটি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। গৌর-নিতাই বলতে পাঁচশ' বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ গৌর-নিতাইকেও যেমন বুঝায়, একালের নরহরি-নিত্যানন্দ প্রভুরও তেমনি ইঙ্গিত রয়েছে। এঁরা নাম বিলাতে নদীয়াতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যেচে যেচে জীবকে নাম দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা জীবকে জ্ঞানও দিচ্ছেন—সংসার দুঃখময়, সংসার অসার, ভাগবতের সেই চিরন্তন বাণী, "পুত্র দারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ, অনুদেহং বিয়েন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা"—ভাঃ ১১।১৭।৫৩, অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র পরিজন কেবল পান্থশালার সঙ্গমের মত, নিদ্রার অনুগামী স্বপ্নের মত এরাও দেহের অনুগামী, "মৎকৃতে

ত্যক্তকর্মাণ ত্যক্ত স্বজনবান্ধবাঃ"—ভাঃ ৩।২৫।২২, অর্থাৎ ভগবানের জন্ত স্বজন, বান্ধব ও কাম্যকর্ম ত্যাগ করা চাই। সংসারের মায়া ছেড়ে ছুটে এসো, হরিনাম নিলে উদ্ধার হবে। সংসারে কেউই তোমার আপন নেই; মনের গোল, অর্থাৎ সংশয় ত্যাগ কর। যাবার সময় কেউই বা কিছুই সঙ্গে যাবেনা, তখন গুরুরূপী হরিই একমাত্র পারের কাণ্ডারী। সুতরাং মিথ্যা দুঃখ না পেয়ে, ঐ অভয় চরণে শরণ নাও।

সাধন সঙ্গীত

সা ১ ॥ কৃতকর্মের ফলভোগের জন্যই জীবের জন্ম ও মৃত্যু। ভগবান্‌কে ভুলে আত্মসুখবাসনা পূরণের জন্ত কর্ম করার সাজা স্বরূপ এই ভবরূপ কারাগারে জীবের নির্ব্বাসন। সাধুগুরুকৃপায় যার এই দিব্যজ্ঞানলাভ হয়, সে বুঝতে পারে তার প্রকৃত অবস্থা। তখন এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে গুরুরূপী ভগবান্‌কে ডাকে। সে জানে কর্মফলদাতা ভগবান্ তার বন্ধু ও সখা। তাই দুঃখ করে অনুতাপ করে—"রেখে আমায় গেলে এ ভব-সংসারে" ব'লে। কিন্তু কেমন ক'রে এই নির্ব্বাসন দণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে সে তার প্রাণ-সখাকে ফিরে পাবে? দেহ থাকতে থাকতে সাধন ক'রে নিতে হবে, নইলে তো ভব-বন্ধন মোচন হবেনা, কুমতি-রূপ কাম-ক্রোধ-লোভাদিকে বশ করা যাবে না, অবোধ মন-মাঝি অকূল সাগরে হাল ধরবে না, ফলে জীবনতরী পাথারেই ঘুরতে থাকবে। অভাজন জীবের কী সাধ্য আছে যে এ অকূলে কূল নির্ণয় করবে? একমাত্র সেই অকূলের কাণ্ডারী ছাড়া কেউই এই অকূল ভবসাগরে দিঙ্‌নির্ণয় ক'রে পারে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই আকুল হয়ে তাঁকে ডাকছে, হে গুরু, আপদ ঘুচাও, পথ দেখাও, তোমার কাছে যাই।

সা ২ ॥ ভবরূপ নদীজলে মায়া স্রোতের বেগ অতি প্রবল, এ স্রোতোবেগ মানুষ নিজ চেষ্টায় প্রতিরোধ করতে পারে না। সেই মায়া থেকেই দেহে অহং-ভাব হয়, 'দ্বিতীয়ে' অভিনিবেশ হয় এবং তা' থেকেই আসে অষ্টপাশ—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুল, শীল, জাতির বন্ধন। বন্ধন অবস্থায় সাঁতার দেওয়া যায় না এবং সুযোগ পেলেই মায়া-কুম্ভীর রূপী ষড়রিপু ছিঁড়ে খায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন, "ন যস্য জন্ম-কর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ"-১১।২।৫১, অর্থাৎ, জন্ম, কর্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতির জন্য যাঁর দেহে অহং-ভাব নেই, তিনিই হরির প্রিয়। আরও "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ", অর্থাৎ মায়ারচিত এই 'দ্বিতীয়ে' অভিনিবেশ বশতঃই ভয় আদি অষ্টপাশের বন্ধন হয়। সংসারে স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়—যাদের আপন ভাবা যায়, তারাই সত্যজ্ঞান থেকে বিমুখ ক'রে মায়ায় বন্ধন করে। এ বন্ধন ছিন্ন করতে হ'লে, ভব-কাণ্ডারীর শ্রীচরণে শরণ নিয়ে ধৈর্য্য সহকারে সাধন করতে হবে।

সা ৩ ॥ মায়া মোহেই মানুষ নিত্যসত্যরূপী শ্রীভগবানের সেবা বিস্মৃত হয়ে অবিরাম অনিত্য বিষয় ভোগ কামনায় কর্ম করে এবং আরও দৃঢ়তর মায়া বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। ষড়রিপু থেকে আত্মরক্ষা ও ভবক্ষুধা নিবারণ ক'রে 'প্রাণরক্ষা' অর্থাৎ ভগবৎ-দাসী রূপে জীবের স্বরূপে অবস্থিতি করতে হ'লে দীন হয়ে সেই দীনবন্ধুর শ্রীচরণে শরণ নেওয়া উচিত। নচেৎ এই দুরত্যয়া মায়ার বন্ধন কেউ নিজ চেষ্টায় ছিন্ন করতে পারে না। ভাগবতে বলেছেন, মায়া রচিত দ্রব্যসমূহে উপভোগবুদ্ধিতে প্রলোভিত হয়ে মূঢ় ব্যক্তি পতঙ্গবৎ বিনষ্ট হয়—১১।৮।৮; আর এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য গীতায় বলেছেন, "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"—৭।১৪।

সা ৪ ॥ সাধক দিবানিশি শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রেমে বিভোর হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় থাকতে আকাঙ্ক্ষা করছেন। কিন্তু বাধা দিচ্ছে ষড়রিপু। তাই রিপুদর্পখর্ব্বকারী শ্রীহরির অভয় শ্রীচরণেই শরণ নিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণচরণে আশ্রয় নিলে যখন তাঁর কৃপা হয়, "যস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ, ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্"—ভাঃ ১০।৮৮।৮, অর্থাৎ আমি যাকে কৃপা করি, ক্রমশঃ তার ধন হরণ করি; সে নির্ধন হ'লে তার স্বজনও তাকে ত্যাগ করে। সুতরাং শ্রীহরি তাঁর শরণাগতের সর্ব্বস্ব হরণ ক'রে তার অন্তরে চির-জাগরূক হয়ে থাকেন। সাধক তখন সেই সাধুসঙ্গ করেন, যিনি "আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু"—ভাঃ ১।১৮।১২ এবং "হরেগুর্ণ-পীযূষপানাৎ" ও "স্মৃত্বা মুকুন্দচরিতাগ্র্যসীধুনা"—ভাঃ ৪।২২।২৪, অর্থাৎ শ্রীহরির পাদপদ্ম-মধু ও তাঁর গুণ-পীযূষ পান ক'রে ও সেই মুকুন্দচরিতামৃত নিত্য স্মরণ ক'রে তাঁর প্রতি প্রেমে বিভোরচিত্ত হয়ে থাকেন। এ ছাড়া সাধকের আর অন্য সুপথ নেই। এই 'শ্রীপাদপদ্ম-মধুপান'—অন্তরঙ্গ সাধনের একটি ক্রিয়া—যা' একমাত্র গুরুমুখে শ্রোতব্য।

সা ৫ ॥ এ সঙ্গীতটিও প্রায় অনুরূপ ভাবে পূর্ণ। সাধক ষড়রিপুর ভীষণ শরাঘাতে জর্জরিত হয়ে তাকে জয় করতে চাইছেন, কারণ এইরূপ "নির্জ্জিত ষড়বর্গৈঃ ক্রীয়তে ভক্তিরীশ্বরে"—ভাঃ ৭।৭।৩৩। বহুজন্ম পরে দুর্লভ মনুষ্যদেহ পেয়ে দেহ থাকতে থাকতে ভগবানের শরণ নিয়ে তাঁকে হৃৎপদ্মাসনে যৌগিক ক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে তথায় জীবাত্মার সহিত মিলিত করতে হবে। এতে মায়াভ্রম দূর হয় ও মনোবিকার চলে যায়। ভক্তি-ভাবিত মন-পুষ্প ও নয়নবারি দিয়ে তাঁর শ্রীচরণপূজায় মনোবেদন ঘুচিয়ে সরল অন্তঃকরণে সদা আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকতে চাইছেন। ভাগবতের ১১।৯।২৯ ও ১১।১৩।৩৪ "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদম্" ও "ঈক্ষেত বিভ্রমমিদম্" শ্লোক দুটি অনুরূপ কথাই বলেছেন।

সা ৬ ॥ মায়ামুগ্ধ ত্রিতাপদগ্ধ সাধকের কাতর আবেদন। মায়াজ ত্রিতাপের এতই প্রতাপ যে ভগবচ্চরণে শরণও নিতে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত কথিত 'আর্জবম্' বা সরলতা ধর্মপথের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু সরল হ'তে চাইলেও মন কুটিল কালের মতই 'কুটিলা গতিঃ' অবলম্বন করে। ফলে ধর্ম-সাধন হয়না। এ সবই মায়াজনিত মলিনতার প্রভাবেই হয়। সুতরাং মায়াবদ্ধ জীব চারিদিকেই অসহায়ভাবে বাঁধা, একেবারেই নিরুপায়। এ অবস্থায় অধমতারণ পতিতপাবন সাধুগুরুরূপী শ্রীভগবানের অভয় চরণে শরণ নেওয়া ছাড়া গতি নেই। ভাগবতে—৫।১২।১২-ভরত বলেছেন, "মহৎপাদরজোঽভিষেকম্" বিনা আর গতি নেই। গুরুরূপী ভগবানের "শাখানখমণি-চন্দ্রিকায় ত্রিতাপ নিরস্ত হয়।"—১১।২।৫৪।

সা ৭ ॥ মায়া-মোহে জীবের দেহে 'অহং-ভাব'—ভাঃ ১১।২।৪১, বা 'মমাহমিতি ধীঃ'—ভাঃ ২।৭।৪১, অর্থাৎ আমার-আমি এই বোধ হয়ে থাকে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে ধূলা-খেলারূপ সংসার—"স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্নতু বাস্তবী" —ভাঃ ১১।১১।২, অর্থাৎ স্বপ্নের ন্যায় অবাস্তব সংসার-এর আসক্তি ত্যাগ ক'রে নিরুপায় জীবকে অকূল ভবসাগর পার হ'তে সেই মধুসূদনরূপী পতিতপাবন শ্রীগৌরচরণে শরণ নিতে হবে। অকপটভাবে তাঁর চরণে শরণ নিলে. তিনি কৃপা ক'রে এই 'দুস্তরা দেবমায়া' পার করেন।—ভাঃ ২।৭।৪১।

সা ৮ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৭।৫৩ শ্লোকে স্পষ্টই বলছেন, 'পুত্রদারাপ্তবন্ধুসঙ্গম পান্থশালার সঙ্গমতুল্য, নিদ্রায় স্বপ্নের মতই তারা দেহের অনুগামীমাত্র', আর ৪।২২।৩৯ শ্লোকে বলছেন, "এই দেহ দ্বারা স্ত্রী পুত্র-আত্মীয়-বন্ধু বিস্তার ক'রে যাদের পোষণ কর, সেই দেহ বৃক্ষের ন্যায় বীজ সৃষ্টি ক'রে কিছুদিনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে।" কেউ তোমার আপন নয়, কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না। কিন্তু 'এমন সুদুর্লভ নরদেহ, যে-দেহই একমাত্র ভগবৎ-ভজনের অনুকূল, তা' লাভ ক'রেও, এবং গুরু-রূপী কর্ণধার পেয়েও যদি ভবসাগর তরণে চেষ্টা না কর, তবে তুমি আত্মঘাতী—"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্, ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।" ১১।২০।১৭।

সা ৯ ॥ পরম দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত এই সঙ্গীত। এই সংসারে সবাই পর, গুরুই কেবল আপন জন। মিথ্যা মায়ায় বিষয়ভোগ্য বস্তু, তার সহায়ক স্ত্রীপুত্র আত্মীয়বন্ধু, তথা এই দেহকে আপনভ্রমে আজীবন মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি বহু কুকার্য্যে রত হয়ে ও বহুকষ্ট ক'রে যাদের জন্য মানুষ ধন উপার্জ্জন করে, সেই ধন বা জন কেউই শেষের দিনে সঙ্গে যাবে না, উপরন্তু নিজের বন্ধনরূপ বীজ সৃষ্টি ক'রে সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে

—"জায়াত্মজার্থ-পশুভৃত্য গৃহাপ্তবর্গান্ পুষ্ণাতি যৎপ্রিয় চিকীর্ষয়া বিতন্বন্, যান্তে সব্রুচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ স দেহঃ সৃষ্টাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্মা।" ভাঃ ১১।৯।২৬। শ্রীমদ্ভাগবত একমাত্র গুরুকেই আপন বা 'দেবতাত্মা' বলছেন, সেই গুরুদেবকে "আত্মায়য়া" ১১।৩।২২, অর্থাৎ অকপটে "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন" ৭।৭।৩০, অর্থাৎ ভক্তিসহকারে সেবা ও সমস্তলাভ তাঁকে অর্পণ করতে পারলেই 'নির্জ্জিত ষড়্বর্গ' অর্থাৎ ষড়রিপু জয় করা যায়। প্রকৃতপক্ষে জাগতিক ধনজন ভবপারের সময় একটিও সহায়ক হবে না; পারের সম্বল নিত্যবস্তু, গুরুসেবা যারা রিপুজয়ী হয়ে তাঁর কৃপালব্ধ সাধনেই সেই ভবপারের সম্বল উপার্জ্জন হয়।

সা ১০॥ ভবে এসে মানুষ আত্মসুখে মত্ত হয়ে নিত্যবস্তু শ্রীভগবৎসেবা বিস্মৃত হয়। সাধুগুরুকৃপা হ'লে দিব্যজ্ঞান হয়, তখন সে বুঝতে পারে নিজের প্রকৃত অবস্থা। কাতর হয়ে সে তখন ভগবান্‌কে ডেকে বলে, হে প্রভু, এই অসময়ে আমাকে রক্ষা করুন। এই সংসারে নিত্য দুশ্চিন্তারূপ বিষে দেহমন দগ্ধ হচ্ছে, আপনার কৃপাসুধা বর্ষণে সে বিষানল নির্ব্বাপিত করুন। শরণাগতির অভাবেই এই চিন্তার উদ্ভব হয়, যাতে ঐ চরণে শরণ নিতে পারি সেই কৃপা করুন। আপনি জগতের জীবন, ভক্তের প্রাণধন, যেভক্ত যেভাবে ডাকে সেইরূপেই দেখা দেন। "যদ্ যদ্ধিয়া বিভাবয়ন্তি, তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়"—ভাঃ ৩।৯।১১, অর্থাৎ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করবার জন্ম তাঁরা বুদ্ধিদ্বারা আপনার যেরূপের চিন্তা করেন, আপনি সেই রূপেই প্রকাশিত হন। কিন্তু 'নির্জ্জিত-ষড়্বর্গ'-ভাঃ ৭।৭।৩৩ না হ'লে তো আপনার দেখা মিলবে না। কিন্তু দর্শন না পেলেও, আপনাকে ছাড়ব না—আপনার নাম সতত গ্রহণ করব। সেই নামই যে আমার 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্'। ঐ নামের জোরে কালভয় দূর ক'রে আপনাকে পাবই পাব। সুতরাং মৃণাল ধ'রে থাকলে যেমন পদ্মকে পাওয়া যায়, তেমনি ভগবৎ-আশ্রয়, অর্থাৎ গুরুপাদপদ্ম, ধ'রে থাকলে আপনাকে হৃৎপদ্মে অবশ্যই পাওয়া যাবে; এবং তখন আর আপনাকে ছাড়ব না। মৃণাল অর্থে সুষুম্না নাড়ী; যোগমার্গের ষট্‌চক্রভেদের ইঙ্গিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১১।১৪।৩৪) ওঙ্কারের বর্ণনায় 'বিসর্ণোবৎ' অর্থাৎ কমলনালতন্তুবৎ, এই কথাটি প্রণিধানযোগ্য। কৃপাধন্য সাধক গুরুমুখে এর সবিস্তার সাধন পন্থা অবগত হবেন।

সা ১১॥ ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মায়ার বন্ধন হয়, যতদিন যায় মায়ার বন্ধন ততই দৃঢ় হতে থাকে। সময় থাকতে গুরুচরণে শরণ নিয়ে এই মায়াবন্ধন ছিন্ন করতে সচেষ্ট না হ'লে, পরে আর উপায় থাকে না। আমরা বাইরে সাধুর ভণ্ডামিই করি, ভিতরে কুকার্য্যে রত থাকি। এইভাবে দিনের পর দিন ভগবান্‌কে ভুলে থাকলে হঠাৎ অতর্কিতে যেদিন মৃত্যু আসবে, তখন তো নিঃসম্বল হয়েই যেতে হবে। তাই বলছেন,

সময়ে গুরুচরণতরী আশ্রয় ক'রে সাধন কর। পঞ্চ-বিষয়াসক্তিরূপ কণ্টকে দেহমন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, আত্মসুখজনিত কর্মে পারের মূল সম্বল হারিয়ে যাচ্ছে। যেজন্য ভবে আসা, অর্থাৎ পারের সম্বল অর্জ্জন করা, তার তো কোনো ব্যবস্থাই হচ্ছে না। ভগবানে ভক্তি করতে হ'লে যে "সর্ব্বকাম বিবর্জ্জনম্"-ভাঃ ১১।১৯।২২ ক'রে তাঁর পদে "মনোগতির-বিচ্ছিন্না"—ভাঃ ৩।২৯।১১ রাখতে হবে, কারণ যতক্ষণ "ভুক্তি-স্পৃহা"-ভ.র.সি.—১।২।১৫ অন্তরে বর্ত্তমান থাকবে এবং মন "অন্যাভিলাষিতাশূন্য" না হবে ততক্ষণ তো কিছুতেই ভক্তিসুখের উদয় হবে না। এ হ'তে হ'লে যে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করতেই হবে—কারণ "খণ্ডিতাত্মা" হ'লেই তো সে "মূঢ় ও অসাধু" হয়ে যাবে—ভাঃ ৩।৩১।৩৪। সুতরাং ব্রহ্মবস্তু অখণ্ডিত রাখতে না পারলে ব্রহ্মজ্ঞানও হবে না, যোগসিদ্ধি বা ভক্তিলাভও হবে না। এই 'মূল'-বস্তু হারালে কোনো মার্গেই কিছু লাভের আশা থাকবে না-এবং একে অখণ্ডিত রাখতে হ'লে সাধকের সর্ব্ব অবস্থায় চাই গুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় আশ্রয় ও নিষ্ঠাসহকারে তাঁর সেবা।

সা ১২॥ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১৭।৫৩, ১১।১১।২ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হয়েছে সংসার অসার, এখানে আত্মীয়-পরিজন কেউ আপন নয়, সবাই পর, পান্থশালার সঙ্গমের মত, নিদ্রায় স্বপ্নের মত। ১১।৯।২৬ শ্লোকেও উল্লিখিত রয়েছে, যে-দেহ আত্মীয়স্বজনের জন্য এতকষ্টে ধন উপার্জ্জনে নিয়োগ করা হয়, সেই দেহ একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে—কেউ তখন সঙ্গে যাবে না। আবার ১১।৯।২৯ ও ১১।২০।১৭ শ্লোকে স্পষ্ট বলছেন, পরমার্থসাধনযোগ্য এমন দুর্লভ মানবদেহ পেয়ে যে গুরুচরণে শরণ নিয়ে সাধন না করে, সে আত্মঘাতীর তুল্য। ভাগবতের ৩।৩১ অধ্যায়ে গর্ভাবস্থায় গর্ভযন্ত্রণাকাতর জীবের সাময়িক দিব্যজ্ঞানলাভ ও পরিত্রাণের জন্য ভগবচ্চরণে আকুল আবেদনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। যিনি জীবকে কর্মভোগের জন্য ভবে নিয়ে আসছেন, বিষয়ে আসক্ত না হয়ে সেই ভগবান্‌কে ভজনা করব ব'লে জীব এই সময়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র জীব মায়ার প্রভাবে সব বিস্মৃত হয়। এই সঙ্গীত জীবের জ্ঞানোদয়ের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। জীবের প্রকৃত বন্ধু যথার্থ আপন জন, দুঃখের দুঃখী কে? শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন, "নিমজ্জোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্, সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্"—১১।২৬।৩২, এবং "সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ, দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ" -১১।২৬।৩৪, অর্থাৎ জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির মত ভবসাগরে নিমগ্ন জীবের সাধুগণই নৌকারূপ পরম আশ্রয়। সূর্য্যের মত সাধুগণই দিব্যচক্ষু বা দৃষ্টিদানকারী, তাঁরাই জীবের বান্ধব ও দেবতাস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্। এমন 'দুঃখের দুঃখী'-কে যে 'ভক্তিরজ্জু' দিয়ে বাঁধতে পারে, "প্রণয় রসনয়াধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ"-ভাঃ ১২।২।৫৫, অর্থাৎ প্রণয়রূপরশি

যাঁরা পাদপদ্ম হৃদয়ে সতত ধারণ ক'রে রাখতে পারে, তার আর কৃতান্তের ভয় থাকে না —"পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে"-ভাঃ ১০।৮৭।১৮, অর্থাৎ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়ে জীব আর পুনরায় কৃতান্তমুখে পতিত হয় না। তাঁরা কালভয় জয় করেন। "নো মে অনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ"-ভাঃ ৩।২৫।৩৮, অর্থাৎ আমার কালচক্র তাদের গ্রাস করে না, "ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে"-ভাঃ ১০।৮২।৪৪, অর্থাৎ, আমার প্রতি ভক্তিই ভূতগণকে অমৃতত্ব প্রদান করে। তাই বলছেন, 'ভক্তি বিনা পায়না সে ধন', ভাগবতেও বলেছেন "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্‌"-১১।১৪।২১, অর্থাৎ সাধুগণের আত্মা ও প্রিয় আমি কেবলমাত্র শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হই। সুতরাং সেই ভগবান্‌ যাঁদের আত্মা ও প্রিয়, সেই সাধুগুরুর শরণ নিতে হবে এবং নিতি, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে, সেই নাম জপ ক'রে যেতে হবে- একমাত্র তাতেই মায়াজ মনোদুঃখ নিবারণ হ'তে পারে, অন্য কোনো উপায়ে নয়।

'ভক্তিরজ্জু দিয়ে বাঁধ'—যে সাধনা দ্বারা হৃদয়স্থিত অনাহতপদ্মে অবস্থিত জীবাত্মাকে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সহিত ভক্তিরজ্জু দ্বারা বন্ধন করা যায়, এবং যে বন্ধন ছিন্ন ক'রে ভগবান্‌ সেই ভক্তহৃদয় কখনও 'ন বিসৃজতি' বা পরিত্যাগ করেন না, সেই উচ্চতর সাধনের ইঙ্গিত রয়েছে।

সা ১৩ ॥ এই সময়ে প্লেগের মড়ক হয়; জনৈক শিষ্য ভীত হয়ে প্রভুকে জানালে প্রভু তার উত্তরে এই সঙ্গীতটি গান করেন। 'ঠিক'—অর্থে নিষ্ঠা; শ্রীমদ্ভাগবতের 'মন্নিষ্ঠাভক্তিঃ', 'নির্বন্ধিনী মতিঃ', গীতার 'অনন্যচিন্তানাম্‌', অখণ্ডিত আত্মার। বাস্তবিক, তাদের কোনো কিছুতেই ভয় নেই, ব্যাধি তো সামান্য কথা। তাই প্রভু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, বৃথা কালহরণ না ক'রে, কালভয়-নিবারণ কালোবরণকে সতত স্মরণ করতে। কারণ তিনিই মধুসূদন রূপে মধুকৈটভ আদি দৈত্য যেমন বিনাশ করেছেন, তেমনি তাঁর নামও "শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা বিতরণম্‌"-চৈঃ চঃ ৩।২০।৩, জীবের মঙ্গল-কুমুদ-জ্যোৎস্না বিতরণকারী। মিথ্যা মায়াভ্রমে না প'ড়ে নিত্যবস্তু চৈতন্য-নিত্যানন্দের শরণ নাও, যাদের নামে "ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্‌"-চৈঃ চঃ ৩।২০।৩-তো হবেই, উপরন্তু নিরানন্দ দূর ক'রে "আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনম্‌"-ও করবে। এর জন্য চাই কর্ণধাররূপী সৎগুরু-চরণ'শ্রয়।

সা ১৪ ॥ জ্ঞানী সাধক জ্ঞান নয়নে দেখতে পাচ্ছেন, যে কোনো সময়ে শেষের দিন আসতে পারে। এদিকে দিনে দিনে তনু ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হচ্ছে। সেই শেষের দিনে ভগবৎচরণকমলই তো একমাত্র সম্বল। আর সবই তো মায়ার বিভ্রম-ভাঃ ১১।১৩।৩৪, এবং সেই মায়া রচিত দ্রব্য 'যোষিৎ-হিরণ্য-আভরণ'-আদিতে উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলোভিত হ'লেই বিনষ্ট হ'তে হবে-ভাঃ ১১।৮।৮। এদিকে মায়ামোহে

স্বসুখভোগের দুরাশা বৃক্ষরূপে আমূল প্রোথিত হয়ে রয়েছে জীবনে, এই "আশা হি পরমং দুঃখম্"-ভাঃ ১১।৮।৪৪, কিন্তু ভগবান্ ব্যতীত কেউই তো এই দুশ্ছেদ্য আশা-বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করতে পারবে না। তাই, যিনি বিশ্বের আধার হয়েও প্রত্যেকের অন্তর্য্যামীরূপে হৃদয়ে অবস্থিত, "যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তেঁহো তাঁহাতে সংসার, অন্তরাত্মারূপে তাঁর জগৎ আধার"-চৈঃ চঃ ১।৫।৭১, সেই অন্তর্য্যামীকে দীন হয়ে নিবেদন জানাচ্ছেন, হে করুণা নিধান, এই দীনজনে করুণা করুন, কৃপা ক'রে মায়াজ ষড়রিপুর যন্ত্রণাদায়ক আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন; কারণ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে"-গীতা ৭।১৪। সাধারণ জীবের অসহায় অবস্থা স্মরণ ক'রে ভক্তভাবাশ্রিত মহাপ্রভুর মতই আর্ত্তি জানাচ্ছেন "পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ"-চৈঃ চঃ ৩।২০ রক্ষা করুন। হে গুণের আকর, হে দয়ার সাগর, এই পতিতের সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে 'ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ' নামরূপ অমৃত পান করিয়ে শমন ভয় নাশ ক'রে অমৃতত্ব দান করুন।

দুরাশা-বৃক্ষ-ছেদনে—চিত্তে যদি ভোগস্পৃহা ও অপরাধ থাকে, তা' হ'লে সাধন করলেও "সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়"-চৈঃ চঃ ২।১৯।১৪২ এবং অপরাধ জন্য ভক্তিলতা ছিন্ন বা শুষ্ক হয়ে যায়। সুতরাং দুরাশা রূপ কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠা লালসা সর্ব্বাগ্রে ত্যাগ করবার জন্য গুরুর চরণে নিবেদন জানাতে হবে।

সা ১৫॥ কর্মবশে জীব 'ভ্রমতামূর্দ্ধাধঃ'—ভাঃ ১।৫।১৮, অর্থাৎ ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক থেকে অধঃ স্থাবরলোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে। যাওয়া আসার এই যন্ত্রণা নিবারণ করতে হ'লে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'অতন্দ্রিতঃ'—১১।২০।১৯ হয়ে তাঁর শ্রীপদে 'অব্যবহিত' বা 'নিরবচ্ছিন্ন' মন রাখতে হবে। সুতরাং "নামের মালা তুলে রাখলে", সেই অকূলেই ভাসতে হবে। হৃদয়ের ধন হৃদয় জুড়ে থাকলেও ভক্তভাবাশ্রিত মহাপ্রভুর মতই ভক্তগণ "প্রাপ্তকৃষ্ণ হারাইয়া, তার গুণ সঙরিয়া সন্তাপে বিহ্বল" হন।

সা ১৬॥ শ্রীমদ্ভাগবতের সেই "বহু সম্ভবান্তে সুদুর্লভ মানুষ্যম্"—১১।৯।২৯, অর্থাৎ বহুজন্ম পরে দুর্লভ মনুষ্য দেহ পেয়ে যদি মৃত্যুর পূর্ব্বেই "তূর্ণম্" অর্থাৎ তাড়াতাড়ি সাধন ক'রে না নেওয়া হয়, তবে সে আত্মঘাতী। এর জন্য চাই নিত্য "হরে গুণ পীযূষ পান"—ভাঃ ৪।২২।২৪ ও হরিনামের "পূর্ণামৃতাস্বাদনম্", যা' "স্বাদু স্বাদু পদে পদে"—ভাঃ ১।১।১৯।

সা ১৭॥ সাধকের পক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করার কত প্রয়োজনীয়তা—তাই বলছেন। "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ"-ভাঃ ৭।৭।৩০—ভক্তিভাবে গুরুসেবা ও তাঁর শ্রীচরণে সব লাভালাভ অর্পণ করতে পারলে আর ভাবনা থাকে না। কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠা তখন আর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

তার উপর। গুরুকেই তখন সর্ব্বধন, অমূল্য রত্ন ব'লে মনে হয়। সর্ব্বদা ঐ চরণ চিন্তা ক'রে চিত্ত 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' হয়ে ষড়রিপুর প্রভাব থেকে মুক্ত হয় এবং "জীয়ন্তে-মরা'র মত হয়ে যায়। গুরুপদে এইভাবে শরণ নিলে চৈতন্যরূপী গুরু হৃদয়ে উদিত হয়ে তার কাম ক্রোধাদি রিপুর মাঝি বা নিয়ন্তা হন। একেই শ্রীমদ্ভাগবতে 'গুরু কর্ণধার' বলেছেন। এরূপ হ'লে হৃদয়মাঝে সত্য সত্যই তাঁর দর্শনলাভ হয়— "পশ্যন্তি কেচিদনিশং তদনন্যভাবাঃ"—যমুনাচার্য্যস্তোত্র-১৮, ও তাঁর শ্রীচরণনিঃসৃত সুধাপান সম্ভব হয়। এটি অন্তরঙ্গ উচ্চতর সাধনেরই ইঙ্গিত। "অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো যংপশ্যন্তি যতয়ো ক্ষীণদোষাঃ"—মুণ্ডক ৩।১।৫, 'ধ্যানে স্ম নো দরশিতং ও উপাসকানাম্''—ভাঃ ৩।৯।৪।

সা ১৮ ॥ গুরুকৃপায় জ্ঞানের উদয় হ'লে সাধকের যে অনুতাপ জাগে, তারই প্রকাশ এই সঙ্গীতে। তখন মনে হয় "নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা গৃহাপত্যাপ্ত-পশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ"—ভাঃ ১১।৩।১৮, অর্থাৎ নিত্য আর্ত্তিপ্রদ, আত্মমৃত্যু হেতু, চঞ্চল গৃহ, বন্ধু, পশু প্রভৃতিতে কী প্রীতিলাভ হয়? তারা তো সবই ক্ষণধ্বংসী।

সা ১৯ ॥ আত্মসুখ বাসনায় নিত্য নবনব আশার মোহময় রূপ মায়াবদ্ধ মানবকে বিভ্রান্ত করে। তাতে দিনে দিনে বিষয়াসক্তি বৃদ্ধিই পায় এবং ভবসমুদ্রের তরঙ্গ ক্রমশঃ ভারী হয়ে ওঠে। কারণ, বন্ধন যত দৃঢ়তর হবে, সমুদ্র তত ভয়াবহ ব'লে মনে হবে। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বলছেন "আশা হি পরমং দুঃখম্"—১১।৮।৪৪। এই আত্মসুখ বাসনা, অর্থাৎ 'ভুক্তিস্পৃহা' সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন ক'রে শ্রীগুরুচরণে গাঢ় রতি স্থাপন করতে হবে। রতি যত গাঢ়তর হবে, ততই সে "সান্দ্রাত্মা" স্বরূপ গ্রহণ করবে। রতি 'সান্দ্রাত্মা' হ'লেই তা' অবশেষে 'প্রেমে' পরিণত হবে। ভ. র. সি. ১।৪।১। বলা বাহুল্য, এটি একটি উচ্চাঙ্গ অন্তরঙ্গ সাধনের ইঙ্গিত।

সা ২০, ২১ ॥ সাধকের সত্যজ্ঞানোদ্ভাসিত সঙ্গীত। ভবে এসেছি একা ন্যাংটা বেশে, শেষের দিন যেতেও হবে ঠিক সেইভাবে। মধ্যপথে মিথ্যা মোহে, পান্থশালার সঙ্গমের মত, যাদের আমার-আমার মনে হয়, তারা কেউই আপন নয়, মরণকালে কেউ কারো নয়। সুতরাং লোকনিন্দায় বিচলিত না হয়ে প্রাণপণে একনিষ্ঠভক্তি সহকারে হরিনাম সাধন ক'রে যেতে হবে। দুটি গানই এক ভাবের।

সা-২২ ॥ দুঃখময় জীবনের দুঃখ অনুভব ক'রে মানুষ যখন বিভ্রান্ত বা ক্ষ্যাপার মত হয়, তখন সাধু গুরু কৃপাপ্রাপ্ত সাধকের বিবেকজ্ঞান হয়। স্ব-বাসনাই পাপে মাতায়; শ্রীমদ্ভাগবতে বলছেন "গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণ-সেবয়া, গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ"—১১।১৩।২৬—অর্থাৎ, পুনঃপুনঃ গুণময় বিষয়সেবা করলে চিত্ত গুণগণে

প্রবিষ্ট হয়—আমার ভক্ত এই বাসনা ও বিষয় উভয়ই ত্যাগ করবে। সুতরাং স্বসুখ বাসনা ত্যাগ ক'রে সত্বর ত্রিজগৎ-আরাধ্য শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করতে হবে। স্বসুখ কামনারূপ কামপ্রভাবে ভবপারের আসল সম্বল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং কোন্‌টি লঘু ও কোন্‌টি গুরু বিচার ক'রে, অর্থাৎ বিষয়-বর্জ্জন ও ভগবৎ-পাদপদ্ম-শরণ দ্বারা, ভবসিন্ধু-পারে যাবার সংকল্প গ্রহণ করতঃ 'হরের্ণামপীযুষপানাৎ' অর্থাৎ হরিনাম সুধাপান রূপ সাধন দ্বারা ভবপার হতে হবে। মুখের কথায় দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায় না—এর জন্য সৎগুরুর চরণ আশ্রয় ক'রে নামামৃত পান করতে হবে—একথা ভাগবত বার বার বলেছেন।

সা-২৩॥ শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন, "মনঃ পরমকারণমামনন্তি, সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ" –১১।২৩।৪০, মনই একমাত্র দুঃখের কারণ, মনদ্বারাই এই সংসারচক্র প্রবর্ত্তিত হয়। এই মনকে নিগ্রহ ক'রে দমন করতে হবে, যত কিছু সাধন "সর্ব্বে মনো-নিগ্রহলক্ষণান্তাঃ, পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ"—ভাঃ ১১।২৩।৪৬, মনের দমন বা সমাধিই হ'ল পরম যোগ। কারণ মন সতত চঞ্চল, অর্জ্জুন তাই শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্, তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্"—গীতা ৬।৩৪। বায়ু বা পবন থেকেও দ্রুতগতি এই চঞ্চল মনকে শ্রীভগবান্ "অভ্যাসেন তু বৈরাগ্যেন" নিগৃহীত করতে উপদেশ দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলছেন "তং সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ, নান্যানি চিন্তয়েৎ ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্"—১১।১৪।৪৬, অর্থাৎ ঐ সর্ব্বব্যাপক মনকে আকর্ষণ ক'রে এক প্রদেশে ধারণ করতঃ অন্য কিছু চিন্তা না ক'রে শ্রীভগবানের সুস্মিত মুখকমল ভাবনা করবে। এই ভাবে দুর্জ্জয় মনকে ধীরে ধীরে আত্মবশে এনে অনিত্য বিষয় ও সংসারে আসক্তি ত্যাগ করতঃ নিত্যসত্য গুরুচরণ কর্ণধারকে আশ্রয় ক'রে সত্যনাম সুধাপানে ভবসাগর তরণের চেষ্টা করতে হবে।

সা-২৪॥ গুরুই গৌরহরি—একথা শ্রীমদ্ভাগবত বারবার বলেছেন, "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি শ্লোকে। সেই অকূলের কাণ্ডারীকে মনেপ্রাণে শরণ নিয়ে তাঁর চরণে ভক্তি করতে হবে। অভক্ত তাঁকে কখনই পাবে না, কারণ তিনি বলেছেন, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'। ষড়রিপু দমনের তথা ভব-ব্যাধি দূর করবার একমাত্র উপায়ই যে হরিনামামৃতপান রূপ গুরুদত্তা মহৌষধি—সেকথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। সেই শ্রীচরণে শরণ নিলে আর কালভয় থাকে না, একথা ভাগবত সুস্পষ্ট বলেছেন, "তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে"-৩।২৫।৪০, "নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ"-৩।২৫।৩৮, "নিবেদিতাত্মা-অমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানঃ"-১১।২৯।৩৪ ইত্যাদি শ্লোকে।

সা-২৫ ॥ অষ্টবন্ধ—দেহাত্মবোধ থেকে সৃষ্ট অষ্টপাশ। শূন্যময়—মায়াপাশ থেকে মুক্ত না হ'লে ভগবান্ দেখা দেন না, তাই ভুবন শূন্যময় মনে হয় ভক্তের। "শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে"—চৈঃ চঃ ৩।২০। তোমা বিনে কে আর—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—গীতা। চমকে ওঠে মন—অজ্ঞানের উপর জ্ঞানের সহসা আলোকপাতে। হ'য়েছ সকল—সাধকের আত্মসমর্পণ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলছেন, "যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ, ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্"—১০।৮৮।৮।

সা-২৬ ॥ ভ্রান্তিতে—জগৎ মায়াময়, "বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসম্"—ভাঃ ১১।১৩।৩৪। ছাড়রে মায়ার কর্ম—"বিষয় সংযোগাৎ মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা"—ভাঃ ১১।২৬।২২, "মনঃ পরমকারণ মামনন্তি, সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ"—ভাঃ ১১।২৩।৪০, "গুণেষু সক্তং বন্ধায়, রতং বা পুংসি মুক্তয়ে"—ভাঃ ৩।২৫।১৫—অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়রূপী মায়ার সংযোগেই মন ক্ষোভিত হয়, অন্য প্রকারে নয়; মনই একমাত্র দুঃখের কারণ, মন দ্বারাই সংসারচক্র পরিবর্ত্তিত হয়; এই মন মায়ায় আসক্ত হ'লেই বন্ধন ও পুরুষোত্তমে আকৃষ্ট হ'লে মুক্তির কারণ হয়। তাই বলছেন, ভোগ্য বিষয়রূপী মায়ায় আসক্ত না হয়ে 'সাধরে আপন ধর্ম', অর্থাৎ সাধনযোগ্য এই দেহ পেয়ে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য সাধন কর, "মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধ্বা মদ্ধর্মে আস্থিতঃ"—ভাঃ ১১।২৬।১। দাসী হব—জীবের স্বরূপে অবস্থিত হয়ে ভগবৎ সেবা পাব। জীব স্বরূপে প্রকৃতি এবং ভগবৎসেবাই তার ধর্ম।

সা-২৭ ॥ কাচ পেয়ে কাঞ্চন—"কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নম্"—হরিভক্তি সুধোদয় —৭।২৮। ছাড়বে নাকো মহাজন—মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিলে সে সুদে আসলে তা' আদায় ক'রে নেবেই। তার প্রাপ্য না দিতে পারলে সে ছাড়ে না, দণ্ড ভোগ করতে হয়। ভগবান্ ভগবৎসাধনযোগ্য দেহরূপ অর্থ ঋণ দিয়েছেন—ধর্ম-সাধন করবার জন্য। গর্ভাবাসে মানুষ সে প্রতিশ্রুতিও দেয়। সুতরাং সেই দেহ-সম্পত্তি নষ্ট করতে থাকলে, অর্থাৎ স্বসুখ কামনাবশতঃ ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডন করলে, তাকে সম্পত্তি নাশ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য সাজা পেতেই হবে—"অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ"-চৈঃ চঃ ২।২০।১০৪। গুরুচরণে শরণ নিয়ে গুরুসেবা করলে তাঁর দয়া হ'লে তবেই মায়াজাল অপসারিত হয়—"তাতে কৃষ্ণভজে করে গুরুর সেবন, মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ।"—চৈঃ চঃ ২।২২।১৮।

সা-২৮ ॥ সাধকের বিবেক জ্ঞানোদ্ভাসিত সঙ্গীত। সাধন পন্থায় তিনটি বিশেষ জিনিষের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এ সঙ্গীতে। (১) গুরুচরণ আশ্রয় ও তাঁর প্রতি নিষ্ঠা, (২) দৈন্য ও (৩) সরলতা। প্রথমতঃ, গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না ক'রে সাধন

করতে চেষ্টা করলে অধঃপতিত হ'তেই হবে, শ্রীমদ্ভাগবতে সুস্পষ্ট বলছেন, "বিজিতহৃষীক বায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং, য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ, ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং, বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ" ১০।৮৭।৩৩, অর্থাৎ, যে মন-তুরঙ্গকে ইন্দ্রিয় ও বায়ুজয় দ্বারাও দমন করা যায় না, তাকে গুরুচরণ শরণ না নিয়ে বশ করতে চেষ্টা করলে, কর্ণধারহীন পোতের ন্যায় বহু বিঘ্নসঙ্কুল হয়ে সমুদ্রে ভাসতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, মহাপ্রভু আচরিত 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'তে হবে,তবেই ভব-ক্ষুধা,অর্থাৎ মায়িক ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি ও তজ্জনিত জ্বালাও দূর হবে। সাধনকালে সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা রাখতে হবে, তবেই তা 'ময়িষ্ঠা ভক্তিঃ' প্রদান করবে—এবং তা' থেকে দুর্ম্মতিও দমন হবে। তৃতীয়তঃ, সাধকের আচরণ হবে সর্ব্বদাই সরল, সাধনধর্ম বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত যাকে বলেছেন-'আর্জবম্'-ভাঃ ১১।৩।২৪। মনুষ্যজন্ম দুর্লভ—কারণ অন্য জন্মে ধর্মসাধনোপযোগী দেহ পাওয়া যায় না ; সুতরাং মনুষ্য দেহ পতন হ'তে না হ'তে তাড়াতাড়ি সাধন ক'রে নিতে হবে—"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদম-নিত্যমপিহ ধীরঃ, তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"-ভাঃ ১১।৯।২৯, অর্থাৎ, বহু জন্মের পর পরমার্থপ্রদ মনুষ্যদেহ লাভ ক'রে, এ পতিত হ'তে না হ'তেই ধীর ব্যক্তি শীঘ্র সাধনে যত্নবান্ হবে ; বিষয়ভোগ তো পশু জন্মেও হয়।

সা-২৯, ৩০, ৩১, ৩২॥ সিদ্ধ মহাপুরুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্গীতকণাগুলি সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবকে, ঠিক বিদ্যুৎচমকের মতই, ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে, অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও, উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ক'রে দেয়। এই দেহ আমি নই, এযে আমার—তাও বলতে পারি না, এ একটা ভাড়াটে ঘরের মত মেয়াদী বাসস্থান। মেয়াদ ফুরালে, একবার নোটিশ দিলেই, একে ছেড়ে চিরতরে উঠে যেতে হবে। তাই বলছেন, দেহ থাকতে থাকতে ভজনযোগ্য এই দেহ দ্বারা তাঁর ভজন ক'রে ভবপারের সম্বল অর্জ্জন ক'রে নাও। হরিনামের ফল সেই শেষের দিনেই সম্যক্ বোধগম্য হবে।

সা-৩৩॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাবাউল স্বরূপের বর্ণনা। এই মহাবাউলকে যিনি ভজনা করেন, তাঁর স্বরূপও প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁকে ভজন ক'রে তাঁর সেবাধিকার পেতে হ'লে পূর্ণব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন ক'রে সর্ব্বপ্রকার আত্মসুখ কামনা বর্জ্জন করতে হবে। সেই 'আনন্দসংপ্লবমখণ্ডম্'কে লাভ করতে হ'লে সাধককেও 'অখণ্ডিতাত্মা' হয়ে 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যা' ও 'অব্যবহিতা' ভক্তিসাধন ক'রে যেতে হবে।

সা-৩৪॥ অসময়ে সাধন করলে যে শ্রীভগবান্‌কে আর পাওয়া যায় না, সিদ্ধ সাধকের অভিজ্ঞতালব্ধ ভারি একটি অমূল্য উপমামূলক বর্ণনা। দেহরূপ জলাশয়ে মীনরূপী শ্রীভগবান্ লীলা করেন। কিন্তু যতদিন যৌবন-রস দেহে বর্ত্তমান থাকে,

ততদিনই সেই লীলাময় হরি 'লীলা-স্বয়ম্বর-রস'-লীলা করেন। "নারীর যৌবনধন যারে কৃষ্ণ করে মন, সে যৌবন দিন দুই চারি"-চৈঃ চঃ ২।২।২৩। প্রকৃতিরূপিণী জীবের যৌবনেই তিনি উদয় হন—সে যৌবন গত হ'লে তিনি আর সাধনলভ্য থাকেন না। যৌবনহীন দেহ যখন রসশূন্য, শুষ্ক হয়ে যায়, তখন সাধন চেষ্টারূপ বাঁধ দেওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ তখন জল শুষ্ক, তাই মীনও অদৃশ্য। রসময় হরি রসেই আবির্ভূত হন। এ সঙ্গীত একটি উচ্চতর অন্তরঙ্গ সাধনের ইঙ্গিত।

সা-৩৫॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঙ্গীতোক্ত উপদেশের পর একটি মূল্যবান কথা বলছেন, 'ঘরের তীর্থতত্ত্ব'। শ্রীমদ্ভাগবতে 'মল্লক্ষণমিমং কায়ম্' ১১।২৬।১, 'নৃদেহমাদ্যম্' ১১।২০।১৭, "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং মানুষ্যম্" ১১।৯।২৯ ইত্যাদি শ্লোকে এর উল্লেখ রয়েছে। গুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রে নিজ দেহাভ্যন্তরে দেহ-তত্ত্ব, যা' একমাত্র গুরুমুখেই শ্রোতব্য, সাধন না করতে পারলে, বাইরের পৃথিবীতে কোথাও কোনো সাধনে তাঁকে পাওয়া যাবে না—এরই চমকপ্রদ ইঙ্গিত।

সা-৩৬॥ মায়িক 'বন্ধু'-রূপে যারা মায়াবদ্ধ জীবকে বন্ধন করেছে, সেই "গৃহাপত্যাপ্ত নিত্য আর্ত্তিদ ও আত্মমৃত্যুদম"-ভাঃ ১১।৩।১৯ তারা আত্মসুখকামনার ইন্ধন হয়ে দেহকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় ও ভবপারের সম্বল নিত্যবস্তু 'ব্রহ্ম'-সম্পত্তি বিনাশ করে। এ দেখে শমন হাস্য করে, কারণ ব্রহ্ম-বস্তু-বিনাশে আত্মা দ্বারা আত্মারই ধ্বংস সাধন হয়—'আত্মাপহ্নবমাত্মনঃ' এবং বুদ্ধিভ্রংশ হয়, 'চেতনাং হরতে বুদ্ধেঃ'-ভাঃ ৪ ২২।৩০। ঋণের দায়ে বঁধিবে আবার—ভাগবত বলেছেন, "গুণেষু সক্তং বন্ধায়" ৩।২৫।১৫—ভগবৎপ্রদত্ত দেহ হচ্ছে পরমার্থসাধক। মানুষ গর্ভাবাসে গর্ভযন্ত্রণায় কাতর হয়ে এই দেহের সদ্ব্যবহার ক'রে ভগবৎসাধনার প্রতিশ্রুতি দান করে। সুতরাং সেই দেহরূপ সম্পত্তি নিয়ে যথোপযুক্ত সাধন না ক'রে আত্মসুখ কামনাপূরণে দেহকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেলে তার মুখ্য কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয় ও ভগবানের কাছে জামিন দেওয়া এই দেহ সম্পদের জন্য ঋণী হয়ে ভবচক্রে বাঁধা থাকতে হয়। পিতৃমাতৃ প্রদত্ত সম্পত্তি, যা' থেকে দেহসৃষ্টি, তাই হ'ল মূলধন। সে সম্পত্তি ব্রহ্ম-রূপী। তাকে অটুট রেখে সাধন করতে পারলে তবেই সে ঋণ শোধ হয়। নতুবা ঋণী হয়ে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, যতক্ষণ না সে ঋণ শোধ হয়। মুণ্ডক উপনিষদ (৩।১।৫) বলেছেন, "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্"; সাধনধর্ম প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন, "ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ"-১১।৩।২৪ এবং "রেতোনাবকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ" ১১।১৭।২৫। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অটুট ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত আত্মজ্ঞান হয় না, আত্মজ্ঞান না হ'লে মায়ামুক্তি হয় না, মায়ামুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ ঋণের দায়ে ভব-বন্ধনে বাঁধা থাকতে হয়।

স্বখাত সলিলে—মানুষ ইচ্ছা ক'রেই আত্মসুখবাসনা পূরণে কর্ম ক'রে সেই কর্মভোগের জন্য ভবসাগরে ডুবে মরে।

শুনি সে শাসনে—ভাগবত বলছেন, "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ", অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবেশের জন্যই ভয় হয়; তখন ভবপারের সম্বলরূপ ব্রহ্ম-বস্তুই এই শমন-শাসন জনিত ভয় দূর করতে পারে, অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুই ব্রহ্মময় ভগবানের অভয় পাদপদ্মে শেষ সময়ে আশ্রয় দিতে পারে। ইহলোকের ধনজন তখন অর্থহীন।

সা-৩৭॥ এই মায়াময় দুস্তর ভবসাগর পার হ'তে হ'লে প্রথমেই চাই প্রকৃত সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপা। "কোনো ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়"-চৈঃ চঃ ২.২২।২৯, কারণ "মহৎকৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি নয়, কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়"-ঐ ২।২২।৩২। তারপর সেই সাধুগুরুর চরণাশ্রয় ক'রে তাঁর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করতে হবে। সাধনাঙ্গের প্রথম স্তরই হচ্ছে, "গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন"—ঐ ২।২২।৬১, "সর্ব্বকারণ শিখি, আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ"—ঐ ২।২৪।২৪১, অর্থাৎ গুরু-পদাশ্রয় সমস্ত সাধনের মূল, গুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত ভজনের আরম্ভই হ'তে পারে না। অন্যান্য সাধনাঙ্গরূপ জল সেচনে ভক্তিলতা পুষ্ট হবে বটে, কিন্তু ভক্তিলতার মূল হ'লেন 'গুরুদেব', তাঁকে তাই কবিরাজ গোস্বামী 'সর্ব-কারণ' বলেছেন। সেই গুরুরূপী সাধনলতার মূলকে গুরু-সেবারূপ ভক্তি-বারি সিঞ্চিত ক'রে সঞ্জীবিত রাখতে পারলে, ভক্তি-লতার অন্যান্য শাখা উপশাখা পুষ্ট হয়ে উঠবে; কিন্তু গুরুকে বাদ দিলে বা অবহেলা করলে ছিন্নমূল হয়ে সমস্ত ভক্তিলতাই শুষ্ক হয়ে যাবে; তখন কোনো সাধনেই আর কোনো কাজ হবে না। "যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজো-পশাখাঃ, প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা"-ভাঃ ৪.৩১।১৪—এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত তরুর মূলসেচনে যেমন তার শাখাপ্রশাখা পুষ্টিলাভ করে, প্রাণ তৃপ্ত হ'লে যেমন ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হয়, অচ্যুতভজনে যেমন সমস্ত দেবতার ভজন হয়, তেমনি সর্ব্বদেবময় গুরুদেবের সেবারূপ মূলসিঞ্চনে সাধন ভক্তিলতা পুষ্টিলাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ," "সর্ব্বদেবময়োগুরু", "তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত", "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা", "গুরু-কর্ণধার", "সমবহায় গুরোশ্চরণম্" ইত্যাদি গুরুমহিমা-জ্ঞাপক শ্লোকে এই কথাই বলা হয়েছে।

সা-৩৮॥ গুরুমহিমা-জ্ঞাপক ও সাধকের সতর্কতাসূচক আর একটি অমূল্য সঙ্গীত। সাধনমার্গ বিঘ্নসঙ্কুল, এইসব বিঘ্ন-বিপদে গুরু-নিষ্ঠা হারালেই পতন হবে। ভাগবতে বারবার বলছেন "মন্নিষ্ঠভাবুদ্ধে", "মন্নিষ্ঠা-ভক্তিঃ"র কথা। গুরুচরণে নিষ্ঠা না থাকলে সাধকের যে অবস্থা হয় তা' ভাগবতের 'বিজিতহৃষীক' ইত্যাদি ১০।৮৭।৩৩ শ্লোকে সুস্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। ১১।২।৫৩ শ্লোকে 'ত্রিভুবনবিভবহেতবে' ইত্যাদিতে বলা

হয়েছে, যিনি ত্রিভুবন বিভবের হেতুও নিমেষার্দ্ধের জন্য ভগবৎপদারবিন্দ হ'তে বিচলিত হননা, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। গুরুবাক্যে দৃঢ় নিষ্ঠা রেখে 'তৃণাদপি সুনীচ' হয়ে যিনি 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' বা 'জীয়ন্তে মরা'র মত হয়ে সাধন ক'রে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করতে পারেন, তিনিই অন্তিমে অখণ্ড গোলোকধামে সেই "আনন্দসংপ্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্" -ভাঃ ১০।৮৩।৪ অচ্যুতের দর্শন পান। শাস্ত্র ঘেঁটে, তর্কাতর্কি ক'রে, বাদ-অনুবাদে তাঁকে পাওয়া যায় না। "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি, কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহম্"-ভাঃ ৬।৪।৩১, অর্থাৎ যাঁর মায়াদি শক্তিসকল তর্ক-নিষ্ঠগণের বিবাদসংবাদের হেতু ও তাদের আত্মমোহের কারণ।

সা-৩৯॥ গুরুমাহাত্ম্য-মূলক আর একটি সঙ্গীত। প্রবর্ত্তের সাধন অনুমানে, সাধকের সাধন বর্ত্তমানে। সাধন হচ্ছে 'কৃতি-সাধ্য',-একে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুষ্ঠান করতে হবে। তা ছাড়া এ হবে 'সাসঙ্গ সাধন', অনাসঙ্গ বা অনুমান সাধনে তাঁকে পাওয়া যাবে না—একথা বলেছেন শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "সাধনৌঘৈঃ" শ্লোকে-১।২।২২। গুরু-সাধন বাইরের জিনিষ নয়, একান্তভাবেই অন্তরের ধন; তিনি "চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি"-ভাঃ ১৬।২৯।৬, অর্থাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতা রূপে স্বীয় অনুভব প্রকাশ করেন। তিনি ভক্তের "ধ্যানমঙ্গলরূপম্"-ভাঃ ১১।১৪।৩৪, এবং ভক্তের প্রণয় ডোরে তার হৃদয়ে বদ্ধ হয়ে ভক্ত হৃদয় কখনো ত্যাগ করেন না—"বিসৃজতিহৃদয়ং ন যস্য"-ভাঃ ১১।২।৫৫।

সা-৪০॥ "আনন্দং ব্রহ্ম"-শুক্ল যজুর্বেদ, "সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ"-চৈঃ চঃ ১।৪।৫৪ এবং "আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতা"—ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৭, তাঁর হ্লাদিনী শক্তি। সুতরাং মূল নিত্যসত্তা আনন্দময়, সেই আনন্দই বিশ্বকে ধারণ ক'রে রেখেছে। কিন্তু সে আনন্দ নিত্য ও পূর্ণ। জীব সেই নিত্য আনন্দময় শ্রীভগবান্‌কে ভুলে এবং জীবের স্বরূপ কর্ত্তব্য ভগবৎসেবা না ক'রে আত্মসুখের বশবর্ত্তী হয়ে ক্ষণধ্বংসী অনিত্য আনন্দে লিপ্ত হয়ে অপরাধী হয় এবং তার শাস্তিস্বরূপ মায়ার বন্ধন বা জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে প'ড়ে যায়। আত্মসুখের উপকরণ সবই মায়াময়, ভ্রমাত্মক, "স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা"-ভাঃ ১১।১৭।৫৩, "বিভ্রমং মনসো বিলাসম্"— ভাঃ ১১।১৩।৩৪, অর্থাৎ ভোজের বাজী। কিন্তু শ্রীভগবান্ "নিত্যো নিত্যানাম্"—কঠ, "আনন্দসংপ্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্"-ভাঃ-১০।৮৩।৪। সেই নিত্য আনন্দময় অমূল্য রত্ন এই মনুষ্যদেহ মধ্যেই অবস্থিত রয়েছে, স্বর্ণ-প্রস্তরের অভ্যন্তর স্থিত বিশুদ্ধ স্বর্ণের মত। "মলক্ষণমিমং কায়ম্"-ভাঃ ১১।২৬।১ এবং "স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ"-ভাঃ ৭।৭।২১, অর্থাৎ স্বর্ণকার যেরূপ স্বর্ণ-প্রস্তর থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করে, অভিজ্ঞ সাধক সেইরূপ দেহ থেকে নিত্যধনরূপ

বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রাপ্ত হন। এইভাবে দেহাভ্যন্তর থেকে যদি সেই নিত্যবস্তু, আনন্দময় সত্ত শ্রীভগবান্‌কে লাভ করার জন্য সাধন না করা হয় তবে সেই দেহী আত্মঘাতীর তুল্য।

পিতৃধন—অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু। দুর্লভ জনম—শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "সুদুর্লভং বহুসম্ভবান্তে" -ভাঃ ১১।৯।২৯। অন্তরে—'চৈত্ত্যবপুষা' বা চিত্তাধিষ্ঠাতারূপে। জ্ঞানচক্ষু—সাধনলব্ধ নির্মল অন্তঃকরণে। অকূল পাথার—শ্রীমদ্ভাগবত কথিত "দুস্তরাং দেবমায়াম্"-২।৭।৪১, "দুরন্তপারংতমঃ"-১১।২৩।৫৭, ও গীতার "দুরত্যয়া মায়া"।

সাধ অধরায়ে ধ'রে—সাসঙ্গ সাধন; অন্তরঙ্গ সাধনের ইঙ্গিত।

কূলে গুরু আমার রয়—ভব পারাবার যতই দুস্তর হোক না কেন, তার কূলে আমার পরমপ্রেষ্ঠ গুরুদেব আমার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে কোল পেতে রয়েছেন, সর্ব্বদা এই জ্ঞান বর্ত্তমান থাকলে, দুরন্তপারও সুগম হয়ে যায়।

সা-৪১॥ "মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" ভাঃ ১১।১৯।৩৬, বা গুরু-নিষ্ঠাই সাধনের প্রাণ। অহরহ তার নামগুণগান ও গুরুপদে অবিচলা, স্থিররতি সাধকের সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশ করে। আমার-আমার বোল—"মমাহমিতি ধীঃ"-ভাঃ ২।৭।৪৯ "অহম্ভাবো দেহে"-ভাঃ ১১।২।৫১। কৈতবসব—"ধর্ম প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ"-ভাঃ ১।১।২ "কৈতবরহিতং প্রেম"-ভাঃ ১০।৩১।১ এর টীকা।

শুদ্ধ হ'লে কায়া—সাধন দ্বারা কর্ম মলিনতা ধৌত হ'লে। এই সাধন হবে গুরু সেবামূলক; চৈতন্য চরিতামৃত বলছেন "তাতে কৃষ্ণভজে করে গুরুর সেবন, মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ," ভাগবতও বলেন, "যৎপাদসেবাভিরুচিঃ…মলং ধিয়ঃ সদ্যঃ ক্ষিণোতি"—৪।২১।৩১, অর্থাৎ যাঁর পাদপদ্মের সেবাভিলাষ মনোমল সদ্য ক্ষয় করে।

সাধ নিতি—"মনোগতিরবিচ্ছিন্না" রেখে "অতন্দ্রিত শ্চিন্তয়েৎ"—ভাঃ ১১।১৪।২৯।

সা-৪২। আশাজালে—"আশা হি পরমং দুঃখম্"—ভাঃ ১১।৮।৪৪।

ঘরে ঠাকুর—দেহরূপ গৃহে নিত্যবর্ত্তমান শ্রীভগবান্। ভাগবতের "মল্লক্ষণমিমং কায়ম্"-১১।২৬।১, "নৃদেহমাদ্যম্"—১১।২০।১৭, "মানুষ্যমর্থদম্"-১১।৯।২৯ ইত্যাদি শ্লোকে একথা বলছেন।

ভাঙাঘরে—নিত্য রোগশোক সঙ্কুল দেহে। কালপক্ষ—কালরূপ পক্ষী সতত দেহকে জীর্ণতর ক'রে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

কর্মসূত্র বন্ধনী—কর্মরূপ সূত্রেই সুখের আশারূপ আকাশ-কুসুমের মালা গাঁথে মানুষ।

সা-৪৩॥ কারে জামিন দিয়ে—দেহকে জামিন দিয়ে, অর্থাৎ ভগবৎসাধন যোগ্য এই মনুষ্যদেহ দ্বারা ভগবৎসাধন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানব গর্ভযাতনা থেকে মুক্ত হয়।

ভাগবতে ৩।৩১।১১-২০.শ্লোকে এর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। মুখে বল—ধর্ম 'কৃতি-সাধ্য', অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধতে হবে, মুখের কথায় হবে না। এরই নাম—নিত্য কর্ম।

আত্ম-পরিজন—"নিদ্রাসুগ স্বপ্নবৎ'-ভাঃ-১১।১৭।৫৩, "যোষিদ্ধিরণ্যাভরণ"-দ্রব্য মায়ারচিত-ভাঃ ১১।৮৮। কোন্ অলঙ্কার ?—'মানুষ্যমর্থদম্' অর্থাৎ এই মানবদেহ পরমার্থপ্রদ, সেই পরমার্থরূপ অলঙ্কারই সঙ্গে যাবে। 'গুরু-কর্ণধার'কে ধ'রে সেই রত্ন আহরণ ক'রে ভবসমুদ্র পার হ'তে হবে-ভাঃ ১১।২০।১৭।

সা-৪৪ ॥ স্বসুখাশাকে নিবারণ করতে না পারলে ভগবৎপাদপদ্মে মন বসবেই না। স্বসুখবাসনার বিষয়সমূহ—সবই মায়ারচিত, মিথ্যা ও অনিত্য। এ বাসনা ত্যাগ করতে গেলে নিত্যবস্তু হরিনামামৃত পান করতে হবে নিতি, অর্থাৎ 'অতন্দ্রিত' হয়ে। এজন্য গুরুপদে মন মজিয়ে গুরু-সেবা করতে হবে। 'আর্জবম্' বা সরলতা সাধনের প্রধান সহায়। এইভাবে 'অন্যাভিলাষিতা শূন্য' মনে 'সর্ব্বকামবিবর্জ্জন' ক'রে গুরু সেবা করলে চিত্তে ভক্তির উদয় হবে এবং মন নিত্য-আনন্দে মগ্ন হবে। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম"; সুতরাং যিনি "সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্", যিনি "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" এবং যিনি ভক্ত-হৃদয়ে "প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ", তাঁকে ভক্তি-ডোরে হৃদয়ে বাঁধতে পারলে আর নিরানন্দ থাকবে না—সেই 'আনন্দ-সংপ্লবম্' সচ্চিদানন্দের আনন্দবন্যায় হৃদয় ভ'রে উঠবে। "ভক্তঃ প্রবয়েত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুস্তরেরেব সমর্পয়ন্তি"—নয়নজলেই তাঁর পূজার্চ্চনা হয়। পঞ্চানন পঞ্চাননে—"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণম্", তাই দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চআননে বা পাত্রে কৃষ্ণের পঞ্চ বিষয় নিত্য সুধা আস্বাদন করেন। মহাপ্রভুও তাই ভক্তভাবে বলেছেন—"কৃষ্ণগুণরূপরস গন্ধশব্দপরশ-সেসুধা আস্বাদে গোপীগণ", "রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে"-চৈঃ চঃ ৩।১৫।১৬। এই নামামৃত আস্বাদনকারী নিবেদিতাত্মা ভক্ত ভক্তিবলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হন—"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে"-ভাঃ ১০।৮২।৪৪ সব বাধাবিঘ্ন, এমনকি জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে, সেই পতিতপাবনের নামসুধাপান সাধন ক'রে যেতে হবে।

সা-৪৫ ॥ সিদ্ধ মহাপুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে একটি অপূর্ব্ব সঙ্গীত। শ্রীভগবান্‌কে যিনি ভক্তিডোরে বন্ধন ক'রে রেখেছেন—তাঁর সমস্ত আচারই শুদ্ধ, কারণ "ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা"-ভাঃ ১১।১৪।২., 'পুনাতি স কুলম্"-ভাঃ ৭।৯।১০। শুধু অন্তরে অনুভবই নয়, তিনি সত্য সত্যই তাঁকে দর্শন করেন—হৃদয়ে ও বাহিরে; "পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ"-যমুনাচার্য্যস্তোত্র-১৮, এবং "স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি, সর্ব্বত্র হয় ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি"-চৈঃ চঃ ২ ৮।২৭৭। তিনি সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন, 'আমার আমি' বিস্মৃত হয়ে গেছেন, তাই তিনি সেই পূর্ণানন্দময়ের চিন্তায় সদাই 'আনন্দসংপ্লবে' প্লাবিত থাকেন—"ময়াত্মভূয়ায় কল্পতে বৈ"-ভাঃ ১১।২৯।৩৪। তাঁর

মন সহ সব ইন্দ্রিয়ই কৃষ্ণের পঞ্চবিষয়ে মগ্ন থাকে, তাই অন্য কিছুই তিনি চিন্তা করতে পারেন না, শোনেন না অন্য কথা এবং রসিকভক্ত ছাড়া অন্য কারো সাথে মেশেন না—তিনি "রসিকাসঙ্গ রঙ্গী"-ভ. র. সি-২।১।৪। লোকাচার বলতে তাঁর কিছুই নেই—"স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্"-ভাঃ ৪।২৯।৪৬, অর্থাৎ ভগবান্ যাঁকে অনুগ্রহ করেন, তিনি লোকধর্মে ও বেদধর্মে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত বুদ্ধিকে ত্যাগ করেন। নামের লহরী—নাম আনন্দ সমুদ্রবৎ নিত্য তরঙ্গায়িত। বাহ্যভাব ত্যাজ্য ক'রে—"বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ, কুশলো জড়বচ্চরেৎ"—ভাঃ ১১।১৮।২৯। বিনা মিষ্টতার—"যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে"-ভাঃ ১।১।১৯, রসজ্ঞ গণের চরিত্র প্রতিপদে স্বাদু হ'তে স্বাদু।

সা-৪৬ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ভবসংসারকে সমুদ্রের এবং সাধককে বণিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, ভাঃ ১০।৮৭।৩৩। এ সঙ্গীতে সংসারকে বাজার ও সাধনকে ব্যাপার বা ব্যবসা বলা হয়েছে। লাভের জন্য ব্যবসা। কিন্তু লাভ না হয়ে যদি মূলধনও নষ্ট হয়, তবে বণিকের সমূহ ক্ষতি হয়। সাধন ক্রিয়া দ্বারা ভবপারের সম্বলরূপী 'লাভ' অর্জ্জন করার জন্যই মানুষ মাতৃগর্ভে ভগবানের কাছে প্রতিশ্রুত হয়ে তবে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু জন্মের পরে প্রারব্ধ কর্মফল রূপ মায়া মোহে তা' বিস্মৃত হয়। আত্মসুখ বাসনা পূরণের জন্য আসল বস্তু বা ভবপারের সম্বল ব্রহ্মবস্তু নষ্ট করে—"যোষিদ্ধিরণ্যা-ভরণাম্বরাদিদ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ, প্রলোভিতাত্মা হ্যপভোগবুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ" -ভাঃ ১১।৮।৮। দেহরূপ গৃহের ভিতর কামক্রোধাদি ষড়রিপুকে সযত্নে পোষণ ক'রে তাদের দুর্নিদেশ সযত্নে পালন করে—কিন্তু তারা তা সত্বেও কখনো, এমনকি দুর্দিনেও কোনো করুণা প্রদর্শন করে না। "কামাদীনাং কতিন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা, স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ"—ভ.র.সি-৩।২।৬, বরং তারা বাগ পেলেই ধ'রে মারে, অর্থাৎ নির্মমভাবে আমাদের পীড়া দেয়। এদিকে এই সংসার 'ব্যসনাবাপ'—ভাঃ ৪।২২।১৩, নানা বিঘ্নসঙ্কুল; এই ক্ষণভঙ্গুর দেহতরণী আচম্কা দমকা হাওয়ায় প'ড়ে "বিষমে ভবাম্বুধৌ"- চৈঃ চঃ ৩।২০ ডুবে যেতে পারে সব সময়েই। সুতরাং দেহ থাকতে থাকতে সাধন ক'রে নিতে হবে—"তূর্ণং যতেত"-ভাঃ ১১।৯।২৯। বিধিমতে, পূতসলিল গঙ্গার জল দ্বারাই ধর্মকার্য্য করা প্রশস্ত। অন্তরঙ্গ উচ্চস্তরের সাধনে গুরুপদেশ মত দেহ মধ্যস্থ পরমপবিত্র গঙ্গার জল অনুসন্ধান ক'রে সেই "ভগবৎপদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃতা সরিৎ" -ভাঃ ৪।২১।৩১ বা "গোবিন্দপাদপদ্মাসবংমধু"-ভাঃ ১।১৮।২২ দ্বারাই সাধন করতে হবে। কিন্তু "গুরোশ্চরণং সমবহায়"-ভাঃ ১০।৮৭।৩৩, অর্থাৎ গুরুচরণ পরিত্যাগ করলে তরণী ডুবে যাবে; উপরন্তু শ্রীচৈতন্যরূপী গুরু কর্ণধার থাকলে ভাঙা তরীও এ সাগরে ডুববে না।

সা-৪৭॥ নাম হচ্ছে "ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্" বা ভবক্ষুধাহর। নিষ্ঠা সহকারে দিবানিশি এই 'পীযুষ-পান' বিনা সাধন হয় না—ভাঃ ৪।২২।২৩। নামের মহিমার অন্ত সাক্ষাৎ অনন্তদেবও জানেন না। মহাদেব এই নাম সুধাপানের জন্য 'ত্যক্তস্বজনবান্ধবঃ'-ভাঃ ৩।২৫।২২ হয়ে আদর্শস্থাপন করেছেন। 'গৃহাপত্য' সবই 'আর্ত্তিদ'-ভাঃ ১১।৩'২২॥ ভবপারের সম্বলরূপ পরমার্থ এই দেহেই সাধন ক'রে নেওয়া যায়,-'মানুষ্যমর্থদম্'-ভাঃ ১১।৯।২৯। এই নামে ত্রিগুণাতীত বেদবাক্যাতীত শক্তি নিহিত আছে—"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তিঃ"-চৈঃ চঃ ৩।২০।৪, একথা মহাপ্রভু নিজে বলেছেন। প্রভু নিতাই দয়া ক'রে সে নাম অযাচকে দান করেছেন। এই নামামৃত পানেই ভক্তের প্রাণ বাঁচে; নতুবা "এ অমৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে, তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন" -চৈঃ চঃ ২।২৫। এই নামেই ভক্তের "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্"-চৈঃ চঃ ৩।২০ হয়। "গুরু-দেবতাত্মা", অর্থাৎ গুরুকে সাক্ষাৎ দেবতা ও পরম প্রিয়তমজ্ঞানে "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা", অর্থাৎ গুরুকে ভক্তিসহকারে সেবা দ্বারা তুষ্ট ক'রে তাঁর বাক্য অনুযায়ী এই নাম-সাধন করতে হবে।

সা-৪৮॥ ভাগবত যাকে বলেছেন, 'মমাহমিতিধীঃ'-২।৭।৪১, সেই দেহ ও দেহজ সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনে আসক্তিই জন্ম-মৃত্যুর কারণ। সেই মিথ্যা 'আমার-আমার' জ্ঞান ত্যাগ ক'রে যে প্রকৃতই তার আপনজন অর্থাৎ সেই নিত্য সত্য স্বরূপের অনুসন্ধান করতে হবে। সে বস্তু দেহমধ্যেই বর্ত্তমান-"মল্লক্ষণমিমং কায়ম্"-ভাঃ ১১।২৬।১, "মানুষ্যমর্থদম্"-ভাঃ ১১।৯।২৯-সেই মনুষ্যদেহেতেই অভিজ্ঞ স্বর্ণকারের মত স্বর্ণরূপ পরমার্থ আহরণ ক'রে নিতে হবে—ভাঃ ৭।৭।২১ এবং এ দুর্লভ বস্তু পেতে হ'লে "গুরু কর্ণধারের" আশ্রয় নিয়ে সাধন করতে করতে "স্ব-চিত্তে স্বত এব সিদ্ধ আত্মা"র দর্শনলাভ হয়-ভাঃ ২।২।৬, "অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ-দোষাঃ"-মুণ্ডক ৩।১।৫, এ দর্শন শুধু চিন্তায় নয়, এ দর্শন প্রকৃত। এ দর্শন হ'লে যাওয়া-আসার চিন্তা থাকে না—"সংসার-হেতুপরমশ্চ"-ভাঃ ২।২।৬। "সেই শ্রীচরণ সেবার অভিলাষই সমস্ত মনোমল নিঃশেষে ধৌত ক'রে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি আনয়ন করে"-ভাঃ ৪।২১।৩১ এবং সেই "ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে,"-ভাঃ ১০।৮২।৪৪, অর্থাৎ অমৃতত্ব প্রদান করে।

ভবমাঝে পড়ি'—স্বয়ং মহাপ্রভুও সাধকভাবে এইরূপ আর্ত্তি প্রকাশ করেছেন,"পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়"-চৈঃ চঃ ৩।২০।৭।

স্থির চিত্ত হও—বিষয় সমূহ থেকে মনকে আকর্ষণ ক'রে সর্ব্বতোভাবে আমাতে মন সন্নিবেশ 'কর—"ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য মন্মনঃ, বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ"-ভাঃ ১১।১৪।৪২।

সা-৪৯। সিদ্ধ সাধকের প্রেমোন্মাদের লক্ষণ বর্ণনা। কৃষ্ণপ্রেমে ভক্তকে পাগল করে "উন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ"-ভাঃ ১১।২।৪০, "বদেদুন্মত্তবৎ বিদ্বান্"-ভাঃ ১১।১৮।২৯। নাম সুধাই "ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্"-চৈঃ চঃ ৩।২০।৩। ছেঁড়া কাঁথা গায়—শ্রীমদ্ভাগবতের "বিবিক্তচীরবসনম্", ভাঃ ১১।৩।২৫ এবং স্বয়ং মহাপ্রভু কথিত "কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ"-চৈঃ চঃ ২।২৫।১৩৬। অসার সংসার—"সংসৃতি র্ঋতুবাস্তবী"-ভাঃ ১১।১১।২, "বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসম্"-ভাঃ ১১।১৩।৩৪। শ্রীচৈতন্যে স্ব চৈতন্যে নিরখিব—ভাগবতের "এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ আত্মা" ২।২।৬ শ্লোকে সেই শ্রীচৈতন্যকে স্ব-চিত্তে, ২।২।৮ শ্লোকে "স্বদেহান্তঃহৃদয়াবকাশে" এবং মুণ্ডক উপনিষদে ৩।১।৫ শ্লোকে তাঁকে "অন্তঃশরীরে" সিদ্ধসাধকের দর্শন হয়, একথা বলেছেন।

কুলশীল মানের ভরম—ভাগবতের সেই "ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ সজ্জতে"—১১।২।৫১, অর্থাৎ জন্ম, কর্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতির অভিমানে যিনি আসক্ত নন।

মাধুকরী—চৈঃ চঃ ২।২০।৭৬-সনাতন গোস্বামী বলছেন, "আমি মাধুকরী করিব"। প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে সাধক বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। বৈরাগ্যই বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান সহায়, "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান, যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্। বৈরাগী করিব সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন, মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-ধারণ"—চৈঃ চঃ ৩।৬।২২১।

তার ঘৃণা-লজ্জা-ভয় থাকবে না—"হসত্যথো রোদিতি রৌতি উন্মাদবৎ"—ভাঃ ১১।২।৪০। সাধনের আর একটি অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ভাগবতোক্ত 'সরলতা'।

সা-৫০॥ গীতায় ৩।৩৯ শ্লোকে বলছেন "আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা, কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ," অর্থাৎ কামরূপ দুষ্পূর অনলের দ্বারাই জ্ঞানীগণের জ্ঞান আবৃত হয়ে যায়। এই কামানলই জ্ঞানীগণের নিত্যবৈরী। ভক্তিরসামৃতের ৩।২।৬ "কামাদীনাং কতিন কতিধা" শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী ঐ একই কথা বলেছেন।

দেহ ভস্মীভূত—অর্থাৎ স্বসুখলালসার বশবর্ত্তী হয়ে ব্রহ্মবস্তুরূপ অমৃত বিনাশ। সুধা যেমন অমরত্ব প্রদান করে, ব্রহ্মবস্তু তেমনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা অর্জন করিয়ে মানুষকে জন্মমৃত্যুর গ্রাস থেকে উদ্ধার করে। কারণ, ব্রহ্মরূপী সত্ত্ব সাধন দ্বারা বিশুদ্ধ হ'লে তবেই বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী কৃষ্ণরতি তার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়ে চিন্ময়ী ভক্তির উদয় করাবে—এবং এইরূপ "ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।"-ভাঃ ১০।৮২।৪৪। অমৃতরূপী আসল বস্তু সংরক্ষণ না করলে, ভয়াবহ ভবসাগরের কল্লোলকে আর কোনো ক্রমেই রুখতে পারা যায় না। পরে অন্য সাধনরূপী বালির বাঁধ আর কোনো কাজেই

লাগে না। ভাগবতে তাই বার বার বলছেন, ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট ক'রে আত্মা খণ্ডিত করলেই সে অসাধু হয়ে যায়, এইরূপ "খণ্ডিতাত্মসু অসাধুষু সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ"—৩।৩১।৪১, "তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গীসঙ্গম্"—৫।৫।২,"সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং কচিৎ" —১১।২৬।৩, "ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ও আর্জব"—এই হচ্ছে সাধন ধর্ম—১১।৩।২৪, "রেতোনাবকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ,"—১১।১৭।২৫ এবং যারা মায়ারচিত কামিনী কাঞ্চন আদিতে উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলোভিত হয় তারা নষ্ট দৃষ্টি হ'য়ে পতঙ্গবৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়—১১।৮।৮। কিন্তু কামের ভয়ে সাধন ছাড়লে চলবে না। গুরুকে কর্ণধার ক'রে যে এই ভবসমুদ্রপার হ'তে চায়, একমাত্র সেই সংসার হ'তে উদ্ধার হয়। সেই অনন্য ভক্তগণকে ভগবান বলেছেন,—"তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে"—ভাঃ ৩।২৫।৪০, অর্থাৎ আমি তাদের জন্ম-মৃত্যু সাগর পার করি। যার হৃদয়ে ভগবান্ সতত বর্ত্তমান, সেখানে মায়ার প্রভাব নেই, সুতরাং জন্ম-মৃত্যুর ভয়ও নেই। ভাগবত বলেছেন, "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া"—২।৫।১৩, অর্থাৎ, মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করতে লজ্জিতা হন। এইরূপ "নিবেদিতাত্মা" ভক্ত "অমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানঃ" —ভাঃ ১১।২৯।৩৪, অর্থাৎ ভগবানে নিবেদিতাত্মা ভক্ত অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

সা-৫১॥ শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন, 'গুরুদেবতাত্মা', 'গুরু পরমদৈবতঃ'—১১।২।৩৭ ও ২।৭।৪১; চৈত্যাধিষ্ঠাতারূপে তিনিই আত্মার আত্মা, প্রিয়তম ও পরমার্থ; আর সবই "নিদ্রানুগ স্বপ্ন" ও "পান্থসঙ্গম"বৎ "মায়ার বিভ্রম" মাত্র—একথা ভাগবত বারংবার বলেছেন। এইসব "গৃহাপত্যাপ্ত ও বিত্ত নিত্য আত্তিদ" ও সেইসব "বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগান্মনঃ" ক্ষুভ্যতি নান্যথা"-ভাঃ ১১।২৬।২২, অর্থাৎ বিষয়ে ইন্দ্রিয়সংযোগ থেকেই মন ক্ষুভিত হয়। তাদের তথাকথিত ভালোবাসাই প্রকৃত জ্ঞান আবরণ ক'রে মানুষকে মোহে আবদ্ধ করে ও এই "মায়ারচিত বিষয় সমূহে প্রলোভিত হ'য়ে উপভোগবুদ্ধিতে মানুষ পতঙ্গবৎ বিনষ্ট হয়"—ভাঃ ১১।৮।৮। কিন্তু "সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ, সন্তো দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ"—ভাঃ ১১।২৬।৩৪, অর্থাৎ প্রকৃত সাধুগুরুই মানুষের দেবতা ও বান্ধব, তাঁরাই সূর্য্যের মত অন্ধকারে জ্ঞানচক্ষু দেন। সেই সুজনরূপী সৎগুরুচরণ শরণ নিলেই অনিত্য কামনা ক্রমেক্রমে চলে যাবে, তবে সাবধান হ'তে হবে, কারণ জীবমাত্রেরই অন্তরে স্বসুখবাসনা বর্ত্তমান। তাই বলছেন, এই স্বসুখ স্রোতরূপী নদীর ধারে যেওনা কখনো, অর্থাৎ, গুরু-সেবা ছাড়া অন্য কোনো কাজে লিপ্ত থেকো না। সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে, কী জন্য এই ভবে আসা; এবং যাতে স্বসুখকামনায় ভবপারের সম্বল বিনষ্ট বা আসল ধন হরণ হয়ে না যায়, তজ্জন্য সদা সজাগ থাকতে হবে।

সা-৫২ ॥ সাধকের নববিধ সাধনের ইঙ্গিত দিচ্ছেন—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি। সাধনশুদ্ধ চিত্তে এই নামই হবে মহাপ্রভু কথিত "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্"—চৈঃ চঃ ৩।২০। প্রসঙ্গক্রমে দেবাদিদেব মহাদেবের বৈরাগ্য ও দিবানিশি পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণের পঞ্চতত্ত্ব সাধনের উল্লেখ করছেন। হরিনামরূপ "পীযূষপানাৎ বিনা"—ভাঃ ৪।২২।২১ সাধন হয় না। সেই অমূল্যধন অধরে ধ'রে সাধন করতে হবে। এখানে অন্তরঙ্গ সাধনের ইঙ্গিত রয়েছে—যা' গুরুমুখে শ্রোতব্য। সময় থাকতে সাধন ক'রে নিতে হবে—কারণ কখন যে প্রাণপাখী পালাবে তার কিছুই ঠিক নেই—তাই ভাগবত বলছেন —"তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্নিঃশ্রেয়সায়"—১১।৯।২৯, অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হ'তে না হ'তে আত্মার কল্যাণের জন্য তাড়াতাড়ি সাধন ক'রে নিতে হবে।

সা-৫৩ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতের সেই "মমাহমিতি ধীঃ" ২।৭।৪১, অর্থাৎ আমার-আমার এই মিথ্যা মোহ। আমার যিনি প্রকৃত আপনজন, সেই "গুরু আত্মদৈবতঃ" ১১।৩।২১—কে চিনতে হ'লে জীয়ন্তে মরতে হবে, অর্থাৎ দেহাত্মবোধ ত্যাগ ক'রে ষড়রিপুজয়ী হ'তে হবে। তা' হ'লে শ্রীচৈতন্যরূপী গুরুর কৃপা হবে এবং তাঁকে চিনতে পারা যাবে, "আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি"—ভাঃ ১১।২৯।৬। কৃপা না হ'লে কেউ তাঁকে চিনতে পারে না।

চোর—ষড়রিপু, আসলবস্তু—ব্রহ্মবস্তু, মহাজন—শ্রীভগবান্, সিন্দুক—দেহ। ভাগবতে বলেছেন, "স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ" ইত্যাদি ৭।৭।২১, অর্থাৎ সুবর্ণকণা-প্রস্তর থেকে যেমন অভিজ্ঞ স্বর্ণকার স্বর্ণ সংগ্রহ করে, তেমনি অধ্যাত্মবেত্তা এই দেহেই সাধন ক'রে পরমার্থরূপী ভগবানকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেই দেহরূপ সিন্দুকের চাবি যদি পর, অর্থাৎ রিপুর হাতে সঁপে দেওয়া হয়, তবে তারা তো সব কিছুই চুরি ক'রে দেহকে নিঃস্ব ক'রে দেবে এবং মানুষকে সাধনরূপ প্রতিশ্রুতিভঙ্গ দোষে শ্রীভগবানের কাছে আসামী হ'য়ে দাঁড়াতে হবে। তাই বলছেন, প্রকৃত আপন যিনি, সেই 'গুরু-দেবতাত্মা'কে "প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ"-ভাঃ ১১।২।৫৫, অর্থাৎ ভক্তিডোরে তাঁর শ্রীপাদপদ্মযুগল হৃৎপদ্মে বেঁধে রাখতে হবে, এবং বাহ্য পূজার্চ্চনার আড়ম্বর বর্জ্জন ক'রে, মনে মনে, অর্থাৎ, অন্তশ্চিন্তিত দেহে পূজা ও সেবা করতে হবে। এরূপ করলে তাঁর কৃপা হবে এবং তখন "ইহার কৃপায় হয় দর্শন ইহার"—চৈঃ চঃ ২।১০।১৭৪, "যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব; তখন সেই অমূল্যধনকে সাক্ষাৎ দেখতে পাবে—"মায়াবলেনভবতাপিনিগুহ্যমানং পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ"—যমুনাচার্য্য স্তোত্র—১৮, অর্থাৎ স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে আপনি আপনাকে গুপ্ত রাখলেও, আপনার অনন্য ভক্তগণ আপনাকে সর্ব্বদা দর্শন ক'রে থাকেন।

সা-৫৪ ॥ গুরুপাদপদ্মে যিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁর লক্ষণ বলছেন। এরূপ সাধক—"স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্"—ভাঃ ৪.২৯।৪৬, তিনি লোকধর্মে ও বেদধর্মে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত বুদ্ধি ত্যাগ করেন। এরূপ আত্মসমর্পণকারীর নিজের বলতে আর কিছুই থাকে না; তিনি সর্ব্বদাই গুরু-সেবায় উন্মুখ, গুরু-সুখে সুখী। এইভাবে তিনি 'আমার-আমি' বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে গুরুর দাস হয়ে আছেন; তখন তাঁর 'দ্বন্দ্ব'-জ্ঞান থাকে না—"সমত্বং দ্বন্দ্ব সংজ্ঞয়োঃ"—ভাঃ ১১।৩।২৪, অর্থাৎ সুখদুঃখে সমভাব হয়ে যায় এবং "সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশাঃ"—ভাঃ ১১।৩ ২৪, অর্থাৎ গুরুনামে মত্ত ও গুরুসেবায় সন্তুষ্টচিত্ত তাঁর সমস্ত দিকই সুখময় হয়, তাই সে ভক্ত প্রেমানন্দে হারায় দিশা দিবানিশি।

সা-৫৫ ॥ সাধকের পক্ষে এ সঙ্গীতটি একটি অমূল্য নিধিস্বরূপ। সাধনপথে বহু বাধা বিঘ্ন, বিভীষিকা ও ভ্রমাত্মক ধারণা আছে—সেগুলি সম্বন্ধে সতর্ক করছেন। আমরা অনেক সময় ভাবি, নাম জপ প্রভৃতি সাধন করছি, মনে আনন্দ হচ্ছে, সময়ে ভগবৎ পাদপদ্ম স্মরণে চোখে জলও আসছে—সুতরাং আমাদের ভক্তি বা প্রেমলাভ হয়ে গেছে। এ ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল। চৈঃ চঃ বলছেন—"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন, তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন"—১।৮।১৫, "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি, হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা"—ভ. র. সি-১।২২, অর্থাৎ শত সহস্র অনাসঙ্গ সাধন দ্বারা সুচির কালেও অলভ্যা এবং সাসঙ্গ সাধনেও শ্রীহরি কর্তৃক সহসা অদেয়া এই হরিভক্তি। "অতো মাং সুদুরারাধ্যাং হিত্বান্যাম্ ভজতে জনঃ"-ভাঃ ১০।৮৮ ১১, অতএব সুদুরারাধ্য আমাকে ত্যাগ ক'রে অন্য দেবকেই লোকে ভজনা করে। সুতরাং সাধারণ সাধকের এই ভক্তির আভাস প্রকৃতপক্ষে 'ভরমে ভক্তি'। মুখে আত্ম-সমর্পণের কথা বললেও, আমরা কাজে তা' করি না, আত্মসুখের জন্য কর্ম ক'রে থাকি। গুরুকে দেবতা ও প্রিয়তম জ্ঞানে সর্ব্বভাবে তাঁর নিঃস্বার্থ-সেবা না ক'রে, এক লাফে গোলোক-বৃন্দাবনে চলে গেছি ব'লে মনে ক'রে থাকি। অ-আ-ক-খ পাঠক শিশু ছাত্র হয়ে গবেষক বা অধ্যাপক হ'তে চাই। শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলেছেন, গুরুচরণ পরিত্যাগ ক'রে কোনো ক্রমেই ভবসাগর পার হওয়া যায় না—ভাঃ ১০।৮৭।৩৩, ১১।৩।২২ ইত্যাদি; আর বলেছেন, "মল্লক্ষণমিমং কায়ম্"—১১।২৬।১, এই নৃ-দেহরূপ পরমার্থ-সাধন যন্ত্র পেয়ে গুরুকে কর্ণধার ক'রে যে ভবাব্ধি পার না হয়, সে আত্মহা—ভাঃ ১১।২০।১৭। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে স্থিররতি লাভ করতে হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকস্থ আচরণের দ্বারা তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকতে হবে। এই ত্রিগুণাত্মক মায়াময় দেহের মায়াভ্রম ঘুচাবার জন্য নিত্যানন্দরূপী গুরুকে কাতরভাবে নিবেদন করতে হবে। ষড়রিপুর প্ররোচনায় দশ ইন্দ্রিয়—এই ষোলো জনা মিলিত-

ভাবে মনকে টানছে। তাই ভাগবতোক্ত ১১।১৩৩৪, 'মায়াস্বপ্নত্রিধা' রূপী ভ্রম থেকে বাঁচাবার জন্ম গুরু নিত্যানন্দকে এই ত্রিবেণীতে, অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী মায়া-প্রবাহের মধ্যে আহ্বান করছেন। কারণ, গীতায় বলেছেন, "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। তাই তাঁকে আসতেই হবে—নতুবা প্রাণে বাঁচব না।

এইভাবে তাঁকে আহ্বান ক'রে, তাঁর সুখে সুখী হয়ে তাঁর সেবা ক'রে "তৎপরত্বেন নির্মলম্"—ভ. র. সি. ১।১।১০, হ'তে হবে। বাইরে তিলকমালা রূপ বহিঃসজ্জার কোনোই মূল্য নেই—এসব বহিরাবরণ সাধনরূপ অগ্নিপরীক্ষাতে টেঁকে না। তজ্জন্য আত্মখণ্ডনকারী, অসাধু, শিশ্নোদরসেবী সংসারীর সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে; কারণ তারা বাইরের ঠাট ঠিকমত বজায় রাখলেও এবং কুলশীলমান ও পাণ্ডিত্যাধিকারী হ'লেও আসলে দিনকানা—অর্থাৎ মায়া মোহাচ্ছন্ন। কামিনী-কাঞ্চন প্রতিষ্ঠার অগ্নিপরীক্ষার আগুনে এসব মেকী-সোনার ভিতরের পিতলরূপ বার হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর"—চৈঃ চঃ ২।৮, একথা মনে রাখতে হবে এবং বাইরে সাধুর বেশ হলেও, সাধক এদের সঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জন ক'রে চলবেন; "সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদর তৃপাং ক্বচিৎ, তস্যানুগতস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ" —ভাঃ ১১।২৬।৩, অর্থাৎ এইরূপ বাইরের ছটাযুক্ত, সাধুবেশী, বিদ্যাবাগীশ, মেকী--সোনাদের অন্তরালে অবস্থিত শিশ্নোদর পরায়ণ, অসতের সঙ্গ করবে না; তা' হ'লে অন্ধের অনুগামী অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে পড়তে হয়। কৃষ্ণভক্ত যে কত সুদুর্লভ, তা' চৈঃ চঃ পরিষ্কার ক'রে বলেছেন, "কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত"—২।১৯।১৩১ এবং ভাগবত বলেছেন, "অতো মাং সুদুরারাধ্যম্" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ও ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর 'সাধনৌঘৈঃ' শ্লোকে।

সা-৫৬॥ সিদ্ধ মহাপুরুষের কয়েকটি লক্ষণ বলছেন। ভাগবতে উল্লিখিত হয়েছে, "প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ,অবিকারাদকর্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ"—ভাঃ ৩।২৭।১, অর্থাৎ, সূর্য্য যেমন সলিলে প্রতিবিম্বিত হয়েও সলিল ধর্মাক্রান্ত হয় না, মুক্তপুরুষ সেইরূপ সংসারে থেকেও প্রকৃতির গুণে বা প্রকৃতিজ সুখদুঃখে লিপ্ত হন না। চকমকী পাথর জলে থাকলেও যেমন তার অগ্নিপ্রকাশ করার শক্তি নষ্ট হয় না, সিদ্ধ পুরুষের নির্ব্বিকার চিত্ত তেমনি সংসারে থেকেও সংসারের সুখদুঃখে নির্লিপ্ত থাকে এবং ঠুকলে পরেই, অর্থাৎ প্রয়োজন হ'লেই অন্তঃস্থিত শ্রীভগবানের প্রকাশে বাইরের মলিনতা ও অন্ধকার দূর ক'রে জগৎ পবিত্র করেন—"তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা"—ভাঃ ১।১৩।১০। সাধক সাধুগুরুসঙ্গ ও তাঁর সেবা দ্বারা ধৈর্য্য ধ'রে নববিধ ভক্তিসাধন করলে নিশ্চয়ই একদিন ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করতে পারেন—"সৎ-সঙ্গলব্ধয়া

ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা, স বৈমেদর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্"—ভাঃ ১১।১১।২৫, অর্থাৎ সৎসঙ্গবশতঃ আমার প্রতি ভক্তি দ্বারা আমার উপাসনা করলে, সাধুগণ প্রদর্শিত আমার পদ নিশ্চয়ই লাভ করবেন।

সা-৫৭॥ আত্মসুখবাসনা সর্ব্বভাবে বিসর্জ্জন ক'রে গুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এ সংসার মায়াময়, "পান্থশালার সঙ্গমের" মত কেউ কারো নয়। সুতরাং তাদের জন্য চিন্তা করা বৃথা। নিজ গরজ থাকতে—অর্থাৎ স্বসুখবাসনার লেশমাত্র থাকতে সাধন হবে না, 'সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্' করতে হবে—ভাঃ ১১।১১।২২, এবং "ময্যনন্যেনভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্, মৎকৃতে ত্যক্তকর্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ"—ভাঃ ৩।২৫।২২, অর্থাৎ, যাঁরা অনন্যভাবে আমাতে দৃঢ়ভক্তি করেন এবং আমার জন্য সমস্ত কর্ম এবং স্বজনবান্ধব ত্যাগ করেন, তাঁরাই এই সাধনের উপযুক্ত। আত্মসুখীর দ্বারা এ সাধন হবে না। ব্রজগোপীদের মত 'অন্যাভিলাষিতা শূন্য' হয়ে "ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ"—তিনিই এই ভক্তিসাধনে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

আনুকূল্য-অনুশীলন—"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ'-হরিভক্তিবিলাস ১১।৪১৭ এবং 'হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনম্'—ভ. র. সি.—১।১।১০, "আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন—চৈঃ চঃ ২।১৯।১৪৮, অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে তার অনুকূল অনুশীলন দ্বারা গোবিন্দসেবা করাতে হবে। শ্রীমদ্ভাগবতের "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে" ইত্যাদি ৯।৪।১৮-২০ শ্লোকগুলিতে এই সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এইরূপ সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণসেবাতেই ভগবৎরতির উদয় হয়ে থাকে।

সাধারণ মায়াবদ্ধ মানুষ "জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্ পুষ্ণাতি যৎ প্রিয়চিকীর্ষয়া বিতন্বন্, স্বান্তে সকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ সদেহঃ সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্মা"-ভাঃ ১১।৯।২৬, অর্থাৎ এই দেহ পরকীয়; মানুষ এই দেহের জন্য এবং স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য বহু কষ্টে ধন সঞ্চয় ক'রে পোষণ করে, কিন্তু সেই দেহ কর্ম-বীজ উৎপাদন ক'রে অবশেষে বিনষ্ট হয়। সুতরাং আপন ধন অর্থাৎ ভবপারের সম্বল ব্রহ্মবস্তু, পরকে দিয়ে বা বিনষ্ট ক'রে শেষে দেউলিয়া বা ঋণী হয়ে বিদায় নিতে হবে।

সা-৫৮॥ সাধকের পক্ষে এ সঙ্গীতটি একটি মহামূল্য রত্ন।

স্বরূপতত্ত্ব—জীবের স্বরূপ, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করতে হবে। মহাপ্রভুর কাছে সনাতন গোস্বামীর সেই প্রশ্ন 'কে-আমি'র তত্ত্বসাধন।

রূপতত্ত্ব—যা' থেকে রূপ-সৃষ্টি সেই প্রকৃতিতত্ত্ব। যে "প্রকৃতি বিহনে কৃষ্ণের নাহিক আকৃতি"-বৃহদ্ভাগবতামৃতম্, "শ্রীভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ"—প্রীতিসন্দর্ভধৃত বচন, এবং যে "যুগপৎশক্তিত্রয় প্রধানং মূর্তিঃ"—বিষ্ণুপুরাণের ১।১২।৬৯ শ্লোকের টীকায়

শ্রীধরস্বামী—সেই শক্তিতত্ত্ব আরাধনা, যিনি "জায়তে অত্যন্ত দুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ —নারদপঞ্চরাত্র। "তীর্থ যাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম"—নরোত্তম। প্রকৃতপক্ষে "সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ" তিনি "স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি"-ভাঃ ৭।৭।২১, যাঁর "অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ উপাসিততীর্থতীর্থম্"—ভাঃ ১০।৬৮।৩৭, এবং "তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে",—ভাঃ ৯।৫।১৬। সেই তীর্থপদ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম সময়েতে, অর্থাৎ শিশুকাল থেকেই সেবা করতে হবে, যৌবনে আত্মসুখোন্মত্ত হয়ে অন্যদিকে মন গেলে চলবে না, ভরতরাজার মত "অহো যুঠেব উত্তমঃশ্লোকলালসঃ" —ভাঃ ৫।১৪।৪৩ হ'তে হবে।

অমূল্যধনরূপ শ্রীভগবৎপদারবিন্দ হৃদয়পদ্মেই বর্তমান। হৃদয়েই সেই বৃন্দাবন সেধে নিতে হবে, স্বর্ণকারের মত দেহক্ষেত্রে স্বর্ণ অনুসন্ধান ক'রে নিতে হবে—ভাগবতে তা' বার বার বলছেন। কিন্তু কল্পবৃক্ষ শুষ্ক হ'লে যেমন তাতে আর ফল ফলে না, রস ট'কে গেলে যেমন তাতে আর ভিয়ান হবার আশা থাকে না, তেমনি দেহরূপ বৃক্ষ শুষ্ক প্রায় হ'লে আর তা'তে সাধলেও কিছু মেলে না। তাই ভাগবত বলছেন, "তূর্ণং যতেত"—১১।৯।২৯। গর্ভাবাসে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভগবান্‌কে ভগবৎসাধনের প্রতিশ্রুতি দেয় মানুষ—ভাঃ ৩।৩১, কিন্তু ভবে এসে তা' ভুলে যায়। আত্মসুখলোভে প'ড়ে আসলধন ব্রহ্মবস্তু হারায়। "মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ"—ভাঃ ২।৫।১৩, আমার-আমার করে যে সব মন্দবুদ্ধিজন, তারা জানে না যে সবই "বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসম্"-ভাঃ ১১।১৩।৩৪ সবই মায়া রচিত, নিদ্রামুগ স্বপ্নবৎ। তারা শুধু আত্মসুখে প্রলোভিতাত্মা হয়ে পতঙ্গবৎ বিনাশ পায়—১১।৮।৮। প্রকৃত আপনজন, যথার্থবন্ধু হচ্ছেন "গুরু-দেবতাত্মা"—ভাঃ ১১।২০।১ "সন্তো দেবতা বান্ধবাঃ"—ভাঃ ১১।২৬।৩৪।

অন্তরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা দু'জনে সখার মত নিত্য অবস্থিত—"সদৃশৌ সখায়ৌ"-ভাঃ ১১।১০।৬, বিষয় থেকে মন আকর্ষণ ক'রে তাঁকে প্রাণপণে চিন্তা করতে হবে, "তং সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ"-ভাঃ ১১।১৪।৪৩, ভাগবতোক্ত যোগক্রিয়াদ্বারা-৩।২৮।১০, তখন সেই "জ্যোতির্ম্ময়" ভগবান্‌কে সাধনেতে সাক্ষাৎ দর্শন পাবে—"যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ"-মুণ্ডক ৩।১।৫। কিন্তু আত্মসুখ বশবর্তী হয়ে ভবপারের আসল ধন সর্ব্বশাস্ত্র কথিত ব্রহ্মবস্তু বিনষ্ট করলে মহাজনরূপী শ্রীভগবান্ ছাড়বেন না। ভাগবতের ৩।২৫।৪০ "বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যান্" শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন, অন্যসব সুখ পরিত্যাগ ক'রে অনন্য ভক্তিদ্বারা যারা তাঁর ভজনা করে, তাদের তিনি ভবরূপ জন্মমৃত্যু সাগর পার করেন।

হ'লে দয়া যাবে মায়া—ভগবৎমায়া দুরত্যয়া; এ মায়া পার হ'তে হ'লে ভগবান্‌কে শরণ নিয়ে সাধন ক'রে যেতে হবে। ভাগবতের ৩।২৫।১৭ শ্লোকে

বলেছেন তিনি "প্রকৃতেঃ পরম্" এবং "অখণ্ডিতম্। তাঁকে পেতে হ'লে প্রথমে সাধনা দ্বারা "প্রকৃতিকে হত-তেজ" করতে হবে। সেটা সম্ভব একমাত্র "ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্"-মুণ্ডক ৩।১।৫। আত্মসুখকামনাতেই ব্রহ্মবস্তু স্খলন হয়, তাই ভাগবত বলছেন "রেতোনাবকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ"—১১।১৭।২৫। অন্যথা প্রকৃতির গুণ-রাগে রঞ্জিত হয়ে সংসারে যাতায়াত করতেই হবে—কোনো পরিত্রাণ নেই। নিজে অখণ্ডিত থাকলে তবেই সেই "আনন্দসংপ্রবমখণ্ডম্" ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন হবে—দেখতে পাবে নয়নেতে—"পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ"-মুণ্ডক, এবং "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি তং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণ স্বরূপম্"-ব্রহ্মসংহিতা-৩৮।

সা-৫৯॥ সাধকের পক্ষে বিষয় ত্যাগ, বৈরাগ্য, দৈন্য ও যোগ কত প্রয়োজন তাই বলছেন। চৈঃ চঃ বলেছেন, "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান, যাহা দেখি প্রীত হয় গৌরভগবান্"—৩।৬.২১৮, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ প্রভৃতি ছয় গোস্বামীর তীব্র বৈরাগ্য তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেবাদিদেব মহাদেবও সেই সাধন করেছেন। ত্যাগ সম্বন্ধে ভাগবত বলছেন, "যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয় মাত্মনঃ, তত্তন্নি বেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে"—১১।১১।৪১, যথালভ্য আহার ও বাসস্থান সম্বন্ধে বলছেন, "যদৃচ্ছয়োপপন্নমন্যাচ্ছুক্রমুতাপরম্ তথাবাসস্তথাশয্যাং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ"—১১।১৮।৩৫, অর্থাৎ ভালমন্দ বিচার না ক'রে যথালভ্য আহার ও বাসস্থানই ভগবৎসাধকের কর্ত্তব্য।

ভগবৎসাধকদের বিষয়ত্যাগ সম্বন্ধে ভাগবত উদাত্তকণ্ঠে বলছেন, "মৎকৃতে ত্যক্ত কর্ম্মাণস্ত্যক্ত স্বজনবান্ধবাঃ", "বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যান্"—৩।২৫।২২-২৪, অর্থাৎ ভগবানের জন্য তাঁরা সমস্ত কাম্যকর্ম, স্বজন, বান্ধব এবং অন্য সব কিছুই ত্যাগ করেন। প্রকৃত পক্ষে ভক্তির উদয়ে মন কৃষ্ণ অনুরাগে বিবাগী হবেই, "কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ, কৃষ্ণ বিনা অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ"—চৈঃ চঃ ১।৭।১৩৬, "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ"-ভাঃ ১১।২।৪২, অর্থাৎ, ভগবানে ভক্তি, তাঁর অনুভব ও অন্যত্র বিরক্তি একই সময়ে উদিত হয়। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে ভক্তের মন যে বিবাগী ও যোগী হয় তার প্রমাণ দিচ্ছেন স্বয়ং মহাপ্রভু, "মন কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মন হইল যোগী"-চৈঃ চঃ ৩।১৪।৪৮; কৃষ্ণমাধুর্য্য এমন জিনিষ যে "তার লোভে মোর মন, ছাড়ি' লোক বেদধর্ম, যোগী হইয়া হইল ভিখারী"-৩।১৪।৪০। বৈষ্ণব-যোগের কথা সনাতন গোস্বামীও বলেছেন, "যোগোঽথবা বৈষ্ণবঃ"-ভ.র.সি ১।৩।১৬। শ্যামকুণ্ড থেকে রাধাকুণ্ডে মিলন—উচ্চতর অন্তরঙ্গ সাধনের ইঙ্গিত, যা' কৃপাধন্য ভক্ত গুরুমুখে শ্রবণ ক'রে সাধন করবেন।

সা-৬০ ॥ অনুরূপ আর একটি মূল্যবান্ সঙ্গীত। গীতায় অর্জ্জুন বলেছেন—"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্-৬।৩৪,এই চঞ্চল মনকে"অভ্যাসেন তু বৈরাগ্যেন" বশে আনতে বলছেন ভগবান্। ভাগবতে বলছেন, এই "মন-তুরগ"কে গুরুচরণ শরণ ব্যতীত বশে আনা যায় না-১০।৮৭।৩৩, এই সর্ব্বব্যাপক চিত্তকে বিষয় থেকে আকর্ষণ ক'রে অন্য কিছু চিন্তা না ক'রে কেবল তাঁরই ভাবনা করতে হবে,—ভাঃ ১১।১৪।৪৩। সেই শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করলে সব ভাবনা দূরে যাবে, সব কামনা বিনষ্ট হবে, "ইচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্"-ভাঃ ৫।১৯।২৬। যিনি "প্রকৃতেঃ পরম্"-ভাঃ ৩।২৫।১৭, সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবান্‌কে তর্কের দ্বারা জানা যাবে না, "ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ"-ব্রহ্মসূত্র ২।১।৬ ধৃত স্কান্দ বচন। তিনি জীবের প্রাকৃতমনের অগোচর। তাঁর নামসুধা "ইতর রাগ বিস্মারণং নৃণাম্"-ভাঃ ১০।৩১।১৪, ভোলা মহেশ্বর তাই সব ভুলিল রে। এই নামামৃতই তাঁকে অমৃতত্ব প্রদান ক'রে 'মৃত্যুঞ্জয়' আখ্যায় ভূষিত করেছে। ভাগবতে ভগবান্ বলেছেন, "নিবেদিতাত্মা মে অমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানঃ"-১১।২৯।৩৪ অর্থাৎ আমাতে নিবেদিতাত্মা অমৃতত্ব প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করে ; এবং "তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে"-৩।২৫।৪০, 'তাদের জন্মমৃত্যুগ্রাস হ'তে উদ্ধার করি। বাস্তবিক-পক্ষে তাঁকে পেলে "পুনরিহয়ৎসমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে"—ভাঃ ১০।৮৭।১৮। যিনি "নিত্যো নিত্যানাম্"-কঠোপনিষদ্, তাঁর দর্শন হ'লে "বিদ্বান্ উন্মত্তবৎ" -১১।১৮।২৯ হয় এবং লজ্জা-ঘৃণা-ভয় ত্যাগ ক'রে "উন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ"—ভাঃ ১১।২।৪০, যে সাধক সাধন-বলে এরূপ সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর দেহরূপ ভাণ্ডই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বলেছেন—"মল্লক্ষণমিমং কায়ম্"-১১।২৬।১, অর্থাৎ এই নরদেহ আমার স্বরূপ অবগতির সাধনভূত যন্ত্র।

সা-৬১ ॥ গোপীগণ যেভাবে আত্মস্মৃতি বিস্মৃত হয়ে সর্ব্বভাবে নিজেদের শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিবেদন করেছিলেন, এ সঙ্গীত তারি একটি অনবদ্য প্রকাশ। আমার আমি ভুলে যাব—"আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার, কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার"—চৈঃ চঃ ১।৪।১৪৯, এ ঠিক সেইরূপ মানসিক অবস্থা। প্রকৃত নিবেদিতাত্মার কী অবস্থা হয় তা' ভাগবতে ১১।২৯।৩৪ "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে, তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ" শ্লোকে বলেছেন। 'নিবেদিতাত্মা' পদের টীকায় চক্রবর্ত্তীপাদ বলেন, "নিবেদিতৌ আত্মানৌ অহন্তাস্পদমমতাস্পদে যেন সঃ", অর্থাৎ আমি ও আমার বলতে যা' কিছু সব নিবেদন করেছেন যিনি ; "যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহ লোকে পরত্রচ, তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতমিতি ব্যবসায়বান্ ভবতি"—অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালে আমার যা' কিছু আছে, সবই তোমাকে সমর্পণ করলাম—এইরূপ ভাব হবে। এইরূপ আত্ম

সমর্পণকারী "অমৃতত্বং সংসার-ধ্বংসেন মরণাতীতত্বং প্রাপ্নোতি"—সনাতন গোস্বামী, অর্থাৎ, তিনি সংসার থেকে মুক্ত হয়ে মরণাতীত হন। "ময়াত্মভূয়ায়—আত্মনঃ স্বভূত্যৈ কল্পতে, যত্রাহং তিষ্ঠামি তত্রৈব সোঽপি মৎ-সেবার্থং তিষ্ঠতি"—চক্রবর্ত্তীপাদ, অর্থাৎ, আমি যেখানে থাকি, আমাতে আত্মসমর্পণকারী সেইস্থানে আমার সেবার জন্য থাকে। কিন্তু এ অবস্থা হঠাৎ আসে না। চক্রবর্ত্তীপাদ বলেন, "শনৈঃ শনৈর্ভক্ত্যাভ্যাসবান্ নিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরিতি ভূমিকারূঢ় এব সম্যক্ নির্গুণঃ স্যাৎ", অর্থাৎ, সাধন ভক্তি অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধক যখন "রতি"-পর্য্যায়ে উন্নীত হন, সেই 'জাতরতি' ভক্তেরই এইরূপ 'আত্ম-ভাব' অবস্থা আসবে। তার পূর্ব্বে নয়।

তোমারে ধরিয়া বুকে—"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু"-ভাঃ ১০।৩২।৩১, অর্থাৎ তোমার যে কোমল চরণ-কমল আমরা ভীত হয়ে আমাদের কঠিন স্তন-মণ্ডলে ধারণ করতাম—কৃষ্ণসুখৈকবাসনাময়ী গোপীগণের এই ভাবনা তুলনীয়।

সমুদ্রে নদী মিশিবে—গোপীগণের অবিচ্ছিন্না কৃষ্ণসেবাসুখ বাসনা স্মরণীয়। ভাগবতে শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ প্রসঙ্গেও বলেছেন, "মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ"—৩।২৯।১২, অর্থাৎ সমুদ্রে গঙ্গাসলিল প্রবাহের ন্যায় এই অবিচ্ছিন্না মনোগতি। এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হ'লে আত্মস্মৃতি সম্পূর্ণলোপ পেয়ে শুধুমাত্র কৃষ্ণ সুখসেবায় চিত্ত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হবে। এ অবস্থা একমাত্র গোপীগণই লাভ করেছিলেন—ভাগবতের ১০।৩০ অধ্যায়ে কৃষ্ণবিচ্ছেদে গোপীগণের এই কৃষ্ণ-তন্ময়ত্বের বর্ণনা আছে।

লা-৬২ ॥ কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে একটি মহামূল্যবান সঙ্গীত। কৃষ্ণপ্রেম অত্যন্ত দুর্লভ, চাইলেই পাওয়া যায় না। কৃষ্ণভজনকারীকে শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে কী অবস্থায় নিয়ে আসেন, তা' ভাগবতের ১০।৮৮।৮৯ শ্লোকে বলেছেন, "যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ, ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্," অর্থাৎ আমি যাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তার ধন হরণ করি, সে নির্ধন হ'লে তার আত্মীয়স্বজন তাকে পরিত্যাগ করে। "অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ," সুতরাং সুদুরারাধ্য কৃষ্ণকে ত্যাগ ক'রে লোকে অন্য দেবতা ভজনা করে। কিন্তু এত সত্ত্বেও যদি কেউ কৃষ্ণ ভজন না ছাড়ে, তবু তাকে তিনি অন্যান্য সিদ্ধি বা মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করলেও কৃষ্ণপ্রেম দেন না, "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগম্"-ভাঃ ৫।৬।১৮, "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া, কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া"-চৈঃ চঃ ১।৮।১৬। কৃষ্ণভক্তি যে কত দুর্লভ তা' ভক্তিরসামৃতসিন্ধু স্পষ্ট করেই বলেছেন: "সেয়ং সাধনসহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা", ১।২৩, ও "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি, হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা" ১।২।২২। সাধারণ সাধকের পক্ষে এই কৃষ্ণ প্রেমলাভ প্রায় অসম্ভবই বলা যায়, যেমন পেচকের ভাগ্যে সূর্য্যকিরণ দর্শন প্রায় ঘটে না বললেই চলে। কারণ,

আত্মসুখ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ক'রে কৃষ্ণসেবাসুখবাসনাময় হয়ে দুরূহ সাধন তো করতেই হবে, কিন্তু ঠিক সেইভাবে দুশ্চর তপস্যা ক'রেও "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ"-ভাঃ ১০।৪৭।৬০ শ্লোকে বলছেন,—"লক্ষ্মী করিলা ভজন, তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন", চৈঃ চঃ ২।৮।১৮৬, কারণ "গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে, ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে"। শ্রুতি-অভিমানী দেবগণ এইজন্য গোপী-অনুগত হয়ে, "তদ্ভাবানুগতভাবাঃ" (শ্রীজীবের টীকা) হয়ে রাগানুমার্গে ভজন করেছিলেন, শ্রীভগবান্ তখন তাঁদের বলেছিলেন, "দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ, ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যভবিতুমর্হতি"—বৃহদ্বামনপুরাণ। এ প্রেম যে কত সুদুর্লভ তা' দেখা যাচ্ছে। তাই গোপীভাবাশ্রিত হয়ে সখীর অনুগত হয়ে দুশ্চর দুরূহ তপস্যা করতে হবে, "অতএব গোপীভাব করি' অঙ্গীকার, রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার" এবং "সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি, রাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়, সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়"—চৈঃ চঃ ২।৮।১৬৬, ১৮৩।

কৃষ্ণপ্রেম অকৈতব—অর্থাৎ সর্বপ্রকার কৈতব বাসনা বিরহিত; শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকেই বলছেন, "ধর্ম প্রোজ্ঝিত কৈতবঃ।" "অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব"-চৈঃ চঃ ১।১।৫০, এবং "কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম"-১।১।৫২, অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাবাসনা ব্যতীত যাবতীয় বাসনামূলক কর্মই বর্জন করতে হবে। কবিরাজ গোস্বামী এই কৃষ্ণপ্রেমকে বলেছেন, "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদহেম—সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়,"-চৈঃ চঃ ২।২।৩৮; জাম্বুনদহেম অর্থ অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণ; কৃষ্ণপ্রেমে মলিনতার চিহ্নও নেই, "নির্মল সে-অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে, শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু,"-চৈঃ চঃ ২।২। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গ, তথা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম এমনই যে "তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি"-চৈঃ চঃ ২।২।৩১। কৃষ্ণদর্শনের একমাত্র উপায় কৃষ্ণপ্রেম, "প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।" এই কৃষ্ণপ্রেম এমনই জিনিষ যে তার স্পর্শে মায়াময় প্রাকৃত চিত্তও অপ্রাকৃত হয়ে যায়। মায়াময় ত্রিগুণ রাগে রঞ্জিত চিত্ত যে-বস্তুর সংস্পর্শে গুণমালিন্যরহিত হয়ে মায়াতীত বা অপ্রাকৃত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, সেই 'শুদ্ধসত্ত্ব'রূপী স্পর্শমণিকে সাধারণ জীব সাধারণ পাথর জ্ঞানে তার মহামূল্য স্পর্শমণিত্ব-গুণ জ্ঞান বিরহিত হয়ে হেলায় ফেলে দেয়। 'শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা' ভক্তিকে স্পর্শমণির সঙ্গে তুলনা করেছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।২২।১১ শ্লোকের টীকায় :—

"প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধু-বুদ্ধ্যামহে", অর্থাৎ স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়, তেমনি ভক্তি-সংস্পর্শে সাধকের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও অপ্রাকৃত হয়। এমন কি মায়িক বস্তুও

ভক্তের আনুকূল্য সেবাবাসনায় সত্য ও চিন্ময় হয়ে যায়—"ভক্তি সম্পর্কাৎ মিথ্যাভূতমপ্যেতৎ প্রবিলাপ্য ভগবতা স্বভক্তেচ্ছানুকূলেন পরমসত্যত্বমেব তৎক্ষণ এব সৃজ্যতে।"

'জাম্বুনদহেম সাধন' ও 'শুদ্ধসত্ত্ব সাধন'—অতি উচ্চস্তরের অন্তরঙ্গ ভক্তি-সাধন; কৃপাধন্য ভক্ত তা' গুরুমুখে প্রাপ্ত হবেন।

সা-৬৩॥ পূর্ব্বোক্ত অকৈতব প্রেম-সাধনের কথাই বলছেন। এই দুরূহ সাধনে যে সব বাধাবিঘ্ন ও প্রলোভন আসতে পারে, তারই ইঙ্গিত দিচ্ছেন। প্রথমে এ সাধনে আত্মসুখ বাসনার চিহ্নমাত্র থাকবে না। যে কোনোরূপ প্রলোভন যা' আত্মসুখ-বাসনার ইন্ধন যোগায় তাকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করতে হবে। 'মায়া প্রেম' তারই নিদর্শন। প্রকৃতবন্ধু একমাত্র সিদ্ধ সাধু মহাপুরুষ গুরুদেব; সেই 'গুরু-দেবতাত্মা'র শ্রীচরণ সার ক'রে সর্ব্বভাবে তাঁরই শরণ নিতে হবে। তিনি বাধা বিপদ ও নানা মায়াময় প্রলোভনের হাত থেকে, পতন থেকে সাধককে রক্ষা করবেন। দৈহিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক বিকার আসবেই। কিন্তু গুরু-শরণ না নিলে, তারা বিপথে চালিত ক'রে, আত্মসুখে প্রলোভিত ক'রে, ব্রহ্মবস্তু খণ্ডন ক'রে দেবে। একবার সেই অমূল্যনিধি চ্যুত হ'লে ভাগবতোক্ত 'অসাধু' হয়ে যেতে হবে। তখন আর কিছুতেই সেই অচ্যুত, "অখণ্ডিতম্", "আনন্দসংপ্লবমখণ্ডম্"-কে পাওয়া যাবে না। খণ্ডিত আত্মায় অখণ্ডিত পরমাত্মার প্রতিবিম্ব অসম্ভব; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম যা' কেবল অখণ্ডিত শুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভূত হয় এবং যে "প্রেম-সূর্য্য" শ্রীভগবানের স্বরূপের মতই "অখণ্ডমণ্ডলাকার", তা' খণ্ডিত আত্মায় কিছুতেই উদিত হ'তে পারে না। "মনোগতিরবিচ্ছিন্না" রেখে তাঁর সেবারূপ "অহৈতুকী" ভক্তি না থাকলে, তা' শুদ্ধাভক্তিরূপেই পরিগণিত হবে না—সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম তো বহু দূরের কথা। মনের মত মানুষ—গুরুই প্রকৃত বন্ধু, গুরুই মনের মত মানুষ; এইরূপ সিদ্ধ গুরু সঙ্গকেই শ্রীরূপগোস্বামী "রসিকাসঙ্গরঙ্গী"—ভ. র. সি. ২।১।৪ বলেছেন। উভয়ে অখণ্ড হ'লে—"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ"—শ্রীরূপগোস্বামীকৃত চৈতন্যাষ্টক-৩; এই শ্লোকে কোনোও প্রণয়িজনবৃন্দের অনির্ব্বচনীয়, অপরিসীম রসসমূহকে হরণ ক'রে সেই রস আস্বাদনকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্তব করা হয়েছে। গোপী-অনুগত হয়ে 'ব্রজরাস' দর্শন করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করতে হ'লে, এই অখণ্ডিত রস-হরণ সাধন-ক্রিয়া করতে হবে,—যা' সাধনের অতি উচ্চ পর্য্যায়ে সাধক গুরু-উপদেশ মত সাধন করবেন।

সা-৬৪॥ কৃষ্ণপ্রেম সাধকের আর একটি সতর্কতামূলক অমূল্য উপদেশসম্বলিত এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত। আসল কথা, সর্ব্বদা গুরু অনুগত হয়ে তাঁর বাক্য অনুযায়ী সাধন করতে হবে। এ সাধন অতি উচ্চ স্তরেই সাধ্য। সাধক মনে করতে পারেন, তিনি বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়েছেন, অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন হয়েছে অনেক, অতএব নিজ-

বিচার অনুযায়ী মোটামুটি গুরু-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হ'লেই চলবে। কিন্তু তা' যে কত বিপজ্জনক, তাই সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন। গুরুর কাছে সাধনের 'ভাব' অবগত হতে হবে, সাধনের যে সব সহায় তিনি নির্দ্দেশ করেছেন, তারও যথার্থ মূল্যবোধ গুরুর কাছে জেনে নিতে হবে। ক্ষুরধার অস্ত্র নিয়ে এ সাধন—একটু অসতর্ক হ'লেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে জন্মের মত পতন অনিবার্য্য। তাই প্রেম-সাধন-সহায়কগুলির 'ভাব' পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে গুরুর কাছে। গুরুর নিকটে প্রেমনদীর কথা অবগত হয়ে, তাঁকে না জানিয়ে ও তাঁর বিনা পরীক্ষায় সে-নদীতে ঝাঁপ দিলে অকূলে ভেসে যেতে হবে। এ নদীতে সাঁতার কাটা সাধকের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং তারও চেষ্টা করা উচিত নয়। এ নদী সাধককে প্রলোভিত করলেও, এর কূল সাধক দেখতে পাবেন না। শ্রীরূপগোস্বামী তাই ইঙ্গিতে সাবধান ক'রে বলেছেন, "সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ"—ভ র. সি. ২ ৫.৭৮। বিনা সাধনে তো এ দুর্লভ রত্ন পাওয়া যাবেই না, উপরন্তু এই "সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা আনন্দরূপা কৃষ্ণরতি" একমাত্র "প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্," অর্থাৎ প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন যাঁরা করছেন এবং যুগল-সাধনে যুগল সংস্কার দ্বারা যাঁদের রতি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়েছে ও আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, একমাত্র তাঁদের পক্ষেই লাভ করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, এ অবস্থা সিদ্ধ সাধকেরই হয়ে থাকে, অপরের নয়। গুরু উপদেশ ও আদেশ ব্যতীত এ সাধন করতে গেলে পতনের সম্ভাবনা। তখন সেই অপরাধ রূপ ফাঁসীর যন্ত্রণা সারা জীবনই বৃথা বহন করতে হয়, কৃষ্ণপদে অনুরাগ না হয়ে বিরাগই এসে যায়। এ সাধনায় দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, তর্ক নেই—গুরূপদেশে একনিষ্ঠভাবে বহু কষ্ট সহ্য ক'রে সাধন ক'রে যেতে হবে। স্বসুখবাসনারূপ কামের গন্ধমাত্র থাকবে না এ সাধনে—কারণ "কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর"-চৈঃ চঃ ১।৪, "ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা" ও "অন্যাভিলাষিতা শূন্য" এই সাধন পূর্ণরূপে "নিরাশিষঃ" ভাঃ ১১।২০।৩৬, অর্থাৎ নিষ্কাম ও নির্ব্বিকার। সিদ্ধগুরু বিনা অন্য সাধকের প্রলোভনে ভুলে বিপথে গেলে "অন্ধান্ধুগান্ধবৎ"-ভাঃ ১১।২৬।৩, হয়ে অন্ধকারেই পড়তে হবে। অন্ধ যেমন আর একজন অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না, তেমনি মায়ান্ধকারাচ্ছন্ন জন যেমন নিজেও কখনো ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি ও কৃষ্ণপ্রেমলাভ করতে পারে না, অপরকেও তা' জানাতে বা সেই পথের সন্ধান দিতে পারবে না। একমাত্র ব্রজাঙ্গনাদের অনুগত হয়ে গুরূপদেশ মত সেইভাবে নিষ্কাম সাধনা করতে পারলে তবে এর প্রাপ্তির সম্ভাবনা, অন্যথা হাটে বাজারে, অর্থাৎ যেখানে সেখানে এ দুর্লভ রত্ন মেলা অসম্ভব।

সা ৬৫ ॥ বিদ্যানগরে মহাপ্রভু তাঁর অন্তরঙ্গতম ভক্ত রায় রামানন্দকে যে স্বরূপমূর্ত্তি দর্শন করিয়েছিলেন, সেই "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" এবং যে রূপ দেখে

রায় রামানন্দ মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন, যে-স্বরূপ "তোমা বিনা এই রূপ না দেখে কোনো জন" ব'লে মহাপ্রভু শ্রীমুখে ব্যক্ত করেছিলেন, সেই "রাধাভাবে ভাবিত আত্মমন" শ্রীকৃষ্ণই এ সঙ্গীতের বর্ণনীয় স্বরূপ। ইনি গোলোকস্থিত শ্রীকৃষ্ণ নন, বৃন্দাবনে অবতীর্ণ যশোদা-নন্দন নন, নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ বা নীলাচলের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যও নন—ইনি রায় রামানন্দ কর্তৃক সাক্ষাৎ দৃষ্ট ও স্বরূপ গোস্বামী বর্ণিত "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত ও তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তঃ" শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরূপ গোস্বামী বর্ণিত "প্রণয়িজনবৃন্দস্য রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুম্", অর্থাৎ রাধাপ্রেম আস্বাদন লোভে সেই প্রেমের আশ্রয় হয়ে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং মাত্র কয়েক জন উপযুক্ত পাত্রকে—"জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ-তিনজন"—চৈঃ চঃ ৩।২।১০৪ সেই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়েছিলেন।

সিদ্ধ মহাপুরুষগণ এই অপূর্ব্ব স্বরূপকেই 'সহজ মানুষ' বলেন। এর সাধন লিখে জানানো যায় না—"সহজ বস্তু না যায় লিখন" চৈঃ চঃ ২।২।৭৫, বেদে তাঁর বর্ণনা নেই, বিচার ক'রে তাঁর স্বরূপ জানা যায় না, তিনি সোনার কমল গোরারূপে অর্থাৎ রাধারাণীর হেমাঙ্গ বরণ ধারণ ক'রে, "দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্"—শ্রীরূপ, সাধনসিদ্ধ ভক্তচিত্তে উদিত হন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যোনিসম্ভব মনুষ্য বা দেব নন; তিনি সংস্কার-জনি, অর্থাৎ—সংস্কার বা সাধন-ক্রিয়াতেই তাঁর আবির্ভাব, "প্রণয়িজনবৃন্দস্য রসস্তোমং হৃত্বা" তাঁর উদ্ভব। স্বয়ং গোলোকনাথ গোলোকে থেকে পরকীয় প্রেম আস্বাদনে অসমর্থ হয়ে যোগমায়ার সহায়তায় বৃন্দাবনে নরলীলা করেছিলেন। সে প্রেম সাধারণ লৌকিক প্রেম নয়, তা' লৌকিক প্রেমসূত্র-কর্তা ভরতমুনির অগোচর। স্বয়ং আপ্তকাম হয়েও শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অনুগ্রহের জন্য মহারাসে "আত্মনি অবরুদ্ধসৌরতঃ"—ভাঃ-হয়ে সেই পরিপক্ব প্রেম লীলা রস আস্বাদন করেছিলেন। "যাঁহার যে সমরস ভরতমুনি মানে, আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে"-চৈঃ চঃ-১।৪।২১৪। ভরতমুনি গোলোকনাথকে এই পরম প্রেমের কথা জানালে, গোলোকপতি কৃষ্ণপ্রেমের আশ্রয়রূপিণী রাধারাণীর সেই সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমের কথা ভরতমুনিকে বহিরঙ্গজ্ঞানে তাঁর কাছে এড়িয়ে গেলেন এবং ভরতমুনি সোমরস পান ক'রে ঐরূপ কিছু একটা দেখেছেন, এই ব'লে সেই পরমপ্রেমের কথা ঢাকা দিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, এপ্রেম কথায় বর্ণনা করা যায় না, এ শুধু আস্বাদনের ও অনুভবের বস্তু; তাই রায় রামানন্দ অন্তরঙ্গতম হ'লেও মহাপ্রভু এই প্রেম-প্রসঙ্গ উত্থাপনে "প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।" এই প্রেমের বিষয় রূপে তিনি বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা প্রকট করলেন ও আশ্রয়রূপে আরও মধুরতর ভাব আস্বাদনের বাসনায় নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে লীলা করলেন। রাধারাণীর প্রেম যে কী বস্তু, এ জানবার জন্য "সে সুখমাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে"-চৈঃ চঃ ১।৪।২১৮ তাই গৌর-লীলায় গোপনে সেই মধুর হ'তে সুমধুর ভাব আস্বাদন করলেন এবং কৃপা

ক'রে কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্তকে এই নিত্যবস্তু রাধা প্রেমাস্বাদনের অংশ প্রদান করলেন। এই অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডে যে-বস্তু নিত্য সেই "নিত্যো নিত্যানাম্"-কঠোপনিষদ ২।২।১৩; পরমবস্তুকে-ও চিনবার, জানবার ও সংরক্ষণ করবার নির্দেশ দিলেন, এবং তার অবহেলা ও অপচয় দেখে কত কাঁদলেন। কিন্তু এ দুর্লভ সাধন তো ভাষায় প্রকাশ করবার নয়, কারণ সে জিনিষ "কহিবার কথা নহে, তথাপি বাউলে কহে, কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়'—চৈঃ চঃ ২ ২ ৪৩। তাই এ বলতে জিভে বাধে, মনে ব্যথা লাগে—জলের পথে সে রূপ-রসেতে গাঁথা—এই উচ্চতম অন্তরঙ্গ সাধনের ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন স্বয়ং মহাবাউল প্রভু নরহরি।

মাতৃ-বন্দনা

মা-১॥ শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি দ্বারাই তিনি আত্মপ্রকট করেন। সন্ধিনীশক্তি বা বিশুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা তিনি ও তাঁর ধাম-পরিকরাদি প্রকাশিত হন, সংবিৎশক্তি দ্বারা তিনি স্বয়ং জ্ঞানবান্ ও অপরকে জ্ঞানদান করেন এবং হ্লাদিনী শক্তির সহায়তায় নিজে আনন্দ অনুভব করেন ও ভক্তগণকে আনন্দপ্রদান ক'রে পোষণ করেন। সেই মাতৃরূপিণী শক্তিময়ীর কৃপা ব্যতীত ভগবান্‌কে চিনবার, জানবার ও লাভ করবার অন্য কোনো উপায় নেই। 'প্রীতিসন্দর্ভ' ধৃত বচন থেকে জানা যায় "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ", ভগবান্ স্বরূপে নিত্যই অব্যক্ত হ'লেও নিজশক্তি দ্বারাই তিনি প্রকাশমান। আবার শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র বলছেন: "যত্তাবিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ, মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা। একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বভাবা শ্রীগোকুলেশ্বরী, অনয়াসুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ। ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ং, জ্ঞায়তে অত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।"

এদিকে মায়িক বিশ্বের উদ্ভব হয় ভগবানের মায়াশক্তির সাহায্যে। জীবের উপর সেই মায়াশক্তির সর্ব্বদাই প্রভাব রয়েছে। সেই মায়াশক্তিকে প্রসন্ন করতে হ'লে শ্রীভগবৎ কথিত "মামেব যে প্রপদ্যন্তে", এই আজ্ঞা অনুযায়ী, শ্রীভগবান্ তথা তাঁর শক্তিকে আরাধনা করতে হবে, নিজ চেষ্টায় এই মায়া-বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। এই দেহও সেই মায়াদেবী প্রসূত, তিনিই আমাদের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ জননী—"প্রকৃতি র্যস্যোপাদানম্"-ভাঃ ১১।১৪।১৯ এবং "গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ"—ভাঃ ৩।২৬।৫, অর্থাৎ স্বীয় সত্ত্বরজতমগুণ দ্বারা সরূপ ও বিচিত্র প্রজাসৃষ্টিকারিণী এই প্রকৃতি। মায়া থেকেই তাপ হয়, "বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা"-ভাঃ ৩।২৬।৫,—মায়িক বিষয় সমূহে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হ'তেই মনের ক্ষোভ বা তাপ উৎপন্ন হয়, অন্যপ্রকারে নয়। সুতরাং মন যাতে মায়ারচিত বিষয়সমূহে সংযুক্ত না হয়, তজ্জন্য মায়াদেবীকে প্রার্থনা করতে হবে, তাঁকে আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করতে হবে,

গুরু উপদেশ মত সাধন ক্রিয়াদ্বারা; তবেই তিনি ত্রিতাপ হরণ করবেন, তখনই "তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান মদ্গতচেতসঃ"—ভাঃ ৩।২৫।২৪, সেই ভগবৎগতচিত্ত ভক্তকে আর ত্রিতাপজ্বালা সহ্য করতে হবে না।

কভু হর কভু হরি—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব জ্ঞাত হয়ে প্রভু বলছেন, এ সবই তোমার বিবিধ স্বরূপমূর্ত্তি: শক্তি ছাড়া মূর্ত্তি প্রকাশ সম্ভব নয়, "যুগপৎ শক্তিত্রয় প্রধানং মূর্ত্তিঃ"—শ্রীধর স্বামী। যেভাবে যে তোমায় ডাকে, তাকে সেই মূর্ত্তি দর্শন করাও—"তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়"—ভাঃ ৩।৯।১১। তুমি জীবের মুক্তিদাত্রী—কারণ মায়াই জীবকে বন্ধন করেন, প্রসন্না হ'লে তিনিই বন্ধনমুক্ত করেন এবং স্বরূপ শক্তির দর্শন করান। ভক্তিবলে ভক্ত তখন "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচনেন, সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপম্"—ব্রহ্মসংহিতা—৩৮।

মা-২ ॥ সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবের মোহ বর্ণনা করছেন। ভবের খেলা—মায়া-দেবীর আবরণাত্মিকা শক্তি। যিনি বন্ধন করেছেন, তিনিই কৃপা ক'রে সে বন্ধন ছেদন করতে পারেন, তাই তাঁকে কাতরে ডাকছেন। ও চরণ তোমার—স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর কৃপা।

মা-৩ ॥ সহজে মায়াবদ্ধ মানুষ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না; বহু বাধা, বহু বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হ'তে হয়। তবু গুরু উপদেশমত নিষ্ঠা সহকারে মাতৃরূপিণী শক্তির আরাধনা ক'রে যেতে হবে। সিদ্ধি সহজলভ্য নয়, তাই তাঁকে আপাত নিষ্ঠুরা মনে হবে। কিন্তু তবু সাধনে দৃঢ়তা রাখতেই হবে। ব্রহ্মাণ্ডময় সবই মাতৃমূর্ত্তির প্রকাশ—এই সুস্পষ্ট অনুভূতি হ'লে তখন আর মায়ার বন্ধন থাকবে না; অন্ধকার মূর্ত্তি অপসারণ ক'রে জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তিতে মা প্রকাশিত হবেন; স্বরূপ-আবরণাত্মিকা ও চিত্ত-বিক্ষেপাত্মিকা মায়ার এই দুই স্বাভাবিক ধর্ম অপগত হয়ে তাঁর স্বপ্রকাশ ও চির আনন্দ ও জ্ঞানময়ী দিব্যমূর্ত্তি প্রকটিত হয়ে উঠবে, এবং জন্মমৃত্যুর আবর্ত্ত অপসারিত হয়ে নিত্য তাঁর সেবায় নিযুক্ত হবার অধিকার লাভ করবে সাধক।

মা-৪ ॥ এই ভবরূপ সংসারে বাইরে ও ভিতরে নিত্য নানা দানবের উৎপীড়ন, বিবিধ সঙ্কট। ভবসমুদ্র ভীষণ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। শান্ত ও স্থির চিত্তে ভগবতীকে ডাকার মত সময়ও পাওয়া যায় না। তাই সাধক কাতরে তাঁর চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

মা-৫ ॥ যে মহামায়ার মায়ায় ত্রিভুবন মুগ্ধ, গুরু উপদিষ্ট সাধন বলে যখন সাধকের সেই মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি শিথিল হবে, তখন শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি সাধকের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে উদিত হবেন এবং ভগবৎ দর্শন করাবেন। সেই "ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে" ভক্ত পরম শান্তি লাভ করবেন-ভাঃ ১১।২।৫৪। তখন সাধকের ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে এবং ত্রিতাপদগ্ধ

তন্মন শীতল হবে। ভাগবতোক্ত "নরদেহমিদং কায়ম্" —সেই ভগবৎ-সাধন-যোগ্য, পরমার্থপ্রদ এই নৃদেহে গুরূপদেশমত সাধন ক'রে যৌগিক প্রক্রিয়ায় মূলাধার থেকে নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী মাতাকে জাগ্রত ক'রে ধীরে ধীরে উর্দ্ধমুখী ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমেশ্বরের পরমধামে উন্নীত করতে হবে সুষুম্নামার্গে, "পুনরিহ যৎসমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে" — ভাঃ ১০।৮৭.১৮। ভাগবতের ১১।১৪।৩৬ ও ২।২।১৮, ১৯ ও অন্যত্র সে সব প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। দেহে জীবন থাকতে থাকতে সে সাধন ক'রে নিতে হবে—"তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবৎ"—ভাঃ ১১।৯।২৯। ঐ চরণ অমৃত একবার পান করতে পারলে আর "ন পতন্তি কৃতান্তমুখে"। শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর নির্ভরশীলতা; বিশেষতঃ শক্তির সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ প্রকাশের ক্ষমতাকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন—দিব্যজ্ঞান ও চিন্ময় আনন্দলাভের জন্য বিরিঞ্চি, ভব ও দেবগণ সর্ব্বদা ঐ চরণ চিন্তা করেন। ঐ নামে কালভয় যায়—"ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণম্"।

মা-৬॥ মায়ার স্বরূপজ্ঞানেই অদ্বয়তত্ত্বজ্ঞান হয়। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সবই মায়ের প্রকাশ—এ জ্ঞান হ'লে আর দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হয় না। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ"—১১।২।৩৭। সেই অদ্বয় জ্ঞানময়ী মায়ের চরণই একমাত্র অভয় প্রদানকারী।

মা-৭॥ কুলকুণ্ডলিনী সাধনের কথা পূর্ব্বেই 'মা-২' সঙ্গীতে উক্ত হয়েছে। তাঁর কৃপা হ'লে "সর্ব্বকাম বিবর্জ্জন" হয়ে যায়।

মা ৮॥ মায়াবদ্ধ জীবের মায়াভ্রমের কথা বলছেন। বিশ্বভুবন মায়ের প্রকাশ—এ সত্যজ্ঞান হ'লে আর আত্মসুখবাসনা থাকে না। সে জ্ঞান লাভ হয়_মাতৃনাম রূপ সুধা পান ক'রে। ভাগবতে উক্ত হয়েছে, 'নামসুধাপানই' প্রধান সাধন, হরি 'পাদপদ্মাসব মধু' পানেই ভব ক্ষুধা দূর হয়। এখানে সেই শ্রীহরির স্বরূপশক্তি রূপিণীর নামের মহিমাই জ্ঞাপন করছেন। এই নামে ভবক্ষুধা যায়, জন্ম-মৃত্যু-আবর্ত্ত রোধ হয়, এবং নিত্যধামে তাঁর সেবা প্রাপ্তি হয়। তবে সময়ে, অর্থাৎ শিশুকাল থেকে অখণ্ড যোগে এই মাতৃপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে গুরূপদেশ মত তাঁর নামসুধা পানরূপ সাধন ক'রে যেতে হবে। এ সঙ্গীতে অন্তরঙ্গ সাধনের ইঙ্গিত রয়েছে।

মা-৯॥ সাধকভক্ত তাঁর অস্তিবাসনার কথা জানাচ্ছেন। জগজ্জননী রাধারাণীর নামামৃতপানই "ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্" হয়। যতক্ষণ দেহ সুস্থ ও জিহ্বা স্ববশ আছে, ততক্ষণ অবিরাম মায়ের মধুমাখানাম অমৃত পান কর এবং 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' হয়ে অকৈতব কৃষ্ণভজনে যেতে থাক; এর জন্য বাইরে ছুটাছুটি করতে হবে না। গুরূপদেশ মত গৃহের অভ্যন্তরে নির্জ্জনে নিজ দেহমধ্যে সাধন কর। জিহ্বা যদি অন্য কথা বলতে চায় তো তাকে তা' বলতে দিও না, তোমার "শ্রবণমঙ্গল কথামৃত"—ভাঃ ১০।৩১।৯, রূপ সুধামাখা নাম দ্বারা তাকে বেঁধে রেখো ও ঐ শ্রীচরণ সুধাপানে

বিভোর ক'রে রেখো। প্রকৃত সিদ্ধ ভক্তের লক্ষণই তো তাই। সে ভক্তজন "বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত - সৎকথোদয়ে" ভাঃ ৯।৪।১৮, অর্থাৎ আমারই পবিত্র কথা কীর্ত্তনে বাক্যকে ও শ্রবণে কর্ণকে নিয়োগ ক'রে থাকেন। "মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ" – ভাঃ ৩।২৫।২৩। এইভাবে তাঁর চরণে সুদৃঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠা থাকলে সাধক শেষ সময়ে তাঁর দেখা পাবেই পাবে "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন সন্তঃ হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি" – ব্রহ্মসংহিতা – ৩৮। সেই অন্তিমে পরম-পবিত্র রাধানাম শ্রবণ করতে করতে নয়ন মুদে অনায়াসে বৃন্দাবনে চলে যাবে।

শ্রীশ্রীমাতৃপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রে সাধনা করা অন্তরঙ্গভক্তগণের অবশ্য প্রয়োজন। এ বিষয়ে কারো কারো মনে কিছু সংশয় ও প্রশ্ন জাগতে পারে। যেমন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ নিলেই তো হয়; সর্ব্বদেবময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়ই তো এর প্রকৃষ্ট উপায়—তবে আর পৃথকভাবে শ্রীশ্রীরাধারাণী রূপিণী মাতৃচরণে শরণ নেওয়ার কী প্রয়োজন থাকতে পারে?

এ প্রশ্ন যাদের মনে জাগে, তাদের শ্রীভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণাটি আরও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা যাক। সূর্য্য কতকগুলি পদার্থ বা mass এর সমষ্টি; কিন্তু ঐ বিভিন্ন পদার্থগুলি যদি প্রজ্জ্বলিত না হ'ত এবং তজ্জন্য উত্তাপ, আলোক, নানাবিধ বিদ্যুৎতরঙ্গ ও বিদ্যুৎকণার সৃষ্টি না করত, এবং সেগুলি বহির্বিশ্বে বিকিরণ না হ'ত, তবে সূর্য্য বহির্জগতে অদৃশ্যই র'য়ে যেত, সূর্য্যের বহুবিধ সৃজনকারী ও ধ্বংসকারী গুণ ও ধর্ম কিছুই প্রকাশ পেত না। এই উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎতরঙ্গ, বিদ্যুৎকণা—সূর্য্যেরই শক্তি; এসব শক্তিদ্বারাই সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশমান ও অন্যান্যের প্রকাশক এবং বহির্বিশ্বে বস্তু ও প্রাণীসমূহে তাপ ও নানাবিধ ক্রিয়া-বিক্রিয়া উৎপাদনে সমর্থ। এক কথায়, এই সব শক্তিই সূর্য্যকে তার 'সূর্য্যত্ব' প্রদান করে।

ঠিক অনুরূপভাবে, শ্রীভগবান্ নিজে চিন্ময় সত্তা হয়েও একমাত্র তাঁর শক্তি-দ্বারাই আত্মপ্রকাশ করতে পারেন এবং নিখিল বিশ্ব—চিন্ময় ও মায়াময়—ব্রহ্মাণ্ডেরও প্রকাশক হন। এই শক্তিই তাঁকে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ প্রদান করে, এই শক্তি ত্রয়ের সাম্যাবস্থাতেই তিনি মূর্ত্তরূপে প্রকটিত। তাঁর লীলাশক্তি, তাঁর যোগমায়া শক্তি, তাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার শক্তি, তাঁর করুণা-শক্তি, তাঁর মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য শক্তি—এসবই তাঁর শক্তির অভিব্যক্তি। শক্তি বিনা তিনি অর্থহীন, শক্তি বিনা তাঁর অস্তিত্বই নেই, শক্তি ছাড়া তাঁকে কল্পনাই করা যায় না।

আবার এই শক্তি যখন পৃথকভাবে মূর্ত্তরূপে প্রকাশমান, "যুগপৎ শক্তিত্রয়-প্রধানং মূর্ত্তিঃ", সেই শক্তিমূর্ত্তিসমূহের প্রধানা শ্রীরাধারাণীর মধ্যে এ সব বিভিন্ন ধর্ম

ও গুণাবলী অত্যন্ত প্রকটরূপে অভিব্যক্ত। সাধারণ লৌকিক জগতের উপমা দ্বারাও বোঝা যায়, পিতার চেয়ে মাতার মধ্যে স্নেহ, করুণা ও পালনশক্তি অধিকভাবে পরিস্ফুট। ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ নিজ নিজ আবদার বা সাধ-পূরণের জন্য মায়ের কাছে জানাতেই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে। সংসারে সন্তানের অভাব অনটন মা যতটুকু বোঝে, যেভাবে সহানুভূতির সঙ্গে তা' গ্রহণ করে, বাবা অতখানি নয়; সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্বন্ধেও মা যতটুকু সজাগ, বাবা ততটুকু নয়; বরং উদাসীনতাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই সন্তান মায়ের অঞ্চল ঘেঁষা হয়, মায়ের কাছেই সব নিবেদন করে।

সাধকের পক্ষেও ঠিক তাই। সাধক জগজ্জননীর চরণে তার আবেদন নিবেদন ক'রে যতটা স্বস্তি ও তৃপ্তি পায়, জগৎ পিতার কাছে ততটা নয়। শক্তি ও শক্তিমান্ তত্ত্বতঃ অভেদ জেনে সাধক স্নেহময়ী, করুণাময়ী সন্তানবৎসলা জগজ্জননীর শ্রীচরণেই আত্মসমর্পণ করতঃ তাঁর আরাধনা করে। এদিকে ভক্তি, প্রেম, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ ও ভক্তিসাধনতত্ত্ব বিচার করলেও দেখা যায় যে কৃষ্ণরতি বা ভক্তি হচ্ছে "শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা", এই শুদ্ধসত্ত্ব আবার শ্রীভগবানের সন্ধিনীশক্তি; আর প্রেম হচ্ছে "হ্লাদিনীর সার", "সান্দ্রাত্মা কৃষ্ণরতি" অর্থাৎ গাঢ়তা প্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব। আবার এতত্ত্ব সাধন করতে হ'লেও গোপী-অনুগত হয়ে সাধন করতে হবে, "এই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়"—চৈঃচঃ। এই গোপী-অনুগত সাধন করতে হবে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাম ও নির্বিকার হয়ে। এইরূপ নিষ্কামভাব সম্ভব একমাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাতৃময় জ্ঞান হ'লে। বস্তুতঃপক্ষে নিখিল বিশ্ব—চিন্ময় ও মায়াময়—মায়েরই প্রকাশ। মা ছাড়া কোথাও কিছু আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, স্বয়ং ভগবান্‌ও না! সাধককে মায়ের এই স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞান অর্জ্জন করতে হবে—মাতৃতত্ত্ব সাধনা দ্বারা। সে সাধনার বিভিন্ন ক্রম কৃপা প্রাপ্ত শিষ্য গুরুমুখে শুনবেন। সেই মাতৃতত্ত্বজ্ঞান ও মায়ের কৃপা হ'লে তবেই ভগবদ্দর্শন ও সেবাপ্রাপ্তি হবে, অন্যথা নয়; "যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা"—নারদপঞ্চরাত্র।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রভু নরহরি তাঁর মাতৃ-বন্দনার অনেক স্থলে মাকে—দুর্গে, দানবদলনী, শিবে—ইত্যাদি আখ্যায় আহ্বান করেছেন। প্রশ্ন হ'তে পারে, প্রভু পরম বৈষ্ণব হয়ে একমাত্র শ্রীরাধারাণীর চরণে শরণ না নিয়ে, মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের দেবীকে, মহামায়া, দুর্গা ইত্যাদি নামে স্তব করছেন কেন? এক্ষেত্রেও প্রশ্নকারীর ভগবৎ তথা তাঁর শক্তিতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে বেশ অস্পষ্টতা বর্ত্তমান। সাধারণ গৃহস্থের একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এটি পরিষ্কার করতে চেষ্টা করি। মনে করা যাক, একটি গৃহে গৃহস্বামীই একমাত্র বাসিন্দা ও কর্ম্মী। অতিথি অভ্যাগত যারা

আসে, তারা কেউই কর্মী নয়। গৃহে ঠাকুর-সেবাপূজা, ঠাকুর-ভোগরন্ধন নিবেদন থেকে শুরু ক'রে ঠাকুর মন্দিরাদি মার্জ্জন, গৃহ প্রাঙ্গণ ঝাঁট দেওয়া, নর্দ্দমা-পায়খানা পরিষ্কার করা সবই তাকে নিজ হাতে করতে হয়। সুগন্ধ পুষ্প, সুরাভিত ধূপধুনাদি ও সুস্বাদু দেবভোগ্য ভোগাদি উপকরণ দ্বারা তাঁকেই নিজহাতে ঠাকুরসেবা চালাতে হয়; এবং প্রত্যুষে সমস্ত বাড়ি ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা ও নর্দ্দমা-পায়খানাদি সাফও তাঁকেই নিজ হাতে করতে হয়। ঠাকুরসেবা সৎ ব্রাহ্মণ পূজারীর কাজ, নর্দ্দমা পায়খানা সাফ রাখা মেথরের কাজ। কিন্তু যেখানে দ্বিতীয় কর্মী নেই, সেখানে গৃহস্বামীকে নিজেই এই উভয়বিধ বিসদৃশ কম করতেই হবে। নর্দ্দমা পরিষ্কারের মত নীচ কাজও যেমন অবশ্য প্রয়োজন, ঠাকুরসেবাও তেমনি। প্রকৃতপক্ষে, নর্দ্দমা সাফও ঠাকুর সেবারই একটি অঙ্গ।

অনুরূপভাবে শ্রীভগবান্ তাঁর চিন্ময়ধামে যেমন নিত্য পরিকরগণের সহিত স্বরূপ শক্তির সহায়তায় লীলা করেন, তেমনি জীবগণকে কর্মফল ভোগ করাবার জন্য মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মায়াশক্তির সাহায্যে তাঁকে সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় লীলাও চালাতে হয়। ব্রহ্মাণ্ডে জীবগণ কত কুকর্ম করে, সেইভাবে তাদের বিচার ও দণ্ড করতে হয়—এ সব কাজ নিঃসন্দেহে 'নোংরা', তবু তাঁকে তা' করতে হয়, এবং যে শক্তি সাহায্যে তিনি এ সব কাজ করেন, তিনি মায়াশক্তি, দুর্গা, পার্ব্বতী ইত্যাদি নামে অভিহিত হন।

প্রভাতের নর্দ্দমা সাফকারী গৃহস্বামী যেমন ঠাকুর সেবারত পূজারী হ'তে কোনো-রূপেই স্বতন্ত্র নন, মায়াশক্তিও তেমনি স্বরূপ শক্তি হ'তে স্বরূপতঃ পৃথক নন—একই ভগবৎ শক্তির বিভিন্ন কর্ম-প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তত্ত্বজ্ঞানী সাধক এতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত আছেন। যারা গৃহস্বামীকে মাত্র প্রত্যুষেই দেখে, তারা তাঁকে মেথররূপে দেখবে ও জানবে। কিন্তু তারা যদি গৃহস্বামীর পূজারী-স্বরূপের পরিচয় অবগত থাকে, তবে বুঝবে যে দুপুরের পূজারী ও প্রত্যুষের মেথর একই ব্যক্তি—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মরত অবস্থায় তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তারা এও জানবে যে মেথরের কাজ ও পূজারীর কাজ যেমন একই সময়ে, বা যুগপৎভাবে করা অসম্ভব, অর্থাৎ যেখানে মেথর বর্ত্তমান, সেখানে পূজারী নেই, এবং যেখানে পূজারী সেখানে মেথর থাকতে পারে না; তেমনি মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তির যুগপৎ-অবস্থিতি অসম্ভব।

ব্রহ্মাণ্ডস্থিত মায়াবদ্ধ জীব আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে মায়ারূপিণী সেই শক্তিময়ীর সাক্ষাৎ পরিচয় পাই; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ সাধক জানেন, ব্রহ্মাণ্ডে যিনি মহামায়া বা দুর্গা, চিন্ময়ধামে তিনিই গোকুলেশ্বরী শ্রীরাধারাণী। এ মা সেই মা—কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডবাসী আমরা—আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এই ব্রহ্মাণ্ডে লীলারতা মায়ের সাথেই। সেই মা হ'তে প্রসূত হয়ে আমরা সেই মায়ের কোলেই ব'সে আছি—কৃপা হ'লে সেই মায়াময়ী মা-ই তাঁর চিন্ময়স্বরূপে দর্শন দেবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীশ্রীপাতাপ্রভুর বাণীরত্ন আহরণ

ভূমিকা

প্রভু নরহরিকে যিনিই দর্শন করেছেন তিনিই জানেন, সাধারণ ধর্মোপদেষ্টা বা ধর্মপ্রচারকদের মত, নরহরি প্রভু কখনও কাউকে সুসংবদ্ধ উপদেশ প্রদান করেননি, বা সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্ত কোনো বাণী প্রচার করেননি। তিনি ভক্তগণের সমুখে যেসব কথা বলতেন তা' অসংবদ্ধ, পরস্পর সম্পর্কবিহীন, পাগলের প্রলাপের ন্তায় কতকগুলি অর্থহীন, খাপছাড়া বাক্যমাত্র এবং সেসব বাক্যও মুখ্যতঃ ক্ষুধিত জীবকে খাদ্যদান, অনাবৃতকে বস্ত্রদান, আর্তের আর্তিত্রাণ সম্বন্ধে, আর ক্ষণে ক্ষণে সুধাবিনিন্দিত কণ্ঠের মধুর হ'তে মধুর 'হরি-বোল' ধ্বনি। তাঁর শ্রীমুখভাষিত বাক্যগুলি প্রায়শঃই অর্থহীন মনে হ'ত এবং কাকে যে কী উদ্দেশ্যে তিনি কী বলছেন, তা' কেউই বুঝতে পারত না, অথচ পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ অর্থহীন বৃথা বাক্যসঙ্কুল পাগলের প্রলাপ—অরণ্যের মধ্যেই আর্ত ও জিজ্ঞাসু তার স্ব স্ব অভিযোগ ও প্রশ্নের সু-সমাধান পেয়ে যেত। এহেন একজন বাতুলের প্রলাপপূর্ণ, অর্থহীন বাক্যালাপ থেকে তাঁর উপদেশ বা বাণী সংগ্রহ করা অসীম সমুদ্রের অতল জলরাশির তল থেকে মুক্তা-সঞ্চয়নের চেয়েও কঠিন কার্য্য। সুতরাং অন্তান্ত সাধু, মহাপুরুষ, সাধক ও ধর্মোপদেষ্টাদের উপদেশ বা বাণীর মত, এই মহাবাউল নরহরি প্রভুর কোনো উপদেশ সংগ্রহণ বা বাণী সঞ্চয়নের দুরাশা একেবারেই ত্যাগ করেছিলাম। মনের কোণে এক একবার অবশ্য আশার ক্ষীণালোক জেগে উঠত—এই সুদুর্লভ সিদ্ধ মহাপুরুষের কোনো উপদেশাবলী যদি সংগ্রহ করা যেত, তবে কী ভালোই না হত! কিন্তু কোথায় উপদেশ, কোথায় বাণী? ঐ পাগলের প্রলাপ খুঁজে কোথায় সে অমূল্যমণি পাব? ভাবাবেশে তিনি যেসব গান গাইতেন, তখন সেসব সঙ্গীত কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করেছি। সেইগুলিই বার বার পড়তাম আর ভাবতাম—আহা! এসব গানের পূর্ণাঙ্গ রূপটি যদি পেতাম! কিন্তু তাও পাইনি তখন। তিনি বর্তমানে তো নয়ই, তাঁর অবর্তমানে দীর্ঘ অনুসন্ধানেও সে দুর্লভ রত্ন মেলেনি। অবশ্য আমার অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা রূপ এই মৌলিক গবেষণায় বিন্দুমাত্র ছেদ পড়েনি কখনও। আমার ধ্যানজ্ঞান চিরদিন ঐখানেই—কেমন ক'রে এই সুদুর্লভ মহাপুরুষের কিছু উপদেশরত্ন সংগ্রহ করতে পারি। তাঁর কৃপায় জাগতিক রত্নমণিতে কোনোদিন আমার স্পৃহা নেই। সেই পরমরত্ন অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে পরশমণির পাহাড় একদিন সত্যই খুঁজে পেলাম। সেখানে বহু জঞ্জাল অনুসন্ধান ক'রে, Curie-দম্পতির মত, সাগ্রহে দেখলাম—বহু পুরাতন, একেবারে জীর্ণ, গলিত, ছিন্ন কাগজে শ্রীগুরুদেবের স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি পত্র রয়েছে। পরম যত্নসহকারে সেগুলি উদ্ধার করলাম। তারপর সেগুলি পাঠ ক'রে অভিভূত হলাম। আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত

সেই সুদুর্লভ মহাসাধকের অমূল্য উপদেশ সমন্বিত সেই পত্ররাজি। অশ্রুজলে অভিষিক্ত ক'রে সেগুলি মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করলাম। এইবার আমার মধ্যে এলো এক নবীন প্রেরণা ও উদ্যম। আমি তখনকার দিনে জীবিত সুপ্রাচীন শিষ্যগণের প্রায় প্রত্যেককে এই অনুরোধ ক'রে পত্র দিলাম যে, তাঁরা যেন দয়া ক'রে তাঁদের নিকট রক্ষিত শ্রীগুরুদেবের স্বহস্ত লিখিত পত্রগুলি আমাকে একবার দেখবার জন্য প্রেরণ করেন, কারণ আমি বর্ত্তমানে শ্রীগুরুদেবের উপদেশাবলী সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত আছি। আমি সেগুলি লিখে নিয়ে তাঁদের অমূল্য বস্তু তাঁদের পুনরায় ফেরত দেব। বলা বাহুল্য, আমার এ পবিত্র আবেদনে সকলেই সাড়া দিলেন এবং পরম শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রদ্ধেয়া রাণীমা প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তগণ সাগ্রহে সেসব পত্র আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন। এবারে আমার গবেষণার কার্য্য পূরোদমে শুরু হ'ল। আবেদনের ফলে বেশ কিছু সংখ্যক এইরূপ পত্র সংগ্রহ হ'ল। আমি সাগ্রহে ও সযত্নে সেগুলি কপি ক'রে নিলাম। বলা বাহুল্য, এগুলি সবই তাঁর শ্রীহস্ত লিখিত। এ ছাড়া ছিল, আমার স্বকর্ণশ্রুত গুরুদেবের বাক্যাংশ-সংগ্রহ, তিনি যখন যা' বলতেন, তা' আমার নোট-বুকে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতাম।

কিন্তু এইবারই আরম্ভ হ'ল—আসল কাজ। বিভিন্ন ভক্তগণকে লিখিত বিভিন্ন সময়ের এই পত্রগুলি স্বভাবতই পরস্পর সম্বন্ধবিহীন। এক পত্রের সঙ্গে অন্য পত্রের সম্পর্ক থাকাও যেমন আশা করা যায় না, তেমনি পত্রগুলির পারস্পরিক বক্তব্যের মধ্যে যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট, সুগ্রথিত, সুসংবদ্ধ, ক্রমিক শ্রেণীবিন্যাস থাকতে পারে, এটা অতি বড় আশাবাদীরও অকল্পনীয়। আমি তাঁর এই পত্রগুলি সংগ্রহ করতে পেরে অবশ্যই আনন্দিত হয়েছিলাম এবং এই সব পত্রাংশ থেকে তাঁর মহামূল্য বক্তব্য কিছু পাওয়া যাবে—এইটুকু আশাই হয়েছিল। কিন্তু সেই ভিন্ন ভিন্ন পত্র থেকে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশগুলি যখন পরস্পর সাজিয়ে তাদের বারবার পড়লাম, তখন আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে এইসব খণ্ড উপদেশাবলীর মধ্যে একটি সুন্দর, সুসমঞ্জস ও সুসঙ্গত ক্রমিক শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে। আমি তখন আনন্দে, বিস্ময়ে একেবারে হতচকিত! কে এই পরস্পর সম্বন্ধহীন বিভিন্ন পত্রের বাক্যগুলির মধ্যে এমন সুশোভন ভাবে ক্রমিক শ্রেণীসজ্জা ক'রে রেখেছে, ঠিক যেন ক্রম-বর্দ্ধমান মুক্তাখণ্ড সমূহের সুগ্রথিত একটি মনোমোহন মুক্তামালার মত! আনন্দে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। সেই পরমপুরুষ পাতাল প্রভুর অপ্রাকৃত লীলা-মহিমা অবগত হয়ে অশ্রু-অভিষিক্ত-নয়নে সেই মুক্তামালা লেখনীসূত্রে সংগ্রথিত ক'রে তাঁর ভক্ত-সমাজে উপহার দিয়ে জীবন ধন্য করলাম।

সেদিন আমার যে-আনন্দ হয়েছিল, কয়েক টন Pitch-blende থেকে কয়েক গ্রাম Radium আবিষ্কার ক'রে Curie-দম্পতিও বোধ হয় সে-আনন্দলাভ করতে পারেননি।

চৈতন্য দান

১। দিন কি কমিতেছে, না বাড়িতেছে? সাধের সংসার কি চিরদিন এমনি থাকিবে? আমি কি এইভাবেই অমরের মত থাকিব?

২। দেখিতে দেখিতে বেলা যে অনেক হইল; এই বেলা বেলাবেলি পথ দেখিয়া রাখা উচিত নয় কি?

ক্রমেই বেলা যাইতেছে। যত্নপূর্ব্বক একটু গঙ্গার জল পর্য্যন্ত তুলিয়া রাখিতে পারি নাই। অনিত্য আত্মীয় হার গলায় পরিয়া মায়া-কুজ্ঝটিকা চক্ষে লাগায় তোমার পথে যাইতে পারিতেছি কৈ?

ঐ যে কাহারা বাদ্য করিতে করিতে নিমতলার ঘাটে যাইতেছে। আজ কেন ঐ ব্যক্তি অমন করিয়া নীরবে চিরনিদ্রিতভাবে রহিয়াছে? ভাব দেখিলে মনে হয় যেন সকলের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসার-গারদবাসী আসামীদিগকে শিক্ষা দিতে দিতে উত্তান নয়নে পরমানন্দময়ী শ্রীরাধারাণীর অভয়চরণ দর্শন করিতেছে?

৩। ভগ্ন ঘরে বাস করিতে বড়ই শঙ্কা; কারণ কখন ঝটিকা আসিয়া মট্‌কা উড়াইয়া দিয়া যাইবে। তাহার উপায় এই বেলা করা উচিত, নচেৎ গঙ্গার জল আনিয়া আহ্নিক করা দায় হইবে।

এ ভগ্ন ঘরে আর কতক্ষণ থাকিবে? দিন যাইতেছে, কিন্তু সাধের ঘুম তো এখনও ভাঙিল না। এদিকে প্রকৃত কার্য্য করিবার বেলা যাইতেছে।

৪। আমি চিরকালই ভাঙা ঘরে বাস করিয়া আসিতেছি। যেমন প্রবল ঝটিকা আসে, অমনি মটকা উড়িয়া যায়। পরক্ষণেই শমন-কিঙ্করের নিদারুণ প্রহার খাইতে খাইতে কঠোর পরিশ্রমের নূতন কারাবাসের জন্য যাত্রা করি। সময় হইলে, আবার জন্ম লইয়া বহির্জগতের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করি।

ভাঙা ঘরে ভূতের দৌরাত্ম্য—এই ভয়ে তোমাদের শরণাগত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি কতদিন পরে আসিয়া ধাঁধা বাজী কাটাইয়া দিবে?

৫। এ ঘর কখন আছে, কখন নাই—তাই তোমাদের শরণাগত হইয়াছি। এস, সকলে মিলিয়া ত্রিতাপের ঔষধ খুঁজিয়া, সেই ঔষধ সেবন দ্বারা সকল দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় করি।

৬। রিপুগণের বীরত্ব কোথায় থাকিবে? নিদানের দিনে তাহারা তোমাকে সম্বলহীন দেখিয়া তোমার গুপ্ত মহাপাতকের সাক্ষ্য দিয়া তোমাকে নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় রাখিয়া বগল বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান করিবে।

৭। আমার আত্মীয় সাজিয়া দলবদ্ধ হইয়া কাহারা কী কোলাহল করিতেছে? আমাকে রক্ষা করুন—ঐ আত্মসুখী মৃত্যুপথ প্রদর্শকদিগকে দেখিতে চাই না।

৮। যেদিন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ বেশে ভস্মীভূত হইব, যাহাদের 'আমার-আমার' জ্ঞানে গলার হার করিয়া পরি, সেদিন তাহারা কোথায় থাকিবে?

যাহাদের আত্মীয় মনে করিয়া গলার হার করিয়া পরি, সংসার-লীলা-খেলার সময় তাহাদিগকে রঙ্গমঞ্চোপরি আমার পুত্র, আমার কন্যা ইত্যাদি রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুপরে দেখি. লীলা-খেলাতে যাহারা 'আমার' ছিল, সময় হইলে তাহারা চলিয়া গেল, বারণ শুনিল না। আমি এখন কী করি, ভাবিয়া দেখিতে গেলে কিছুই বুঝা যায় না।

আমি ভবের হাটে বারবার যাতায়াত করিতে করিতে কেবলই তহবিল হারাইয়া দেনার দায়ে পড়ি। যাহাদের 'আমার' ভাবিয়াছিলাম, যাহাদের মতে চলিতাম, তাহারা সময় হইলে সকলে কে কাহার ঘরে জন্মগ্রহণ করিল; জন্মান্তরে আর চিনিতে পারিলাম না, তাহারাও চেনা দিল না, কাছে যাইলে তখন 'পর' ভাবে।

৯। মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছ, এমন জন্ম আর কি পাইবে? এক্ষণে মনুষ্যের কার্য্য কর।

ভব-সংসারে আপন কার্য্য করিতে আসিয়াছিলে, তাহার কী হইল?

১০। আর কবে চিনিব? চিনি বহিয়া মরিলাম, কই একদিন আস্বাদন করিলাম?

সময়ে চিনিলে না, আর কবে চিনিবে? দেখিতে দেখিতে বেলা যাইতেছে। এখনো কেন নিশ্চিন্তমনে থাকিয়া, অনিত্য ক্ষণধ্বংসী আনন্দ প্রদানকারী বন্ধুদের যুক্তিতে ভব-বন্ধনে পড়িতে বাসনা কর?

সময়ে সবাই ভালবাসে, অসময়ে কেহ শুধায় না এসে। যৌবন হইলে আগত, নব নব সাথী আগত, মায়াতে মোহিত হয়ে হাবায় জ্ঞান-তত্ত্ব।

১১। ও সব কীসের কাগজ? ও সব জীবন-জমা-খরচের খাতা, সত্য-বন্দীর খাতা। ও কি নষ্ট হইবার যো আছে? উহা চিত্রগুপ্তের খাতা, ঐ খাতায় সব লেখা আছে।

১২। মায়াদেবী মৌখিক মায়ায় যে জগৎকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন, ইহাই সত্য; কাচখণ্ড প্রদান করিয়া যে কাঞ্চন গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই সত্য।

এই মায়াময় পরীক্ষাক্ষেত্রে সব যেন ধোঁকার টাটি, অর্থাৎ পরিপাটি কিন্তু ক্ষণধ্বংসী। তাই বলিতেছি, শান্তিধামে যাইবার সুযুক্তি কবে গো, বাবা?

১৩। অষ্টপাশে আবদ্ধ হইয়া সকলি খোয়াইলাম। দেহ নষ্ট হইলে কী লইয়া সাধন করিব?

মনুষ্যগণ পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া অষ্টপাশে বদ্ধ হয়। তার ফলে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে; ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া কখনো বলে, আত্মহত্যা করিয়া মরিব। এইরূপে নিদারুণ যন্ত্রণায় আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয়।

১৪। পরম আনন্দময়কে ভজিবে। কারণ, জগতে কিছুই থাকিবে না; কখন যে আঁধার হইবে, তাহার কিছুমাত্র ঠিকানা নাই। তাই বলি, অন্য চিন্তা দূর করিয়া সেই ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীহরির পাদপদ্ম চিন্তা কর। কী করিতে আসিয়া কী করিতেছি, প্রস্তর পাইয়া পরশমণি জ্ঞান করিতেছি। অমূল্য রত্ন পরিত্যাগ করিয়া অনিত্য বস্তুতে মনপ্রাণ সঁপিয়াছি।

১৫। হেলা দিয়া বেলা কাটাইলে শেষে স্বকার্য্য সাধন হয় না। বৃথা কাজে কাল গত হইতেছে দেখিয়া শমন-কিঙ্কর অট্টহাস্য করিতেছে। বিলম্ব হইলে বাসনা-বাতিকে অঙ্গ ভার বোধ করিবে। আপনার কাজে হেলা দিও না, দিও না—সব মিছা, কেবল ধাঁধাবাজী!

দ্বিতীয় চয়ন

উদ্ধারোপায়

১। সময়ে নিত্য বস্তু চিনিয়া প্রাণপণে উপাসনা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই পিতামাতা, স্বামী ও নিজকুল উদ্ধারের উপায় হইতে পারে।

২। কিন্তু বেলা থাকিতে বাঁচিবার উপায় থাকিতে, হেলা করিয়া ভেলা ডুবাইয়া দিয়া সাধ করিয়া অপমৃত্যু মরিলে, সে দোষ কাহার?

৩। অনিত্য ক্ষণধ্বংসী সুখের জন্য সংসার সাগরে সন্তরণ করিবার সময় এখন নয়। বেলা অধিক হইয়াছে; সুতরাং এ সময়ে, যাহাতে অকূলে কূল পাওয়া যায় তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

৪। আমি কালভয়ে ভীত হইয়া অসময়ে অবেলায় ঐ অভয়চরণে শরণ লইতেছি। এবার কঠিন হইতে পারিবেন না। কারণ, দয়াল গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া অযাচকে পাপী তাপীর সকল দুঃখ দূর করিয়া চির শান্তিময় অভয় চরণ দান করিতেছেন।

৫। এক্ষণে যাহা কিছু সম্বল আছে, আর নষ্ট না হয়; সাবধানে রক্ষা করিবে।

৬। যাহাতে পিতৃমাতৃ সম্পত্তি লইয়া স্বদেশে যাইতে পারি, তজ্জন্য এই দেহ-ভগ্নতরীখানি সারাইয়া দিন।

তৃতীয় চয়ন

(ক) গুরু-করণ

১। সাগরপার হইতে হইবে, কেমন বৎস? সংসারী লোকে 'দুঃখের সাগর' বলে, তাহাও কখনও শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি এই অকূল দুঃখের সাগর পার হইতে হয়, তবে গুরু-রূপী কাণ্ডারীর প্রয়োজন। কারণ, এই দেহ-তরী আপনি চলিতে পারে না। ঐকান্তিক চিত্ত না হইলে এই শ্রীগুরু-কাণ্ডারী পাওয়া যায় না।

দুস্তর ভব-পারাবার তরিবার উপায় কী?—সদ্‌গুরু কৃপা হি কেবলম্।

২। যখন মাতৃদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী কর্ম্ম গেল না, তখন মনুষ্যের কর্ম্ম করিলাম কৈ? যদি সদ্‌গুরু পাই, তবেই মনঃ সাধ পূর্ণ হইবে।

৩। এই ভব-সংসারে আসিয়া জাগ্রতাবস্থায় ,মোহনিদ্রাবশতঃ ভাবের পরিবর্ত্তন হওয়াতে পথিমধ্যে ছয়জন রিপু বন্ধু সাজিয়া অলীক, ক্ষণধ্বংসী আনন্দের গল্প শ্রবণ করাইতে করাইতে অষ্টপাশে বদ্ধ করিয়া গোলোক-ধাঁধার পথে প্রবেশ করাইয়াছে।

ঐ অসময়ে নিরুপায়ের উপায়—সদ্‌গুরু কৃপা হি কেবলম্।

৪। এক্ষণে ঋণের দায়ে ভবভয়ে ভীত হইয়া এই অবেলায় শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে চিরদিনের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছি।

৫। নিদানের দিনে রিপুগণ বলিয়া যায়, যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সাধন না করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাঘাত করে এবং আমাদের ভোগায় ভুলিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে, পরিণামে তাহাকে ভব-বন্ধনে পড়িতে হয় ও ভীষণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

৬। সকলেই সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। যথাসময়ে আমার আমি এবং আমি যাহাদের আপন ভাবি—সকলেই পলায়ন করিবে। কিন্তু ভবপারের কাণ্ডারী পতিতপাবন গুরুদেব কোনও সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

৭। আর সাধ করিয়া বেলা কাটানো উচিত নয়। কারণ, একাকী পথে যাইতে হইবে—এ সময়ে গুরু বই আপন কেহ নাই।

৮। গুরু নাম সত্য, মরণ সত্য ভবে—সব ফেলে যেতে হবে। সব অনিত্য, ইহাই সত্য।

৯। স্ত্রী পুত্র পরিজনসহ বাস করিয়া ভজন নষ্ট হয় ও পরিণামে অকূল সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। প্রথমে সদ্‌গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা, পরে যথোচিত সময়ে আত্মতত্ত্ব গ্রন্থ পাঠ ও তাহার ক্রিয়া করিবে।

১০। সকলই ক্ষণধ্বংসী—এই ভয়াবহ ব্যাপার দেখিয়া মৃত্যুভয় আসিয়া স্মরণপথে দাঁড়াইবে। সুতরাং শ্রীগুরুর অভয়পদে প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক পিতৃ-মাতৃ সম্পত্তি রক্ষার জন্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইবে।

১১। এই সময়ে সদ্‌গুরুর অভয়চরণাশ্রিত হইয়া চিরজীবনের মত আত্ম-সমর্পণ করিবে। তৎপরে তাঁহার নিকট সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইবে। প্রথমেই পিতামাতার চরণামৃত পান ও তাঁহাদের যুগলচরণ পূজার নিয়ম তিনি

যে প্রকার আজ্ঞা করেন, সেইমত ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। পরে তিনি তোমার ভব-বন্ধন-মোচনের উপায় বলিয়া দিবেন।

১২। যিনি জ্ঞানী, তিনি সদ্‌গুরু আশ্রিত হইয়া অগ্রে পরকালের পথ পরিষ্কার করেন; তাহাতে প্রাণ থাকুক, আর যাউক।

১৩। শ্রীশ্রীগুরুদেব বই আমাদের আর কেহ নাই। নিদানকালে শ্রীশ্রীগুরুদেব বিনা ভবনদীপারের আর কাণ্ডারী নাই। অতএব বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার উপর নিজপুত্রাপেক্ষা বাৎসল্য স্নেহ বর্ত্তমান রাখিবে। কদাচ মৌখিক ভক্তি-স্নেহ দেখাইবে না।

১৪। গুরু বই প্রাণের বন্ধু আর কেহ নাই। অতএব তাঁহার যুগল চরণ সতত ধ্যান করা উচিত; তাহা হইলে ভবনদীপারের ভাবনা থাকিবে না।

১৫। আমি জানি, শিক্ষাগুরু অপেক্ষা প্রাণরক্ষার প্রিয়তর বন্ধু আর কেহ নাই। স্বপ্নেও শ্রীশ্রীশিক্ষাগুরুদেবকে মনুষ্যজ্ঞান করিও না। তাঁহার কৃপায় দিব্যচক্ষু হয়, পাপক্ষয় হয়, ভবপারের সম্বল উপার্জ্জনের ক্ষমতা জন্মে ও মনুষ্যজন্ম সফল হয়।

১৬। গুরুকে ভগবদ্‌জ্ঞানে গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস, ভক্তি ও তাঁর চরণে অকপট প্রেম রাখিবে। তাহা হইলে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সকল সময়ই দর্শন পাইবে। অনুমান-বর্ত্তমান সমান দর্শন পাইবে।

১৭। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া সংসারের কীধন আছে যাহা লইয়া আপনি অসময়ে সুখী হইবেন? বাটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে ইষ্ট-সাধনের উন্নতি হইবে কীসে? কে তোমার আপন হইয়াছে, যে তাহার কথা স্মরণ পথে রাখিয়া তোমার পাতাল বাসী পাগলছেলেকে ভুলিয়া গিয়াছ?

১৮। এই সময়ে আর নিজকার্য্যে হেলা দিও না। কারণ, চিরসঙ্গী শ্রীশ্রীগুরুদেবের মত আর কেহ আপনার আপন হইয়া নিদানের সম্বল উপার্জ্জন করিতে বলিবে না। অনিত্য আত্মীয়গণ কেবল মায়াপাশে বন্ধন করিয়া, তুমি আমাদের আপন—এই কথা জানাইয়া, পরমধনকে লাভ করিতে দিবে না।

১৯। যাঁহার কৃপায় দুস্তর ভবসাগরের নরক-যন্ত্রণা নিবারণ হয় ও ইন্দ্রিয়গণ দয়া করে, কোন্ ভালবাসার জিনিষ ও বন্ধু পাইয়া আজ তাঁহাকে

ভুলিয়া যাইব? এ সংসারে যাঁহার কৃপাকণাতে প্রাণরক্ষা হইবে, এবং যিনি ভবসমুদ্র পার করিবেন, কীধন আছে, যাহা তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিব? প্রাণ দিলেও পরিশোধ হইবে না।

২০। সদ্‌গুরুর শান্তিময় যুগলচরণ কমলে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই, আপনার কৃপাবিন্দু প্রাপ্ত হইয়া, সেই দুষ্প্রাপ্য সদ্‌গুরুর চরণতরীতে দুস্তর ভবনদী গোষ্পদের ন্যায় পার হইয়া যাইবে।

২১। সময় পাইলেই আপনার অসময়ের কাণ্ডারী, নিদানের বন্ধু গুহাবাসী অবোধ সন্তানের দয়াময় গুরুদেব দত্ত মহামন্ত্র সাধন করিবেন। যাহাতে ভবপারের সম্বল অর্জ্জন হয়, তাহাতে কদাচ বিরত থাকিবেন না।

২২। যদি সদ্‌গুরু পায়, ভ'জে লয়—মরণের ভয় রবে না।

(খ) সদ্‌গুরুর লক্ষণ

১। শিক্ষাগুরু করিবার সময় অগ্রে সেই মহাত্মার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। কারণ, তাহাতে বুঝা যাইবে, ইনি আকুমার-বৈরাগ্য-ব্রজ-উপাসনা-পথের পথিক কিনা।

২। এইগুলি অগ্রে দেখিতে হয় কেন? এতদুত্তরে বলি, দেহ-গেহ-পরিজন গুরুপদে সমর্পণ করিতে হইবে ও তাঁহার চরণে এ জন্মের মত দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই সত্য মনে করিতে হইবে ও সেইমত কার্য্য করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত শিক্ষাগুরুই ভবপারের কাণ্ডারী।

৩। বংশরক্ষাকারী শিক্ষাগুরু নাহি হয়।

৪। পাঁচবৎসরের শিশুর সহিত তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও কণ্ঠস্বর মিল করিয়া লইবে। তানপুরার সুরের সঙ্গে তাঁহার কণ্ঠের সুর মিলাইয়া লইবে; ডুব দিয়া জল খাইলে, এই শিবের যন্ত্রে তাহার ফাঁকী ধরা পড়িবে।

৫। বিবাহ না হইলে সে সাধু হয় না। পদ্মিনী যুবতী স্ত্রী ও ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য যে অনায়াসে ছাড়িয়া আসিয়াছে, একমাত্র সে-ই ব্রজপথের পথিক হইতে পারে।

"হেন মায়া ছাড়ে যেই, পরম ঈশ্বর সেই, ভজ মন তাঁরে নিষ্ঠা করি।"

৬। একটি সন্তান জন্মিলে তুই জন্মের ফেরে পড়িতে হয়। নিজ স্ত্রীর কাছে যে ফেল হইল, সে অপরকে তরাইবে কী করিয়া?

৭। তিনি বালকের মত কামিনীকাঞ্চন লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে খেলা করেন; তাঁহার সমস্ত বৃত্তি বাতুলের ন্যায় অসংবদ্ধ; তিনি সদা আনন্দময়।

৮। তাঁহার অঙ্গে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, তাঁহার আকর্ষণ দুর্নিবার; তাঁহার সঙ্গ নিত্য আনন্দময়।

৯। তাঁহার দর্শনে রমণী হৃদয়ে মাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠে; ভক্তহৃদয়ে ভক্তি ও পাপীর অনুশোচনা জাগে।

১০। নিজ যুবতী স্ত্রী ও অর্থের কষ্টি-পাথরে তাঁহাকে কষিয়া লইবে। বিনা পরীক্ষায় শিক্ষা গুরু করিও না।

১১। তাঁহার আকুল 'মা' 'মা' কণ্ঠে রমণী-হৃদয়ে বিশ্ব-জননীর আবির্ভাব হয়। হীরা, সোনা, রূপা লইয়া তিনি শিশুর ন্যায় লোষ্ট্রবৎ ক্রীড়া করেন। সোনা ও মাটির ঢেলায় তিনি কোনো পার্থক্য দেখেন না।

১২। তাঁহার দেহ-ত্যাগ সাপের খোলস ছাড়ার ন্যায়। এইরূপ হইতে না পারিলে, গোলোকে গতি হয় না।

১৩। নির্হেতু হইয়া যিনি বস্তু প্রদান করেন, তিনি সত্যযুক্ত ব্রজ উপাসনার লোক।

১৪। এ হেন শিক্ষাগুরু সুদুর্লভ—কোটিকে গুটক' মিলে।

১৫। তিনি অখণ্ড ব্রহ্মচারী, ক্ষণিকের জন্যও ব্রহ্মচর্য্য চ্যুত হইলে সেই 'পূর্ণ ব্রহ্ম', 'অচ্যুতের' সন্ধান মিলে না। 'অখণ্ড মণ্ডলাকার'-কে জানিতে হইলে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন।

১৬। গুরুদেব! তুমি যে আমার স্মরণ-মঙ্গল, তাপিত প্রাণশীতল, ভক্তিমাখা মাধুর্য্য মূর্ত্তি! কতদিনে ঐ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মচারী মূর্ত্তিতে তোমার এ দীন সন্তানের নিকট বসিয়া বাৎসল্যস্নেহসিক্ত উপদেশামৃত পান করাইবে?

১৭। তোমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সংসারীর সাধ্যাতীত, কারণ তুমি যে অধরা।

চতুর্থ চয়ন

(ক) ধর্ম-সাধন

প্রাপ্তির উপায়

১। তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত না হইয়া শ্রীশ্রীগুরুবাক্য অনুসারে অন্ধ বিশ্বাসে কার্য্য করিলেই সব সফল হয়।

২। নাম প্রাপ্ত হইবার জন্য নানাস্থানে নানামত শিক্ষা করিও না। আমি বলিতেছি, তাহাতে বিপদ।

৩। প্রভুর কৃপাতে যে-ধন প্রাপ্ত হইলে, তাহা তোমার ঐকান্তিক বিশ্বাসে গুরুবাক্য সাধনের ফল।

সাধন কাহাকে বলে ?

৪। চৌদ্দবৎসর বয়স হইতে না হইতেই মেয়ে মানুষের দিকে মন যায়; ডুব দিয়া জল খাইতে শেখে। ফলে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, পাঁচবৎসর বয়সের নির্ম্মলভাব আর থাকে না; আত্মঘাতী প্রবৃত্তি ধরা পড়ে কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তনে।

আব্রহ্মস্তম্ব সর্ব্বজীবেরই এই আত্মঘাতী প্রবৃত্তি আছে : ইহার ফলে ভব-বন্ধন। এই প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া আত্মরক্ষা করার নামই সাধন।

৫। সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অটুট রাখিয়া পাঁচবৎসর বয়সের ভাব ঠিক রাখিতে পারিলে, তাহার আর ভব-ঘোরে আসিতে হয় না।

৬। Total ঠিক রাখিলে, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে, তবেই পূর্ণব্রহ্মের অনুভূতি হয়। ডুব দিয়া জল খাইয়া পরিত্রাণের উপায় নাই। এক বিন্দু পতনে দুই জন্ম ঘোরাইবে।

৭। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণের কার্য্য কর, ব্রহ্মকে অবগত হও, ব্রহ্মচর্য্য ঠিক রাখ।

সাধনের প্রয়োজনীয়তা

৮। অরুচির কত জ্বালা আমি জানি। নামে অরুচি হইয়া বারে বারে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তবু অনিত্য আনন্দে সুখানুভব করিতেছি।

৯। বহুজন্ম হইতে ঋণজালে জড়িত হইয়া মহাজনের বিচারে জীবন সংশয়াপন্ন। দত্তোপলক্ষে, অর্থাৎ গচ্ছিত সম্পত্তি বিনাশের অভিযোগে, নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। আর এ নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। তথাচ ছয় জন চিরসঙ্গী পিতৃমাতৃসম্পত্তি নষ্টকারীদের কথায় অলীক আনন্দে মত্ত হইয়া হেলা করিয়া সাধের বেলা কাটাইতেছি।

১০। এক্ষণে বিবেকের সহিত চিরবন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া শ্রীগুরুর অভয় পদে প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক পিতৃমাতৃসম্পত্তি রক্ষার জন্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হউন।

১১। সন্তানের কর্ত্তব্য—পিতৃমাতৃপথ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক পিতামাতাকে মহানরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করা।

১২। ঘরে পিতৃমাতৃসম্পত্তি আছে; কিন্তু জগমাঝে কয়জন পুণ্যবান্ পুত্র ভীষ্মের মত জীবের সাধ্যাতীত কঠিন পণ করিয়া রিপুদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক সতর্কতার সহিত সে সম্পত্তি রক্ষা করিতে জানে?

১৩। নিত্য বস্তু লাভ করিতে হইলে দিব্যজ্ঞানের প্রয়োজন হয়; অতএব হেলা করিয়া বেলা কাটানো উচিত নয়। পিতৃদত্ত অমূল্যধন থাকিতে থাকিতে যিনি উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন, তাঁহারই মঙ্গল হয় এবং তিনিই অভয় চরণ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

১৪। পঙ্ক উদ্ধারের কার্য্য চলিতেছে কি না? এ কাঙালের উদ্ধার কতদিনে হইবে?

১৫। কর্ত্তামাগো, আমি ঠিক পাগল হইয়াছি। নহিলে, বাবার পড়ার সময় নষ্ট করিয়া এই নিত্য, অক্ষয়, অব্যয়, অখণ্ড ভাবের পূজা করিবার জন্য ধন, মান, খ্যাতি, বিদ্যা ইত্যাদি প্রাপ্ত হইবার পথ রোধ করিতে বসিয়াছি?

১৬। ঘৃণা-লজ্জা-ভয় থাকিতে গৌর-প্রাপ্তি হইবে না।

(খ) সাধনের সময়—ধ্রুবযোগ

১। প্রথমেই যদ্যপি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রিত হইয়া প্রকৃত কার্য্যাদি শিক্ষা করিতাম ও পিতামাতার চরণযুগল পূজা করিয়া পিতৃমাতৃসম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতাম, তবে বারে বারে ভব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।

২। তোমার পিতৃমাতৃসম্পত্তির তহবিল এখনও বেশ বেশী আছে। তবে সদ্‌গুরু চরণাশ্রিত হইয়া ইহকাল পরকালের সম্বল উপার্জ্জন করিতে এত ভয় কেন? পঞ্চম বর্ষীয় ধ্রুব পিতামাতার উদ্ধারের উপায় পদ্মপলাশ লোচন হরিকে নিজে লাভ করিতে পারেন নাই কি? আমরাও তো সেই মানুষ—কী প্রকৃত কার্য্য করিতে পারিলাম?

৩। হেলা করিয়া বেলা কাটানো উচিত নয়। পিতৃদত্ত অমূল্যধন থাকিতে থাকিতে যিনি উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন, তাঁহারই মঙ্গল হয় এবং তিনিই অভয় চরণ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৪। যত বেলা যাইতেছে, ততই কালরূপী ব্যাঘ্রের ভয় হইতেছে। কালরূপী ব্যাঘ্রের ভোজন দর্শন করুন: কেমন নয়নান্তরালে থাকিয়া মোহনী বা ভেল্কী দিয়া অলক্ষিতভাবে দিবানিশি ভোজন করিতেছে। আবার পলকেই ধরিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবে। এই সময়ে সাবধান হওয়াই উচিত। কারণ অন্ধকার হইলে আর দেখা যাইবে না—আবার চৌরাশি যোনি ভ্রমণে যাইতে হইবে। উঃ, কী হৃদয়-বিদারণ নিদারুণ ব্যাপার!

৫। পাঞ্চ ভৌতিক দেহের ভাব দেখিতেছেন, বাবা? এই ঠিক চলিতেছে, আবার কিছুক্ষণ পরেই কল খারাপ হইল। সুতরাং এ নবদ্বারযুক্ত অনিত্য দেহের উপর সর্ব্বদাই সন্দেহ। তাই বলিতেছি, নিজের শিক্ষাগুরু বাক্য অনুযায়ী আত্মতত্ত্ব সাধিতে বিরত থাকিবেন না।

৬। কদাচ আপন কার্য্যে হেলা দিও না, সময় কাহারও বারণ শুনিবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল আপনকার্য্য করিয়া কালভয় নাশ করিতে হয়।

৭। বেদমার্গের পূজার সময় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়গণ সময় পাইয়া অনিত্য অলঙ্কার স্বরূপ আমাকে ঘৃণা করিয়া অঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া চির বিদায় দিতেছেন। আপন যিনি তাঁহাকে এতদিন খুঁজি নাই। হে পতিতপাবন, বেলা যাইতে না যাইতে কালরূপী ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া আসিতেছে। মহাবিপদে পড়িলাম। ফুল তোলা তো এখনও হয় নাই। হে গুরুদেব, ফুলের বাগানের রাস্তা কোন্ দিকে বলিয়া দিন।

৮। দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক করিবার উপায় শীঘ্র শীঘ্র করুন। কারণ, এখনও ভবপারের সম্বল উপার্জ্জনের পুঁজি রহিয়াছে। দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে, কাহারও সাধ্য নাই—সেই বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত দুর্লভ নিত্য ধনকে দর্শন করে।

৯। শীঘ্র শীঘ্র ভবপারের সম্বল উপার্জ্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। কারণ নলিনীদলগত জলের ন্যায় জীবন টলমল করিতেছে। প্রাণপাখীকে ধরিয়া রাখা বিষম দায়। তাহার উপর ভাঙা ঘরের ভাবনা। এক্ষণে নিরুপায়ের উপায়—সদ্‌গুরু কৃপা হি কেবলম্।

১০। ত্রাণ করিবার উপায় শীঘ্র শীঘ্র করা কর্ত্তব্য। কারণ, বিলম্ব হইলে বাসনা-বাতিকে অঙ্গ ভার বোধ হইবে।

(গ) সংসারী ধর্ম্ম-যাজন

১। এখনও তোমার কর্ম-বন্ধন কাটে নাই, সেই জন্য এখন সংসারের কর্মক্ষেত্রে কর্ম করিতে হইবে।

২। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে মতি ঠিক রাখিয়া সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম করিবে। আর অবকাশ হইলেই শ্রীধামগুহাশ্রমে আসিবে।

৩। এই অধম সন্তানকে একটি পোষ্টকার্ড লিখিতেও সময় পাও না—ইহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে, আপন কাজে হেলা দিয়াছ। বাবা, অনিত্যকার্য্য যতদূর সম্ভব দূরে পরিহার পূর্ব্বক নিত্যকর্মে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিবে।

৪। কেবল অনিত্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিওনা। সময় পাইলেই কর্ত্তব্য কার্য্য প্রাণপণে করিবে। অবকাশ হইলেই, যাহাতে পথের সম্বল উপার্জ্জন হয়, যত্নের সহিত তাহার চেষ্টা করিবে।

৫। প্রত্যহ পিতামাতার চরণপূজা করিবে ও চরণামৃত ধারণ করিবে। যাহাতে মাতৃসেবা করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা দিবে। কদাচ পরছিদ্রান্বেষণ করিবে না।

৬। সংসারী ধর্ম যাজন করিতে হইলে স্ত্রী-ত্যাগ করিতে হয় না। আত্মধ্বংসকারী মাদকতা ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হয়।

৭। মহারাজা যুধিষ্ঠিরের মত চলাই সংসারী স্ত্রী-পুরুষের কর্ত্তব্য।

৮। নানাপ্রকার পরীক্ষাপূর্ণ, মায়াময় এই জগৎ। ইহা জ্ঞাত হইয়া আপন বুঝিয়া লও গো এই বেলা।

৯। মৎস্য খাইতে নিষেধ আছে বলিয়াছি বলিয়া যেন এ নরাধম সন্তানের কথা কদাচ ভুলিবেন না।

১০। মৎস্য, মাংস, মাদকতার নেশা প্রথমেই কি মৎস্য-মাংসাশী ব্যক্তি ও মাদক দ্রব্য সেবনকারী ত্যাগ করিতে পারে? যে সময়ে সেই ব্যক্তির ভগবানের উপর অখণ্ড স্নেহ-ভক্তি ভালবাসা দাঁড়াইয়া থাকে, তখন আর আত্ম সুখের কথা স্মরণ থাকে না এবং জীবন রক্ষার জন্য সাত্ত্বিক আহার করিতে অন্তর পিপাসিত হইয়া থাকে।

১১। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ ও পুণ্য স্ব-স্ব বপুতে জীবের ভোগ হইয়া থাকে। এই সময়ে কেবল আপনাদের চরণামৃতপান ও নাম জপই পরমৌষধি।

(ঘ) সাধারণ উপদেশ

১। সদা সত্য পথে থাকিয়া মাটির দিকে চাহিয়া চলিবে। কারণ, ঘরের ভূতে নাচাইয়া শেষে ফেলিয়া দেয়—সাবধান! আপন ধর্ম বজায় রাখিয়া চলিবে।

২। সময় পাইলেই কর্ত্তব্য কর্ম প্রাণপণে করিবে। যাহাতে পিতৃ সম্পত্তি লইয়া স্বদেশে যাইতে পারা যায়, তজ্জন্য এই দেহ-ভগ্নতরীখানি গুরুর কাছে সারাইয়া লইবে।

৩। কাহারও সাথে মিশিও না। এই আড্ডা-গল্প অভ্যাস করিলে কিছুই হইবে না। সর্ব্বদা একা থাকা উচিত। লোকের সঙ্গে কথা কহিলে যোগের ক্ষতি হয়। সব ফাঁকী, আপন কাজ কর।

৪। আশ্রমের ভ্রাতৃদ্বয়কে কাহারও সহিত, এমন কি কোনো গুরুভ্রাতার সহিতও, মিশিতে ও গল্প করিতে নিষেধ করিবে।

নানাস্থানে যাইতে যাইতে ধর্মভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। প্রকৃতপথভ্রষ্ট হইয়া জাঁক জমক দেখিয়া বা মুখস্থ বিদ্যা শুনিয়া সেইখানে গিয়া তাহাদের দলে মিশিয়া দিন-কানা সাজা না হয়—এই প্রার্থনা।

৫। কখনও গুরুর ধন অপচয় করিও না। গুরুর ধন অপচয় ও অপহরণ করিলে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

৬। শিক্ষাগুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া অটল বিশ্বাসের সহিত সাধন করিতে হয়। তারপর শিক্ষাগুরুব কৃপালাভ হইলে দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার আশা করা যায়।

৭। ঠাকুর এক, কিন্তু পথ অনেক।

৮। সংসাবী গোলে থাকিও না। কেবল অনিত্য কথায় থাকিও না। পথের সম্বল শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সার করিয়া অনিত্য বিষয় অল্পে অল্পে ভুলিবে। মাটির মত হও গো, মা।

৯। দিবারাত্রি যখন সময় পাইবে, তখনই সাধন কার্য্য করিবে। যোগ-সাধনা ঠিক রাখিয়া চলিবে, ইহাতে হেলা দিও না।

১০। কখনও কাহারও কথায় কর্ণপাত করিয়া- আপন আসল কার্য্যে ব্যাঘাত করিবে না।

১১। আমি দেশকাল ও লোকাচার দেখিয়া পিতামাতার মুখোজ্জ্বল বাখিতে বলায় কি সকলেই ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে স্মরণপথের বহির্দ্বারে বাখিয়া দিবেন?

(ঙ) বিধিমার্গ

১। অটল বিশ্বাসেব সহিত শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে নির্মল ভক্তি রাখিবে।

২। কলিকালে হরিনাম বিনা গতি নাই। অতএব অহরহ বৈষ্ণবের মুখে উপযুক্ত স্থানে গার্হস্থ্যাশ্রমের বেদবিহিত নিয়মানুসারে হরিনাম শুনিতে বসা একান্ত কর্ত্তব্য। নাম-শ্রবণ হইতে শ্রদ্ধা আসে।

৩। তুমি ত্রিসন্ধ্যা চরণামৃত পান করিতে পারতো বড়ই ভাল হয়, মা। প্রসাদ দেবতারাও বাঞ্ছা করেন।

৪। শিখা ও মালা ধারণ করিবে। তিলকসেবা, মালাজপ ও নামকীর্ত্তন বিধিমত করিবে।

৫। যখন অবসর পাইবে, তখনই গুরুদত্ত মহামন্ত্র জপ করিবে। নাম জপে শুচি-অশুচি, সময়-অসময় নাই।

৬। মনে রাখিও, কেবল হরিনাম, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন নাম-ধারা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

৭। ঠিক সময়মত সেবাপূজা করিবে। সকাল সকাল ঠাকুর পূজা করিবে।

৮। ব্যাধির শরীরে নহে শ্রীকৃষ্ণ ভজন। অতপ, অর্থাৎ অদুঃখিত, শরীরে যোগসাধনা ভাল হয়।

৯। এক্ষণে স্থিরচিত্তে বায়ু-তত্ত্ব যোগসাধনা করিবে, তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া থাকে।

১০। স্ত্রী-সংসর্গকারী ব্যক্তিরা মতি ঠিক রাখিতে পারে না, অতএব এই স্থলে মৌখিক প্রণয়ই ঠিক নিয়ম।

১১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবে। আপনমনে আনন্দ করিয়া গ্রন্থপাঠ করিবে।

(চ) রাগমার্গ

১। সে-কথা সাক্ষাতে বলিব, যাহা শ্রবণ করিলে অতুলনীয় আনন্দে বিভোর হইয়া প্রেমরসাস্বাদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। এমন ইচ্ছা হইবে যে প্রাণান্তেও মধুমাখা হরিনামামৃত পান করিতে ভুলিবেন না। তার সাক্ষী মহেশ্বর।

২। অনর্পিত বস্তু লাভ করিতে হইলে আত্মসুখ ত্যাগ করিতে হয় ও শ্রীশ্রীগুরুবাক্যমত চলিতে হয়। অল্পে অল্পে আত্মসুখ ত্যাগ করা চাই, অনর্থ নিবৃত্তি হইলে গুরু-পদ পাই।

৩। সে যে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন, সুতরাং বিনা সাধনে কোথায় পাইব?

৪। নানা বার-ব্রত করিয়া কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? আপন ঘরে না খুঁজিলে কি তাঁহাকে পাওয়া যায়?

৫। যেন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অভয় চরণ দিবানিশি ধ্যান করিতে পারি, লোকে না জানিতে পারে।

একা নির্জ্জন ঘরে বসিয়া গাঢ় ধ্যানে মগ্ন থাকিবে। গুরু-তত্ত্ব হৃদ্-পিঞ্জরে রাখিবার চেষ্টা করিবে—এটি পরীক্ষা ক্ষেত্র।

৬। অটল বিশ্বাসের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে। নামামৃত লইবে। একদিন তো মরিতেই হইবে, তাই বলিতেছি, কদাচ হেলা দিও না। যতশীঘ্র পার পবিত্র মনে সাধন কার্য্য কর।

৭। Total ঠিক চাই—কোথাও ফাঁকী দিলে চলিবে না।

৮। পুত্রকন্যাতে কি তোমার বাসনা নাই? যদি না থাকে, তবে সত্য বলিবে। কারণ, মনে যদি বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হয় তো নরকে যাইতে হইবে। আত্মসুখ ত্যাগ করিয়া রাধাগোবিন্দের উপাসনা করিবে।

তোমরা যে ঘরে থাকিবে, তোমাদের সাধনার আসনে স্ত্রীসংসর্গকারী ব্যক্তিরা বসিতে পারিবে না, কারণ তাহারা অনেক কন্যাপুত্রের জন্ম দিয়াছে।

৯। এই বেলা বেলাবেলি, যাহার সাধনের ধন লইতে ইচ্ছা আছে, শীঘ্র শীঘ্র জীয়স্তে মরিয়া পথের সম্বল উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করুন—নচেৎ রিক্তহস্তে যাইতে হইবে।

১০। আত্মসুখ ত্যাগ করিয়া, নির্হেতু হইয়া, যিনি আত্মগুরু হৃদয়ে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া সাধকের প্রাণ বাঁচাইয়া পরম মঙ্গল করেন, তাঁহারই যথার্থ ভালবাসা। তিনিই এই নির্হেতু ব্রজ উপাসনা পথের পথিক। তাঁহার দ্বারাই কার্যসিদ্ধি হয়।

১১। যাহার দ্বারা খুন, তাহাকে ধরিয়াই উঠিতে হইবে।

১২। প্রবর্ত্তের সময় অনুমান-সেবা ও অনুমান-ভজনা করিবে। সাধকের পথে অনুমান-সেবা নাই,—বর্ত্তমান-পূজা, বর্ত্তমান-গুরুকার্য্য ও বর্ত্তমান-সেবা।

১৩। বর্ত্তমান-রাধাকৃষ্ণ রূপ নিত্য সত্য শ্রীশ্রীচৈতন্যে বর্ত্তমান-দৃষ্টি করিয়া পূজা করা অপেক্ষা অধিকতর সিদ্ধ-সাধন ও পরমানন্দের বিষয় আর কী আছে?

১৪। ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া গুরুদত্ত ভবপারের সম্বল নামামৃত পান করিবে ও মাখিবে। সময় পাইলে নির্জ্জন ঘরে বসিয়া দ্বিদল লক্ষ্য রাখিয়া দ্বাদশবার বীজ ও গায়ত্রী জপ করিবে। তাহার পর যত পার, ততই ভাল। মন চঞ্চল হইলে, সামান্য সামান্য পরিমাণে নিঃশ্বাস বন্ধ রাখিয়া জপ করিবে।

১৫। কারুণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত, লাবণ্যামৃত ক্ষীরোদ সমুদ্রের জলে অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে মিশাইয়া লইবেন।

১৬। স্বভাব-সিদ্ধ হইলে শ্রীচৈতন্য আপন বলিয়া শ্রীশ্রীচরণতরী দিয়া ভবপারে লইয়া যান।

(ছ) সাধন পথে বিঘ্ন ও তৎ-প্রতীকার

১। এ কী মায়াদেবীর ধাঁধাবাজীর খেলা? আসল কাজের সময় হইলেই দুই ভগিনী হাজির—নিদ্রা ও আলস্য। না ঘুমাইলে তো ঘরে চুরি হয় না।

২। ভয় আছে, বাবা। ভব-ভয়-হারী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃদ্‌পদ্মে রাখিতে পারিলে আর ভয় নাই,—ইহা স্মরণ রাখিয়া উভয়ে আসল কার্য্য সাধন করিবে।

৩। সময় বড়ই খারাপ যাইতেছে; ইহাতে মানসিক চাঞ্চল্য না করিয়া উভয়ে পথের সম্বল উপার্জ্জন করিতে ভুলিও না।

৪। মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে—অতএব এ সময়ে অবোধ সন্তানের নিকট আসা উচিত।

৫। তোমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। তুমি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া কালযাপন কর।

রোগ-শোক যাহা ভোগ হয়, তাহা জীবের কর্মফলে হয়—তাহা প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু ভগবৎ-ভক্তের যে পীড়া হয়, তাহা কেবল ভক্তের মন পরীক্ষা করিবার জন্য।

৬। সত্যপথে থাকিয়া শ্রীনলরাজা ও শ্রী শ্রীবৎস মহারাজের কত কষ্ট গিয়াছে! বিষম পরীক্ষা তাঁহাদের হইয়াছিল।

অগ্নি-পরীক্ষাতে প্রমাণ হয়—যে জনে মেকী সোনা।

৭। বাবা, বসিয়া বসিয়া কেবল মন স্থির করিবে। শ্রীবৎস রাজার যে পোড়া শোল মাছ জলে পলাইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সহায়, তথাচ মহারাজ যুধিষ্ঠির কত কষ্ট পাইয়াছিলেন! ধর্মের জয় হইবেই।

৮। বাবা, অনিত্য চিন্তায় কাতর হইও না—সময় ফিরিবে।

৯। বাবা, মন ঠিক রাখিবে। আবার দয়া করিবেন দীন, দয়ালু, দীনবন্ধু।

১০। তোমারও মঙ্গল হইবে। ঐ কষ্টের দিন কি থাকিবে? শ্রীশ্রীগুরু-রাধাগোবিন্দ তোমাকে কৃপা করিবার জন্য ঐ প্রকার পরীক্ষা করিতেছেন। তুমি নিজের সাধন-ভজন ঠিক রাখিতে ভুলিও না।

১১। শিক্ষা-করা বীজমন্ত্র রিপুগণ ভুলাইয়া দেয়। তাই সকল সময় শিক্ষাগুরুর সঙ্গে সাক্ষাতের দরকার। প্রত্যেক মাসে মাসে যাতায়াত ও সাক্ষাৎ দর্শন, স্পর্শন ও পূজনের দরকার।

১২। পরীক্ষার সময় যেন ভব-পারের সম্বল হারাইয়া ফেলিও না। কারণ, পরীক্ষার সময়ে বিষম বিপদে পড়িয়া স্মরণ, মনন ও ইষ্ট উপাসনা ভুল হইয়া যায়। তাই বলিতেছি, প্রাণ যায় যাইবে, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে ভুলিও না।

১৩। এক্ষণে ঐ নিত্য-চৈতন্য ধনকে সাবধানে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে পার যদি, তবে আর ভব-ঘোরে আসিতে হইবে না।

১৪। সাবধান! যেন ভব-পারের সম্বল চুরি না হয়। তুমি সাবধান থাকিও, যাহাতে পারাণী-খরচ না হয়।

১৫। সাবধান! নানা প্রকার বিভীষিকা আছে। কোনো সূত্র পাইলেই পলায়ন করিবে ও দুই জন্ম যাতায়াত করাইবে।

১৬। খুব সাবধান! গুরুদত্তা সম্পত্তি নষ্ট না হইলে কষ্ট হয় না ও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

১৭। পিতৃমাতৃ সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিবেকের সঙ্গে চির-বন্ধুত্ব স্থাপন করুন। নচেৎ, অশান্ত রিপু প্রলোভন দেখাইয়া বিষয়-বিপিনে লইয়া যাইবে। কিন্তু স্মরণ-মনন থাকিলে, মহর্ষি জনকের মত নির্লিপ্তভাবে সকল কার্য্য করিতে পারিবেন।

১৮। কোনো বস্তু দেখিয়া ভ্রমেও লোভ করিও না। কারণ, অনেকেই সর্ব্বনাশের যুক্তি দিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞান-তিমির-নাশক যুক্তি দিবার মানুষ অতি বিরল।

১৯। বালিকাবস্থার মত নির্মলমনে ভগবানের উপাসনা করিবে।

কাহারও ভেল্কি-লাগানো কথা শুনিয়া তাহাতে মন দিয়া সেইমত কার্য্য করিও না। অনেকেই সর্ব্বনাশ করিয়া দিতে পারে।

২০। অসৎ সঙ্গ চৌর ঐ ভক্তিধন হরণ করিয়া লয়। তাই বলি, সাবধান! অসৎ সঙ্গ কুবাতাস যাহাতে বেশী গাত্রস্পর্শ না করিতে পারে, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

২১। সাবধান! ব্রহ্মার দুর্লভ ভজন যেন লোকে না জানিতে পারে।

২২। যথার্থ ঠাকুরপূজার কথা বলিলে কত হিংস্র দ্বিপদ পশু পাগল বলিয়া ঠাকুরপূজার পাত্র ফেলিয়া দিয়া সকল কার্য্য নষ্ট করিবে।

২৩। কর্ত্তামাগো, তুমি ভোগের দ্রব্য চৌকি দাও, যেন আত্মীয় আত্ম-ধ্বংসকারী দ্বিপদ পশুতে না ছুঁইয়া ফেলে।

২৪। ভয়ানক কালের গতি হইয়াছে। যদি কেহ পরকালের পথ প্রশস্ত করিতেছেন এমন শুনিতে পান, তবে যদি তাঁহার সদ্‌গুরুর কাছে শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলেই তিনি আনন্দ পাইবেন ; নচেৎ, তাঁহার মনে নূতন তর্কের উদ্ভব হইবে, যেন তিনি কালকে ফাঁকী দিয়া মৌরসী করিতেছেন!

২৫। সর্ব্বদা নিজ আত্মাকে রক্ষা করিবে, কারণ মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অলীক আমার-আমার জ্ঞানে সবাই ভুলিয়া আছে। মায়াদেবীর সংসারে সবই মায়াময় হইয়া রহিয়াছে। তাহার পার হওয়া জীবের সাধ্যাতীত। যাঁহার বহুজন্মের সাধন সম্পত্তি আছে, তিনিই এ জন্মে শ্রীগুরু-কৃপাবলে অনায়াসে অলৌকিক সাধন করিতে পারেন। নচেৎ কার সাধ্য অসাধ্য সাধন করে।

২৬। পেত্নীতে নিজধর্ম করিতে পারিবে না, অপরের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং মনে মনে সেই মোহন-মূরতি গুরু-রাধা-গোবিন্দের পূজা করা ছাড়া অন্য গোল করিয়া লাভ নাই।

পঞ্চম চয়ন

মাতৃ-তত্ত্ব

আপনাদের সেই শ্মশানবাসী কাঙাল, পাগল ছেলে 'মা' কথাটি ভুলিতে না পারিয়া, 'ওমা, মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কী বলিতেছে শ্রবণ করুন :

১। লীলাময়ী, এ ভোজবাজীর লীলা ও লীলা-খেলা তোমারি সৃজিত, মা। ঐ ধাঁধাবাজী দেখিয়া দেখিয়া কতস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই।

২। এক্ষণে ঐ ঋণের দায়ে ও ভবভয়ে ভীত হইয়া, ভবানী, তোমার ঐ অভয় চরণে শরণ লইতেছি।

৩। মা, সৃষ্টিকার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইবে বলিয়া বেদের বিধানের ভিতর অষ্টপাশে জীবকে বন্ধন করিয়াছেন।

৪। মা, সৃষ্টিরক্ষা করিবার জন্য তুমি জীবের চক্ষে ধূলি দিয়া এবং মোহিনী শক্তি বিস্তার পূর্ব্বক পলকে সৃষ্টি লয় ও নূতন সৃজন করিতেছ। কাহার সাধ্য আছে যে গুরু-কৃপা ব্যতীত ঐ অভয় চরণ চিনিয়া ধরে?

৫। কৈ মা, তোমাকে তো এখনও চিনিতে পারিলাম না? তবে কি গতি-দায়িনী মা নানা বার-ব্রত-কর্মে নিযুক্ত করাইয়া সেই পুণ্য ভোগ করাইবার জন্য গতিরোধ করাইবেন?

৬। ওমা, লীলাময়ী, তোমার লীলা খেলা বুঝিতে না পারিয়া যে সমস্ত মনুষ্য অহঙ্কৃতান্তঃকরণে দুর্য্যোধন-বুদ্ধিতে মায়ার সঙ্গে খেলিতে বসে, তাহাদের পরিণামে ভব-যন্ত্রণা লাভের উপায় করা হয়, এবং মায়া-ভোজবাজীতে যাহা দেনা হয়, তাহা পরিশোধের জন্য দ্বীপান্তর হয়।

৭। নানা কর্মফল পুণ্য ভোগ করিতে করিতে হয়তো আবার কর্মদোষ-কুফল উপার্জ্জন হইবে, তখন কোন্ যোনিতে জন্মগ্রহণের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠাইবেন, মা?

৮। মা, জীব তোমাকে না চিনিয়াই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তাই আজ ভাবিতেছি, মা, নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান কী? কেমন করিয়া সে কর্ম করিব? কোন্ পথ দিয়া ত্রিবেণী গঙ্গার জল আনিব? মা, ওমা, আর যেন মতিভ্রম করাইয়া দিও না।

৯। মা, অভয়া, অভয় দাও মা। বড় ভয় হইতেছে। ফুলের বাগানে ফুল তুলিতে যাইতে হইবে। বেলা অনেক হইল—ঠাকুর-পূজার সময় পাছে বহিয়া যায়। এক্ষণে পথ দেখাইয়া দাও, মা, ফুল তুলিতে যাই।

১০। জগৎ জননী! এমন কাহার সাধ্য আছে যে তোমার মায়া ভেদ করিয়া সহসা মায়ার পরপারে গমন করিবে?

১১। মা, তোমার বিনা কৃপাতে কাহার সাধ্য আছে, চিন্ময়-রূপিণী তোমায় চিনিবে? তাই বলিতেছি, কী তপস্যা আছে আমার যে বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ পাইব?

১২। কবে তোমাকে চিনিবার শক্তি দিবেন? আর তোমার দীন সন্তানকে পর করিয়া রাখিবেন না। মা, দীনতারিণী গো, আমি ভাঙা ঘরে ভূতের ভয়ে বেগার খাটিয়া মরিলাম। মাগো, জ্যোতির্ম্ময়ী, জ্যোতিঃ দর্শন করাইয়া এ দেহ পবিত্র করাইয়া দিন, মা।

১৩। মা, আমি মাতৃপূজা জানি না বলিয়া কি তোমার শরণাগত অবোধ সন্তানকে মায়াময় ধাঁধাবাজীর মাঝখানে ছাড়িয়া দিয়া, মা, লীলাময়ী, আনন্দময়ী, তোমারি লীলাখেলা তুমিই দেখিতেছ, মা?

১৪। আমাকে ভবের গাছে জুড়িয়া দিয়া আর পাক দিও না, মা। চক্ষের ঠুলি খুলিয়া দাও, মা। আর মাকাল ফল দেখাইয়া ভুলাইয়া চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করাইও না। তোমার শরণাগত অবোধ সন্তানকে বাঁচাও, মা।

১৫। ওমা, দীনতারিণী গো, তোমার দীন সন্তানকে কৃপা বিন্দুদান করিতে কাতর হইও না মা। এই মায়াময় পরীক্ষা-ক্ষেত্রে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হারাইয়া 'এ আমার, ও আমার' করিয়া, মা ব্রহ্মময়ী, সত্য-সনাতনী, তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে ভুলিয়া যাই।

১৬। পরের ভাবনা ভাবিতে দিও না, মা। পরকে আপন করিতে গিয়া ঐ যুগল চরণ খুঁজিলাম না, একদিনও পূজা করিলাম না।

১৭। মাগো, এই মায়াময় সংসারে আর কতকাল অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করাইবেন? 'আমার-আমার'-ভ্রমে আত্মীয়-হার গলায় পরাইয়া দিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ভবের হাটে ভূত সাজাইয়া রাখিবেন? এই হার সর্ব্ব কার্য্য পণ্ড করিবার জন্য। ছিঁড়িতে পারা যায় না, আবার দেখিতেও পাওয়া যায় না—মায়াদেবী মোহ-সূত্র দিয়া কী-প্রকারে গ্রথিত করিয়াছেন। এদিকে ত্রিতাপ সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত করিতেছে—তাহা অনুভব হইতেছে। অথচ, কী

আশ্চর্য্য মায়াদেবীর লীলা-খেলা, মনে ভাবিতেছি কত সুখে আছি! আনন্দময়কে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া বাসনা-বাতিক লইয়া আছি। ধিক্, সহস্র ধিক্ আমার মনুষ্য নাম-ধারণে।

১৮। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া কেমন করিয়া সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণীর সাধন করিবার নিয়ম বর্ণনা করিতে পারি? তবে পতিত পাবন, অধম-তারণ, ভবপারের কাণ্ডারী, শিক্ষা গুরু প্রভু যাহা বলিয়াছেন ও শিখাইয়াছেন, তাহাই আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম।

১৯। সদ্‌গুরু অভাবে ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া বংশ রক্ষা করিলে ব্রহ্মময়ীর অভয়পদে পূজা-ধ্যানাদি দ্বারা তাঁহার দর্শনলাভে বঞ্চিত হইতে হয়।

২০। প্রথমে মন্ত্রাশ্রয়। তারপর আত্মতত্ত্ব জ্ঞান জন্মাইলে তাহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করেন। তারপর, বিশ্বাসের সহিত গুরু-তত্ত্ব উপাসনায় যদি আপনার কৃপা-লাভ করিতে পারে, তখন আপনার নামামৃত দীন সন্তানকে অর্পণ করিয়া তাহাকে ভীষণ ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন। ইহাতে ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ হয়, এবং জিহ্বোপস্থও বশ হয়।

২১। সদ্‌গুরুর শান্তিময় যুগল চরণ-কমলে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই, আপনার কৃপাবিন্দু প্রাপ্ত হইয়া সেই দুষ্প্রাপ্য সদ্‌গুরুর চরণ তরণীতে দুস্তর ভবনদী গোষ্পদের ন্যায় পার হইয়া যাইবে।

২২। ওমা, বলুন, কেমন করিয়া কোন্‌স্থানে সারাৎসার সম্পত্তি রাখিতে হয়। আপনার শ্রীচরণাশ্রয় বিনা এই অকৃতী, অভাজন সন্তানের আর অন্য উপায় নাই। কোথায় মা ব্রহ্মময়ী রাধারাণী, রক্ষা করুন।

২৩। মাগো, আপনাকে প্রাণপণে খুঁজিয়া, চিরশান্তিময় পথে যাইবার জন্য এই শ্রীচরণাশ্রিত সন্তানকে একাকী নির্জ্জন ঘরে বসিয়া, শ্রীশ্রীগুরু রাধাগোবিন্দের যুগল চরণ ধ্যান করিয়া, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নামামৃত পান করিতে বলিতেছেন।

২৪। মাগো, ব্রহ্মময়ী, তোমার এ সন্তান তোমার কৃপামৃত সঞ্জীবনীরস বিশ্বাসের সহিত লইয়া এ ভগ্নপাত্রে কোথায় রাখিবে, মা?

২৫। সে-চক্ষু কৈ আছে, যে শুভঙ্করী মা রাধারাণীকে জনসমাজে খুঁজিয়া পাইব?

২৬। ওমা, দীনতারিণী, একবার দীনের চক্ষুর ছানি তুলিয়া দাও, মা,— একটি বার মনের সাধে ঐ অভয় চরণ দর্শন করি।

২৭। চক্ষের ছানি তুলিয়া দাও, মা। ভালরূপে দর্শন করিয়া দশ-দশার হাত হইতে নিস্তার পাই।

২৮। পতিতপাবনী, পতিত সন্তানের উদ্ধারের জন্য ছদ্মবেশী দেবী মূর্ত্তিতে মায়িক সংসারে 'মা' সাজিয়া 'আমার-আমার' করিয়া আপনি কাঁদিয়া ত্রিসংসারকে কাঁদাইতেছেন।

২৯। এদিকে বেলা যাইতেছে। আপনি জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে প্রতি গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন—তাহা কি এই নরাধম সন্তান চিনিতে পারিতেছে?

৩০। মা, তুমি তো প্রতি ঘরে ঘরে জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে বিরাজ করিতেছ ও পুত্রবৎ বাৎসল্যস্নেহ প্রদর্শন করিতেছ। নহিলে, কে এ হতভাগ্য সন্তানকে ক্ষুধার সময়ে দুগ্ধ, ঘাস ও বিচুটি পাতা খাইতে দেন? জগৎজননী, তুমিই সত্য!

৩১। ভক্তি-যোগে শক্তিময়ী মা যেন সুধা বর্ষণ করিতেছেন, লইতে জানিলাম কৈ? কাষ্ঠের পুত্তলিকা পাইলেই সাধের খেলা খেলিতে বসি, এদিকে অমূল্য সময় চলিয়া যাইতেছে।

৩২। করুণাময়ী! তোমার অপার পরমানন্দবর্দ্ধনকারী নামামৃত কবে পান করিয়া দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জগতে মাতৃরূপ দর্শন করিয়া শত্রু-মিত্র সমভাবে দেখিব?

৩৩। এই প্রার্থনা, যেন চতুর্দ্দিকে তোমার যুগল চরণ, আর ঐ ত্রিভুবন বিজয়ীরূপ দর্শন পাই—কখনও ভ্রমান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রূপান্তর দর্শন না হয়।

৩৪। ওমা, জগৎজননী! এ পঞ্চতত্ত্বসমষ্টি—সমস্তই তোমার সৃষ্টি, সেইজন্য তোমার নাম 'জগৎ জননী'। ওমা, লীলাময়ী! কোন্ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র তোমার লীলার স্থান? কোথায় তোমার ব্রজধাম?

৩৫। স্বদেশে যাইবার জন্য মা কৃপা-বারি বিতরণে সাধের ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া বলিতেছেন, "ওরে মূঢ়, অজ্ঞান সন্তান, একবার চক্ষের নিকটে দেখ, তোর গুরু-মূর্ত্তি আমি।"

৩৬। মহেশ্বর 'সিদ্ধি' পান করিয়াছিলেন, সোনার কৈলাস ত্যাগ

করিয়াছিলেন কেন?—ভব-ভয়-নিস্তারিণী, কাল-ভয়-নাশিনী আদ্যাশক্তিকে ভাবিবার জন্য।

৩৭। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে কুল-কুণ্ডলিনী মা মহারাণী জাগিয়া যত্নের সহিত বাৎসল্য স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলিবেন, "কেন বৎস, ডাকছ? শীঘ্র আমার নিকটে এসো। এতদিন অলীক মায়াজালে জড়িত হয়ে, অনিত্য আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের সহিত কাল কাটিয়ে এখন বুঝি পূর্ব্বকর্মফলে সৎগুরু প্রাপ্ত হয়ে তাঁর কৃপায় মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে? মায়াজাল ছিন্ন ক'রে আমাকে ডেকে চরণধূলিস্বরূপ পরমামৃত ভিক্ষা করছ?"

ষষ্ঠ চয়ন

কৃষ্ণ-প্রেম

১। অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে প্রেমের পথে যায়।

২। ভাই, বন্ধু, দারা, সুত—পৃথক করিয়া লেখ,
পিরীতি করিলে তাহারে পাইবে, মনেতে ভাবিয়া দেখ।

৩। সবাই বলে পিরীত কর—
পিরীত কি হয় মুখের কথায় আপনি না হ'লে দৃঢ়?

৪। যদি হয় জীয়ন্তে মরা—
অনুরাগ বিহনে সে-মানুষ যায় না ধরা।

৫। দুঃখের সময়েও সুখানুভব হইবে।

সপ্তম চয়ন

ভগবৎস্বরূপ

১। যে-ভাবে যে আমায় ডাকে, সেই মূরতি দেখাই তাকে।

২। আমি তোমার গুহাবাসী অবোধ সন্তান—তোমারি আছি।

৩। কে তোমার আপন?—আমিই তোমার পাতালবাসী পাগল ছেলে।

৪। দেখা যদি দিইগো তোরে, রইতে আর নারবি ঘরে,—
তখন বেড়াবি নগরে নগরে ব'লে নরহরি।

৫। আমার মত হরি-ধ্বনি করতে শক্তি আছে কার?
আমি, হরি হয়ে করি হরি-ধ্বনি ভক্তভাবে অবতার।

উপসংহার

প্রভু নরহরি যে অত্যাশ্চর্য্যরূপে তাঁর বাণীরত্নরাজি সংগ্রহণও ধর্মসাধনার ক্রমবিন্যাসে সজ্জিত করিয়েছেন, সেটি তাঁর অলৌকিক লীলারই একটি অংশ বলা যেতে পারে। সংসারী ও সন্ন্যাসী—ধর্মসাধনেচ্ছু সকল স্তরের ব্যক্তিই এই বাণীগুলি শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করলে নিঃসন্দেহে উৎসাহিত ও উপকৃত হবেন। পরন্তু, স্তরভেদে প্রত্যেক সাধক এই বাণীরত্নরাজির অন্তর্নিহিত অর্থ অবগত হয়ে সাধনে উপজাত সংশয় ছিন্ন ও বিঘ্ন বিপদ অতিক্রান্ত হ'তে পারবেন। কারণ, একমাত্র সাধকগণই ধর্মসাধনপন্থার কঠিন ও কঠোর পরিবেশ, পথের দুর্গমতা ও বাধাবিঘ্নগুলি সাক্ষাৎভাবে অনুভব করবেন। পাতাল-প্রভুর সাধন-পথে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ঐ বাণীরত্নের উজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকা তাঁদের সাধনমার্গের নির্ভুল ও সত্য পথপ্রদর্শকরূপে প্রতিভাত হবে।

বাণীগুলির প্রত্যেকটিই শাস্ত্রসমর্থিত ; তথাপি এই ব্যর্থহীন, সুস্পষ্ট সাধন-সহায়ক আলোক-নির্দ্দেশকের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ, নানাশাস্ত্রের অসংখ্য সিদ্ধান্তরূপ ঘন অরণ্যে যে সকল পরস্পর-বিরোধী উক্তি বিদ্যমান, তারা এরূপ জটিল ও কুটিল জটাজাল সৃষ্টি করেছে যে, সাধকগণ সে সব পাঠ ক'রে বিভ্রান্ত হ'তে বাধ্য। তাই "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্" এবং "মহজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই তত্ত্ব অবগত হয়ে, প্রকৃত সাধক যে গুহা-বাসী এই মহাজনের সাধনায় নি ত পন্থা অবলম্বন করতে আগ্রহী হবেন এবং নিবিড় শাস্ত্রারণ্যের ঘনান্ধকার, দুর্গম পরিবেশে আলোকোজ্জ্বল সহজ সুন্দর পথ দর্শনে কৃতার্থ হবেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে পাতাল-প্রভুর সাধন, আচরণ, সঙ্গীত ও বাক্য সবই ধর্ম-শাস্ত্র-সমর্থিত। মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকে যে আদেশ করেছেন—"সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন।"—চৈঃচঃ ২।২৪, তদনুযায়ী পাতাল-প্রভুর সঙ্গীত-সুধা-সংগ্রহের গুরু-কৃপা-দীপিকা-টীকায় সে সকল শাস্ত্র-সমর্থন স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর সঙ্গীত ও বাণী একই ভাব-ধারায় প্রবাহিত—তাই পৃথকভাবে বাণীর আর টীকা লিখিত হ'ল না কেবলমাত্র কয়েকস্থানে কিছু কিছু শব্দের অর্থ স্পষ্টীকৃত করার প্রয়াস করা হ'ল।

১ম চয়ন

১। সাধের সংসার—এই সংসার আমাদের সাধের, অর্থাৎ নিজ বাসনা অনুযায়ী কর্মফলের রূপায়ন।

২। গঙ্গার জল—বাইরের জগতে গঙ্গার জল পরম পবিত্র—স্পর্শমাত্র অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র করে। তেমনি দেহমধ্যে এক অতি বিশুদ্ধ অমৃত ধারা

প্রবাহিত আছে, যার সংস্পর্শে সাধকের সব মায়া-মলিনতা বা অজ্ঞানান্ধকার অপগত হয়। সেই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "গোবিন্দ-পাদপদ্মাসব" রূপ গঙ্গা দেহেই বর্ত্তমান, গুরু-মুখে যোগ্য শিষ্য সাধক সেই গঙ্গা-আনয়ন-সাধন শ্রবণ করবেন।

সংসার-গারদবাসী আসামী—প্রত্যেক সংসারীই নিজ অণু-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারের ফলে ভগবৎ-সেবা ছেড়ে আত্ম ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন হ'য়ে অপরাধ করে এবং "সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।"—চৈঃ চঃ।

১২। ধোঁকার টাটি—মায়া-কানন।

১৪। প্রস্তর—কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠারূপ আত্ম ইন্দ্রিয় সুখের উপকরণ সমূহ।

২য় চয়ন

১। পিতামাতা ইত্যাদি—যে কূলে একজন কৃষ্ণভক্ত হন, সেই কূলের পূর্ব্বপুরুষগণও মুক্ত হয়ে যান—"নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ম্"—পদ্মপুরাণ।

২। অপমৃত্যু—শ্রীমদ্ভাগবত কথিত "আত্মহা"—১১।২০।১৭।

৪। গৌরাঙ্গরূপে……দান করিতেছেন—ক্রিয়ার 'বর্ত্তমান' কাল লক্ষ্যণীয়। কৃপা-ধন্য ভক্তই এর প্রকৃত অর্থ অবগত হবেন।

৬। স্বদেশে—জীবের স্বরূপে ভগবদ্ধামে।

৩য় চয়ন (ক)

২। মাতৃদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী—আত্ম ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সকল কর্ম্মই বন্ধনকারী। নিজে মায়ামুক্ত হয়ে ভগবৎ সেবালাভ হ'লে নিজ কুলও উদ্ধার হয়; পিতামাতা উদ্ধারের সেই একমাত্র পন্থা। অন্য সব কর্ম্মই তাঁদের ভব-বন্ধনকারী।

৩। জাগ্রতাবস্থায় মোহনিদ্রা—মানুষ জাগ্রত অবস্থায় নিজ স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করতঃ আত্ম ইন্দ্রিয় সুখ কর্মে লিপ্ত থাকে। এই সব কর্ম্মই তাকে মায়ার বন্ধনে বদ্ধ করে। সুতরাং সব আত্ম ইন্দ্রিয় সুখকর্ম্মই মোহজ।

বন্ধু সাজিয়া—আত্ম ইন্দ্রিয় সুখলালসায় মোহগ্রস্ত হয়ে প্রকৃত শত্রু ষড়রিপুকে বন্ধু ব'লে ভ্রম হয়।

১৭। বাটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে—অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে গুরু-সেবারূপ সাধন না করলে।

২০। আপনার কৃপাবিন্দু—অর্থাৎ মায়াদেবীর কৃপা।

২২। মরণের ভয়—জীবন-মরণের আবর্ত্ত।

৩য় চয়ন (খ)

১। আকুমার বৈরাগ্য—ছয় গোস্বামী আচরিত ব্রজ-উপাসনা পথ।

৪। তানপুরার সুর—ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরে তার বিক্রিয়া হবে; বালকের মত মধুর স্বর আর থাকবে না, রইবে না বালক-ভাবও।

১০। বিনা পরীক্ষায়—মহাপ্রভু সনাতনকে বলেছেন, "দোঁহার পরীক্ষণ" —চৈঃ চঃ ২।২৪। গুরু ও শিষ্য উভয়ে উভয়কে পরীক্ষা করবেন।

৪র্থ চয়ন (ক)

৪। আত্মঘাতী প্রবৃত্তি—ভাগবতোক্ত "খণ্ডিতাত্মা মূঢ়" যে "পতঙ্গবৎ নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ"।

৪র্থ চয়ন (খ)

৭। ফুলের বাগান—দেহমধ্যে পূজার উপকরণ, গুরুমুখে শ্রোতব্য।

৪র্থ চয়ন (চ)

৭। Total—"মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ"—ভক্তি-প্রবাহ গঙ্গাজলধারার মত অবিচ্ছিন্না হবে, বিন্দুমাত্র ছেদ বা dis-continuity থাকতে পারবে না, অর্থাৎ অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করতে হবে।

১০। আত্মগুরু হৃদয়ে—আত্ম ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ ক'রে নিঃস্বার্থভাবে সাধককে গুরুজ্ঞানে তাঁর হৃদয়ে আত্মহৃদয়স্থ সকল স্নেহ করুণা বিতরণ করবেন। সাধককে সর্ব্বভাবে পতন থেকে রক্ষা করাই তাঁর লক্ষ্য, নিজ সুখ-সাধন নয়। যুগল সাধনের ইঙ্গিত রয়েছে; কৃপাধন্য সাধকগণই এর গূঢ়তত্ত্ব অবগত হবেন।

১১। খুন—অর্থাৎ পতন। গুরুমুখে এ সাধন শ্রোতব্য।

১৩। শ্রীশ্রীচৈতন্য—অন্তঃস্থিত শ্রীচৈতন্যদেবকে জাগ্রত করতে হবে।

সিদ্ধ-সাধন—যে-সাধনে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত।

১৪। দ্বিদল—আজ্ঞা-চক্র, যোগমার্গোক্ত সাধনের ইঙ্গিত।

১৫। পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ, সপ্তসমুদ্র, তিন অমৃত—সব দেহমধ্যেই বিদ্যমান। কৃপা-ধন্য সাধক যথাসময়ে গুরুনির্দ্দেশে সাধন করবেন।

১৭। স্বভাব-সিদ্ধ—অর্থাৎ এই সাধনে সিদ্ধিলাভ হ'লে।

৪র্থ চয়ন (ছ)

২। ভয় আছে—অর্থাৎ, সাধনে বিঘ্ন আসবেই,সে সময় গুরুস্মরণ একান্ত কর্ত্তব্য।

১৩। নিত্য-চৈতন্য—দেহমধ্যে বর্ত্তমান; গুরু-উপদেশ অনুসারে সাধন করতে হবে।

২৩। ভোগের দ্রব্য—"নারীর যৌবনধন যারে কৃষ্ণ করে মন"—চৈঃ চঃ।

২৪। নূতন তর্কের—ভাগবতোক্ত "যচ্ছক্তয়ো বাদিনাং বিবাদসংবাদ ভুবো-ভবন্তি"—৬।৭।৩১, অর্থাৎ, যাঁহার মায়াশক্তি তর্কনিষ্ঠগণের বিবাদ সংবাদের হেতু ও মোহের কারণ।

২৬। পেত্নী—আত্ম ইন্দ্রিয় সুখী।

৫ম চয়ন

৫। বেদের বিধান, বার-ব্রত-কর্ম—"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম"—চৈঃ চঃ।

৮। নিত্যকর্ম—যে সাধনে নিত্যধনকে পাওয়া যায়।

ত্রিবেণী গঙ্গার জল—তিন অমৃত।

১২। জ্যোতিঃ দর্শন—"প্রেমানন্দমহানন্দরসেনাবস্থিতং হি যং, জ্যোতী-রূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম্"—ব্রহ্মসংহিতা—২।

২২, ২৪। কোন্‌স্থানে, ভগ্নপাত্রে—ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর দেহ; এই ভাঙ্গা ঘরে কোথায় তাঁকে এনে বসাব? ভগবৎ-আসন রচনা করতে হবে এমন স্থানে যেখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজ করতে পারবেন। গুরু সেই স্থানের সন্ধান জানাবেন—"কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকং, ষড়ঙ্গ-ষটপদী-স্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।"—ব্রহ্মসংহিতা—১।

২৮। মা সাজিয়া—বিশ্বজননী এখানে দু'প্রকারের লীলা করছেন, প্রথমে প্রতি পিতামাতার হৃদয়ে সন্তান-স্নেহ সঞ্চার করিয়ে, জীবের আত্ম-সুখকামনা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করার চেষ্টা করছেন। এটি বিশ্বজননীর বাৎসল্য রসসমুদ্রের বিন্দুমাত্র জীব-হৃদয়ে আরোপ মাত্র। জীবকে শিক্ষা ও জ্ঞান দিবার জন্য জগৎজননীর এটি করুণাঘন কল্যাণময় রূপ। অপরদিকে, প্রাকৃত পিতামাতা সেজে সন্তানকে 'আমার আমার' এই মিথ্যা মায়ায় আবদ্ধ ক'রে তার স্বরূপ জ্ঞান আবরণ করছেন—এটি তাঁর আবরণাত্মিকা শক্তি। কিন্তু এই আবরণরূপ অন্ধকারের মধ্যেও তাঁর নিজ মাতৃস্বরূপের সন্তান-স্নেহের বিদ্যুৎচমক বর্ত্তমান। এই বিদ্যুৎ-চমকই সাধককে সত্য জ্ঞান দিয়ে মায়ামুক্তির পথে নিয়ে যাবে।

২৯। প্রতি গৃহে গৃহে—প্রতি জননীর সন্তানস্নেহে জগজ্জননীর বাৎসল্য রসের স্পর্শ।

৩১। ভক্তি যোগে—"ভক্তি-যোগ-পরিভাবিত হৃৎসরোজে" শুদ্ধসত্ত্ব বিকিরণরূপে জগজ্জননীর স্নেহসুধাবর্ষণের সাক্ষাৎস্পর্শ অনুভূতি হয় ও সেই সুধাস্পর্শে চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বময় হয়ে ওঠে।

৩২। পরমানন্দবর্দ্ধনকারী—এই শুদ্ধসত্ত্ব চিন্ময়শক্তির বিকিরণ; স্বরূপে ইনি হ্লাদিনী-সার, তাই পরমানন্দবর্দ্ধনকারী; সংবিৎময়ী, তাই দিব্যজ্ঞান প্রদানকারী। এই জ্ঞান লাভ হ'লে জগৎ মাতৃময়—এই সত্য দর্শন হবে।

৩৪। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র—প্রতি জীবকে তার স্ব স্ব কর্মফল ভোগ করাবার জন্য শক্তিময়ী বিশ্বজননীই মায়িক পঞ্চভূত সমষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকটিত হয়েছেন। কিন্তু এ তো জীবকে দণ্ড দিবার জন্য তাঁর কঠোর বহির্জগতের লীলা। এ ছাড়াও তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ ও মাধুর্য্যময়ী নিত্য-লীলা আছে নিত্যধামে। সাধক এ তত্ত্ব অবগত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডন্তর্গত মা-কে প্রশ্ন করছেন, কোন্ পুরুষোত্তমের ক্ষেত্রে, কোন্ নিত্যধামে, কোন্ ব্রজলোকে পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সাথে আপনার সেই নিত্যলীলা? সেখানে আমায় নিয়ে চলুন, মা।

৩৫। গুরু-মূর্ত্তি আমি—ভগবৎ-শক্তিই গুরু-শক্তিরূপে সিদ্ধগুরুর অন্তরে অধিষ্ঠিত হন। সেই গুরু-শক্তির কৃপায় সাধকের মায়া-মোহ অপগত হ'লে

তার শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলচিত্ত শুদ্ধসত্ত্বময়ী গুরুশক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্তের স্বতঃপ্রকাশমান আলোকে শক্তিময়ী মাকে সর্ব্বত্র গুরু-মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত দেখতে পাওয়া যায়। এ দর্শন যখন তখন, যার তার হয় না।

৩৬। 'সিদ্ধি' পান—অর্থাৎ মায়ামুক্ত অবস্থা। মহেশ্বর স্বরূপতঃ মায়ামুক্ত হয়েও মায়াদেবীকে অঙ্গীকার ক'রে তাঁর সাহায্যে সংহারলীলা করেন। মায়াশক্তি শ্রীভগবানেরই শক্তি। তাঁর ভব-বন্ধন ও মোচন করবার ক্ষমতা রয়েছে। মহেশ্বর সেই মহামায়ার মহিমা ও লীলা অবগত হবার জন্য, বিষয়-সুখ পরিত্যাগ ক'রে, মায়াদেবীর লীলাস্থল মহাশ্মশানভূমিতে তাঁর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন। এইভাবে তিনি সিদ্ধ সাধকের আদর্শ স্থাপন করেছেন। শক্তিময়ীর আরাধনা ক'রে তাঁর কৃপা না পেলে শক্তিমান্ শ্রীভগবানের পূর্ণ অনুভূতি হ'তে পারে না—এই তত্ত্বও তিনি বুঝতে চেয়েছেন। নারদপঞ্চরাত্র বলছেন, "যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ, মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা" এবং "অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ", কিন্তু "জ্ঞায়তে অত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।"

৩৭। কুল-কুণ্ডলিনী—সেই শক্তিময়ী মায়ের কথাই বলছেন, প্রত্যেকের দেহে মূলাধারে যিনি 'সার্দ্ধ ত্রিবলী আকারে সুষুপ্তা' রয়েছেন। গুরূপদেশ মত সাধনে মায়ামুক্ত হ'লে তাঁর দর্শন ও অনুভূতি হয় সাধকের।

৬ষ্ঠ চয়ন

কৃষ্ণ-প্রেমের মহিমার কথা প্রভুর সঙ্গীত-সুধায় বহু স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বাণী-পঞ্চকে এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সুন্দরভাবে প্রকাশিত। প্রথমে, সাধুসঙ্গরূপ সাধন দ্বারা সকলরূপ 'ভুক্তি-স্পৃহা' বা 'অনর্থে'র সম্পূর্ণ নিবৃত্তি প্রয়োজন; দ্বিতীয়তঃ, লৌকিক বা সাংসারিক প্রীতি হ'তে এ প্রীতি সম্পূর্ণরূপে পৃথক; তৃতীয়তঃ, এ প্রীতি অর্জ্জন করতে হ'লে সাধককে আত্মতত্ত্ব সাধন ক'রে নিজে দৃঢ়তা, অর্থাৎ স্থির-রতি বা অটুট ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করতে হবে; চতুর্থতঃ, যে "প্রণয়-রসনা" দ্বারা সেই অধর চাঁদকে "ধৃত" করা যাবে, সেই প্রেম-সাধনে সাধককে জীয়ন্তে-মরা, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কামী ও নির্ব্বিকারী হ'তে হবে। পঞ্চমতঃ, এ কৃষ্ণ-প্রেমের একটি লক্ষণ এই যে

"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজতে"—ভ. র. সি. অর্থাৎ, অতিশয় দুঃখও চিত্তে সুখ ব'লে অনুভূত হয়।

৭ম চয়ন

ভগবৎ-স্বরূপ বাণী-পঞ্চকের প্রথমটি তাঁর শ্রীকণ্ঠে গীত, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি শ্রীহস্ত-লিখিত, চতুর্থ ও পঞ্চমটি—প্রাচীনা অন্তরঙ্গা শিষ্যা সনাতনী মায়ের কাছে প্রভুকর্তৃক আবির্ভাব-স্বরূপে গীত। একমাত্র তাঁর কৃপা-ধন্য ভক্ত সাধকই এই মহাবাণী পঞ্চকে তাঁর স্বরূপ অনুভব করবেন, অলমতি বিস্তারেণ।

মূল লীলাকথার ১৩৪৩ সাল ২৩শে পৌষের ঘটনায় বিবৃত করা হয়েছে কীভাবে প্রভু নরহরি স্বয়ং এই শ্রীচরণাশ্রিত দাসের মানস রাজ্যে প্রবেশ ক'রে তাঁর অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে "ভজ-নরহরি" পয়ারের অচিন্তনীয় ও অদ্ভুত ব্যাখ্যা স্ফুরিত করেন। ব্যাখ্যাটি তিনি ভক্তগণসহ শ্রবণ করার পর শ্রীমুখে মন্তব্য করেছিলেন, "গুরুদেব ওর অন্তরে উদিত হয়ে এই ব্যাখ্যা স্ফুরণ করেছেন।" মূল ব্যাখ্যাটি এখানে লিখিত হ'ল।

ভজ নরহরি প্রাণারাম,
জপ নরহরি রাধাশ্যাম।
এই পয়ার হয় কলির তারক-ব্রহ্ম-নাম—
গাহ সদা, কহ সদা, জপ অবিরাম।
শ্রীগুরু শ্রীনরহরি স্বয়ং শ্রীমুখে
প্রেমাশ্রু-বিভোর হ'য়ে সদা গান সুখে।
সন্দিগ্ধ চিত্তেতে মোর জাগিল সংশয়,
অর্থবাদ করি, যাতে অপরাধ হয়।
প্রমাদ দেখিয়া গুরু করুণা-সাগর
প্রকাশ করেন কিছু অন্তর ভিতর।
তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২।৮)
"অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে,
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে"
মহাশক্তিশালী নাম যেন চিন্তামণি,
জীব নিস্তারিতে গান শ্রীগুরু আপনি।

ভাব-সূত্রে শব্দরত্নে সযত্নে গ্রথিত,
গুরু-কৃপা-আলোকেতে অর্থ প্রকাশিত।
এক এক শব্দ যেন চিন্তামণি সম,
গুরু-কৃপায় ঝলমলে অর্থ অনুপম।
শ্রীযুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণ-উপাসনাময়
জীবের নিস্তারহেতু হইল উদয়।
এই পয়ার-অর্থ আমি কিছু নাহি জানি,
পাই নাই বিচারিয়া শাস্ত্রেতে সন্ধানি'।
বিজ্ঞমুখে শুনি নাই' কহে নাই কেহ,
ঘুচে নাই অন্তরের এ ঘোর সন্দেহ।
শুনি নাই কোথা কভু, বুঝি নাই যাহা,
স্বয়ং না জানালে প্রভু কে জানিবে তাহা?
বিনিদ্র নিস্তব্ধ এক গাঢ় নিশিযোগে,
আবির্ভবি' চিত্তে মম প্রভু আত্মযোগে,
তড়িৎ-ঝলকসম মম চিত্তলোকে
স্বনামার্থ প্রকাশেন অপূর্ব্ব আলোকে।
আঁধার হৃদয়ে যাহা দেখিনি কখনো,
করুণা-কিরণে তার পাইনু দর্শন।
এই অর্থে কিছু মোর নাহি আত্মকৃত,—
যাঁর নাম, তাঁরি ব্যাখ্যা, তাঁরি লীলামৃত।
প্রভুকৃত এই ব্যাখ্যা হ'লে সমাপন,
প্রাতে উঠি' লিখিবারে করিনু যতন।
পরদিন যাই যবে প্রভু দরশনে,
এই ব্যাখ্যা নিবেদন করিনু চরণে।
ভক্ত এক প্রভু অগ্রে করেন পঠন,
সমাহিত হয়ে সবে করেন শ্রবণ।
পঠনান্তে মধু-স্বরে কহিলেন প্রভু,
"গুরু-কৃপা বিনা এই অর্থ নহে কভু।"

কত অর্থ ধরে ইহা না হয় ধারণা ;
কৃপা করি' মুক্তি কীটে দেখাইলেন কণা ।
স্বনাম-মহিমা, শিষ্য-অপরাধ-ক্ষালন,
এক লীলায় করেন প্রভু দু'কার্য্য সাধন ।
কহিলেন, 'দেখ চাহি' দিই চক্ষু-দান,
গুরু-কৃপায় হোক তব গূঢ় অর্থ জ্ঞান ।
এ পয়ারে শব্দার্থ শব্দের বিন্যাস,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করে ভিন্নার্থ প্রকাশ ।
প্রথমেই কহিতেছে, ওহে মূঢ় নর !
ভজ হরি—প্রাণারাম পাইবে সত্বর ।
কী কর, কী কর মন আসিয়া বিদেশে !
রিপুরা ঘুরায়ে মারে ধরি' তব কেশে ।
তিল মাত্র শান্তি নাহি, সদা রহে ভয়,
কখন শমন আসি' গ্রাসিবে নিশ্চয় ।
ভবরূপ বিদেশেতে নাহি শান্তি লেশ,
শ্রীহরি ভজিলে তবে মিলিবে স্বদেশ ।
তাই কহি, ভজ হরি, পাবে প্রাণারাম,
প্রাণের আরাম হ'লে যাবে নিত্যধাম ।
এই বাক্যে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ হয়,
ভজিব যাহারে তার কী-বা পরিচয় ?
কেবা হরি, ভজি কারে, কেমনে জানিব,
কীবা রূপ কোথা বাস, কীরূপে চিনিব ?
তাই কহি, ভজ 'নর', অন্য কারে নয় ;
মানুষ হইয়া ভজ 'মানুষ' নিশ্চয় ।
দেবতা বিগ্রহ-আদি সর্ব্ব ত্যাগ করি,
ধরিতে পারিবে যারে ভজ তারে ধরি' ।
অনুমানে কভু তাঁর ভজন না হয়,
সাক্ষাৎ-সেবন—এই সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (২।২২।১৮)
"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন,
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ"।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।২।২২ শ্লোকের টীকায়
"সাক্ষাত্তদ্ভজনমেব কর্ত্তব্যত্বেন প্রবর্ত্তয়তি।"
ধ্যানে-জ্ঞানে যোগে-যাগে ধরা নাহি যায়,
চোখের সামনে মানুষ নাচিয়া বেড়ায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১২।১২)

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা,
নচ্ছন্দসা, নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।"

সবার উপরে সত্য—কহে মহাজন ;
মানুষ ছাড়িয়া কোথা পাইবে সে জন ?

শ্রীচণ্ডীদাসে

"......শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"
অসংখ্য মানুষ জাতি না হয় গণন,
তার মধ্যে কোন্ মানুষ করি আরাধন ?
সেই হেতু কহি—ওহে ভজ নিষ্ঠা করি,
ই ভব মাঝে যিনি—নর রূপে হরি।
মানুষ চিনিয়া লহ, কহে চণ্ডীদাস,
কোটিতে মিলিলে এক হও তাঁর দাস।
নর-দেহ ধরিয়াও যিনি নারায়ণ,
সর্ব্ব সঁপি' কর তাঁর সাক্ষাৎ-সেবন।
কেমন লক্ষণ তাঁর কিবা পরিচয় ?
—প্রাণের আরাম তাঁর দর্শনেতে হয়।
যাঁর দরশনে হয় তাপ-বিমোচন,
প্রাণানন্দকরী, সেই নর-নারায়ণ।

পুনরপি লক্ষণ এক কহিছে বেকত,
প্রাণেতে রমণ তিনি করেন সতত।
প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান—
এই পঞ্চ বায়ুতে তাঁর সর্ব্ব সমাধান।
বাহিরের ভোগ্য বস্তু সর্ব্ব পরিহরি,
পঞ্চপ্রাণে সমাহিত সদা নর-হরি!
দ্বিতীয় চরণে আছে গূঢ় পরিচয়—
অন্তরঙ্গ ভক্ত যেই স্বরূপ জানয়।
কাহারে হৃদয়ে ধরি' করিব আপন?
'নরহরি' যিনি, তাঁরে ভাব সর্ব্বক্ষণ।
নিজের নরত্ব যিনি করেন হরণ,
'নরহরি' বলি' তাঁরে জানে ভক্তজন।
নরত্ব কেমনে হরে?—এই প্রশ্ন হয়,
নারীর মাধুর্য্য দ্বারা পুরুষ মোহয়।
নিজ অন্তঃস্থিতা নারী করি' জাগরণ,
বহিঃপুরুষত্ব তাঁর করেন স্তম্ভন।
বাহিরে পুরুষাকার, অন্তরে প্রকৃতি—
ভজনের ধন বলি' জান তাঁরে নিতি।
অন্তরে প্রকৃতিভাব করিয়া সাধন,
যুগল মধুর রস করেন আস্বাদন।

তথাপি শ্রীরূপগোস্বামীস্তবমালায়াম্

"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য রসস্তোমংহৃত্বা"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।৪)

"শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে,
বিজাতীয়ভাবে নহে তাহা আস্বাদনে।
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন,
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন।"

অন্তরে পুরুষভাব না রহে তাঁহার,—
শিশুসম সমভাব সদা নির্ব্বিকার।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (৩।৫)
"নির্ব্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠপাষাণসম"
অতএব নররূপে যিনি হন নারী,
পুরুষ-অভিমান-হীন অখণ্ড ব্রহ্মচারী।
খণ্ড হইলে প্রকৃতিত্ব সিদ্ধ কভু নয়,
সকল শাস্ত্রতে এই মর্ম অর্থ কয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৩১।৩৪
"—খণ্ডিতাত্মস্বসাধুযু সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ"
এমন দুর্লভ ধন চিনিব কেমনে?
—বস্তুরে চিনিয়া লবে বস্তু পরীক্ষণে।
কী-পরীক্ষা করি' সেই জানিব রতন?
— চুম্বকে যেমন করে লৌহ-পরীক্ষণ,
নারী সদা পুরুষেরে করে আকর্ষণ,
চিরকাল এ নিয়ম দেখি সর্ব্বক্ষণ।
নিজ পুরুষ-অভিমান হইলে হরণ,
নারী আর তাঁরে নাহি করে আকর্ষণ।
নারীর নিকটে নারী যেমন নির্ব্বিকার,
নর হয়ে নারী হ'লে হয় এ প্রকার।
যেমতি মায়ের কোলে সুখে শিশু রয়,
নর হয়ে নারী—যার এই পরিচয়।
নররূপে নারী যিনি, তিনি পরতত্ত্ব—
বেদে না কহিতে পারে, তাঁহার মহত্ত্ব।
'রাধাশ্যাম' বলি যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়
সেই তত্ত্ব বর্ত্তমানে, জানিবে নিশ্চয়।
'নরহরি' যিনি, তিনি সেই 'রাধাশ্যাম',
তাঁহা বিনু অন্য নাহি, জপ তাঁরি নাম।

শ্যাম হয়ে তিনি রাধা--এই গূঢ় তত্ত্ব,—
যুগলিততনু তাঁর জানে মাত্র ভক্ত।

স্বরূপগোস্বামীকড়চায়াম্
"তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে-২।৮

"রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ"

এই নামে কহে, কর যুগল উপাসনা—
যুগলিততনু বিনা না হয় ধারণা।
নরহরি নামে হের যুগল প্রেমতত্ত্ব—
নারীরে ভজিয়া যিনি মোহেন নরত্ব।
শ্রীযুগলতনু বিনা না হয় চিন্তন;
'নরহরি' রূপে সেই প্রেম আস্বাদন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ১'৪,

"তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন,
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন।"
রাই-কানু—এইতত্ত্ব, কে করে প্রতীত?
বুদ্ধি-অগোচর ইহা ধারণা-অতীত।
নরহরি-রাধাশ্যাম জপ—এই কহে;
মহাভাব-রসরাজ একরূপে রহে।
নর হরি' জপ রাধা—এই কহে বিধি
রাধারে ভজিলে তবে মিলে শ্যাম-নিধি।
নরত্ব না ঘুচিলে রাধা-ভজন না হয়,
তাই অগ্রে পুরুষত্ব হরিতে কহয়।
'পুরুষত্বে' বুঝি সর্ব্ব পুরুষ-অভিমান,
মাতৃতত্ত্ব সাধিলে হয় তার অবসান।
বহুদুঃখে বহু দৈন্যে মায়েরে সাধিলে
তবে জগন্মাতারাধারাণী-কৃপা মিলে।

শুদ্ধচিত্তে যবে শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশয়,—
অন্তর বাহির সব হবে রাধাময়।
তাই কহে, ওহে নর! রাধা-ভাব হরি'
শ্যামচাঁদে ভজ, পাবে কিশোর-কিশোরী।
কুণ্ডলিনী রাধাশক্তি করি' জাগরণ
সহস্রারে পার যদি করিতে প্রেরণ।
রাধাময় চিত্ত হ'লে দীন ভক্তজন
সহস্র দল বাসিনীরে পায় দরশন
রাধাভাব হরি' শ্যামে স্মরণ করিলে,
রহিতে না পারে কৃষ্ণ রাধা আকর্ষিলে।
রাধারাণী চিত্তপটে হইলে উদয়,
রাধা-প্রেমে বাঁধা কৃষ্ণ আসিয়া মিলয়।
অধরারে ধরিবারে নাহি অন্যোপায়,
রাধারে ধরিলে বাঁধা পড়ে শ্যামরায়।
অতএব ধর হৃদে শক্তিময়ী রাধা,
যুগল মূরতি রবে হৃদিপটে বাঁধা।
রসিক-শেখর, আর পরম করুণ'—
শাস্ত্রে কহে শ্রীহরির এই দুই গুণ।
আপন নরত্ব হরি' রস-আস্বাদন,
জীবের নরত্ব হরি' করেন মোচন।
এমন করুণা নাহি দেখি কোন জনে,
নিত্যপথসন্ধান দেখান আপনে।
নারীবিনা অন্য কারো নাহি সেথা গতি,
নর হয়ে কেমনে বা ভজে রাধা-পতি?
নরের নরত্ব তাই করিয়া হরণ,
স্বরূপ-প্রকৃতিরূপ করান দর্শন।
মায়া-মোহে 'নর-নারী'—জীব এই মানে,
আত্মসুখে রতিখণ্ডে মৃত্যুপথ আনে।

পুরুষ-অভিমান স্বেচ্ছায় না করে ত্যজন
সাধন-অস্ত্রেতে তাই করেন হরণ।
নরত্ব হরিয়া জীবে দেখান স্বরূপ,
'নরহরি' বলি তাঁরে করুণার ভূপ।
এমন দয়াল ঠাকুর কোথা নাহি আর,
'নরহরি' 'নরহরি'—জপ অনিবার।
আর এক অর্থ হয় দেখিলে বিশেষ,—
বর্ণে বর্ণে রহিয়াছে সাধন-উপদেশ।
'ভজ' শব্দে—সেবা, আর আত্ম সমর্পণ,
আপনারে না বিকালে না হয় ভজন।
নির্ব্বিকার সেবা—এই প্রধান সাধন,
সাক্ষাৎ না সেবিলে তাঁরে না পায় কখন।
নরত্ব হরিয়া ভজ, প্রথমেই কহে,
ভজন না হয়, যদি পুরুষত্ব রহে।
'প্রাণারাম হরি' ভজ'—এই ইহা কয়,
ভোগ্যবস্তু না ত্যজিলে সাধন না হয়।
পুনরপি কহে, শুন, ভজ প্রাণ হরি'—
আরাম পাইবে তাতে নহিলে যে মরি।
'জীয়ন্তে মরা' না হলে ভজন না হয়,
ভজিলে পরম শান্তি, অন্যথায় ভয়।
দ্বিতীয় চরণে কহে করিয়া নিগূঢ়—
সাধন জপের তুল্য, নাহি বুঝে মূঢ়।
'জপ' শব্দে—পুনঃ পুনঃ গোপনে স্মরণ,
তেমনি ভজন নিজ রাখিবে গোপন।
পুনঃ পুনঃ না সাধিলে সিদ্ধি নাহি হয়,
তিলে তিলে না সেবিলে না মিলে নিশ্চয়।
পুনঃ কহে, ভজ নর! রাধাশ্যাম হরি',
নিগূঢ় ভজন কথা কহিনু আবরি'।

রাধাশ্যামভাব হরি' ভজন করিবে,
যুগল-ভজিতে হ'লে যুগলে সাধিবে।
নিগূঢ় ভজন-কথা কহা নাহি যায়,
বুদ্ধি-অগোচর—মিলে শ্রীগুরু-কৃপায়।
এ পয়ারে বর্ণে বর্ণে আছে আচ্ছাদন,
নিগূঢ় বিবিধ তত্ত্ব, অকথ্য-কথন।
শ্রীগুরু-ইচ্ছায় কিছু হয় প্রকাশন,
গুরু-কৃপা বিনা অর্থ না হয় ধারণ।

*　　　　*　　　　*

ওরে মূঢ় মন ! সব সন্দেহ পাসরি'
শ্রীগুরু শ্রীনরহরি ভজ নিষ্ঠা করি'।
শ্রীগৌর সুন্দর যিনি তিনি 'নরহরি'
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে কহেন আবরি'।
"চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি"—৩।২
"ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি"—৩।৪
শ্রীগুরু-কৃপায় যদি হয় সে বিশ্বাস,
স্বরূপ জানায়ে তবে করিবেন দাস।
স্বয়ং ভগবান্ তিনি সর্ব্বশক্তিময়,
তর্কনিষ্ঠ মনে স্বরূপ না হয় উদয়।
পরমাদ্ভুত শক্তি তাঁর, অলৌকিক সব—
পরমেশ্বর বিনা কারো না হয় সম্ভব।
স্বশক্তি মহিমা প্রভু লোকে দেখাইতে
অলৌকিক লীলা প্রকাশ কৈলা অবনীতে।
দুর্বিতর্ক্যা, দুরাপা, সে দুর্লভা শক্তিকে—
বুদ্ধি-বলে, তর্ক-বলে না বুঝে তার্কিকে।
সর্ব্বত্যাগি' দীন হয়ে শরণ লইলে,
দৃঢ়ভক্ত্যে শক্তিময়ীর সাধন করিলে।

দৈন্য বলে কৃপা হ'লে সে দীন-তারিণী,
সহস্রারে প্রকাশেন দল-নিবাসিনী।
তাঁহার কৃপায় যুগল রাধাকৃষ্ণ রূপ,
ভক্তচিত্তে, কারো ভাগ্যে, উদিত স্বরূপ।
'নরহরি-নরহরি'—এই নাম সার,
ইহকালে, পরকালে গতি যে আমার।
সর্ব্বতত্ত্বসার তিনি, তিনি পরতত্ত্ব,
নরকের কীট আমি কী জানি মহত্ত্ব ?
অবিশ্বাস-অপরাধ ক্ষমিবার তরে,
নিজতত্ত্ব কণামাত্র কহেন অন্তরে।
শ্রীনামের অর্থ নিজে না কৈলে প্রকাশ,
মুঞি জীবাধমের তাহা না হইত বিশ্বাস।
ভক্তি নাহি, দৈন্য নাহি, নাহিক সাধন—
দৈন্যমূল দীনতারিণীর কৃপার কারণ।
অহঙ্কারে মত্ত সদা নাহি আত্মজ্ঞান,
গুরু কিবা বস্তু, কিবা শক্তি পরিমাণ।
ক'বে আত্ম-অভিমান হইবে খণ্ডন,
'সর্ব্বস'পি' গুরুপদে লইব শরণ ?
দীন, অকিঞ্চন, এই অভাগা-অনাথে,
দীনতারিণী চাহিবেন কৃপানেত্র পাতে।
নিজতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, ভক্তির সাধন,
শক্তিতত্ত্ব, স্বরূপতত্ত্ব, কৃপা-বিবরণ।
সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিলেন নিজ নামালোকে,
স্ব-মহিমা প্রচারিলেন প্রভু সর্ব্বলোকে।
এমন দয়ালঠাকুর কোথা নাহি আর,
'নরহরি, নরহরি'—জপ অনিবার।

২৩শে পৌষ, সন ১৩৪৩ সাল সকাল

শ্রীশ্রীনরহরি প্রভুর মাহিমা জ্ঞাপক এই সঙ্গীত তিনি কৃপা ক'রে তাঁর এই দাসের চিত্তে স্ফুরিত করিয়েছিলেন, সন ১৩৪৪ সালে, ১৮ই পৌষ।

আজি, প্রকট শ্রীহরি, নররূপধরি'
'নরহরি' নবনামে
এ লীলা গোপনে, গিরিগুহাবনে,
কভু বা নদীয়াধামে।

বৃন্দাবন দাস লিখে বেদ ব্যাস,
মায়ে কহে গৌর হরি—
তোমারি জঠরে আসিব সত্বরে
গূঢ় লীলা পুনঃ করি' ।
গৌরাঙ্গ শ্রীহরি নাম 'নরহরি'
ইঙ্গিত করিল আর ;
সে মহাবচন করিতে পূরণ
পুনঃ লীলা নদীয়ার ।
হের, ইঁহারই শ্রী অঙ্গে বিরাজে কী-রঙ্গে
শ্রীগৌর অঙ্গের শোভা !
সেই, মধু-হরি নাম, প্রেম সুধাধাম,
সে-মাধুরী মনলোভা ।
হের, অঙ্গ ঝলকে কী জ্যোতি আলোকে,
পুলক উছলি' পড়ে !—
বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে ক্বণিত
বাঁশরীর সুধা ঝরে ।
অজভব যাঁরে চিনিতে না পারে,
সেই গোপী-প্রাণ-চোর,
নয়ন মেলিয়া দেখগো চাহিয়া—
উদিত ব্রজ-কিশোর ।
নরহরি নাম, পরানন্দধাম—
নবলীলা নবযুগে,
তাঁরি কৃপালোকে তাঁরে জানে লোকে
ভক্তি যার পদযুগে ।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
সে প্রভু আমার গতি—
নরহরি ধ্যান, নরহরি জ্ঞান,
নরহরি প্রাণপতি ।

———

পঞ্চম অধ্যায়

ভক্তের স্তরভেদ

ভক্তের স্তরভেদ

গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হ'লেই গুরুর 'শিষ্য' নামে চিহ্নিত হওয়া যায় বটে, কিন্তু 'শিষ্য' হ'লেই সব শিষ্য সমান হয় না; শিষ্যদের মধ্যে বহু ভেদ থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধন অনুযায়ী এবং প্রারব্ধ অনুসারে এই ভেদ কম-বেশী হয়, 'অধিক'-পর্য্যায়ে সে ভেদ একেবারে আকাশ-পাতাল সমান হয়েও থাকে। শাস্ত্র আলোচনায় দেখা যায়, সাধক ও ভক্তগণের মধ্যে নানারকমের নানা স্তর-ভেদ বর্ত্তমান। প্রথমতঃ, নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ ভক্তগণের কথাই আলোচনা করা যাক। তাঁদের মধ্যেও 'তারতম্য' আছে। যদিও "নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি' মানে"—চৈঃ চঃ ১।৪, এবং "যার যেই ভাব—সেই সর্ব্বোত্তম"—চৈঃ চঃ ২।৮, তথাপি "তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর-তম" চৈঃ চঃ ২।৮, এবং এই বিচার "সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী"—চৈঃ চঃ ১।৪। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তির 'অধিকারী' বিচারে দেখা যায়, 'শ্রদ্ধা' অনুযায়ী উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ —এই তিন প্রকার 'অধিকারী' আছে;—"উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারী"-চৈঃ চঃ ২।২২। আবার "রতি-প্রেম তারতম্যে ভক্ত তরতম"—চৈঃ চঃ ২।২২, এদেরও তিনটি, অনুরূপ বিভাগ রয়েছে। এদিকে ভক্তির 'প্রকার' বিচার করলে, চার রকমের ভক্তি দেখা যায়: তামস, রাজস, সাত্ত্বিক ও নির্গুণ: ভাঃ ৩।২৯।৬-১২। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভক্তদের মধ্যে স্তরভেদ বা তারতম্য সর্ব্বত্রই আছে, সিদ্ধ ভক্তগণ থেকে নিম্নস্তরের সাধক পর্য্যন্ত—কেউ কারো ঠিক সমান হ'তে পারেন না।

আবার মোটামুটিভাবে ভক্তদের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি বিভাগ রয়েছে—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। "বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন, অন্তরঙ্গ সঙ্গে প্রভুর রস-আস্বাদন।" এই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ—এদের প্রত্যেকের মধ্যেই আবার বহু স্তরভেদ আছে। তবে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই দুই বৃহৎ শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যটা খুব বেশী এবং সুস্পষ্ট। বহিরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে আচার-আচরণে মহাপ্রভু সদা সতর্ক থাকতেন। সেসব ক্ষেত্রে তাঁকে প্রচলিত লৌকিক ও সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মানমর্য্যাদার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখাতে হ'ত। যারা ধর্ম ও ভক্তি-সাধনের গভীর স্তরে পৌঁছাতে পারেনি, তাদের বাইরের ঠাট বজায় রেখে তাদের যতটুকু কল্যাণ-সাধন করা যায়, সেই বিষয়েই তিনি সদা সজাগ ছিলেন। বহিরঙ্গ জগতের উদ্ধারের জন্য তিনি নিজে দেশ ভ্রমণ ও পুরীতে অবস্থান ক'রে নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ক'রে জীবকে ভগবন্মুখী করতে সচেষ্ট হয়েছেন। যবন হরিদাসের দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন এবং বাংলাদেশে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুকে 'আচার্য্য' ক'রে জীবের উদ্ধার কার্য্য করিয়েছেন।

বাংলাদেশের তদানীন্তন সাংসারিক মায়াবদ্ধ মানবকুলকে ও সমাজের পাষণ্ডগণকেও বিবিধ অধর্মাচরণ থেকে রক্ষা ক'রে কৃষ্ণোন্মুখী করতে নিত্যানন্দপ্রভুই যোগ্যতম, তাই তাঁকে 'সংসারী' সাজিয়ে বাংলার সামাজিক উচ্চস্তরের দোর্দণ্ড প্রতাপ 'গণ্যমান্য'দের, তথা নিম্নস্তরের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়েছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভুর Formula ছিল: "কামিনীর কোল, মাগুর মাছের ঝোল, হরি-হরি বোল," অর্থাৎ ওরে সাংসারিক জীব, তোরা স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে ঘরকন্না করছিস কর, আমিষ ভক্ষণ করছিস কর, শুধু মুখে একবার 'হরিবোল' বল্। এই Formula রচিত ব্যাপক 'ব্যবস্থাপত্র', তথা নিত্যানন্দপ্রভুর সর্ব্বাকর্ষী রূপ, গুণ, দৈন্য, বিনয়াবনত মধুর ব্যবহার, তাঁর উচ্চ সামাজিক মর্য্যাদা এবং সর্ব্বোপরি মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সঞ্চারিত শক্তি সে সময়ে বাংলার সমাজে যে 'miracle' সৃষ্টি করেছিল, তা' অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব্ব। নিত্যানন্দপ্রভু এই Formula ব্যাপকভাবে প্রয়োগ না করলে তদানীন্তন বঙ্গসমাজকে মুসলমান প্রভাব, শাক্ত নিষ্ঠুরতা পণ্ডিতী নাস্তিকতা ও সামাজিক উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা যেত না—এ ধ্রুব সত্য। নিত্যানন্দ Formula এই সব বাঙালীকে 'বৈষ্ণব' করেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তারা একেবারেই বহিরঙ্গ। মুসলিম প্রভাব, শাক্ত-হিংসার বিভীষিকাময় তাণ্ডব ও ন্যায়ের নাস্তিকতা থেকে মুক্ত হয়ে তারা 'হরি-বোল্' বলত, এবং মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। কিন্তু তারা কখনই মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের পর্য্যায় ভুক্ত হ'তে পারেনি। এরূপ mass-scale-এ যারা নিত্যানন্দপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্ত হয়েছিল, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল এবং বংশপরম্পরায় এখনও তা' আছে। বাংলা দেশ তো বটেই, এমনকি ছোটনাগপুর জঙ্গলের এক অখ্যাত 'আদিবাসী' সমাজ সেই যে মহাপ্রভুর বৃন্দাবনগমন সময়ে তাঁর ভক্ত হয়েছিল, আজও মহাপ্রভুকে তারা ভগবৎজ্ঞানে ভক্তি করে, এর প্রমাণ আছে। বহিরঙ্গ ভক্তদের মধ্যেও বহুবিধ স্তরভেদ আছে। মুখ্যতঃ, ইষ্টদেবের প্রতি মমত্ব-বোধই এই স্তরভেদ সৃষ্টি করে। এতেই ভক্তের 'তারতম্য' হয়ে থাকে। সংভিশয় মমত্ববোধ সম্পন্ন ভক্ত সমূহই তাঁর 'গণ' রূপে পরিগণিত হন।

এদিকে অন্তরঙ্গ ভক্তদের ভিতরেও কিছু স্তরভেদ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণের 'সখা'দের মধ্যেও মুখ্যতঃ চারটি শ্রেণী আছে—সুহৃৎসখা, সখা, প্রিয়সখা, নর্মসখা। সেইরূপ সখীদের মধ্যে বহু পর্য্যায় বর্ত্তমান। কিন্তু তা' হ'লেও এঁরা সবাই 'অন্তরঙ্গ' ভক্তমধ্যে গণ্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যেও অনুরূপ স্তর-ভেদ ছিল। "জগতের মধ্যে 'পাত্র' সার্দ্ধ তিন জন"; এঁরা হচ্ছেন স্বরূপ গোস্বামী, রায় রামানন্দ,

শিখি মাহিতী ও তাঁর ভগিনী মাধবী দেবী। কিন্তু শচীমাতা, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দপ্রভু, গদাধর, জগদানন্দ ও বৃন্দাবনের পঞ্চ গোস্বামী—এঁরা সকলে অবশ্যই মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ। কিন্তু তথাপি প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পার্থক্য আছে।

স্বয়ং ভগবানের ভক্ত হয়ে তাঁর কাছে কাছে থাকলেই যে সকল জীবেরই সমস্ত অনর্থ কেটে যাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। 'কালা কৃষ্ণদাস' দক্ষিণ ভ্রমণে মহাপ্রভুর একমাত্র নিত্যসঙ্গী ছিলেন, তথাপি ভট্টমারি গণ "স্ত্রীধন দেখাইয়া তার লোভ জন্মাইল" এবং "প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে।" কিন্তু দয়াময় প্রভু ভট্টমারিদের সঙ্গে রীতিমত সংঘর্ষ বাধিয়ে তবে "কেশে ধরি' বিপ্র লইয়া করিলা গমন।"—চৈঃ চঃ ২।৯। মহাপ্রভু এই মতিভ্রষ্ট কৃষ্ণদাসকে ক্ষমা করেননি, পরন্তু পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে তাকে "করিলা বিদায়; যাঁহা তাঁহা যাহ, আমা সনে নাহি আর দায়।"—চৈঃ চ ২।১০। ছোট হরিদাস প্রভুর সেবার জন্য বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবী দেবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা ক'রে আনার অপরাধে যাবজ্জীবন অপরাধী হয়ে অবশেষে ত্রিবেণী সঙ্গমে আত্মবিসর্জন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করেন। কারও অনুরোধে মহাপ্রভু তাকে ক্ষমা করেননি। বাহ্যতঃ তার কার্য্যে অপরাধের গুরুত্ব বোধগম্য না হ'লেও নিশ্চয়ই তাঁর গুরুতর অপরাধই হয়েছিল, না হ'লে স্বয়ং প্রভু তার আত্মোৎসর্গে উল্লসিত হয়েই বা বলবেন কেন—"স্বকর্মফলভুক্ পুমান্!" প্রভুর বজ্রসম কঠোরতা এখানে লক্ষণীয়। অদ্বৈতপ্রভুর একদল শিষ্য মহাপ্রভুর বিরোধিতা করেছিল; অদ্বৈত প্রভু তাদের চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছিলেন। এদিকে রায় রামানন্দ নির্জ্জনে সুন্দরী তরুণী দেবদাসীর সব অঙ্গসেবা ক'রেও মহাপ্রভুর নিকট 'অপ্রাকৃতদেহ' বিশিষ্ট একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বরসবেত্তা ব'লে পরিগণিত এবং প্রভুর অন্তরঙ্গতম ভক্ত, একমাত্র যাঁর ভাগ্যেই মহাপ্রভুর "রসরাজ-মহাভাবময়" রূপ প্রকটিত হয়েছিল। সুতরাং 'তারতম্য' আছে বৈকি—এবং এই তারতম্য প্রায় 'আকাশ-পাতাল' পার্থক্য যুক্ত।

এই তো গেল অন্তরঙ্গ মহলের কথা। তাঁরা বহিরঙ্গের বহু উর্দ্ধে, তাঁদের সম্বন্ধে বহিরঙ্গ ভক্তদের কোনো 'ধারণা'ই নেই। আবার এই বহিরঙ্গদের মধ্যেও প্রচুর তারতম্য রয়েছে। একেবারে বহির্দ্বারে যারা, তারা শুধু নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভগবান্ বা মহাপুরুষের শরণাগত হয়। স্বার্থসিদ্ধি হ'লেই তারা সরে পড়ে। অবশ্য তাদের মধ্যে কচিৎ কেউ তাঁর কৃপা পেয়ে যায়। কিন্তু এটা খুবই দুর্লভ। এ মহাভাগ্য হয় তাঁদেরই, যাঁদের "সংসার ক্ষয়োন্মুখ" হয়েছে, সাধারণ জীবের পক্ষে এ ভাগ্য "নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে"র মত—চৈঃ চ ২।২২।২৮। সুতরাং এ কচিৎ সম্ভাবনা বাদ দিয়ে স্বসুখসিদ্ধিকামী সাধারণ জীবের এই শ্রেণীকে

'বহির্দ্বারের বহিরঙ্গ' বলা যায়।. মহাপ্রভু এদের খুব বেশী একটা আমল দেননি— যেমন নবদ্বীপের চাপাল-গোপাল, 'পুরীর রামানন্দরায়ের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক, অদ্বৈতের কিঙ্কর কমলাকান্ত বিশ্বাস ইত্যাদি। এদিকে তথাকথিত বাহ্য ভক্তদের বা সমাজের নামজাদা বৈষ্ণব পণ্ডিতদেরও অনেককেই তিনি উপেক্ষা করেছেন। তার দৃষ্টান্ত রয়েছে প্রথম দিকে কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ, প্রখ্যাত ভাগবত ব্যাখ্যাকার বল্লভভট্ট, ভগবান্ আচার্য্যের ভ্রাতা গোপাল, বঙ্গদেশীয় নাটক রচয়িতা ইত্যাদি। এই বঙ্গদেশীয় কবির নাটককে অন্যান্য ভক্তগণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও, স্বরূপ গোস্বামী তার একটি শ্লোক শ্রবণ মাত্র তাকে মহাপ্রভুর একেবারে অশ্রাব্য ব'লে ঘোষণা ক'রে তার দোষত্রুটি সবিস্তারে বু'ঝয়ে দেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভক্তের গুণাগুণ সবাই বুঝতে পারে না,—একমাত্র কয়েকজন অন্তরঙ্গ যোগ্য ভক্তেরই সে ক্ষমতা থাকে—যেমন ছিল স্বরূপ গোস্বামী বা রামানন্দ রায়ের। অনেক 'আপাতঃ' ভক্তকে ও তাদের ক্রিয়াকলাপকে তাঁরা নাকচ করে দেন। প্রকৃত ভক্ত ও ভক্তিকে জানবার ও চিনবার ক্ষমতা মাত্র গুটি কয়েক কৃপা প্রাপ্ত অন্তরঙ্গ ভক্তেরই থাকে।

এবার স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর নিন্দক পাষণ্ডদের উল্লেখ করা যাক। তখন নবদ্বীপের সামাজিক উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত অনেকেই মহাপ্রভুর নিন্দক ও তীব্র বিরোধী ছিল। তাদের সংশোধন করতে না পেরে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তাদের ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হয়ে বাংলাদেশ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীক্ষেত্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন। "এইমত নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ, না মানে নিন্দক সব সে সব বিলাস" চৈঃ ভাঃ ১।২০, ; "মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ, নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম। সেই সব মহাদক্ষ ধা'ইয়া পলাইল।" "কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন, না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন"—চৈঃ চঃ ১।৭, "সবে মিলি' ভবে করে প্রভুর নিন্দন,—সবদেশ ভ্রষ্ট কৈলা একলা নিমাই, ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্মভয় নাই। পুন যদি ঐছে কহে মারিব তাহারে, কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে?" "তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়, যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা হাসি' সে করয়"। "মোরে নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার, এসব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার। অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব, সন্ন্যাস বুদ্ধিতে মোরে প্রণত হইব। প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়"—চৈঃ চঃ ১।১৭। পুরীতেও তিনি নিন্দার হাত হ'তে নিস্তার পাননি— রামচন্দ্রপুরী, সার্ব্বভৌমজামাতা অমোঘ, অন্তরঙ্গ দামোদর পণ্ডিত (যদিও স্নেহবশতঃ) —এঁদের নাম সর্ব্বজন পরিচিত।

ঠিক অনুরূপভাবে শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর লীলা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অবশ্য পাতালদেব মহাপ্রভুর চারিশত বৎসর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখনকার

সামাজিক অবস্থা অনেকাংশে বিভিন্ন এবং তাঁদের লীলার উদ্দেশ্যও পৃথক। তবু এই দুই লীলায় কয়েকটি সুন্দর সামঞ্জস্য রয়েছে।

পাতালদেবের লীলা অত্যন্ত নিগূঢ়। মনে রাখতে হবে, তিনি পরিদৃশ্যমান বহির্জগতের সকল প্রলোভন, সকল আকর্ষণ পরিত্যাগ ক'রে অন্ধকারময় গুহায় গহন গোপনে সকল দুঃখকষ্ট অঙ্গীকার ক'রে নিজেকে অবরুদ্ধ রেখেছিলেন সারা জীবন—এবং সেখানে সাধনার স্থান বেছে নিয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অমরবাণী "একচার্য্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্ত গুহাশয়ঃ অলক্ষ্যমান আচারৈ র্মুনিরেকোহল্পভাষণঃ—" ১১।১।১৪ এর সার্থক রূপায়ণ করেছেন একমাত্র পাতালদেবই। জীবন্ত অবস্থায় নিজেকে মৃতের ন্যায় পাতালে প্রোথিত ক'রে এই কঠোর সাধনার কী প্রয়োজন ছিল, কী তাঁর নিগূঢ় উদ্দেশ্য, তা' একমাত্র তিনিই জানেন। মহাপ্রভুর লীলার অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য জানতেন স্বরূপ গোস্বামী ও রায় রামানন্দ। পাতালপ্রভুর লীলার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কে জেনেছিলেন তা' আমার জানা নেই। কৃপা ক'রে আমার অন্তরে তিনি যেটুকু স্ফুরিত করেছেন, তাই যথাস্থানে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চেষ্টা করব।

মহাপ্রভু 'তিন বাঞ্ছা' পূরণ করবার অভিপ্রায়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 'রাধাভাব কান্তি' অঙ্গীকার ক'রে, এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ গোস্বামী ও রায় রামানন্দসহ সেই নিগূঢ় লীলারস আস্বাদন করেছিলেন। তাঁর এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন প্রসঙ্গে "আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলা ত্রিভুবন।" এইভাবে বাহ্যজগতের বহিরঙ্গ জীবও তাঁর লীলার সুফল প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর লীলাতেও অনুরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। পাতালদেবের অন্তর্লীলার আনুষঙ্গিক বহিঃপ্রকাশ ভিন্নরূপ। তথাপি কয়েকটি সামঞ্জস্য বেশ সুপরিস্ফুট। সেগুলির কিছু কিছু 'বস্তু-নির্দেশ' রূপ মঙ্গলাচরণে এবং লীলামৃতে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নিন্দক ও শত্রুদের কথাও ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে। এবার তাঁর 'ভক্ত'দের সম্বন্ধে কিছু বিশ্লেষণ করা যাক।

যতদূর অবগত আছি পাতালদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সংখ্যা গুটিকয়েক মাত্র, আঙুলে গোণা যায়,—প্রায় মহাপ্রভুর 'সার্দ্ধ তিনজনের'ই মত। তাঁদের মধ্যেও অবশ্য স্তরভেদ আছে। বাকী সবই তাঁর বহিরঙ্গ, এবং তাদের শতকরা নিরানব্বই জনই একেবারে 'বহির্দ্বারের'। দুরারোগ্য ব্যাধি, সঙ্কটপূর্ণ মামলা, নানা সাংসারিক অশান্তি প্রভৃতি 'মুস্কিল-আসান' ও বিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি এবং স্বসুখ প্রাপ্তি লালসায় এইসব 'আর্ত্ত' একান্তভাবে স্বার্থসিদ্ধির আশাতেই তাঁর অলৌকিক শক্তির কাছে ধর্ণা দিত, এবং স্বার্থসিদ্ধি হ'লেই আর তাদের দেখা যেত না। শ্রীগুরুদেবের স্বার্থ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কা'রো কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। এরমধ্যে কচিৎ কারো পূর্ব্ব ভাগ্যবলে তাঁর প্রতি একটু মমত্ববোধ জাগত।

এইসব তথাকথিত ভক্তদের চিঠিপত্রাদি নিয়ে শেষ সাড়ে চার বৎসর আমাকেই কাজ করতে হয়েছে। বেশীর ভাগ ভক্তের, কারো ছয়-সাত পৃষ্ঠা দীর্ঘ-পত্র গুরুদেব মাত্র লেখকের স্থান ও নামটি প'ড়ে আমাকে দিয়ে দিতেন—প'ড়ে জবাব দেবার জন্ত ; তিনি সেসব পত্রের একটি অক্ষরও পড়তেন না। মাত্র রাণীমা ও বড়দাদার (সুরেন্দ্র নন্দীর) পত্র তিনি সাগ্রহে সবটা পড়তেন এবং স্বহস্তে তার জবাব দিতেন। বাকী চিঠির কিছুটা মেজদাদা ও বেশীর ভাগই আমি জবাব দিতাম। এইসব তথাকথিত ভক্ত ও হোমরা-চোমরা শিষ্যদের প্রতি গুরুদেবের এই ঔদাসীন্য কেন? কারণ তারা একেবারেই 'বহির্দ্বারের' অন্তর্ভুক্ত। সবাই স্বসুখকামী, কেউই গুরুসুখে সুখী নয়। আবার এমন শিষ্য বা ভক্ত আছেন, যাঁরা বিষয়ী হ'লেও এবং যাঁদের পত্র না আসলেও গুরুদেব নিজে যেচে তাঁদের পত্র লিখতে বলতেন আমাকে। তিনি বলতেন, "বাবা, এদের অন্তরে গুরুভক্তি আছে; কিন্তু এরা বিষয়ী এবং 'বিষয়ের স্বভাব এই—করে মহাঅন্ধ, সেই কর্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ।' এরা গুরুকে ভুলে আছে, কিন্তু গুরু এদের ভোলেন না। তাই মাঝে মাঝে পত্র দিয়ে এদের ঘুম ভাঙাতে হয়।" এবার পার্থক্য দেখুন—ভগবান্ সত্যই অন্তর্যামী এবং "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।"

গুরু আশ্রমে বহুদিন ধ'রে আশ্রম সেবা ও গুরুর কাছে কাছে থেকেও যে কামিনী-কাঞ্চন প্রতিষ্ঠা লোভে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে চরিত্রভ্রষ্ট, গুরুধন-অপহারক ও ক্ষমতালোভে উন্মত্ত হ'তে পারে কেউ, এর সুবিস্তৃত কাহিনী শুনেছি গুরুদেবের মুখে তাঁর গুরু প্রেমচাঁদ গোস্বামীর কোনো কোনো শিষ্য সম্বন্ধে এবং তাঁর নিজ আশ্রমের শিষ্য চোর পঞ্চাননের কুকীর্ত্তি-ক্রিয়ায়, তাঁর অন্যান্য আশ্রমের কতিপয় শিষ্যের দুষ্কার্যে,—যাদের পরিচয় গুরুদেব স্বয়ং ভক্তদের কাছে বিবৃত ক'রে সকলকে সতর্ক ক'রে দিতেন। গুরুদেব অবর্ত্তমানে স্বভাবতঃ এই শ্রেণী আরো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এবং এই 'বহির্দ্বারে'র স্বার্থান্ধ কুটিল ও কুচক্রী শিষ্যগণ কিভাবে ক্ষমতা ও বিষয়লোভে তাঁরই আশ্রমের তীব্র শত্রুতা সাধনে তৎপর হয়ে সর্ব্বপ্রকার কুকার্য্যে রত হ'তে পারে, তা' প্রকট হয়েছে ভয়াবহরূপে দু'বার তাঁর অবর্ত্তমানে। এইসব বিষয় ও ক্ষমতা লোলুপ তথাকথিত শিষ্যগণ বিস্মৃত হয়েছে, "তোমার ভজনফল—তোমাতে প্রেমধন, বিষয় লাগি' তোমায় ভজে—সেই মূর্খজন। তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল, তোমা লাগি' সনাতন বিষয় ছাড়িল। সেই শুদ্ধভক্ত—তোমা ভজে তোমা লাগি', আপনার সুখদুঃখে হয় ভোগভাগী"—চৈঃ চঃ ৩।৯। সুতরাং রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-রামানন্দের মত কে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পেরেছেন, সেইটাই প্রকৃত ভক্ত চিনবার একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় নিদর্শন।

পাত্তালপ্রভুর এইসব তথাকথিত শিষ্যদের সঙ্গে মহাপ্রভুর ভক্ত ও অবৈতের

শিষ্যবর্গের সঙ্গে কিছু কিছু সামঞ্জস্য আছে। এ সবের যথার্থ জ্ঞান তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত দু'একজন ত্যাগী অন্তরঙ্গ শিষ্যের কাছেই অবগত হওয়া যাবে, বিষয়লোভী স্বার্থান্ধ শিষ্যদের কাছে নয়। দুঃখের বিষয়, পাতালপ্রভুর এরূপ অন্তরঙ্গ শিষ্যের সংখ্যা খুবই নগণ্য, এবং তাঁরাও একে একে গত হয়েছেন। গুরুদেব স্বকার্য্য সাধন ক'রে নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হয়েছেন, দু'চারজন অন্তরঙ্গ ভক্তও তাঁর অনুগামী হচ্ছেন। প্রকৃত গুরুভক্ত কে, এখন চিনে নেওয়া দুরূহ।

মহাপ্রভুর মতো গুরুদেবও লৌকিক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণকে গ্রাহ্য করতেন না। প্রতাপরুদ্রের মতো ভক্তকেও মহাপ্রভু স্বেচ্ছায় দর্শন দেননি। এ যুগের রাজা মহারাজা জেলার জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি, সাব্ ডেপুটি, বা চেয়ারম্যান্ ইত্যাদিকেও গুরুদেব অনুরূপ ভাবে দূরে রাখতেন, স্বেচ্ছায় দর্শনই দিতেন না,—তা' আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। লৌকিক সমাজে থাকতে হ'লে অনেক সময়ে বহিরঙ্গ বৈষয়িক লোকেরও প্রয়োজন হয়, তার দৃষ্টান্ত মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গী কালা কৃষ্ণদাস। গুরুদেবেরও সেরূপ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তারা কেউই তাঁর সঙ্গপ্রভাবে অনর্থদোষমুক্ত হয়ে যায়নি। প্রয়োজন ফুরালে যেমন মহাপ্রভু, তেমনি গুরুদেবও তাদের বিদায় দিয়েছেন। গুরুদেব অন্তর্ধানেও এইসব বর্ণ চোরা শিষ্যগণ স্বরূপ প্রকাশ ক'রে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে; ঠিক "ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে, পাছে পাতনা উড়াইয়ে সংস্কার করিতে"—চৈঃ চঃ ১।১২ এইরূপে। প্রকৃত ভক্তদ্বেষীকে মহাপ্রভু ক্ষমার চোখে দেখতে পারেননি—"আরে পাপী, ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু, কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু"—চৈঃ চঃ ১।১৭; গুরুদেবও তেমনি ক্ষমা করেননি, করতে পারেন না; ভক্তের জন্য ভক্ত রক্ষাকারী সুদর্শন সতত সজাগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীশ্রীপাতাল প্রভুর প্রত্যক্ষ দর্শন

শ্রীশ্রীপাতাল প্রভুর প্রত্যক্ষ দর্শন

জীবনে দুঃখের অনুভূতি থেকেই দুঃখনিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে। যে পন্থা অবলম্বন ক'রে এই দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি ঘটে, তারই নাম ধর্মপথ। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ— যে ধারণ ক'রে রাখে; ধারণ অর্থে এখানে স্বরূপে অবস্থিতি বুঝায়। জীব স্বরূপতঃ জ্ঞানময় ও আনন্দময়—সেই সত্য জ্ঞানে ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থিতি হয় যার দ্বারা তাই 'ধর্ম'। যে পথে গেলে, যে বিধি-নিষেধ আচরণ করলে সেই পরম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাই সত্য ধর্মপথ।

মায়াবদ্ধ জীবের প্রত্যেকেরই জীবন দুঃখময়। মায়া, অবিদ্যা, মোহ বা মিথ্যা জ্ঞানে জীব কিন্তু এই দুঃখকেই আপাতঃ সুখ ব'লে মনে করে, এবং আত্মেন্দ্রিয় সুখ লালসায় নতুন নতুন কর্ম ক'রে নতুন কর্মবন্ধনে বদ্ধ হয়ে পড়ে। এইভাবে সংসারচক্র অবিরাম চলতে থাকে। একমাত্র কোনো মায়ামুক্ত সিদ্ধ কৃষ্ণভক্তের কৃপাতেই মায়াবদ্ধ মানবের এই মিথ্যা মোহ নাশ হয়। তখন সে আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারে এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সেই মায়ামুক্ত কৃষ্ণভক্তের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর উপদেশমত পথে চলতে শুরু করে। কিন্তু মায়াময় জগতে এইরূপ মায়ামুক্ত মহাপুরুষের সংখ্যা অতি অল্প;—"কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত, কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত"— চৈঃ চঃ ২।১৯; সুতরাং "ম্রিয়মাণঃ কালনষ্টা কচিত্তরতি কশ্চন"-ভাঃ ১০।৩৮।৫, "সংসার ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যে কেহ তরে, নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে"—চৈঃ চঃ ২।২২। জগতে বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কিছু সংখ্যক আছেন,—তাঁদের কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ দার্শনিক, কেউ বা সাহিত্যিক। কিন্তু ধর্মসাধন প্রক্রিয়া-দ্বারা মায়া মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন ও শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হয়েছেন, এরূপ মহামানব সুদুর্লভ। শ্রীভগবান্ সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন প্রাকৃত গুণের অতীত; আর আমাদের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় এই মায়িক সত্ত্বরজতম গুণময়; এবং আমরা যে বিশ্বে বাস করছি তাও এই প্রাকৃত ত্রিগুণ উপাদানে গঠিত। সুতরাং মায়াময় বিশ্বে অবস্থিত হয়ে মায়াময় দেহ-মন ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই মায়াতীতকে অনুভব করা যায় না—এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তবে যদি এমন কোনো সুদুর্লভ মহাপুরুষ থাকেন, যিনি এই 'দুরত্যয়া মায়া' অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন, এবং দুশ্চর তপস্যা ক'রে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করতে পেরেছেন, তবে একমাত্র সেই দেব-দুর্লভ মহামানবের সঙ্গ, সেবা ও কৃপাতেই এই আপাতঃ অসম্ভব কার্য্যও সম্ভব হবার আশা করা যায়। অর্থাৎ এই মায়িক বিশ্বে থেকেও মায়ার প্রভাব মুক্ত হওয়া যায় এবং তখন সেই 'মায়াতীত' অবস্থাতেই 'হয় তাঁর অনুভব।'

কিন্তু সেরূপ সুদুর্লভ মায়ামুক্ত মহামানব কৃষ্ণপ্রেমিক কোথায় পাওয়া যাবে? সত্যই এরূপ পুরুষের দর্শন ও তাঁর কৃপাপ্রাপ্তি একান্তই ভাগ্যের কথা।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, জগতে কিছু প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন, যাঁরা এ বিষয়ে গভীরভাবে প্রভূত ভাবনা করেছেন। মায়া মোহাচ্ছন্ন, মিথ্যাজ্ঞান ও ভ্রান্তি ভরা এই ভুবনে সত্য জ্ঞানের আলোকে মিথ্যা মোহের অন্ধকার অপসারণ করতে ও দুঃখময় জীবনের দুঃখদূরের পন্থা নির্ণয়ে তাঁরা গভীরভাবে ব্যাপক গবেষণা করেছেন— এঁদের বলা হয় দার্শনিক। 'দর্শন' শব্দের অর্থ সত্যদর্শন। জগৎ ও জীব সম্বন্ধে এঁরা যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য আলোকপাত করতে একাগ্রভাবে গভীর ভাবনা ক'রে তাঁদের চিন্তালব্ধ তত্ত্বগুলি জগৎসমক্ষে প্রচার করেছেন, এবং সেই সঙ্গে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ ও কেউ কেউ পরম সুখ শান্তির পথনির্দেশও করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের কারো চিন্তাধারার মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য তো নেই-ই, উপরন্তু একের মতামত অপরের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মীও হয়েছে। যার ফলে জ্ঞানলাভেচ্ছু অসহায় মায়াবদ্ধ মানব বিভ্রান্ত হয়েছে। দার্শনিকদের এক একটি শ্রেণী অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করতেই যেন আত্মপ্রকাশ করেছে। পরমসত্য ও চরমশান্তি মেলা তো দূরের কথা, এসব দার্শনিক তত্ত্বের সুগভীর চিন্তাধারা পরিণামে চিরন্তন কলহ, বাদ বিতণ্ডাতেই পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু এর কারণ কী? কারণ, এঁরা কেউই আসল পথের পথিক নন; সকলেই অনুমান দ্বারা, চিন্তাশক্তি সাহায্যে, মনন প্রক্রিয়ায় সেই অবাঙ্মনসগোচর, অপ্রাকৃত তত্ত্ব, তথা প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন। ব্যাপারটি একটি উপমার সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

কল্পনা করা যাক, চারদিকে সাগর বেষ্টিত একটি ছোট দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের বাসিন্দারা কেউ সেই দ্বীপের বাইরে কখনো যায় নি। তাদের দ্বীপের বাইরের জগৎ তারা কেউ কখনো চাক্ষুষ করেনি। অনেকটা সেই কূপমণ্ডূকের মতই তাদের অবস্থিতি। তাদের রাজ্যের রাজধানী, বিদেশী শাসকবৃন্দ, বিদেশী শাসকদের মূলদেশ ও মূল সম্রাট—এসব শুধু তাদের কল্পনারই বস্তু। মহকুমা সহর থেকে আগত রাজ-কর্মচারীদের মুখে সেখানকার কিছু বৃত্তান্ত শুনে বিদেশী শাসকদের সম্বন্ধে এক অজ্ঞাত ভয়-সম্ভ্রম মিশ্রিত জ্ঞান হয়েছে তাদের। এই জ্ঞানকে মূলধন ক'রে চিন্তা ও কল্পনাশক্তির সাহায্যে তারা তাদের দেশের প্রধান শাসনকর্তার আবাস স্থল বা রাজধানী, শাসন-কর্তার রূপ ও স্বভাব অনুমান করে। এক একজন চিন্তাবিদ্ রাজধানী ও প্রধান শাসকের এক এক রূপের পরিচয় প্রদান করে। বিদেশী শাসকদের আদি মূলদেশ, তার সুসমৃদ্ধ রাজধানী ও সুসভ্য, সুউন্নত শাসককুল, তথা মহামান্য সম্রাটের বর্ণনা আরো সুদূর কল্পনাপ্রসূত, নবনব মানসতুলিকায় নিত্যনতুন রঙে রসে রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য, এসব বিবরণ বিশিষ্ট চিন্তাবিদের চিন্তা-বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করবেই। কারো সাথে কারো বর্ণনার মিল হয় না; এবং একজন একটি নতুন বিবরণ প্রচার করা মাত্র, আর একজন নব উৎসাহে, নবীন উদ্যমে তাকে নাকচ ক'রে আর একটি সংশোধিত বর্ণনা দিতে অগ্রসর হয়ে আসেন। এই-ই স্বাভাবিক। প্রত্যক্ষ দর্শন না হ'লে কল্পনা-রঞ্জিত বিবরণে পার্থক্য থাকবেই। চিন্তাবিদ্‌দের যার চিন্তাশক্তির প্রাথর্য্য যত বেশী, তিনি তত মোক্ষমভাবে বিরুদ্ধবাদীর বর্ণনা খণ্ডন ক'রে তাকে অক্ষম ক'রে দেবেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য সবারই অজ্ঞাত থেকেই যায়। দৈবক্রমে একজন প্রত্যক্ষদ্রষ্টা দেশের রাজধানী, প্রধান শাসক, তথা বিদেশস্থিত মূল রাজধানী ও সম্রাটকে দেখেশুনে সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে সেই দ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে তিনি দ্বীপবাসীদের মুখে দেশের শাসককুল ও তাদের আবাসস্থল সম্বন্ধে তাদের পরস্পর বিরোধী বিবরণ শুনে রীতিমত কৌতুক অনুভব করলেন। তখন তিনি তাদের জানালেন যে তিনি দেশের রাজধানী, তথা শাসকদের মূল দেশ পরিভ্রমণ ক'রে তথাকার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করেছেন। দ্বীপবাসীরাও তাঁর কথায় বিশ্বাস করলেন। তারপর সেই প্রত্যক্ষদ্রষ্টার মুখ থেকে শাসকদের বিস্তৃত এবং নির্ভুল বিবরণ শ্রবণ ক'রে দ্বীপবাসীদের সকল সন্দেহের নিরসন হয়, সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয় এবং তাদের অলভ্য বস্তুর সত্য রূপ জানতে পেরে তারা তৃপ্তিলাভ করে। শুধু তাই নয়, সেই প্রত্যক্ষদ্রষ্টা সেই 'উন্নত দেশে' যাবার সুপথেরও যথার্থ নির্দেশ দিতে পারেন, যা' এতদিন তাদের কল্পনার ও বিতণ্ডার বিষয় ছিল। সম্রাট এবং শাসককুলের রূপ-গুণ-স্বভাব ইত্যাদি সম্বন্ধেও সঠিক বিবরণ একমাত্র তিনিই দিতে সমর্থ হলেন। সুতরাং এই উপমার সাহায্যে, অনুমান ও কল্পনাপ্রসূত বিভিন্ন দর্শন সম্বন্ধে মহাভারতের অমর বাণীর তাৎপর্য্য সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে: "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—মহাভারত বনপর্ব ৩।১৩।১১৭—অর্থাৎ তর্ক দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় না, শ্রুতি সকলের মত ভিন্ন ভিন্ন, এমন মুনি নেই যাঁর মত পৃথক নয়। ধর্মতত্ত্ব গুহাতে নিহিত আছে; মহাজন যে পথে গমন করেছেন, সেই-ই প্রকৃতপথ।

চিন্তাবিদ্‌দের রচিত দার্শনিক গ্রন্থ সহজলভ্য। যে কোনো ব্যক্তি সে সব সংগ্রহ করতে পারেন এবং সে সকল পাঠ ক'রে সেই সেই দর্শন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারেন। কিন্তু এসব চিন্তাধারা পরস্পর বিরোধী এবং পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিমূলক। পূর্ব্ব আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে প্রকৃত সত্যজ্ঞান লাভ করতে হ'লে একজন 'প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা'র সঙ্গ প্রয়োজন। কিন্তু সেরূপ প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা এ জগতে সুদুর্লভ। এরূপ

একজন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা বা 'মহাজনে'র দর্শন, সান্নিধ্য ও সঙ্গলাভে এ অধম লেখক ধন্য হয়েছে,—তাই আজ এই লেখনী ধারণ করেছি। প্রচলিত দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত আছেন, আমিও সে সব বহুপূর্ব্ব থেকেই অবগত আছি। কিন্তু তাতে সত্য নির্দ্ধারণ তো দূরের কথা, সত্য প্রায় অলভ্য হয়েই গিয়েছিল। এ অসহায় অবস্থা শুধু আমার নয়, সকলেরই—উপমার দ্বীপবাসীদের মত। কিন্তু বহু ভাগ্যফলে যখন সেই সুদুর্লভ মায়ামুক্ত মহাপুরুষের দর্শন ও কৃপালাভে ধন্য হলাম, তখন এক নিমেষেই সকল সন্দেহের অবসান হয়ে গেল—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" তাঁর কৃপালব্ধ এই সত্য অনুভূতি, যতটুকু বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায়, ততটুকু প্রকাশ করতে আগ্রহী হলাম। তৎপূর্বে এটুকু বলা প্রয়োজন যে দার্শনিক মতবাদগুলি যে আগাগোড়া ভ্রান্ত, তা' নয়; বহু মতবাদেই আংশিক সত্য নিহিত আছে; সেগুলি উল্লেখ করতে চেষ্টা করব। দর্শন কর্ত্তাগণ যে কেউই একেবারে কিছুই দর্শন করেননি, এমন নয়। যাঁরা প্রকৃত দর্শনলাভে ধন্য হয়েছেন সেই মায়ামুক্ত মহাপুরুষগণ কচিৎ স্বয়ং লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁদের মুখ থেকে শ্রুত তত্ত্ব তাঁর শিষ্য ও অনুগামীগণ লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। তাতেই বহুস্থানে সেই লিপিকারদের personal factor বা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ও মতামতে রঞ্জিত হয়ে সেসব মূল তত্ত্ব বিকৃত হয়েছে। কেউ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কেউ বিপক্ষযুক্তি খণ্ডন নিমিত্ত, কেউ নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপনকল্পে, কেউ নিজ শ্রেণী-স্বার্থ পরিপোষণে, কেউ তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় শাসনের চাপে প'ড়ে সেই সব মূল সত্যকে বিকৃত করেছেন, কেউ কিছু চেপে গেছেন, কেউ বা ভিন্ন মত সংযুক্ত করেছেন। বহুযুগ ধ'রে এইসব কিছু প্রত্যক্ষ, কিছু অপ্রত্যক্ষ, কিছু উদ্দেশ্যমূলক পরিবর্ত্তিত সন্নিবেশ বা 'প্রক্ষিপ্ত' আকারে—এই সব ভারতীয় দর্শন বর্ত্তমানে বহুবিকৃত। এগুলি স্পষ্ট হবে, আদিভারতীয় বা অন্-আর্য্য সভ্যতা ও তাঁদের উচ্চ আধ্যাত্মিকতার বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা।

যথার্থ 'ভারতবাসী' বলতে কাদের বোঝায়, এ বিষয়ে আমাদের একটা বিরাট ভ্রান্তি আছে। মহেঞ্জোদরো সভ্যতা আবিষ্কারের পর সে ভ্রান্তির নিরসন হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় তা' হয়নি আজো। মহেঞ্জোদরো সভ্যতা শুধু পাঞ্জাবের সভ্যতাই নয়;—এ সভ্যতা বিস্তৃত ছিল সমগ্র উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, পূর্ব্ব ভারত জুড়ে—এ সভ্যতা সারা ভারতের। পশ্চিমবঙ্গে অধুনা আবিষ্কৃত অজয় উপত্যকা, এবং মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত নিদর্শন সেই একই সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। এই বিষয়ে সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ' ১৩৭২ এর কিছু কিছু উক্তি উল্লেখযোগ্য: "সম্প্রতি বর্দ্ধমানের বহুস্থানে প্রাগৈতিহাসিক

ও তাম্র প্রস্তর সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আনুমানিক বয়স প্রায় খৃঃ পূঃ চার হাজার বছর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ব বিভাগ অজয় নদ উপত্যকায় বর্দ্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও বনকাঠিতে তাম্র প্রস্তর যুগ থেকে লৌহ যুগের এক সুমহান্ প্রাচীন সভ্যতা খনন ক'রে আবিষ্কার করেছেন। এ কথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রস্তর-তাম্র-ব্রোঞ্জ-লৌহ প্রভৃতি যুগ অতিক্রম করে সে সভ্যতা ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে বর্দ্ধমানের কোনো উল্লেখ নেই। পরবর্ত্তীকালে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে আর্যেতর ব্রাহ্মণেতর জনসমাজ উচ্চতর বৃহৎ হিন্দুসমাজে মিশে যায়।"

"প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নানাবিধ প্রাস্তরিক নিদর্শন গোটা সীমান্ত বাংলায় বিক্ষিপ্ত। আর্য্য-অনুপ্রবেশ যে ঘটেছিল, তারও প্রমাণ রয়েছে এই সব জেলায়। সীমান্ত বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের ফলে সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ স্পষ্ট।"

"পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতির স্থিতিস্থাপকতাই তাকে আর্য্যীকরণের হাত থেকে দীর্ঘকাল সরিয়ে রেখেছিল। অন্-আর্য্য লোক-সংস্কৃতির ধারা দ্রাবিড় সভ্যতার শেষ জীবাশ্ম বহন করে নেমে এসেছিল পশ্চিম থেকে পূবে। অন্-আর্য্য সভ্যতার সঙ্গে আর্য্য হিন্দুদের দীর্ঘকালীন বোঝাপড়া ঘটেছিল এইখানে।"

"ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রোটো-অষ্ট্রেলয়েড্ ও দ্রাবিড়বংশোদ্ভূত আদিবাসীদের আবির্ভাব ঘটেছিল কোনো অনিবার্য্য কারণে। সেই আগমন ঘটেছে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে। দ্রাবিড় সভ্যতা অতি প্রাচীন সভ্যতা—এই সভ্যতার চিহ্ন সনাক্ত হয়েছে মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায়। আর্য্য অনুপ্রবেশের ফলে পরবর্ত্তী কালে এই সভ্যতা ক্রমশঃ দক্ষিণে ও পূবে পিছু হঠে এসেছে। জাতি দল গোষ্ঠিভ্রষ্ট অনেক উপজাতি ও উপগোষ্ঠী দুর্গম অরণ্যের অন্ধকারে দীর্ঘকালের মত পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, যাযাবরের মত আস্তানা বেঁধেছে। এমনিভাবে সেই মহারণ্য সমুদ্রের তলায় পলি জমেছে, গড়ে উঠেছে অন্-আর্য্য জনবসতি ও সংস্কৃতির দ্বীপপুঞ্জগুলি।"

"রাঢ়ভূমির বিশাল নিষাদ সংস্কৃতি প্রথমে ছিল অন্-আর্য্য সম্ভব। পরে আর্য্য শোণিত ও অবরোধের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। পূজাপদ্ধতির অনুশাসন ও হরফ গেছে পাল্টে। বেদবাক্যের সঙ্গে অনেক খেদবাক্য মিশে সমাজ জীবনের বহুমুখী বাণী তৈয়ারী হয়েছে।"

"বাংলার প্রধান আদিম অধিবাসী সাঁওতালরা প্রাচীন দ্রাবিড় জাতি থেকে নিষ্পন্ন। আদিতে তারা যে ভারতের অন্য প্রান্তে ছিল, এমন মনে হয়।"

"নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও তাম্রযুগ নিদর্শন কুঠার ফলক বাংলাদেশের প্রাচীন প্রাগার্য্য সংস্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন। সাঁওতাল আদি বিচিত্র নিষাদ সংস্কৃতিও এই অঞ্চলেই।"

"বাংলার শস্যশ্যামলা সমতল ভূমি থেকে তার আদি বাসিন্দাগণ এদেশে আর্য্য-বিবর্ত্তনের স্তরে স্তরে উদ্বাস্তু হয়ে পার্ব্বত্য অরণ্যভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পশ্চিমে যখন আর্য্যরা অবিসংবাদী, তখনও যে বাংলায় সর্ব্বত্র অন্‌-আর্য্য বিচিত্র সংস্কৃতির উদ্বেল জলতরঙ্গ, সে তথ্যে কারো সংশয় নেই। আর্য্যরা এই আদি বাসিন্দাদের দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ ইত্যাদি আখ্যা দেয় এবং আর্য্য-শোণিতের সঙ্গে এদের আত্মীয়তা স্থাপনে প্রয়াসী হয়। কিন্তু অন্‌-আর্য্যগণ আর্য্যসকলের নিকট নির্জিত হননি এবং আত্ম-সংস্কৃতিরক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছেন। ঐ অন্‌-আর্য্যদের কাছ থেকে আর্য্যরা প্রভূত গ্রহণ করেছে এবং এতেই এঁদের সমুচ্চ পরিশীলনই প্রমাণিত হয়।"

"হিন্দুধর্মের অনেকখানি অংশই অন্‌-আর্য্য এবং আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া—সে বিষয়ে বিস্তর পুঁথি লিখিত হয়েছে। যত্রতত্র শিবমন্দির, শিবদেবতার বহুল প্রাধান্য। ঋগ্‌বেদের দেবতারা প্রাণীবাহনে আরোহণ ক'রে অন্‌-আর্য্য প্রভাব স্বীকার ক'রে নিলেন। শাক্তদেবীদের মধ্যে অন্‌-আর্য্য উপস্থিতি এখন সর্বতোভাবে প্রতিপাদিত হয়ে গেছে।"

এই সকল প্রামাণ্য উক্তি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আর্য্য আক্রমণের পূর্ব্বে সারা ভারতে এক অতি উচ্চ সভ্যতা, সংস্কৃতিসম্পন্ন ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনে অতি উন্নত জাতি বিদ্যমান ছিল ; এরা আর্য্য দস্যুদের আক্রমণে পরাজিত হয়ে কিছু দক্ষিণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিছু অরণ্যে অরণ্যে লুকিয়ে বেড়ান ও কিছু বন্দী হন। আর্য্যরা এঁদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিশেষতঃ ধর্মানুশীলনের অনেকাংশ আত্মসাৎ করে।

পণ্ডিতেরা বলেন এই আদিম অধিবাসীরাই প্রকৃত ভারতীয়। এঁদের গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, কৃষি-শিল্প-চারুকলা, সমাজব্যবস্থা, নগর পরিকল্পনা, দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এঁরা অতি উন্নত পর্য্যায়ের সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। এঁদের ব্যবহৃত উন্নত ধরণের লিপি, যার আজো পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়'ন, শীলমোহর প্রভৃতি এই উন্নত সভ্যতার সুস্পষ্ট নিদর্শন। তাঁরা শান্তিপ্রিয় ছিলেন। বৈদেশিক আক্রমণ না হওয়ায় তাঁরা দেশরক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেননি। শান্তিপ্রিয় সুসভ্য জাতি হিসাবে তাঁদের আধ্যাত্মিকতা অতি উন্নত ধরণের ছিল। এর নিদর্শন বহন করছে যোগাসনে উপবিষ্ট মহাদেবের সমাধিস্থ মূর্ত্তি ও অসংখ্য শিবলিঙ্গ।

শান্তিপ্রিয়তা ও সংরক্ষণশীলতা জাতির সভ্যতাকে উন্নত করলেও বহিঃশত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার শক্তিশালী ব্যবস্থায় ঔদাসীন্য এনে দেয়। বহুদিন

বহিঃশত্রুর আক্রমণ না হওয়ায় তাঁরা এর সম্ভাবনাটাও দেখতে পাননি। কিন্তু সেই আক্রমণ যখন সত্যই অতর্কিতে ভয়াবহ নিষ্ঠুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে এল, তখন তাঁদের দুর্ব্বল প্রতিরক্ষা শক্তিতে আর তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হল না। এটা এখন নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রায় চার হাজার বছর পূর্ব্বে যারা বহিঃশত্রুরূপে আদি ভারতীয়দের অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং নিষ্ঠুরতার ভয়াবহ লীলা চালিয়ে ভারতীয় সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল তারা আর কেউ নয়, তারাই কুখ্যাত 'আর্য্য'। এই নিষ্ঠুর যাযাবর দস্যুদল তাদের উন্নততর সামরিক সজ্জায় সজ্জিত হয়ে এক শান্তি-প্রিয় সভ্যজাতিকে ধ্বংস করেছিল। এই ভয়াবহ আক্রমণে পর্য্যুদস্ত হয়ে বহু ভারতীয় নিহত হলেন, কিছু সংখ্যক তাদের হাতে বন্দী হলেন, আর বাকীদের মধ্যে যারা সমর্থ হলেন তাঁরা দলে দলে দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় নিলেন, আর যাঁরা অতদূর যেতে পারলেন না তাঁরা নিষ্ঠুর দস্যুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে গভীর জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করলেন। যাঁরা দক্ষিণ ভারতে গেলেন, তাঁরা কালক্রমে সেখানকার স্বাধীন ও সভ্য ভারতবাসীর সাথে মিশে গেলেন; আর যে সব দরিদ্র ও অক্ষম ভারতীয় বনে জঙ্গলে লুকালেন, তাঁরাই হাজার হাজার বছর ধ'রে ভারতের 'আদিবাসী' ব'লে পরিচিত হয়ে রইলেন। এঁরা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিক, এবং আত্মরক্ষার্থে এঁদের এক অরণ্য থেকে গভীরতর অন্য অরণ্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হ'ল। তাই ঘরবাড়ী বেঁধে পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রাখবার কোনো সুযোগই এঁরা পেলেন না। তখন সারা উত্তর ভারতে চলেছিল নিষ্ঠুর আর্য্য-অভিযান; তারই ফলে নির্দ্দয়ভাবে বিপর্য্যস্ত ও লণ্ডভণ্ড হ'ল আদি ভারতীয় বাসীদের সভ্যতা।

এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের অর্থাৎ কয়েকশত বৎসর পূর্ব্ব থেকে আমেরিকার আদিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ান্দের উপর ইউরোপীয় 'আর্য্য'দের নিষ্ঠুর অভিযান-কাহিনী। 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত June 5, 1960 তারিখের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "মনুষ্যহত্যায় তথাকথিত ইউরোপীয় সভ্যজাতিরা নরখাদকদের চেয়ে অনেক বেশী দড়। যাদের গায়ের চামড়া সাদা নয়, তাদের অসভ্য মনে করা শ্বেতাঙ্গদের বহুকালের অভ্যাস। এতে তাদের দুটো বড় সুবিধা হয়—প্রথমতঃ, সভ্যকরার মহৎ আদর্শের নামে তাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন, তাদের শ্রমশক্তিকে বে-পরোয়া নিয়োগ, বেয়াড়াপনা করলে তাদের জানোয়ারের মত মেরে ফেলা এবং এইভাবে দেশ থেকে আসল বাসিন্দাদের বিলুপ্ত ক'রে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন করা। ফলে রেড্-ইণ্ডিয়ানরা তাদের স্বদেশে আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন যদিও তারা শিল্পে ও মানবীয় ঐতিহ্যে শ্রদ্ধেয় ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী হত্যা, উৎপীড়ন ও উৎসাদনের সে এক অনবচ্ছিন্ন ইতিহাস।——আজও তাদের বংশধররা

অরণ্যে আছে। পাভেল্লা আমাজন্ অববাহিকায় ৮০০ জন ইণ্ডিয়ান্‌কে হত্যা করে, ৩০০ জনকে দাস বানায়। ভগোজোঙ্গ ১৫০০০ লোককে নিশ্চিহ্ন করে। জোর ক'রে আদিবাসীদের লাগানো হয় রবার সংগ্রহ কাজে। সাজা দেওয়ার জন্য বা মজা দেখার জন্য তাদের উপর কুকুর লেলিয়ে অঙ্গচ্ছেদ ক'রে হত্যা করা হ'ত। আমেরিকার যেসব উপজাতি পালিয়েছিল জঙ্গলে, তারা সেখানেই আছে; পুনরাক্রমণের ভয়ে অরণ্যের আরো গভীরে আত্মগোপন করেছে। অতীত ব্যবহারের স্মৃতি তাদের মধ্যে আজো জীবন্ত। তাদের চোখে শ্বেতাঙ্গ হ'ল—শয়তান, খুনী ও বিশ্বাসঘাতক।"

অনুরূপ অবস্থা ভারতীয়দেরও। কিন্তু এখানকার ইতিহাস চার-পাঁচশত বছরের নয়, চার-পাঁচ হাজার বছরের। তাই মূল বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও, বহুদিনের সংমিশ্রণের ফলে কিছু কিছু ভিন্নরূপ দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গ অভিযানকারীরা মূলতঃ সবাই নিষ্ঠুর দস্যুদল। পরদেশ দখল ক'রে সেদেশের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন ক'রে ভোগ করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। ইউরোপীয়দের তবু একটা স্বদেশ ছিল। আমেরিকায় তারা উপনিবেশ স্থাপন করতে এসেছিল। কিন্তু আর্য্যরা যাযাবর ও অসভ্য দস্যুদল মাত্র। ভারতে তারা বসবাস করতেই চেয়েছিল। অথচ সামরিক শক্তিবলে গণহত্যা ও লুণ্ঠন চালালেই সেখানে চিরস্থায়ী বসবাস করা যায় না, দস্যু আর্য্যরা এটুকু বুঝত। কারণ তারা না জানত কৃষি, না বুঝত শিল্প, না পারত গৃহনির্মাণ করতে; শিক্ষা ও সংস্কৃতির তো বালাই-ই ছিল না। সুতরাং প্রয়োজনের খাতিরে তারা জনপদের উপর জনপদ দখল করেই ক্ষান্ত হ'ল না, সেখানকার বাসিন্দাদের বহুসংখ্যককে বন্দী ক'রে নিজেদের প্রয়োজন মতো কাজে লাগাল। কৃষিবিদ্, শিল্পী, স্থপতিদের তো তারা নিজ স্বার্থে কাজে নিয়োগ করলই, উপরন্তু ভারতীয়দের মধ্যে যারা জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান্ ও ধর্মতত্ত্ববেত্তা—তাদেরও নিজ অধীনে রেখে তাদের গুণ, বিদ্যা ও ধর্মজ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করল। ভারতীয়দের বাধ্য হয়ে ক্রীতদাসের মতোই তাদের এইসব বিদ্যা শেখাতে হ'ল। ভারতীয়গণ তাঁদের উন্নত আধ্যাত্মিক বিদ্যা ও ধর্মানুশীলনেরও কিছু কিছু ওদের শেখাতে বাধ্য হলেন। কিন্তু যা' কিছু শেখালেন তা' মুখে মুখে ও 'হাতে কলমে'। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিগূঢ় বা অন্তরঙ্গ অংশটি তাঁরা সযত্নে এদের কাছ হ'তে গোপন রাখলেন। শুধু মাত্র বহিরঙ্গটুকু, অর্থাৎ প্রাকৃতিক দেবদেবী, তাঁদের বাহ্যিক পূজা অর্চনা বিধি, যাগযজ্ঞের আড়ম্বর, চিকিৎসাবিদ্যা—এইসব কিছু কিছু শেখালেন। এসব বিদ্যা আর্য্যরা বহু শতাব্দী ধ'রে অনুশীলন ক'রে ক্রমে ক্রমে আত্মস্থ ক'রে নিল এবং সে বিদ্যা তাদের নিজস্ব বিদ্যা ব'লে জাহির ক'রে তা' 'বেদ' নামে প্রচার করল। বিজেতারা যা' প্রচার করে, তাই সত্য ব'লে মানতে বাধ্য হ'তে হয় সকলকে। নিরক্ষর আর্য্যদের তো লিপির বালাই ছিল না, ভারতীয়রাও এ বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব লিপির ব্যবহার

করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ফলে এসব বিদ্যা মুখে মুখেই অধীত হ'তে লাগল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এরূপ চলাতেই বেদকে 'শ্রুতি' নামে অভিহিত করা হয়।

কালের অমোঘ গতিতে ও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ও আর্য্য-রক্তের সংমিশ্রণ ঘটল এবং এক বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হ'ল। অবশ্য খাঁটি 'ভারতীয়'ও কেউ কেউ থেকে গেলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এঁদের মধ্যে একজন। ভারতীয়দের আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মই হ'ল প্রাণস্বরূপ। তাই তাঁরা এর যথার্থ স্বরূপ বা অন্তরঙ্গ রূপটি পরবর্ত্তীযুগেও যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। বৈদেশিক, নিষ্ঠুর ও একান্ত অধার্মিক আর্য্যদের তা' কখনই জানতে দেননি। বরাবরই উত্তরভারতে এ ধারা চ'লে এসেছে। এমন কি প্রাকৃত দেবদেবীর অর্চ্চনা ইত্যাদিতে যে সব বহিরঙ্গ বিধি তাঁরা শিখিয়েছিলেন, স্বভাবক্রূর আর্য্যগণ তাদের নিষ্ঠুর জীবহত্যালীলায় ও ভারতীয়দের পীড়নে (তাদের 'শূদ্র' আখ্যায় অপাঙ্‌ক্তেয় ক'রে) তার যথেষ্ট অপব্যবহার করেছে এবং এখনও ক'রে চলেছে এবং সেইজন্যই মহাপ্রভু "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ, নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ।"

পরবর্ত্তীযুগে উপনিষদে ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশিত করলেও, এই ধর্মাচার্য্যগণ সে তত্ত্ব ইচ্ছা ক'রেই দ্ব্যর্থমূলক ও সংশয়াত্মক রেখেছেন। ব্যাপকভাবে এসব তত্ত্ব প্রচারিত হ'লে, অসুর-স্বভাব আর্য্যগণ তার অপব্যবহার করবে, তাই বিশেষ পরীক্ষা ক'রে নির্ব্বাচিত শিষ্যদের কয়েকজনকে মাত্র তা' 'গুরুমুখী' শিক্ষণীয় বিষয় ক'রে রেখেছেন। ভালোয়-মন্দয়, ধর্ম-অধর্মে মিশ্রিত পরবর্ত্তী সমাজে এ ব্যবস্থা অপরিহার্য্য ছিল।

উপরি উক্ত বিশ্লেষণের প্রমাণ স্বরূপ পূর্ব্বের উদ্ধৃতিগুলি স্মরণ করা যেতে পারে; আরও দু'একটি উদ্ধৃতি সন্নিবিষ্ট করছি। দস্যু আর্য্যদের প্রথম অভিযানকে জয়যুক্ত করবার আহ্বানে ঋগ্‌বেদে লিপিবদ্ধ আছে: "হে ইন্দ্র, তুমি শত্রু ধর্ষণকারীরূপে যুদ্ধ হ'তে যুদ্ধান্তরে গমন কর, বল দ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস কর"। "মহেঞ্জোদরো যিনি ধ্বংস করেছিলেন, তিনিও একজন ইন্দ্র; ঘাতকেরা নাকি পরিচয়ে আর্য্য"।— আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬শে আষাঢ়, ৭২। এখানে 'ইন্দ্র' অর্থ দলাধিপতি। আমেরিকার রেড্‌-ইণ্ডিয়ান্‌দের মত যে সব উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে পলায়ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁদের উত্তর ভারতীয়দের প্রতি একটা 'বিজাতীয়' আক্রোশ বর্ত্তমান; এবং এ ভাব আজও বেশ প্রকট আছে। দক্ষিণ ভারতীয়দের শিল্প, মন্দির ও নগর নির্মাণ কৌশল এবং তাঁদের আধ্যাত্মিকতার একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। শিবলিঙ্গ সারা দক্ষিণ ভারতে আজিও পূজ্য। উত্তর ভারতেরও গ্রামে গ্রামে তার অবশেষ চিহ্ন আছে। অথচ, আর্য্য কথিত 'বেদে', শিবকে 'অন্‌-আর্য্য' দেবতা বলা হয়েছে।

আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান্দের মত নিম্ন শ্রেণীর অসহায় ভারতীয়রা নিষ্ঠুর আর্য্য আক্রমণের ভয়ে বন থেকে গভীর বনান্তরে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন— পাঁচ হাজার বছর দীর্ঘ সময়েও তাঁদের উত্তর ভারতীয় আর্য্যরীতিনীতি গ্রহণ করাতে পারেনি। খাঁটি ভারতীয়গণ চিরদিনই রক্ষণশীল এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অটুট ও অক্ষুণ্ণ। আর্য্যদের প্রতি তাঁরা আজও একটা 'বিজাতীয়' মনোভাব পোষণ ক'রে থাকেন। আর্য্য ও ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণে উদ্ভূত নব 'আর্য্য-ভারতীয়'গণ ও কিছু কিছু খাঁটি ভারতীয় জ্ঞানী ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ পরবর্ত্তীকালে বহু ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন প্রণয়ন করেছেন। পূর্ব্বেই বলেছি এই সব শাস্ত্র প্রণেতাগণ ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ়তা বিষয়ে এবং তার সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই তাঁদের ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন কালোপযোগী বহু আবরণে ও আভরণে আচ্ছাদিত ও অলঙ্কৃত। এবার এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

আদি ভারতীয়দের সভ্যতা,সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সুস্পষ্ট নিদর্শন আজও দক্ষিণ ভারতে বিদ্যমান। তাঁরা আধ্যাত্মিকতার অতি উন্নত স্তরে পৌঁছেছিলেন। তাঁদের অনেকেই দুরূহ ধর্মসাধন করেছিলেন এবং ধর্মতত্ত্বের সত্যস্বরূপ অবগত ছিলেন। সাধারণ ভারতীয়েরাও এ সব সাধককে ও তাঁদের সাধনপন্থাকে অতিশয় শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। প্রাচীন মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ ধর্মসাধনপন্থাগুলি ও শিবলিঙ্গপূজন প্রভৃত শ্রদ্ধাসহকারে জনগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের অসুর-স্বভাব, হিংস্র ও নিষ্ঠুর আর্য্যগণ কর্ত্তৃক এর অপব্যাখ্যা, অমর্য্যাদা ও অপব্যবহারের আশঙ্কায় উত্তর ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ সযত্নে এ সব তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রাখলেন। তাই উপনিষদে ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত করলেও, তা' নানার্থমূলক ক'রে রাখলেন। বেদান্তসূত্রগুলি ইচ্ছা ক'রেই highly condensed form বা অতিশয় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রণীত হয়েছে, যার ফলে এর নানা অর্থ হ'তে পারে। হয়েছেও তাই। মূল রচনা যে এইরূপ একটি উদ্দেশ্য মূলক তা' স্পষ্টই বোঝা যায়। এটা তৎকালীন সামাজিক, তথা রাষ্ট্রীয় পরিবেশে বহিরঙ্গের অপব্যবহারের ভয়েই যে করা হয়েছে তা' সুস্পষ্ট। প্রকৃত সাধনযোগ্য সাধক গুরুমুখে শ্রবণ ক'রে ও সেইমত সাধন ক্রিয়া দ্বারা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান অবগত হয়েছেন।

বৌদ্ধযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে ধর্মের নামে এইরূপ একটা ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা, অমানুষিকতা ও অরাজকতার যুগ এসেছিল। তাকে রোধ করবার জন্যই বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, সংসার ত্যাগ, তপস্যা ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার। তখন খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজাই ছিলেন আর্য্যবংশোদ্ভব। তদানীন্তন উত্তর ভারতীয় সমাজ মুখ্যতঃ আর্য্য ও মিশ্রজাতি দ্বারা গঠিত। প্রাচীন ভারতীয়দের নিকট থেকে প্রাপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা বা

ধর্মশাস্ত্রকে তখন সকল শ্রেণীর লোকই শ্রদ্ধার চোখে দেখত। দেবপূজক অর্থাৎ পুরোহিত শ্রেণী তখন সমাজের শীর্ষ দেশে। তাঁরা যা' প্রচার করতেন, যেরূপ বিধি নিষেধের ব্যবস্থা দিতেন, স্বয়ং রাজা তা' সমর্থন করতেন এবং জনসাধারণ নীরবে সে সব মেনে নিত। এই পুরোহিতগণও কালক্রমে বেশীর ভাগই আর্য্যবংশোদ্ভব হয়ে গেলেন; সমাজের শীর্ষস্থানে বিশুদ্ধ ভারতীয়দের সংখ্যা ক্রমে লোপ পেয়ে গেল। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল এই যে প্রাচীন ভারতীয়দের বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবাদ আর রইল না, তা' ক্রমে আর্য্যদের হিংসা, নিষ্ঠুরতা ও পরপীড়নের স্বভাবপুষ্ট হয়ে এক বীভৎসরূপ ধারণ করল। ধর্মের নামে লক্ষ লক্ষ অসহায় জীবহত্যা, শ্রেণী বা জাতিভেদ, এবং প্রকৃত ভারতীয়গণকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত ক'রে ও 'শূদ্র' আখ্যা দিয়ে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলতে লাগল। বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগযজ্ঞের বিকৃত অর্থ ক'রে নৃপতিগণ কর্তৃক সে সবের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান চলতে লাগল অবাধ গতিতে। অর্থাৎ ধর্মের দোহাই দিয়ে দুস্তর সামাজিক শ্রেণী বিভেদ, দরিদ্রশোষণ, সামাজিক অসংখ্য খুঁটিনাটি বিধি নিষেধ, জীবহত্যা ও অসহায় নিম্নশ্রেণীর ভারতীয়দের উপর উৎপীড়ন চলল। শাসকগণ সমর্থিত পুরোহিত সম্প্রদায় এইসব অত্যাচারের প্রধান উৎসস্থল হয়ে উঠল। ধর্মের যখন এই বিকৃতরূপ, শাসককুল তার সমর্থক, অসহায় জনগণ অত্যাচারে জর্জরিত,—ঠিক সেই সময়ে দুই ধর্মনেতা আবির্ভূত হলেন—মহাবীর ও বুদ্ধদেব। নীতিগতভাবে বৌদ্ধধর্মের সহিত জৈনধর্মের বহু সাদৃশ্য থাকায় এখানে শুধু বৌদ্ধধর্মেরই আলোচনা করব।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্য্য-পূর্ণ। প্রথমতঃ তিনি ছিলেন আর্য্য বংশোদ্ভব; দ্বিতীয়তঃ তিনি এক রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী; তৃতীয়তঃ তিনি যৌবনেই রাজ্য, স্ত্রী, পুত্রের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন ক'রে গৃহত্যাগ করতঃ কঠোর তপস্যায় রত হয়েছিলেন এবং পরিশেষে মায়ামুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাই প্রথমে তাঁর শিষ্য-সংখ্যা অল্প হ'লেও ক্রমেই তার পরিধি বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং তাঁর বাণী ধর্মনিপীড়িত জনগণকে তো বটেই এমন কি কোনো কোনো নৃপতি এবং জ্ঞানী-গুণী-সমাজকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করল। তাঁর বাণী ধর্ম-অত্যাচারে জর্জরিত অসহায় জনগণকে এক অভিনব আশার আলোক দেখাল; পুরোহিতদের প্রবর্তিত আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা বিধিনিষেধের কাঠগড়া থেকে তাদের মুক্ত ক'রে নিয়ে এল। জ্ঞানী ও গুণীজনগণ ধর্মতত্ত্বের দুর্ভেদ্য জটিল জালে নিবদ্ধ হয়ে ভগবৎ-তত্ত্ব, তথা ধর্ম-পথ শুধু বিভ্রান্তিময় ব'লেই মনে করেছিলেন। তাঁদেরও সেই তত্ত্ব-জাল থেকে একেবারে নিষ্কৃতি দিল বুদ্ধদেবের বাণী। বুদ্ধদেব শান্তমধুর কণ্ঠে বললেন; (১) প্রত্যেক মানুষের জীবনই দুঃখময়, (২) সেই দুঃখের কারণ আছে, (৩) কিন্তু সেই দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব,

(৪) দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে। বুদ্ধদেবের এই 'সত্যচতুষ্টয়' দিকে দিকে আশার আলোক উদ্ভাসিত ক'রে তুলল।

কিন্তু কী সে উপায়? বুদ্ধদেব অভয় বাণী শোনালেন, "ভয় নেই; পুরোহিতদের বিধিনিষেধ মানতে হবে না, যাগযজ্ঞ করতে হবে না, ধর্মের নামে লক্ষ লক্ষ অসহায় জীব হত্যা করতে হবে না।" জনসাধারণ বিস্মিত হয়ে বললে, "কিন্তু বেদে যে এসব কথাই বলে, বেদতো অভ্রান্ত"। বুদ্ধদেব উদাত্তকণ্ঠে বললেন, "বেদ মানতে হবে না। শুধু সৎ হও—কর্মে সৎ, বাক্যে সৎ, চিন্তায় সৎ"। জ্ঞানী ও গুণী জনগণ শুধালেন, "কিন্তু তত্ত্বকথা শুনালেন কৈ? কেন দুঃখ হয়, কে আমাদের দুঃখ দেয়, কী তার স্বরূপ? তারপর—আমি কে, ঈশ্বর কে, তাঁকে পাবার উপায় কী—এ সব কথার উত্তর কৈ?" বুদ্ধদেব বললেন, "কেউ যদি শরাহত হয়ে যন্ত্রণা অনুভব করে, তবে কর্তব্য হবে ঐ শরটি আহত স্থান থেকে তুলে ফেলে সেখানে ঔষধ লাগানো। শরটি কী দিয়ে প্রস্তুত, কী তার গুণাগুণ, কে এটি নিক্ষেপ করল, কেন নিক্ষেপ করল, কেমন তার স্বরূপ—এ সব প্রশ্ন অবান্তর।" শ্রোতারা তৃপ্ত হয়ে বললেন, "অতি চমৎকার কথা"। বুদ্ধদেব শোনালেন, "মানুষের জীবন দুঃখময়; এই দুঃখ নিবৃত্তিই সমস্যা। তত্ত্ব-আলোচনায় শুধু বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতের সৃষ্টি হয়। এ সব মত একদেশদর্শী হ'তে বাধ্য। ঠিক অন্ধের হাতী-দেখার মত। নিরর্থক শুষ্ক আলোচনা মানুষকে আরো বিভ্রান্ত করে, দুঃখ-নিবৃত্তির কোনো সমাধান হয় না তাতে।" বুদ্ধদেব স্পষ্টই বুঝেছিলেন, বেদকে মানলে এবং ভগবৎতত্ত্ব নিয়ে প্রহেলিকাময় আলোচনা চালালে সেই পুরোহিতদের বিকৃতি ব্যাখ্যাযুক্ত বেদের মনুষ্যত্বহীন অপকৌশলের খপ্পরে পড়তেই হবে; তত্ত্বকথার কুটিল ও জটিল জালে মানুষ যত জড়াবে, ততই সেই জাল জটিলতর হবে। জনগণকে দুঃখ-দুর্দশা ও উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। তাই তিনি স্বয়ং এসব তত্ত্বকথার আলোচনা সযত্নে পরিহার করেছেন এবং শিষ্যদেরও সেইরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য মনুষ্যের দুঃখের কারণ সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে দ্বাদশটি নিদান বা 'ভব-চক্রে'র উল্লেখ করেছেন। দুঃখের কারণ বাসনাপূরণ কামনায় কৃতকর্ম। কার্য্য হ'লেই তার কারণ থাকে। দুঃখ হচ্ছে ফল এবং কারণ কর্ম। এই অমোঘ কার্য্য-কারণতত্ত্বকে বৌদ্ধরা বলেছেন 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ'। কর্ম করায় 'ভবচক্র'। এর একটি থেকে আর একটির উদ্ভব হয়। বিনাসাধনে এই অমোঘচক্র থেকে কেউ পরিত্রাণ পায় না। এগুলির ক্রম এইরূপ:—(১) অবিদ্যা, (২) ঘনীভূত পূর্ব্বজন্মজ সংস্কার, (৩) উক্ত চেতনা, (৪) জীবদেহ, (৫) ছয় ইন্দ্রিয়, (৬) ইন্দ্রিয়সহ বিষয়-সংস্পর্শ, (৭) পূর্ব্বভুক্ত বিষয় ভোগের স্মৃতি, (৮) বিষয় ভোগতৃষ্ণা, (৯) বিষয়কে সাগ্রহে নিমগ্ন থাকা, (১০) জন্মগ্রহণের ইচ্ছা, (১১) জন্ম, (১২) জরা-মরণাদি দুঃখ।

দুঃখের কারণগুলি রোধ করতে হ'লে শুধু নিষ্কাম কর্ম ক'রে যেতে হবে। এর জন্ত আট রকম নিয়ম নির্দ্দেশ করলেন তিনিঃ (১) অবিদ্যা বা মিথ্যা দৃষ্টি দূর; (২) সংসারাসক্তি ত্যাগ (৩) মিথ্যাভাষণ, পরদ্বেষ, পরনিন্দা ও কর্কশ বাক্য বর্জ্জন; (৪) স্বার্থশূন্য কর্ম; জীবহত্যা, চুরি, ইন্দ্রিয় সেবা নিষেধ; (৫) সৎউপায়ে জীবিকা অর্জ্জন; (৬) অসৎ চিন্তা ত্যাগ ও সৎ চিন্তা অভ্যাস; (৭) দেহ ও মন 'আমি' নই—এই স্মরণ; (৮) সমাধি। সমাধি'র অর্থ বাসনার বিলোপ ও 'পরমসত্তা'র সহিত মিলন। এতেই সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি ঘটে।

ধর্ম-প্রপীড়িত অসহায় জনগণ সাগ্রহে বুদ্ধদেবের এই উপদেশ গ্রহণ করলেন; জ্ঞানী গুণীরাও যেন এই বাণীতে তত্ত্বের জটিল জাল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। অনেক নৃপতিও মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং যৌবন কালেই দুস্ত্যাজ 'হৃদিস্পৃশঃ' দারা-সুত ও রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে কঠোর সাধনা দ্বারা ভগবৎতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছেন ও সেই তত্ত্ব প্রচার করেছেন। যিনি এত ত্যাগ ও সাধনা ক'রে সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দর্শন ও তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি করলেন, তিনি ঈশ্বর মানতেন না, একথা একেবারেই ভুল। পরন্তু জনগণের হিতার্থে এবং তদানীন্তন পুরোহিতবর্গের অপকৌশল হ'তে তাদের রক্ষা করতে তিনি ইচ্ছা করেই তত্ত্বকথা এড়িয়ে গেছেন এবং কদর্থ সমন্বিত বিকৃত ব্যাখ্যাপূর্ণ বেদকে না মানতে সকলকে উপদেশ করেছেন। 'শরাহত' ব্যক্তির যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টাই তিনি করেছেন—শর ও শরনিক্ষেপ-কারীর 'তত্ত্বকথা' নিয়ে কালক্ষেপণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। বৌদ্ধধর্ম তাই মূলতঃ নীতি ও আচরণ মূলক, তত্ত্বসমৃদ্ধ নয়।

বুদ্ধদেব স্বয়ং যা' বলেছেন তা' সাধনসিদ্ধ প্রত্যক্ষদ্রষ্টার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত পরম-সত্য। এ সত্য চিরন্তন। যা' বলেননি, যা এড়িয়ে গেছেন, তা' নিয়ে বিতণ্ডা করার কোনো অর্থ হয় না। তিনি তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে ইচ্ছা ক'রেই সে সব সম্বন্ধে নীরব ছিলেন।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোনো দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেননি। কিন্তু তাঁর তিরোভাবের পর বৌদ্ধ ধর্মমত যখন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে, তখন প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে তাঁর পরবর্ত্তী শিষ্যেরা তাঁর উপদেশ ও ধর্মকে দর্শনের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে প্রয়াসী হলেন। কিন্তু তাঁরা দু ভাগ হয়ে গেলেন। একদল কঠোরভাবে বুদ্ধপন্থী, এঁরা নিজেদের অন্তরঙ্গ বলেন। এঁরা বলেন, কঠিন ও কঠোর সংযমের দ্বারা আত্মচেষ্টায় মুক্তি অর্জ্জন করতে হবে এবং এরজন্ত সংসার না ক'রে, ইন্দ্রিয় জয় করতঃ সব আত্মসুখ বাসনা পরিহার করতে হবে। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এত কঠোরতা পালন সম্ভব নয় ব'লে খুব কম, অর্থাৎ 'হীন' সংখ্যক লোক এই মতবাদ গ্রহণ করে

—তাই এঁরা 'হীনযান' নামে পরিচিত। এঁরা মন ও জড় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বা অনুমানে তা' জানা যায়, অর্থাৎ এঁরা বাস্তববাদী—Realist। দ্বিতীয় দল হ'ল, সংস্কারপন্থী। এঁরা অতটা কঠোরতা অপরিহার্য্য ব'লে মনে করেন না। এঁরা এক শাশ্বত সত্তায় বিশ্বাসী এবং বুদ্ধদেবকে সেই শাশ্বত সত্তার মানবিক অবতার ব'লে মনে করেন। বুদ্ধের কৃপাতেই মুক্তি হবে ব'লে এঁদের বিশ্বাস। এঁরা বলেন জড় বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং বস্তুর যথার্থ সত্তা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই দলে বেশী লোক যোগ দেওয়ায় এঁদের 'মহাযান' বলা হয়। এঁরা আদর্শবাদী—Idealist। বলা বাহুল্য বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি উভয় দলেই অব্যাহত আছে। বুদ্ধদেব স্বয়ং দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনা পরিহার করলেও, পরবর্ত্তী যুগের এই 'দর্শন'ই ক্রমে ক্রমে ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্মের 'অদর্শনে'র কারণ হয়েছে।

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ছাড়াও ভারতে প্রধানতঃ ছয়টি বিভিন্ন দর্শন প্রচলিত আছে। নানার্থব্যঞ্জক বেদান্তের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। এবার পরবর্ত্তী পাঁচটি দর্শনের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব। বেদান্তপ্রণেতা যে স্বয়ং-সাধক এবং সাধন ক'রে প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ তত্ত্বই প্রচার করেছেন, এ বেশ স্পষ্ট। কিন্তু তদানীন্তন বৈদেশিক আর্য্য-পরিবেশে ধর্মতত্ত্বের অপব্যবহারের আশঙ্কায় তিনি সূত্রগুলি প্রণয়নে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, এবং সেগুলির মাত্রাতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে তাদের বিভিন্নার্থব্যঞ্জক ক'রে রেখেছেন। পরবর্ত্তী ভাষ্যকারগণ এক এক ভাবে তার টীকা করেছেন। উপনিষদ সম্বন্ধেও প্রায় ঐ একই কথা। কিন্তু অপর পাঁচটি দর্শনের প্রণেতাগণের মধ্যে কেউ কেউ সাধক বা তত্ত্বদ্রষ্টা থাকলেও, সমগ্র দর্শনটি যে সেই প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার প্রণয়ন তা' স্বীকার করা যায় না। এইসকল দর্শনে চিন্তাশীল 'দার্শনিক'দেরই অবদান বেশী। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রণেতার inter-polation বা অবৈধ সন্নিবেশের ফলে তা' ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে, এবং কখনো কখনো তা' দুর্ব্বোধ্য ও অসামঞ্জস্য পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেইজন্য এই সব বিভিন্ন দর্শনের অধিকাংশের মধ্যে মিল তো নেই-ই, উপরন্তু একটি দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যেও প্রচুর অসঙ্গতি রয়ে গেছে। প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর বিবরণে তা' হ'তে পারে না।

এদের মধ্যে 'সাংখ্য' ও 'যোগ' দর্শন সমগোত্রীয়; যুক্তিবাদী 'ন্যায়' ও 'বৈশেষিক'ও সমশ্রেণীর, এবং 'পূর্ব্ব মীমাংসা' বেদের কর্মকাণ্ডের দার্শনিক বিশ্লেষণ। সাংখ্যের মতামত বহু প্রাচীন কালের, এবং উক্ত মতানুযায়ী ধর্মসাধনপন্থারূপ যোগসাধনাও আদি ভারতীয়দের আমলের। অথচ 'আদি বিদ্বান্' কপিলদেবের রচিত ব'লে সাংখ্যের যে তিনটি গ্রন্থ সাংখ্যকারিকা, সাংখ্য প্রবচনসূত্র ও তত্ত্বসমাস প্রচলিত আছে, তাদের নিজেদের মধ্যেই সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে। সাংখ্যে চিন্ময়, স্বপ্রকাশ

জীবাত্মা, অর্থাৎ 'পুরুষ', ও 'জড়াপ্রকৃতি'—এই দুটি স্বতন্ত্র মূলসত্তা স্বীকার করা হয়েছে। পুরুষকে কর্মফল ভোগ করানোই প্রকৃতির উদ্দেশ্য। পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—প্রকৃতি পুরুষ একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না কেন? আর পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করে কে? এ মূল প্রশ্নের উত্তর সাংখ্যে উহ্য আছে। প্রশ্নটা অতি স্বাভাবিক, আপনিই জাগে; কিন্তু উত্তরটা যেন দিয়েও দিচ্ছেন না সাংখ্যকার। 'তত্ত্বসমাসে' এর উত্তর ছিল—তিনি 'ঈশ্বর'। কিন্তু পরবর্তীরা এ 'ঈশ্বর-তত্ত্ব' এড়িয়ে গেছেন, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে। হয়তো এ উদ্দেশ্য তদানীন্তন বহুল প্রচারিত বৌদ্ধমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য। সাংখ্য বুদ্ধের অনেক পূর্ব্বেকার। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এর পরিবর্ত্তন হয়েছে। তবু 'ঈশ্বর নেই'—এ কথা সাংখ্য বলেন নি; ঈশ্বরের তত্ত্ব প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, এই বলেছেন পরবর্ত্তীরা। প্রকৃত পক্ষে যুক্তিতর্ক দ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'তে পারে না। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার, দেশকালের স্বরূপ বিচার প্রভৃতি দার্শনিকতত্ত্ব অনবদ্য। দেশ-কালতত্ত্ব Kantএর সঙ্গে তুলনীয়।

যোগশাস্ত্র হচ্ছে সেশ্বর সাংখ্য। মায়ামুক্তির উপায়স্বরূপ পতঞ্জল মুনি যোগ-সাধনকে অপরিহার্য্য বলেছেন। দার্শনিক তত্ত্ববিচারে সাংখ্যের সহিত প্রায় একমত হ'লেও, পতঞ্জলের যোগসাধন প্রক্রিয়া বর্ণনাই এর বৈশিষ্ট্য। ভোগ্য বিষয়ের সংস্পর্শে চিত্ত বিষয়ের রূপ লাভ করতঃ কর্মফল ভোগ করে। বিষয়-সংস্পৃষ্ট চিত্তের এই বিকার বা 'বৃত্তি'ই হ'ল জীবের 'বন্ধ'। এ থেকে মুক্তি পেতে হ'লে 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ' করতে হবে। এর উপায় স্বরূপ যোগাভ্যাসকে অপরিহার্য্য বলা হয়েছে। সাধক যোগাভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তবৃত্তি নিরোধের পথে এগিয়ে যাবে, এবং তাতেই পরিণামে দুঃখ নিবৃত্তি হবে। এই যোগাভ্যাস অনুশীলনের আট প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন পতঞ্জল: (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, (৮) সমাধি। 'যম' হচ্ছে নিষেধাত্মক; হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য্য, ইন্দ্রিয়সেবা, অর্থলালসা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করতে হবে। 'নিয়ম' হচ্ছে অনুশীলনাত্মক; শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান। 'আসন'—নানাবিধ যোগাসন। শ্বাসজয় প্রক্রিয়াই 'প্রাণায়াম'। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে তাদের বিষয়বস্তু থেকে তুলে নিয়ে অন্তর্মুখী করাই 'প্রত্যাহার'। চিত্তকে অভীপ্সিত বিষয়ে দীর্ঘকাল সংযুক্ত রাখার নাম 'ধারণা'। আর গভীরতর নিরবচ্ছিন্ন ধারণাই হচ্ছে, 'ধ্যান'। গভীরতর ধ্যানের নাম 'সমাধি', এতে দৃশ্য ও দ্রষ্টার দুই সত্তা মিলে এক হয়ে যায়।

পতঞ্জল অতি সতর্কভাবে 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কথা বলেছেন। ঈশ্বর অনন্ত শক্তি, ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানময়; জীবের 'অদৃষ্ট' অনুযায়ী প্রকৃতির নিয়ন্তা; করুণাময়, জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু চিত্তের একাগ্রতার জন্য 'ঈশ্বর প্রণিধান'কে অনেক উপায়ের মধ্যে একটি উপায় বলা হয়েছে। মায়ামুক্তির জন্য ঈশ্বরভক্তি যে অপরিহার্য্য একথা বলতে গিয়েও, কোনো সাময়িক প্রয়োজনে, পতঞ্জল চেপে গেছেন।

যুক্তিবাদী 'ন্যায়' ও 'বৈশেষিক' দর্শন যুক্তিতর্কের দ্বারা বস্তুবাদ ও বহু সত্তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে, অর্থাৎ এ শাস্ত্র Logical Realism ও Pluralismএর সমর্থক। এরা যুক্তিতর্ক দ্বারা তিন প্রকারের পৃথক ও নিত্য সত্তার প্রতিষ্ঠা করেছে: (১) চিন্ময় ঈশ্বর, (২) চিন্ময় জীবাত্মা, (৩) অসংখ্য জড় পরমাণু। ঈশ্বর ও জীব—পিতাপুত্রের সম্বন্ধযুক্ত; কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, ভ্রম প্রমাদাদি দোষশূন্য ও জীবের কর্মফল দাতা। তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, আর পরমাণুরা উপাদান কারণ। জীব কর্মফল অনুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ করে, তাদের জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ; তাদের জ্ঞান মিথ্যা, নৈতিকতা অসম্পূর্ণ, তারা অদৃষ্ট বদ্ধ। ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জগতের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগের কোনো কথা 'ন্যায়ে' নেই। ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞানতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু তত্ত্বগুলির মধ্যে কোনো আন্তঃ যোগাযোগ, অর্থাৎ পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় না থাকাতে একে স্পষ্টতঃই তত্ত্বদ্রষ্টার দর্শন বলা চলে না। 'বৈশেষিকে'র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—অসংখ্য আত্মা, অসংখ্য মন, অসংখ্য পরমাণু প্রভৃতি সকলের 'বিশেষ' বা 'Particularity' প্রতিষ্ঠা করা।

এবার পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে দু'একটি মাত্র প্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করা যাক। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা সকলেই তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন চিন্তাবিদ্। চিন্তারাজ্যে গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে অনুসন্ধান চালিয়ে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক দ্বারা সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত রূপ ও ভাব নির্দ্ধারণে তাঁরা বহু অধ্যবসায় সহকারে প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের চিন্তালব্ধ এই সকল দার্শনিক তত্ত্বগুলি সত্যই অপূর্ব্ব। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে তাঁদের সিদ্ধান্তের মধ্যে পারস্পরিক কোনো সামঞ্জস্য থাকা তো দূরের কথা, একের সিদ্ধান্ত অপরের একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত; এমন কি একই দার্শনিক জীবনে বহুবার নিজের মতবাদ পরিবর্ত্তনও করেছেন। "Philosophers do not even discuss the same questions, and when they do, it is only to give *diametrically opposite* answers. Their concern seems less to arrive at a goal than to obliterate the foot-steps of their predecessors. In fact, they are like blind men searching in dark rooms for non-existent black cats."—Joad. পাশ্চাত্য দার্শনিকদের

মধ্যে যাঁরা Idealism সমর্থন করেন তাঁরা Subjective ও Objective এই দুই ভাগে বিভক্ত এবং Realist রা প্রধানতঃ Sense-data typeএর realism সমর্থক। এঁরা সাধারণতঃ বহির্জগৎ থেকে শুরু ক'রে মন ও আত্মা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই বিশ্লেষণে যুক্তিতর্কের প্রয়োজনে কখনো 'ভগবান্'কেও অবতারণা করেছেন। আবার যুক্তির খাতিরে তাঁকে নস্যাৎও করেছেন। এ সব যুক্তি তত্ত্বের 'ভগবান্ পাশ্চাত্য দর্শনে একেবারেই টেঁকসই হয়নি।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় 'Form' ও 'Appearance'এর বাহ্যজগৎ বিষয়ে যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাতে কিছুটা সত্য নিহিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-তত্ত্ব বহু অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট। তাঁর পরবর্ত্তী অ্যারিষ্টেটল একে কিছুটা সংশোধিত করলেন—'ভগবান্'কে 'Prime Mover' রূপে চিহ্নিত ক'রে। বলা যায়, তিনি সত্যের পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছিলেন। তবু তা' বেশ অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। মধ্যযুগে এই প্লেটো-অ্যারিষ্টেটলের যুগ্ম ধারা কিছুটা রূপান্তরিত অবস্থায় Scholasticism, Nominalism প্রভৃতি রূপে প্রচলিত থাকল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে A-priori reasoning বা যুক্তিমূলক জ্ঞানতত্ত্ব প্রভাব লাভ করল Leibnitz, Descartes, Spinoza প্রমুখ দার্শনিকের দর্শন আলোচনায়। বোধহয় নেহাৎ 'ভাগ্যক্রমেই' 'ভগবান্'ও এঁদের যুক্তির ক্রীড়নকরূপে একটু স্থান পেয়েছিলেন। Empiricist বা অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক, যাঁরা আদর্শবাদ বা Subjective Idealismএর সমর্থক, সেই Locke, Berkely, Hume প্রভৃতি জগৎকে নেহাৎ মানসকল্পনাপ্রসূত ব'লে প্রচার করলেন,—যা' অনেকটা ভারতীয় 'মায়াবাদে'র মত। Berkely 'ভগবানের'ও অবতারণা করলেন বেশ ভালভাবেই তাঁর Solipsism বা মায়াবাদ বোঝাতো। কিন্তু অসম্পূর্ণ, ও অস্পষ্ট হওয়ায়, পরবর্ত্তীদের যুক্তিতে তাঁর 'ভগবান্'ও টিঁকলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে Kant তাঁর Objective Realism প্রচার করলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে। তিনি 'moral sense' বা নৈতিক বোধের অবতারণা ক'রে বাহ্য ও অতীন্দ্রিয় জগৎ, অর্থাৎ 'phenomenal' ও 'noumenal' জগতের ব্যাখ্যা দিলেন এবং ভগবান্‌কেও আসরে নামালেন। কিন্তু তাঁর দর্শনও সত্যদৃষ্টির অভাবে অসম্পূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তারপর এলেন Hegel তাঁর 'Whole of Knowledge' বা সামগ্রিক জ্ঞান ও সত্তা বোধ নিয়ে। তারমধ্যে ভগবান্‌ও স্থান পেলেন 'Absolute' রূপে। তাঁর এই 'Monism' বা এক-সত্তা-বাদ ভারতীয় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বের অনেকটা কাছাকাছি মনে হ'লেও যথেষ্ট অস্পষ্ট। কারণ ঐ একই—এঁরা সবাই অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

দার্শনিক Bergson বিশ্বকে 'অবিচ্ছেদ্য কালপ্রবাহ'রূপে দেখলেন, যাকে অনুভব করা যায় Intuition, অর্থাৎ সহমর্মিতা বা 'স্বজ্ঞা' দ্বারা। বাহ্যজগৎকে এই অবিচ্ছেদ্য কালপ্রবাহের স্থির চিত্রাংশ ব'লে তিনি যে ব্যাখ্যা দিলেন, তাও সন্তোষজনক নয়। Whitehead বললেন, 'Feeling' বা উপলব্ধিই হ'ল বিশ্বের স্বরূপ। বিশ্ব-জগতের রূপ অনন্ত সম্ভাবনাময়। তারমধ্যে একটিকে যিনি নির্ব্বাচন ক'রে নেন, তিনিই 'ভগবান্'। ভগবান্ অতীন্দ্রিয়, কিন্তু তিনিই ইন্দ্রিয়গোচর বহির্জগৎ সৃষ্টি করেন। এ জগৎ পূর্ণ, কিন্তু পরিবর্ত্তনময়,—গতিশীল; Hegelএর মত Static, অর্থাৎ স্থির নয়। এইভাবে 'ভগবান্'কে তিনি তাঁর dynamic দর্শনের আসরে নামালেন। জীবন ও বস্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত, উভয়ের মিলিত ক্রিয়ায় বিশ্বের সৃষ্টি। সাধারণ দৃষ্টিতে তাদের ভেদ বোধগম্য হ'লেও তারা অচ্ছেদ্য, পৃথকভাবে তাদের বোঝা যায় না। এ তত্ত্ব অনেকটা সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও পরস্পর নির্ভরশীল ক্রিয়াতত্ত্বের মত। কিন্তু এ দর্শনেও সাক্ষাৎ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শনের স্পষ্টতা নেই, সম্পূর্ণতা তো দূরের কথা।

ভারতীয় দর্শনে অবশ্য একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এসব দর্শন-রচয়িতার মধ্যে যাঁরা শুধুই চিন্তাবিদ্, সাধক বা তত্ত্বদ্রষ্টা নন, তাঁরাও কিন্তু বিশ্বে একটি 'নৈতিক নিয়ম' স্বীকার করেছেন। এমন কি, বেদে পর্য্যন্ত এই নৈতিক নিয়মের কথা বলা হয়েছে, যার নাম 'ঋত'। মীমাংসা-দর্শনে একে বলে 'অপূর্ব্ব', ন্যায়-বৈশেষিকে 'অদৃষ্ট'—যা' জীবের কর্মের নৈতিক ফলাফল তো প্রদান করেই, এমন কি জড়-পরমাণুকেও নিয়ন্ত্রণ করে। জড় পরমাণুর এই নিয়ন্ত্রণ বা অদৃষ্ট আধুনিক বিজ্ঞানের Radio-active disintegrationএ atom-এর 'fate'এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নৈতিক নিয়ম ভারতীয় দর্শনে সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়েছে—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"—হে অমৃতের পুত্রগণ, শ্রবণ কর: আমি এই জগতের পশ্চাতে এক মহান পুরুষকে জেনেছি। তাকে জেনেই শুধু মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই। সে পুরুষ হলেন—"সত্যং জ্ঞানমমৃতমানন্দরূপং যদ্বিভাতি।" এই দার্শনিকগণ আরো আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন, "অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়"—অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে অমৃতলোকে নিয়ে চল।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, দার্শনিকরা চিন্তাবিদ্, সাধক নন; তাঁদের চিন্তার ফল প্রত্যক্ষ দর্শনের অভাবে অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত। যাঁরা ধর্ম সাধনা দ্বারা চরম সিদ্ধিলাভ করেছেন, ধর্মপথের, শ্রীভগবান্ ও তাঁর ধাম পরিকর আদির, এবং এই

দৃশ্যমান বিশ্বের, তথা তার জীবগণের সত্যস্বরূপের সাক্ষাৎ ও যথার্থ পরিচয় তাঁরাই দিতে পারেন। এঁদের সংখ্যা নগণ্য। তথাপি এঁরা ধর্মের ও ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ প্রচার করেন নি বহিরঙ্গ আর্য্যদের অপব্যবহারের আশঙ্কায়। ধর্ম তাই গুরুমুখী।

সুতরাং যে কথা প্রথমেই উপমা সাহায্যে বর্ণনা ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন আলোচনায় তাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে পরিস্ফুট হয়। তীক্ষ্ণধী দার্শনিকগণ সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক বিচার বিশ্লেষণে এবং সুগভীর ও সুব্যাপক চিন্তাশক্তির সাহায্যে যে সকল চমৎকৃতিজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সে সবই অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় সবই অস্পষ্ট, পরস্পর বিরোধী ও অসম্পূর্ণ। একমাত্র প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার সুস্পষ্ট দর্শন-অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই এসব অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি দূর ক'রে তার স্পষ্ট, সত্য ও সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করতে পারে। সে কাজ চিন্তাবিদ্ দার্শনিকদের দ্বারা হ'তে পারে না। সুতরাং "ছয় দর্শন হইতে তত্ত্ব নাহি জানি, মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি"—চৈ.চঃ২।২৫। কিন্তু কোথায় সেই চরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ? বহু জন্মের সৌভাগ্যবশতঃ গুরুরূপে আমি যাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় লাভ করেছি, তিনি একজন সেই চরম ও পরম ধন প্রাপ্ত সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমিক। তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত ও কিছু কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভধন্য তাঁর শ্রীচরণাশ্রিত দাসরূপে সে সব নিগূঢ় তত্ত্ব নিঃসংশয়ে ও দ্বিধাহীন বাক্যে প্রকাশ করবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে আমি জীবনকে কৃতকৃতার্থ মনে করি। শ্রীশ্রীপাতালপ্রভু শুধু একজন সত্যদ্রষ্টা সিদ্ধ সাধকই নন, তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ভগবৎ সাধনার সব ক'টি মার্গেই সাধন করেছেন। এখান থেকে ইংল্যাণ্ড যেতে হ'লে স্থলপথ, জলপথ ও বিমান পথ—এই তিন রকম পৃথক পৃথক পথেই যাওয়া যায়। সাধারণতঃ ভ্রমণকারী এক পথেই যাতায়াত করেন। তাই তিনি সেই এক পথেরই পরিচয়, তার সুবিধা অসুবিধা বিবৃত করতে পারেন। কিন্তু যিনি তিনটি পথেই যাতায়াত করেছেন, তিনিই সব ক'টি পথের পূর্ণ পরিচয় জ্ঞাত আছেন, এবং তাদের তুলনামূলক সমালোচনা করতেও সমর্থ। পাতালপ্রভু ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, ও তন্ত্রমার্গের সব ক'টিতেই সাধন ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাই একমাত্র তাঁর পক্ষেই ধর্মসাধনের এই সব বিভিন্ন মার্গের পরিচয় বা তুলনামূলক সমালোচনা সম্ভব। তিনি কৃপা ক'রে সেই সব বিভিন্ন মার্গের তুলনামূলক অভিজ্ঞতা যেটুকু এই শ্রীচরণাশ্রিতকে জানিয়েছেন এবং কিছু কিছু উপলব্ধি করিয়েছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে অতি সংক্ষিপ্তরূপে তাঁর প্রদর্শিত পরম ভগবদ্ধর্ম সাধনপন্থার রূপরেখাটুকু অঙ্কন করতে চেষ্টা করব। 'রূপরেখা' এইজন্য বলছি,যে এতে সাধনপন্থার বিস্তৃত ও বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তা' একমাত্র কৃপাধন্য শিষ্য কর্তৃক গুরুমুখেই শ্রোতব্য। তথাপি ঐ outlines থেকে স্পষ্ট বোধগম্য হবে যে সাধকের যোগ্যতা অনুযায়ী সময় বিশেষে ও তার

সংস্কার ও রুচি অনুযায়ী সব সাধন মার্গেরই কিছু কিছু প্রয়োজন হ'তে পারে ; অর্থাৎ সাধনের কোনো সুনির্দ্দিষ্ট একক পন্থা নেই, তা' মিশ্রিত হ'তে বাধ্য। যেমন কোনো দুর্গম স্থানে যেতে হ'লে, শুধু স্থল পথ নয়, প্রয়োজন মত জল বা বায়ুপথেরও আশ্রয় নিতে হয়, এও সেইরূপ। ভ্রমণকারীকে যেমন আবহাওয়া বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হয়, সাধকের রুচি ও সাধন-সামর্থ্য অনুযায়ী তার সাধন-পন্থাও পরিবর্তনশীল ও মিশ্র হ'তে বাধ্য। এ তথ্য অসাধকদের জানবার কথা নয়, প্রকৃত সাধকই গুরূপদেশে এসব নিগূঢ় তথ্য অবগত আছেন।

সেই দুরূহ, দুর্গম ও জটিল সাধনপন্থার সামান্য রূপ-রেখামাত্র অঙ্কিত করতে প্রয়াসী হলাম। সাধন পন্থা অর্থ শ্রীভগবান্‌কে পাওয়ার উপায়। এ সম্বন্ধে আরো বহু প্রয়োজনীয় তথ্য প্রভুর সঙ্গীত সুধাসংগ্রহ ও তাঁর পত্রাদি হ'তে সংগৃহীত বাণীতে পাওয়া যাবে। কিছু মূল্যবান্ তত্ত্ব প্রভুর 'সাধন-বৈশিষ্ট্য'-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। শ্রীভগবৎস্বরূপ ও তাঁর ধাম পরিকরাদি এবং এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব, তার জীবকুলের সঙ্গে শ্রীভগবানের সম্বন্ধ, মায়ার স্বরূপ ইত্যাদি তত্ত্ব পাতাল প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের- বিজ্ঞানময় স্বরূপ ব্যাখ্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ সেখানে তার পূর্ণ পরিচয় পাবেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সব সিদ্ধান্তই তাঁর সাধনলব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত হ'লেও, সর্ব্বত্র যথাযোগ্য শাস্ত্র-প্রমাণ-বচন সন্নিবেশিত হয়েছে। শ্রীশ্রীপাতালপ্রভু বাণী ও শাস্ত্রবাক্য পরপর প্রদর্শিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীপাতালপ্রভু প্রদর্শিত ধর্মসাধন পন্থার রূপরেখা

"ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

১। সাধু দর্শন ও সঙ্গ

পাতালপ্রভু বাক্য। অবকাশ পাইলেই শ্রীধাম গুহাশ্রমে আসিবে। বাটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে ইষ্টসাধনের উপায় হইবে কীসে ?

শাস্ত্রবাক্য। ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্, সন্ত এবাস্য
ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ—ভাঃ ১১।২৬।২৬

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ ;
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ
-ভাঃ ১০।৫১।৫৩

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সংবিদঃ—ইত্যাদি—ভাঃ ৩।২৫।২৪

মুখ্যতস্তু মহৎ কৃপয়ৈব—নারদভক্তিসূত্র—৩৮

অতি ধন্যানাং প্রাথমিক মহৎসঙ্গজাত মহাভাগ্যানাম্—

-ভঃ রঃ সিঃ টীকা ১।৩।৫

কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ—চৈঃ চঃ ২।২২।৫৮

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়, তার উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়

-চৈঃ চঃ ২।২২।১৩

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়—

-চৈঃ চঃ ২।২২।৩৩

২। প্রকৃত সাধুগুরুর অন্বেষণ ও তৎ পদাশ্রয়

পাতালপ্রভু বাক্য। এই তরী আপনি চলিতে পারে না। ঐকান্তিক চিত্ত না হইলে শ্রীগুরুকাণ্ডারী পাওয়া যায় না।

সৎগুরুর অভয় পদে প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইবে।

যদি সৎগুরু পাই, তবেই মনঃসাধ পূর্ণ হইবে।

যদি সৎগুরু পায়, ভজে লয়, মরণের ভয় রবে না।

দুস্তর ভব পারাবার তরিবার উপায় সৎগুরু কৃপা হি কেবলম্।

শাস্ত্রবাক্য। তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ—মুণ্ডক ১।১২ ;

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্—ভাঃ ১১।৩।২১ ;

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং- শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্—ভাঃ ২।৯।৩৫ টীকা।

গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন—চৈঃ চঃ ২।২২।৬১ ;

গুরুপাশে সেই ধর্ম প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য—ঐ ২।২৫।১০১ ;

সর্ব্বকারণ লিখি, আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ—ঐ ২।২৪।২৪১।

৩। গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবৎজ্ঞান ও তাঁর কৃপালাভের উদ্দেশ্যে সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ।

পাতালপ্রভু বাক্য। গুরু-গোবিন্দ এক করি' জান। শিক্ষাগুরুকে স্বপ্নেও মনুষ্যজ্ঞান করিও না। গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুমহেশ্বর, গুরুবিনা ধ্রুব বনে কৃষ্ণ নাহি পায়। গুরুনিষ্ঠা রাখ মন আর সব মিছে, পলাইতে পথ নাহি যম আছে পিছে। গুরুসুখে সুখী হও সিদ্ধ হবে কার্য্য, গুরু আজ্ঞা যাহা হয় তাই শিরোধার্য্য। যাঁহার কৃপাকণাতে প্রাণ রক্ষা হইবে, কী ধন আছে যে তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া তাঁহার ঋণ শোধ করিব ?

শাস্ত্রবাক্য। আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ, ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ—ভাঃ ১১।১৭।২৭। তস্মাদ্গুর্বাত্মদৈবতঃ বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরু-দেবতাত্মা—ভাঃ ১১।২।৩৭। গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে, গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে—চৈঃ চ ১।১। শিক্ষাগুরুকে তো জানি কৃষ্ণের স্বরূপ—চৈঃ চঃ ১।১। তাতে কৃষ্ণভজে করে গুরুর সেবন, মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ—চৈঃ চঃ ২।২২।১৮।

মন্তব্য। গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা স্পষ্ট নয়। তজ্জন্য গুরু ও শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী বিষয়টি স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। ধর্মসাধনের বিভিন্ন মার্গ আছে এবং প্রত্যেক মার্গে বিভিন্ন সাধনাঙ্গ ও সাধনের ক্রম অনুযায়ী স্তরভেদ আছে। ভক্তিপথে বিধিমার্গে চৌষট্টি সাধনাঙ্গ রয়েছে; তার মধ্যে "এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ; নিষ্ঠা হইলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ"—চৈঃ চ ২।২২। এর মধ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলা হয় এবং নামকীর্ত্তনে কর্মক্ষয়, সংসার বিরতি, ভক্তি ও প্রেমের উদয় হয় বলা হয়ে থাকে। আবার "বহুজন্ম করে যদি নাম সঙ্কীর্ত্তন, তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন"-চৈঃ চঃ ১।৮।১৫ এবং "সেয়ং সাধনসহস্রৈর্হরিভক্তি সুর্দুর্লভা"-ভ, র, সি, এরূপ উক্তিও বহু রয়েছে। এরূপ পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের সমাধান কী? একটু ধীরভাবে শাস্ত্রালোচনা করলেই এর উত্তর পাওয়া যায়। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন, "আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ"—চৈঃ চঃ ২।২৪।২৪১, তারপর দীক্ষা ও গুরুসেবা। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুও বলছেন যে চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি সাধনের মধ্যে "ত্রয়ং প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকম্"—১।২।৪৩, অর্থাৎ গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবা এই তিনটি প্রধান। যিনি গুরুকৃপা থেকে বঞ্চিত তাঁর সমস্ত সাধনচেষ্টা বৃথা। কারণ যে কৃষ্ণকৃপা লাভের জন্য ধর্ম সাধন, সেই কৃষ্ণ কৃপাশক্তি তাঁর গুরু শক্তির মধ্যে দিয়েই আত্মপ্রকট করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণই সমষ্টিগুরু, কিন্তু "জীবে সাক্ষাৎ নাহি"—চৈঃ চঃ ১।১, তাই "আচার্য্য চৈত্ত্য বপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি"—ভাঃ ১১।২৯।৬। একমাত্র শ্রীগুরুদেবের যোগেই শ্রীকৃষ্ণের গুরুশক্তি, তথা তাঁর কৃপা-শক্তি, আবির্ভূত হয়ে শিষ্যকে কৃতার্থ করতে পারেন—"গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে"-চৈঃ চঃ ১।১।২৭, সুতরাং সৎগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে তাঁর কৃপালাভার্থ তাঁর সেবা করা সাধকের অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য। এই সত্যই শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে উদাত্তকণ্ঠে উক্ত হয়েছে, তা' সঙ্গীতের টীকায় প্রদর্শিত হয়েছে। স্বয়ং মহাপ্রভুও লৌকিক লীলায় ঈশ্বর পুরীর কাছে দীক্ষা ও কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে 'গুরু'-হবার যোগ্যতালাভ করা অতি দুরূহ। মুণ্ডক উপনিষদ বলছেন, "সৎগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ—শ্রোত্রিয়ং

ব্রহ্মনিষ্ঠং চ" এবং "যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়"—চৈঃ চঃ ২।৮; অর্থাৎ গুরুকে ব্রহ্মানুভবযুক্ত ও কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ হ'তে হবে। এ হ'তে হ'লে তাঁকে ধর্মসাধনে সিদ্ধিলাভ ক'রে, চিত্তের অপ্রাকৃতত্ব দূর করতঃ চিত্তকে বিশুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাতে হবে। তবেই সেই বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের গুরুশক্তি, তথা কৃপাশক্তি, আবির্ভূত হয়ে শিষ্যকে সাধনফল দান করতে সমর্থ হবে। যার তার চিত্ত, এমনকি সাধন পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়েছে যারা তাদের চিত্তও সম্পূর্ণরূপে অনর্থ-নিবৃত্তি-প্রাপ্ত হয়ে অপ্রাকৃত হয়ে যায় না; সুতরাং গুরুশক্তি সে-চিত্তে আবির্ভূত হ'তে পারে না। এরজন্য 'শুদ্ধ-সত্ত্বের' সাধন করতে হবে; সেই সাধনে সিদ্ধিলাভ করলে তবেই সেই 'শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল' চিত্তে গুরুশক্তি আবির্ভূত হবে। বৈজ্ঞানিক ভাষায়, charge সঞ্চয় ও polarisation সাধনদ্বারা দেহেন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে polarised বা insulator করতে পারলে, তবেই সে পরম ঈশ্বরের গুরুশক্তি অর্থাৎ Great Dipole-এর moment-এর আওতায় এসে তার শক্তিতে শক্তিমান্ হবে। এরূপ সৎগুরু জগতে সুদুর্লভ। সেরূপ সৎগুরুকেই শাস্ত্রে বলেছেন "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", এবং "সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ"; এরূপ গুরুর সঙ্গ ও কৃপা না হ'লে কোনো সাধনই বিন্দুমাত্র ফল দিতে পারে না—"বিজিতহৃষীকবায়ুভিঃ" শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৭।৩৩ এই কথাই বলেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি উপমার উল্লেখ করা যেতে পারে। মনে করা যাক, কোনো একটি ফলবান্ বৃক্ষের বীজ এনে জমিতে বপন করা হ'ল। বৃক্ষটি কীভাবে সুপুষ্ট হ'তে পারে তার অনেকগুলি উপদেশ পাওয়া গেল: যথা, জমিকে অতিরিক্ত ক্ষার ও অম্লমুক্ত করা, কাঁকরাদি পরিষ্কার, জল সেচন, নানারূপ সার প্রয়োগ, আগাছা তুলে দেওয়া, কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি। সবুজ চারাটি অঙ্কুরিত হ'লে চাষী চারাটির মূলের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই ভেবে মূলটি ছিঁড়ে ফেলে সবুজ চারাটি মাটিতে ভালভাবে প্রোথিত ক'রে যথারীতি জলসেচন, সার প্রয়োগ আদি চারাটির সর্ব্বপ্রকার পুষ্টিসাধন ক্রিয়াগুলি করতে লাগল। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই চারাটি শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেল। এক্ষেত্রেও তাই। গুরুশক্তিই হচ্ছেন মানবরূপী সাধকের চিত্তক্ষেত্রে প্রোথিত দীক্ষা-মন্ত্র-বীজের মূল। নাম-কীর্ত্তন আদি চৌষট্টি অঙ্গ সাধন ক্রিয়া ঐ বীজ অঙ্কুরিত হ'লে তার পুষ্টি বিধান করার বিভিন্ন উপায়—"শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন"। ঐ সকল সাধনরূপ সেচন ক্রিয়ায় "উপজিয়া বাড়ে লতা"—চৈঃ চঃ ২।১৯। এই হ'ল স্বাভাবিক নিয়ম। তবে সাবধান হ'তে হবে অপরাধ থেকে; "যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা, উপাড়ে বা ছিঁড়ে, তার শুকি' যায় পাতা"—চৈঃ চঃ ২।১৯। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অপরাধরূপ মত্তহস্তী এসে ঐ লতার শিকড় উপড়ে ফেললে, অথবা ছিঁড়লে

লতায় পাতা শুকিয়ে যায়, লতা আর সজীব থাকে না। কিন্তু মালী যদি অজ্ঞতাবশতঃ নিজেই সেই মূলকে অপ্রয়োজনীয় বোধে উৎপাটিত করে তবে অবিলম্বেই লতাটি বিনষ্ট হবে। মূলরূপী গুরুকৃপাশক্তির সহিত ক্ষেত্ররূপী সাধকের যোগাযোগ ছিন্ন হ'লে, সে সাধনলতা, শতসহস্র সাধনেও অচিরেই শুষ্ক হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হবে ; তখন "সেয়ং সাধন সহস্রৈর্হরিভক্তি সুর্দুর্লভা" হয়ে সাধকের আর কিছুই লাভ হবে না।

৪। মানবের অধিকার অনুযায়ী ধর্মপথ

(ক) শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারীধর্মযাজন

পাতালপ্রভু বাক্য। এখনও কর্মবন্ধন কাটে নাই, সেইজন্য এখন সংসারের কর্মক্ষেত্রে কর্ম করিতে হইবে। নির্লিপ্তভাবে কর্ত্তব্যকর্ম করিবে, আর অবকাশ পাইলেই গুহাশ্রমে আসিবে। কেবল অনিত্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিও না ; অবকাশ পাইলেই যাহাতে পথের সম্বল উপার্জ্জন হয়, যত্নের সহিত তাহার চেষ্টা করিবে।

শাস্ত্রবাক্য। তাবৎ কর্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা,
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে—ভাঃ ১১।২০।৯

(খ) জাতশ্রদ্ধের বিধিমার্গ

পাতাল প্রভুবাক্য। ছেড়ে সংসারের খেলা, ছুটে আয়রে এই বেলা,—
হরিনাম নিলে 'পর ত'রে যাবি, বারে বারে ডাকছি তাই।

অহরহ বৈষ্ণবের মুখে উপযুক্ত স্থানে হরিনাম শুনিতে বসা কর্ত্তব্য। নাম শ্রবণ হইতে শ্রদ্ধা আসে।—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিবে।—ঠিক সময়মত সেবা-পূজা করিবে।

শাস্ত্রবাক্য। তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ, শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ভাঃ ২।১।১৫, রাগহীনজন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়, বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়। সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন।—শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী—চৈঃচঃ ২।২২

(গ) (১) ব্রহ্মচর্য্যসাধন. (২) অষ্টপাশ মোচন সাধন ;
(৩) ষড়রিপুদমন সাধন ; (৪) আত্মসুখ বর্জ্জন সাধন ;
(৫) আত্মতত্ত্বজ্ঞান সাধন।

মন্তব্য। শিষ্যভেদে গুরু এই সব সাধনে জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, তন্ত্রমার্গ অথবা ভক্তিমার্গের আচরিত পন্থা উপদেশ দেবেন। সকল অবস্থাতেই গুরুসেবা ও গুরুবাক্য অনুযায়ী সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাতালপ্রভু বাক্য। (১) 'অখণ্ডমণ্ডলাকার'কে জানিতে হইলে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন। মেয়ে মানুষের দিকে মন যায়, আত্মঘাতী প্রবৃত্তি ধরা পড়ে। এ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া আত্মরক্ষা করার নামই সাধন।…পিতৃমাতৃ সম্পত্তি রক্ষার জন্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হও।

(২) অষ্টপাশে মন বাঁধা সে, খুলিব তায় কী ক'রে?

(৩) ফাঁদ পেতে রিপুগণ ব'সে আছে সর্ব্বক্ষণ। ছয় রিপুতে ঘটায় বাধা, পাই না তাই দরশন।—ছেড়োনাকো কামের ভয়ে।

(৪) আত্মইন্দ্রিয়সুখত্যাগ করিয়া রাধাগোবিন্দের উপাসনা করিবে।

স্ব সুখানল নিভায়ে দাও।…আত্মসুখীর কার্য্য তো নয়, ব্রজগোপী সাক্ষী সে রয়।

(৫) আমাতেই আছে আমার যে জন।…জানে আত্মখবর ক'জনা?—ঘরে ঠাকুর না চিনিয়া পায় কি কেহ চিন্তামণি?—আপন ঘরে না খুঁজিলে কি তাঁকে পাওয়া যাবে?—দেহ নষ্ট হইলে কী লইয়া সাধন করিবে?—থাকিতে অমূল্যধন, কেন যাও বৃন্দাবন?—প্রাণপণে চিন্তা কর, দেখতে পাবে সাধনেতে।—সৎগুরু ধ'রে ঘরের তীর্থ-তত্ত্ব জান না?—স্বরূপ-সাধন বর্ত্তমানে, এ কর্ম নয় অনুমানে।—শিক্ষাগুরুবাক্য অনুযায়ী আত্মতত্ত্ব সাধিতে বিরত থাকিও না।

শাস্ত্রবাক্য। (১) প্রমদাসু সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ, খণ্ডিতাত্মসু অসাধুষু সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ —ভাঃ ৩।৩১।৩৪। শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ—ভাঃ ১১।৬।৪৭। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি —গীতা ৮।১১; ব্রহ্মচারী ব্রতে স্থিতঃ—গীতা ৬।১৪।

(২) ঘৃণালজ্জাভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী, কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ—ভাঃ ১১।২ ৩৭, ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ, সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ—ভাঃ ১১।২।৫১।

(৩) মনোঽচিরাৎ স্যাদ্ বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ, বায়্বগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্—ভাঃ ৩।২৮।১০, জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ, ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ—ভাঃ ১১।১৫।১, জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেন বলীয়সা, তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা'। প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্, তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ—ভাঃ ৩।২৭ ২২-২৩। এবং নির্জ্জিত ষড়্‌বর্গৈঃ ক্রীয়তে ভক্তিরীশ্বরে—ভাঃ ৭।৭।৩৩।

(৪) অর্থেন্দ্রিয়ারামসগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ—ভাঃ ৪।২২।২৩। তস্মান্ময়াশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য যে ভবেৎ—ভাঃ ১১।২০।৩৬। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে, তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ—ভ.র.সি ২।১৫। অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্—ভ.র.সি—১।১।৯।

(৫) ধার্য্যমানং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্, অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ।—ভাঃ ১১।২০।১৯; প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ, বিপর্য্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ—ভাঃ ১১।১৪।৩৩। নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্, ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা—ভাঃ ১১।২০।১৭।

স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ, ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈরধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মগতিং লভতে—ভাঃ ৭।৭।২১।

তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং পুনরিহ যৎসমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে—ভাঃ ১০।৮৭।১৮।

যতন্তো যোগিন শ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্—গীতা ১৫।১১।

৫। গুরুসেবাই সর্ব্বধর্ম সাধনের প্রাণ

পাতালপ্রভু বাক্য। নিজগুরুসেবা ছাড়ি অন্যত্র না যাবে; অকপটে চরণসেবা করিবে তাঁহার, কৃপা হইলে ব্রজপ্রাপ্তি হইবে তোমার।

শাস্ত্রবাক্য। অয়ং প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকম্—ভ.র.সি. ১।২।৪৩। মহৎসেবা দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ—ভাঃ ৫।৫ ২; নৈষাং মতিস্তাবৎ...মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ—ভাঃ ৭।৫।৩২;

কস্তরতি কস্তরতি দেবমায়াং—যো মহানুভবং সেবতে—নাঃ ভঃ সূঃ—৪৬।

তাতে কৃষ্ণ ভজে—করে গুরুর সেবন, মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ—চৈঃ চঃ ২।২২।১৮

মহৎ কৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুন মুখ্য অঙ্গ।—চৈঃ চঃ ২।২২।

৬। সাধকের অবশ্যপালনীয় বিধি

(ক) কামিনী ও কাঞ্চন কামনা ত্যাগ; (খ) 'জীয়ন্তে মরা';

(গ) বিঘ্নেধৈর্য্য; (ঘ) নিরলস সাধনাগ্রহ; (ঙ) গুরুবাক্যে নিষ্ঠা

পাতালপ্রভু বাক্য। (ক) সংসারী গোলে থাকিও না।...স্ত্রীসংসর্গকারী ব্যক্তিরা মতি ঠিক রাখিতে পারে না, অতএব এস্থলে মৌখিক প্রণয়ই ঠিক নিয়ম।

(খ) শিক্ষাগুরু বাক্য ধর, জীয়ন্তে যদি সে মর, তবে প্রাপ্তি মদন মোহন।

(গ) সাবধান! নানা প্রকার বিভীষিকা আছে। পরীক্ষার সময় যেন ভবপারের সম্বল হারাইয়া ফেলিও না। বসিয়া বসিয়া মন স্থির করিবে। ধর্মের জয় হইবেই।

(ঘ) পাবে যদি ভক্তি, রাখি' স্থিরমতি সাধ নিতি, গুরুচরণ বন্দ।

যায় যাবে যাক্ এ ছার পরাণ, হরিনাম তো ভুলিবনা।

(ঙ) শ্রীশ্রীগুরুদেব যাহা বলিবেন, তাহাই সত্য মনে করিতে হইবে ও সেইমত কার্য্য করিতে হইবে।

শাস্ত্রবাক্য। (ক) নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারংপরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য, সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ, হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু—চৈঃ চঃ নাঃ ৮ ২৭

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ, যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি সঙ্গতঃ—ভাঃ ৩।৩১।৩৫

তেষশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু—ভাঃ ৩।৩১।৩৪

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ, বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি—মনু ২।২১৫

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার, স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর—চৈ চঃ ২।২২।৪৯

দর্শন দূরে রহু, প্রকৃতির নাম যদি শুনি, তবহিঁ বিকার পায় মোরতনু মন।

প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?—চৈঃ চঃ ৩।৫।৩৪ ;

বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ, দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন। দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ, দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন। ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া, ইন্দ্রিয় চরাইয় বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া—চৈঃ চঃ ৩।২।১১৮।

বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ, সেই কর্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ—চৈঃ চঃ ৩।৬।১৯৭

(খ) তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্—ভ. র. সি.—১।১।৯ ;

সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্— নাঃ পঃ রাঃ।

আত্মসুখধর্ম—সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন—চৈঃ চঃ ১।৪

(গ) ধৈর্য্যবন্ত এব হইয়া করয়ে ভজনে—চৈঃ চঃ ২।২৪ ১১৬

(ঘ) বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ—ভাঃ ১১।১৪।২৯ ; বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ—ভাঃ ১১।৯।১১ ; অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেনাত্মবশং নয়েৎ—ভাঃ ১১।২০।১৯

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে—চৈঃ চঃ ২।২৪ ; সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে ; রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা। চৈঃ চঃ ৩।৬

(৬) আচার্য্যং মাংবিজানীয়াৎ, নাবমন্যেত কর্হিচিৎ—ভাঃ ১১।১৭।২৭ ;
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ—ভাঃ ১১।১৯।৩৬। শিক্ষাগুরুকে তো জানি কৃষ্ণের স্বরূপ—
চৈঃ চঃ ১।১

৭। আত্মাহুতি

পাতালপ্রভু বাক্য। কবে আমার আমি ভুলে যাব, তোমার আমি হয়ে রব, সেদিন আমার কবে হবে হরি ?

শাস্ত্রবাক্য। মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ—ভাঃ ১১।২৯।৩৪

শরণ লইয়া করে আত্মসমর্পণ, কৃষ্ণ তারে তৎকালে করে আত্মসম—
চৈঃ চঃ ২।২২।৫৪

৮। (ক) মাতৃতত্ত্ব সাধন

(কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ)

মন্তব্য। সাধনার উচ্চ স্তরে বিভিন্ন মার্গে বিভিন্ন পন্থা, শিষ্যের রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী, গুরু উপদেশ করবেন।

পাতালপ্রভু বাক্য। জগৎ জননী ! এমন কার সাধ্য আছে যে তোমার মায়া ভেদ করিয়া সহসা মায়ার পরপারে গমন করিবে ? মা, তোমার বিনা কৃপাতে কার সাধ্য আছে, চিন্ময়রূপিণী তোমায় চিনিবে ?

শাস্ত্রবাক্য। নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ, তামৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যত্যমিতং প্রভুম্ ?—শ্রীকৃষ্ণামৃতে ধৃত নারায়ণাধ্যাত্ম বচন।

যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ, মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা। একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বভাবা শ্রীগোকুলেশ্বরী, অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ। ভক্তির্ভজনসম্পত্তি র্ভজতে প্রকৃতিঃ স্বয়ং, জায়তে অত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ। —শ্রীনারদপঞ্চরাত্র।

ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর, যে তোমার মায়ানটে হইবেক স্থির ?—
চৈঃ চঃ ২৮

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন, হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ—ঐ ১।৪
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ—চৈঃ চঃ ২।৮ ; অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা,
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা—ঐ ১।৪ ; অতএব গোপীভাব করি' অঙ্গীকার,

রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার। সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি,
রাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়, সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়—

চৈঃ চঃ ২।৮

৮। (খ) প্রাক্তন সৌভাগ্যে রাগমার্গ

মন্তব্য। এ সাধন একমাত্র ভক্তিপথের সাধকের সাধনের শেষ স্তরে প্রাপ্য।

পাতালপ্রভু বাক্য। সে যে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন ; সুতরাং বিনাসাধনে কোথায় খুঁজিয়া পাইব ?

শাস্ত্রবাক্য। কৃষ্ণতদ্‌ভক্ত কারুণ্যমাত্র লোভৈকহেতুকা—ভ. র. সি -১।২।১৬৩

ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা—ঐ ২।১।৪১

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম, তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোনো ভাগ্যবান্—

চৈঃ চঃ ২।২২।

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া চিন্তন, রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।—ঐ ২।২৩।

৯। প্রেমোদয়

মন্তব্য। একমাত্র ভক্তিমার্গের সাধকেরই কৃষ্ণপ্রেম লাভ সম্ভব।

পাতালপ্রভু বাক্য। অনুরাগ বিহনে সে-মানুষ যায় না ধরা। নিষ্কামী নির্ব্বিকারী তারাই প্রেমের অধিকারী।···জীবে কভু সম্ভবেনা—অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, ভাগ্যে না ফলিলে।

শাস্ত্রবাক্য। সম্যঙমসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ, ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে—ভ. র. সি ১।৪।১ ; ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।

অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা—ভ. র. সি ১।৪।১২

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম। কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য হয় প্রেম তো প্রবল।

সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন, কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন। চৈঃ চঃ ১।৪

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে, এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে—ঐ ২।৮

প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার—চৈঃ চঃ ২।১০

সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম, সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম—চৈঃচঃ২।২৩

যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়, তার বাক্য ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়—ঐ-ঐ।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর সাধন-বৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর সাধন-বৈশিষ্ট্য

সকলেই জানেন মহাপ্রভুর লীলার দুটি উদ্দেশ্য ছিল—একটি অন্তরঙ্গ, অপরটি বহিরঙ্গ। তাঁর অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্যের কথা অবগত ছিলেন রায় রামানন্দ, স্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতি জনকয়েক অন্তরঙ্গ ভক্ত। রায় রামানন্দ প্রথম দর্শনেই বলেছিলেন, "নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন, আনুষঙ্গে প্রেমময় কইলে ত্রিভুবন"—চৈঃ চঃ ২।৮, এবং "অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার, দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার"—চৈঃ চঃ ১৪। শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর লীলারও এইরূপ দুটি উদ্দেশ্য ছিল। বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য তাঁর লীলাবৃত্তে সামান্য কিছু কিছু বিবৃত করেছি; এবার তাঁর অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য তাঁর কৃপালোকে কিছুটা :প্রকাশিত করতে প্রয়াসী হব। শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর সাধনার এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা' অদ্ভুত, অপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না রাখলে তাঁর লীলাকাহিনী একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়ে। পাঠকগণ অবগত আছেন, সাধনার বিভিন্ন মার্গ আছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধন-সংস্কারক্রমে সাধকগণকে এই জন্মে গুরু তাঁদের মুখ্য সাধনমার্গ বেছে দেন এবং গুরুপ্রদর্শিত পথে সেই সেই মার্গেই তাঁরা সাধন ক'রে যান। বলা বাহুল্য, একই সঙ্গে সকল সাধনমার্গে কেউ সাধনা করেন না এবং সেটা কোনো সাধকের পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু অতিশয় বিস্ময়ের ব্যাপার এবং প্রায় অবিশ্বাস্য হলেও, শ্রীশ্রীপাতালদেব এইরূপ অসম্ভব কার্য্যই সাধন করেছিলেন, অর্থাৎ এইসব বিভিন্ন সাধনমার্গের সকল স্তর শুধু সাধনই করেননি, প্রত্যেক মার্গেই ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে সেইসব পৃথক পৃথক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগবে, পাতালদেব সর্ব্ব ধর্মমার্গ স্বয়ং সাধন করেছিলেন কেন? কী প্রয়োজন ছিল তাঁর এত কৃচ্ছ্র-সাধনের? এ প্রশ্নের উত্তর এইরূপ। এর প্রয়োজন ছিল দুই কারণে। প্রথমতঃ, মানুষ বিভিন্ন সাধনপথে সাধকরূপে কী-প্রকারে সেই সব সাধনপথে অগ্রসর হয়, সে সব পথের পরিচয় কী, কোথায় তার কীরূপ আনন্দাস্বাদন, কোথায় কী রকম দুঃখ, বিঘ্ন-বিপদ এবং সে সব বিঘ্ন অতিক্রম করতে সাধককে কী উপায় অবলম্বন করতে হয়, মানবদেহে সাধকের এই সব পরিশ্রম, দুঃখ-কষ্ট, সংযম, উত্থানপতনের জন্য আশা-নিরাশার তরঙ্গ, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও চরমে সিদ্ধিলাভ ও ভগবৎ-দর্শনের আনন্দ—এই সব স্বাদ নিখুঁতভাবে আস্বাদনের জন্য প্রভুর বাসনা হয়েছিল। এ তত্ত্বও স্বয়ং মহাপ্রভু প্রদর্শন করেছেন যে "বিজাতীয় ভাবে নহে

তাহা আস্বাদন", অর্থাৎ রাধারাণীর ভাব আস্বাদন করতে যেমন তাঁকে রাধারাণীর ভাব সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার ও আত্মসাৎ করতে হয়েছিল, সর্ব্বমার্গের সাধকদের অভিজ্ঞতা আস্বাদন-বাসনায় পাতালদেবকেও তাই সব কটি মার্গের সবস্তরে সাধন ক'রে চরমসিদ্ধি অর্জ্জন করতে হয়েছিল।

একমাত্র প্রকৃত সাধকগণই মর্মে মর্মে বুঝবেন, কোনো সাধক 'জীবের' পক্ষে একই জীবনে বিভিন্ন ধর্মপন্থার সমগ্র সাধনপথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম ক'রে চরম লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো বা সিদ্ধিলাভ করা কতদূর সম্ভব। তথাপি বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে এই আপাতঃ অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হয়েছিল পাতালদেবের দুশ্চর তপশ্চর্য্যায়। পাতাল প্রভুর সাধনজীবন এরই সার্থক রূপায়ণ।

দ্বিতীয় কারণ, সাধনপথসমূহের সমগ্র পথচারণার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান জীব-জগৎ বিস্মৃত-প্রায় হয়েছিল। সে জ্ঞান অন্ততঃ অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান্ ভক্তকেও তিনি কিছু কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তার প্রয়োজনীয়তা ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ব্রহ্মচর্য্য পালন সর্ব্বমার্গের সাধনারই মূল ভিত্তি; কিন্তু-কোন্ মার্গে কী সাধনে বা কী প্রক্রিয়ায় এ বিষয়ে কতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়; কোন্ পন্থায় তার কী বিঘ্ন, কী তার প্রতীকার—এসব তথ্য তিনি সুস্পষ্টরূপে অবগত হয়ে কৃপাধন্য শিষ্যকে প্রকাশ করেছেন। আবার যে কোনো মার্গেই হোক না কেন, সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে মাতৃতত্ত্ব উপাসনা ক'রে মাতৃসিদ্ধিলাভ করতেই হবে, এবং তা' করতে হ'লে সুষুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত ক'রে ষট্ চক্র ভেদ করিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে পর-ব্রহ্মের সহিত মিলন করাতেই হবে। কিন্তু এর সাধনপ্রক্রিয়া বিভিন্ন মার্গে বিভিন্ন প্রকার; এবং তার সুবিধা-অসুবিধা, বিঘ্ন ও প্রতীকারও ভিন্ন রূপ। পাতালদেবের নিজস্ব সাধনলব্ধ এসব নিগূঢ় ও সুগোপন তথ্য তাঁর কৃপা-প্রাপ্ত সামান্য কয়েকজন মাত্র ভক্ত অবগত হয়েছিলেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, গৌর-লীলায় মহাপ্রভুর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। মুখ্যতঃ 'তিন অভিলাষ' পূরণই এই গৌর অবতারের কারণ। তার জন্য যে কয়েকজন ('সার্দ্ধ তিন জন') অন্তরঙ্গ ভক্তের প্রয়োজন ছিল, তা' নগণ্য। জিনিষটি এতই উর্দ্ধস্তরের, যে সর্ব্ব সাধারণের সমুখে প্রকাশ করা তো দূরের কথা, বহিরঙ্গের কাছ থেকে তাকে সর্ব্বতোভাবে গোপন রাখবার জন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সর্ব্বদা সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। কিন্তু মায়াবদ্ধ বহিরঙ্গ জীবের জন্য যে তাঁর প্রাণ কাঁদেনি তা' নয়, তাদের উদ্ধারের জন্য তিনি অদ্বৈত প্রভু, বিশেষতঃ নিত্যানন্দপ্রভুকে নিযুক্ত করেছিলেন, এক mass-recipe এর ব্যবস্থা ক'রে এবং পশ্চিমে পাঠিয়েছিলেন রূপ-সনাতনকে। কিন্তু এই দুই স্তরের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। মধ্যবর্ত্তী

বিপুল ও বিরাট শূন্য ধাপ গুলি পূরণের ব্যবস্থা তিনি সে-লীলায় করেননি। হয়তো তার প্রয়োজনও ছিল না।

ব্যাপারটি ভাল ক'রে বুঝতে একটা 'উপমা'র সাহায্য নেওয়া যাক। নিরক্ষর ব্যক্তিকে বিদ্যাশিক্ষা করাতে হ'লে শিক্ষকের প্রয়োজন; mass-scale-এ শিক্ষাপ্রচারের জন্য বিদ্যালয় ও বহু শিক্ষকের দরকার। মনে করা থাক, কোনো একটি 'নিরক্ষর'-অঞ্চলে, কয়েকজন 'উচ্চতম' স্তরের জ্ঞানী ও গুণী এসে বসবাস স্থাপন করলেন। এঁরা নিজেদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যগুলি আলোচনা ক'রে পরম আনন্দ পেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, জনসাধারণ সবাই একেবারে অক্ষর-জ্ঞান বঞ্চিত, নানা কুসংস্কার-পীড়িত, এবং এদের এইসব অন্ধ সংস্কার উদ্ভূত কার্য্যাবলী তাঁদের ক্রিয়া-কলাপ ও দৈনন্দিন জীবনযাপনেও নিরতিশয় বাধা সৃষ্টিকারী। তখন তাঁরা কী করবেন? অবশ্যই তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা হবে, এদের অক্ষর-জ্ঞান পরিচয় করিয়ে ক্রমে ক্রমে শিক্ষার উচ্চতর স্তরে উন্নীত করবার। এইরূপ চিন্তা ক'রে ঐ সকল জ্ঞানী ও গুণী সেই নিরক্ষরগণকে মিষ্টব্যবহারে তুষ্ট ক'রে তাদের প্রচলিত জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ না ক'রে, ক্রমে ক্রমে শিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়ে তাদের বশে এনে, শিক্ষার জন্য স্কুলে ভর্ত্তি করালেন। প্রথমে দু'একজন, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয়ে, পরিশেষে mass-scale.

কিন্তু খুব বেশী একটা কিছু তাঁরা ক'রে যেতে পারবেন কি? এইসব জ্ঞানী ও গুণী বেশীর ভাগই প্রবীণ, তার উপর তাঁদের অধিকাংশ সময়, তাঁদের নিজস্ব জ্ঞান পর্য্যালোচনাতেই অতিবাহিত হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণকে বশে এনে তাদের ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিতে কতটুকু সময় ও শক্তি তাঁরা নিয়োগ করতে পারবেন? হয়তো বিশেষ কিছুই নয়। তবু তাঁদের বাঁচার জন্য, কিংবা নিছক কৃপাপরবশ হয়েই, তাঁরা এই সব অশিক্ষিতকে অন্ততঃ অক্ষরজ্ঞান দেবার জন্য 'পাঠশালা' খুলবেন, এবং এর জন্য অন্ততঃ একজন কৃতী গুণীজনকে তাদের মধ্যে নেমে আসতে হবে।

শ্রীভগবানের গৌরলীলায় ঠিক এমনটিই হয়েছিল। উপমাটি অবশ্য সর্ব্বাংশে খাটে না, কারণ জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে কেউ একজন সর্ব্ব-জ্ঞাতা বা জ্ঞান-সম্রাট্ থাকতে পারেন না, পরন্তু শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিময়। যাই হোক, তিনি তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গ রসজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ ভক্তকে নিয়ে 'তিন অভিলাষ' পূরণ-রূপ আনন্দাস্বাদন করতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হলেন। এঁরা হলেন স্বরূপ গোস্বামী, রায় রামানন্দ প্রভৃতি। কিন্তু বাইরে চেয়ে দেখেন, সবই কলিহত, মায়াবদ্ধ, বহির্ম্মুখ জীব; তাদের মধ্যে পাষণ্ডের সংখ্যাও কম নয়। তখন কতকটা নিজ প্রয়োজনে এবং বেশীর ভাগই করুণাবশতঃ তিনি এদের 'ধর্ম্ম-অক্ষর' পরিচয় জ্ঞান দেবার জন্য নিজ অন্তরঙ্গদের মধ্যে যোগ্যতম 'শিক্ষক'

নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু ও বৃন্দাবনে রূপসনাতনকে প্রেরণ করলেন। তাঁদের মারফৎ যে universal mass prescription এর ব্যবস্থা করলেন, তা' অবিলম্বেই কার্য্যকরী হ'ল। বহু উদাসীন, বিপথগামী, নাস্তিক, এমন কি পাষণ্ড পর্য্যন্তও নিত্যানন্দপ্রভুর এই 'গণ-পাঠশালা'য় ভর্ত্তি হয়ে ধর্ম-শিক্ষার 'অ-আ-ক-খ' পাঠ নিল। তারা ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল, বৈষ্ণবধর্মে আগ্রহী হ'ল এবং তাদের চিত্তে গৌর-নিত্যানন্দে ভক্তির বীজ রোপিত হ'ল। এতে দেশ কলির আসন্ন গ্রাস হ'তে রক্ষা পেল। মহাপ্রভুও যেমন অনেকটা নিশ্চিন্তে তাঁর লীলাস্বাদন করলেন, ভারতভূমি—বিশেষতঃ গৌড়বঙ্গ—ব্যাপকভাবে অধর্মাচরণ, হিংসা ও পাশববৃত্তির তাণ্ডবতা ও মুসলিম অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত হ'ল।

এইবার জিনিষটি বিচার ক'রে দেখা যাক। মহাপ্রভু নিজ লীলা ক'রে গেলেন এবং দেশের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে ধর্মের আওতায় আনলেন। কিন্তু সে কতটুকু? —ঐ 'অ আ-ক-খ' পর্য্যন্ত। এদিকে মহাপ্রভু ও তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ছিলেন আবিষ্কারক বা গবেষক শ্রেণীর উচ্চতম পর্য্যায়ভুক্ত। মধ্যেকার এই বিপুল 'gap' কিন্তু রয়েই গেল। অ-আ-ক-খ শিখে কত কষ্ট ক'রে ক্রমে ক্রমে এগোতে হয় একটু একটু ক'রে; কত পরিশ্রম, দিবানিশি কত মনোযোগ, কত চেষ্টা, কত অধ্যবসায়; শিক্ষকের কত তিরস্কার, পরীক্ষার কত বিভীষিকা, সেই পরীক্ষায় ব্যর্থতার হতাশা ও সার্থকতার আনন্দ, তারপর একটি একটি ক'রে ক্লাস প্রমোশন পেয়ে ভাল ছেলের পক্ষে দশ বছর ও খারাপের পক্ষে হয়তো আরো চার পাঁচ বছর ধৈর্য্য ধ'রে থাকলে, তবে স্কুল পাঠ সমাপ্ত হয়। তারও পরে আছে কলেজে উচ্চতর শিক্ষা, চার বছর পরে ঠিকমত পরীক্ষা-পাশ করতে পারলে গ্র্যাজুয়েট্ পদ লাভ, এবং যারা আরো উচ্চতর শিক্ষাভিলাষী তাদের স্নাতকোত্তর সম্মান প্রাপ্তি। তারপরেও জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত রয়েছে গবেষকদের জন্য। কিন্তু তা' সম্ভব একমাত্র তাঁদেরই পক্ষে, যাঁরা ধাপে ধাপে এতগুলি সুকঠিন ও সুদুস্তর স্তর অতিক্রম ক'রে স্নাতকোত্তর পদবী প্রাপ্ত হয়েছেন। এখন 'অ-আ' শিক্ষার্থী যদি খেয়ালবশতঃ গবেষণার সাধ করে তবে তাকে কী বলা যাবে? 'উদ্বাহুরিব বামনঃ,' অর্থাৎ বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরবার বাসনা করার মতই নয় কি?

শ্রীভগবান্ গৌর-লীলায় জনগণকে সত্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তাদের মধ্যে ধর্ম-'প্রবণতা' এনে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই তিনি ক'রে গেলেন। স্কুল বসিয়ে ধাপে ধাপে শিক্ষা দিয়ে ও পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণদের Primary ও Secondary education দিয়ে যাবার সময় পাননি তাঁর নিযুক্ত ভক্তগণ। সুতরাং পরবর্ত্তী যুগে তো সেটা কল্পনাই করা যায় না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে কেউই এ সকল

ধাপ অতিক্রম করেননি। অবশ্যই করেছেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। মহাপ্রভুর সময়ের সেই infant class থেকে research-stage পর্য্যন্ত যে বিরাট gap-এর সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা রয়েই গেল।

এই gapটি কতদূর, কেমন তার রূপ, কেমন ক'রে তা' পার হ'তে হয়, তা' একমাত্র সে-gap যিনি নিজে পার হয়েছেন, তিনিই বলতে পারেন, বোঝাতে পারেন বা অন্যকেও পার করাতে পারেন। এঁদেরই নাম 'সিদ্ধসাধক'। মহাপ্রভু ও তার অন্তরঙ্গগণের এদিকে দৃষ্টি দেবার অবসর তো ছিলই না, পরন্তু সময়টাও তার অনুকূল ছিল না। এখন তাঁর পরবর্ত্তী সময়ে যদি কেউ আগ্রহী হয়ে 'ধর্ম-স্কুলের' পাঠক্রম অনুসরণ ক'রে ধর্ম-শিক্ষা করতে চায়, ধর্ম-শিক্ষার Matric, I. A., B. A., M. A. পাশ করতে চায়,—তবে তার উপায় কী হবে? কোথায় পাবে সে শিক্ষক? কোথায় সে-পথের পথিক, কোথায় সিদ্ধ সাধক?

যেখানে-সেখানে, হাটে-বাজারে এ শিক্ষক পাওয়া যায় না। এ বস্তু সেই চণ্ডীদাস বর্ণিত 'কোটিকে গুটিক' মেলে, বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিত 'কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত'। আবার এর পথও ভিন্ন ভিন্ন। অসিদ্ধ সাধকগণ, বিশেষতঃ যাঁরা এখনও নিম্নশ্রেণীভুক্ত, নিজ নিজ পথের উৎকর্ষতা বর্ণনা ও অপর পথের নিন্দা ক'রে শুধু বিবাদেরই সৃষ্টি করেন। ফলে উৎসুক শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু যিনি সব ক'টি পথের সবখানিই ভ্রমণ ক'রে একেবারে সেই সেই পথের অন্তিমে পৌঁছেছেন, তিনিই কেবল এসব পথের গুণাগুণ বিচার ক'রে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে সেই সেই পথে নিয়ে যেতে পারবেন। Arts, science, commerce—সব বিষয়েই যিনি সমভাবে পারদর্শী, সেই versatile geniusই কেবল শিক্ষার্থীকে তার বিদ্যাশিক্ষার ঠিকমত line এ পরিচালনা করতে পারেন, অপরে নয়। ধর্মজগতে এইরূপ একটি versatile genius রূপে অবতীর্ণ হলেন শ্রীশ্রীপাতালদেব।

জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, তন্ত্রমার্গ, ভক্তিমার্গ—সব মার্গেরই সাধনের সমগ্রপথ, শুরু হ'তে শেষ পর্য্যন্ত, অতিক্রম ক'রে তিনি চরম সীমায় বা সিদ্ধ অবস্থায় পৌঁছিয়েছিলেন। একান্তভাবে তাঁরই শ্রীপাদপদ্ম আশ্রিত এই দীন দাসকে তিনি কৃপা ক'রে এই সব বিভিন্ন সাধনপন্থা সম্বন্ধে যেটুকু উপদেশদান ও ধর্মতত্ত্ব চিত্তে স্ফুরিত করেছেন তারই কিছু কিছু ভাষায় বিবৃত করতে চেষ্টা করব। এসব তত্ত্ব যদিও তাঁর সাধন ক্রিয়াকলাপের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত, তথাপি প্রত্যেক সিদ্ধান্তই শাস্ত্রযুক্তিসম্মত, তাই যথাযোগ্য শাস্ত্রবচনও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হবে। মহাপ্রভুরও আজ্ঞা—"সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন"—চৈঃ চঃ ২।২৪।

তাঁর শিক্ষা হ'তে জানা যায় যে সব মার্গেরই অন্তর্গত কিছু কিছু সাধন স্তর-বিশেষে সাধকের অবশ্য প্রয়োজন। কোনো কোনো শাস্ত্রাদিতে এবং বাস্তবজগতেও দেখা যায় বটে, যে এক এক ধর্মপন্থী শুধু নিজ পন্থারই উৎকর্ষ-কীর্ত্তন ও অন্য সব মার্গের নিন্দা করে এবং স্ব-স্ব পন্থাতেই শেষ সীমায় পৌঁছানো যায় এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্র এবং প্রকৃত সিদ্ধ সাধু মহাপুরুষ কোনো পন্থারই দোষ কীর্ত্তন করেন না, বরং প্রত্যেক মার্গের প্রয়োজনীয়তার কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। তবে যেহেতু প্রত্যেক মার্গাবলম্বীদের মধ্যেই উন্মার্গগামী আছে ও সময়ানুসারে ধর্মের বিকৃতি ও গ্লানি দেখা যায়, তজ্জন্য সেই সেই সময়ে রচিত সৎশাস্ত্রগুলি সেই সেই গ্লানিবহুল বিকৃত ধর্মাচরণ সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে দেন এবং মহাপুরুষগণও সাধককে সাবধান করেন। কিন্তু সাধনের স্তরভেদে বিশেষ বিশেষ স্থানে এক এক মার্গকথিত সাধন-প্রয়োজনের কথাও তাঁরা উপদেশ দেন। কিন্তু তাই ব'লে গুরু-নির্দ্দেশ ব্যতীত, নিজের ইচ্ছামত সাধনের 'জগা-খিচুড়ি' করলে সাধকের অধঃ-পতনই হবে। একমাত্র সিদ্ধ গুরুই সাধক শিষ্যকে তার সাধনের স্তরভেদে উপযুক্ত স্থানে তার উপযুক্ত সাধন-প্রণালী উপদেশ করতে পারেন। সাধকের কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম ও প্রণালী বেঁধে দেওয়া যায় না, সে-প্রণালী নির্ব্বাচনের ভার ছেড়ে দিতে হবে গুরুকে। আবার যেহেতু সাধারণতঃ এক গুরু সব মার্গ-সাধনের পূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারেন না, সেহেতু সাধককে স্তরভেদে প্রয়োজন মত ভিন্ন ভিন্ন মার্গের গুরু, বা ভিন্ন ভিন্ন specialist বা expert-opinion নিতে হবে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৯।৩১ শ্লোকে বলেছেন, 'এক গুরুর নিকট সুস্থির সুপুষ্ট জ্ঞানলাভ হয় না' (অনুবাদ)। সে-গুরুর সন্ধান শ্রীভগবান্‌ই একনিষ্ঠ সাধককে মিলিয়ে দেবেন। সাধনের চরম সীমালাভ সহজে হবার নয়—বহু জন্ম ধ'রে বহু দুঃখ-কষ্ট, বহু শারীরিক ও মানসিক কৃচ্ছ্রসাধন, বহু উত্থান-পতন, বিপুল বিঘ্ন-বিপর্য্যয় ও ব্যর্থতা-সার্থকতার উত্তাল তরঙ্গ-দোলায় দুলতে দুলতে তবে যদি দৈবক্রমে কারো ভাগ্যে এ অপার পারাবার পার হওয়া সম্ভবপর হয়—"কোনো ভাগ্যে কেহ তরে, নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে"—চৈঃ চঃ ২।২২, "ম্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন"—ভাঃ ১০।৮৮।৫।

তবে যে ভক্তিশাস্ত্রে বলে, কোনো মার্গেরই প্রয়োজন নেই, একমাত্র ভক্তিমার্গেই তাঁকে পাওয়া যায়, এবং ভক্তিসাধনেই তাঁর পূর্ণতম স্বরূপের পরিচয় মেলে—একথা কি মিথ্যা? না, মিথ্যা নয়। ভক্তিমার্গেই যে তাঁর পূর্ণতম স্বরূপকে লাভ করা যায়, এ কথা সর্ব্বৈব সত্য; অন্য সব পন্থারই শেষ প্রাপ্তি এ অপেক্ষা ন্যূন, এও সত্য। তবে অন্য সব মার্গ অনুসরণ করা অনুচিত ব'লে তাঁরা যে মন্তব্য করেছেন, সেটা শাস্ত্র-রচনার সেই সেই সময়োপযোগী এবং ধর্মরাজ্যে সদ্য প্রবিষ্ট সাধকগণের পক্ষে

অবশ্য পালনীয়। কারণ সেই সেই সময়ে অন্যান্য পন্থাবলম্বীগণ বেশীর ভাগই উন্মার্গগামী ছিলেন, তাঁরা ধর্মাচরণ অপেক্ষা নিজ নিজ শ্রেণীস্থাপন প্রয়াসেই সচেষ্ট ছিলেন এবং নিজ ধর্মপ্রচার অপেক্ষা পরধর্ম নিন্দাতেই মুখর হয়েছিলেন। এদের সাহচর্য্য প্রাথমিক ধর্মশিক্ষার্থীর পক্ষে ভয়াবহ বিপজ্জনক, তাই মহাপ্রভু সর্ব্বতোভাবে তাদের সঙ্গ পরিহারের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন।

এক্ষণে যাঁরা নিজ নিজ মার্গে গুরু নির্দ্দেশমত ধর্মপথ গ্রহণ ক'রে ধর্ম আচরণ করছেন, তাঁরা বলবেন যে তাঁরা নিজ নিজ পথেই বেশ অগ্রসর হচ্ছেন এবং কেউ কেউ এমন দাবীও করবেন যে তাঁরা 'সিদ্ধি'-লাভ করেছেন। এ বিষয়ে এই দীনের সবিনয় নিবেদন এই যে আমরা যদি বিনত চিত্তে নিজের 'আত্মানুসন্ধান' করি, তবে সবিস্ময়ে বুঝতে পারব, আমরা একেবারেই ভ্রান্ত। আমরা সারাজীবন ভক্তিমার্গে নাম-সঙ্কীর্ত্তন, মন্ত্র-জপ, বিধিমত পূজার্চ্চনা, সাত্ত্বিক আহার ইত্যাদি ক'রে; অথবা জ্ঞানমার্গে বেদান্তপাঠ ক'রে, সব মিথ্যা এবং আমিই ব্রহ্ম জ্ঞান ক'রে, অথবা যোগমার্গে বিধিমত কঠোর অষ্টাঙ্গ যোগসাধন ক'রেও জীবন-সায়াহ্নে যদি নিজের কাছে নিজের দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ করি, তা' হ'লে বিস্ময়চকিত হয়ে দেখতে পাব যে সারাজীবন, হয় কার্য্যে, না হয় মুখে, না হয় মনেও, যে সব-কিছু পেয়েছির অহঙ্কার ক'রে এসেছি সেটা একেবারেই অসার, মিথ্যা ও আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। ভগবৎ-লাভ বা অনুভূতি তো দূরের কথা, আমরা যে-মায়াতে আকণ্ঠ নিমগ্ন ছিলাম সেই মায়াতেই ডুবে আছি। অন্তরে এখনো স্ত্রী-পুরুষ-ভোগলালসার অঙ্কুর অন্তর্নিহিত, মনে এখনো কাঞ্চন-সঞ্চয় কামনা, চিত্তে এখনো লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভের লালসা। এখনো বিষয়-বাসনার আকর্ষণ সমভাবে বিদ্যমান; ইন্দ্রিয় ভোগের প্রতিকূল বিষয়ে 'ঘৃণা', লোকসমাজে নিজমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় 'লজ্জা', নিজ দেহ-ধন-মান-প্রতিষ্ঠা নাশের আশঙ্কা বা 'ভয়', ইন্দ্রিয়ানুকূল ভোগ্যবস্তুর বিনাশে 'শোক', স্বার্থ-প্রতিকূল ব্যক্তি ও পরিবেশের 'নিন্দা', নিজ বংশ বা 'কুলে'র মিথ্যা গর্ব, নিজ 'শীলে'র গুণানুকীর্ত্তন, সামাজিক জাতি'-অভিমান—এই 'অষ্ট-পাশে' আমাদের দেহ-মন এখনো সুদৃঢ়রূপেই বদ্ধ। আত্মসুখকামনা পরিপূর্ণরূপেই চিত্তে বিরাজমান। স্বসুখলালসায় উন্মত্ত হয়ে স্ত্রী ভোগ ক'রে পুত্র কন্যার জন্ম দিয়ে গ্রহাবিষ্ট হয়ে নিজের ও আত্মখণ্ডীকৃত ঐ দুর্গ্রহদের জন্য জীবনের প্রায় সব সময়টুকুই এবং নিজের ও নিজ উপগ্রহদের সুখ দিতে বা দুঃখ দূর করতে নিয়োগ ক'রে এসেছি। ভগবৎ সুখ বা সেবার জন্য জীবনের কতটুকু অংশ, কত per-centage নিয়োগ করতে পেরেছি? ধর্মের আচরণ যা 'করেছি, তা' শুধু বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। কিন্তু নিজের কাছে হিসাব নিলে তার নগণ্যতা ও অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি হতেই হবে। একথা শতকরা

নিরানব্বই জন তথা-কথিত ধর্মাচরণকারীর পক্ষেই প্রযোজ্য। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও, আমরা সেই 'শিশু-শ্রেণী'তেই থেকে যাই, এবং আরো কর্মের বোঝা নিয়ে পরজন্মের জন্ম অপেক্ষা ক'রে থাকি। শুনতে অত্যন্ত অপ্রিয় হ'লেও, এ একেবারে নগ্ন ও কঠোর সত্য, এবং সকল মার্গেরই তথাকথিত ধর্মধ্বজাধারীগণের পক্ষে প্রযোজ্য।

কলেজের উচ্চশিক্ষা তো অনেক দূরের কথা, আমরা কি কেউ স্কুলের পাঠেও কিছুদূর অগ্রসর হ'তে আগ্রহ, চেষ্টা বা অধ্যবসায় দেখাই? পাঠশালায় ভর্তি হয়ে যেমন নিয়মিত পাঠশালায় যেতে হয়, তেমনি ধর্মশিক্ষায় গুরুর কাছে এসে তাঁকে সেবা দ্বারা তুষ্ট ক'রে তাঁর কৃপা-উপদেশ গ্রহণ করতে এবং যত্ন ও চেষ্টা সহকারে তা' অভ্যাস ক'রে আয়ত্ত করতে হয়। গুরুর কাছে সে-পাঠের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হ'তে হবে, তারপর পরবর্তী পাঠের জন্ম ঔৎসুক্য, জিজ্ঞাসা ও উৎকণ্ঠা থাকতে হবে। কিন্তু এগুলির কতটুকু আমরা পালন করি? আমরা যে-বিষয়-বাসনায় আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ হয়ে আছি, সে-বন্ধন-উন্মোচন করাবার জন্ম গুরুর কাছে কতটুকু উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ প্রকাশ করি? এক একটি ইন্দ্রিয় দমনের জন্ম পৃথক পৃথক সাধন আছে, তা' গুরুর কাছে শ্রবণ ক'রে নিষ্ঠা সহকারে সাধন করতে হবে। ছয় রিপু বশীকরণ, অষ্টপাশ উন্মোচন, ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ জন্ম বিশেষ বিশেষ সাধন আছে। আমরা ক'জন তা জানবার জন্ম গুরুর কাছে প্রশ্ন করি, আগ্রহ প্রকাশ করি, বা জেনে তা' নিষ্ঠা-সহকারে সাধন করি? সাধনের স্তরভেদে এর প্রত্যেকটি সাধনেরই অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং তার কঠিন কঠিন পরীক্ষাও রয়েছে। আমরা ক'জন সেসব সাধন করেছি, বা তার পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি? যে মায়াময়ীর মায়াজাত বিশ্বে আমরা বর্তমান রয়েছি,—এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি যাঁর উপাদানে গঠিত এবং যাঁর 'দুরত্যয়া মায়া'-মোহে জীবমাত্রেই মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত, সেই বিশ্বপ্রসবিনী মহামায়াকে জানবার, চিনবার ও বুঝবার জন্ম,—এই দুস্তর মায়া-সমুদ্র পার হবার জন্ম, সেই জগজ্জননী মায়া-দেবীর করুণাকটাক্ষ লাভের জন্ম ক'জন আমরা সচেষ্ট হয়েছি, ক'জন সাধন করেছি?

আমরা কথায় কথায় ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের উল্লেখ ক'রে থাকি। কিন্তু ভেবে দেখিনা সেটা কত দূরের বস্তু। আগে বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ক'রে আত্মসুখ-কামনা বিসর্জন দিয়ে, বহু দুঃখকষ্ট, বহু বিঘ্নবিপর্যয় অতিক্রম ক'রে ইন্দ্রিয়বশ করতে হবে, ষড়রিপুকে জয় করতে হবে; বিশ্ব প্রসাবনী জগজ্জননীকে আরাধনা ক'রে তাঁকে প্রসন্ন করতে হবে। মাতৃতত্ত্ব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারলে তবে তো সেই বিশ্বজননীর কৃপা হবে, তবে তিনি যদি কৃপা ক'রে পাশ-বন্ধন ছেদন ক'রে মায়া

সমুদ্রের পরপারে নিয়ে যান, তবে তো মায়া পার হওয়া যাবে। তারও পরে কারণ সমুদ্রের পরপারে ব্রহ্মলোক, তারও গভীরে বৈকুণ্ঠ ও গোলোকধাম। এসব এত দূরের ব্যাপার, যে 'অ-আ' শিক্ষার্থীর নিকট গবেষণা তত্ত্বালোচনার মত, 'আদার ব্যাপারীর কাছে জাহাজের খবরের' মতই একান্ত অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় স্বর্গের দেবতাগণ তো মায়ামুক্ত ননই; মহ-জন-তপ ও সত্যলোকের ঋষিগণও সম্পূর্ণরূপে মায়ামুক্ত নন। স্বয়ং ব্রহ্মাও, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েও মায়াপার হ'তে পারেন নি। মহাদেব স্বয়ং প্রলয়কর্ত্তা ও মায়াধীশ হয়েও শ্রীকৃষ্ণমায়া মোহিনী কর্ত্তৃক মুগ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীভগবানের বাণী 'মম মায়া দুরত্যয়া' অতি নির্মম সত্য। ব্রহ্মাণ্ডের কারো পক্ষে নিজ চেষ্টা বা সাধনে এ মায়া অতিক্রম করা সম্ভব নয়। একমাত্র যিনি নিজে মায়াপার হয়েছেন, এমন কোনো সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্তের কৃপায় বহুজন্ম ধ'রে সাধন করলে তবেই মায়াদেবীর কৃপা-কটাক্ষ লাভের আশা করা যায়। তাই মহ-জন-তপ লোকের ঋষিগণও ধরণীতে আসেন মায়ামুক্ত কৃষ্ণভক্ত বা সিদ্ধ মহাপুরুষের স্থানে তাঁদের প্রণাম করতে, সিদ্ধ-পীঠের ধূলি ও হাওয়া স্পর্শ করতে ও তাঁদের সঙ্গলাভের আশায়। অবশ্য, সাধনের জন্য 'নরদেহ' ধারণের প্রয়োজন। তাই স্বর্গ, মহ, জন, তপ লোকের সাধনেচ্ছু দেব-ঋষিগণও মনুষ্যজন্ম প্রার্থনা করেন, কারণ, সূক্ষ্মদেহে 'সাধন' হয় না, মাত্র সুখদুঃখ ভোগ হয়ে থাকে।

তারপর, আমরা কি কোনোদিন চিন্তা ক'রে দেখেছি, মহাকৃষ্ণভক্ত দেবাদিদেব মহাদেব কোন্ পরমধনের উদ্দেশে, কোন্ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে সোনার কৈলাস পরিত্যাগ ক'রে শ্মশানবাসী হয়েছেন? তিনি যে-পথ নির্দেশ করেছেন প্রত্যেক সাধকেরই সাধনার উচ্চতর পর্য্যায়ে সে-সাধন অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এসব একেবারে 'মটুকার খবর', research scholar এর গবেষণার বস্তু, infant class ভুক্ত, আমাদের মত শিশু শিক্ষার্থীর কাছে একান্তই অবান্তর। তবু আমাদের এ সব কথা ভেবে দেখা উচিত—আমাদের মিথ্যা অভিমান, অলীক কল্পনা ও বৃথা গর্ব্ব চূর্ণ করবার জন্য এবং আমাদের সাধন-জগতের 'মায়ার ঘুমঘোরের' সুখস্বপ্ন ভাঙাবার নিমিত্ত।

একণে একে একে জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ ও তন্ত্রমার্গ কথিত কিছু কিছু সাধনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করতে সচেষ্ট হব এবং সেই সাধনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শাস্ত্রসমর্থনও প্রদর্শন করব।

স্বসুখবাসনার জন্য পঞ্চ বিষয়ে ইন্দ্রিয় সমূহের আসক্তিই হ'ল মায়া-বন্ধন। এ আসক্তি আমাদের ত্যাগ করতে হবে। 'দেহ' যে আমি এবং দেহ তথা 'ইন্দ্রিয়ের' সুখই যে আমার সুখ—এ মিথ্যা অভিমান বর্জ্জন করতেই হবে। 'আমি' যে দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত, নিত্য চৈতন্যময় আনন্দস্বরূপ; এবং বিশ্বের সব বস্তুই নশ্বর,

ভোগ্য বস্তুর যথার্থ তৃপ্তিপ্রদান ক্ষমতা নেই, আমাদের স্বসুখবাসনাই তাদের ভোগ্য বস্তু ব'লে প্রতিভাত করায়—এ সত্য জ্ঞান আমাদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে। নতুবা কিছুই হবে না। এ অনুভূতি-লাভ মুখের কথায়, উপদেশে বা গ্রন্থপাঠে হয় না; এরজন্য চাই যথোপযুক্ত 'সাধন'-ক্রিয়া ও তার সার্থকতার জন্য গুরুসেবা ও গুরু কৃপা। এ সত্য অনুভূতি লাভ করতে পারলে, তবেই মায়ার ঘুমঘোর কাটে, অন্যথা নয়, কিছুতেই নয়। বিনা সাধনে এ উপলব্ধি হ'তে পারে না। এর জন্য যে-সাধন প্রয়োজন, জ্ঞানমার্গে সেই সাধন অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞানমার্গ মায়াজয়ের direct পথ বা সরাসরি প্রত্যক্ষ সাধন-পথ। সব ভোগ্যবস্তুকে মিথ্যা জ্ঞান এবং নিজ দেহ 'আমি' নই—এই বোধ অর্জ্জন করতে হবে। তার জন্য সব মায়াময় ভোগ্য-দ্রব্যে বিতৃষ্ণা, কঠোর বৈরাগ্য ও দেহকে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-সহনশীল করতে হবে। জ্ঞানমার্গ প্রত্যক্ষ পথ হ'লেও, সবচেয়ে কঠিন পথ।

এক্ষণে বিচার করে দেখা যাক, মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের স্বরূপটা কী রকম। আমরা দশমাস গর্ভযন্ত্রণা সহ্য ক'রে ভূমিষ্ঠ হচ্ছি; তারপর সারাজীবন আত্মসুখলালসায় ছটফট্ করছি, সুখের জন্য যা কিছু আঁকড়ে ধরছি তা' ক্ষণভঙ্গুর ও পরিণামে দুঃখপ্রদ প্রমাণিত হচ্ছে, তারপর অতৃপ্ত মন নিয়ে ভগ্নদেহে হতাশ চিত্তে দেহত্যাগ করছি। এই তো আমাদের জীবনের ধারা। এ ধারাও আবার অসীম। কিন্তু এই নিরন্তর দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কী? সে উপায়ই হ'ল ধর্ম-সাধন। আমাদের দেহ, অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়ের যাতে সুখবোধ হয় এবং দুঃখ অনুভূতি হয়—সেই উপলব্ধি ক্রমে ক্রমে কমিয়ে আনতে হবে, 'শীতোষ্ণে সমদুঃখসুখ', 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' হ'তে হবে, মান-অপমান ও নিন্দাস্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে হবে—গীতা ১৪।২৪, ১২।১৮, তবে তো দেহাভিমান, দেহ-দেহী অভেদ জ্ঞানের মিথ্যা ভ্রান্তি কাটবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে সব রকম বিষয়ভোগে লালিত ক'রে নামমাত্র ধর্ম অনুষ্ঠান করলে ভোতা হবে না, মায়া'-বন্ধন থেকেই যাবে। এর জন্য চাই কঠোর 'আত্ম-বিনিগ্রহ'-রূপ সাধন; দেহ তথা মনকে সব রকম কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত করিয়ে যে কোনো দুঃখ সহ্য করবার সীমাহীন ক্ষমতা অর্জ্জন করানো। তবে তো কিছু হবে। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুরু সাধকের যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী সাধকের ধর্মপথ ও সাধন-প্রক্রিয়া নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন। রুচি অনুযায়ী সাধকের বিভিন্ন মার্গ নির্দ্দিষ্ট হয় এবং এই কৃচ্ছ্রসাধনে দৃষ্টিভঙ্গীও পৃথক পৃথক হয়। তথাপি প্রত্যেক মার্গেই আদিতে কঠোর বৈরাগ্য, সংযম ও অভ্যাস-যোগের আশ্রয় নিতে হয় সাধককে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যৌবনে মায়াবদ্ধ "মানব স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে দুঃখনাশ সুখের জন্য কর্ম আরম্ভ করে, কিন্তু তাদের বিপরীত ফল দেখা যায়। এ ফল নিত্য

পীড়াপ্রদ, আত্মমৃত্যুহেতুভূত ও সতত চঞ্চল"। (শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৩।১৮ শ্লোকের বঙ্গানুবাদ; পাঠকের সুবিধার জন্য অধিকাংশ শ্লোকেরই বঙ্গানুবাদ দেওয়া হবে, মূল শ্লোক মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এর প্রতীকার কী? দেখা যাচ্ছে আত্মসুখলালসাই সব অনর্থ সৃষ্টি করে এবং "বিষয়-চিন্তাই অনর্থের মূল"—ভাঃ ৩।২৭।৪; "বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগহেতুই মন ক্ষুব্ধ হয়, অন্য কারণে হয় না; দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত কখনই মনঃক্ষোভ হয় না। অতএব যাঁরা ইন্দ্রিয় সংযম করেন, তাঁদের মন স্থির হয়ে শান্ত হয়"—ভাঃ ১১।২৬।২২; "সংসারপ্রবাহকারিণী তৃষ্ণাকে যথোচিত বিষয় সকল দ্বারাও পূরণ করা যায় না"—ভাঃ ৭।১৩।২৪। "মনই ধর্মাধর্ম কামনাপূর্ণ এবং আত্মার উপাধি, বিষয় দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে এই মন বিকৃত হয়ে পড়ে, এই মন গুণানুরক্ত হ'লেই বিপদের কারণ এবং গুণহীন হ'লে মঙ্গলের আস্পদ হয়"—ভাঃ ৫।১১।৬-৭; "চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হ'লেই জীবের বন্ধন এবং পরমেশ্বরে সংযুক্ত হ'লেই তার মোচন হয়"—ভাঃ ৩।২৫।১৫; সুতরাং এই যে সংসার, এই যে ভোগ্য বিশ্ব বা "প্রপঞ্চ দ্বৈত অসৎ ও অলীক হ'লেও বস্তুত জীবের মনই তার প্রকাশক; অতএব যে-মন কর্মসকলকে সঙ্কল্প ও বিকল্পযুক্ত করে, সেই মনকে দমন করা কর্তব্য, তারপর আর ভয় থাকবে না"—ভাঃ ১১।২।৩৮। বাস্তবিক এই "মনই একমাত্র দুঃখের কারণ; মন দ্বারাই সংসার-চক্র পরিবর্তিত হয়। মনের দমনই পরম যোগ, মনসংযমই চরম ফল"—ভাঃ ১১।২৩।৪৩-৪৬। কিন্তু একে দমন করব কী ক'রে? ভাগবত বলছেন, "গুরু-উপাসনাজনিত শাণিত 'জ্ঞান'-অসি দ্বারা অমূলক সংসার বন্ধনকে ছেদন করা যায়"—ভাঃ ১১।২৮।১৬; "দেহী 'জ্ঞানোৎপত্তি' দ্বারা যে পর্যন্ত মায়া পরিত্যাগ না করে এবং নিঃসঙ্গ ষড়রিপু বিজয়ী হয়ে 'আত্মতত্ত্ব' অবগত না হয়, তাবৎ সংসারপথে বিচরণ করে। যে পর্যন্ত 'মন'কে এই সংসার তাপের ক্ষেত্র ব'লে নিশ্চয় না হয়, তাবৎ সংসার থেকে নিষ্কৃতি হয় না। রোগ, শোক, মোহ, লোভ, বৈর—এই সকলে সংযুক্ত হয়ে মন মমতাপ্রাপ্ত হয়, তাতেই সংসার-তাপ হয়। ঐ মনটি ভয়ানক শত্রু, ওকে বিনাশ কর"—ভাঃ ৫।১১।১৬। "ভক্তিযোগ ও তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তকে নিবর্তিত ক'রে আপনার বশে আনবে"—ভাঃ ৩।২৭।৫; "তীব্র ভক্তিযোগ', 'তত্ত্বজ্ঞান,' বলবান্ বৈরাগ্য, তীব্র আত্মসমাধি দ্বারা অহর্নিশ পুরুষের প্রকৃতি অভিভূয়মান হয়ে তিরোহিত হ'তে পারে"—ভাঃ ৩।২৭।২০। তা' হ'লে শ্রীমদ্ভাগবত এই সিদ্ধান্ত করলেন যে 'জ্ঞানোৎপত্তিই' একমাত্র মন-দমন ও সংসার চক্র নিবর্তনের কারণ; "আত্মজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানসকল বিনষ্ট হয়"—ভাঃ ৩।২৭।২১। 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' সংযুক্ত ব্যক্তিই আমার শ্রেষ্ঠপদ জেনেছেন; জ্ঞানী 'জ্ঞান' দ্বারা আমাকে ধারণ করেন, অতএব ইনি আমার প্রিয়তম"—ভাঃ ১১।১৯।৩। কিন্তু শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান থাকলে হবে না, "জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে 'ভক্তি' ভাবে আমাকে

ভজনা কর"—ভাঃ ঐ। আরও "যোগিগণ জ্ঞানবৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা নিজ কল্যাণার্থ আমার অভয়প্রদ পাদমূল সেবা করেন"—ভাঃ ৩।২৫।৪৩ কিন্তু এই 'জ্ঞান' আসবে কোথা থেকে? ভাগবত সুস্পষ্টভাবে বললেন, "সাধুসেবা দ্বারা আমার সম্বন্ধে 'জ্ঞান' উৎপন্ন হয়। সৎসঙ্গজনিত 'ভক্তি'যোগ ব্যতীত সংসার-তরণের আর অন্য উত্তম উপায় নেই"—ভাঃ ১১।১১।৪৯; "সাধুরাই হিতোপদেশ দ্বারা মনের আসক্তি ছেদন করেন"—১১।২৬।২৬। জ্ঞানযোগের অধিকারী কারা? এর উত্তরে ভাগবত বলছেন, "যারা সংসারে কর্মসমূহের কর্মসকলে বিরক্ত হয়ে দুঃখ বোধ ক'রে কর্ম-পরিত্যাগী হয়েছে—তারাই"—ভাঃ ১১।২০।৭।

এই 'জ্ঞান'-লাভের জন্য সাধন ধর্মপথের অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক স্তর। এই সাধনের জন্য চাই এই শরীর, 'নরবপু'। বস্তুতঃ "স্বর্গবাসীরাও জ্ঞান ও ভক্তির সাধন এই শরীর অভিলাষ করেন," কারণ "তাঁরা ঐ সূক্ষ্ম দেহে সাধন করতে অপারগ"—ভাঃ ১১।২০।১২। এ জ্ঞান লাভ করা যায় তত্ত্বদর্শীর কাছে "তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয়" হয়ে—গীতা ৪।৩৭। এই 'জ্ঞান'-সাধনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গীতায় অর্জুনকে কথিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য : "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ" |—৪।৩৪, "যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি "—৪।৩৫, "জ্ঞান-প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি"—৪।৩৬, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে "—৪।৩৭, 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে',—৪।৩৮ "যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্, আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়"—৪।৪১ "তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্"—৫।১৬, "গচ্ছন্ত্য-পুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ—৫।১৭, "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে, প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ"—৭।১৭, "জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ"—৯।১। জ্ঞান-সাধনে গীতার উক্তি প্রণিধান যোগ্য—"আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহ :—১৩।৮, "ভক্তিরব্যভিচারিণী বিবিক্ত-দেশসেবিত্বমরতিঃ জনসংসদি"—১৩।১১, "ন হিনস্তি আত্মনাত্মানম্"—১৩ ২৯।

এইবার যোগ-সাধনার কথা। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে "বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগহেতু মন ক্ষুব্ধ হয়"—ভাঃ ১১।২৬।২২, এবং চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হ'লেই জীবের বন্ধন হয়"—ভাঃ ৩।২৫।১৫। চিত্তের এই বিষয়াসক্তি, অর্থাৎ বিকার, বা 'বৃত্তি' থেকে মুক্ত হ'তে হ'লে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে হবে—এরই নাম যোগ। প্রকৃতপক্ষে "মনের দমনই পরম যোগ"—ভাঃ ১১।২৩।৪৩। অন্য সব বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে নিত্যবস্তুতে যুক্ত বা focus করাই যোগ; এতে অন্যসব বিষয় অকিঞ্চিৎকর, বা out of focus হয়ে যায়। "ধীর ব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে আকর্ষণ ক'রে বুদ্ধি-সারথির সাহায্যে ঐ মনকে আমাতে সর্ব্বতোভাবে নিবিষ্ট করবে।

সর্বব্যাপক ঐ মনকে আকর্ষণ ক'রে এক প্রদেশে ধারণ করবে।"—ভাঃ ১১।১৪।৪৫। এর উপায়-স্বরূপ পতঞ্জল যোগাভ্যাসকে অপরিহার্য্য বলেছেন। যোগাভ্যাস অনুশীলনের জন্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটপ্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তিনি। শ্রীমদ্ভাগবতও বলছেন, "পরমাত্মাকে চিত্তে যমাদি যোগপথসমূহ দ্বারা চিন্তা করবে, অন্ত উপায়ে নহে"—১১।২০।২৪। আসন ও প্রাণায়ামের বিস্তৃত নিয়ম বর্ণিত হয়েছে ভাগবতের ১১।১৪।৩১-৩৫ শ্লোকগুলিতে; ২।২ অধ্যায়েও যোগের নিয়মগুলি বিশদভাবে উল্লিখিত আছে। এই যোগমার্গে যোগক্রিয়ার 'বিঘ্নে'র সম্বন্ধেও অবহিত করেছেন ভাগবত। "অপকযোগ যোগীর শরীর অভ্যন্তর হ'তেই উত্থিত উপদ্রবসকল দ্বারা বিঘ্নসঙ্কুল হয়, এই সব বিঘ্ন যোগধারণা, আসন, মন্ত্র, ভগবৎচিন্তা ও নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা ধ্বংস করতে হবে। নিত্য যোগ আচরণশীলের দেহ ক্রমে জরা-রোগাদি রহিত হয়। পরন্তু যে ভগবানের শরণ নিয়ে যোগানুষ্ঠান করে, তাকে বিঘ্নসকল অভিভূত করে না"—ভাঃ ১১।২৮।৩৮-৪০। ভাগবত বলছেন, যোগীর "প্রাণবায়ু জয় হয়" ও "ধৃতচিত্তযোগীর নিকট যাবতীয় সিদ্ধি উপস্থাপিত হয়"—১১।১৫।১; পরন্তু যোগক্রিয়ায় দেহকে সংযমের বন্ধনে বদ্ধ করা হয় এবং সতত সঞ্চরণশীল মনকে তার অনন্ত আকর্ষণ থেকে মুক্ত ক'রে শ্রীভগবান্ রূপ এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এটাই যোগক্রিয়ার পরমলাভ। এর জন্ত শরীরকে অবশ্যই নানা কৃচ্ছ্রসাধন করাতে হবে। বস্তুতঃ এই দুর্লভ "মানবশরীর ক্ষুদ্র কামনা-পূরণের জন্ত উদ্দিষ্ট নয়, ইহকালে কষ্টকর তপস্যা ও পরকালে অসীম সুখের নিমিত্ত"—ভাঃ ১১।১৭।৪২।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্ত যৌগিক ক্রিয়া-কলাপের অপরিহার্য্যতার প্রমাণ প্রদর্শনের পর এবার যোগক্রিয়ালব্ধ সুফলের কথা উল্লেখ করছি। যোগী যোগসাধন করতে করতে দেহমধ্যে যে সকল বিভূতি দর্শন করতে সমর্থ হন, তা' তাঁকে আনন্দে অভিভূত করে, এবং বহির্বিশ্বের ভোগ্যবস্তু সমূহের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণ ক'রে দেহাভ্যন্তরস্থ অতুল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য দর্শন, শ্রবণ ও অনুভব করিয়ে মনকে বিষয়-বাসনা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে প্রভূত সাহায্য করে। আমাদের এই নরবপুই যে গোলোকধাম, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক ও নানাবিধ ভগবদ্ধাম, ভগবৎ-স্বরূপ ও শক্তি মূর্ত্তির আধার বা প্রতিবিম্বস্বরূপ, তার সাক্ষাৎ দর্শন, শ্রবণ ও অনুভূতিলাভ হয় যোগ-সাধনে। এ সব সাক্ষাৎ দর্শন, যার যেরূপ স্তরের সাধন সেইভাবে, প্রত্যেক যোগীসাধকেরই লাভ হয়েছে, বর্ত্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্, 'অন্তঃশরীরে' জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ"—মুণ্ডক ৩।১।৫, "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলম্, তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্ম-

বিদোবিদুঃ"—মুণ্ডক ২।২।৯, "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ, ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ এতদ্ বৈ তৎ"—কঠ ২।১।১৩ ; অর্থাৎ, কালত্রয়ের নিয়ন্তা, অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ, অন্তরাত্মা, নির্ধূমজ্যোতির ন্যায় যোগীদের দ্বারা দৃষ্ট হন। তিনি আজও আছেন, কালও থাকবেন। ভাগবত বলছেন, "মনদ্বারা প্রাণজয় ক'রে প্রাণায়াম করবে ; প্রাণবায়ুকে ছয় ঊর্দ্ধস্থানে নীত করবে ; স্ব স্ব দেহমধ্যে হৃদয়াকাশে প্রাদেশ পরিমিত পুরুষকে ধারণা দ্বারা চিন্তা করবে"—২।২। গীতায় যোগসাধন সম্বন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বিশেষভাবে বর্ণনা ক'রে তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে অষ্টম অধ্যায়ের উপসংহারে বলছেন "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন" এবং "যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্"-৮।২৮। এগুলি বাস্তব সত্য। যোগসাধনা মাধ্যমিক স্তরে প্রয়োজন।

তন্ত্রমার্গ—শক্তি-সাধনা মূলক। বিশ্বের মূল তত্ত্ব এক বিরাট শক্তি—এই জ্ঞানে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা। সাধককেও তাই শক্তি অর্জ্জন করতে হয় সর্ব্বপ্রকারে। তজ্জন্য 'ভয়' দূর করা প্রয়োজন। শ্মশান ভয় ও বিভীষিকা পূর্ণ। সেখানে বাস ও সাধন-ক্রিয়া ক'রে সাধক 'ভয়' জয় ক'রে 'অভয়া শক্তি'র আরাধনা করেন। "নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু"—ভাঃ ১১।৫।৩১, "কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি"—শ্রীধরস্বামী।

পূর্ব্বেই ব'লেছি চার মার্গের লক্ষ্য বা সাধ্য শ্রীভগবানেরই বিভিন্ন স্বরূপ। আবার ভক্তি-মার্গের মধ্যেই যে তাঁর পূর্ণতম প্রকাশ সে সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজ সাধন-সংস্কার অনুযায়ীই তার লক্ষ্য বা সাধ্য নিরূপিত হবে।

এবার ভক্তিযোগের কথা আলোচনা করা যাক। ভক্তিযোগ ভগবান্‌কে যেভাবে বশীভূত করে, অন্য কোনো যোগ তা' করতে পারে না। আবার সবমার্গেরই শেষ-সিদ্ধির জন্য ভক্তিযোগের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে। একথা সর্ব্বশাস্ত্রে বহু স্থলে কীর্ত্তিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে দৈহিক দুঃখসহন, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, নিরলস সাধন-ক্রিয়াও যেমন অবশ্য প্রয়োজন সকল সাধকের প্রাথমিক অবস্থায়, তেমনি আবশ্যক বৈরাগ্য, দৈন্য, সহিষ্ণুতা অভিমানশূন্যতা, পরের সম্মানদান, অহিংসা, সরলতা ও জীবে দয়া। প্রাথমিক স্তরের সাধককে অন্তর 'সেবায় উন্মুখ' ক'রে তুলতে হবে। কারণ, "শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ, সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"—ভ, র, সি-১০৯। এখন 'সেবা'র অর্থ 'অন্য বাঞ্ছা ছাড়ি' আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন'। এরূপ সাধনেই শ্রীকৃষ্ণনাম কৃপা ক'রে সাধকের জিহ্বায় স্ফুরিত হ'তে পারেন। "কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা,… লাভপ্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ, সেকজল পাইয়া উপশাখা বাড়ি যায়, স্তব্ধ হইয়া মূল-

শাখা বাড়িতে না পায়"—চৈঃ চঃ ২।১৯। এরূপ দুর্ব্বাসনাপুষ্ট কীর্ত্তনকারী "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন, তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন"—চৈঃ চঃ ১।৮। শ্রীশ্রীপাতালদেব বার বার বলেছেন, "বাবা এমনভাবে নাম ক'রোনা, যাতে দুর্ব্বল রোগীর হার্টফেল হয়ে যায়। নাম হবে মধুর হ'তে মধুর, নাম শুনে হৃদয় গ'লে যাবে, মনপ্রাণ জুড়িয়ে যাবে। নাম শুনে বিভীষিকা না লাগে যেন।" মহাপ্রভু বলেছেন, "মাধুর্য্য ভগবত্তা সার," "তাঁর নামকীর্ত্তনে বদন রুদ্ধ হয়ে যাবে" এবং সর্ব্ব অবস্থাতেই সাধন হবে মাধুর্য্যময়, যে 'মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা"—উঃনীঃ ৬৪। অবশ্য সর্ব্ব অবস্থাতেই সাধককে গুরুসেবা দ্বারা গুরুকৃপা লাভে যত্নবান্ হতে হবে। তারপর জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ কথিত দৈহিক ও মানসিক সাধনও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সাধনস্তরে অবশ্য প্রয়োজন। সনাতন গোস্বামী ভক্তিসাধনে যোগমার্গসাধনার প্রয়োজনীয়তার কথা ইঙ্গিত ক'রে বলেছেন, আমার 'বৈষ্ণব যোগও' নেই,"যোগোঽথবা বৈষ্ণবঃ"। পরন্তু বিষয়-বাসনা থেকে মনকে বিরত করিয়ে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে যুক্ত করাতে যোগধারণার যে একান্ত প্রয়োজন তা' ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়েও বলছেন, "এইরূপে 'ধ্যান' করলে আপনার হৃদয়াকাশে ভগবান্ যখন 'জ্ঞান'রূপে প্রকাশ পাবেন, তখন প্রেমরসাপ্লুত 'ভক্তি'-বলে তাঁর প্রতিই মন অর্পিত হবে। তখন তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই দেখতে ইচ্ছা হবে না। এই প্রকার ধ্যানাসক্তিতে হরির প্রতি যোগীর 'প্রেম'সঞ্চার হয়, 'ভক্তি'-ভরে হৃদয় গ'লে যায় এবং প্রেমে অঙ্গ পুলকিত হয়"—ভাঃ ৩।২৮।৩৪।

ধর্ম-সাধন-পথে অগ্রসর হ'তে হ'লে সাধককে চারটি ধর্মমার্গ কথিত সব সাধনপন্থারই, কোনো কোনোটি সময় বিশেষে,যে সাধন করবার প্রয়োজন হয়, এই বাস্তব সত্য অবগত হয়েই শ্রীশ্রীপাতালদেব চারটি ধর্মমার্গই আগাগোড়া সাধন ক'রে সিদ্ধিলাভ করত তাদের স্বরূপ পরিচয় অবগত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সাধককে সেইমতো প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে প্রমাণ করলেন সিদ্ধিলাভ সহজ বস্তু নয়; পরন্তু স্মরণ করিয়ে দিলেন মহাপ্রভু-বাক্য, "প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতন-ধন, অনেক যে দুঃখেতে মিলয়— দেহ গেহপুত্রদার, বিষয়-বাসনা আর, সর্ব্ব আশা যদি তেয়াগয়"—ভক্তমাল; আরও দেখিয়ে দিলেন "জায়তে অত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ"—নারদপঞ্চরাত্র।

সত্যই সেই অধর চাঁদ অনেক দুঃখের ধন।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশ্রীপাতালদেবের বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মতত্ত্ব ও ভগবৎতত্ত্ব-বিশ্লেষণ ।

লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীপাতালপ্রভুর লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবৎতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। শ্রীভগবান্ স্বয়ং, তাঁর অবতারগণ, অথবা তাঁর ভক্তগণ কেউই পরিস্ফুটভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থায় এ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন নি। হয়তো এতদিন এর প্রয়োজন ছিল না। বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। এ যুগে মানবমন সব বিষয়ই বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা যাচাই ক'রে নিতে আগ্রহী। তাই বোধ হয় এই কালোপযোগী প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে শ্রীশ্রীপাতালপ্রভু বস্তু-বিশ্ব ও চেতন সত্তা, সচেতন আত্মার কর্ম ও তার বন্ধনহেতু দুঃখ, মানবাত্মার কর্মজ দুঃখের নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ ধর্মাচরণ, অতীন্দ্রিয় পরম সত্তার স্বরূপ, তার সহিত সাধারণ জীবের ও বস্তুবিশ্বের সম্বন্ধ—এই সকল বিষয় নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পন্থায় ও সরল গণিতের সহায়তায় সবিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করেছেন।

পাতালপ্রভুর 'প্রত্যক্ষ দর্শনে' বস্তু-জগৎ, চেতন আত্মা ও পরম রহস্যময় পরমাত্মার সত্য স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তা' অতি সংক্ষিপ্তভাবে, এবং এতে এ সব বিষয়ের ইঙ্গিত মাত্র আছে। পরন্তু আত্মার কর্মজ বন্ধন, তজ্জন্য তার দুঃখ, সেই দুঃখ তথা ভবচক্র-নিবৃত্তির পন্থাস্বরূপ ধর্মাচরণের উপায়গুলিই বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ-দর্শনে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে এতে বর্ণিত তত্ত্বগুলি একমাত্র সাধকজনেরই বোধগম্য।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক

যাঁদের সমগ্র জীবন ধর্মসাধনায় নিযুক্ত নয়, তাঁরা প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) সাধারণ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ—যারা কোনো বিষয়ে চিন্তা বা বিশ্লেষণ না ক'রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরা এদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত কোনো জিনিষ মানতে পারে না। জনসাধারণের অধিকাংশই এই শ্রেণীভুক্ত। এদের এই স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ জ্ঞানের কোনই মূল্য নেই। (২) যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করেন। এঁরা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; (ক) যাঁরা তর্কশাস্ত্রসম্মত প্রথায় যুক্তি দ্বারা তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন—এঁরা দার্শনিক। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন এই সকল দার্শনিকের সিদ্ধান্তসমূহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণপূর্ণ ও প্রখর মেধাশক্তির পরিচায়ক। (খ) যাঁরা গণিতবিদ্যার সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং সেই সকল সিদ্ধান্ত বাস্তব ঘটনাবলীতে প্রয়োগ ক'রে মিলিয়ে নেন—এঁরা বৈজ্ঞানিক। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—কারো সহিত কারো পুরাপুরি সামঞ্জস্য নেই। সুতরাং দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত সমূহ পরস্পরবিরোধী ও

বিভ্রান্তিমূলক। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই বাস্তব পরীক্ষা সাপেক্ষে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; তাই সকল বৈজ্ঞানিককেই সে সব সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করতে হয়। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্তই মেনে নেয়।

চৈতন্য-চেতন বৈজ্ঞানিক

'বৈজ্ঞানিক' বলতে আমরা সাধারণত যাঁদের বুঝি, তাঁরা সকলেই বস্তু-বিজ্ঞান নিয়ে পর্য্যালোচনা করেন। অবস্তু অর্থাৎ চেতন সত্তা সম্বন্ধে কোনো বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন না। কারণ তাঁদের আলোচনা যে-গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এটা সেই গণ্ডীর বাইরে পড়ে। কিন্তু তথাপি এঁদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন যে বস্তু-বিজ্ঞানের সীমানার বাইরে আড়ালে থেকে কোনো রহস্যময় চেতন শক্তি সর্ব্বদাই কাজ করছে—যাকে বাস্তব ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রপাতি দ্বারা ধরা-ছোঁওয়া যায় না, অথচ যার অস্তিত্ব অবিসংবাদিত ও যার প্রভাব অমোঘ। এই রহস্যময় শক্তির ইঙ্গিত অনেকেই দিচ্ছেন। বস্তু-বিশ্ব যে কোনো বিরাট চেতন মনের সৃষ্টি, এ সম্বন্ধে বলছেন Sir James Jeans;

1. Nature and our conscious mathematical mind work according to the same laws. The universe cannot admit of a material representation, as it is nothing but a *mental concept*—it consists of the pure thought of a *mathematical thinker*.

2. The universe looks more like a great thought than a great machine.

3. If the universe is a universe of thought, then its creation must have been an *act of thought*. So modern scientific theory compels us to think of the creator as working outside time and space, which are part of this creation, just as the artist is outside the canvas.

বস্তুবিশ্ব যে মানসচিন্তা হ'তে উদ্ভূত, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলছেন বৈজ্ঞানিক Lawden তাঁর Quantum mechanics গ্রন্থে:

The physical world is an abstract creation of the mind of man, modelling for him the pattern of his sense-perceptions.

বস্তু বা matter যে অবস্তু-সমুদ্রে মানস ভাবনাসঞ্জাত তরঙ্গমাত্র তা' বলছেন Sir Jeans.

1. Matter is a packet of *waves*—mere visualisations of a mathematical formula of an undulating but wholly abstract nature.

2. Thus matter must be of the same nature as *mind*.

3. Substantial matter resolves itself into a creation and manifestation of *mind.*

4. The *mind* is the *creator* and *governor* of the realm of matter.

উদাত্তকণ্ঠে বলছেন—Sir Arthur Eddington

1. The substance has melted into shadow. It remains an unknown quantity which the mathematical symbol X stands for.

2. To describe matter the physicist will point to a number of symbols and a set of mathematical equations which they satisfy.

3. The familiar qualities of touch, colour and sound are fancies projected by the mind into the external world.

ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু-বিশ্ব সীমাবদ্ধ, অসম্পূর্ণ ও অসত্য; ইন্দ্রিয়াতীত বিশ্বই পরম সত্য। বস্তু-বিজ্ঞানীর কল্পিত বিশ্ব এই দুই বিশ্বের মাঝামাঝি; জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে সে কল্পিত বিশ্ব বস্তু-বিশ্ব থেকে স'রে অবস্তু-বিশ্বের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। এ সম্বন্ধে বলছেন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Max Planck :

There are three different kinds of worlds : (i) the world of senses, or the tangible world, (ii) the world of physics, or the *hypothetical* world, (iii) the *real* world, or the world of intangibility. The tangible world is based on sense-perceptions. The world of physics is a deliberate hypothesis put forward by a finite human mind, and, as such, it is subject to changes. The real world lies beyond our senses, and is independent of them. As the view of the physical world is perfected, it recedes from the world of senses and simultaneously approaches the world of reality.

এ বিষয়ে বলছেন Sir James Jeans :

1. Everything that has been said and every conclusion that has been tentatively put forward is speculative and *uncertain.*

2. It is generally recognised that we are not in contact with ultimate *reality.*

বলছেন Sir Arthur Eddington-ও—

The physicist does not hide the *incompleteness* of his work and implicitly advertises for some one to complete the work.

Mathematician Martin Gardner বলছেন :

Modern science should indeed arouse in all of us a *humility*—before the immensity of the unexplored and a tolerance for crazy hypotheses.

বৈজ্ঞানিক Alexander জানালেন :

Eddington and some other scientists maintain that God and mind are *realities* that we know directly, while physical realities we do *not know*, and only approach by symbolical construction.

এ যুগের molecular Biologist Gunther Stent বললেন :

Man will *never know* how the universe began or what is the most fundamental of atomic particles, because such mysteries are hideen in an endless and tiresome succession of Chinese boxes.

Britain-এর প্রখ্যাত Astrophysicist Sir Fred Hoyle মত দিলেন :

There may be processes under way in the universe that are *totally at odds* with the accepted physical laws.

New-York-এর আধুনিক Physicist David Finkelstein-এর মতে—

The way has been prepared to turn over the structure of present physics. I consider *space*, *time* and *mass* as *illusions*. I am searching for a link between physics, relativity and human consciousness.

Physicist M. I. T. Morrison বললেন :

Rationality has to include the *irrational*.

Harvard-এর Astronomer Owen Gingerich স্পষ্ট তাঁহার মত দিলেন—

Aspects of *mysticism* totally outside science may come back and be incorporated within its framework.

আরও একধাপ এগিয়ে এসে West Germanyর Max Planck Institute-এর director Friedrich Weizacker ঘোষণা করলেন :

A unity between *mysticism* and *science* already exists.

জীবদেহের মধ্যে জীবের দেহ-পরিচালনায় এক রহস্যময় চেতনশক্তির কথা জানাচ্ছেন বহু প্রখ্যাত Biologist। বলছেন Dr. Carrel :

Each part of the body seems to know the *present* and *future* needs of the whole. An organ develops by means such as those attributed to *fairies* in the tales told to children.

বলছেন Dr. Ratcliff ও Platt ;

DNA is life itself. It has a vivid *memory* which time does not dim. It stores a vast number of directions and blue prints which it issues just at the right time and place. DNA is prepared to generate heart, lungs, kidneys and every thing else on a *pre-arranged schedule*.

Dr. Cabot ও Dick এর মতে—

In our body there is a *never-slumbering intelligence* which doctors try to imitate and supplement with medical and surgical work. In our fight against disease, we always have this prodigiously ingenious and *powerful force* at work on our side.

The construction of new tissues is one of the wonders of nature. In response to some *mysterious directive force*, fibre cells arrange themselves in neat geometric patterns like chemical crystals.

রহস্যময় শক্তির সন্ধানে

কিন্তু এঁরা সবাই ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন, এ রহস্যময় চেতন শক্তিকে কেউই অনুসন্ধান করেননি। যাকে কেউ অনুসন্ধান করতেই এগিয়ে এলেন না, সেই অজ্ঞাত শক্তি তেমনি অজ্ঞাত, তেমনি রহস্যাবৃতই র'য়ে গেল। কেউ তার রহস্য ভেদ করতে পারল না, তার স্বরূপ জানতে সমর্থ হ'ল না, তাকে বিশ্লেষণ করা তো অনেক দূরের কথা। এই দুর্জ্ঞেয় শক্তির অনুসন্ধান, তার প্রহেলিকা-ভেদ, তার স্বরূপ-প্রকাশ ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেন, একেবারে নিখুঁত গণিত-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে, পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম, সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীপাতালদেব। পাতালদেব-সূত্রের primary postulate হ'ল এই যে জড় বিশ্বের প্রকৃতিই এইরূপ, যে শুধুমাত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তার স্বরূপ অবগত হওয়া অসম্ভব।

এতো গেল অজ্ঞাত চেতনশক্তির কথা। এবার এই অচেতন বা বস্তু-বিশ্বের আলোচনা করা যাক। এই বস্তু-বিশ্ব-সৃষ্টি কোথা থেকে হচ্ছে? এর raw-materials কোথা থেকে আসছে? বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে একেবারে নিরুত্তর। তাঁদের মতে—বস্তুর আদি উৎস কী—এ প্রসঙ্গ বিজ্ঞানের আলোচনা-সীমার বাইরে। বিজ্ঞান শুধু দৃশ্যমান বস্তুর আলোচনাই করতে পারে, তার উৎসের নয়। কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান বস্তুকণা সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যালোচনা ক'রেও তাঁরা জানালেন যে বস্তুর চরমসত্তা অবর্ণনীয়,—এ শুধু mathematical symbols; বস্তুকে ভাষায় প্রকাশ করতে হ'লে বলা যায় এ হচ্ছে অবস্তু-সাগরে সম্ভাবনার তরঙ্গগুচ্ছ, যার location নির্ণয় করতে গেলে, তার momentum নিরূপণ করা যায় না—অথবা যার momentum নির্দ্ধারণ করতে গেলে, তার location পাওয়া যায় না। তা'হ'লে বস্তুর কি কোনো সত্তাই নেই? বস্তু-বিজ্ঞান বলে, বস্তু কী—তা' জানবার উপায় নেই। শুধু তার effect থেকে তার সত্তার অনুভূতি হয় মাত্র।

পাতালদেব ঐ একই কথা বলছেন, তবে তাঁর ভাষা বৈজ্ঞানিকদের মতো অস্পষ্ট ও হেঁয়ালিপূর্ণ নয়। তিনি বস্তু-বিশ্বকে তথা বস্তুকে অবর্ণনীয় বলছেন না, বরং বৈজ্ঞানিক-পন্থায় তার অনুসন্ধান ক'রে তার উৎস নির্ণয় করলেন, সেই উৎসের স্বরূপ বর্ণনা করলেন এবং কেমন ক'রে সেই অবস্তু-বিশ্ব থেকে বস্তু-বিশ্বের উৎপত্তি হ'ল—নির্ভুল, বিশুদ্ধ, অথচ অতি সরল গাণিতিক ভাষায় তার বর্ণনা দিলেন। পাতালদেব বললেন, সৃষ্টির মূল পরিকল্পনা সহজ, সরল ও সার্বভৌম। সৃষ্টি হচ্ছে একটি স্থির অবস্তু-ভূমি-সীমা থেকে, যাকে fixed reference frame বলা যেতে পারে। পরন্তু সৃষ্ট পদার্থ কালক্রমে জটিল হতে জটিলতর হচ্ছে এবং পৃথক পৃথক গতিশীল বস্তুপুঞ্জে পরিণতি লাভ করছে। এইসব পৃথক পৃথক বস্তুপুঞ্জ সবই গতিশীল, তাই বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি একই ভাবে সর্বত্র বর্ণনা করা যায় না। এইসব পরস্পর গতিশীল বস্তুপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি বর্ণনা করতে tensor ও relativistic mechanics-এর প্রয়োজন হচ্ছে। এদিকে জটিল পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ক্রিয়া-বিক্রিয়া বুঝতে quantum electro-dynamics-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করতে হচ্ছে। মানব-মন যেমন কর্মসূত্রে জটিলতর ও কুটিলতর হয়ে উঠছে, বিশ্বপ্রগতির ক্রমপর্য্যায়ে বস্তু-পুঞ্জ তেমনি ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতা ও অস্পষ্টতার ধূম্রজালে সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে,—matrix, tensor, spinor, probability ইত্যাদির নিত্য নতুন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গাণিতিক কুয়াশায় সত্যকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে—এবং বৈজ্ঞানিকগণ এই পথে যত অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁদের সমুখে কুয়াশা ততই নিবিড়তর হয়ে উঠে তাঁদের দিশাহারা ক'রে তুলছে। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ যে পর্য্যায়ে পৌঁছিয়েছেন—তা' এক ক্রমবর্দ্ধমান অস্পষ্টতা ও প্রহেলিকার ঘন ও গভীর কুয়াশা-স্তর। এরপর বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের প্রথায় যত অগ্রসর হবেন, এই অস্পষ্টতা ততই বাড়বে। পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণের উক্তিগুলি তারই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি।

প্রহেলিকার এই নিবিড় ধূম্রজাল ভেদ ক'রে পাতালদেবের স্বচ্ছ দৃষ্টি সত্যের স্বরূপ প্রকাশ করেছে। তিনি বলছেন, গতিশীল বস্তু-বিশ্বের কোনো স্থান থেকেই প্রকৃত সত্য নিরূপণ করা যাবে না। সৃষ্টির আদি স্থিরভূমি থেকেই সত্য নির্ণীত হবে, এবং এ সত্য-নির্দ্ধারণ অতি সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। এ সত্য নিরূপণ করতে হ'লে বস্তু-বিজ্ঞানীদের মতো একদেশদর্শী হ'লে চলবে না; অচেতন বিশ্ব যে চেতনসত্তা থেকে উদ্ভূত—এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে, চেতন সত্তাই যে সমগ্র বস্তু-সত্তাকে সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিণামে ধ্বংস করছে—এ তথ্য অবগত হ'তে হবে। এই পরস্পর গতিশীল পৃথক পৃথক বস্তুজগতে যেমন সত্য-দর্শন অসম্ভব, পৃথক পৃথক কর্মবদ্ধ পৃথক পৃথক energy-shell যুক্ত জীবের আত্মাও তেমনি অস্বচ্ছ দৃষ্টিবশত সত্য-নিরূপণে অসমর্থ—এই পারস্পরিক গতি, এই বিভিন্ন কর্মবন্ধনের

মধ্যেই অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তা, সম্ভাবনা ও অসত্যের বীজ নিহিত আছে। Fixed frame of reference, অর্থাৎ স্থিরভূমিতে এবং emancipated soul বা কর্মবন্ধন-মুক্ত আত্মায় কোনো অস্পষ্টতা নেই, নেই কোনো অজ্ঞান ও অসত্য। এইরূপ স্থিরভূমি ও মুক্ত আত্মা সম্বন্ধেই Einstein-এর উক্তি 'God does not play dice with the universe' প্রযোজ্য। কিন্তু জটিল বিশ্বের সর্ব্বত্রই এই 'সম্ভাবনা'র পাশা-খেলা চলছে—কী বস্তু-জগতে, কী জীবের সুখে দুঃখে,—এর হাত থেকে কোনো পরিত্রাণ নেই; tensor-এর invari:nce এর আদৌ কোনো সমাধান নয়, কারণ বিশাল বস্তু-বিশ্ব uniform, cosmology-র এই assumption সর্ব্বৈব ভ্রান্ত। তেমনি quantum mechanics এর বাহু যে পদার্থের সব ধর্মের সমাধানে সমর্থ নয়, Jayness-এর উক্তি 'present quantum electro-dynamics contains some clear elements of nonsense' তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি।

বস্তু-বিশ্বের উৎস

বস্তু-বিশ্বের raw-materials কী এবং কোথায় তার উৎস? পাতালদেব বললেন, এর raw-materials হচ্ছে radiation, নিছক radiation—এবং তার উৎস ঐ চেতন বিশ্বের চেতনসত্তার কতকগুলি বিশিষ্ট অংশ, যাকে বিজ্ঞান বলে charge-dipoles, এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে; ঐ charge কিন্তু আমাদের সুপরিচিত বস্তু-বিশ্বের সাধারণ electric charge নয়,—তবে কেমন সে charge? পাতালদেব বস্তু-বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়ে বললেন এ হচ্ছে চেতন charge। সকলেই বলবেন, চেতন charge! চেতন charge কাকে বলে? পাতালদেব জানালেন, চেতন charge-এর ধর্ম সাধারণ charge-এর ধর্মের মতোই, তবে এর মাত্র দু'টি গাণিতিক বৈশিষ্ট্য আছে: (১) এ charge-এর ক্ষুদ্রতম unit-এর radius imaginary, (২) oscillation-কালে, প্রয়োজন হ'লে, এ charge imaginary হ'তে পারে।

এবার দেখা যাক, উক্ত live charge-dipoles থেকে কী প্রকারে radiation সৃষ্টি হচ্ছে এবং কী প্রকারেই বা সেই radiation, যা' শুধু space-এ তরঙ্গ মাত্র, বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। এর বিস্তৃত mathematical analysis Pat‾ldev Principle গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। Dipole oscillation হ'লে তা' থেকে radiationএর সৃষ্টি হয়—এ তথ্য বস্তু-বিজ্ঞানীদের জানা আছে। কিন্তু সে-radiation damped হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। স্বাভাবিক নিজশক্তিতে এরূপ radiation বিশেষ কোনো কাজে আসে না। কিন্তু পাতালদেবের প্রদর্শিত চেতন charge এরূপ নয়। তার বিশেষ ধর্ম দু'টি equation-এ put ক'রে সবিস্ময়ে দেখা গেল—

সে-radiation আদৌ damped নয়, পরন্তু অত্যন্ত সহজ ও সরল দুটি sine-curve এর set. আরো চমকপ্রদ ব্যাপার এই যে, উক্ত সরল sine curve দু'টির একটি real এবং সেখানে time positive, অন্যটি imaginary ও time সেখানে negative. এইরূপে অত্যাশ্চর্যভাবে অথচ অতি সহজে, দেখা গেল যে দু'টি বিশ্বের অবস্থিতি সৃষ্টির আদি পরিকল্পনাতেই রয়েছে। এক বিশ্বের কাছে তাদের বিশ্বটি real, observable বা knowable এবং অপরটি imaginary, non-observable বা un-knowable.

'Radiation দ্বারা space-time-এরও সৃষ্টি হচ্ছে'—পাতালদেবের এই কথাটি শুনে প্রথমে একটু চমকে যেতে হয়। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বললেন, আদিতে চেতন সত্তা ছাড়া কোথাও কিছু ছিল না। সৃষ্টির একেবারে প্রারম্ভে চেতন সত্তার এক অংশ স্থির থাকল, আর এক অংশ স্থির অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স'রে যেতে লাগল। স্মরণ রাখতে হবে যে, চেতন charge-dipole গুলি সকলেই সচেতন এবং একটি অসীম জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট চেতন-সত্তার অংশমাত্র। সৃষ্টির প্রয়োজনেই একাংশের অপসরণে এই শূন্যের সৃষ্টি। ক্রিয়াটি চেতনসত্তার ঐচ্ছিক হ'লেও বৈজ্ঞানিক নিয়মসূত্রে গ্রথিত। একাংশের এই অপসরণে যে-শূন্যের সৃষ্টি হ'ল, তাই হ'ল space. কিন্তু পাতালদেব এর পর এক অদ্ভুত কথা শোনালেন, যা দুনিয়ায় কোনো বৈজ্ঞানিক কোনো দিন বলেন নি তা' হচ্ছে এই যে space নিছক 'শূন্য' নয়, পরন্তু এই 'শূন্য' নিম্নতম frequency-র radiation দ্বারা সম্পৃক্ত। শক্তিদ্বারা নিষিক্ত না হ'লে 'নিছক শূন্য' কোনো 'বস্তু' ধারণ করতে পারে না; এই শক্তি, তা' সে যত নিম্ন মানেরই হোক না কেন, 'শূন্য'কে 'বস্তু'-ধারণ ক্ষমতা প্রদান করে। এখন এই নিম্নতম frequency radiation আসছে কোথা থেকে? পাতালদেব বললেন, ঐ চেতন সত্তার একাংশ অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে অপস্রিয়মান চেতনভূমিতটস্থিত চেতন charge-dipoles-দের oscillation থেকে। শূন্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সে-শূন্য উপরিউক্ত নিম্নতম frequency radiation দ্বারা শক্তি-বিশিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর গাণিতিক বিশ্লেষণ Pataldev Principle গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

এইভাবে চলল চেতন ভূমিতটের অপসরণ ক্রিয়া ও শক্তি-সম্পৃক্ত শূন্য-সৃষ্টি,—কিন্তু সে কতক্ষণ? অনন্তকালের জন্য কি? পাতালদেব অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললেন, ঐ sine-curve-ই তা' দেখিয়ে দিচ্ছে। একটা বালকও তা' বুঝতে পারে। পাতালদেবের কথায় মনে হয়, চেতনসত্তাবিশিষ্ট ঐ স্রষ্টা বোধ হয় বালকের মতো সরল; অতি সহজ শিশুসুলভ স্বাভাবিক তার ক্রিয়াকলাপ; মানব-মনের কুটিলতা ও জড়পদার্থের জটিলতা নেই তাতে, নেই তার সরল প্রক্রিয়ার মধ্যে গণিত-বিশারদদের

tensor-এর tension, spinor-এর sprain বা quantum mechanics-এর complexities. Sine curve-এ এক নজরেই দেখা গেল সৃষ্টির ক্রমপ্রবাহ এবং সহজ হিসাবে পাওয়া গেল সৃষ্টি কতকাল চলবে, এবং প্রলয়ের কতকাল পরে পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হবে।

এই তো গেল sine-curve প্রদর্শিত সৃষ্টির ক্রমপ্রবাহ, সৃষ্টির period ও space-time সৃষ্টির আদি কথা। এইবার বস্তু-সৃষ্টির ব্যাপারে আসা যাক। পাতালদেব-সূত্রে radiation-matter-equivalence-তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে, অর্থাৎ সব বস্তুই radiation থেকে উদ্ভূত এবং এই radiation চেতন charge-dipoles সৃষ্ট। এখন প্রশ্ন হবে—বস্তুর raw materials স্বরূপ এই radiation-এর frequency কত ?

পাতালদেব সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট oscillatory dipoles এর ছোট্ট একটি equation solve ক'রে তার frequency বার ক'রে দেখালেন এর natural frequency হচ্ছে $4{\cdot}8 \times 10^{28}$/sec ; equationটি এত সহজ যে যে-কোনো B. Sc. ছাত্র সেটি অনায়াসে বুঝতে পারে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পাঠক Pataldev Principle গ্রন্থ আলোচনা করবেন। পাতালদেব অতি সহজে দেখিয়ে দিলেন ঐ frequency radiation-এ যে-শক্তি নিহিত আছে, বস্তু-বিজ্ঞান স্বীকৃত নিয়মেই সে-radiation বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে। এইরূপে অতি সরল ও সহজ গাণিতিক ভাষায় বস্তু-বিশ্বের বস্তু সৃষ্টির উৎসের সন্ধান দিলেন পাতালদেব। এ 'বস্তু' এখনও সৃষ্টি হয়ে চলেছে, কতদিন এ সৃষ্টি চলবে তাও তাঁর সূত্রে পাওয়া গেল।

Space-time-এর রূপ

আধুনিক বিজ্ঞান যে-space-time কে রহস্যময় বলছে, যার প্রহেলিকাময় ধাঁধার খেলাতেই বস্তুসমূহের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া হয় ব'লে বিজ্ঞান মনে করছে সেই অনন্ত রহস্যময় space-time-এর রহস্যের কোনো সমাধান আধুনিক বিজ্ঞান করতে পারে না। পাতালদেব বলছেন, এ রহস্য বস্তু-বিজ্ঞানের জ্ঞান-সীমা-বহির্ভূত 'কল্পিত', অদৃশ্য imaginary particles-এ নিহিত। শুনতে আশ্চর্য্য লাগে, কিন্তু পাতালদেব এই অতি বিস্ময়কর কথা শোনালেন তাঁর matter-radiation equivalence-তত্ত্বে,—radiation থেকে রূপান্তরিত বস্তু-কণার এক অংশের গতি আলোর গতির চেয়ে কম গতিসম্পন্ন,এ অংশ দৃশ্য real matter-রূপে বস্তু-বিশ্ব-নির্মাণ করছে ; আর এক অংশ আলোর গতির চেয়ে বেশী গতিশীল, এরা অদৃশ্য imaginary polar matter-রূপে পরিণত হয়ে space-time-এ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি আরও এক অদ্ভুত কথা শোনালেন, প্রত্যেক দৃশ্য নবসৃষ্ট real বস্তুকণার চারপাশে

অদৃশ্য imaginary ছায়া-বিদ্যুৎকণা পরিক্রম করে। বস্তু-বিশ্বের নবসৃষ্ট দৃশ্য real matter, তার উপগ্রহ অদৃশ্য imaginary ছায়া বিদ্যুৎ-কণা এবং Space-time-এর অন্তর্নিহিত অদৃশ্য imaginary matter—এ সবেরই বিবরণ দিলেন তিনি। Space time-এর যে-অভিনব, অথচ বৈজ্ঞানিকদের 'কাম্য' structure পাতালদেব সরল গাণিতিক হিসাব করে বার করলেন, বৈজ্ঞানিকরা সেইরূপই একটা কিছু চান, অথচ পান না, কোনো কালে পাবেনও না। কারণ অতি সহজ। তাঁদের সব কিছু পর্যালোচনা অ-চেতন, জড় বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চেতন সত্তা, তথা চেতন বিশ্ব ও অদৃশ্য বস্তু —তাঁদের আলোচনা-সীমার বহির্ভূত।

পাতালদেব যেভাবে বিশ্বসৃষ্টির বিশ্লেষণ করলেন তাতে বোঝা যায়, বস্তু-বিশ্বের নব সৃষ্ট কণাগুলির প্রকৃত সত্তা শুধু দৃশ্য বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রতিটি কণার স্বরূপ দৃশ্য ও অদৃশ্য দুই সত্তার এক অবিচ্ছেদ্য মিলিত সত্তা। গাণিতিক ভাষায় বলা যায় যে x, বা y যদি নিছক বস্তু-সত্তার সূচক হয়, তবে প্রত্যেকটি নবসৃষ্ট বস্তু সত্তার প্রকৃত স্বরূপ হবে $x+iy$, অর্থাৎ দৃশ্য real ও অদৃশ্য imaginary মিলিত একটি complex সত্তা। এরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত, একটিকে অপরটি থেকে কোনো ক্রমেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

কিন্তু বস্তুবিজ্ঞানী এর অদৃশ্য imaginary part সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ এবং subjective idealist দার্শনিক এর দৃশ্য real partকে স্বীকার করেন না। এঁরা প্রকৃত স্বরূপের অবিচ্ছেদ্য একাংশ বাদ দিয়ে অর্ধাংশ আলোচনা ক'রে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হন, স্বভাবতই তা' ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। বস্তুবিজ্ঞানের এই সকল সিদ্ধান্ত তাই সূক্ষ্মস্তরে 'সম্ভাবন' ও 'অনিশ্চয়তা'র আবরণে অস্পষ্ট, এবং সৃষ্টির মূল পটভূমিকে না জানার জন্য মহাকাশ-পর্যালোচনায় পরস্পর-বিরোধী 'বিশ্বরূপ'র প্রকাশনায় হেঁয়ালিময় হয়ে ওঠে। অনুরূপ অবস্থা দার্শনিকগণেরও। বস্তুবিজ্ঞানের এই একদেশদর্শী আলোচনার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ 'সম্ভাবন'বাদকে বিদ্রূপ ক'রে Einstein বলেছিলেন, 'God does not play dice with the universe'; Quantum mechanics-এর উদ্ভট সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয়ে এ যুগের বৈজ্ঞানিক Jayness তিক্ত মন্তব্য করেছেন, 'It has produced some clear elements of non-sense.' বৈজ্ঞানিক Stent স্বীকার করেছেন, 'Man will never know how the universe began, or what is the most fundamental of atomic particles.' Finkelstein পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, 'Space, time and mass are illusions.'

প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের এই 'অনিশ্চয়তা', এই হেঁয়ালি ও এই 'elements of non-sense'-এর একমাত্র কারণ তার সীমাবদ্ধ দৃষ্টি, নবসৃষ্ট পদার্থের প্রকৃত স্বরূপের

অবিভাজ্য একটি অঙ্ককে বাদ দিয়ে পর্য্যালোচনা করা। এদিকে সৃষ্টির মূল স্থিরভূমিকে না জানার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি-স্বরূপ মহাকাশ-গবেষক ও বিশ্বরূপসন্ধানী Relativity-র অসহায় ঘূর্ণিচক্রে প'ড়ে কিম্ভূত কিমাকার বিশ্বরূপসমূহের আলেয়া মূর্ত্তি দর্শন ক'রে বিহ্বল হচ্ছেন, এবং বস্তুর অস্তিত্বরূপ-গবেষক Quantum mechanics-এর গহন অরণ্যে পথ হারিয়ে দিশাহারা হয়ে আজগুবি 'nonsensical elements'-এর পরিচয় দিচ্ছেন।

দার্শনিকগণও অনুরূপভাবে অন্ধের মতো বৃথাই 'searching for non-existent black cats in dark rooms'.

কিন্তু সত্যের স্বরূপকে খণ্ডিত না ক'রে যদি নবসৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতরূপ অর্থাৎ অবিভাজ্য complex সত্তাকে নিয়ে আলোচনা করা যায়, এবং সৃষ্টির মূল স্থিরভূমিকে স্বীকার করা যায়, তবে বস্তুর অস্তিত্ব কণার স্বরূপ থেকে শুরু ক'রে সমগ্র বস্তু-বিশ্বের পরিচয় অবিশ্বাস্যরূপে সহজ, সরল ও সাবলীল হয়ে যায়। Pataldev Principle সেই সহজ সত্যের চিরভাস্বর দীপ্তিতে দীপ্তিমান্।

দুই বিশ্ব

এই হ'ল আমাদের real বস্তু-বিশ্বের কথা। কিন্তু ঐ যে imaginary বস্তু-বিশ্বের অস্তিত্ব ধরা পড়ল ঐ ছোট্ট অতি সরল sine curve-এ, ওটার কী ব্যাখ্যা দিলেন তিনি? অত্যন্ত সহজ, সরল ও দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট ভাষায় অবিশ্বাসীর চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন—এর co-efficient imaginary, এটা 'un-knowable' অন্ত বিশ্বের কাছে; আর এখানে time-এর গতি আমাদের বিশ্বের time-এর গতির বিপরীতমুখী। এখন matter বা বস্তু হচ্ছে 'রূপান্তরিত radiation' এবং radiation তার নির্দিষ্ট frequency দ্বারা প্রকাশিত হয়। কিন্তু frequency-তে time-factor ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। T তার dimension বা 'পরিচয় পত্র'। সুতরাং যদি কোনো দুটি ক্ষেত্রে time-এর গতি পরস্পর বিপরীতমুখী হয়, তবে উক্ত দুটি ক্ষেত্রের frequency-ও বিপরীতধর্মী হবে। অর্থাৎ এই উভয় স্থানের radiation-ও বিপরীত গুণাত্মক এবং radiation থেকে রূপান্তরিত matter-ও বিপরীতধর্মী হ'তে বাধ্য। সুতরাং এটা একটা বালকেরও বোধগম্য হবে যে, এক বিশ্বের matter-কে যদি আমরা positive বলি, অপর বিশ্বের matter negative, অর্থাৎ anti-matter হবে।

এইরূপে দুই বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট বস্তু-বিশ্বের অস্তিত্ব তিনি তাঁর সরল equation দ্বারা প্রমাণ করলেন, তদুপরি এই উভয় বিশ্বের প্রত্যেকটির বস্তুপুঞ্জের বর্তমান পরিমাণ ও দুই বিশ্বের বর্তমান density নির্দ্ধারণ করলেন। বহু-বিজ্ঞানীগণ tensor calculus-এর অনেক tension-এ মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত ক'রে এক একজন বিশ্বের বস্তুর

পরিমাণ ও তার density-র এক একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। যদিও সেগুলি সবই অসম্পূর্ণ দৃষ্টিপ্রসূত, তথাপি সেইসব ভিন্ন ভিন্ন result-এর average value পাতালদেবসূত্রের অতিসরল প্রণালীতে প্রাপ্ত ফলের সহিত মিলে যায়। অধিকন্তু পাতালদেবসূত্রের সরল গণিত, সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত বস্তুর পরিমাণ, ও space-time-এ বস্তু-densityর হিসাব দেয়। বিস্তৃত ব্যাখ্যা Pataldev Principle গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

নিখিল বিশ্বের প্রতিটি কণার আবর্তন

বস্তু-বিশ্বের প্রতিটি কণার rotation হয় কেন? বৈজ্ঞানিকেরা আগে এটা জানতেন না। তারপর অনেক ঘা খেয়ে ও অনেক টাল সামলে ক্রমে ক্রমে এটা তাঁদের জ্ঞান-গোচর হ'ল। Rotation হচ্ছে sub-atomic particlesদের, nucleus-এর, electron-এর; rotation হচ্ছে গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রের; rotation-রত প্রত্যেক galaxy এবং clusters of galaxies-ও; এখন বৈজ্ঞানিকেরা ভাবছেন universe-এরও rotation আছে কিনা। এইরূপই তাঁদের দৃষ্টির মালিন্য, তাঁদের জ্ঞানের দৈন্য। পাতালদেব শুধু স্মিতহাস্যে একটি সহজ কথা জানালেন, বস্তু-বিশ্ব, তথা space-time, radiation-প্রসূত; radiation angular momentum বহন করে, radiation-equation তার সাক্ষ্য দিচ্ছে (Pataldev Principle দ্রষ্টব্য); সুতরাং radiation-রূপান্তরিত বস্তুমাত্রেই radiation-এর এই অন্তর্নিহিত ধর্ম rotation থাকবেই। Space-time ও radiation দ্বারা energised, সুতরাং spaceএরও rotation থাকবে।

সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট radiation-এ নিহিত একটি photon-এর energy বিশ্লেষণ ক'রে অতি সহজেই দেখা যায়, উক্ত photon যে-পরিমাণ angular momentum বহন করে, তা'তে এক জোড়া proton-antiproton-এর spin-সৃষ্টি সম্ভব। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে angular momentum এর এই পরিমাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় উদ্ভাবিত অন্তিম বস্তু-কণা বা nucleon-দের Pauli-spin এর সমান।

অপস্রিয়মান বিশ্ব

মহাকাশ পর্যবেক্ষকগণ বলেন মহাকাশে Galaxy-cluster সমূহ পরস্পর পরস্পর থেকে দূর দূরান্তরে অপসারিত হচ্ছে। এর কারণ প্রসঙ্গে বস্তুবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহু জটিল গণিত বিজ্ঞান আলোচনা ক'রে যেসব কথা শুনালেন, তা' সবই পরস্পর বিরোধী। কিন্তু পাতালদেব এর যে ব্যাখ্যা দিলেন তা' একেবারে অভিনব। তিনি বস্তুর electro-magnetic mass-এর যে-ধর্ম জানালেন, তাতে এরা উপযুক্ত দূরত্বে

এদের পরস্পর পরস্পরের বিকর্ষণ অনুভব করবে। সেই ধর্ম অনুসারে অতিসহজ নিয়ম মেনে উপযুক্ত দূরত্বে অবস্থিত Galaxy clusters-গুলি অপসারিত হ'তে পারে।

সর্ব্বব্যাপী চেতন শক্তি

এই জড়বিশ্বের সর্ব্বত্র পৃথকভাবে চেতনসত্তার পাশাপাশি অস্তিত্ব কীরূপে থাকতে পারে? পাতালদেব সূত্র যুক্তি দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে এই বিস্ময়কর অবস্থিতির সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। তাঁর সূত্র দেখিয়ে দেয়, এই বিশ্বের সর্ব্বত্র চেতনসত্তা পরিব্যাপ্ত রয়েছে। কিন্তু কী তার স্বরূপ? পাতালদেব দেখালেন, এ-স্বরূপ radiation. স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, এও যদি radiation হয়, তবে পূর্ব্বকথিত radiation এর সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? এ radiation-ও তো পূর্ব্বের radiation-এর সঙ্গে মিশে গিয়ে তারই মতো 'বস্তু'তে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে; সুতরাং radiation-রূপে সর্ব্বত্র তার অস্তিত্ব কীরূপে প্রমাণ বা স্বীকার করা যায়? পাতালদেব শোনালেন, এ-radiation পূর্ব্বোক্ত radiation নয়, এর সঙ্গে ওর পার্থক্য আছে। প্রশ্ন হবে, সে-পার্থক্য কোথায় ও কী প্রকার? পাতালদেব দেখালেন, পার্থক্যটা উৎসের স্বরূপে নয়, পরন্তু উৎসের oscillation-সময়ে। এরাও সেই চেতন charge-dipole, কিন্তু oscillation কালে এদের charge real থাকে, অথচ পূর্ব্বোক্ত charge-dipole set-এর charge oscillation-সময়ে imaginary হয়ে যায়। ফলে এর থেকে উদ্ভূত radiation-এ এক বিপ্লবাত্মক পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন জাগবে, কেমন সে পার্থক্য? পাতালদেব বোঝালেন, জড়বিজ্ঞানে dipole oscillation হ'লে যে-radiation বিকিরিত হয়, তাতে উক্ত dipole-এর loss of energy হয়, এবং এটাই স্বাভাবিক; কারণ ঐ loss of energy-ই radiation-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়ে এক অপূর্ব কথা শোনালেন পাতালদেব—চেতন charge-dipole-এর দ্বিতীয় set-এ, যেখানে oscillation-কালে charge real থেকে যায়, সেখানে dipole-দের gain of energy হয় এবং এদের এই gain of energy-ই হচ্ছে এই অদ্ভুত radiation! পাতালদেব বললেন, এ-radiation জড়বিজ্ঞান পরিচিত সাধারণ radiation-এর সকল ধর্ম পালন করে না, কোনো কোনোটির ব্যতিক্রম হয়। সাধারণ radiation-এর মতো এ-radiation কখনও 'বস্তু'তে রূপান্তরিত হয় না, এর 'তরঙ্গ'রূপ অপরিবর্ত্তিত থাকে, এ-radiation সর্ব অবস্থাতে radiation-ই থাকে, এ হচ্ছে 'নিত্য' radiation, যাকে বলা যায় transcendental radiation বা চেতন বিকিরণ। এ radiation-এর চেতনা আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আছে। অচেতন বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে এই চেতন radiation

সর্ব্বসময়ে সর্ব্বভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। পাতালদেব আরও দেখিয়ে দিলেন, এ radiation-এর mean value সব সময়েই সমান থাকে।

প্রশ্ন জাগে, এ radiation কী ক'রে সর্ব্বস্থানে একই অপরিবর্ত্তিত শক্তি বা তীব্রতা সহ পরিব্যাপ্ত থাকতে পারে? পাতালদেব এর উত্তরে আবার একটি অপূর্ব্ব কথা শোনালেন: এই চেতন রহস্যময় শক্তিকে কোথাও কোনো 'স্থানে' আমরা ধরতে ছুঁতে পারি না, অথচ এর অমোঘ 'প্রভাব' আমরা সর্ব্বত্র সমভাবে ও সর্ব্বকালে উপলব্ধি করি। Pataldev Principle অনুযায়ী, অবস্তু-সত্তার ধর্মগুলি Quantum mechanics-এর যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং এই Quantum mechanics -এর ভাষা ব্যবহার ক'রে তিনি বললেন, এই শক্তির 'momentum' আমরা নির্ভুলভাবে অনুভব করি (যদিও ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রদ্বারা তার পরিমাপ করতে পারি না, কারণ তা' অতীন্দ্রিয়), কিন্তু কোথাও একে 'localise' করতে পারি না, এর co-ordinates বার করতে পারি না; অর্থাৎ এর momentum-এর পরিমাপে, বা এর 'প্রভাবের' নির্দ্ধারণে 'অনিশ্চয়তা'র পরিমাণ 'শূন্য', সুতরাং বস্তু-বিজ্ঞানের uncertainty principle অনুযায়ী "its probability-distribution over *space* must be *uniform*", অর্থাৎ বস্তু-বিশ্বে এ সর্ব্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত হতে বাধ্য।

পাতালদেবসূত্র অনুসারে দেখা গেল, বস্তু তথা বস্তু-বিশ্বের উৎস একপ্রকার radiation; সেই radiation বিকিরিত হয় এক প্রকার চেতন charge dipoles দের oscillation থেকে এবং সেই charge oscillation-কালে imaginary রূপ ধারণ করে। এও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, চেতন সত্তার কোনো অংশের ক্ষয় হয়ে সেই ক্ষয়প্রাপ্ত সত্তা বস্তু-সত্তায় পরিণত হয় না, পরন্তু উক্ত imaginary চেতনসত্তা বা charge-এর vibration প্রসূত radiation-ই বস্তু-সত্তায় রূপান্তরিত হয়। এতে সেই চেতন সত্তার কোনো অংশের বিচ্যুতি ঘটে না, পরন্তু তার loss of energy হয়। সুতরাং imaginary চেতন charge-এর oscillation জনিত energy-loss-ই এই বস্তু-বিশ্ব। বস্তু-বিশ্বের বস্তু-সত্তায় চেতন বস্তুর কোনো অংশ নেই, এবং এই জড় বিশ্ব যদিও চেতন charge-এর energy থেকে উদ্ভূত, তথাপি মনে রাখতে হবে এই charge real নয়, পরন্তু imaginary। অর্থাৎ এই বস্তু-বিশ্ব বিরাট চেতন মানসের 'স্বপ্ন'-প্রসূত।

এদিকে দ্বিতীয় যে-চেতন charge-dipole set এর charge oscillation-সময়ে real থাকে, সেই radiation যে এক অদ্ভুত ধর্মবিশিষ্ট, তা' পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এই radiation দ্বারা উক্ত oscillating charge-dipoles দের energy বৃদ্ধি হয়, এবং এই আশ্চর্য্য radiation কখনও বস্তু-সত্তায় রূপান্তরিত হয় না।

এর radiation রূপ অপরিবর্তনীয়, এই নিত্য radiation চেতনাশক্তি-বিশিষ্ট। এ শক্তি প্রত্যেক বস্তুকণার সৃজন, গঠন, ও ধ্বংস-ক্রিয়া কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বৈজ্ঞানিকদের সেই 'creator and governor of the realm of matter', —Jeans, সেই 'intangible reality'—Planck, সেই 'immensity of the unexplored'-Gardner, সেই 'mysticism', সেই 'illusion', সেই 'missing link'কে রূপদান ক'রে প্রকাশ করলেন সরল গণিতের ভাষায় পাত্তালদেব। Planck -এর 'intangible reality' পাত্তালদেবের 'transcendental radiation' রূপে বস্তু-বিশ্বে সতত সর্বত্র সমদীপ্তিতে বিদ্যমান। পাত্তালদেব ছোট্ট একটু গুণভাগদ্বারা এই radiation-এর velocity ও energy নির্দ্ধারণ করলেন। জড়বিজ্ঞান-স্বীকৃত নিয়মেই দেখালেন, বস্তু-বিশ্ব এই radiation absorb করতে পারে না, পরন্তু তা' বস্তুকণার external surface থেকে reflected ও scattered হয়ে যায়। এই reflection বা scattering-প্রথায় সেই বস্তুকণার অভ্যন্তরে source of radiation-এর virtual image সৃষ্টি হয়। স্বভাবত প্রশ্ন জাগবে, এই image কি দর্শনযোগ্য? পাত্তালদেব উদাত্তকণ্ঠে বললেন, হাঁ, অবশ্যই দর্শনযোগ্য। একমাত্র সেই চক্ষু এই image দেখতে পাবে, যে-চক্ষু এই radiation-sensitive, অন্য চক্ষু নয়। এই radiation সতত সর্বত্র বিরাজিত থেকেও, সাধারণ ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়, একমাত্র trained eyes-ই তাকে দেখতে পাবে, ঠিক যেমন radio, television waves সর্বত্র বর্তমান থেকেও মাত্র radio receiver ও television receiver-এর শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য।

চেতন আত্মা

এবার এই অচেতন বিশ্বে যে-চেতনশক্তি সর্বজনবেদ্য, সেই 'আত্মা'র প্রসঙ্গে আসা যাক। আত্মা একটি শক্তির প্রকাশ এবং এ-শক্তি চেতন। কিন্তু এ-শক্তি কোন্ শ্রেণীভুক্ত? বিজ্ঞান বলে শক্তি চার প্রকার: (১) gravitational, (২) electro-magnetic, (৩) weak electro-magnetic, (৪) nuclear. জীবিত দেহ ও মৃত দেহের gravitational mass-এ কোনো পার্থক্য নেই, সুতরাং আত্মার কোনো gravitational mass না থাকাতে এই energy-source gravitational হ'তে পারে না; nuclear energy-র পরিধি nucleus এর মধ্যে সীমাবদ্ধ, সুতরাং এ nuclear energy-ও নয়। অতএব এ-energy electro-magnetic এবং তা' হ'তে হ'লে আত্মার স্বরূপ হবে গতিশীল electric charge। কিন্তু এ charge সাধারণ electric charge নয়, কারণ মৃতদেহে সাধারণ electric

charge সঞ্চার ক'রে তাকে পুনর্জীবিত করা যায় না। এই অসাধারণ chargeকে চেতন charge বলা যায়। কিন্তু এই চেতন charge এর ধর্ম কীপ্রকার? পাতালদেব জানালেন, এর ধর্ম সাধারণ charge এর মতোই, মাত্র দু'টি গাণিতিক বৈশিষ্ট্য আছে এর, যার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যসহ চেতন charge এর rotational ও translational গতির equation থেকে এর energyর যে expression পাওয়া যায়, তার একটি অংশ non-electromagnetic অর্থাৎ gravitational. আত্মার charge-এর 'পাতালদেব বৈশিষ্ট্য' প্রয়োগ ক'রে এক আশ্চর্য্য জিনিষ দেখা গেল যে ঐ energy imaginary. যতক্ষণ আত্মার গতি আছে, অর্থাৎ দেহীর জীবনকালে, এ-energy অবিরাম সঞ্চিত হয়ে চলেছে, কিন্তু তা' imaginary-রূপেই থেকে যাচ্ছে, যার অর্থ এই যে দেহীর জীবিত অবস্থায় এর কোনো real manifestation বা বাহ্যপ্রকাশ সম্ভব নয়। দোলনকালে pendulum যেমন তার গতিবশত ঊর্দ্ধে স্থানান্তরিত হয়ে potential energy সঞ্চয় করে, এও কতকটা সেইরূপ। ঊর্দ্ধগতি বিরত হয়ে নিম্নগতি সুরু হ'লে সেই potential energy যেমন পুনরায় নিম্নগতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, জীবের জীবনও সেইরূপ।

এতক্ষণ গতিশীল চেতন charge-এর কথা হল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, আত্মার গতি rotational ও translational—এর প্রকৃত অর্থ কী? পাতালদেব এর একটি অপূর্ব্ব অর্থ দিলেন। তিনি জানালেন, আত্মার rotational গতির অর্থ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি তার অভিনিবেশ, এরা inversely vary করে; অর্থাৎ কোনো ভোগ্য বিষয় আত্মাকে যত বেশী আকৃষ্ট করবে, আত্মার rotational velocity তত কম হবে। Translational গতি দেহের গতি। এইরূপে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আত্মার গতির পরিমাণ অনুযায়ী তার potential energy সৃষ্ট ও সঞ্চিত হয়ে চলেছে এবং charge-এর পাতালদেব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে-energy সারাজীবন imaginary বা অপ্রকাশ্য থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এই potential energy-র kinetic energy রূপে রূপান্তর ও আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বসঞ্চিত P. E. নিঃশেষ হয়ে গেলে গতির পুনরাবর্ত্তন হবে এবং যে-energy জীবনভোর imaginary P. E. রূপে সঞ্চিত হচ্ছিল তা' নতুন গতি বা পরিক্রমণের প্রারম্ভ থেকে K. E. রূপে ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করতে থাকবে। Pendulum-দোলনের সঙ্গে এই জীবনাবর্ত্তন-চক্র তুলনীয়। এইরূপভাবে গতিশীল chargeএর পরিক্রমণ ও পুনঃপরিক্রমণ অবিরাম চলতে থাকবে। এরই নাম জন্ম-মৃত্যু ও পুনর্জন্ম চক্র।

জন্ম হ'লে মৃত্যু হবেই, কিন্তু মৃত্যুর পরও কি পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী? এর উত্তরে

অনেকে অনেক কথা বলেন। কিন্তু পাতালদেব ঐ energy-expression-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বললেন, এই ছোট্ট termটি এর নির্ভুল ও নিখুঁত উত্তর দিচ্ছে। তিনি দেখিয়ে দিলেন, আত্মার rotational গতি যদি চরম অবস্থায় উপনীত হয়, অর্থাৎ এর গতি আলোর গতির সমান হয়, যার অর্থ হ'ল এই যে ভোগ্য বিষয় সম্বন্ধে আত্মার বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ না থাকে, তা'হ'লে ঐ energy-termটি শূন্য হয়ে যায়। সুতরাং এরূপ জীবনে কোনো energy সঞ্চিত হয় না এবং সেই জীবন-গতির পুনরাবর্ত্তন সম্ভব নয়, অর্থাৎ আত্মার আর পুনর্জন্ম হ'তে পারে না। এরই নাম আত্মার বন্ধন-মুক্ত, ভব-চক্রের অবসান।

আত্মা একটি গতিশীল চেতন charge। এর গতির জন্য এর energy-র যে expression পাওয়া যায় তা' চার ভাগে বিভক্ত: (১) magnetic K. E.— জীবন-প্রবাহ-জনিত চৌম্বক শক্তি, (২) আত্মার অন্তর্নিহিত electric P. E. (৩) নিয়ত সঞ্চয়নরত imaginary gravitational P. E. ও (৪) constant বা প্রারব্ধ, যা' আত্মার কোনো চেষ্টা ব্যতীতও আপনিই প্রকাশ পাবে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, আত্মা তো electric charge, তথাপি তার ৩নং gravitational energyটি হ'ল কেন? পাতালদেব এর একটি চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি জানালেন, আত্মার গতি যত শ্লথ হবে, অর্থাৎ ভোগ্যবিষয় সমূহে আত্মার অভিনিবেশ যত বেশী হবে, ততই আত্মার চারপাশে non-electro-magnetic বা gravitational energy-shells রূপ শ্যাওলা জমবে। পৃথিবীর ভোগ্য বিষয়সমূহে যার কোনই আকর্ষণ নেই, সেরূপ সিদ্ধপ্রায় সাধকের আত্মার গতিবেগ আলোর গতির কাছাকাছি হওয়ায়, এই gravitational energy-র শ্যাওলা জমবে না। তিনি দেখিয়ে দিলেন, সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবের আত্মিক chargeএর চারপাশে মায়িক বা gravitational energy-shellএর শ্যাওলা থাকবেই। এই energy shell-ই বিশুদ্ধ আত্মার e.m. massএর উপর চাপানো ভৌতিক বা ভেজাল আত্মার বোঝা, যাকে বলে mechanical, gravitational বা inertial mass। ঐ বোঝা কিন্তু সর্ব্বদাই energy-shellরূপে অবস্থিত, মানুষের জীবিতাবস্থায় তার প্রভাব লক্ষিত হবে না, কারণ জীবিতকালে তা' imaginary. যাদের ভোগ্য বিষয়ে অভিনিবেশ খুব কম, সেরূপ সাধকদের energy-expression-এর ২, ৩, ৪নং অংশগুলি দুর্ব্বল, কিন্তু ১নং অংশ খুব প্রবল। তাঁদের জীবন-প্রবাহ-জনিত চৌম্বক শক্তি অতিশয় শক্তিশালী এবং gravitational shell ক্ষীণ হওয়ায় mechanical mass অতি নগণ্য। সুতরাং inertia-জাত মায়ার প্রভাবও অতিশয় ক্ষীণ, অর্থাৎ মায়ার এই inertia-জ পরতন্ত্রতা বা অসহায় অবস্থা থেকে তাঁরা একপ্রকার মুক্ত। তাঁরা আত্মার স্বাতন্ত্র্যধর্ম সুষ্ঠুরূপে প্রয়োগ করতে

সমর্থ হন এবং কতকটা স্বেচ্ছায় 'life-events' অর্থাৎ জীবন-ঘটনা-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাঁদের ঐ ১নং চৌম্বক শক্তির সাহায্যে।

শরীরের গতি দু' প্রকার: Involuntary ও voluntary। 'Biological-need'-এর জন্য শরীরের অভ্যন্তরে ও বাইরে যেসব involuntary action হয়, সে সবই brain-cells-স্থিত trans-radiationএর virtual imageএর নির্দেশে brain কর্তৃক nerves ও muscles সাহায্যে পরিচালিত হয়। সুতরাং দেহের involuntary action-এর সহিত আত্মার গতির কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে না। পরন্তু শরীরের voluntary সব action-ই আত্মার ইচ্ছায় হয়। আত্মার ইচ্ছার সূত্র দু' প্রকার: কোনো ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে অভিনিবেশ, অথবা পরার্থে কোনো চেষ্টা। এ দু'প্রকার ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্য brain cells-এ অবস্থিত মন nerves ও musclesএর সাহায্য নেয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এই গতি প্রকৃতপক্ষে আত্মার rotational গতি, অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের প্রতি মনোযোগ। সমগ্র দেহের গতি আত্মার translational গতির প্রকাশ।

কোনো ব্যক্তি কায়িক বা বাচনিক চেষ্টা ব্যতীত শুধু তার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অপর কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর মানসিক ক্রিয়ার উপর কি কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে? এর উত্তরে অনেকে অনেক পরস্পরবিরোধী উক্তি করবেন,—সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তো বটেই, এমনকি অনেক চিন্তাশীল মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ পর্যন্ত। সেই সকল পরস্পরবিরোধী অসংখ্য মতবাদের নিরসন ক'রে পাতালদেব আত্মার গতিজনিত equationএর external force ও external coupleএর expression দুটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে নির্ভুল দ্ব্যর্থহীন গাণিতিক ভাষায় বললেন, যদি কোনো বাইরের আত্মা অপর কোনো আত্মার উপর তার শক্তির প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তবে উক্ত বাইরের আত্মার magnetic field-strength ও rotational velocity খুব বেশী হ'তে হবে: অর্থাৎ সেরূপ বহিরাত্মার আত্মিক charge-strength খুব বৃহৎ হওয়া প্রয়োজন, এবং ভোগ্য বিষয়সমূহে তার আসক্তি নগণ্য হওয়া দরকার। আরও সেই ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির খুব নিকটে থাকতে হবে। পরন্তু উক্ত শক্তি আলোর গতি 'c' দ্বারা বিভাজিত হওয়ায় সে-প্রভাব অতি নগণ্য।

বিশ্বসৃষ্টির কারণ

এবার এই জড় বিশ্বসৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যাক। এই বিশাল বস্তু-বিশ্ব, যা' আমরা আমাদের চারদিকে দেখছি, যার বিশালতা সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদ্‌রা নিত্য নতুন তথ্য আমাদের জানাচ্ছেন, সেই বিরাট বিশ্বসৃষ্টির কী কারণ, তা' কি কেউ ভেবে

দেখেছেন? বিজ্ঞানীরা এর সৃষ্টির কারণ চিন্তা করা তো অনেক দূরের কথা, এর বিস্তার বা ব্যাপকতা কত দূর, বিশ্ব সসীম না অসীম, তাই ভেবে কিছু ঠিক করতে পারেন নি। এই বিশ্বের মূল উৎস কোথায়, এ প্রশ্নও যেমন বিজ্ঞানীদের আলোচনা-সীমার বহির্ভূত, —তেমনি এই বিশ্বসৃষ্টির কারণ কী এ প্রশ্ন তো তাঁদের কাছে একেবারেই অবান্তর। দার্শনিকেরা এ বিষয়ে কেউ কেউ কিছু কিছু বলেন বটে, তবে সে সকল উক্তি অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী। একমাত্র পাতালদেবই সুস্পষ্ট ও নির্ভুল গাণিতিক ভাষায় গতিশীল আত্মার equation-এর energy-expression-এর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন, আত্মার ঐ (৩) নম্বর gravitational energy-ই বিশ্ব সৃষ্টির কারণ। সারাজীবন ধ'রে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ঐ যে gravitational energy সঞ্চিত হয়ে চলেছে, জীবিতকালে যে-energy imaginary থেকে যায়, তাকে মুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতেই হবে; এবং এটা একমাত্র সম্ভব যখন আত্মার গতি পুনরাবর্ত্তিত হবে, অর্থাৎ আত্মার আর একটি নতুন জন্ম হবে। এর জন্য চাই আত্মার আর একটি নতুন দেহধারণ এবং এমন পরিবেশ যা' তাকে ঐ সঞ্চিত gravitational energy-র বহিঃপ্রকাশের অনুকূল ভোগ্য বিষয়সমূহ ও সেইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রদান করবে। তার জন্য প্রয়োজন হবে—রূপে-রসে-গন্ধে-শব্দে-স্পর্শে ভরা ভোগ্যা বসুন্ধরা। সুতরাং আত্মা তার যে-slow motion, অর্থাৎ বিষয়ে অভিনিবেশ বশত যে-কর্ম-প্রচেষ্টা দ্বারা ভোগ্য বিষয় সমূহ আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চায়, সেই প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ এই বিশ্বের সৃষ্টি।

প্রশ্ন হ'তে পারে, আত্মার বাসনা-পূরণের জন্য প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বাসনা পূর্ণ হয়ে যায় না কেন? পাতালদেবের ব্যাখ্যা এর অতি সহজ ও সরল উত্তর দেয়। তার কারণ ঐ প্রচেষ্টা-প্রসূত energy জীবিতকালে imaginary থাকতে বাধ্য, জীবনের পুনরাবর্ত্তন ব্যতীত এর আত্মপ্রকাশ অসম্ভব। পাতালদেব জানালেন, এর আরও একটি ব্যাখ্যা আছে। বিজ্ঞানে যাকে বলা হয় 'retarded potential'—অর্থাৎ আত্মার বর্ত্তমান অবস্থা বর্ত্তমানে দৃষ্ট ফলাফল প্রদান করে না, পরন্তু আত্মার পূর্ব্বেকার অবস্থাই আত্মার বর্ত্তমান ফলাফল বা সুখদুঃখের জন্য দায়ী।

জীবের দুঃখ কেন

জীবমাত্রেরই দুঃখ আছে, এটা আমরা সবাই উপলব্ধি করি। কিন্তু কেন সে দুঃখ? পাতালদেব দ্ব্যর্থহীন গাণিতিক ভাষায় বললেন, তার একমাত্র কারণ ঐ সঞ্চিত gravitational energy, ঐ ভূতের বোঝা। গত জন্মের জমানো বোঝা এ জন্মে তো ক্রমে ক্রমে নামবেই। সুতরাং আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে—এ জন্মে যেন

আর নতুন বোঝা বৃদ্ধি না করি। তা' যদি করতে পারি, তা' হ'লে বোঝা বইতে আর জন্মও হবে না, এবং সেই সঙ্গে সব দুঃখেরও নিবৃত্তি হবে। কেউ যদি প্রশ্ন করে, সারা জীবনভোরই যদি ভালো কাজ করা যায়, তবে তো পরজন্মে ভালো ফলই পাওয়া যাবে, দুঃখ হবে না। পাত্তালদেব বললেন, কথাটা ঠিক। কিন্তু ঐ ভালো ফলের মধ্যেই প্রলোভনভরা 'মায়া'র ফাঁদ পাতা থাকবে, যে কোনো মুহূর্তে সেই ফাঁদে প'ড়ে 'মন্দ' কাজ করা অসম্ভব নয়। সুতরাং এই মায়ার মিথ্যা মরীচিকায় যাতে আর বিভ্রান্ত হ'তে না হয়, সেইদিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

মায়া

প্রশ্ন হ'তে পারে, 'মায়া' বলতে ঠিক কী বোঝায়? নানা ধর্মগ্রন্থে 'মায়া'-সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু তাতে এ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা হয় না। পাত্তালদেবের ভাষা কিন্তু আদৌ অস্পষ্ট নয়। গণিত চিরদিনই সুস্পষ্ট, সঠিক ও নির্ভুল; সেই গণিতের ভাষাতেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন মায়া কী! মায়া হচ্ছে চেতন imaginary charge-এর oscillation-প্রসূত radiation; এ-radiationএর উৎসের oscillation সম্বন্ধে 'সত্য' সত্তা নেই; এ উৎস এক জীবিত সত্তার অংশ, কিন্তু কম্পনকালে 'কল্পিত' চেতন সত্তা, অর্থাৎ 'সত্য' প্রাণবিহীন। যার দ্বারা এই উৎস 'কল্পিত' হচ্ছে, সেই 'কর্তা' অবশ্যই সব কিছু করবার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু এ-radiation নিজে কিছু করতে অক্ষম, কারণ এর উৎস 'সত্য' প্রাণবিহীন, সুতরাং এ-radiationও নির্জীব, জড়। সেই 'কর্তা' নিজ চেতনশক্তি প্রভাবে এই অচেতন, জড় radiation এর সাহায্যে কাজ করেন। এই জড় radiation এর এক অংশ materialised real matter ও anti-matter সহ দুই বিশ্বের বস্তুতে পরিণত হয়, আর অন্য অংশ অদৃশ্য polar imaginary moleculesএ ভরা energised space-time। এই space-time তার অদৃশ্য imaginary polar moleculesএর complex polarisation-প্রথায় জীবের বাসনা অনুযায়ী প্রত্যেক জীবকে তার ভোগ্য রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অনুভূতি যোগায়। প্রকৃতপক্ষে matter এর কোনো চরম 'সত্য' সত্তা নেই, স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই matter এর 'কল্পিত' সত্তা। এদের প্রকৃত সত্তাকে আচ্ছাদন করে space time এর polarised structure.

তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে জড় জগতের জড়বস্তু মাত্রেই ভ্রান্তিমূলক এবং space-time এই ভ্রান্তি উৎপাদনে প্রধান সহায়ক। প্রকৃতপক্ষে এ সবই সেই চেতন মনের 'স্বপ্ন'-বিলাস মাত্র। কিন্তু মানুষ যদি বিচার দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়, তথাপি এই ভ্রান্তি ও তজ্জনিত মোহ থেকে মুক্ত হ'তে পারে না কেন? কেন মানুষ জেনে শুনেও ভুল করে? কেন এই মিথ্যা মরীচিকার মোহ ত্যাগ করতে পারে না? এই মিথ্যা মোহ বা মায়া কোথা থেকে এত শক্তি পেল, মানুষ তার সর্বশক্তি

নিয়েও যে-শক্তির কাছে একেবারে অসহায়? এর যথার্থ উত্তর জানতে হ'লে পাতালদেব-সূত্রেরই আশ্রয় নিতে হবে। এ-সূত্র অনুসারে, কোনো জড়বিষয় ভোগের জন্য ইচ্ছা হ'লে, জীবের মন সেই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়; সেই অভিনিবেশের ফলে আত্মার velocity slow হয়ে যায় এবং তার চারদিকে gravitational shell-সৃষ্টি হয়। এই shell-সৃষ্টির পর জীব ইচ্ছা করলেও উক্ত বিষয়ের প্রতি তার লালসা আর দমন করতে সমর্থ হয় না, কারণ ঐ shell gravitational এবং সেই shell gravitational ধর্ম অনুযায়ী কাজ ক'রে যাবে। আত্মার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় উক্ত gravitational বস্তুর ধর্ম বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হবে না। আত্মা এখানে অসহায় এবং নীরব ভোক্তামাত্র। আত্মা নিজ ইচ্ছায় কোনো বিষয়ের প্রতি তার মনোযোগ হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে, এবং সেই velocityর প্রভাবে তার energy-shell কম বেশী হ'তে পারে, কিন্তু ঐ gravitational shell একবার গঠিত হয়ে গেলে. তার ক্রিয়ার উপর আত্মার আর কোনো প্রভাব থাকতে পারে না। মনের অভিনিবেশবশত energy-shell গঠিত হয়ে বিশেষ বিশেষ বস্তুতে আত্মার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ হয়। পরে জীব ইচ্ছা করলেও তার এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণের অন্যথা করতে পারে না, কারণ আকর্ষণ বা বিকর্ষণ gravitational shell এর ধর্মবশতই সংঘটিত হয়ে থাকে। জড়ধর্মবিশিষ্ট energy-shell এর এই inertia-ধর্ম বা 'জড়তা'র কোনো সময়েই কোনো পরিবর্তন হয় না, সুতরাং বিষয়-বিশেষের প্রতি জীবের আকর্ষণ বা বিকর্ষণেরও কোনোই রদবদল হয় না কোনো কালে। বিচার দ্বারা তার অন্যথা করবার চেষ্টা করলেও energy-shell এর এই 'জড়তা'র জন্য মনের এই 'স্ব-ভাব'নিষ্ঠা'র কোনো সময়েই বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না, এবং এর একমাত্র কারণই হ'ল এই যে জড় shell জড়ের inertia ধর্ম পালন করবেই। মনের এই স্ব-ভাব-নিষ্ঠার 'অপরিবর্তনীয়তা' ও জীবের ইচ্ছাসত্ত্বেও তার এই 'অসহায়তা'কেই ধর্মগ্রন্থে 'দুরত্যয়া মায়া' বলা হয়েছে।

মায়া-মুক্তির উপায়

পাতালদেব-প্রদর্শিত মায়ার অপরূপ স্বরূপ জানা গেল। কিন্তু এই দুরত্যয়া মায়ার প্রভাব থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায়? পাতালদেব-সূত্র অনুসারে অবগত হওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীবের স্ব-ভাবের অপরিবর্তনীয়তার জন্য তার ইচ্ছাসত্ত্বেও সে তার ভোগ্য বিষয়ে আকর্ষণ রোধ করতে পারে না। এর জন্য চাই কোনো বহিঃশক্তির সাহায্য। একমাত্র কোনো শক্তিশালী মহাপুরুষই এরূপ সহায়তা করতে পারেন। সেই মহাপুরুষকে অবিরত এইরূপ শক্তিসঞ্চার করতে হবে এবং সাধককেও তাঁর নির্দেশে অবিরাম কাজ ক'রে যেতে হবে। কারণ প্রত্যেক জীবেরই ভোগ্যবিষয় সমূহের

প্রতি যে-চিরন্তন আকর্ষণ রয়েছে, এই ভোগ্য জগতে অবস্থান করলে তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মহাপুরুষের বহিঃশক্তি কিছুটা acceleration যোগালেও, মায়ার বিপরীতমুখী আকর্ষণ সর্বদাই কাজ ক'রে সেই accelerationকে decelerate করবেই। মায়ার দুর্বার গতির বিরুদ্ধে মহাপুরুষের বহিঃশক্তি যেমন সুদক্ষ কাণ্ডারীর কাজ করবে, তেমনি সাধকের অবিরাম কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা নিরলসভাবে এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড় টানতে হবে। সাধকের এই যে অবিরাম কর্মপ্রচেষ্টা, এরই নাম ধর্মাচরণ।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এই ধর্মাচরণের নামে যুগ যুগ ধ'রে ভারতের তথা পৃথিবীর বুকে যে অকথ্য অত্যাচার, সীমাহীন শোষণ ও দুর্বলের প্রতি প্রবলের অবর্ণনীয় নিপীড়ন চ'লে এসেছে, তার কলঙ্ককালিমাময় ইতিহাস সাধারণ মানুষের মনে ধর্ম সম্বন্ধে এক ভয়াবহ আতঙ্কের চিত্রই পরিস্ফুট করেছে। যুগে যুগে তাই ধর্ম নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে যুগাবতার বুদ্ধদেব, মহাবীর ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নেতৃত্বে। ধর্মনীতি ব'লে কথিত কতকগুলি গ্রন্থে লিখিত নিয়ম জোর জবরদস্তি ক'রে নির্মমভাবে জনসাধারণকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু এই ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্র, এই স্বেচ্ছাচারিতা, এই 'ফ্যাসিজ্‌ম্' কেন মেনে নেবে জনসাধারণ? কী আছে সেসব নীতির যৌক্তিকতা, কী তাদের ফলাফল—কে বুঝিয়ে দেবে তাদের এসব? ধর্মাবতারগণ এই সব ধর্মীয় অনাচারের হাত থেকে মুক্ত করেছেন অত্যাচারিত জনগণকে এবং সাম্যের বাণী শুনিয়ে ধর্মনীতিগুলি অপেক্ষাকৃত মৃদু ও সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে তাদের শান্ত করেছেন। কিন্তু তাঁদের তিরোভাবের পর ধর্মনীতিগুলি আবার শ্রেণীস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে উঠেছে ও জনসাধারণ পুনরায় ধর্মনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। কোনো ধর্মপ্রচারকই অখণ্ডনীয় যুক্তিদ্বারা ধর্মনীতিগুলির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেননি। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম শাস্ত্রীজীই এগিয়ে এলেন এই সব ধর্ম-নীতিকে গণিত-বিজ্ঞানের অকাট্য যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাদের সর্বজনমান্য করতে। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি জানালেন, কেন তোমরা ব্যক্তি বিশেষের কথা মানবে, কেনই বা গ্রন্থবিশেষে লিখিত কতকগুলি কথা গ্রাহ্য করবে? তোমাদের বুদ্ধি-শক্তি আছে,—চিন্তা দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা বিচার ক'রে দেখ, সমস্ত বিশ্বই গণিত-বিজ্ঞানের সূত্রে গ্রথিত, সমস্ত প্রাণীর জীবনধারা নিখুঁত গাণিতিক equation এর নির্ভুল পথে ধাবমান হচ্ছে, জীবন থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে পুনর্জীবনের এই অবিরাম ধারা অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে। বিশ্বের প্রতিটি কণা বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলেছে, কোথাও বিন্দুমাত্র ভুল নেই, আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক জীবের জীবনও সেই গণিতবিজ্ঞানসম্মত আত্মার equation মেনে প্রবাহিত

হয়ে চলেছে—কোথাও নেই খুঁত, নেই কোনো হিসাবের গরমিল, নেই কোনো কারচুপি। সেই গণিতবিজ্ঞানের অমোঘ, অবার্থ নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ে দেখ, বিচার ক'রে নাও তথাকথিত ধর্মাচরণের নীতিগুলিকে। যেগুলি গণিতবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় সুফল প্রদান করবে, সেগুলি বেছে নাও; যেগুলি এই নিয়মে না টেঁকে, সেগুলি বর্জন কর। কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো গ্রন্থবিশেষের কথা মানতে হবে না; নিজ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে গণিতবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই ক'রে নাও। —এমন অদ্ভুত কথা এ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ কখনো বলেনি, কেউ কখনো শোনেনি। পাতালদেবই সর্বপ্রথম এই বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বললেন, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আছে, আর আছে গণিতবিজ্ঞানের আলোক; বুদ্ধি দ্বারা ঐ আলোকপাত কর সর্বত্র, সেই আলোতে যা' দেখবে তাই সত্য, আর সব মিথ্যা।

সেই বিজ্ঞানের আলোকে তিনি দেখালেন, ধর্মাচরণের কোনো বাঁধাধরা পথ নেই, সাধকের সামর্থ্য ও সংস্কার অনুযায়ী গুরু তাকে তার উপযুক্ত পথে নিয়ে চলবেন। বিজ্ঞানের ভাস্বর আলোকে পাতালদেব দেখিয়ে দিলেন—প্রত্যেক প্রাণী এক একটি গতিশীল চেতন electric charge; জীবের জীবনকালে এই charge সর্বদাই gravitational energy-shell দ্বারা আবৃত, এবং তদুপরি gravitational matter দ্বারা প্রস্তুত জড় দেহদ্বারা আচ্ছাদিত। তার চতুর্দিকে মহাশূন্য space-time-এর সাগরে বস্তুবিশ্ব ভাসমান। আবার এই space-time-এর সর্বত্র চেতন radiation সমদীপ্তিতে পরিব্যাপ্ত। এই বস্তুবিশ্বে চেতনসত্তা দু'শ্রেণীর—একটি আত্মা-রূপী অসংখ্য গতিশীল চেতন electric charge, অন্যটি সর্বব্যাপী চেতন radiation, অন্য সব কিছুই জড়। বিজ্ঞানের নিয়মে insulator-ই radiation absorb করে, conductors radiation absorb করতে পারে না, পরন্তু reflect ও scatter ক'রে দেয়। কোনো একটি medium-কে insulator হ'তে হ'লে তার মধ্যে charge-dipoles-এর উপস্থিতি প্রয়োজন, যারা উক্ত medium-এর মধ্যে D-field সৃষ্টি করবে। যে-medium-এ ঐ charge-dipoles যত বেশী, সেই medium তত ভাল insulator হবে। কিন্তু বস্তু-বিশ্বে চেতন charge-dipoles-এর কোনো চিহ্ন নেই, অতএব বস্তু-বিশ্বের কোথাও চেতন-insulator নেই। সুতরাং চেতন radiation absorb করবার মতো কোনো স্থান নেই বস্তু-জগতে, কোথাও চেতন radiation-sensitive কিছু পাওয়া যাবে না, অর্থাৎ চেতন radiation সর্বত্র উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, কোথাও তাকে অনুভব করা যাবে না। এদিকে আত্মার চেতন charge তার চতুর্দিকে 'বস্তু'-রূপ conductor দ্বারা আবৃত থাকায় বাইরের চেতন radiation সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তার হবে না।

পরন্তু মন ও বস্তু-বিশ্বের মধ্যে যে 'চিরন্তন' আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সম্বন্ধ আছে, তদনুরূপ 'অপরিবর্তিত' ধারণাই তার থেকে যাবে বস্তু-বিশ্ব সম্বন্ধে—বিশ্বের 'প্রকৃত' স্বরূপ আত্মার কাছে চিরদিন অজ্ঞাতই রয়ে যাবে। কারণ সে আবৃত, আচ্ছাদিত—তার সত্য দৃষ্টি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। সুতরাং বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ জানতে হ'লে এই আবরণ বা পর্দা অপসারণ প্রয়োজন। এই আবরণ অপসৃত হ'লে চেতন radiation-এর চির ভাস্বর জ্যোতিতে বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আত্মার কাছে। গাণিতিক বিশ্লেষণে পাতালদেব দেখিয়েছেন, আত্মেন্দ্রিয় ভোগেচ্ছাপ্রসূত কর্মই আত্মার চতুর্দিকে gravitational shell-রূপী আবরণ নির্মাণ করে। অতএব ভোগেচ্ছাকে কমিয়ে আনতে হবে। এই ভোগেচ্ছাদমনের দ্বারা আবরণ অপসারণের তিনটি উপায় আছে। প্রথম উপায়—বস্তু-বিশ্বের সব কিছুই নশ্বর, পরিণামে দুঃখপ্রদ, সুতরাং বাসনার তৃপ্তিপ্রদানে অসমর্থ, এইরূপ সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করা। পরন্তু মুখের কথায় এইরূপ জ্ঞান বা উপলব্ধি হয় না। পাতালদেব বললেন, বিজ্ঞানের আলোকেই বস্তুর জ্ঞান সম্ভব। এই বস্তু-বিশ্বে বস্তু-ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়,—আমরা যাকে একটি সুন্দর বস্তু ব'লে দেখছি, সেটি আদৌ কোনো 'বস্তু'ই নয়, সেটি অবস্তু সমুদ্রে একটি তরঙ্গগুচ্ছের সম্ভাবনা মাত্র, 'the probability-density of a wave-packet' এবং তাকে যেস্থানে দেখছি ব'লে মনে করছি, সেটি আদৌ সেখানে নেই, পরন্তু তার 'স্থিতি-সম্ভাবনার বিস্তৃতি' ছুটে চলেছে একটি স্বাভাবিক 'ভ্রান্তি-তরঙ্গের' আকারে। প্রকৃতপক্ষে ওর কোনো রূপ নেই, রস নেই, গন্ধ নেই, শব্দ নেই, স্পর্শ নেই, ঐ স্থানেতেও ও নেই,—space-time-এর complex polarisation ওকে ঐ স্থানে ঐ রকমভাবে উপলব্ধি করতে আমাদের মনকে বাধ্য করছে। সুতরাং যাকে আমরা যা' ব'লে মনে করছি, সে জিনিষ আদৌ তা' নয়। এখন একটা মাটির তৈয়ারী খাদ্য-দ্রব্য, বা প্ল্যাষ্টিকের পুষ্পগুচ্ছকে জেনে শুনে কে রসনাতৃপ্তিদায়ক বা সুন্দর সুগন্ধি জিনিষ ব'লে গ্রহণ করবে? বিজ্ঞানের রায় মেনে নিলে দেখা যায় যে আমরা ভীষণভাবে প্রতারিত হচ্ছি, কোনো একটি সুচতুর যাদুকর বা মোহময়ী মায়াবিনী 'কিছুই-না'-কে আমাদের সামনে এনে আমাদের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকের 'পরম আরামপ্রদ' ব'লে মনে করিয়ে আমাদের তাহা ঠকাচ্ছে, কতগুলি মিথ্যা মরীচিকার পিছনে ছুটিয়ে আমাদের শ্রান্তক্লান্ত করিয়ে একেবারে বোকা বানিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। বস্তু-বিশ্বে বস্তু-বিজ্ঞানের আলোকপাত সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর এই স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ ক'রে দেয়; এবং পাতালদেব সেই বস্তু-বিজ্ঞানালোকে উজ্জ্বল বস্তু-বিশ্বের স্বরূপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললেন,—চেয়ে দেখ, মুগ্ধ মানব, কার পিছনে

তোমার এই অবিরাম ধাওয়া। মায়াবিনীর মিথ্যা মোহমায়ায় মুগ্ধ হয়ে অনেক কামনা করেছ, অনেক ছুটেছ—আর না, এবার ক্ষান্ত হও। যা' দেখছ, যা' শুনছ, যা' আস্বাদ করছ, যার ঘ্রাণ পাচ্ছ, যার স্পর্শানুভূতি হচ্ছে—সবই স্বপ্নের মতো অলীক, তোমার কামনা-অগ্নির ইন্ধন হয়ে শুধু সেই কামনাকেই আরও প্রজ্বলিত ক'রে চলেছে, তাকে তৃপ্ত করছে না, শান্ত করছে না। সুতরাং যে জিনিষ যা' নয়, তার প্রতি বাসনা ক'রে প্রতারিত হয়ো না, মনকে বুঝাও, মনকে শিখাও।

দ্বিতীয় উপায়—আমাদের এই মনুষ্যদেহকে অবলম্বন ক'রে। বিজ্ঞানের Physiology-শাখা বলছে যে জীবের জীবনদীপ জ্বালিয়ে রাখার জন্য দেহস্থিত বহু কোটি (মনুষ্য দেহে 10^{17}) cells-এ অবিরাম যে সকল জটিল হ'তে জটিলতর ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলছে, তাদের মধ্যে co-ordination রক্ষার জন্য সদাজাগ্রত brain-কে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। এই co-ordination সম্ভব হয় দেহস্থিত nervous system-এর link-এর সাহায্যে। Nervous system-এর এই যে 'integrating power',-এ-ক্ষমতা কোথা থেকে সে পায়, তা' বস্তু-বিজ্ঞানের আজও একটি 'unanswered question'; প্রকৃতপক্ষে nervous system সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ হ'লে, বিজ্ঞানের একটি 'supreme riddle of the universe'-এর সমাধান হবে।

Physiology কথিত এই রহস্যময় nervous system-এর একটি প্রধান অংশ হচ্ছে—cerebro-spinal system, অন্য আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ sympathetic system. Nervous system সুস্থ, সতেজ ও সবল হ'লে, মন ও দেহ সুস্থ থাকে, রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ সমূহ মনকে বিশেষ বিচলিত করতে পারে না—এ কথা চিকিৎসকগণ স্বীকার করেন। সুতরাং এই nervous system যাতে সুস্থ ও সতেজ থাকে, তৎপ্রতি যত্নবান হ'তে চিকিৎসক মাত্রেই পরামর্শ প্রদান করেন।

'Nerve-কে সতেজ রাখ'—চিকিৎসকদের এই পরামর্শের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে পাতাঞ্জলদেব বলছেন, স্থূল দৃষ্টিতে যেটুকু বোঝা সম্ভব হয়, Physiology সেটুকু দৃষ্টি দিয়েও যেটুকু উপদেশ দিচ্ছে, সেটি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, শারীরিক কোনো কোনো ব্যায়াম-প্রক্রিয়া এই nervous system-কে সুস্থ ও সতেজ রাখতে সাহায্য করে। এই সকল ব্যায়ামকে অবহেলা করা উচিত নয়। কিন্তু nerve-কে সতেজ করা কেবল দেহকে সবল করাই উদ্দেশ্য মাত্র না ক'রে, এইসব প্রক্রিয়াকে আরও দীর্ঘস্থায়ী, আরও নিবিড় ক'রে তুললে, দেহ তো বটেই, মনেও একটা 'নতুন-কিছু'র আস্বাদ পাওয়া যায়। অবশ্য এটা সকলের হয় না। কিন্তু কেন হয় না? এবং যে 'নতুন একটা কিছু' পায়, সেই বা কেন পায়,

এবং কী সেই 'নতুন কিছু'? স্থূলবিজ্ঞানে এর কোনো উত্তর নেই, কারণ এ স্থূল বস্তু নয়। এই প্রশ্নের উত্তরে পাতালদেব যা' জানালেন, তা' অপূর্ব। তিনি বললেন, ঐ যে nerves, ওগুলি স্থূল দেহের যা' প্রয়োজন সেরূপ কার্য্য তো করেই, তাছাড়া আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেও ওদের নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ওরা হচ্ছে দেহস্থিত অধ্যাত্ম মার্গ; অর্থাৎ চেতন রাজ্যে যেতে হ'লে ঐ পথ ধ'রে যেতে হবে, অন্য উপায় নেই। সাধারণ জীব মায়াবদ্ধ, চৈতন্য-চেতন নয় কেউ; কেউ ওদিকে নজর দেয় না; তাই ওপথ হয়ে আছে ধূলি-মলিন, অবরুদ্ধ প্রায়। যেসব সাধক চেতন রাজ্যের তীর্থযাত্রী তাদের ঐ তো একমাত্র পথ। সুতরাং বহু জন্মের জমা জঞ্জাল-জালে ভরা ঐ পথ-পরিষ্কারে তাদের সর্ব্বাগ্রে আত্মনিয়োগ করতে হবে। জঞ্জাল ঝাড়ু দেওয়ার প্রথাই যৌগিক ব্যায়াম। সারা জন্মে যে যতটা পারল, ময়লা সাফ করল। কিন্তু তার পর? তাতে কী ফল সে পেল? পাতালদেব জানালেন, সাধারণ অসাধক দেহমনের একটু স্বস্থতাবোধ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কিন্তু সাধক অন্য এক দুর্লভ জিনিষ লাভ করবে। পথের জঞ্জাল ঝাড়ু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধককে চেতন electric charge-রূপ পাথেয় অর্জ্জন করতে হবে। সেই চেতন charge দেহ মধ্যে সঞ্চিত হওয়ার সাথে সাথে ঐ nerve-রূপী পরিষ্কৃত ও সুসংস্কৃত electric circuit-এ প্রবাহিত হ'তে থাকবে উর্দ্ধগতিতে। জিনিষটি কী হ'ল এইবার ভেবে দেখতে হবে। পাতালদেব বললেন, মনে করা যাক, কোনো একটি পরিত্যক্ত গৃহ নবাবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা গেল, সেই গৃহে electric lines রয়েছে; কিন্তু বহুদিন অব্যবহার্য্য অবস্থায় থাকায় সে line গুলি অকেজো হয়ে গেছে। ঐ line-এর বিভিন্ন point-এ light bulb, fan, motor, radio প্রভৃতিও connected রয়েছে। তখন আবিষ্কর্ত্তার প্রথম কাজই হবে electric line গুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাদের কার্য্যোপযোগী ক'রে তোলা। তারপর দ্বিতীয় কাজ হবে electric current-এর ব্যবস্থা করা। উক্তস্থানে dynamo চালু না থাকলে battery সংগ্রহ করতে হবে। মনুষ্য দেহেও ঠিক অনুরূপ অবস্থা। Nervous system হচ্ছে চেতন electric current circuit; সেগুলি কখনও ব্যবহার না করায় ফলে অকেজো হয়ে আছে। দীর্ঘ দিন যৌগিক ব্যায়াম প্রক্রিয়ায় সেগুলি কার্য্যোপযোগী ক'রে তোলা যায় বটে, কিন্তু চেতন charge সঞ্চয় ক'রে তদ্দ্বারা current-প্রবাহ না করাতে পারলে বিশেষ কিছুই ফললাভ হবে না। পরন্তু ঐ চেতন chargeএর সঞ্চয় যখন optimum value-তে পৌঁছাবে, তখনই সাধকের দেহমধ্যে আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত অসীম রত্নরাজি সাধকের নয়নগোচর এবং অশ্রুত সঙ্গীত শ্রবণগোচর ও অনাস্বাদিত রস আস্বাদলভ্য হবে। চেতন জগতের এই সকল অপূর্ব্ব আনন্দসম্ভার

উপলব্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধক আনন্দে অভিভূত হবেন এবং তখন বাইরের ভোগ্যা বসুন্ধরা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ ব'লে মনে হবে। সেই সাথে বহির্মুখী মন আপনিই সেদিক থেকে নিবৃত্ত হয়ে অন্তর্লোকের অনন্ত ঐশ্বর্যে ও আনন্দে নিমগ্ন হয়ে থাকবে।

তৃতীয় উপায়টি—সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। যে পরম রহস্যময় চেতনসত্তার ইঙ্গিত দিলেন বিজ্ঞানের সকল শাখার প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ এবং পাতালদেব যে পরম চেতন সত্তার অনুসন্ধান ক'রে তার উৎস ও স্বরূপ আবিষ্কার করলেন, এবং এই বস্তু-বিশ্বের সৃষ্টির উপকরণ, সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও তার সাথে পরম সত্তার সম্বন্ধ নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ ক'রে এই জড়বিশ্বেই সেই পরমসত্তার যুগপৎ উপস্থিতি ও পরিব্যাপ্তি প্রমাণ করলেন সরল গাণিতিক equation-এর সাহায্যে, সেই পরমসত্তাকে বিজ্ঞান-সচেতন মন মেনে নেবেই। এখন সেই পরমসত্তার সহিত আমাদের কীরূপ সম্বন্ধ ও ব্যবহার হওয়া উচিত? পাতালদেব-সূত্র অনুসারে আমরা অবগত হয়েছি, আমাদের কর্ম অনুযায়ী সুযোগ্যা ভোগ্যা বসুন্ধরার স্রষ্টা ও নিয়ামক তিনিই। আমাদের দেহযন্ত্রের অদৃশ্য চালকও তিনি; অদৃশ্য ও অজ্ঞাত অসংখ্য হিতকর প্রভাব বিস্তার ক'রে তিনি সতত মাতৃস্নেহে আমাদের লালনপালন করছেন,—একথাও প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ নানাভাবে জানাচ্ছেন। যিনি একাধারে আমাদের জনক, জননী, পালক, রক্ষক ও সর্ববিষয়ে হিতকামী, আমাদের এমন প্রিয়তম বন্ধুকে কীভাবে ব্যবহার করব আমরা? পাতালদেব একটি উপমার আশ্রয় নিয়ে বললেন, মনে করা যাক, আমাদের কোনো এক প্রিয়জন যাদুবিদ্যা শিখে নিজেকে অদৃশ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করলেন। কিন্তু সেই বিদ্যাপ্রয়োগে আমাদের সমুখে তিনি অদৃশ্য হ'লে তাঁর অদৃশ্য অবস্থায় তাঁকে তাঁর দৃশ্য অবস্থার মতো যথারীতি আহারাদি স্থূলদ্রব্য দ্বারা তাঁর পরিপোষণ করতে হবে। সেই সব আহারাদি স্থূলভাবে তাঁর ব্যবহারে না লাগলেও 'দর্শন'-মাত্রেই তিনি পুষ্টিলাভ করবেন। এই পরিপোষণের অভাব হ'লে পুষ্টির অভাবে তাঁর জীবননাশেরও সম্ভাবনা থাকবে। তখন ঐ ব্যক্তির অদৃশ্য অবস্থায় আমরা জানব তিনি নিশ্চিতই আমাদের কাছে বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং যথানিয়মে তাঁকে আহারাদি দিয়ে তাঁর পরিপোষণ ক'রে যেতে হবে। এই উপমার 'প্রিয়জনে'র মতো, বৈজ্ঞানিকদের ইঙ্গিতপ্রদত্ত ও পাতালদেবের গাণিতিক equationএ সুস্পষ্ট নির্দ্ধারিত আমাদের পরম প্রিয়তম সেই ইন্দ্রিয়-অগোচর চেতন পরমসত্তা চেতন radiation-রূপে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে বর্ত্তমান। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের ইঙ্গিত ও পাতালদেবের equation সন্দেহের লেশমাত্র রাখেনি। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হবে, আমাদের সকলের এবং বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সেই স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত অদৃশ্য চেতন পরমসত্তাকে আমাদের চারদিকে

নিশ্চিত বর্তমান জেনে সর্বভাবে তাঁকে আমাদের আপনজন মনে ক'রে তাঁর সেবাদি পরিপোষণ দ্বারা তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে প্রিয় ও আপন ক'রে নেওয়া।

কল্পিত যাদুবিদ্যার প্রভাবে ঐ অদৃশ্য প্রিয়জনের মতো তিনিও যে কিছুকাল পরে যাদু বা মায়ার নিবিড় তিমির আবরণ অপসরণ ক'রে জ্ঞান ও সত্যের আলোকে দৃশ্যমান হবেন, একথা বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রমাণ করলেন পাতালদেব। যুক্তিটি এইরূপ: বস্তু-বিশ্বে কোথাও চেতন charge-dipoles-এর অবস্থিতি না থাকায় চেতন radiation কোথাও absorbed হ'তে পারে না। অসাধকের আত্মা চেতন charge হ'লেও সর্বদাই gravitational energy-shell দ্বারা আবৃত,—সুতরাং চেতন radiation কখনও আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না, অর্থাৎ চেতন radiation-এর কোনো উপলব্ধি হয় না আত্মার। পাতালদেব-সূত্রানুসারে আমাদের চারপাশে সর্বজ্ঞ পরমসত্তার নিশ্চিত অবস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে এবং তাঁকে আমাদের পরম প্রিয়তম জ্ঞানে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করত ভোগ্যবস্তুতে অভিনিবেশ ত্যাগ করতে পারলে, নতুন কোনো shell-এর আর সঞ্চয় হয়না। উপরন্তু সাধক যদি সাধনের পরিপকাবস্থায় দেহমধ্যে চেতন charge-dipoles গঠন করতে সমর্থ হন, তবে ঐ চেতন radiation আত্মাকে শুধু স্পর্শই করবে না, উক্ত সাধকদেহ insulation ধর্ম প্রাপ্ত হওয়ায় তাতে কিছুটা absorbed-ও হবে। চেতন radiation insulated শরীরে absorbed হওয়ার ফলে, দেহস্থ স্থূল ইন্দ্রিয় সমূহও চেতন radiation-sensitive হবে, এবং সাধারণ স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমসত্তার সত্যকার উপলব্ধি হবে—অদৃশ্য চেতনসত্তা নয়নের দৃষ্টিগোচর, কর্ণের শ্রবণগোচর ও সর্বেন্দ্রিয়ের অনুভবযোগ্য হয়ে উঠবে।

সাধন

পূর্ব্ব পর্য্যালোচনায় সাধকের চেতন charge সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষণে কী পন্থায় এই charge সঞ্চয় করা যায়, তার আলোচনা প্রয়োজন। পাতালদেব-সূত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, প্রত্যেক জীবের দেহমধ্যে আত্মারূপী চেতন গতিশীল charge ছাড়াও যৌবনে সাময়িকভাবে চেতন charge-এর আবির্ভাব হয়। স্বাভাবিক নিয়মে, অর্থাৎ মায়াবদ্ধ জীবের চিরন্তন আত্মেন্দ্রিয় সুখ-ভোগের বাসনার ফলে এই চেতন charge আবির্ভূত হয়েও দেহমধ্যে সঞ্চিত হ'তে পারে না, বিনষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবের ক্ষেত্রে এইটিই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু সাধককে এই charge দেহমধ্যে সংরক্ষিত করতে হবে। এরও মুখ্যত তিনটি উপায় রয়েছে; প্রথম নিয়মে বিশ্বজগৎ অলীক ও নশ্বর এই বৈজ্ঞানিক সত্য মেনে আত্মেন্দ্রিয় সুখ-বাসনাকে অবদমিত রাখতে হবে। এতে সাময়িক চেতন charge-এর

discharged হবার সম্ভাবনা কমে আসে। দ্বিতীয় উপায় যৌগিক পন্থায় শরীরস্থ আধ্যাত্মিক মার্গ nervous system-কে এমনভাবে দৃঢ় ক'রে তুলতে হয়, যাতে সাময়িক চেতন charge-discharge এর নিম্নমুখী গতি-প্রবণতা বন্ধ হয়। তৃতীয় উপায় পরমসত্তাকে নিকটতম প্রিয়তমজ্ঞানে তাঁর সেবায় মনকে নিযুক্ত ক'রে মনের ইন্দ্রিয়সুখবাসনাকে স্তিমিত ক'রে আনা। এছাড়া আরও কয়েকটি উপায় আছে, যেমন ভগবন্নাম উচ্চারণ ও শ্রবণ। এই নাম-উচ্চারণে জিহ্বার সঙ্গে মুখগহ্বরের যে সকল বিশিষ্ট স্থানে স্পর্শ হয়, সেই সব স্থানের স্পর্শজনিত কিছু চেতন বা আধ্যাত্মিক potential difference-সৃষ্ট হয় দেহমধ্যে genetic cells-এ। অনুরূপভাবে ভগবন্নাম-শ্রবণে কর্ণপটাহে যে-oscillation-সৃষ্টি হয় তাতেও কিছু আধ্যাত্মিক current-এর উদ্ভব হয় দেহে উপরি উক্ত cell সমূহে এবং সমস্ত দেহমন এক অপ্রাকৃত আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে; এগুলি পরীক্ষালব্ধ বাস্তব সত্য। এর পরিমাণ অতি সামান্য হ'লেও এর ক্রমবর্দ্ধমান ফল তুচ্ছ করার মতো নয়—এ তথ্য ভগবন্নাম জপ বা কীর্ত্তনরত সাধক ও নাম-শ্রবণনিষ্ঠ ভক্ত মাত্রেই সুনিশ্চিত ভাবে অবগত আছেন। কিন্তু বিষয়-ভোগাদি বাসনা নিয়ে যে সাধন করে তার কী ফল হয়? বিশেষ উদ্দেশ্য থাকায় এবং সেই বিষয়-পূরণের জন্য উক্ত বিষয়ে-গভীর মনোনিবেশ থাকায় উক্ত সাধকের আত্মার গতি শ্লথ হয়ে যায় এবং তার আত্মার চারপাশে কঠিন gravitational shell-এর শ্যাওলা জন্মে। উপরন্তু genetic-cells-এ উৎপন্ন অতিরিক্ত charge তার ক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী ক'রে তোলে, যাতে তার শ্যাওলার shell-গুলি আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। এর ফলে আবৃত আত্মা সত্য স্বরূপের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়, এবং ধর্মসাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্রমে ঔদাসীন্য এসে পড়ে এবং তার দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্যে উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সেই সাধক পতনের দিকে অগ্রসর হয়।

পাতালদেব জানালেন, কিন্তু এগুলি সবই বিজ্ঞানসম্মত সত্য হ'লেও, এই বস্তু-বিশ্বের স্বাভাবিক inertia-ধর্ম বশত এবং কর্মের জন্য আত্মার gravitational shell-এর সর্ব্বদা উপস্থিতির জন্য, জীবমাত্রেই এর বিপরীতশক্তি, অর্থাৎ বহির্মুখী আত্মইন্দ্রিয় ভোগসুখবাসনার বিপুল ও দুর্নিবার গতির কবলে পড়ে, কেউই এর হাত থেকে সহজে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হ'তে পারে না। এ যেন নিম্নাভিমুখী প্রবল জলপ্রপাতের বিরুদ্ধে ঊর্দ্ধমুখে সাঁতার কাটার মরণপণ প্রয়াস। চেষ্টা একটু শ্লথ হ'লে, বা সতর্কতা বিন্দুমাত্র শিথিল হ'লে ঐ নিম্নাভিমুখী বিপরীত গতি দুর্ব্বার শক্তিতে তার সকল প্রচেষ্টার বাঁধ সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাই মায়ার এই দুরত্যয়া শক্তির বিপরীত দিকে যেতে হ'লে চাই বিপুল আধ্যাত্মিক potential-এর অধিকারী কোনো প্রচণ্ড শক্তিশালী মহাপুরুষের অবিরাম সান্নিধ্য, সাহচর্য্য ও উপদেশ। এইপ্রকার

শক্তিশালী মহাপুরুষের তুষ্টিবিধান দ্বারা তাঁর সান্নিধ্যে কিছু induction বা স্পর্শে conduction charge অর্জন করা যেতে পারে।

সাধনপথে সাধকের বিভিন্ন অবস্থা

এবার পাতালদেব-সূত্রানুসারে সাধকের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মাচরণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। প্রথমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার ক'রে দেখতে হবে সিদ্ধ মহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য কী? তাঁর আধ্যাত্মিক চেতন charge-এর পরিমাণ খুব বৃহৎ এবং সাধনপ্রভাবে তাঁর জড়দেহের অণু-পরমাণুও চেতন charge-dipoles-এ পূর্ণ হয়ে তাঁর দেহকে সম্পূর্ণভাবে insulated ক'রে তুলেছে। তার ফলে তিনি একটি বৃহৎ চেতন electric charge-dipole, এবং একটি চেতন magnet। তাঁর দেহে চেতন steady ও alternate দু'প্রকার current প্রবহমান। তিনি চেতন radiation পূর্ণভাবেই absorb করেন, যার ফলে তিনি চেতন পরমসত্তাকে সর্বভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি dipole-oscillation প্রথায় *H.F. radiation বিকিরণ করতেও সমর্থ; এই H.F. radiation দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির জড়দেহ ভেদ ক'রে তার psycho-sphere-এ অবস্থিত মানসবৃত্তির ছবিগুলির নিখুঁত বিবরণ তিনি জানতে পারেন, স্পষ্ট দেখতেও পান তার energy-shell-এর মূর্তি, অর্থাৎ সমগ্র 'প্রারব্ধ'। প্রয়োজন মতো এই H. F. radiation তিনি সুদূরেও directed radiation প্রথায় বিস্তার করতে পারেন এবং সেখান থেকে reflected beam-এর সাহায্যে সেই সেই স্থানের পূর্ণ পরিচয়ও পেতে পারেন। কোনো ভক্ত আকুল হয়ে সেই মহাপুরুষকে ডাকলে সেই ভক্তের দেহস্থিত (virtual image-রূপে অবস্থিত) চেতন radiation-এর তা' গোচরীভূত হয়। সর্বব্যাপী চেতন radiation সে-সংবাদ মহাপুরুষের গোচরে আনলে, চেতন-radiation-sensitive মহাপুরুষ তৎক্ষণাৎ তা' জানতে পারেন। এরূপে সিদ্ধমহাপুরুষ জীবমাত্রেরই ভূতভবিষ্যৎ ও অন্তরের বর্তমান সংবাদ জেনে ত্রিকালজ্ঞ হ'তে পারেন; এবং প্রয়োজন মতো দূরদর্শন, দূরশ্রবণ করতে পারেন এবং ভক্তের আকুল আহ্বান উপলব্ধি করেন।

ধর্মাচরণগুলি যে বিজ্ঞান-সম্মত তা' পাতালদেব এইরূপে ব্যাখ্যা করলেন। ধর্মাচরণের ফলে দেহে ও মনে যে সকল অভিনব ভাবের উদয় হয়, তার লক্ষণগুলি বস্তু-বিজ্ঞানের magnetism, static electricity ও current electricity-র ধর্মের সঙ্গে

---

* এই H. F. radiation সাধারণ radiation, 'চেতন' নয়; অর্থাৎ vibration কালে এর charge imaginary হয়ে যায়। বস্তু-বিশ্বের কোনোস্থান থেকে চেতন-radiation বিকিরণ সম্ভব নয়। Dipole charge e-এর সমান হ'লে এর frequency হবে $4 8 \times 10^{22}$: পরন্তু moleculesদের চেতন charge এর চেয়ে বেশী ক'রে কম frequencyর radiationও সম্ভব।

সুন্দরভাবে তুলনীয়। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়গুলি যেসব নিয়ম মেনে চলে, ধর্মাচরণজনিত প্রাপ্ত অবস্থাও সেই সব নিয়মের অধীন। প্রথমে magnetism-এর ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা যাক। স্মরণ রাখতে হবে ধর্মসাধনার অর্থ মনকে নিয়ন্ত্রণ করা। মায়াবদ্ধ জীবের অনিয়ন্ত্রিত মন আত্মেন্দ্রিয় সুখ-ভোগেচ্ছায় ভোগ্য বিষয়সমূহে অভিনিবিষ্ট হয়ে তার slow velocity-র জন্য কর্ম-বন্ধন বা gravitating energy shells উৎপন্ন করে। মনের বহু সঙ্কল্পের কতকগুলিকে বেছে নিয়ে কার্য্যকরী করে নিশ্চয়াত্মিকা 'বুদ্ধি'। সাধক 'বুদ্ধির' এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, যাতে ভোগ্য বিষয় সম্বন্ধে আত্মার গতি অতি দ্রুত হয়ে যায়; পরন্তু তিনি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্ব্বদা গুরুর প্রতি স্থির রেখে গুরুর নির্দেশ মতো নির্দিষ্ট পথে চলেন, কোনো সময়ে পথভ্রষ্ট হন না। উপরন্তু সাধক সাধন-কর্মে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ত নিযুক্ত রাখেন। বুদ্ধিবৃত্তির এই উভয়বিধ নিয়ন্ত্রিত কার্য্যকে প্রকৃতপক্ষে গুরুকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর চারদিকে orbital motion ও self-spinning বলা যায়। এটা বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়াকলাপের একটা abstract idea. এই উভয়বিধ গতির ফলে বুদ্ধিবৃত্তির একটা আধ্যাত্মিক magnetic moment সৃষ্টি হয়, যে-moment বুদ্ধিবৃত্তি-পরিব্যাপ্ত আত্মার charge-এর উপর নির্ভর করে। বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ 'ভাবে'র নিয়ন্ত্রণের ফলে বুদ্ধি, তথা আত্মা, magnetised হয়ে পড়ে।

অসাধকদের আত্মার এরূপ অবস্থা কখনও হয় না। তুলনামূলক ভাষা প্রয়োগ ক'রে বলা যায়, অসাধক মায়াবদ্ধ জীবগণ dia-magnetic শ্রেণীভুক্ত। magnetism-এর ধর্ম অনুযায়ী, এই শ্রেণীর লোক চেতন পরম সত্তার বা কোনো সিদ্ধ মহাপুরুষের magnetic field-এর প্রভাব উপলব্ধি করতে অসমর্থ। বিজ্ঞানের ধর্ম অনুযায়ী এই সকল লোক বরং এইরূপ magnetic field-এর শক্তিশালী অংশ থেকে স'রে দুর্ব্বলতর অংশে আশ্রয় নেবে, এবং ঐ field-এ লম্বভাবে অবস্থান করবে, অর্থাৎ তারা চেতন magnetic field-কে সর্ব্বভাবে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবে। পরন্তু গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী ধর্মসাধকগণ তাঁদের গুরুকেন্দ্রিক orbital motion ও সতত সাধন ক্রিয়াতৎপরতা প্রসূত spinning motion-এর জন্য প্রভূত magnetic moment অর্জ্জন করত para-magnetic হয়ে যান। এঁরা যখন চেতন magnetic-field-এর আওতায় আসেন তখন তাঁরা সেই field-এ aligned হয়ে যান এবং field-এর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্থানে আসতে চেষ্টা ক'রে induced magnetism অর্জ্জন করেন। এক্ষণে magnetism-এর ধর্ম অনুযায়ী, পদার্থের absolute temperature যত কমবে, তার magnetic susceptibility তত বাড়বে, এবং বিপরীতক্রমে প্রথমটি যত বাড়বে, দ্বিতীয়টি তত কমবে। Magnetism-

এর এই বিশেষ ধর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে পাতালদেব বললেন, সাধকের absolute temperature-রূপী তার মেজাজ যত নরম হবে, তার আধ্যাত্মিক magnetic susceptibilityও তত বৃদ্ধি পাবে। এই temper বা মেজাজ যখন absolute zeroর কাছাকাছি আসবে, অর্থাৎ সাধক যখন 'তৃণাদপি সুনীচ' হয়ে 'জীয়ন্তে মরা'র মতো হতে পারবেন, সেই 'দীনাতিদীন' সাধক তখন magnetic susceptibility-র Curie point-এ পৌঁছাবেন, এবং বাইরের কোনো field-এর বিনা সাহায্যেই স্বতই magnetism-এর ধর্ম প্রাপ্ত হবেন। সাধনার উচ্চতম স্তরে সাধক ferro-magnetic হয়ে যান এবং সুবৃহৎ magnetic susceptibility লাভ করেন। তাঁদের সুদীর্ঘ ও সুকঠোর তপশ্চরণ তাঁদের অভ্যন্তরে অতি শক্তিশালী magnetic fiield-এর সৃষ্টি করে এবং তাঁরা permanent magnet হয়ে যান। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে এঁদের পক্ষেও magnetic susceptibility ও absolute temperature inversely vary করে, অর্থাৎ ক্ষণিকের অসতর্কতা বশতও যদি এই প্রকার সিদ্ধপ্রায় সাধকের মেজাজ Curie point-এর অতি দীনাবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়, অমনি সেই সিদ্ধপ্রায় সাধকও ferro-magnetism-এর উচ্চ অবস্থা থেকে অধঃপতিত হয়ে para-magnetic অবস্থা প্রাপ্ত হন। অতএব 'তৃণাদপি সুনীচ' আচরণের দ্বারা 'জীয়ন্তে মরা'র মতো হওয়া সিদ্ধপ্রায় সাধকেরও অবশ্য কর্তব্য।

পাতালদেব দেখিয়ে দিলেন যে, সাধারণ সাধক এইরূপে paramagnetic অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যখন কোনো উচ্চমার্গের সাধকের সমীপবর্তী হন, তখন তিনি magnetism-এর ধর্মবশতই উক্ত উন্নত সাধকের magnetic field-এ নিজেকে aligned ক'রে নেন, এবং তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথ ও উপদেশমতো সাধনক্রিয়া করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এইরূপে তিনি ঐ উন্নত সাধকের নিকট থেকে কিছু induced magnetism অর্জন ক'রে থাকেন। যে কোনো সেবারত সাধকই এই বহিঃস্থ magnetic field-এ এলে অন্তরে কিছু 'oscillation' বা দোলা পাবেনই।

এর পর static electric charge-এর ধর্মের সঙ্গে সাধকের সাধনাবস্থার তুলনা করা যেতে পারে। ইতিপূর্বেই পাতালদেব দেখিয়েছেন, সমস্ত বস্তু-বিশ্ব, তথা সাধারণ মায়াবদ্ধ জীব, trans-radiation-এর নিকট conductor সদৃশ এবং এরা এই radiation absorb করতে অসমর্থ। ধর্মসাধনেচ্ছু সাধক তাঁর আধ্যাত্মিক charge-বৃদ্ধির সাধনে গুরুকে তাঁর insulator-রূপে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ তাঁর ভিতরে সঞ্চয়নরত charge যাতে leak না ক'রে চলে যায় তার জন্য গুরুকে তাঁর

'রকিক' রূপে বর্ণন করেন। প্রাথমিক অবস্থায় এরূপ সাধকের সাধারণ অসাধকের সঙ্গ বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, কারণ অসাধকরূপী conductor তাঁর সমীপবর্ত্তী হ'লে তাঁর আধ্যাত্মিক potential কমে যাবে। অপরপক্ষে static electricity-র ধর্ম্ম অনুযায়ী, সাধক যদি সমশ্রেণী সাধকবর্গের সমাবেশে আসেন, তবে ঐ সমাবেশে যে কোনো একজন সাধকের charge-বৃদ্ধিতে অপর সাধকদের potential স্বতই বৃদ্ধি পাবে।

এবার current electricity-র ধর্মগুলির সঙ্গে সাধন-আচরণের বিভিন্ন অবস্থার তুলনা করা যাক। সাধারণ অসাধকের দেহাভ্যন্তরে কোনো স্থায়ী আধ্যাত্মিক electrostatic potential বা কোনো আধ্যাত্মিক current থাকতে পারে না কারণ যৌবনে দেহে আধ্যাত্মিক charge-এর periodic সঞ্চার সত্ত্বেও, তা' স্বাভাবিক নিয়মে conducting band-পথে discharged হয়ে যায়। পরন্তু গুরুর নির্দ্দেশমতো trans-charge-অর্জ্জনরত সাধকের আধ্যাত্মিক charge-এর একাংশ সুসংস্কৃত আধ্যাত্মিক electric circuit cerebro-spinal nervous system-এ trans-current রূপে প্রবাহিত হ'তে থাকে। এই trans-current প্রবাহের ফলে উক্ত cerebro-spinal cord-এর ছয়টি বিশিষ্ট স্থান আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে অনাবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক সম্পদ-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেয়। গুরুকৃপাধন্য সাধকগণ 'ষট্‌চক্রে' এই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার প্রত্যক্ষ দর্শন করেন।

সমশ্রেণীর সাধকগণের trans-current একই দিকে প্রবহমান, current electricity-র ধর্ম অনুসারে তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবেন।

যে উন্নত সাধক তাঁর দেহস্থ current-কে slowly varying করতে পারেন, তিনি সাধারণ conductor-রূপী অসাধককে repel করবেন। যিনি অতি উন্নত স্তরের সাধক, এবং যিনি সিদ্ধির সমীপবর্ত্তী হয়েছেন, তিনি দেহমধ্যে উচ্চ p.d. সমন্বিত condenser প্রস্তুত করতে পারেন এবং এই condenser-discharge দ্বারা rapidly varying current উৎপন্ন করতে পারেন। সাধারণ অর্থাৎ নিম্নস্তরের সাধক অত বেশী p.d. অর্জ্জন করতে পারেন না। কিন্তু সিদ্ধপ্রায় সাধক দেহমধ্যস্থ di-electric pressure ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ ক'রে এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ কতিপয় plane-এর মধ্যস্থ p.d. কে অনুরূপভাবে পরিবর্ত্তিত ক'রে দেহ-surface-এ fluorescence glow-discharge-সৃষ্টি করতে পারেন—যাকে দেহের বহির্ভাগে 'জ্যোতির্ম্মণ্ডল-' রূপে প্রকাশ্যভাবে দেখা যায়। গুরুকৃপাপ্রাপ্ত সাধকগণ এই অপরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সকল অতি উন্নত পর্য্যায়ের সাধক দেহমধ্যস্থ open-

circuit-এ প্রবহমান displacement current ব্যবহারে নানাবিধ চমৎকৃতি জনক ঘটনা সংঘটিত করতে পারেন। উল্লেখযোগ্য যে, এইরূপ current ব্যবহারে direct current-এর মতো heat-loss হয় না। এই সকল সিদ্ধপ্রায় সাধক electomagnetic waves-সৃষ্টিতেও সমর্থ হন। এই rapidly-varying current-এর effect দেহের বহির্ভাগস্থ স্তরে 'skin-effect' রূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং দেহের বহির্ভাগে, বিশেষত 'point-effect'-রূপে চরণাঙ্গুলি স্পর্শে, এই current-এর effect উপলব্ধি হয়। সময়ে সময়ে সে-effect 'spark' রূপেও দৃষ্ট হয়।

সাধক সাধনপ্রভাবে কী প্রকারে conductor সদৃশ দেহের অভ্যন্তরে চিন্ময় charge-dipoles-এর সঞ্চার ক'রে দেহমধ্যস্থ medium-এ D-field সৃজন করত তাকে চিন্ময় insulator-এ পরিণত করতে পারেন, এ অত্যাশ্চর্য্য ও প্রায় অবিশ্বাস্য তত্ত্ব একমাত্র পাতালদেবই গণিত-বিজ্ঞানের সূত্রে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সাধক-দেহ এইরূপে চিন্ময় insulator-এ রূপান্তরিত হ'লে সেই দেহমধ্যস্থ medium-এ ε এর সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই জানেন এই ε insulator-এর insulation ক্ষমতার পরিচায়ক। এর কয়েকটি অদ্ভুত ধর্ম আছে। ε-বৃদ্ধির সাথে উক্ত insulator-এর material density, negative energy ও absorption power বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সাধকের insulation বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর চিন্ময় density ও চিন্ময় energy-র (যা' সর্ব্বদাই negative) বৃদ্ধি হয়। এদিকে ε-বৃদ্ধির ফলে সাধক-দেহে trans-radiation-এর scattering প্রভূত পরিমাণে কমে যায় এবং এই radiation-এর অধিকাংশই উক্ত সাধকদেহে absorbed হয়। এইভাবে উক্ত সাধক trans-radiation-এর সাক্ষাৎ স্পর্শ পান এবং ঐ radiation-এর শক্তিদ্বারা শক্তিমান হন। যেহেতু scattering coefficient $\propto \frac{1}{\epsilon^2}$, অতএব প্রত্যেক সাধকেরই দেহমধ্যে dipole-সঞ্চার প্রক্রিয়ায় insulation-শক্তি বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। আবার, যেহেতু radiation absorption-power বস্তুর atomic number-এর উপর নির্ভরশীল, absorption-শক্তি বৃদ্ধি করতে হ'লে সাধককে তাঁর atomic number বাড়াতে হবে, অর্থাৎ তাঁকে প্রভূত পরিমাণ trans-charge-এর অধিকারী হ'তে হবে। এই দুটি অমূল্য তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন পাতালদেব।

ধর্ম-সাধন-প্রক্রিয়ায় কীভাবে আধ্যাত্মিক magnetism-এর আবির্ভাব হয় এবং ঐ magnetism অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সাধককে, এমন কি সিদ্ধপ্রায় মহাপুরুষকেও,

কেন 'তৃণাদপি নীচ' হয়ে আচরণ করতে হয় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে পাতালদেব দিয়েছেন। এইবার electrical দৃষ্টিভঙ্গিতে দৈন্ত-আচরণের একটি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দিচ্ছেন পাতালদেব। সাধন-প্রক্রিয়ায় কঠোর নিয়ম-শৃংখলা যত বৃদ্ধি পাবে সাধক-দেহে moleculesসমূহের মধ্যে covalent bond ততই বাড়বে, এবং স্বেচ্ছাচারী ভবঘুরে electrons-দের সংখ্যা তত কমবে। এই covalent bond-এর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে energy-gap-ও বাড়বে এবং সাধক perfect insulation-এর দিকে এগিয়ে যাবেন। সাধকরূপী semi-conductor গণ বহু সাধন ক'রে যেটুকু forbidden energy-gap সৃষ্টি করেছেন, ক্রোধরূপী temperature-বৃদ্ধিতে তাঁদের conductance বেড়ে যায়, ফলে তাঁদের সাধনের প্রভূত অবনতি হয়। বহু আয়াসে অর্জ্জিত gap ভেদ ক'রে charge চলে যায় conduction band-এ এবং তার অবক্ষয় হয়। যাঁরা insulator হয়ে গেছেন, তাঁদের এই gap প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তখন conduction হয়ে charge ক্ষয় আর হ'তে পারে না বটে, তবে ক্রোধরূপী temperature-বৃদ্ধি charge-এর নিম্নাভিমুখী গতির প্রবণতা আনে। সুতরাং ক্রোধ সর্ব্ব অবস্থাতেই পরিত্যাজ্য।

দৈন্ত-প্রসঙ্গে সাধকের আর দুটি আচরণ—সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম ও হাতযোড় করার অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন পাতালদেব। সাধক যখন insulation-এর আশ্রয় নিয়ে সাধন করেন, তখন এই insulation তাঁর ভিতরে core-material রূপে সারা দেহে পরিব্যাপ্ত থাকে এবং বাইরে skin-এর স্থান বিশেষে conduction-layer-এ charge থাকে। যে সব সাধক semi-conductor-এর পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁদের insulation ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে সর্ব্বাঙ্গ ভূমি স্পর্শ করলে insulated core material সহ দেহ-surface-দুটি condenser-এর সৃষ্টি করে এবং তাতে প্রণত সাধকের capacitance প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে তাদের charge ধ'রে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সিদ্ধমহাপুরুষের সান্নিধ্যে এলে induction বা conduction-প্রথায় বেশী পরিমাণ charge লাভের সম্ভাবনা থাকে। এখন পাত্র বড় হ'লে তবে তো ভিক্ষা মিলবে বেশী, সঞ্চয় হবে প্রচুর। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দেহকে condenser এ পরিণত ক'রে এইভাবে পাত্রের ধারণ-শক্তি বৃদ্ধি করে। পৃষ্ঠদেশ উপরে ও বক্ষদেশ ভূমিতে রাখার তাৎপর্য্য এই যে, charge সংরক্ষণ করার প্রধান আধার, অর্থাৎ অধ্যাত্ম-রাজ্যের প্রধান মার্গ হচ্ছে মেরুদণ্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট nerve গুলি।

সমস্ত শরীরকে চিন্ময় elcctricity-র circuit মনে ক'রে সাধক এই circuit close করার জন্ত যে switch on করেন, তাই হ'ল দু'টি কর যুক্ত করা। করের বিভিন্ন দশাঙ্গুলি mutual inductance-বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যে-সাধক দেহমধ্যে

কিছু চিন্ময় magnetism অর্জন করেছেন, বা দেহ-circuit-এ steady current প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছেন,—এরূপ কোনো সাধকের কাছে গেলে উক্ত যুক্ত-কর ভক্ত প্রার্থী তৎক্ষণাৎ instantaneous induced current-এর প্রভাব উপলব্ধি করবেন; এরূপ প্রার্থী যুক্তকর হয়ে যদি উক্ত সাধকের সেবামূলক কিছু 'কাজ' করেন, তবে dynamo-principle-এ কিছু induced current-ও লাভ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত যদি এইরূপ কোনো প্রার্থী যুক্তকর, অর্থাৎ closed circuit-অবস্থায় কোনো alternate current প্রবহমান উন্নত সাধকের সমীপবর্ত্তী হন, তবে উক্ত প্রার্থীর দেহে সাময়িকভাবে induced e. m. f. এর সৃষ্টি হবে। তৃতীয়ত যদি কোনো সাধক অপর একজন অতি উন্নত সাধকের নিকটে করযোড়ে উপস্থিত হয়ে নিজ শরীরের inductance ও capacitance নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তবে উক্ত উন্নত সাধকের সৃষ্ট radiationএর resonance উপলব্ধি করার সৌভাগ্য লাভ করবেন।

এর পর সাধক কেন নিঃসন্তান হন, তার গাণিতিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন পাতালদেব। সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবের দাম্পত্য জীবনকে দুই variables এর function-রূপে Taylor's theorem অনুযায়ী expand করলে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, উক্ত expansion এ যদি n-সংখ্যক first derivatives exist করে ও continuous হয়, তবে সেই দম্পতির fertile period-এ n-সংখ্যক সন্তান হবে; যে সকল derivatives-এর existence নেই, বা যারা continuous নয়, সেই সংখ্যক সন্তানের জন্ম হবে না। জাত সন্তানগণ পিতা বা মাতার derivatives হওয়ায় পিতা বা মাতার স্বভাবই প্রাপ্ত হবে, অর্থাৎ পিতা-মাতার অপূর্ণ বাসনাপূরণের বীজ বহন করবে। এইরূপে পিতামাতা তাঁদের derivatives-রূপ সন্তানগণের মধ্যে তাঁদের বাসনা বা আদর্শের বীজ রেখে দেন; সুতরং কোনো জীবই এই ভব-চক্র থেকে 'মুক্ত' হতে পারেন না, যতক্ষণ তাঁদের 'বীজ' বহনকারী উত্তরপুরুষ পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকে। অপরদিকে, গুরু-নির্দেশ অনুযায়ী সাধনরত সাধকের কোনো নিজস্ব স্বতন্ত্র বাসন নেই। তাঁদের equation অতি সরল, তাঁরা সর্ব্বদাই গুরু নির্দ্দেশের parallel পথে চলেন। সুতরাং গুরু নির্দেশকে reference axis ধরলে, তাঁদের derivative শূন্য। অতএব তাদের সন্তান থাকতে পারে না। বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য Pataldev Principle গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুর পর সাধকের কীরূপ গতি হয় তার আলোচনা করা যাক। সাধক সাধনাদ্বারা দেহমধ্যে যে T-charge সঞ্চয় করেন, মৃত্যুকালে সেই T-charge আত্মার T-charge -এর সহিত একীভূত হয়ে আত্মার শ্রীবৃদ্ধি অর্থাৎ charge-বৃদ্ধি করে। যে সব সাধক দেহমধ্যে T-charge dipoles গঠন করতে পারেন, মৃত্যুসময়ে তাঁদের সেই

T-charge-dipoles আত্মার T-charge-এর পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে যায় এবং এইরূপে গঠিত যুক্ত আত্মা সহ তাঁদের দেহপাত হয়।

এইসব T-charge একবার দেহমধ্যে-সংরক্ষিত করতে পারলে, তাদের কখনও বিনাশ বা ধ্বংস হয় না। জন্ম থেকে জন্মান্তরে, তারা আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে জানবার পথ সুগম ক'রে তোলে।

সূক্ষ্মের চেতন বিশ্বের স্বরূপ

বস্তুবিজ্ঞানীগণ বস্তু-বিশ্বের আড়ালে যে এক রহস্যময় শক্তির ইঙ্গিত দিলেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা পাতালদেব সেই শক্তির উৎস-সন্ধান, তার স্বরূপ-নির্ণয়, বস্তু-বিশ্বে তার ক্রিয়া-বিক্রিয়া বিশুদ্ধ গণিত-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করলেন। এক্ষণে স্বাভাবিকভাবেই ঔৎসুক্য জাগবে—চেতন সত্তা-সমন্বিত সেই চেতন বিশ্বের কিছু পরিচয় জানবার জন্য। তিনি কি এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন? পাতালদেব তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যে-যুক্তি অনুসরণ করেছেন, সেই যুক্তিদ্বারাই এই চিন্ময় বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন।

পাতালদেবের বিশ্লেষণে জড় বিশ্ব imaginary trans charge-এর oscillation-প্রসূত radiation থেকে উৎপন্ন। এই chargeএর oscillation সময়ে, এর nature imaginary হয়ে যায়। অতএব এর প্রসূত radiationএর উৎস 'কল্পিত' এবং এই radiation-প্রসূত সমগ্র জড় বিশ্ব তথা জড় space সেই স্রষ্টার 'স্বপ্ন'-বিলাস মাত্র। এর কোনো 'সত্য' সত্তা নেই। সুতরাং, জড় বিশ্বের 'বস্তু'-সত্তার কোনো 'সত্য' উৎস নেই; জড় বস্তু 'নিত্য' বস্তু নয়, পরন্তু radiation থেকে রূপান্তরিত। এর চরম রূপ wave-packet হ'লেও macroscopic scale-এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'বস্তু' ব'লে প্রতিভাত হয়। জড় বস্তু সর্ব্বদাই gravitational ধর্মী; জড়বস্তুর প্রত্যেক কণার অন্তর্নিহিত spin আছে, কারণ এর raw-material-রূপ radiation সর্ব্বদাই spin-ধর্মী; জড়পদার্থ মাত্রেই inertia-র অব্যাহত প্রভাবে প্রভাবিত, এদের নিজস্ব কোনো 'স্বয়ংশক্তি' নেই, পরন্তু inertia-ধর্মের কাছে অসহায় হয়ে বিভিন্ন গতিতে গতিশীল হ'তে বাধ্য হয়েছে; ফলে এরা relativity-ধর্ম প্রাপ্ত হয়ে পরস্পরের ভ্রান্তি উৎপাদন করে। ঐ বিশ্লেষণেই তিনি চেতন বিশ্বের যে সংজ্ঞা দিলেন, সেই সংজ্ঞা অনুসারে চেতন বিশ্বে dipole-আকারে real live-charge-এর নিত্য অবস্থিতি। উক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী চেতন বিশ্বের শুধুমাত্র বহিঃসীমায় imaginary live-charge-এর অবস্থান সম্ভব, যে-imaginary live-charge-এর oscillation প্রসূত radiation বস্তু-বিশ্ব নির্মাণ করে। উক্ত radiation unidirectional, অর্থাৎ মাত্র বস্তু-বিশ্বের দিকেই বিস্তারিত; সুতরাং চেতন বিশ্বে উক্তরূপ কোনো radiation বা তজ্জাত gravitating matter থাকতে পারে না। Live-charge-এর সংজ্ঞায় তার electro-magnetic rest-mass negative ও imaginary নির্দ্ধারিত হয়েছে, অতএব dipole rest-massও negative ও imaginary হবে, পরন্তু এর মান কখনও শূন্য হ'তে পারে না,

অর্থাৎ এ 'বস্তু' নশ্বর নয়, কারণ dipole-এ positive ও negative charge সর্বদা 'আবদ্ধ' অবস্থায় থাকে। সুতরাং চেতন বিশ্বের এই চিন্ময় সত্তার 'matter' সম্পূর্ণরূপে electro-magnetic ও অবিনশ্বর, জড় বিশ্বের মতো কল্পিত radiation হ'তে রূপান্তরিত নশ্বর wave-packet মাত্র নয়। এই চিন্ময় বস্তুর অন্তর্নিহিত spin ব'লে কিছু নেই, চিন্ময় বস্তুর ইচ্ছাক্রমে spin থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। চিন্ময় পদার্থের inertia-ধর্ম না থাকাতে এরা নিজ গতি নিয়ন্ত্রণে সমর্থ, এদের absolute rest-অবস্থা যে কোনো সময়েই সম্ভব। কোনো চিন্ময় সত্তাই relativity-র অসহায় অবস্থায় প'ড়ে পরস্পরের ভ্রান্তি উৎপাদন করে না। এখানে সব চিন্ময় সত্তাই এক পরম চেতন সত্তা হ'তে উদ্ভূত ব'লে সকলের মধ্যে পারস্পরিক আনুগত্য ও পূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান। এখানে জড় বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় চিন্ময় বস্তুর velocity-র কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। আলোকের গতির চেয়ে বেশী গতিতে যারা ভ্রমণশীল, তাদের total energy real, এবং আলোকের গতির নিম্নগতিতে যারা ভ্রমণরত, তাদের total energy imaginary. এইরূপ চেতন বিশ্বে কি আমাদের জড় বিশ্বের মতো আকাশ, বাতাস, আলো, মাটি, জল, গৃহ, আসবাব ইত্যাদি আছে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে পাতালদেব তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন, সবই আছে; তবে তারা আছে আরও স্বাধীনভাবে; আছে চেতনসত্তার ইচ্ছানুযায়ী বাধাবিহীন, অটুট, অনাবিল আনন্দবৈচিত্র্য ও আস্বাদন-চমৎকারিতার রসপুষ্টিসাধন করবার জন্য। যেখানে চেতন বস্তু বিদ্যমান, সেখানে ঐ চেতন সত্তার ইচ্ছাকৃত সঙ্কোচনের ফলে space-এর অবস্থিতি সম্ভব এবং চিন্ময় dipole-oscillation দ্বারা dipoles দের বিবিধ charge প্রসূত, নানা frequency-radiation দ্বারা এ space সদাই energised; চেতন সত্তার ইচ্ছানুরূপ এ সকল radiation বৈচিত্র্যময় আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি সৃষ্টি করতে সমর্থ। চিন্ময় বিশ্বের সব চিন্ময় বস্তুই dipole, —electric অথবা magnetic। যেসব radiation dipole-oscillation প্রসূত, তাদের equation of motion বিচার ক'রে পাতালদেব চিন্ময় বিশ্বের কয়েকটি অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের বিষয় প্রতিষ্ঠিত করলেন। Variable frequency যুক্ত যে কোনো external energy চিন্ময় বিশ্বের dipole-সংস্পর্শে বিশ্লেষিত হয়ে যায় এবং তদ্দ্বারা সেই সকল চিন্ময় সত্তা, বহু বৈচিত্র্য, বৈদগ্ধ্য ও বিশিষ্টতা লাভ ক'রে মাধুর্য্যময় হয়ে উঠে। Equation-এর সাহায্যে আরও দেখা যায় একই energy বিভিন্ন প্রকার dipole-সংস্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন absorption line-এর সৃষ্টি করে, কারণ absorption co-efficient oscillatory বস্তুর frequency-র উপর নির্ভরশীল। সুতরাং একই প্রকার energy বিভিন্ন ধরণের dipole সমন্বিত আসবাব ও ধামাদি বা বিগ্রহের

মধ্য দিয়ে আসতে গিয়ে সেই সেই বিভিন্ন dipole-সংস্পর্শে নানাভাবে absorbed হয়ে দর্শকের সমূখে বিচিত্র বর্ণালি শোভিত spectrum সমূহ প্রকাশ ক'রে নব নব রূপে নব নব বৈচিত্রী-চমৎকারিতা আনয়ন ক'রে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করে।

এই চিন্ময় বিশ্বে কোনো চেতন বিগ্রহ সম্ভব কিনা এবং এখানকার মাটি, জল, আসবাব ইত্যাদি চেতন কিনা—এ প্রশ্নের উত্তরে পাতালদেব জানালেন, চেতন সত্তার সংজ্ঞা অনুসারে চেতন বিশ্বে কোনো জড় সত্তার চিহ্নমাত্র নেই; সেখানে সব 'পদার্থ'ই চেতন dipole,—electric অথবা magnetic। এই জড় বিশ্বস্থিত চেতন আত্মার সুখদুঃখ-অনুভূতি ও ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যশক্তির তুলনামূলক উপমা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, চিন্ময় বিশ্বে সমগ্র চেতনসত্তা স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি ও বিচারশক্তি-যুক্ত, এবং চরমে সুখপ্রদ ও পরম আনন্দময়। তা' হ'লে এই চিন্ময় বিশ্ব নিত্য সত্তা, পূর্ণ জ্ঞান ও পরম আনন্দ-ভাণ্ডার। বিভিন্ন বৈচিত্রী ও অসংখ্য বিভাগের দ্বারাই এই জ্ঞান ও আনন্দ তার চরম সীমা ও পরাকাষ্ঠা লাভ করতে পারে। তাই স্বভাবতই এই সত্তা অনন্ত প্রকার বৈচিত্রীময় স্ত্রী ও পুরুষ বিগ্রহ এবং নানাবিধ আসবাব-উপকরণে বিভক্ত হবে। আমরা জানি বস্তু-বিশ্বে পদার্থ-গঠনের মূলে তিন প্রকারের বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া আছে: (১) intra-protonic, (২) intra-nucleic বা mesonic, (৩) intra-atomic বা electro-magnetic,—এই তিন শক্তির সমন্বয়েই পদার্থের সৃষ্টি; ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থে তিন প্রকার চেতন শক্তিরই co-existence রয়েছে। ঠিক অনুরূপ-ভাবে চিন্ময় বিশ্বের তিন প্রকার চেতন শক্তি—(১) সত্তা-প্রধান, (২) জ্ঞান-প্রধান, (৩) আনন্দ-প্রধান শক্তির সাম্যাবস্থা বা equilibrium state-ই হ'ল চিন্ময় matter-এর স্বরূপ। এর মধ্যে সত্তা-প্রধান চিন্ময় পদার্থ চিন্ময় বিশ্বের উপকরণ, জ্ঞান-প্রধান চিন্ময় পদার্থ পুরুষ-বিগ্রহ, আনন্দ-প্রধান চিন্ময় বস্তু স্ত্রী-বিগ্রহ। 'প্রধান' বলতে ক্রিয়া-প্রাধান্য বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় সত্তার মূল আধার হচ্ছে চেতন charge; এ charge-ও গঠিত হয়েছে তিন প্রধান চেতন শক্তি—সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সমন্বয়ে, ঠিক u, d, s এই তিন প্রকার quark-এর সমবায়ে গঠিত জড় বিশ্বের মূল পরমাণুগুলির মতো। চেতন charge-গঠনে 'সত্তা' বা 'সন্ধিনী' শক্তির প্রাধান্য। Positive চেতন charge-এর সংজ্ঞা হ'ল সেই চেতন charge—যার অতি ক্ষুদ্র থেকে শুরু ক'রে সুবৃহৎ অণুর গঠন আছে; অর্থাৎ যে সকল অণুর charge খুব কম থেকে আরম্ভ ক'রে খুব বেশী পর্য্যন্ত হ'তে পারে। সংজ্ঞা অনুসারে negative চেতন charge-এর অণু মূলত ক্ষুদ্র, অর্থাৎ এর charge-এর পরিমাণ সাধারণত কম। এসব চিন্ময় particle-এর কোনো anti-particle নেই। চিন্ময় পুরুষ-বিগ্রহে অসংখ্য প্রকার চিন্ময় dipole-এর ক্রিয়া-বিক্রিয়া বর্ত্তমান। এসব চিন্ময় dipole-এর

প্রত্যেকটিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র negative nucleus-এর চারদিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র positive চেতন charge-এর পরিক্রমণ বা oscillation বিদ্যমান। জটিল চেতন dipole-বিজ্ঞান পুরুষদেহকে অবলম্বন ক'রেই প্রকাশিত, তাই পুরুষমূর্তি জ্ঞান-প্রধান। চিন্ময় স্ত্রী-বিগ্রহে নানাবিধ ছোট বড় positive nucleus-কে কেন্দ্র ক'রে নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র negative চেতন charge-এর oscillation; ফলে বহু বিচিত্র radiation সৃষ্টিকারিণী স্ত্রী-মূর্তি আনন্দচাঞ্চল্য-প্রকাশে সুনিপুণা। তাই স্ত্রী-মূর্তিগুলির বহুবিধ বৈচিত্র্য-বিস্তারিণী শক্তিকে আনন্দ-প্রধান বলা যায়। স্ত্রী, পুরুষ ও উপকরণাদির এই তিন সত্তাকে পাত্তালদেব মূলত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন: পুরুষ-বিগ্রহের dipole-এ negative charge কেন্দ্র ও positive charge oscillating, স্ত্রী-বিগ্রহের dipole-এ কেন্দ্রে positive charge ও negative charge oscillation-রত, এবং উপকরণাদির dipole-এ প্রতি cycle-এ এই অবস্থা পরিবর্তনশীল। এর ফলে পুরুষের magnetic moment ও angular momentum positive, স্ত্রীর negative এবং উপকরণাদির variable। চিন্ময় বিশ্বের এই চেতন পুরুষ ও স্ত্রী-বিগ্রহ সম্বন্ধে পাত্তালদেব এক অপরূপ ব্যাখ্যা শোনালেন। স্ত্রী ও পুরুষের magnetic moment বিপরীত হওয়ায়, একে অপরের field-এর মধ্যে এলে অন্তরে প্রবল আলোড়ন অনুভব করবেন। সেই আলোড়নের frequency imaginary, অর্থাৎ এ আলোড়ন অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভূত হবে, তার বহিঃপ্রকাশ হবে না। পরন্তু একই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ, যেমন পুরুষগণ বা স্ত্রীগণ, কাছাকাছি হ'লে যে-দোলা অনুভব করবেন, তা' real, অর্থাৎ কর্মচাঞ্চল্যে তার বাহ্যপ্রকাশ দেখা যাবে। আবার angular momentum বিপরীত হওয়ায় পুরুষ-প্রকৃতি-মূর্তিগণের মূল dipole-গুলি পরস্পর বিপরীত দিকে rotation ও spin করবে; অর্থাৎ একে অপরের image বা প্রতিবিম্বরূপে প্রতিভাত হবেন এবং এ-image real ও opposite ব'লে মনে হবে। শুধু তাই নয়, image function original function field-কে double ক'রে দেয়, সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ কাছাকাছি হ'লে একে অপরের field double ক'রে দেবেন। বস্তুত যিনি যাঁ'র উপাসনা করেন, সেই উপাস্যরূপী nucleus-এর মূর্তরূপ দেখলে এইরূপই হয়, একের মধ্যে অপরের প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায়। আরও লক্ষ্যণীয় যে এতে একে অপরের পরম আনন্দদায়কও হন। নিজের প্রতিবিম্ব দেখে যে-আনন্দ হয়, নিজের আরাধ্যের মূর্তরূপ চোখের সামনে দেখতে পেলে, তার সাথে আলাপ-পরিচয় ও সম্বন্ধ-স্থাপন করতে পারলে, তার চেয়েও বহুগুণ আনন্দ হয়। Nucleus-স্থিত negative charge-রূপী পরমারাধ্যার মূর্তরূপকে চোখের সামনে দেখে positive charge-রূপী আরাধক আনন্দে বিস্ময়ে অবাক হয়ে ভাবেন—যাঁ'কে কেন্দ্র ক'রে আমার

আরাধনা, তিনি এবং। আবার নিম কেন্দ্রিক স্বরূপী positive charge-কে মূর্তরূপে সম্মুখে রেখে উপাসিকা negative charge আনন্দে বিভোর হয়ে ভাবেন, আমি যাঁর উপাসনা করি, তিনি এমন। তখন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে multiple image-এর সৃষ্টি হয়ে তাঁদের আনন্দ-চমৎকারিতা আরও শত শত গুণে বর্ধিত হয়। একরূপ সত্তায়, যেমন কেবল পুরুষ, বা কেবল স্ত্রীতে, এ আনন্দ-অনুভব সম্ভব হ'ত না। উপাস্য ও উপাসকের বিপরীত moment ও angular momentum-জনিত ধর্ম পারস্পরিক আনন্দ-বিস্ময়-অনুভূতি ও সেবারূপ প্রেমাস্বাদনের জন্যই।

পাতালদেব-সূত্রের Logical Analysis

Logic-এ hypothesis তিন প্রকার: Law বা নিয়ম বিষয়ে, agent বা কর্তা সম্বন্ধে, collocation বা সমাবেশ বিষয়ে। জড়বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মকানুন আমরা জানি, জড়পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে যেসব আনুষঙ্গিক সমাবেশ বা collocation প্রয়োজন তাও জানা আছে। কিন্তু এই জড়-বিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক কে, তা' অজ্ঞাত। অনুরূপ অবস্থা জীব-বিজ্ঞানেও। জড়বিজ্ঞান উক্ত agent কে 'great mathematical mind' ব'লে ইঙ্গিত করেছেন, এবং জীব-বিজ্ঞান তাকে 'never-slumbering intelligence' ও 'great organiser' ব'লে আভাষ দিয়েছেন। কিন্তু ঐ agent সম্বন্ধে ওঁদের কোনো clear hypothesis নেই। পাতালদেবের সুস্পষ্ট hypothesis সেই agent সম্বন্ধে। তাঁর hypothesis-এ এই agent চেতন charge, বস্তু-বিশ্বে তার সর্বত্র সন্দীপ্তিতে পরিব্যাপ্তি; সেই ব্যাপ্তি radiation-প্রথায়, এবং সেই radiation চেতন dipole-oscillation প্রসূত। উক্ত চেতন dipole-এরই এক বিশেষ oscillation থেকে এই বস্তু-বিশ্বের সৃষ্টি।

চেতন ও অচেতন সত্তার মধ্যে Analogy

আমরা জানি চেতন সত্তারূপ আত্মা জীবদেহে বর্তমান থেকেও দেহস্থ সাধারণ gravitating matter ও সাধারণ charge বা current-এর ধর্মে কোনো প্রকার বিকার করে না। সুতরাং 'চেতনা'-গুণের জন্য চেতন charge কোনো অসাধারণ ধর্ম প্রকাশ করে না, এবং এর ধর্ম সাধারণ charge-এর ধর্মের মতোই। সুতরাং এদের মধ্যে মিল অংশই বেশী। অমিল অংশ—একটি চেতন, অপরটি অচেতন। চেতনা-গুণের জন্য আত্মারূপী চেতন charge-এর জোগেচ্ছা আত্মাদের জন্য। শুধু জোগেচ্ছা

প্রকৃতে কর্মের জড় সঞ্চিত কর্মফল-রূপ energy-shell-এর স্বরূপ আমাদের ঠিক জানা নেই, সুতরাং অজানা অংশ খুব কম।

$$\text{অতএব, analogy-র সম্ভাব্যতা} = \frac{\text{মিল অংশ}}{\text{অমিল অংশ} + \text{অজানা অংশ}} = \text{খুব বেশী।}$$

পাতঞ্জলদেব-সূত্র জড়বিশ্ব ও চেতন শক্তির সাথে এক নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন ক'রে বিশ্বের বিবিধ আপাত সম্বন্ধবিহীন ঘটনাগুলিকে এক ও অভিন্ন কর্তার অভিন্ন নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও গ্রথিত ক'রে আমাদের অসম্পূর্ণ ও অবিন্যস্ত জ্ঞানকে সম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্ত করেছে।

পুস্তকে কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। তন্মধ্যে যে যে স্থানে অর্থ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয়, সহৃদয় পাঠক নিম্নলিখিত শুদ্ধ শব্দে সেগুলি সংশোধিত ক'রে নেবেন।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	২২	ভদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩	২৬	বুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৫	১২	পরম	সেই পরম
৫৭	১৪	এসবশুণে	এসব শুনে
৬০	৯	স্মরণ	শরণ
১৬২	১২-১৩	গুরুদেবের সঙ্গে	গুরুদেবের পত্রের সঙ্গে
১৯১	২৮	তবুও	তুমিই
১৯৭	২০	বাবা, আর একটুও এগিও না	বাবা, ঐ ট্রেনে হয়তো আমার মা বাবা কেউ আসছে। ফিরে চল, বাবা আর একটুও এগিও না
২০৯	১৪	শক্তির	শক্তির প্রভাবে
২৬৮	৪	বিপদগ্রস্ত	বিষাদগ্রস্ত
৪০১	২৫	ভক্ত মনে	ভক্ত মান
৪৭৩	২৫	অন্তিবাসনার	অন্তিম বাসনার
৫০৫	১১	সাধন-সহায়ক	সাধন-সহায়ক বাণীরও